শ্রী অরবিন্দ

যোগসমন্বয়

প্রবন্ধ।

যোগসমন্বয় প্রসঙ্গ।

ভূমিকা

অনির্বাণ

শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দির

১৫.০০

১

সমন্বয়ের নীতি ও রীতি

যোগ আর জীবন আলাদা নয়, বা যোগের সাধনা জীবনে একটা খাপছাড়া ব্যাপার নয়। উমার তপস্যার মতই বিশ্বপ্রকৃতিতে চলছে একটা অখণ্ড মহা-যোগের সাধনা। প্রকৃতি শিবাভিসারিণী। একটা পরম সত্য তার সত্তার গভীরে বীজের মত নিহিত রয়েছে, তার সার্থক রূপায়ণ ঘটানোই তার দায়। আমাদের জীবনের মর্মেও এমনিতর একটি বীজভাবের প্রেরণা আছে, আমরা ভাবে ও কর্মে তাকেই রূপ দিয়ে চলেছি। কিন্তু চলেছি অর্ধ-অচেতন হয়ে, মন্থর লয়ে। জীবনের গভীর লক্ষ্য সম্পর্কে যদি সচেতন হই, চিত্তের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে যদি তার অনুকূলে সংহত এবং একাগ্র করি, তাহলেই আমাদের জীবনের সাধনা প্রাকৃতভূমি হতে উত্তীর্ণ হয় যোগভূমিতে।

মুখ্যত যোগজীবন অন্তর্জীবন, কিন্তু তাবলে বহির্জীবনের প্রতিষেধ নয়। বস্তুত অন্তরে-বাইরে কোনও একান্ত বিরোধ নাই। প্রাণের ধর্মই হল অন্তরের গভীর সত্যকে বাইরে রূপ দেওয়া। প্রাকৃতভূমিতে জীবনের যে-রূপ বাইরে ফুটেছে, তা-ই তার সবখানি নয়। নয় বলেই গাছপালার মত পশুপাখির মত মানুষের জীবন অভিব্যক্তির একটা নিটোল পূর্ণতায় পৌঁছয় না। ঋগ্বেদের ঋষির ভাষায়, 'সে সানু হতে সানুতে আরোহণ করে চলে, আর দেখতে পায় তার কত করবার আছে।' এই করাটা কেবল বাইরের করা নয়, আসলে তা ভিতরের করা। অন্তরের তাগিদেই আমরা এত উপকরণ স্তূপাকার করে তুলি। যদি ভিতরে না ডুবতে পারি, উপকরণ জঞ্জাল হয়ে ওঠে। আবার যতই গভীরে যাই, ততই দেখি বাইরটা গুছিয়ে আসছে। এই ভিতরে যাওয়াটাই হল যোগ; আর ভিতরের শক্তিতে বাইরের প্রশাসন, তার মধ্যে ঋতচ্ছন্দের আবির্ভাব ঘটানো হল যোগের বিভূতি বা ঐশ্বর্য। অন্তরে চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা আর বাইরে বিভূতির উল্লাস, দুয়ে কোনও বিরোধ নাই। এই সত্যই চেতনার মৌলসত্য, শিব-শক্তির সামরস্যের সত্য।

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

জীবন বিচিত্র, তাই যোগের সাধনাও বিচিত্র। অথচ এই বৈচিত্র্যের গভীরে একটি ঐক্যের সূত্র আছে। জীবনের বিভিন্ন প্রকাশ এক অখণ্ড মহাপ্রাণের বিভূতি। তেমনি বিভিন্ন যোগসাধনা এক অখণ্ড মহাযোগেরই বিস্তার মাত্র। অন্তঃপ্রকৃতির ঝোঁক যেমন বিশেষের পুষ্টির দিকে, তেমনি আবার সমস্ত বিশেষকে একটি অখণ্ড সমগ্রতার মধ্যে গুটিয়ে আনার দিকেও। এমনি করে প্রকাশ পায় একের ঐশ্বর্য। বনস্পতির প্রাণ শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে—এটা তার বাইরের দিক, বিভূতির দিক। কিন্তু তার সত্তার গভীরে চলছে এক অখণ্ড রসেরই লীলা। যোগের বৈচিত্র্যও তেমনি এক মহাযোগেশ্বর পুরুষোত্তমের ঐশ্বর্য-যোগের উল্লাস। ভারতবর্ষ গীতায় একবার তার পরিচয় পেয়েছে।

বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যকে সমন্বয়ের মাঝে সুডৌল আর পরিপূর্ণ করে তোলা যেমন প্রকৃতির একটা রীতি, তেমনি তার আরেকটা রীতি হচ্ছে মুমূর্ষু অতীতের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার দ্বারা তার রূপান্তর ঘটানো। এই নতুন সঞ্জীবনী শক্তি আসে ঊর্ধ্বতর চেতনা থেকে, যা প্রকৃতির মধ্যেই এতদিন প্রকাশের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে ছিল। ভাগবত-যোগ তার বৈবস্বত দীপ্তি হারিয়ে ম্লান হয়ে পড়েছিল। গীতায় তার মধ্যে নতুন তেজ সঞ্চার করা হল। সে শুধু অতীতের সমাহার এবং সমন্বয়ই নয়, একটা নতুনতর পৌরুষেয় শক্তিপাতও। তারপর বহুযুগ পার হয়ে গেছে, মানুষের চেতনায় আবার এসেছে একটা মন্বন্তরের লগ্ন। আবার এক পৌরুষেয় শক্তিপাতের দ্বারা যোগসমন্বয় ঘটানো তাই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

*

হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ—ভারতবর্ষের যোগ-সাধনার মোটের উপর এই পাঁচটি শাখা। পাঁচটি শাখা, কিন্তু তাবলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। আসলে তাদের মধ্যে জীবনের শক্তিবৈচিত্র্যের একেকটি দিক অনুশীলনের ফলে চরমে উঠেছে। এই প্রাকৃত জীবনীশক্তিই যোগশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে উপায়-কৌশলের ফলে। আমাদের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনেও কিছু-না-কিছু যোগশক্তির প্রয়োগ আমরা করেই থাকি—অজ্ঞাতসারে। সেই শক্তিগুলিকে চিনে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সহায়ে তাদের অনুশীলিত ও সংস্কৃত করেই এদেশে যোগশাস্ত্রের পত্তন হয়েছে। বস্তুত

যোগের সাধনা একটা বৈজ্ঞানিক সাধনা, আকাশে তার ফুল ফুটলেও মূল রয়েছে মাটিতেই। যোগের একটা মুখ্য সাধনা হল কালসংক্ষেপ। প্রকৃতির পরিণাম চলে মন্থর গতিতে, একটা শক্তিকে ফুটিয়ে তুলতে সে অসম্ভব সময় নেয়। যোগী কৌশলে সেই শক্তিকে অল্প সময়ের মধ্যে সক্রিয় করে তোলেন। আবার কৌশলটা তিনি আবিষ্কার করেন প্রকৃতির মধ্যেই। অপরা-প্রকৃতিতে যা অস্ফুট, পরা-প্রকৃতির উপান্তে হয়তো তার একটু স্ফুটতর আভাস পাওয়া গেল। যোগী সেইটুকু ধরে পরা-প্রকৃতিকে দোহন করে শক্তিকে জীবনে নামিয়ে আনলেন। সুতরাং যোগ একটা অপ্রাকৃত বা অযৌক্তিক ব্যাপার নয়।

বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন যোগবিদ্যার ইতিহাস আলোচনা করলে তার দুটি ত্রুটি দেখতে পাই—যার জন্য আমাদের নতুন করে যোগসমন্বয়ের কথা ভাবতে হচ্ছে। অবশ্য ত্রুটিগুলি দেখা দিয়েছে জাতীয়-চেতনার অবক্ষয়ের ফলে। প্রথম ত্রুটি হল, অনুশীলনের আত্যন্তিকতার (exclusiveness) ফলে অখন্ড যোগসাধনার মধ্যে বিরোধ ও খন্ডতার আবির্ভাব। এই বিরোধ কৃত্রিম, জীবনে তার কোনও সায় নাই। জ্ঞান আর ভক্তিতে বিরোধের কথা আমরা সবাই জানি। অথচ সুস্থ প্রাকৃত-জীবনের কারবার চলে শুধু মস্তিষ্ক বা শুধু হৃদয় নিয়ে নয়—দুয়ের সৌষম্যে এবং সমাহারে। চেতনার দুটি মৌলবৃত্তির উৎকর্ষ ঘটাতে গিয়ে শেষপর্যন্ত আমরা দুয়ের মাঝে যদি একটা বিরোধের সৃষ্টি করে বসি, তাহলে বুঝতে হবে সাধনার কোথাও ভুল হচ্ছে। আরেকটা ত্রুটি হল, জীবনের সঙ্গেই যোগের একটা বিরোধ আছে—আমাদের মধ্যে এমনিতর বদ্ধমূল একটা সংস্কার। যোগে চেতনার উত্তরণ ঘটে—এটা তার মৌলধর্ম। কিন্তু সে যদি মহাশূন্যে হারিয়ে যায়, আর পৃথিবীতে না নেমে আসতে চায়, তাহলে তার সাধনা একাঙ্গী হল। সুস্থ প্রাকৃত-জীবনেও এর কোনও সায় নাই। অন্তরে-বাইরে, ভাবে-কর্মে সেখানে কোনও আত্যন্তিক বিরোধ নাই। যোগ-জীবনেই-বা সমাধিতে ব্যুত্থানে বিরোধ থাকবে কেন? যোগস্থ হয়ে কর্ম করাই-বা অসম্ভব হবে কেন?

এই দুটি ত্রুটির সংশোধন হল যোগসমন্বয়ের একটা সাধারণ অভ্যুপগম (postulate)। গোড়াতেই জানতে হবে, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যোগের সহায়ে জীবনের সমগ্র অনুশীলন এবং শিবাভিসারিণী মহাপ্রকৃতির অকুণ্ঠ ছন্দোনু-বর্তন।

২

প্রকৃতি-পরিণামের তিনটি পর্ব

অতীতে যোগের সাধনা হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে। জীবনের একেকটি বৃত্তিকে ধরে যোগীরা অনুশীলনদ্বারা তার চরম উৎকর্ষ ঘটাতে চেয়েছেন। তাইতে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, সাধন-জীবনে দেখা দিয়েছে নানা মত ও পথের বিরোধ। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন বৃত্তি একটি অখণ্ড সত্যেরই বিভূতি। সে-সত্য আদিতে অব্যক্ত, অন্তেও অব্যক্ত—এই দৃষ্টিতে তা অদ্বৈত। একটি জড়ের অদ্বৈত, আরেকটি চেতনার। কিন্তু দুটি অদ্বৈতের মাঝে দ্বৈতের বিচিত্র লীলা, তারই নাম জীবন। জড়ের অদ্বৈত হতে চেতনার অদ্বৈতের দিকে যাই, অথবা চেতনার অদ্বৈত হতে জড়ের অদ্বৈতের দিকেই নেমে আসি, মাঝখানকার এই দ্বৈতলীলাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই, প্রয়োজনও নাই। বরং অদ্বৈতের আলোতে দ্বৈতের লীলাবৈচিত্র্যের আস্বাদনেই অনুভবের পূর্ণতা—কেননা সবকে নিয়ে, সবাইকে জড়িয়ে অদ্বৈতের যে-সৌষম্য, তা-ই সত্তার সত্য। জীবনে সেই সত্যেরই অভিব্যক্তি।

অভিব্যক্তি ঘটে কালে। তার মধ্যে পর্বের ভেদ আছে। একটা পর্ব অস্ফুট, তার পরের পর্ব স্ফুটতর—এরই নাম অভিব্যক্তি। আসলে ওটা প্রাণের ধর্ম, জড় তার বনিয়াদ। জড় ওই আদিম অব্যক্ত, যার কথা আগে বললাম। জড় জড় থাকে না চিরকাল, সে-থাকার কোনও অর্থ নাই। জড়কে ভিত্তি করে ফোটে প্রাণ। প্রাণ শক্তিরই একটা বিভঙ্গ। জড়ের আপাতলক্ষ্যহীন অন্ধশক্তিতে একটা লক্ষ্যের আভাস দেখা দিল :- এখানে শক্তির সংজ্ঞা দিতে পারি 'প্রাণ'। লক্ষ্যের আভাস যখন আরও স্পষ্ট হল, তখন দেখা দিল 'মন'। মন বোঝে, প্রাণ অতটা বোঝে না—এই হল দুয়ের মৌলিক তফাত। কিন্তু মন অশক্ত, বুঝেও সে অনেক-কিছু করতে পারে না। তার মধ্যে স্বরাট শক্তির আবির্ভাব যখন হয়, তখন দেখা দেয় 'চিৎ' (Spirit)। এইখানে শক্তির পূর্ণতা। এই পূর্ণ শক্তিকে পাবার সাধনাই হল যোগ। অভিব্যক্তির মূলে এই যোগের প্রেরণা। প্রকৃতি স্বরূপত যোগিনী। সে মৃন্ময়ী, হতে চাইছে চিন্ময়ী। এইটাই যোগ, এইটাই জীবন।

প্রকৃতি-পরিণামের তিনটি পর্ব

চিৎশক্তির দুটা দিক আছে—একটা বিবিক্ত স্বরূপস্থিতির (self-poise) দিক, আরেকটা শক্তির দিক। বিবিক্ত না হয়ে, নিজেকে শক্তিপরিমণ্ডলের বাইরে না নিয়ে শক্তির সার্থক প্রয়োগ করা যায় না। এই বিবিক্তভাবটা নির্বর্ণ, অথচ তা বর্ণবৈচিত্র্যের উৎস। যখন সে নির্বর্ণ, তখন তাকে বলতে পারি অব্যক্ত। এইটি হল অন্তিম অব্যক্ত। যখন আদিম অব্যক্ত থেকে অন্তিম অব্যক্তের দিকে যাই, তখন তাকে মনে হয় প্রলয় বা শূন্যতা। কিন্তু সেই শূন্যতা হতেই আবার শক্তি উছলে পড়ে। একটা উজানের দিক, আরেকটা ভাটার দিক। দুটাই যোগ-শক্তি। একটার লক্ষ্য মোক্ষ—প্রাচীন যোগ মুখ্যত একেই পরমার্থ বলে ধরেছে। আরেকটার লক্ষ্য হল সৃষ্টি—শূন্যকে দোহন করে শক্তির উৎসারণ। এইটিই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। মোক্ষ সেখানে পরম পুরুষার্থ নয়, প্রথম পুরুষার্থ। জীবকে হতে হবে শব নয়, শিব।

উজান-ভাটা দুটি ধারার কথা বলেছি। আসলে দুটি বিপরীত ধারা নয় কিন্তু। কেবলই উজান বা কেবলই ভাটা, এটা প্রকৃতির দস্তুর নয়। তার শক্তির ক্রিয়া হয় দমকে-দমকে। তাই জীবনে উজান-ভাটার একটা ছন্দ চলতে থাকে। উজিয়ে যাওয়াটা হল প্রাণের আদিম প্রেরণা, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তার সবল প্রতিবাদ। কিন্তু ভাটার টানে আবার তাকে নেমে আসতেই হয়। এই নেমে আসাটা শক্তির অবসাদ হবে না বিসৃষ্টি হবে, তা নির্ভর করে উজিয়ে গিয়ে চেতনা স্বচ্ছ হয়েছে কিনা তার 'পরে। চেতনার চাইতে জড়ের আকর্ষণ যতক্ষণ প্রবল থাকে, ততক্ষণ অবসাদই মনে হয় স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু তারও মধ্যে চিৎশক্তির সূক্ষ্ম ক্রিয়া চলতে থাকে। একটু সে জোর ধরলে পরেই দেখা দেয় বিসৃষ্টি। তার মধ্যে নিবৃত্তির একটা টান থাকে, যা হয় বিসৃষ্টির প্রতিষ্ঠা। যোগশক্তি একেক ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিসৃষ্টির উল্লাসে উপচে পড়ছে। উপচে পড়ছে কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না, উজানমুখী একটা টান ভিতরে থাকছেই। আবার সে আরেক ভূমিতে উঠছে, তারপর স্বপ্রতিষ্ঠার বীর্যে উপচে পড়ছে। উজান-ভাটার মধ্যে এমনি চলছে একটা ছন্দের দোলা।

স্বপ্রতিষ্ঠার ভূমি থেকে আবার সহজের আনন্দে নেমে আসা অবরভূমির রূপান্তরের জন্য। রূপান্তর হল নিরুদ্ধ শক্তির মুক্তি। জড়ের মধ্যে প্রথম যখন প্রাণের উদ্ভব হল, তখন সে কত অসহায়, কত দুর্বল। অবসাদ আর মৃত্যুকেই তখন মনে হয় তার চরম নিয়তি। অথচ জড়শক্তির প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার মধ্যেও সে যে কি করে টিকে থাকে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। মনে হয়, তার মধ্যে

এমন-একটা কিছু আছে, যা জড়ত্বের চাইতেও বড়, যা অজর এবং অনবসন্ন। একটু স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েই জড়কে সে আত্মসাৎ করতে শুরু করল, জড়ের মধ্যে সংক্রামিত করল প্রাণের ধর্ম, তাকে করল তার আত্মপ্রকাশের বাহন। তখন, যেখানে বৈষম্য ছিল, সেখানে দেখা দিল সৌষম্য, জড়শক্তি আর প্রাণশক্তির বিরোধী রইল না। মনে হল, জড়ের গভীরেও ওই প্রাণধর্মই লুকিয়ে ছিল, প্রাণের ছোঁয়া পেয়ে সে-ই আজ জেগে উঠেছে। এমনি করে প্রাণের মধ্যে জাগে মন, স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে সে আবার প্রাণ আর জড়ের রূপান্তর ঘটায়। অভিব্যক্তির এই ধারা : একটা নিগূঢ় শক্তির প্রেরণায় খানিকটা উজিয়ে গিয়ে স্থিতিলাভ করা, তারপরে আবার ভাটিয়ে এসে অবরভূমির রূপান্তর ঘটানো। আবার উজিয়ে যাওয়া, আবার ভাটিয়ে আসা—এমনি করে বার-বার, যেপর্যন্ত না অন্তিম অব্যক্তের সঙ্গে আদিম অব্যক্তের যৌগিক সম্মিশ্রণে (fusion) ব্যক্তের অন্তরিক্ষ অকুণ্ঠ ঐশ্বর্যে ঝলমলিয়ে উঠছে। এই ঝলমল জীবনই দিব্য-জীবন। আর পূর্ণযোগ তার সাধন।

*

মহাপ্রকৃতি চলেছে দিব্য-জীবনের অভিব্যক্তির দিকে। তার তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে ঘটল দেহের অভিব্যক্তি। দেহ জড়পিণ্ড, কিন্তু প্রাণবন্ত। প্রাণ-শক্তি একটা নতুন আবির্ভাব। জড়শক্তিই তার বনিয়াদ, তবুও জড়ের ধর্ম আর প্রাণের ধর্ম এক নয়। এই এক-না-হওয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারি স্বোত্তরণ (self-exceeding) দিয়ে। জড় জড়ই থাকল না, তার নিরুদ্ধ শক্তির একটা উন্মেষ ঘটল, সে রূপান্তরিত হল প্রাণময় দেহে। কতকগুলি দৈহ্যক্রিয়া প্রকৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে বলা যেতে পারে। ইতর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়, নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে অধিকাংশ প্রজাতিই (species) একটা পরিপূর্ণ সুডৌল জীবন যাপন করছে। সে-জীবন বিশেষ করেই দেহাশ্রয়ী, প্রাণপ্রাচুর্যে শক্তি-মান—কিন্তু মননশক্তি তার মধ্যে অস্পষ্ট।

প্রকৃতি-পরিণামের এই পর্বের উপর দাঁড়িয়ে দেখা দিল মানুষ। তার প্রাণবন্ত দেহে আরেকটা শক্তির উন্মেষ হল—মননশক্তি। এ-শক্তি ইতরপ্রাণীতেও ছিল, কিন্তু ছিল অস্পষ্ট। মানুষেরই মধ্যে তার প্রকাশ হল সুস্পষ্ট। মনঃশক্তির এই আত্মপ্রকাশের প্রভাব দেহের উপরেও পড়ল, দেহ আরও

সূক্ষ্মসংবেদনশীল (sensitive) হয়ে উঠল। দেহের মধ্যে আছে নাড়ীতন্ত্র (nervous system), যা মুখ্যত মনঃশক্তির বাহন। এই নাড়ীতন্ত্র ইতরপ্রাণীর চাইতে মানুষের মধ্যে বেশী পরিণত। কিন্তু সর্বজনীন ভাবে পরিণতির শেষ ধাপে এখন পর্যন্ত সে পৌঁছয়নি। এদেশের যোগপন্থা—বিশেষ করে হঠযোগ —নাড়ীতন্ত্রের উৎকর্ষ ঘটানোর উপর বেশী জোর দিয়েছে।

মনঃশক্তির অভিব্যক্তি হল প্রকৃতি-পরিণামের দ্বিতীয় পর্ব। এর কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে। মনঃশক্তির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় বুদ্ধির উন্মেষে। বুদ্ধির দুটি মৌললক্ষণ—সামান্যভাবনা (conceptual thought) আর আত্মসচেতনতা (self-consciousness)। বুদ্ধি সব মানুষেরই আছে, সব মানুষই ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হয়ে ভাবতে পারে, নিজের মননের সাক্ষীও হতে পারে। কিন্তু সবাই তা ঠিক সমানভাবে পারে না। কতকগুলি সাধারণ মনোবেগ (passion) সব মানুষের মধ্যে সমান, কিন্তু বুদ্ধির উৎকর্ষ সবার মধ্যে সমান নয়। একটা সর্বজনীন উৎকর্ষ ঘটানোর চেষ্টা চলছে সমস্ত জগৎ জুড়ে, তার নাম হল শিক্ষা। উদ্ভিদের শিক্ষার দরকার হয় না, পশুর শিক্ষা অল্পেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু মানুষের শিক্ষার আর শেষ নাই। ছোট্ট শিশুর মত তার মন চঞ্চল—এখনও সে বাড়তির পথে বলেই। সময়-সময় তার মধ্যে অসাধারণ শক্তির বিকাশ দেখা দেয়, আমরা তাকে বলি প্রতিভা। প্রতিভা মনঃপ্রকৃতির স্বোত্তরণের চিহ্ন। সাধারণের ওপারেও একটা-কিছু আছে, যা আধারে প্রকাশের পথ খুঁজছে। মাঝে-মাঝে প্রতিভার বিদ্যুৎঝলকে তা-ই দেখা দেয়। প্রমাণ হয়, মানুষের মন পরিণামের শেষ ধাপে পৌঁছয়নি এখনও, তার ভবিষ্যতের দিগন্তে একটা মহতী সম্ভাবনা উদ্যত হয়ে রয়েছে।

এই সম্ভাবনাকে নিয়ে দেখা দেয় প্রকৃতি-পরিণামের তৃতীয় পর্ব। তার মৌললক্ষণ হল চিৎশক্তির প্রকাশ। যেমন দেহ-প্রাণকে ভিত্তি করে মনঃশক্তির প্রকাশ ঘটেছিল, তেমনি দেহ-প্রাণ-মনকে ভিত্তি করেই চিৎশক্তির প্রকাশ ঘটবে— তাদের বাদ দিয়ে নয়। এই কথাটি মনে রাখতে হবে, কেননা এই হল প্রকৃতি-পরিণামের স্বাভাবিক রীতি। মনঃশক্তির যখন প্রকাশ হল, তখন সে দেহ আর প্রাণকে তার অনুকূলে রূপান্তরিত করে নিল। তেমনি চিৎশক্তির প্রকাশও দেহ-প্রাণ-মনকে তার অনুকূল করে নেবে, এইটাই প্রত্যাশিত। অনুকূল করে নেবে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে খানিকটা বর্জন-মার্জনও দরকার হবে, তাদের ঠিক আগের খাতে বইতে দিলেও চলবে না। মনও তা-ই করছে। প্রাণের দুর্বার

প্রকাশ ঘটে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে। ইন্দ্রিয়কে সংযত না করলে মনঃশক্তির স্ফুরণ হয় না, এটা মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতার সত্য। এদেশের যৌগিক শিক্ষানীতির ভিত্তি তাই ছিল ইন্দ্রিয়সংযম বা ব্রহ্মচর্য। তেমনি চিৎশক্তিকেও আধারে স্ফুরিত করতে হলে দেহ প্রাণ ও মনের শক্তির সংযম এবং পরিশীলন দরকার। সংযম (control) মানে নিগ্রহ (repression) নয়। নিগ্রহ হচ্ছে মূঢ়ের অস্বাভাবিক জবরদস্তি; আর সংযম হচ্ছে বিজ্ঞানীর স্বাভাবিক স্বোত্তরণের প্রচেষ্টা। আধুনিক সভ্যতা নিগ্রহ আর সংযমের পার্থক্য ঘুলিয়ে ফেলে সংযমের বিরুদ্ধেও জিগির তুলেছে, এটা আশঙ্কার কথা। চিৎপ্রকাশ ঘটে যোগশক্তিতে। সংযম তার বনিয়াদ। সংযমের ফলে দেহ প্রাণ ও মনের মধ্যে চিৎশক্তির প্রকাশ স্বচ্ছন্দ হবে, এইটাই যোগজীবনের লক্ষ্য।

প্রশ্ন হবে, চিৎশক্তির স্বরূপ কি? উপনিষৎ থেকে তার জবাব পেতে পারি। উপনিষৎ বলছেন, আত্মাকে ঘিরে পাঁচটি কোশ রয়েছে। সবার বাইরে অন্নময় কোশ, যা অন্ন বা জড়শক্তি দিয়ে গড়া। এটি হল আমাদের দেহ। তার ভিতরে আছে প্রাণশক্তি দিয়ে গড়া প্রাণময় কোশ। মোটামুটিভাবে নাড়ীতন্ত্রকে প্রাণশক্তির বাহন বলা যেতে পারে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, জড়ের সংগে প্রাণের তফাত যতখানি, প্রাণের সংগে মনের ততখানি তফাত নাই। শক্তিক্রমের যত উপরের দিকে যাব, ততই পরস্পরের তফাতটা কমে আসবে, এই হল নিয়ম। প্রাণময় কোশেরও গভীরে আছে মনোময় কোশ। প্রাকৃত মানুষের চেতনা এই পর্যন্তই যেতে পারে। সে মনের মধ্যে ঢুকতে পারে, কিন্তু তার গভীরে আর পথ পায় না। মনের মধ্যে ঢুকেও তার চেতনার মুখ কিন্তু ফেরানো থাকে বাইরের দিকে। প্রাণ-চেতনার বুভুক্ষা আর জড়-চেতনার বস্তু-নির্ভরতা তাকে কেবলই বাইরের দিকে টানে। মানুষের মন তাইতে চঞ্চল।

মনোময় কোশেরও গভীরে আর দুটি কোশ আছে—বিজ্ঞানময় আর আনন্দময়। এই দুটি কোশই হল চিৎশক্তির আধার। আত্মা চিৎস্বরূপ, আর তাঁর শক্তি সক্রিয় হচ্ছে এই বিজ্ঞান ও আনন্দের ভিতর দিয়ে। যোগের লক্ষ্য হচ্ছে, মনেরও গভীরে এই বিজ্ঞান ও আনন্দের উৎসকে আবিষ্কার করে মন-প্রাণ-দেহের ভিতর দিয়ে তাকে উৎসারিত করা।

বিজ্ঞান আর আনন্দ সবার আড়ালে রয়েছে বটে। কিন্তু সেখান থেকেই তাদের শক্তি মন-প্রাণ-দেহকে সঞ্জীবিত করছে। সর্বত্রই সূক্ষ্মশক্তি স্থূলশক্তির নিয়ামক। সুতরাং খুঁজলে পরে মনের মাঝেও আমরা বিজ্ঞানের খানিকটা

আভাস পাব। বিজ্ঞানকে ধরতে পারলে আনন্দকে ধরা কঠিন হয় না।

বলেছি, মনঃশক্তির উৎকর্ষ ঘটে বুদ্ধিতে। তার দুটি লক্ষণ—সামান্যভাবনা আর আত্মসচেতনতা। এই দুটি বৃত্তির উৎকর্ষ ঘটাতে পারলেই চেতনা বিজ্ঞানভূমিতে উত্তীর্ণ হয়। সামান্যভাবনার দুটি স্তর আছে—একটি ইন্দ্রিয়-নির্ভর, আরেকটি ভাবনির্ভর। ইন্দ্রিয়নির্ভর সামান্যভাবনা দিয়ে প্রাকৃত-মন তার ব্যাবহারিক কাজ চালিয়ে যায়। সবসময় এর জন্য খুব আত্মসচেতন হওয়া দরকার পড়ে না। বস্তুর স্মৃতি আর কল্পনা নিয়ে মন জাল বুনছে, ভেসে চলেছে—এ তো আমরা হামেশাই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু একটু অন্তর্মুখ এবং আত্মসচেতন হলেই বস্তুনিরপেক্ষ ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। ভাবকে তখন অনুভব হয় বস্তুর অতিরেক বলে। এখন দেখছি, বস্তু থেকে ভাব জাগছে; তখন দেখব ভাবেরই প্রতিবিম্ব পড়ছে বস্তুতে। এখন যেমন একটা সুন্দর ফুল দেখলে সৌন্দর্যের চেতনা জাগে, তখন নিরপেক্ষ সৌন্দর্যচেতনারই প্রতিবিম্ব পড়তে দেখব ফুলের উপর, পাতার উপর—এমন কি কুৎসিতেরও উপর। কবির মধ্যে এই ভাবদৃষ্টি খোলে, তা আমরা জানি।

এই ভাব স্বপ্রতিষ্ঠ হয় পরিপূর্ণ আত্মসচেতন হতে পারলে। আত্ম-সচেতনতার লক্ষণ হল বিষয়ের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে না যাওয়া, খানিকটা তাকে ছাপিয়ে থাকা। তার জন্য দুটি জিনিস দরকার—অন্তর্মুখীনতা আর শূন্যতা। চলছি, বলছি—কিন্তু বেহুঁশ হচ্ছি না কোনকালেই, নিজের উপর দৃষ্টিটি বেশ সজাগ আছে। আর ভিতরটা সবসময় থাকছে ফাঁকা—অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব সেখানে ঢেউ তুলছে না। যেমন ভাবের বেলায়, তেমনি চেতনার এই তটস্থতার বেলাতেও দেখি, ক্রমে দৃষ্টির বিপর্যয় ঘটছে। আমি আর বস্তুনির্ভর নই, সমস্ত বস্তুই আত্মনির্ভর। এ আত্মা অহং নিশ্চয় নয়। অহং আত্মার প্রতিভূ—যেমন আমার অহং, তেমনি সবার অহং। আত্মার শক্তি ভাব, ভাবের প্রতিবিম্ব বস্তু। এই দর্শনই বিজ্ঞানীর দর্শন।

বিজ্ঞান স্বপ্রতিষ্ঠ হলে আপনা হতেই তার গভীরে আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে আনন্দের সম্পর্ক এইভাবে বোঝানো যেতে পারে। একটা ঢিল সূর্যের দিকে ছুঁড়ে দিলে তা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে। কিন্তু সূর্যেরও তো মাধ্যাকর্ষণ আছে। পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে একটা বিন্দু আছে, যেখানে পৃথিবীর চাইতে সূর্যের আকর্ষণ প্রবল। ঢিল যদি সেই বিন্দুটা পার হয়ে যায়, তাহলে সে আর

পৃথিবীতে পড়বে না, সূর্যেই পড়বে। বিজ্ঞানের গভীরে তেমনি স্বরূপানন্দের একটা আকর্ষণ আছে। তবে কিনা এ-আকর্ষণ প্রলয়ের নয়, সৃষ্টির। অন্তর্মুখ টানটা যেমন তখন অফুরন্ত, তেমনি সৃষ্টির উল্লাসও অফুরন্ত। এই হল সাবিত্রীশক্তির দস্তুর—সংহরণ আর বিচ্ছুরণ চলছে একসঙ্গে। মন পর্যন্ত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, তারপর বিজ্ঞানের চিদ্‌বিন্দু, তারপর সৌর আনন্দের আকর্ষণ। বিজ্ঞান আর আনন্দ ওতপ্রোত। চিন্ময়ী মহাশক্তির এই স্বরূপ। তাঁর মধ্যে পৌঁছনই যোগের লক্ষ্য। ব্রহ্মের তিনি কারণ-শরীর। দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি সব-কিছুর তিনি উৎস। আজ তারা অবিদ্যাচ্ছন্ন, কিন্তু বিদ্যার অভীপ্সাও তাদের মধ্যে আছে। সে-অভীপ্সা বস্তুত তাঁরই আকর্ষণ। এইখানে তাঁর সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ। এই যোগচেতনাতেই তাঁর বিজ্ঞান ও আনন্দ আমাদের মন-প্রাণ-দেহকে অভিষিক্ত ও রূপান্তরিত করবে।

পার্থিব জীবন দিব্য হবে। এই হল প্রকৃতি-পরিণামের সম্ভাবিত তৃতীয় পর্ব।

৩

জীবনের ত্রিপুটী

দেখতে পাচ্ছি, জীবনের অভিব্যক্তির তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বের আশ্রয় হল দেহ, দ্বিতীয় পর্বের মন, আর তৃতীয় পর্বের চিৎশক্তি। পর-পর তিনটি পর্বের অভিব্যক্তি ঘটলেও বস্তুত তারা ওতপ্রোত। নিতান্ত দেহনির্ভর যে-জীবন, তারও একটা মনোময় দিক আছে, অধ্যাত্মবোধের একটা আভাস তাতে আছে। আবার অধ্যাত্মজীবনও দেহ-মনের দাবিকে একেবারে অস্বীকার করে চলতে পারে না। অবশ্য উৎকর্ষের দিক দিয়ে চিৎশক্তিই বড়। কিন্তু সেই শক্তি সবিগ্রহ হবে দেহে এবং মনকে করবে তার ঐশ্বর্যের বাহন, এই হল প্রকৃতিপরিণামের ধ্রুব নিয়তি।

দৈহ্যজীবন মনোজীবন আর অধ্যাত্মজীবন—এই তিনের মাঝে প্রাণের বিকাশ হচ্ছে যথাক্রমে জড়শক্তি মনঃশক্তি আর চিৎশক্তিকে আশ্রয় করে। তিনটি শক্তির পরিণামে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা বলাই বাহুল্য।

দৈহ্যজীবনের বনিয়াদ হল জড়শক্তি। সাংখ্যের ভাষায় বলতে গেলে, তার চলনের রীতিতে রয়েছে তমোবৃত্তির প্রভাব। তমোবৃত্তির বিশিষ্ট ধর্ম হল অপরিবর্তনীয়তা আর পৌনঃপুনিকতা। সে যাকে আঁকড়ে ধরে তাকে ছাড়তে বা তার রদবদল করতে চায় না। তার মধ্যে যে-গতি আছে, তা হল আবর্তগতি। একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তিতে সে অভ্যস্ত। আমাদের অধিকাংশ শারীর-ক্রিয়ার এই ধরন। এটা যখন মনে সংক্রামিত হয়, তখন মনও জড়ধর্মী হয়ে যায়। নতুন কোন ভাব গ্রহণ করতে না পারা, দিনের পর দিন একই ভাবনার জাবর কেটে চলা, অভ্যস্ত আচারের মধ্যে একটা মূঢ় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা—এই হল তামসিক মনের লক্ষণ।

দৈহ্যজীবনের দর্শন হল জড়বাদ। সমাজের অধিকাংশ মানুষই জড়বাদী। তারা মুখ্যত চায় দেহের স্বাচ্ছন্দ্য আর প্রাণবাসনার পরিতৃপ্তি। মনের শিক্ষাও তাদের চাই, জীবনে আধ্যাত্মিকতার খানিকটা বরাদ্দ থাকাও দরকার—কিন্তু সে-সমস্তই তাদের পক্ষে গতানুগতিক। যা চিরকাল চলে এসেছে তা-ই চলুক, তারা একটি কথাও বলবে না। কিন্তু নতুন-কিছুর আমদানী করতে গেলেই

তারা কোলাহল শুরু করবে। তাদের মনের সজীবতার লক্ষণ কেবল ওইখানেই। গুরু-পুরোহিতের মারফতে আধ্যাত্মিকতার যেটুকু বারোয়ারি ব্যবস্থা আছে, তা-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। তুমি তার চাইতে বেশী যদি কিছু করতে চাও, তাহলে সন্ন্যাসী হয়ে সমাজ থেকে বেরিয়ে যাও; কিন্তু সমাজের বুকে বসে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা চলবে না—এই তাদের রায়।

জড়াশ্রিত দৈহ্যজীবনের এই হল রূপ। তবে মন আর চিৎশক্তি একেও যে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করে না, তা নয়। গতানুগতিক সমাজজীবনে মনের জড়ত্ব ভাঙ্‌বার চেষ্টা করছে পাশ্চাত্য জগৎ, আর প্রাচ্য জগৎ চেয়েছে চেতনার জড়ত্ব ভাঙ্‌তে। পাশ্চাত্যপ্রভাবে মানুষ মননশীল হয়ে উঠছে, তার বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা শাণিত হচ্ছে দিন-দিন, স্থাণুত্বের বদলে জীবনের নানাদিকে এসেছে প্রগতির জোয়ার। তাতে বাইরের জীবনের জৌলুস বাড়ছে সত্যি, কিন্তু অন্তর হয়ে যাচ্ছে দেউলিয়া। ফলে ভদ্রবেশী বর্বরতাই দিন-দিন সমাজে কায়েম হতে চলেছে। পক্ষান্তরে প্রাচ্য জগতে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন চেতনার জড়ত্ব ভাঙ্‌তে গিয়ে সমাজের মধ্যে ইহবিমুখীনতার যে-আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, তাতে সমাজজীবনকে করেছে পঙ্গু এবং দুর্বল। অতি দুর্দিনেও সেখানে দেবমানবের আবির্ভাব ঘটেছে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মন ও চেতনা জড়ত্ব এবং গতানুগতিকতার মোহকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মোটের উপর বলা যেতে পারে, জীবনের জড়তা ভাঙ্‌তে গিয়ে মনঃশক্তি বা চিৎশক্তি কোথাও পুরাপুরি সফল হতে পারেনি আজও, তিনের মাঝে একটা সার্বভৌম সামঞ্জস্যও ঘটেনি। মনঃশক্তি যেখানে এগিয়ে গেছে, চিৎশক্তি সেখানে পিছিয়ে রয়েছে; আবার চিৎশক্তি যেখানে এগিয়ে গেছে, মনঃশক্তি সেখানে রয়েছে পিছিয়ে। এই হল বর্তমান জগতের হাল।

*

এখনও মানুষের জীবন অপরাপ্রকৃতির শাসনকেই মেনে চলে। পরাপ্রকৃতির প্রেরণা অনুভব করে মুষ্টিমেয় লোক; আর পরমাপ্রকৃতিকে লাভ করে যাঁরা স্বরাট হন, তাঁরা 'কোটিকে গোটিক'। তবে কিনা অপরা-প্রকৃতির গভীরেও পরা- এবং পরমা-প্রকৃতির আকূতি নিগূঢ় হয়ে আছে। তাইতে মানুষ স্থাণুত্বের চাপ ঠেলে ফেলতে চায়, তার প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে, মনে আসে প্রগতির তাগিদ।

প্রগতিকেই আমরা বলতে পারি সার্থক মনোধর্ম। জড়াশ্রয়ী জীবনেও প্রগতির প্রেরণা আছে, কিন্তু তার লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী নয়। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে সে থেমে যায়, তারপর জীবনটা গতানুগতিকতার আবর্তে কেবল পাক খেয়ে চলে। সমাজের অধিকাংশ মানুষেরই এই দশা। তারা বস্তুনির্ভর, তাই বন্ধ; ভাবের মুক্তি তাদের অজানা। এই মুক্তির আস্বাদ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা মনস্বী। বস্তুর চাইতে ভাব তাঁদের কাছে বড়। উপনিষদের ভাষায় তাঁরা 'স্বপ্নস্থানঃ অন্তপ্রজ্ঞঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসঃ'। বাস্তব-জগতের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে একটা ভাবময় স্বপ্নজগতের উজ্জ্বলতায় তাঁরা বিচরণ করেন, বাইরের বস্তুকে উপলক্ষ্য করে অন্তরে ভাবের সুদূরপ্রসারী দিগন্তই তাঁদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জড়াশ্রয়ী জীবনের ইন্দ্রিয়তর্পণকেই তাঁরা পুরুষার্থ বলে ভাবতে পারেন না, তাঁদের পুরুষার্থ হল 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'। জ্ঞানে কল্যাণে এবং শ্রীতে জীবন উজ্জ্বল সার্থক এবং সুন্দর হয়ে উঠবে, এই তাঁদের কাম্য।

কিন্তু মনোজীবনের এই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সবসময় সহজ হয় না। উৎকর্ষের দিক দিয়ে জড়শক্তির চাইতে মনঃশক্তি বড়। মন তা বোঝেও, কিন্তু জড়ত্বের বাধাকে সে কাটিয়ে উঠতে পারে না। সত্য বলতে মন রয়েছে একটা তটস্থভূমিতে—তার সামনে আলো, পিছনে আঁধার। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পিছনের সংস্কার পদে-পদে তার বাদী হয়ে দাঁড়ায়। আলোর আভাসই সে পেয়েছে, কিন্তু তার উৎসে তো এখনও পোঁছতে পারেনি। তাই তার শক্তি বন্ধ্যা, তার সাধ যতটুকু সাধ্য ততটুকু নয়। জ্ঞান কল্যাণ আর সৌন্দর্যের সাধনায় তাই আমরা সত্যের পরিপূর্ণ এবং বিশুদ্ধ রূপ বড় একটা দেখতে পাই না। মনস্বীর দর্শনে বিজ্ঞানে বিশ্বহিতৈষণায় সাহিত্যে শিল্পে এই মনের প্রগতির যুগেও দেখি ভেজালের ছড়াছড়ি। মনস্বিতা আজকাল মানুষের মনকে মাতায় কিন্তু তাতায় না, অধ্যাত্মক জ্যোতির শিখায় তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে না। সমস্ত জগৎ জুড়ে মনস্বিতার সাধনায় একটা অবক্ষয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

আবার মনস্বিতাকে বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে গুহাহিত থাকলেও চলবে না। ভাব অন্তরের সম্পদ, তার জন্য অন্তর্মুখীনতা একান্ত প্রয়োজন—একথা সত্য। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতে ভাব যদি তার উপর জয়ী না হতে পারে, তাহলে সে নীরক্ত ও নিবীর্য হয়ে জীবনের বিচিত্র এবং পরিপূর্ণ বিকাশে বাধাই হয়ে দাঁড়ায়। আলোর উৎস আকাশে, কিন্তু সেই আলোই আবার মাটিতে নেমে

তার বুকে বিচিত্র বর্ণের ফুল হয়ে ফোটে। তাতে যেমন মাটির সার্থকতা, তেমনি আলোরও সার্থকতা। পৃথিবী আর দ্যুলোক দুয়ে মিলে একটি অখণ্ড যুগনদ্ধ সত্তা। বৈদিক ঋষির ভাষায় পৃথিবী মাতা, দ্যুলোক পিতা। দুয়ের সামরস্যই দিব্যজীবন-সাধনার মূল সূত্র।

*

এই সামরস্য জীবনে সিদ্ধ হতে পারে একমাত্র অধ্যাত্মভাবনায়। মনোময়-জীবনের ঊর্ধ্বে রয়েছে অধ্যাত্মজীবন। কিন্তু ঊর্ধ্বে থেকেও দেহ-প্রাণ-মনের জীবনকে সে আলো হয়ে জড়িয়ে থাকবে, সঞ্জীবিত এবং উদ্দীপ্ত করবে—এইখানেই তার সার্থকতা। দেহ-প্রাণ-মন নিয়ে যদি হয় পার্থিবজীবন, তবে মানসোত্তর দিব্যজীবন তার প্রতিষেধক নয়, পরিপূরক। অথচ সে আছে দেহ-প্রাণ-মনকে ছাপিয়ে। এই ছাপিয়ে থাকাকে আগেই বলেছি স্বোত্তরণ (self-exceeding)। আর জীবনের মধ্যে যে-গতিধর্ম রয়েছে, স্বোত্তরণ হল তার প্রচোদক। যে-জড় প্রাণের আধার, তার স্থাণুত্বের মধ্যেও স্বোত্তরণের প্রবেগে আবর্তের সৃষ্টি হয়। নিজের চারদিকে পাক খেতে-খেতে একসময় সে ছিটকে পড়ে। নিজেকে তখন সে ছাপিয়ে গিয়ে ফোটে প্রাণরূপে। প্রাণ জড়াশ্রয়ী, আবার জড়াতীতও। প্রাণের মধ্যেও একটা আবর্তগতির সৃষ্টি হয়, একই প্রাণ-লীলার আমরা দেখি অন্তহীন পুনরাবৃত্তি। সে হল তার জড়ধর্মের বাঁধুনি। কিন্তু তারই মধ্যে ফোটে বৈচিত্র্য, আবার তাকে ছাপিয়ে ফোটে স্বতন্ত্র মন। স্বোত্তরণের এইখানেই শেষ হয় না। বস্তুর মোহ কাটলে মন পায় ভাবের সন্ধান, পায় মানসোত্তরের আভাস। এইখানেই অধ্যাত্মজীবনের শুরু।

মনোজীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রথম স্ফুরণ হয় ইষ্টার্থের (values) বিবিক্ত বোধ থেকে—যা হতে জাগে আবার আদর্শের (ideal) বোধ। আদর্শবোধ গতানুগতিকতার বন্ধন হতে মানুষকে মুক্তি দেয়। সে বলে, যা আছে তা-ই নিয়ে খুশী থাকতে পারছি না, তার চাইতেও ভাল একটা-কিছু চাই। এর মূলে রয়েছে সেই স্বোত্তরণের প্রবেগ। প্রাণের বুভুক্ষা মনের মধ্যে এসে ধরল ভাবময় প্রগতির রূপ। জীবনের 'অর্থে'র একটা উৎকর্ষণ ঘটল তাতে। কিন্তু চাওয়ার পূর্ণ তৃপ্তি তো এতেও হল না। অর্থ পেলাম বটে, কিন্তু পরমার্থ কোথায়—এ-জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে থেকেই গেল।

পরমার্থ কি? না যে-পাওয়াতে সব চাওয়া মিটে যায়। দেহের চাওয়া, প্রাণের চাওয়া, মনের চাওয়া—সব। লক্ষ্য করে দেখেছি, যার চাওয়া, সে নিজে তা মেটাতে পারে না, তার চাইতে ঊর্ধ্বতন কোনও শক্তির কাছে তার হাত পাততে হয়। দেহের চাওয়া মেটায় প্রাণ, প্রাণের চাওয়া মেটায় মন। তর্পণের এই ধারা ধরে যদি চলি, তবেই জীবন সার্থক হয়। প্রাণকে তৃপ্ত করতে গিয়ে যদি মনের দিকে না তাকাই, তাহলে যা পাই তা হল প্রেয়—শ্রেয় নয়। প্রেয়ের সম্ভোগে বাধা আছে, অবসাদ আছে, বেশীদিন তাকে টিকিয়ে রাখতে পারা যায় না। প্রকৃতি যেন বলে, প্রগতির নাম করে তুমি ঢুকে পড়েছ কানাগলিতে, এবার ফিরতে হবে। কিন্তু প্রেয়কে যদি শ্রেয়ের অধীন করি, তাহলে এ-বিপত্তি ঘটে না। প্রাণের চাওয়াকে যদি মনের অধীন করি, তাহলে তার ভোগ শুদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়ের তর্পণের চাইতে মানসতর্পণ এইজন্য বড়। কিন্তু মানসতর্পণও তো চরম নয়। কেন নয়?

নয় দুটি কারণে। প্রথমত মনের দর্শন সংকীর্ণ। সে দেখে ইন্দ্রিয়ের ভূমিতে দাঁড়িয়ে, তাই তার দৃষ্টি দিগন্তের গাছপালায় ঠেকে যায়। যদি সে আরও ঊর্ধ্বে উঠতে পারত, তাহলে আরও বেশী দেখতে পেত। তখন সে জীবন-সমস্যার সমাধান করতে পারত আরও সুশৃঙ্খলভাবে। দ্বিতীয় কারণ, মন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নয়—তার অহন্তা আঁছে, মমতা আছে, যেগুলি প্রাণ-বুভুক্ষারই রকমফের। নিরাসক্ত না হতে পারলে ঊর্ধ্বশক্তির সঙ্গে যোগ সহজ হয় না। শক্তি আসে বটে, কিন্তু তার ক্রিয়া হয় ব্যামিশ্র। তাইতে জীবন-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয় না।

ব্যাপ্তিবোধ আর নিরাসক্তি—এই দুটি হল অধ্যাত্মজীবনের বনিয়াদ। শুদ্ধ-চৈতন্যের এদুটি স্বভাবধর্ম। এরা যেন সূর্যকিরণের মত। সূর্যের কিরণ অবাধে সব জায়গায় ছড়িয়ে প'ড়ে সব-কিছুকে অভিষিক্ত এবং সঞ্জীবিত করে—কিন্তু তবুও সব-ছাপিয়ে তার একটা স্ব-তন্ত্র সত্তা আছে। এই পরিব্যাপ্ত স্বাতন্ত্র্যই তার শক্তির উৎস।

মনশ্চেতনাকে ছাপিয়েও তেমনি আছে এক বিরাট ও স্বরাট অধ্যাত্মচেতনা। প্রাকৃত-মনের সদরমহলে আমরা তার দেখা পাই না, কিন্তু তবুও সে আছে। আছে দ্রষ্টা হয়ে, প্রশাস্তা হয়ে। আমাকে আমি দেখি না যতক্ষণ, ততক্ষণ প্রাকৃত-শক্তির অন্ধতাড়নায় আমি জীবনের পথ অতিবাহন করি। আমার ব্যবহার তখন যান্ত্রিক, সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে আন্দোলিত। যান্ত্রিকতার চরম পরিণাম অবসাদ,

চেতনার আচ্ছন্নতা। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে দেখা দেয় স্বপ্নের বিকার। চেতনার আচ্ছন্নতা আর মৃত্যু একই কথা। তাইতে প্রাণের পরাভব। আর এই স্বপ্ন-বিকারে দেখি মনের অসিদ্ধির সূচনা। প্রাণ আর মন অন্ধপ্রবৃত্তির তাড়নায় নির্ঋতির গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে, এই হল অপরা-প্রকৃতির দ্বারা শাসিত জীবনের পরিণাম। এ-সর্বনাশ হতে বাঁচাতে পারে ওই বৃহৎ ও স্বরাট আলোর চেতনা। স্বারাজ্যের চেতনা প্রাণকে মৃত্যুর পাশ হতে মুক্ত করে, এক লোকোত্তর অজর অমৃত জ্যোতিঃসত্তার বোধে জীবনকে নির্ভয় করে। মৃত্যুকে তখন দেখি এক শাশ্বতপুরুষের অপরাপ্রকৃতির ছায়ার মায়া মাত্র। দিনরাত্রির আবর্তনের মত জন্মমৃত্যুর আবর্তন আছে এই পার্থিব পরিমণ্ডলে; কিন্তু ঊর্ধ্বে সৌর-মণ্ডলে শুধুই আলো। তেমনি আবার বৃহতের চেতনা মনকে করে বিকারমুক্ত। সঙ্কীর্ণ মনে বাসনার সংঘাত থেকে বিকার দেখা দেয়। যে বিকারগ্রস্ত, সত্যকে সে পুরাপুরি দেখতে পায় না, দেখে তার একদেশ মাত্র। একদেশকে একান্ত করে তুললে ভিতরে-বাইরে সংঘাত অনিবার্য। তাইতে সমাজে আমরা একটা গোটা মানুষ প্রায় দেখতে পাই না, দেখি শুধু ভগ্নাংশের ছড়াছড়ি আর ঠোকাঠুকি। নিজেকে পুরাপুরি পেতে হলে প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে নিজেকে তুলতে হবে, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন বাস্তব চেতনার পিছনে আবিষ্কার করতে হবে আকাশের মত উদার স্বচ্ছন্দ ও প্রশান্ত এক পরচৈতন্যের পটভূমিকা। সেই বৃহতের মধ্যে ক্ষুদ্রের বিন্যাস তখন হবে সুশৃঙ্খল ও সুসমঞ্জস, জীবনের অনুতে ঘটবে ঋতচ্ছন্দের আবির্ভাব। একটা বৃহৎ ভাবনার শাসনে চারদিক যখন গুছিয়ে আসে, কর্মশক্তিকে তখনই সিদ্ধির দিকে পরিচালিত করা চলে। একমাত্র বৃহতের আবেশে সর্বাঙ্গীণ সিদ্ধি আসতে পারে এবং তা-ই অধ্যাত্মসাধনারও লক্ষ্য।

*

নিরাসক্ত বৃহতের চেতনায় আবিষ্ট অধ্যাত্মজীবন হবে মনোজীবন এবং দৈহ্যজীবনেরও নিয়ন্তা—এই হল আমাদের জীবনাদর্শ। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ব্যাবহারিক জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মজীবনের একটা বিরোধ দেখা দেয়। গতানুগতিক দৈহ্যজীবনকে ছাপিয়ে যেমন প্রগতিধর্মা মনোজীবন, তেমনি তাকে ছাপিয়েও হল পূর্ণতাসিদ্ধ অধ্যাত্মজীবন। এ-জীবনসাধনার দুটি প্রধান অঙ্গ হল অন্তর্মুখীনতা এবং নিঃসঙ্গতা। নিজের ভিতরে না ডুবে গিয়ে বিরাটের

সত্যকে কখনও আবিষ্কার এবং উপলব্ধি করা যায় না। তাই প্রত্যেক অধ্যাত্ম-সাধকের জীবনেই আসে গুহাহিত হবার একটা পর্ব। প্রাকৃত-জীবনেও যেমন দেখি, যে-কোনও শিক্ষানবিশির সময় মানুষকে কতকটা বিবিক্ত হয়ে থাকতে হয়, এক্ষেত্রেও তা-ই। বরং অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধি অত্যন্ত দুরূহ বলে তার শিক্ষানবিশির পর্ব দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক। তখন বাইরের জীবনের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কাও আছে।

এদেশে হয়েছেও তা-ই। মানুষ গুহাহিত হতে গিয়ে নিজেকে জগৎ ও জীবন হতে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়েছে। সুদূরদর্শের আকর্ষণ যে ব্যক্তিগত-ভাবে কাউকে-না-কাউকে এমনতর দেওয়ানা করে তুলবে, সেটা অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু একে সর্বসাধারণের অনুকরণযোগ্য আদর্শ বলে প্রচার করা চলে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। অনধিকারীর অনুকরণের ফলে আমাদের দেশে ক্রমে আধ্যাত্মিক ও ব্যাবহারিক জীবনের মাঝে একটা দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, এবং তার পরিণাম কারও পক্ষে শুভ হয়নি। এতে একদিকে আধ্যাত্মিকতায় যেমন ভেজাল ঢুকেছে প্রচুর, অন্যদিক দিয়ে তেমনি ব্যাবহারিক জীবনও হয়ে গিয়েছে দেউলিয়া। এই অসামঞ্জস্য দূর না করতে পারলে যে আমাদের কল্যাণ নাই, সেকথা বলাই বাহুল্য।

সব বিজ্ঞানের একটা ফলিত দিক থাকে, সুতরাং অধ্যাত্মবিজ্ঞানেরও তা থাকবে। অন্তরে যা পেয়েছি তাকে বাইরেও রূপ দেব, একা হয়ে যা পেয়েছি তাকে সবার করে তুলব—এই হল অধ্যাত্মসিদ্ধির ফলিত দিক। এর মধ্যে শেষের প্রচেষ্টাই আমাদের দেশে চলে, প্রথমটা চলে না। অধ্যাত্মসিদ্ধি একটা লোকোত্তর কিছু, আমাদের অধ্যাত্মগুরুরা এই ভাবনাতেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে চান। কিন্তু সে যে সব মানুষের জীবনের সব-কিছুকেই জারিত করতে পারে, সে যে আকাশ-বাতাস-আলোর মত সহজ ও সঞ্জীবন হতে পারে, এদিকটার উপর তাঁরা ততটা জোর দেন না। ফলে বাসুদেব যে কুরুক্ষেত্রেই আমাদের জীবন-রথের সারথি—একথা আমরা ভুলে গিয়েছি। গীতায় একদিন যে-যোগসমন্বয়ের অনুশাসন উচ্চারিত হয়েছিল, তা আমাদের সমাজে আজও ফলপ্রসূ হয়নি।

এইজন্যই সমন্বয়ের কথা আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। লোকোত্তরের পথে এতদিন নিঃসঙ্গ হয়ে চলে আমরা যা লাভ করেছি তা বর্জন করতে চাই না, কিন্তু তাকে সর্বজনীন এবং জীবনের সর্বত্র সহজে পরিব্যাপ্ত করতে চাই। আমরা জানি, চিৎপ্রকাশ বিশ্বের পরমার্থ। কিন্তু এও আমাদের স্বীকার করতে

হবে, সে-প্রকাশের আধার হল এই জড়, আর আমাদের মন হল দুয়ের মাঝে সেতু। চিৎএর ঐশ্বর্যকে যদি দেহে-প্রাণে-মনে নামিয়ে আনতে পারি, এবং সে-সিদ্ধিকে কেবল ব্যক্তির মধ্যে নিবন্ধ না রেখে সহজের ছন্দে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলেই আমাদের সাধনার সম্যক চরিতার্থতা ঘটবে। হয়তো তার জন্য পুরাতনের ভিত্তিতেই একটা নতুনতর কৌশলের আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু তার আগে একবার দেখা যাক আমাদের পুরাতন সিদ্ধির পুঁজি কি এবং কতটুকু।

৪

নানা পথ

যোগের কতকগুলি সার্বভৌম অভ্যুপগম আছে, তাদের কথা আগে বলে নিই।

যোগশক্তি বস্তুত মহাপ্রকৃতির স্বরূপশক্তি। প্রকৃতির মধ্যে উত্তরায়ণের একটা প্রবেগ আছে, অচেতন এবং অর্ধচেতন অবস্থায় তা মন্থর। পূর্ণচেতন হয়ে সেই বেগকে ক্ষিপ্র করে তোলা হল যোগের লক্ষ্য। আর এই যোগের অধিকারী মুখ্যত হল ব্যক্তি। ব্যক্তিকে আশ্রয় করেই প্রকৃতি তার যোগশক্তিকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। যোগ প্রকৃতির শক্তি হলেও পুরুষই তার সাধক। আবার এই পুরুষ পুরুষোত্তমের আশ্রিত। সুতরাং যোগের সমস্ত প্রস্থানে তিনিই যোগেশ্বর। একদিকে প্রকৃতি, আরেকদিকে যোগেশ্বর—যোগের সাধক রয়েছে মাঝখানে। যোগেশ্বরের প্রসাদে প্রকৃতিকে দোহন করে সে যোগশক্তিকে আবিষ্কৃত এবং আয়ত্ত করে মৃন্ময়ী প্রকৃতিকে চিন্ময়ী করে তুলছে—এই হল বিশ্বযোগের ছক। যোগেশ্বর যোগী আর প্রকৃতি, যোগের সাধনায় এ-তিনের অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ অপরিহার্য। প্রকৃতি যোগের ক্ষেত্র, যোগেশ্বর তার অধিষ্ঠাতা এবং রূপান্তরকৃৎ ক্ষেত্রজ্ঞ, আর যোগী তার নিমিত্ত—এই বুদ্ধিতে যোগের সাধনা করতে হবে। আবার আমাদের আত্মপ্রকৃতির রয়েছে তিনটি বিভাব—ভাবনা, বেদনা (feeling) এবং সঙ্কল্প। যোগে এই তিনটি বিভাবেরই রূপান্তর ঘটবে। এককেটি বিভাবের উপর জোর দেওয়াতে এককেটি বিশিষ্ট যোগপন্থার উদ্ভব হতে পারে। আমরা সাধারণত তাদের যথাক্রমে বলি জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগ। হঠযোগ এবং রাজযোগকে কর্মযোগের মধ্যেই ধরা হয়। আধারের এককেটি বৃত্তিকে ভিত্তি করে এককেটি যোগের অনুশীলন চলতে পারে। এককালে আমরা তা-ই করে এসেছি। তাছাড়া প্রাচীন সমস্ত যোগের লক্ষ্য ছিল চেতনার একটা লোকোত্তর ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু পূর্ণযোগ সমস্ত যোগেরই সাধনা এবং সিদ্ধিকে আংশিকভাবে স্বীকার করে নিয়ে তাদের মাঝে একটা সামঞ্জস্য ঘটিয়ে লোকোত্তর সিদ্ধিকে লোকাতত করতে চায়—এই তার বৈশিষ্ট্য।

এই গেল গোড়ার কথা। এখন সংক্ষেপে একেকটি যোগপন্থা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

*

প্রকৃতিই যোগের ক্ষেত্র। আমাদের আত্মপ্রকৃতিতে আমরা এই ক'টি স্তর দেখতে পাই—দেহ, নাড়ীতন্ত্র (যা প্রাণশক্তির বাহন), মন এবং ভাব। দেহ এবং নাড়ীতন্ত্রকে ভিত্তি করে যে-যোগ, তার নাম হঠযোগ। মনকে ভিত্তি করে রাজযোগ। আর ভাবকে ভিত্তি করে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও গীতোক্ত কর্মযোগ।

হঠযোগ আর রাজযোগে অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্ক। কথা আছে, রাজযোগ করবার সামর্থ্য যার নাই, সে-ই হঠযোগের অধিকারী। দুটি যোগেরই লক্ষ্য হল চিত্ত-বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা, একেবারে শূন্য হয়ে যাওয়া। হঠযোগীরা বললেন, শ্বাসের সঙ্গে মনের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। শ্বাস যতক্ষণ চঞ্চল থাকবে, ততক্ষণ মনও চঞ্চল থাকবে। যদি শ্বাসকে আমরা রুদ্ধ করতে পারি, তাহলে মন নিস্পন্দ হবে, শরীরও জড়বৎ হয়ে যাবে। এই জড়সমাধিকে তাঁরা পুরুষার্থ বলে ধরে নিলেন। তার জন্য তাঁরা কতকগুলি বাহ্যিক কৌশল অবলম্বন করলেন—আসন বন্ধ মুদ্রা ষট্‌কর্মের দ্বারা নাড়ীশোধন এবং প্রাণায়াম। বন্ধ এবং মুদ্রার সাধনা করতে গিয়ে দেহের মধ্যে কুণ্ডলিনী-শক্তি আবিষ্কৃত হল এবং তাকে অবলম্বন করে হঠযোগের আরেকটা শাখা বেরিয়ে এল—নাড়ীতন্ত্রাশ্রিত ষট্‌চক্রভেদ। কুণ্ডলিনীযোগ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলে ভারতবর্ষের অনেক সম্প্রদায় একে নিজেদের সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছে।

যোগের মূল লক্ষ্য লোকোত্তর চেতনায় প্রতিষ্ঠা হলেও সাধনার সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি সিদ্ধি বা বিভূতিরও আবির্ভাব হয়—কারণ পুরুষ এবং প্রকৃতিকে, চিৎ এবং শক্তিকে বস্তুত কখনও একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। প্রকৃতির ভাটার ধারাকে উজান বওয়াতে গেলে স্রোত্তরণের নিয়মে তার মধ্যে কতকগুলি ঊর্ধ্বশক্তির বিকাশ ঘটবেই। এইজন্য আধারের যে-শক্তিকে ভিত্তি করে আমরা যোগ করি না কেন, তারই মধ্যে কতকগুলি অলৌকিক বিভূতির স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী। সাধনার শেষে হঠযোগীরও কতকগুলি কায়িক সিদ্ধি আয়ত্ত হয়, যার ফলে দেহ এবং নাড়ীতন্ত্রের উপর তিনি অদ্ভুতভাবে কর্তৃত্ব করতে পারেন।

কিন্তু হঠযোগের প্রধান ত্রুটি হল, এর কৃচ্ছ্রসাধ্যতা। দেহ নিয়ে এতখানি

কসরত করবার সময় সুযোগ আর সামর্থ্য সবার নাই। সুতরাং একে সর্বজনীন করে তোলবারও কোনও উপায় নাই। তাছাড়া এতে দেহের উপর বেশী ঝোঁক পড়ায় সাধককে অনেকসময় লক্ষ্যভ্রষ্টও করে দেয়। প্রাণসংযম হতে মনঃসংযম এবং তার ফলে তত্ত্বজ্ঞান—হঠযোগের এই যে লক্ষ্য, তা এর চাইতে সহজ ও সূক্ষ্ম সাধনায় সিদ্ধ হতে পারে। সুতরাং এত কৃচ্ছ্রসাধনা করবারই-বা দরকার কি? তবে দেহ ও নাড়ীতন্ত্রকে শক্ত-সমর্থ করবার জন্য হঠযোগের আবিষ্কৃত কতকগুলি সহজ কৌশলকে সর্বজনীন শিক্ষার অঙ্গীভূত করতে পারলে লাভ আছে —একথাও বলে রাখা ভাল।

হঠযোগের মত রাজযোগেরও লক্ষ্য হল চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে স্বরূপে অবস্থান করা। কিন্তু তার জন্য রাজযোগী জোর দেন মনের উপর। মনকে মন দিয়েই বশ করা হল তাঁর লক্ষ্য। রাজযোগের আটটি অঙ্গ আছে। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম আর প্রত্যাহার—এই পাঁচটি হল বহিরঙ্গ, আর ধারণা ধ্যান সমাধি—এই তিনটি অন্তরঙ্গ। হঠযোগের কতকগুলি মূল সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য আসন ও প্রাণায়াম এই বহিরঙ্গের মধ্যেই পড়ে। তবে রাজযোগের আসন প্রাণায়াম হঠযোগের মত অত কৃচ্ছ্রসাধ্য নয়, আর তার সাধনাও করতে হয় মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে। নাড়ীশোধনের জন্য হঠযোগের ষট্‌কর্মের অনুরূপ কিছু রাজযোগে নাই। রাজযোগী ভাবনাযুক্ত সহজ প্রাণায়ামের দ্বারাই নাড়ীকে শুদ্ধ করে নেন। দেহ ও প্রাণ নিয়ে যেটুকু সাধনা, রাজযোগী তাও করেন মনোবিজ্ঞানসম্মত সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বনে। বহিরঙ্গ সাধনের শেষ অঙ্গ যে-প্রত্যাহার, তা-ই হল রাজযোগের গোড়ার সাধন। প্রত্যাহার হল বাহির থেকে মনের মোড় ভিতরের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। অন্তর্মুখীনতা সব যোগের ভিত্তি। অন্তর্মুখীনতার ফলে চিত্ত একাগ্র হয় এবং একাগ্রতার ফলে অবশেষে শূন্য হয়ে যায়। সেই শূন্যতায় বিষয়ের বা স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। এই হল রাজযোগের সাধনরীতির মূল কথা। অন্তর্মুখীনতা তন্ময়তা আর শূন্যতা—আগাগোড়া এটা হল নিবৃত্তি বা নিরোধের পথ। যে-কোনও যোগীকে এই পথ ধরে যে চলতেই হয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। নিরোধের চরমে হল পুরুষের অনুভব, রাজযোগী তাকে বলেন কৈবল্য। কিন্তু কৈবল্যের দিকে চলতে গিয়ে নিরোধের চাপে প্রকৃতির মধ্যে ঐশ্বর্য বা বিভূতির আবির্ভাব হয়—রাজযোগে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তবে রাজযোগী এগুলিকে আমল দেন না। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে নিরোধসমাধির দ্বারা কৈবল্যলাভ।

রাজযোগের মূল নীতিগুলি যোগের সর্বগত নীতি বটে, কিন্তু ঐ নিরোধ-সমাধির দিকে একান্ত ঝোঁক আবার রাজযোগের একটা মস্ত ত্রুটি। রাজযোগী বলছেন বটে, সমাধি লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র—চিত্তের যে-কোনও ভূমিতে মানুষের সমাধি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাতেই যে সে যোগী হল তা নয়; কিন্তু অনেক-সময় উপায়কেই যে মানুষ লক্ষ্য বলে ভুল করে বসে। এ-যোগেও হয়েছে তা-ই। যোগ বলতেই আমরা বুঝি সমাধি, আর সমাধি বলতেই বুঝি নিরোধসমাধি। কিন্তু নিরোধসমাধি ছাড়াও সমাধি আছে—যেমন গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধি। স্বরূপে অবস্থান বা ব্রাহ্মী স্থিতি তাতেও হয়, অথচ বৃত্তিনিরোধের তাতে দরকার হয় না। সেই অন্তর্মুখীনতা একাগ্রতা শূন্যতা এখানেও ফোটে—কিন্তু ফোটে উপরের আবেশে, নীচের ঠেলায় নয়। এই হল সহজের পথ—স্বভাবের ছন্দে ফুল ফোটার মত ফুটে ওঠা। এটা প্রকৃতির বলাৎকার নয়, আপ্যায়ন। সুতরাং একেই সত্যকার রাজযোগ বলা যায়, নইলে প্রচলিত রাজযোগে খানিকটা হঠের ভাব আছে বই কি।

তবে পতঞ্জলি তাঁর অষ্টাঙ্গ-যোগে এই সম্ভাবনার দিকেও একটা ইঙ্গিত করেছেন। বলেছেন ক্রিয়াযোগের কথা—যার মানে হল চলতে-ফিরতে যোগ। এইটাই সর্বজনীন যোগের পথ। তার অঙ্গ হল তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান। তার মধ্যে আবার ঈশ্বর-প্রণিধান হল মুখ্য। পতঞ্জলি বলেছেন, এতেই চিত্তের ক্লিষ্টবৃত্তি ক্ষীণ হয়ে সমাধি এসে যেতে পারে।

এই ক্রিয়াযোগের সঙ্কেত ধরেই আমরা যোগের রাজপথে এসে পড়তে পারি, যে-পথে সবার সঙ্গে চলতে কোনও বাধা নাই। এখানে সাধনার ভিত্তি হল ভাব বা আন্তর অনুভব। আগেই বলেছি আমাদের অন্তশ্চেতনার তিনটি বৃত্তি আছে—ভাবনা বেদনা আর সঙ্কল্প। এই তিনটি বৃত্তির অনুশীলনে তিনটি যোগপথ দেখা দিয়েছে—জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ আর কর্মযোগ। জীবনের সঙ্গে এই তিনটি যোগের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। তবে এরা যে-আকারে আমাদের মধ্যে এখন প্রচলিত, তাতে কিছু ত্রুটি আছে, সে-কথা আগেই বলে রাখি। প্রথম ত্রুটি হচ্ছে এদের লক্ষ্যে একটা ইহবিমুখীনতা। জ্ঞানযোগের সাধ্য যে-ব্রহ্ম বা আত্মা, তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ; ভক্তের ভগবানও তা-ই; কর্মযোগী কর্ম করেন কর্ম-ক্ষয়ের জন্য, সৃষ্টির উল্লাসে নয়। এ-জগৎ মায়াময় অতএব হেয়—এই নেতিবাদ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তিনটির মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে আছে। দ্বিতীয় ত্রুটি হল দেহ-প্রাণ-মন বা প্রাকৃতজীবনের প্রতি একটা উপেক্ষা, যা ওই নেতিবাদের

ফল। তৃতীয় ত্রুটি হল তিনটি যোগপন্থার মধ্যে অন্যোন্যবিরোধ। তিনের সামঞ্জস্যে যে আধারের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি হতে পারে এবং তা-ই যে মানুষের পরম পুরুষার্থ, এ-চেতনা আমাদের মধ্যে বড় ক্ষীণ।

জ্ঞানযোগের পথ হল বুদ্ধির পথ। বিচার আর বিবেক তার সাধন। আগে বিচার, তার পর বিবেক। যার মধ্যে বিচার নাই, সে মূঢ়। প্রবৃত্তির তাড়নায় অবশ হয়ে সে বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। ফলে সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব আর অশান্তি। যে বিচারশীল, সে নিজেকে সামলাতে জানে। প্রেয় থেকে শ্রেয়কে সে বেছে নেয়। এই হতে তার বিবেকের শুরু। বিবেক হতে আসে বৈরাগ্য, বিষয়ভোগ তখন আলুনি লাগে। বাইর ছেড়ে মন তখন ভিতরে ঢুকে পড়ে। বাইরে মায়া বা প্রকৃতির গুণের খেলা, ওখানে শান্তি নাই। শান্তি গুহাহিত চেতনার নিস্তরঙ্গতায়। তা-ই আত্মা বা ব্রহ্ম বা শূন্য। এই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, এ-ই মানুষের পরমপুরুষার্থ।

ভক্তিযোগের পথ হল হৃদয়ের পথ। ভক্তের সাধনা রসের সাধনা। বিচার বিবেক বৈরাগ্য তাঁরও আছে, তিনিও প্রকৃতি বা মায়ার বাইরে চলে যেতে চান। কিন্তু তাঁর অপ্রাকৃত ধাম শুধু নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি নয়। ওটা তার বাইরের আবরণ, ভিতরে আছে রসের হিল্লোল। সেখানে আনন্দদোলায় দুলছেন অখিল-রসামৃতমূর্তি পুরুষোত্তম। তাঁকে মানুষের মত করে ভালবাসা যায়। এই ভালবাসাই মানুষের পরম পুরুষার্থ। হৃদয়ে ভালবাসা উথলে ওঠে বলেই ভক্ত জগৎকে মিথ্যা বলেন না, বলেন সেই পুরুষোত্তমের আনন্দলীলা।

কর্মযোগকে সাধারণত জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগের প্রাথমিক সাধন বলে ধরা হয়। বলা হয়, কর্ম জীবের জন্মের কারণ, কর্ম হতে জগতের সৃষ্টি, সুতরাং কর্ম আত্মার একটা বন্ধন; এ-বন্ধন কাটাতে হবে; তাই কর্ম যদি আমাদের করতে হয় তো কর্মক্ষয়ের জন্যই করব। জ্ঞানযোগী সোজাসুজিই নৈষ্কর্ম্য বা কর্মত্যাগের উপদেশ দেন, ভক্ত তাকে রূপান্তরিত করেন অর্চনায়। গীতায় কর্মযোগের একটা তৃতীয় ধারার কথা আছে বটে, কিন্তু আমাদের অধ্যাত্মচেতনায় তার বিশেষ কোনও ছাপ পড়েনি—লোকোত্তরের দিকেই চিত্তের ঝোঁকটা বরাবর প্রবল রয়েছে বলে।

এই হল প্রচলিত যোগপন্থাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এখন সমন্বয়ের কথায় আসা যাক।

৫

সমন্বয়

দেখলাম, যোগের প্রত্যেকটি পদ্ধতি মানুষের আধারের একেকটি বৃত্তিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বৃত্তিগুলি অবশ্য মানুষের মধ্যে আলাদা-আলাদা হয়ে থাকে না, থাকে একসঙ্গে মিলে-মিশে। সুতরাং একসঙ্গে সমস্ত বৃত্তির যৌগিক উৎকর্ষসাধন বা যোগসমন্বয় বস্তুত একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়, বরং তা-ই মহাপ্রকৃতির অভিপ্রেত। কিন্তু কি করে সে-অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে, সে-ই হল সমস্যা।

আমাদের দেশে সর্বসাধারণের মধ্যে চলতি যেসব সাধনপদ্ধতি আছে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন পন্থার খানিক-খানিক নিয়ে একটা মিশ্রপন্থা দাঁড় করাবার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু বস্তুত সমন্বয় এমন-একটা জোড়াতাড়ার ব্যাপার হতে পারে না। আবার একটার পর একটা পদ্ধতি ধরে ক্রমে-ক্রমে সবগুলিতে সিদ্ধ হওয়ার ফলে একধরনের সমন্বয় দেখা দিতে পারে। কিন্তু সেটা সকলের পক্ষে যেমন সাধ্যও নয়, তেমনি তাকে যোগচেতনার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টির স্বাভাবিক রীতিও বলা চলে না। যোগশক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণের রীতি হল প্রাণের রীতি। প্রাণশক্তি প্রাণকে যখন শিশুতে বিকশিত করে তোলে, তখন সর্বাঙ্গীণভাবেই তা করে। তার মধ্যে যেমন জোড়াতাড়ার ব্যাপার নাই, তেমনি পর্যায়ক্রমে একেকটা অঙ্গকে চরম পুষ্টির দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টাও নাই। ক্রম বা পর্বভেদ সেখানেও আছে, কিন্তু তা সর্বাঙ্গীণ পুষ্টির ক্রম।

যোগসমন্বয় এই রীতিতে হওয়া সম্ভব। বিভিন্ন যোগপন্থার মূলে আছে যোগশক্তির একটা সর্বগত প্রেষণা (urge), যা জীবনকে অখণ্ড সুষমায় ফুটিয়ে তুলতে চায়। যোগের এই মৌলশক্তিটি আমাদের প্রথম আবিষ্কার করা দরকার। জীবনে যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি ঐক্যেরও এমন-একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে, যা থেকে বৈচিত্র্যের সুষম বিচ্ছুরণ সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রানুগ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলে, কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলির মধ্যে ছন্দ আনা যায় না। ছন্দ যেখানে নাই, সেখানে সমন্বয়ও নাই। সত্যকার যোগজীবন ছন্দের জীবন, সৌষম্যের জীবন। অধ্যাত্মসাধনায় ছন্দের অভাবই সবচাইতে বেশী চোখে পড়ে।

সেটা যে প্রকৃতি নয়, বিকৃতি—তা বলাই বাহুল্য।

যোগসমন্বয়ের খানিকটা আভাস আমরা পাই তান্ত্রিক যোগপদ্ধতিতে। এতক্ষণ আমরা যতগুলি পদ্ধতির কথা বলেছি, তাদের সবার লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি। একমাত্র তন্ত্র মুক্তির সঙ্গে ভুক্তিকেও সমানভাবে লক্ষ্যের মর্যাদা দিয়েছে। তন্ত্রের এই স্বীকৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের যেমন একটা লোকোত্তর দিক আছে, তেমনি লোকাতত দিকও আছে। দুয়ের একটিকে বর্জন করলে জীবনের অঙ্গহানি অবশ্যম্ভাবী। সব যোগের যোগেশ্বর হলেন পুরুষ; কেবল তন্ত্রে প্রকৃতিকে বা শক্তিকেও বলা হয়েছে যোগেশ্বরী। তন্ত্রের প্রভাবে প্রাচীন ভক্তিযোগ রূপান্তরিত হয়েছে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মে, যার ভজনপদ্ধতিতে পুরুষকে ছাপিয়ে প্রকৃতির প্রাধান্য—যদিও লোকোত্তর স্থিতির দিকেই সেখানে ঝোঁক বেশী। প্রচলিত কর্মযোগেরও যে এইদিকে ঝোঁক, সেকথা আগেই বলেছি। এই ইহবিমুখীনতার বিরুদ্ধে সবলকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছে একমাত্র তন্ত্র। বলতে গেলে তন্ত্রই ভারতবর্ষের গণধর্ম। সাধারণ মানুষ জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পারে না, একে নিয়েই তার অষ্টপ্রহরের কারবার। এই পার্থিবজীবনকেও একটা মর্যাদা দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনতৃষ্ণা আর অধ্যাত্মতৃষ্ণার মাঝে তন্ত্র যে একটা সমন্বয়ের সন্ধান দিতে পেরেছে, এইটাই তার বড় কীর্তি। তবে সমন্বয়ের পথে তন্ত্রও সম্যক সিদ্ধি লাভ করতে পারেনি—কতকটা নিজের অতিচারে, কতকটা নৈতিবাদী অভিজাত-ধর্মের বিরুদ্ধতায়।

*

যেমন পুরুষকে মানবো, তেমনি তাঁর শক্তিকেও মানবো। শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। পুরুষ জড়ে নিগূঢ় থেকে অধ্যাত্মশক্তিতে নিজেকে চৈতন্যে প্রস্ফুরিত করে চলেছেন। সবই তিনি; কিন্তু প্রস্ফুরণের কথা উঠছে যখন, তখন বুঝতে হবে তাঁর শক্তির দুটি বিভাব। একটি অবর (lower), আরেকটি পর (higher)। প্রকৃতির অবরভূমি থেকে পরভূমিতে উত্তীর্ণ হবার যে সচেতন ক্ষিপ্র সংবেগ, তা-ই হল যোগের শক্তি। আবার পরভূমিতে উত্তরণের লক্ষ্য অবরভূমিকে বর্জন নয়, তার রূপান্তর-সাধন। দেহ-প্রাণ-মনকে ছাপিয়ে যা পেয়েছি, তার আলো আর তেজ দিয়ে এই দেহ-প্রাণ-মনকেই জারিত করতে হবে—এই হল পূর্ণযোগের লক্ষ্য।

উত্তরণ সব যোগেরই সাধ্য। আধারের এককেটি বৃত্তিকে ধরে যোগপন্থা প্রবর্তিত হয়েছে, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু স্বভাবের নিয়মে আধারশক্তির স্ফুরণ যখন হয়, তখন তা ভাগে-ভাগে হয় না, হয় সমগ্রভাবেই। এই সামগ্রিক অভঙ্গ (integral) স্ফুরণ হল পূর্ণযোগের লক্ষ্য। আধারের কোনও শক্তিকে উপেক্ষা করলে চলবে না, জীবনের কোনও অংশ বাদ দিলে চলবে না, আমার যা-কিছু আছে সবখানি তুলে ধরতে হবে সেই সর্বময়ের দিকে। তিনি যেমন সব-কিছুকে ছাপিয়ে থেকেও সব-কিছুকে নিয়েই পূর্ণ, আমাকেও তেমনি পূর্ণ হতে হবে।

অথচ হতে হবে সহজভাবে। প্রাকৃতভূমিতেও দেখি, আমাদের জাগ্রত জীবনই সহজ পূর্ণতার জীবন। যতক্ষণ জেগে আছি, ততক্ষণই পুরাপুরি বাঁচছি। স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিও চেতনার ধর্ম বটে, কিন্তু তবু তার সত্যকার সার্থকতা জাগ্রতেই। স্বপ্ন আমাদের নিয়ে যায় সূক্ষ্মে, সুষুপ্তি নিয়ে যায় কারণে—সেখানে শক্তির উৎস। কিন্তু সেই শক্তিকে জাগ্রতে যদি স্ফুরিত করতে না পারি, তাহলে শুধু স্বপ্ন আর সুষুপ্তির ঘোরে জীবন কাটানোকেই কি বলব পুরুষার্থ?

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখি, জ্ঞানযোগের চরম লক্ষ্য যে-পরিনির্বাণ তা সুষুপ্তিধর্মী, আর ভক্তিযোগের ভাবোল্লাস স্বপ্নধর্মী। কেবল কর্মযোগের ভিত্তি হল জাগ্রতের ভূমি। কিন্তু সাধনার প্রচলিত আদর্শে কর্মযোগের স্থান গৌণ : শেষপর্যন্ত ভক্তের বাইরে কোনও কর্ম থাকে না, আর জ্ঞানীর অন্তরে-বাইরে সব কর্মই বন্ধ হয়ে যায়। একেই আমরা সাধারণত পরম-পুরুষার্থ বলে মনে করি। কিন্তু জ্ঞানের পরমপ্রশান্তি আর ভক্তির ভাবোল্লাস কি জাগ্রতের কর্মেও সঞ্চারিত করা যায় না? যিনি যোগেশ্বর, তিনি কি সুষুপ্তিতে লীন, না শুধু স্বপ্নে বিভোর? এই বিরাট বিশ্ব কি তাঁর জাগ্রতের লীলা নয়? সেই লীলার মধ্যে সুষুপ্তির আনন্দ আর স্বপ্নের বিজ্ঞান কি অন্তর্গূঢ় ও সক্রিয় হয়ে নাই? তাঁর জাগ্রৎ স্বপ্ন আর সুষুপ্তিতে বিরোধ নাই। তাহলে আমাদেরই-বা তা থাকবে কেন?

প্রাকৃত-জীবন জাগ্রতেরই জীবন। চেতনা সেখানে স্বচ্ছ, বোধ তীক্ষ্ণ, ঐশ্বর্য বিচিত্র। এই স্বচ্ছতা, তীক্ষ্ণতা আর ঐশ্বর্যকে আমরা হারাতে চাই না। কিন্তু প্রাকৃত জাগ্রতের একটা দোষ—সে বহির্মুখ, তাইতে তার চলন উপর-ভাসা এবং গতানুগতিক। যখন সে অন্তর্মুখ হতে চায়, তখন সে ঘুমিয়ে

পড়ে। যদি ঘুমের মধ্যেও সে জেগে থাকতে পারত, তাহলে সেটা হত ধ্যান। ধ্যানে অন্তঃশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, বিজ্ঞান আর আনন্দের সাক্ষাৎ মেলে। ধ্যান যখন ভাঙে, তখন তাদের খানিকটা জাগ্রতেও সঞ্চারিত হয়। পুরাপুরি হয় না বলে সাধক আবার ধ্যানের মধ্যে ডুবে যেতে চায়। এমনি করে বহির্নিরপেক্ষ অন্তর্মুখ জীবনাদর্শের সৃষ্টি হয়, যা অন্তর্নিরপেক্ষ বহির্মুখ জীবনের বিপরীত। কিন্তু এতে জীবনের অখণ্ড পরিচয় মেলে না। বাইরের জীবনে যদি অন্তর্জীবনের সবটুকু আলো আর আনন্দ স্ফুরিত হত, ভাবসমাধির উল্লাস আর নিরোধসমাধির প্রশান্তি যদি সিসৃক্ষার (will to create) বীর্য নিয়ে জাগ্রৎসমাধিতে রূপান্তরিত হত, তাহলেই জীবন পূর্ণ হত।

সাধকজীবনে এই পূর্ণতার আভাস যে আসে না, তা নয়। তাহলে জীবন্মুক্তি কথাটার সৃষ্টি হত না। কিন্তু সাধারণত কল্পনা করা হয়, জীবন্মুক্তি নির্বাণমুক্তির ফাউ; লক্ষ্য আমাদের নির্বাণমুক্তিই, কিন্তু অনেকসময় প্রারব্ধক্ষয় হয় না বলেই জীবন্মুক্তি মানতে হয়। ওটা সিদ্ধির পরিশেষ।

কিন্তু এ-কল্পনা কি আবশ্যক? জীবন্মুক্তিকে শেষে না রেখে কি গোড়ায় আনা যায় না? একেবারে শিশুর মত মুক্ত হয়েই কি জীবনটা শুরু করা যায় না? যায়, যদি শিশু যেমন মাকে জানে, তেমনি করে তাঁকে জানি। কিন্তু মাকে শিশু জানে বুদ্ধি দিয়ে নয়, বোধ দিয়ে—তার সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁকে তার সর্বস্ব বলে জানে। জানে, তার মুক্তি চেতনা আনন্দ ঐশ্বর্য—সবই ওই মা।

এমনি করে সহজ বোধে বিরাটকে জানা দিয়েই পূর্ণযোগের শুরু। এ যেন একমুহূর্তেই প্রভাস্বর সূর্যের কাছে কমলের মত জীবনের সবগুলি দল মেলে ধরা, পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনে চাওয়া-পাওয়ার সব প্রশ্নকে ফুরিয়ে দেওয়া।

সবাই এমন করে পায় না, তা জানি। তাই পূর্ণযোগও সবার জন্য নয়। কিন্তু তবুও বলা চলে, একজনও যদি এ-অধিকার পায়, তবে সবাই একদিন তা পাবে না কেন? যোগেশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাও তো সেইজন্যই।

ভরসার কথা এই, যে সত্যের সাধক, তার কাছে সাধনার গোড়াতে সূর্যের মতই এমনি করে তিনি প্রকাশিত হন। অধ্যাত্মজগতের এটা একটা আইন। উপনিষদের ঋষি বললেন, তিনি বিদ্যুতের মত ঝলক দিয়ে আবার মিলিয়ে যান। জানিয়ে দেন, আমি আছি, এইবার আমায় খুঁজে বার কর। অভীপ্সার আগুন তখন তিনিই জ্বালিয়ে দেন আধারে। তার তেজে তিলে-তিলে সব-

কিছু আগুন হয়ে যায়, মৃন্ময়ী প্রকৃতি রূপান্তরিত হয় চিন্ময়ীতে।

বৃহতের সহজবোধ এবং তাঁরই আবেশে তাঁর কাছে অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ—এই হল তাহলে পূর্ণযোগের প্রথম শর্ত। এ যেন সেই কিশোর নচিকেতার বিবস্বান্ মৃত্যুর বুকে ঝাঁপ দেওয়া। এ মুক্ত হওয়ার জন্য সাধনা নয়, মুক্ত হয়েই সাধনা করা ফুল ফোটার মত।

বস্তুত সাধনা মানুষে করে না, সাধনা করে চলেছেন সেই পরমা-শক্তিই। এই যে দেহে প্রাণে মনে প্রাকৃতশক্তির ক্রিয়া চলছে, এ কি আমার ইচ্ছায়? তবে অপ্রাকৃত শক্তির ক্রিয়াটা আমার ইচ্ছায় হবে—একথাই-বা ভাবি কেন? এইটাই অবিদ্যা। অবিদ্যা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আমিই সাধনা করি কসরত করি হাঁপিয়ে মরি। জড়ত্বের বাধা ভাঙ্‌বার জন্য এটুকুর দরকার আছে। কিন্তু এই হাঁসফাঁস যতক্ষণ, ততক্ষণ সাধনা হয় না। অবশেষে আমিটা একদিন শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন তিনি এসে তার জায়গায় বসেন। 'আমি হাল ছাড়লে পরে, তুমি হাল ধরবে জানি।' সত্যকার সাধনা তখনই শুরু হয়—তাঁর শক্তিপাতে।

সে-শক্তির ক্রিয়া হয় তখন কোনও বুদ্ধির ছক-অনুযায়ী নয়। সুতরাং যার যেমন প্রকৃতি, তার তেমন যোগ। এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আমি যে-ভূমিতে থাকি না কেন, সেখানেই এই যোগশক্তির ক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে। সূর্য যখন ওঠে, তখন কোনও কলি ঘুমিয়ে আছে, কোনওটি-বা একটুখানি মুখ খুলেছে। সূর্যের আলো তো বেছে-বেছে তাদের উপর পড়ে না। তৃতীয় কথা, এই শক্তির কাছে সমস্ত জীবনই যখন যোগ, তখন জীবনের ভালমন্দ সব-কিছুকেই সে সিদ্ধির অনুকূলে ব্যবহার করে, তার মধ্যে কোনও বাছবিচার করে না।

পরমা-শক্তির ক্রিয়ার এই রীতি। বুঝে নিতে পারলে চলা সহজ হয়, অনেক সংশয় বেদনা ও অশান্তির হাত হতে বাঁচা যায়।

*

যেমন অখণ্ড সাধনা, তেমনি অখণ্ড সিদ্ধি। প্রথম সিদ্ধি সম্যক্ জ্ঞান। তাঁকে জানছি যেমন একরূপে, তেমনি বহুরূপে। যেমন আত্মাতে, তেমনি বিশ্বে। ব্রহ্ম জীব আর জগৎ, লোক আর লোকোত্তর, শূন্য আর পূর্ণ, শিব আর শক্তি—কোথাও কোনও ভেদ নাই, বিরোধ নাই।

এই জ্ঞান হতেই মুক্তি। শুধু সাযুজ্যমুক্তিতে তাঁর সঙ্গে একাত্মতার অনুভব নয়, অথবা সালোক্যমুক্তিতে সমস্ত সত্তার সচ্চিদানন্দভূমিতে স্থিতিই নয়। আসে সাধর্ম্যমুক্তি—যাতে অপরা-প্রকৃতি রূপান্তরিত হয় পরমা-প্রকৃতিতে, আসে নির্বাণমুক্তি—যাতে অহন্তার পরিনির্বাণে চেতনা উপশান্ত হয় মহাশূন্যে, বিচ্ছুরিত হয় বিশ্বজ্যোতিতে।

এই প্রমুক্তির চেতনা ছড়িয়ে পড়ে ভাবনায় বেদনায় এবং কর্মেও। তিনে তখন আর বিরোধ থাকে না। অহং দূর হয়ে গিয়ে ভাবনায় তখন আমরা তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাই। আর সেই অদ্বৈতভূমিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে হৃদয়ে দেখি রসের ফোয়ারা উথলে উঠছে, তাঁর প্রেমের বিচিত্র লীলাবিলাস জীবনকে করছে মধুময়, আর নিত্যযুক্ত চেতনায় তাঁরই শক্তির আবেশে জাগছে অবন্ধন দিব্য-কর্মের প্রেরণা বিসৃষ্টির উল্লাস।

এমনি করে সিদ্ধজীবনে ফোটে শুধু মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য নয়, ফোটে শুদ্ধ-সত্ত্বের একটা স্ফটিকস্বচ্ছতা, যাতে তাঁর আলো আমরা আধারের কোথাও এতটুকু আড়াল না রেখে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি, আর সেই আলোর ছোঁয়ায় প্রবুদ্ধ অন্তরের সত্যধর্মকে অনায়াসে বিচ্ছুরিত করতে পারি বিশ্বের উপর। তখন ওখানে যা, তা-ই ফোটে এখানে। জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বে সমস্ত বৈচিত্র্যে নিরঙ্কুশ হয়ে উপচে পড়ছে তাঁর যে-আনন্দ, সেই আনন্দ আমাদের মধ্যেও হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। আমরা তখন হই রূপে-রূপে তাঁরই প্রতিরূপ। সিদ্ধি তখন সহজ হয় জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে বিশ্বচেতনার উচ্ছল উৎসারণে।

এ-সিদ্ধি শুধু জ্ঞানের নয়—এই প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনেরও রূপান্তরের ফলে সমগ্র আধারশক্তির সম্যক্‌ সিদ্ধি। হঠযোগ আর রাজযোগের কৃচ্ছ্রসাধনায় যে একাঙ্গীন পরিণাম, তা-ই এখানে সর্বাঙ্গীণ হয়ে দেখা দিতে পারে মানসোত্তর শক্তির আবেশে।

বিশ্বেশ্বরের বিশ্বযোগই পূর্ণযোগের আদর্শ। সবাইকে নিয়ে তাঁর যে-যোগ, আমাদের ব্যক্তিগত যোগও অনুসরণ করছে সেই ধারাকে। তাই আত্ম-সচেতনতার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বচেতনাও এ-যোগের একটা ভিত্তি। আমাতে আমি যেমন গুটিয়ে আছি, তেমনি আবার আমার জগতে ছড়িয়ে পড়ছি—প্রাকৃতজীবনের এই স্বাভাবিক রীতিই পূর্ণযোগে ঊর্ধ্বায়িত হবে। আমার সাধনা আমার একার জন্য নয়—সবার জন্য, অথবা সবার জন্য তাঁর যে-সাধনা তার অভিব্যক্তি আমার সাধনায়—এই উদার বুদ্ধি গোড়া হতে এ-যোগের নিয়ামক। ব্যক্তিতে

বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে এখানে কোনও ভাগাভাগি নাই। যা-কিছু ঘটছে তা মুখ্যত ব্যক্তিতে ঘটলেও ঘটছে বিশ্বের জন্য এবং বিশ্বাতীতের আবেশে—এই সম্যক্ দৃষ্টি নিয়ে পূর্ণযোগের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

এইগুলি হল গোড়ার কথা। এখন সাধনার কথায় আসা যাক।

পূর্ণযোগের চারটি অঙ্গ—কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ এবং সিদ্ধিযোগ। এই অঙ্গবিভাগ শুধু বোঝবার সুবিধার জন্য। এর মধ্যে পৌর্বাপর্যের কথাটা প্রধান নয়। জানতে হবে—যেমন অখণ্ড সাধনা, তেমনি অখণ্ড সিদ্ধি। সমস্ত ব্যাপারটা হল সহজের ছন্দে চিন্ময় প্রাণের উদয়ন। তার মধ্যে খণ্ডতার কথা ওঠেই না। তবুও খণ্ডবুদ্ধির সংস্কার আমাদের অভ্যস্ত বলে অখণ্ডকে খণ্ডে-খণ্ডে ভাগ করে দেখানো হচ্ছে, যাতে বুঝতে সুবিধা হয়।

প্রথম কর্মযোগ দিয়ে শুরু করা যাক।

প্রথম পাদ

দিব্য কর্মযোগ

১

সাধন-চতুষ্টয়

সাধনার শুরুতে এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে। যোগ জীবনবিমুখ নয়, সমস্ত জীবনই একটা যোগ। পুরুষোত্তম সে-যোগের ভর্তা এবং ঈশ্বর। তাঁর দিব্য-সঙ্কল্প ঐশ্বরযোগের শক্তিতে আমাদের জীবনে রূপ ধরছে। যোগ একার জন্য নয়, সবার জন্য। পুরুষের মোক্ষ তার একমাত্র লক্ষ্য নয়, প্রকৃতির রূপান্তরও তার সাধ্য। জীবনের সার্থকতা যখন জাগ্রতে, তখন জাগ্রতই যোগের মুখ্য ক্ষেত্র। স্বপ্নের ভাব এবং সুষুপ্তির শক্তি দিয়ে এই জাগ্রৎকে সমৃদ্ধ করতে হবে। কর্ম দিয়ে জীবনের শুরু, অতএব যোগেরও শুরু। চেতনার বিস্তার তুঙ্গতা ও গভীরতার সাধনাই যোগ।

যোগসিদ্ধির প্রাথমিক মুখ্য সাধন হল চারটি: শাস্ত্র, উৎসাহ, গুরু এবং কাল। এখন একে-একে তাদের নিয়ে আলোচনা করা যাক।

*

প্রথম শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্র হল বেদ বা জ্ঞান। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে এই বেদ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে স্বভাবের বীজশক্তিরূপে। এই শক্তির আবিষ্কার এবং স্ফুরণ হল সাধনার লক্ষ্য।

সময় না হলে, মানুষ এই লক্ষ্যের সম্পর্কে সচেতন হয় না। উপনিষদ্ বলেন, তিনি যাকে বরণ করেছেন সে-ই তাঁকে পায়, সাধ্য-সাধনায় তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁর এই বরণ কালসাপেক্ষ। কিন্তু তাবলে এটা খামখেয়ালের ব্যাপার নয়। এরও মাঝে ছন্দ আছে, ক্রম আছে। কুঁড়ি যেমন ফুল হয়ে ফোটে, এও তেমনি।

বেদের প্রকাশ হয় বাকে বা মন্ত্রে। ঋষিরা বলতেন, যে-বাক্ আমরা মুখে বলি কানে শুনি, তা হল স্থূল বৈখরী বাক্। তার মূলে রয়েছে ভাব, সে-ই হল আসল বাক্। তাকে শুনতে হয় কান দিয়ে নয়—প্রাণ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। সেই শ্রুতির জন্য বাইরের বাক্ হল একটা অবলম্বন মাত্র। বৈখরী বাকের

সহায়ে হৃদয়ে ভাব জাগানোকে বলে মন্ত্রচৈতন্য। তখন সাধনার ধারা উলটে যায়—চৈতন্যের আবেশে আপনাহতেই হৃদয়ে মন্ত্রের স্ফুরণ হতে থাকে, আর তাকে অবলম্বন করে জাগে ভাবের হিল্লোল। 'শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে।' নেশা না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্র কণ্ঠ-স্থ মাত্র, আত্ম-স্থ নয়।

ভাব হতেই মন্ত্রের স্ফুরণ হয়েছে, এমন অধিকারী কম। অধিকাংশক্ষেত্রে ভাবের অস্পষ্ট আভাস চিত্তে প্রথম জাগায় একটা ব্যাকুলতা। তারপর মন্ত্রকে আশ্রয় করে ভাবের পুষ্টির সাধনা চলে। সাধনা সহজ হয়, ভাব যখন মন্ত্রকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে। তখন বুঝতে হবে, এইবার তিনি এসে হাল ধরেছেন।

মন্ত্র হল শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ। বোঝাবার সুবিধার জন্য মন্ত্রে আর শাস্ত্রে সাময়িকভাবে একটা ভেদ করে নেওয়া যেতে পারে : বোধের জন্য মন্ত্র, আর মননের জন্য শাস্ত্র। যেমন ব্রহ্মবোধের মন্ত্র হল 'ওম্' বা কোনও মহাবাক্য; আর মনের সমস্ত সংশয় দূর করে ব্রহ্মবোধকে প্রস্ফুট করবার জন্য 'বেদান্ত-শাস্ত্র'।

শাস্ত্রের আবার দুটি ভাগ। এক ভাগে থাকে তত্ত্ব, আরেকভাগে সাধনা। তত্ত্বের আলোচনায় মন যখন নিঃসংশয় হল, বস্তুসম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারল, তখন যে-জ্ঞান হল তা পরোক্ষজ্ঞান। তবলার বোল তখন মুখে এসেছে, হাতে আসেনি। হাতে আনবার জন্য আশ্রয় করতে হয় সাধনশাস্ত্র এবং সাধনা।

একই প্রকাশিত হচ্ছেন বিচিত্ররূপে। বৈচিত্র্য থাকলে ভেদও থাকবে। কিন্তু ভেদটা বাইরের। অন্তরে-অন্তরে সেই একের সঙ্গে সবার যোগ। ফুলের কর্ণিকা থেকে বেরিয়ে এল অনেকগুলি পাপড়ি। পাপড়িগুলি আলাদা, আবার আলাদাও নয়। সবার আকৃতি-প্রকৃতি একই ধরনের, এক কেন্দ্র থেকে সবার রসের যোগান আসছে। এমনি করে এক আর বহুর মধ্যে অন্যোন্যাশ্রয়ের একটা সম্বন্ধ আছে। এক ছড়িয়ে পড়ছে বহু হয়ে, আবার বহু গুটিয়ে আসছে একের মধ্যে—সৃষ্টি-লীলার এই যুগল ছন্দ।

অধ্যাত্মসাধনাতে আমাদের অভিযান শুরু হয় বহুর ক্ষেত্র হতে একের দিকে। সবাই সাধনা করি নিজের-নিজের রুচি আর সংস্কার অনুযায়ী। মানুষের স্বভাব বিচিত্র। সুতরাং পরিধি হতে কেন্দ্রে পোঁছবার পথও বিচিত্র। যারা অনুগামী হবে, তাদের জন্য সবাই পথের বিবৃতি রেখে যান। এই বিবৃতিগুলি হল বাইরের শাস্ত্র।

একের দিকে লক্ষ্য থাকলেও গোড়াতে সবার দৃষ্টি বা পথ এক হয় না। তাইতে 'যত মত, তত পথ'; 'বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ'। এই থেকে সম্প্রদায়ভেদের সৃষ্টি।

এটা নিরর্থক নয়। নানা মতের অরণ্যে দিশাহারা হওয়ার চেয়ে নিজের স্বভাব ও সংস্কার অনুযায়ী একটা মত আঁকড়ে ধরা ভাল। নিষ্ঠা সাধনার পক্ষে অপরিহার্য। তবে কিনা তা গোঁড়ামি হয়ে উঠলেই সর্বনাশ।

চিত্ত যদি উন্মুক্ত এবং উদার থাকে, তাহলে সাধনায় এগ'তে-এগ'তে দেখি, অদ্বৈতের পথ বস্তুত সমন্বয়ের পথ। যতক্ষণ মানসভূমিতে থাকি, ততক্ষণ ভেদের সংস্কার যায় না। তখন বলি, তোমার পথ আলাদা আমার পথ আলাদা, তোমার ঠাকুর আলাদা আমার ঠাকুর আলাদা। দুয়ের মধ্যে মিল কোথাও নাই। এমনও বলি, আমার ধর্মই সত্য, আর-সব ধর্ম মিথ্যা। এই সংস্কার তত্ত্বোপলব্ধির শেষপর্যন্ত থাকতে পারে—এই এক আশ্চর্য। তারপর অধিমানসভূমিতে উঠলে দেখি, সব পথ সব মতই সত্য, তবে কিনা আমার নিজেরটাতেই আমার বিশেষ রুচি। এখানে অভেদমূলে ভেদের দর্শন, কিন্তু ভেদভাবের স্বাতন্ত্র্য একেবারে যায়নি। বহু আর একের বিরোধ ঘুচে যায় একমাত্র অতিমানসভূমিতে। তখন দেখি, সব একেরই বিচিত্র উল্লাস, কারও সঙ্গে তো কারও বিরোধ নাই। এমন-কি বৈচিত্র্যের ভূমিতেও একের সঙ্গে অপরের যেন আলোয়-আলোয় মেশামেশি। তখনই বলতে পারি, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'।

যে পূর্ণযোগের সাধক, তার শাস্ত্রদৃষ্টি হবে এই অতিমানসী দৃষ্টির অনুগত। ব্রহ্মের জ্ঞান সর্ববৃহতের জ্ঞান। একদেশদর্শিতার দ্বারা সে-জ্ঞান কখনও সম্যকভাবে লাভ করা যায় না। ব্রহ্ম অবশ্যই 'শাস্ত্রযোনি', কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা সার্থক হতে পারে একমাত্র শাস্ত্রসমন্বয়ের দ্বারা।

আরেকটা কথা। শাস্ত্রের যা চরম প্রতিপাদ্য, তত্ত্বের দিক থেকে তা এক এবং নিত্য। কিন্তু সেই একের আবার অভিব্যক্তি হয় পরিণাম ও বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে। অখণ্ড একরস তত্ত্ব যেমন সত্য, তেমনি তার কালিক পরিণাম এবং বহুধা-বৈচিত্র্যও সত্য। একটি অক্ষর পুরুষের সত্য, আরেকটি তাঁর পরিণামিনী প্রকৃতির সত্য। একটি সত্যকে আমরা পাই উজান বেয়ে, আরেকটিকে পাই ভাটিয়ে এসে। এইজন্য একই মৌলতত্ত্বের বাস্তব উপলব্ধির ধারা যুগে-যুগে বদলে যায়। তাই সবযুগের শাস্ত্রীয় তত্ত্বজ্ঞান ও সাধনা এক হয় না। উত্তুঙ্গতার

দিক দিয়ে অধ্যাত্ম অনুভব পর্যবসিত হয় শূন্যতায়, তার চেহারা সবযুগেই এক। কিন্তু সেখান থেকে জগতের দিকে তাকাতে গিয়ে একযুগের দৃষ্টির সঙ্গে আরেকযুগের দৃষ্টি সর্বাংশে এক হয় না। যতই কাল বয়ে যাবে, মানুষের আধ্যাত্মিক বাস্তবদৃষ্টি তত গভীর হবে—এটা স্বাভাবিক। এ যেমন জাতির জীবনে ঘটে, তেমনি ব্যক্তির জীবনেও ঘটে। একসময় আমরা তত্ত্বদৃষ্টির তুঙ্গভূমি থেকে জগৎকে বলেছি মায়া, তারপর আবার বলেছি লীলা। একটিতে জগৎকে মনে হয়েছে মিথ্যা, আরেকটিতে সত্য। কিন্তু লীলাবাদও তো জগৎ-দর্শনের পরম সত্য নয়। তার চাইতে গভীর হল পারার্থ্যবাদ—যা জগতের মধ্যে একটা চিন্ময়পরিণামের সূত্র আবিষ্কার করে। বৈরাগীর দৃষ্টিতে জগৎকে উপেক্ষা করা নয় বা রসিকের দৃষ্টিতে তাকে সম্ভোগ করা নয় শুধু—তার প্রত্যেকটি পর্বকে সত্য বলে জেনে তাদের আপাতদৃষ্ট অদিব্যভাবকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করাই তখন যোগীর পরম পুরুষার্থ।

এই রূপান্তর প্রকৃতিপরিণামের অন্তর্গত। সুতরাং তার একটা কালাপেক্ষা আছে। একথা অবশ্য সত্য যে পুরুষের স্পর্শে প্রকৃতির রূপান্তর চিরকাল হয়ে আসছে। কিন্তু তা হয়েছে সাধকের অগোচরে, নেপথ্যের অন্তরালে। তার বাস্তব চেতনা এতদিন তাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেয়নি কিংবা রূপান্তরকে স্পষ্টভাবে সাধ্যের অন্তর্গত বলে ঘোষণা করেনি। গোড়াতেই এমনতর ঘোষণা সম্ভবও ছিল না। সাধনা যখন শুরু করি, অধিকাংশক্ষেত্রে তখন দেখি, অনেক আগে থেকেই আমরা অপরা-প্রকৃতির জালে জড়িয়ে গেছি। স্বভাবতই তখন জাল কেটে বেরিয়ে পড়া আমাদের পুরুষার্থ হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাধনার প্রথম পর্বটা যায় বৈরাগ্যে। উপনিষদের ঋষির মত তখন বলতেই হয়, 'নেদং যদিদ-মুপাসতে'—যা নিয়ে মানুষ মেতে আছে তা ব্রহ্ম নয়। এই বৈরাগ্যের সংবেগ থেকে নেতিবাদী সব শাস্ত্রের উদ্ভব। কিন্তু অবিদ্যা হতে বিদ্যায় উত্তীর্ণ হয়ে তাতে সুপ্রতিষ্ঠ হলে দেখি, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই যা-কিছু সবই যে ব্রহ্ম। এই হল লীলাবাদী শাস্ত্রের মূলসূত্র। কিন্তু এও তো চরম দর্শন নয়। দৃষ্টি আরও গভীর হলে দেখব, ব্রহ্ম যে সব হয়ে আছেন, শুধু তা-ই নয়—তিনি হচ্ছেনও। পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে কেউ শুধু সূর্যকে দেখল, তার সূর্যদর্শন নিশ্চয় সত্য। কেউ সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত পৃথিবীকেও দেখল, তার সূর্যদর্শন কিন্তু সত্যতর। আর যে পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে সূর্যের তেজস্ক্রিয়াকে অনুভব করল, তার সূর্যদর্শন সত্যতম।

পূর্ণযোগীর দর্শন এই শেষের শ্রেণীর। তার মধ্যে যেমন অতীতের সমাহার আর সমন্বয় থাকবে, তেমনি থাকবে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও। এইজন্য পূর্ণযোগের সাধক যে-শাস্ত্র অনুসরণ করবেন, তা অতীতের কোনও একটি বিশেষ শাস্ত্রের পুনরাবৃত্তি নয়। অথচ অতীতের অভিজ্ঞতাকে তিনি প্রত্যাখ্যানও করবেন না। তার মধ্যে যেটুকু সত্য ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর মহিমার প্রতি ইঙ্গিত করছে, তাকে আত্মসাৎ করে তিনি এগিয়ে চলবেন সুদূর দিগন্তের দিকে। প্রাণেরও বিকাশ এই রীতিতে হয়। শৈশব হতে কৈশোর, কৈশোর হতে যৌবন—এর মধ্যে যেমন অগ্রগতি আছে, তেমনি আছে আত্তীকরণও (assimilation)। চেতনার সূর্য ক্রমে মাধ্যন্দিন মহিমার দিকে এগিয়ে চলেছে। যুগ হতে যুগান্তরে তার প্রতি পদক্ষেপের যে-বাণীরূপ, তা-ই বেদ। সে-বেদ ক্রমে 'মহতো মহীয়ান্' হয়ে চলেছে। পূর্ণযোগী হৃদয়ের প্রদ্যোত দিয়ে তারই অনুবর্তন করে চলেছেন।

*

শাস্ত্রজ্ঞান দিয়ে সাধনার শুরু। সাধনা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো নয়। যা আমরা সিদ্ধ করতে চাই, আগে তার বিজ্ঞান জানা দরকার। প্রাচীনেরা একে বলতেন 'শ্রবণ'। কোন্ পথ দিয়ে কোথায় যেতে হবে, পথে কি-কি বাধা আছে, পথের শেষে যে-দেশে গিয়ে পৌঁছব তার চেহারাই-বা কি রকম—এসব বিষয়ে গোড়া থেকে একটা সুশৃংখল আর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। অবশ্য ধারণা থাকাই যথেষ্ট নয়, যা জেনেছি তাকে জীবনে ফলিত করাই আসল কথা। কিন্তু তবুও বুদ্ধির শুদ্ধির জন্য শাস্ত্রজ্ঞানও দরকার। অর্থাৎ গীতার ভাষায় প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তত্ত্বদর্শীর কাছ থেকে আগে জ্ঞানের উপদেশ নিয়ে তবে সাধনা করতে হয়।

কিন্তু অধীত শাস্ত্রকে সফল করা হল আসল কথা। তার জন্য সাধকের চাই 'উৎসাহ'। পূর্ণযোগের এই হল দ্বিতীয় সাধনাঙ্গ। উৎসাহের অন্য নাম অভীপ্সা, তীব্রসংবেগ বা ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা অর্থে কিন্তু ছটফটি নয়—ওটা চিত্তের রজোগুণের ক্রিয়া। সত্যকার ব্যাকুলতা জন্মায় সাধকের গোত্রান্তরের পরে। বিয়ের সময় মেয়েদের বাপের গোত্র ছেড়ে স্বামীর গোত্র নিতে হয়, তারপর আর তারা বাপের গোত্রে ফিরে যেতে পারে না। যোগের দীক্ষাও

তেমনি—প্রাকৃত-জীবনকে পিছনে ফেলে অপ্রাকৃত-জীবনের পথে পা বাড়ানো, একটা তীব্র সঙ্কল্প নিয়ে। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'—যোগের পথে এমনিতর রোখ থাকা চাই। এই থাকলে তবে ব্যাকুলতার সার্থকতা। ব্যাকুলতার অর্থ তখন সংবেগ—যা দুর্নিবার অপ্রমত্ত প্রেরণায় সাধককে লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়ে চলে, না পৌঁছন পর্যন্ত এক মুহূর্ত বিশ্রাম দেয় না। সাধনা 'ভ্যাত-ভেতে চিঁড়ের ফলার' নয়।

শাস্ত্রজ্ঞান দিয়ে পথের পরিচয় আর পাথেয় সঞ্চয় করলাম, তারপর উৎসাহ নিয়ে পথ চলা শুরু করলাম। এই চলার তিনটি পর্ব আছে। প্রথম হল সাযুজ্য, তারপর রূপান্তর, তারপর বিকিরণ। মেয়েদের ওই উপমার জের টেনে বলতে পারি, গোত্রান্তরের পর মেয়ে বর পেল, ঘর পেল—স্বামীর সাক্ষাৎ-সঙ্গ পেল, সর্বস্ব দিয়ে তাঁর হল। এইটি সাযুজ্য। তারপর সে মা হল। এ তার জীবনের একেবারে নতুন আরেকটা পর্ব। সাযুজ্য নিয়ে এল রূপান্তর—দেহে প্রাণে মনে এক নতুন আলোর অভিষেক। এই রূপান্তরের পর মেয়ে হল যথার্থ গৃহিণী—গৃহের সে সম্রাজ্ঞী, সবার ধাত্রী।

পূর্ণযোগের সাধকের জীবনেও এই তিনটি পর্ব। পর্বগুলি মোটের উপর ক্রমিক হলেও তারা অন্যোন্যাশ্রিত। প্রথম সাযুজ্য দিয়ে শুরু, আবার ঐ সাযুজ্য দিয়েই সারা। সমস্তটা সাধনজীবন সাযুজ্যেরই পরিপাক। এই সাযুজ্য প্রথম আসে বিদ্যুতের ঝলকের মত, এসেই মিলিয়ে যায়। কিন্তু সত্তায় সে এমন-একটা সাড়া দিয়ে যায় যে এর পর গতানুগতিকতার পথে গড়িয়ে চলা সাধকের সম্ভব হয় না। সাযুজ্যের একটা অস্ফুট অভীপ্সা সাধকের চিত্তে গোড়াতেই জাগে বটে, কিন্তু চাইতে গিয়ে সে যা পায় তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। এ-পাওয়া তাঁর প্রসাদ বা শক্তিপাত, এক নিমেষের জন্য সাধকের কাছে তাঁর নিজেকে ধরা দেওয়া, তাকে বরণ করে নেওয়া। একবার ছুঁয়ে তিনি আড়াল হয়ে যান, তারপর জাগে বিরহের ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতায় চিত্ত তখন অতন্দ্র হয়, আভাসে পাওয়াকে আধারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জাগে অদম্য উৎসাহ। গোড়াতে এ-উৎসাহ মনে হয় সাধকের। কিন্তু ক্রমে সে বুঝতে পারে, তার মধ্যে যে শক্তির যোগান আসছে তার উৎস লোকোত্তরে। সে নিজে কিছুই করছে না, কেউ যেন তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। এই শক্তির কাছে নিজেকে তখন সে সঁপে দেয়। সমর্পণে চিত্তে আসে এক অনুপম প্রশান্তি স্বচ্ছতা আর পরিব্যাপ্তি। তখন তার করার পাট চুকে গিয়ে শুরু হয় হওয়ার পাট। সাধককে তখন আর

চেষ্টা করে শক্তি ফোটাতে হয় না, সত্তার গভীর হতে শক্তি যেন ফোয়ারার মত আপনি উপচে ওঠে। এই শক্তিই তখন আধারের রূপান্তরের কাজ শুরু করে দেয়। কাঠে আগুন ধরে গেছে, এখন সে নিজের তাতে কাঠকে আগুন করে তুলবে। রূপান্তর সিদ্ধ হলে পর শুরু হয় আত্মবিকিরণ—জ্বলন্ত ইন্ধনের তাপ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, একটা কাঠ থেকে আরেকটা কাঠে আগুন ধরে যায়।

সব হচ্ছে সেই বৃহতের শক্তিতে—এইটি বুঝতে পারা হল জ্ঞান। এই জ্ঞানকে আড়াল করে রাখে আমাদের অহমিকা। আমরা মনে করছি, আমরাই সব-কিছু করছি। তাঁর ইচ্ছাতেই যে সব হচ্ছে এটা বুঝতে সময় লাগে। বুঝতে পারলে জীবনের বোঝা হাল্কা হয়ে যায়। তখন অলখের উৎস হতে শক্তির যোগানও আসে। আবার অহংএর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কামনা। অহং সব-কিছুই চায় তার মনের মত। কিন্তু তা তো হয় না, হতে পারে না। তাই সে যা চাইছে আর সংসারে যা হচ্ছে, তার মধ্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়। এই বিরোধে সংসারের কিছু আসে যায় না, ক্ষতি হয় অহংএরই। নিজের চাওয়া যদি সে ছাড়তে পারে, তাহলে তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়, চেতনা ব্যাপ্ত হয়। তখন আর মিথ্যা চাওয়ার বিড়ম্বনা তার মধ্যে থাকে না, চাওয়া আর হওয়ার মাঝে একটা সন্ধি হয়ে যায়। 'সব ছেড়ে সব পাওয়া'—এই কথাটা তখনই সত্য হয়।

আলোর ছোঁয়ায় যেমন ফুল ফোটে, তেমনি তাঁর ছোঁয়ায় ধীরে-ধীরে ফুটে ওঠা—এইটি হল সাধনার মর্মকথা। কিন্তু এ যে খুব সহজে হয়, তা নয়। কেননা আমরা জন্মসিদ্ধ হয়ে তো কেউ জন্মাই না—জন্মাই অপরা-প্রকৃতির নানা সংস্কার নিয়ে। এই সংস্কারগুলি প্রশ্রয় পায় অহংকে আশ্রয় করে। তাই প্রথমটা তাদের তাড়াবার ভারও নিয়ে হয় অহংকেই। এইজন্যই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের আগে দরকার হয় আত্মপ্রতিষ্ঠার। 'সংসারের বেলায় আমি, আর সাধনার বেলায় তুমি'—এমন ভাগাভাগি হল পাটোয়ারী বুদ্ধির কারসাজি। প্রথমটায় অদম্য উৎসাহ নিয়ে খাটতে হবে আমাকেই। খাটব প্রবৃত্তির প্রভু হয়ে, কিন্তু তাঁর গোলাম হয়ে। অহংকে দিয়েই কাজ করিয়ে নিতে হবে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে জানব, এ-অহং তাঁর যন্ত্র। 'আমার জঞ্জাল আমাকেই সাফ করতে হবে; কিন্তু করব তোমার হয়ে, তোমার জন্য তোমারই শক্তিতে'। এমনি করে তিলে-তিলে সমর্পণ সত্য হয়ে উঠবে। শেষে আর 'অহঙ্কার' নয়; এ 'অহং কার?—না তাঁর'।

*

পথের পরিচয় পেলাম শাস্ত্রে, অতন্দ্র উৎসাহে পথ চলাও শুরু হল। এবার চাই পথের দিশারী। দিশারী হলেন গুরু।

হৃদয়গুহায় যে-বাণী তা-ই যেমন সত্যকার বেদ বা শাস্ত্র, তেমনি হৃদয়-গুহায় রয়েছেন যে অন্তর্যামী পুরুষ তিনিই সদ্‌গুরু। সেই গুরুর নিঃশ্বসিতই বেদ। তিনি অন্তরে থেকে আমার সব-কিছু নিয়ন্ত্রিত করছেন, তাই তাঁকে বলি 'অন্তর্যামী'। তিনিই আমার ইষ্ট। ইষ্ট মন্ত্র আর গুরু—তিনই এক। আবার এই তিনটিই আমার গুহাহিত আত্মজ্যোতি।

এই অন্তর্যামী গুরু কারও কাছে প্রকাশ হন নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, কারও কাছে ভূতভাবন পরমাত্মরূপে, কারও কাছে পুরুষোত্তম ভগবানরূপে—কারও কাছে-বা যুগপৎ এই তিনরূপেই। প্রথমটায় তিনি থাকেন আমাদের অহংএর আড়াল হয়ে। বস্তুত তাঁরই শক্তিতে আমরা পথ চলছি, কিন্তু ভাবি চলছি বুঝি নিজের জোরে। ক্রমে বুঝতে পারি, আমার সাধনা যতটুকু সিদ্ধি তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। পিছনপানে তাকিয়ে দেখি, অতীতের ব্যর্থতারও একটা অর্থ আছে, কিছুই তো নষ্ট হয়নি জীবনে। তখন বুঝি, আমার শক্তিতে বা আমার বুদ্ধিতে আমি পথ চলিনি, পদে-পদে আড়াল থেকে কেউ আমায় চালিয়ে নিয়েছে। ক্রমে এই দেশনা (guidance) বর্তমানের প্রতি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। দেখি, গুরু 'পুরএতা'—তিনি চলেছেন আগে-আগে, আমি চলেছি তাঁর পিছনে-পিছনে। তখন নিঃসংশয়ে পরমানন্দে আমার সব ভার তাঁকে সঁপে দিই। দিশারী তখন হন দোসর, হন বঁধু, হন আমার আমি। তিনি শিব, আমি শক্তি। তিনি যেমন তাঁতে, তেমনি আমাতে, তেমনি এই জগতে। তিনি সর্বেশ্বর, তিনি অন্তর্যামী, তিনি সর্বময়। কি তাঁর দেশনার রীতি, সে-প্রশ্ন আমার নয়। আমার শুধু তাঁর স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়া, তাঁর টানে কূল ছেড়ে অকূলে ভেসে চলা।

*

এই অন্তর্যামী গুরুকে পাওয়ার একমাত্র পথ হল নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে খুলে ধরা। আমাদের অহঙ্কার দিয়ে তাঁকে ঢেকে রেখেছি, সেই

আড়ালটি সরিয়ে নিতে হবে। আমাদের অহঙ্কার অশান্ত, তার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, একটা-কিছু পাওয়ার লোভ তার বড় বেশী। এই দোষগুলি বর্জন করতে হবে। আকাশের মত স্বচ্ছ উদার আপ্তকাম একটা প্রশান্তির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে। এই বৃহৎ প্রশান্তিই গুরু। তিনি আছেন আমার সব ছেয়ে সব ছাপিয়ে—আমার কালো আমার অন্ধকার, আমার আনন্দ আমার বেদনা, আমার শ্রদ্ধা আমার সংশয় সবই সেই আকাশের বুকে বীচিভঙ্গের মত। আমার সব অবগুণের ক্ষমা আছে তাঁর কাছে। অফুরন্ত তাঁর ভালবাসা, অবিচল তাঁর ধৈর্য। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মত সত্তার সমস্ত রসমাধুরী দিয়ে তিনি তিলে-তিলে আমায় বিকশিত করে তুলছেন। এই তাঁর পরমকৃত্য, তাঁর 'জ্ঞানময়ং তপঃ'।

অন্তর্যামী গুরুর এই স্বরূপকে আমরা মূর্ত দেখতে পাই মানুষ গুরুতে। দেখে আশ্বস্ত হই। কেননা নিজেদের রূপ আছে বলে রূপতৃষ্ণাও আছে, তাই শুধু ভাবে পেয়ে আমাদের হৃদয় ভরে না। যদিও জানি ভাব আগে রূপ পরে, ভাবের দৃষ্টি না খুললে রূপ দেখে কিছুই বোঝা যায় না, তবুও প্রাণ আর ইন্দ্রিয়ের চিন্ময় তর্পণের জন্য রূপও যে চাই।

তাই 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' আমরা তাঁর রূপ কল্পনা করি, তা নয়। ভাবের অনুরূপ হয়ে তিনিই আমাদের কাছে ধরা দেন। অন্তরে দেখা দেন ভাববিগ্রহ ইষ্টের রূপে, বাইরে দেখা দেন লীলাবিগ্রহ অবতাররূপে, গুরুরূপে। যিনি নির্ণাম নীরূপ, তাঁরই নাম আর রূপ। দুইই সত্য। নাম আর রূপ যেমন সাধকের প্রথম অবলম্বন, তেমনি তাদের নিয়েই তার চরম বিলাস। রূপ হতে অরূপ, আবার অরূপ হতে রূপ—পরিক্রমা পূর্ণ হয় এমনি করেই।

ইষ্টদেবতা—অবতার—গুরু, রূপের পথে এমনি করে ক্রমে তিনি কাছে এগিয়ে আসেন। সব চাইতে কাছে তাঁকে পাই গুরুর মধ্যে—গুরু আমার 'রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।'

অন্তর্যামী ইষ্ট অবতার গুরু—পূর্ণযোগের সাধক সবই মানেন। কিন্তু তা বলে 'আমার ইষ্ট, আমার অবতার, আমার গুরু' বলে তিনি গোঁড়ামি করতে পারেন না। অন্তর্যামীই সবার গুরু—'স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ'। 'ভগবানই গুরু' এই ভাব সিদ্ধ হলে তবে 'গুরুই ভগবান' বলবার অধিকার জন্মে। তখন বলা চলে 'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ, মদাত্মা সর্বভূতাত্মা'। আর ঐ শেষের অনুভবটি হল উপলব্ধি অখণ্ড হয়েছে কি না,

তার কষ্টিপাথর। যে-আমি সবার মধ্যে, সে-ই হল পাকা আমি। লীলাবিগ্রহের মধ্যে বিশ্বরূপ দেখবার দিব্যচক্ষু তারই আছে।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, বিভূতির চাইতে যাঁর বিভূতি, তিনি বড়। আগে অন্তর্যামী, তারপর তাঁর বিভূতি। একথা ভুললে গুরুকে বড় করতে গিয়ে বুদ্ধির দোষে ছোটই করব।

*

শাস্ত্রে যেমন শিষ্যলক্ষণ আছে, তেমনি গুরুলক্ষণও আছে। তাও জানা দরকার।

পূর্ণযোগের যিনি গুরু, তিনি অন্তর্যামী গুরুরই প্রতিভূ। সুতরাং অন্তর্যামীর যে-রীতি, তাঁরও সেই রীতি। শিষ্যকে তিনি পরিচালন করেন তার স্বভাব অনুযায়ী, গুরুভার হয়ে তার উপর চেপে বসেন না। অন্তরে রসের যোগান দিয়ে বাইরে মুক্ত আলো-হাওয়ার স্বচ্ছন্দ পরিবেশে তিনি ফুল ফুটিয়ে চলেন।

তাঁর দেশনার তিনটি অঙ্গ—অনুশাসন, আচরণ আর অনুভাব (influence)। তাঁর অনুশাসনের উদ্দেশ্য শিষ্যের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা, নিজের কতকগুলি মত তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া নয়। সাধনার পদ্ধতি তিনি বলে দেন একটা প্রাথমিক আলম্বন হিসাবে,—কিন্তু তাকেই যে চিরকাল আঁকড়ে থাকতে হবে একথা বলেন না। তাঁর দৃষ্টিতে উপায় সপ্রয়োজন হলেও লক্ষ্যটাই বড়।

গুরুর অনুশাসনের চাইতে আচরণ বড়। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' গুরু যা বলছেন, সে তাঁর অনুভূত সত্যের বাঙ্ময় রূপ। অনুভব শুধু বাণীতে রূপ ধরবে না, রূপ ধরবে কর্মেও। তাইতে গুরুর সত্যকার কৃতিত্ব হচ্ছে একটা চিন্ময় পরিবেশের সৃষ্টিতে। তখন কথা না বলেও অনুশাসন করা চলে। আবার গুরুর আচরণও হবে স্বচ্ছ উদার এবং সহজ—ভঙ্গিসর্বস্ব নয়। আচরণের একটা ছক বাঁধা থাকলে তার অনুকরণ করা সহজ হয়। কিন্তু শিষ্যের স্বভাবের উন্মেষে তা সহায়তা করে না। আচরণ শেষ পর্যন্ত আবরণই হয়ে দাঁড়ায়।

সবচাইতে বড় কথা হল গুরুর অনুভাব। শক্তিসঞ্চার করবার ক্ষমতা না

থাকলে গুরু হওয়া যায় না। আবার 'অক্ষীয়মাণ উৎসের' সঙ্গে যোগ না থাকলে শতধারায় নিজেকে বইয়েও দেওয়া যায় না। শঙ্করাচার্যের একটি শ্লোকে আছে, 'বটগাছের তলায় এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখে এলাম। তরুণ গুরু বসে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে বসেছে বৃদ্ধ শিষ্যেরা। গুরুর মৌনই হল তাঁর উপদেশ, আর তাইতে শিষ্যদের সংশয় ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।' এই দক্ষিণামূর্তি গুরুই সদ্‌গুরু। তাঁর গুরুগিরি আত্মজ্যোতির নিঃশব্দ বিকিরণে।

আরেকটা বিষয়ে গুরুকে সাবধান হতে হবে। 'আমি গুরু' এই অভিমান থাকলে গুরু হওয়া যায় না। গুরু অন্তর্যামীর প্রতিভূমাত্র। 'মা যা বলাচ্ছেন তা-ই বলছি, যা করাচ্ছেন তা-ই করছি'—এই তাঁর ভাব। তিনি পথের সাথী, পথের শেষ নন। কিন্তু এইখানে এসে সিদ্ধেরও ভরাডুবি হয়ে যায়। গুরু-গিরির অহঙ্কার হল মহামায়ার শেষ বন্ধন। তাকে কাটিয়ে ওঠা সহজ কথা নয়।

*

বাকী রইল কাল। 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'—কালক্রমে নিজের মধ্যেই মানুষ বস্তু খুঁজে পায়। বাস্তবিক, সময় না হলে কিছুই হয় না। আধ্যাত্মিক সাবালকত্বেরও একটা সময় আছে। তবে এও ঠিক, সে-সময় সবারই আসবে। সময় যখন আসে, তখন দেখা দেয় ব্যাকুলতা—আর যেন তখন তর সয় না। তখনই কালের সঙ্গে লড়াই। আগেই বলেছি, যোগসাধনা হল একটা কাল-সংক্ষেপের ব্যাপার। প্রবর্তসাধকের পক্ষে কালকে মনে হয় একটা বাধা। তাঁর সঙ্গে যুক্ত থেকে তখন পুরুষকারের প্রয়োগ করতে হয়। শক্তির যোগান তিনিই দিয়ে যান। ক্রমে বাধা যত দুর্বল হয়ে আসে, কালের বেগ ততই বাড়ে, কালকে তখন মনে হয় অনুকূল। আর শেষ পর্বে সাধকের হাত থেকে যখন তিনি সাধনার ভার তাঁর হাতে তুলে নেন, তখন কাল হয় যন্ত্র, সাধক কালাতীত। শাশ্বতকাল আর একটি ক্ষণ তখন তার কাছে এক।

কালের প্রতি প্রবর্তসাধকের মনোভাব হবে এই : সাধনার জন্য অনন্তকাল তার সামনে পড়ে রয়েছে, সুতরাং তাকে হতাশ বা ধৈর্যহারা হলে চলবে না। অথচ তার যা চাই, তা এই মুহূর্তেই চাই। অর্থাৎ অবিচল ধৈর্যের ভূমিকায় প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োগ—এই হল কালজয়ের সঙ্কেত।

২

আত্মোৎসর্গ

যোগে মানুষ দ্বিজ হয়, বুদ্ধির ভূমি হতে উত্তীর্ণ হয় বোধির ভূমিতে। একটা বৃহত্তর সত্তার আবেশে মানুষ তখন হয় অন্তর্মুখ এবং স্থিতধী, জীবনের একটা নতুন অর্থ সে খুঁজে পায়। বাইরে থেকে দেখতে গেলে এই আবেশ এবং নবজন্মের কারণ সবার পক্ষে এক হয় না। কিন্তু ভিতরের কারণ সবার বেলাতেই এক। সাধনশাস্ত্রের ভাষায় তাকে বলে প্রসাদ বা শক্তিপাত। সময় হয়েছে, তাই কে যেন এসে তোমায় ছুঁয়ে গেল। আর সেই ছোঁয়ায় শিউরে উঠে সমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হয়ে উঠল অলখের জন্য।

সত্যকার সাধনা তখন থেকেই শুরু হয়। তার আগেও সাধনা চলতে পারে—কতকটা গতানুগতিকভাবে, কতকটা-বা ঢিমাতেতালা চালে। সে যেন আধঘুম-আধজাগরণের অবস্থা। তার একটা অস্বস্তি আছে, কিন্তু তাকে কাটিয়ে ওঠবার মত উৎসাহের দীপ্তি নাই। শক্তিপাতে চিত্ত যেন গাঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। বৃথা কালহরণ তখন অসম্ভব হয়।

বাউল বলেন, 'গুরু মন্ত্র আর ইষ্ট তিনের দয়া হল, একের দয়া বিনা জীব ছারখারে গেল'। এই এক হল সাধক নিজে। তাঁরই প্রসাদে সব হচ্ছে এবং হবেও, কিন্তু খাটতে হবে নিজেকেই। 'কৃপার বাতাস সবসময়ই বইছে, কিন্তু তবুও তুই পাল তুলে দে।' তাঁর সংগে আমার সম্পর্ক সচেতন সহযোগিতার সম্পর্ক—আগাগোড়া। আমি এক পা বাড়ালে তিনি দশ পা এগিয়ে আসবেন; কিন্তু ঐ এক পা বাড়াতে হবে আমাকেই।

এই জন্যই সাধনার সত্যকার শুরু হয় একটা ব্রতদীক্ষাতে। 'ব্রত' মানে যা বরণ করে নেওয়া হয়েছে; আর 'দীক্ষা' মানে অতীতটাকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দেবার তীব্র ইচ্ছা। সমস্ত হৃদয় বলবে, 'তোমাকেই আমি বরণ করে নিলাম,—তোমাকে ছাড়া আর কিছুই আমি চাই না। আমি কূল হতে আজ অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তোমারই জন্য।' গোপীচিত্ত না জাগলে সাধনার শুরুই হয় না। নিজেকে অনিঃশেষে তাঁর কাছে উৎসর্গ করতে হবে। দেহ-প্রাণ-মন হৃদয় সব দিয়ে চাইতে হবে শুধু তাঁকেই—আর কাউকে নয়, কিছুকেই নয়।

আত্মোৎসর্গ

শক্তিপাত যদি তীব্র হয়, আত্মোৎসর্গ সহজ হয়। তিনি যেন জোর করে আমায় কুলের বার করে নিয়ে যান। পথের বাধা তখনও থাকে, কিন্তু মনে-প্রাণে তো কোনও দোটানার বাধা থাকে না। পথে বেরিয়ে তখন চলার বেগে আপনা থেকেই পায়ের তলায় পথ জেগে ওঠে। আর হৃদয়ে রয়েছেন দিশারী। আমার সব-কিছু তাঁকে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। কোন্ পথ দিয়ে তিনি নিয়ে চলেছেন, সে-বিচার আমার নয়—তাঁর হাতে হাত রেখে কেবল চলি, কেবল চলি।

কিন্তু এমনি করে বুকের আলোতে পথ চলা সম্ভব হয় কেবল উত্তমাধিকারীর বেলাতে। সাধারণত আত্মোৎসর্গ সিদ্ধ হয় ক্রমে-ক্রমে। দীক্ষা আর উৎসর্গের মাঝে একটা দীর্ঘ দিনের ফাঁক থাকে। আদর্শ কি তা মন হয়তো বোঝে, কিন্তু পথ চলতে পদে-পদে কেবল হোঁচট খায়। সাধনায় অন্তরের আগ্রহ আছে, কিন্তু সমস্ত সত্তার হয়তো সায় নাই। তখনই সাধকের যত বিড়ম্বনা। হয়তো তখন সারাজীবন প্রস্তুতিতেই কেটে যায়। কিম্বা একজায়গায় এসে নৌকা চড়ায় ঠেকে যায়, আর এগ'তে পারে না। আবার বেশ উঁচু অবস্থা থেকে পতনও হয় কখনও-কখনও। এসবই ঘটে, তাঁকে সব দিতে পারিনি বলে, কোথাও-না-কোথাও আত্মাভিমান থেকে গেছে বলে। 'আলের পথে চলতে-চলতে যে-ছেলে বাপের হাত ধরে, তার পড়ে যাবার ভয় থাকে। কিন্তু বাপ যার হাত ধরে, সে পড়লেও বাপই তাকে টেনে তোলে।' তবে কিনা যোগভ্রষ্টের কখনও সর্বনাশ হয় না। গীতার ভাষায়, 'কল্যাণকৃৎ-এর কখনও দুর্গতি হয় না।' থেমে থাকা বা পড়ে যাওয়া একটা সাময়িক ব্যাপার। তাঁকে যে চেয়েছে, তিনিই তাকে চেয়েছেন বলে তবে না সে চাইতে পেরেছে। সুতরাং অকুণ্ঠ আত্মোৎসর্গের শুভলগ্ন একদিন তার আসবেই, পাওয়া তার সার্থক হবেই।

*

সংস্কারের বাধাই হল পথের সবচাইতে বড় বাধা। অবিদ্যার পরিবেশে জন্মেছি বেড়ে উঠেছি, তারপর হয়তো এসেছি যোগের পথে। এখন চেতনার মোড় একেবারে উল্‌টাদিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এতদিনের অভ্যাসের মূঢ়তা কি একদিনে কাটিয়ে ওঠা যায়? দেহ-প্রাণ-মন সব উপরের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—এই হল আদর্শ। কিন্তু সে-আলোর স্বরূপ তো আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কি করে আধারে তাকে নামিয়ে আনব?

এ এক দারুণ সমস্যা বটে, কিন্তু তার সমাধান আছে আমাদের চাওয়ার মধ্যেই। তাঁকে যে চায়, তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বিবেক আর বৈরাগ্যের শক্তি আপনাহতে জেগে ওঠে। বিষয়সুখ তার কাছে আলুনি লাগে। সে বেশ বোঝে, সবাই যা নিয়ে মেতে আছে, তা সে চায় না—চায় আরেকটা কিছু। সংস্কারের জাল তবুও তাকে জড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার সমস্তটা প্রাণ আঁকুপাকু করে জাল ছেঁড়বার জন্যই।

দেহ-প্রাণ-মনের অভ্যস্ত সংস্কারকে যখন আলোর পথে বাধা বলে মনে হয়, তখন সাধক প্রায়ই ধরে উচ্ছেদের পথ। সে ভাবে, এই প্রাকৃত-অনুভবের স্তরে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণই ঝামেলা। একে যদি ভুলতে পারি, তাহলে আর ঝামেলা নাই। এ-জগতে কোথাও শান্তি নাই, সুখ নাই। যাকে সুখ বলে মনে করি, তাও সুখের মুখোসপরা দুঃখই শুধু। শান্তি আর সুখ জগতের ওপারে। অথবা, সুখ সেখানে না থাক, অন্তত দুঃখ তো একেবারেই নাই—কেননা দেহ-প্রাণ-মনের অস্তিত্বেই দুঃখের অস্তিত্ব। বিদেহমুক্তিতে দুঃখ নাই। সুতরাং তা-ই আমাদের পরমপুরুষার্থ। তার পথ হল, সমস্ত বৃত্তির নিরোধ, দেহ-প্রাণ-মনের উচ্ছেদে প্রাকৃত-সত্তার পরিনির্বাণ।

নিরোধযোগের এই লক্ষ্য। বলা বাহুল্য পূর্ণযোগের লক্ষ্য তা নয়। নিরোধযোগী অখণ্ড সত্তাকে দুখণ্ড করলেন—একটা ইহলোক, আরেকটা লোকোত্তর। তাঁর মতে লোকোত্তরই সত্য, অতএব ইহলোক মিথ্যা। মিথ্যা হলে ওটা আছে কেন? জবাব হল, আসলে ওটা নাই, ওর থাকাটা একটা মায়া। কার মায়া?—লোকোত্তরের মায়া হলে তা সত্যেরই মায়া, সুতরাং সত্য। আর ইহ-লোকের মায়া হলে তা আমারই মনের মায়া। তখন জগৎকে যে মিথ্যা বলি, সে আমার গরজে। আমার সুষুপ্তিতে জগৎ লোপ হয়ে যায়—আমারই কাছে; আসলে জগৎ কিন্তু থেকেই যায়। আর সুষুপ্তিতেও যদি কেউ জেগে থাকে, থেকে চেতনার উদয়-বিলয়ের দিকে তাকায়, তাহলে সে দেখে—তুর্যাতীতের যে-জাগৃতি, তার একটা দিক তুরীয়, আরেকটা দিক জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির উদয়-বিলয়। নিরোধযোগী শুধু ঐ তুরীয়টুকুকে লক্ষ্য করছেন, কিন্তু পূর্ণযোগী তুর্যাতীতের ভূমিতে থেকে নিচ্ছেন চারটি ভূমিই। লোকোত্তর এবং ইহলোক দুইই তাঁর কাছে সত্য।

তাছাড়া এ-মীমাংসা শুধু বুদ্ধির মীমাংসা। এর পরেও আছে প্রাণের মীমাংসা, আনন্দের মীমাংসা। দুঃখকে হেয় বলি, কেননা তাকে অনুভব করি

চেতনার একটা বাধা বলে। এ হল বুদ্ধির বিচার। কিন্তু তা-ই কি দুঃখের একমাত্র রূপ? দুঃখ কি চেতনাকে উদ্বুদ্ধও করে না, প্রাণে দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করবার বীর্যও জাগায় না? ভালবাসার দুঃখ কি অনির্বচনীয় আনন্দ-বেদনার রূপ ধরে না? অর্থাৎ শুধু বুদ্ধির বিচারে দুঃখ হেয় হলেও সঙ্কল্পের বিচারে ভালবাসার বিচারে দুঃখ হেয় নয়। দুঃখকে স্বীকার করে নিয়েই মহাযোগীর মধ্যে চলতে পারে প্রেমের আর করুণার তপস্যা। দুঃখময় জগতের সার্থকতা তখন আরেকদিক দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুঃখ আছে, তাকে জয় করে আনন্দে রূপান্তরিত করবার জন্যই। প্রকৃতির যান্ত্রিক পরিণাম্ তার স্বরূপের সত্য নয়, তাহলে জগৎকে কেবলই দুঃখের নিদান বলা চলত। কিন্তু প্রকৃতির ওই পরিণামের গভীরতর তাৎপর্য রয়েছে রূপান্তরে, অন্তর্গূঢ় চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষণে। এই দর্শন পূর্ণযোগীর।

*

পশুর জীবনের চাইতে মানুষের জীবনে জটিলতা বেশী। এই জটিলতা তার উদ্বুদ্ধ চেতনার দান। সে পশুর চাইতে দেখে বেশি বোঝে বেশি, তাই তার ঝামেলার আর যেন অন্ত নাই।

তবুও প্রাকৃত-মানুষের জীবন কতকটা গতানুগতিকতার পথ ধরে চলে বলে তার মধ্যে মোটের উপর খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। বাইরকে নিয়ে হয়রানি থাকলেও নিজের ভিতরকে নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা নাই। কতকগুলি স্থূল অভ্যাস আর রুচির কোনওরকম পরিতৃপ্তি হলেই সে খুশী।। অন্তরে তার গরুড়ের ক্ষুধা নাই, তাই অন্তত একটা দিক দিয়ে সে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু বাইর থেকে যে অন্তরে ঢোকে, সে যেন প্রথমটায় 'বাঁশবনে ডোমকানা' হয়ে যায়। বিভিন্ন বৃত্তি আর সংস্কারের এত জটলা যে তার মধ্যে, এ ছিল তার স্বপ্নেরও অগোচর। নিজেকে আবিষ্কার করতে গিয়ে সে দেখে—সে একটা মানুষ নয়, দশটা মানুষ। আর এই দশটা মানুষও যে মিলে-মিশে ঘর করছে, তা নয়। জীবনের সদরমহলে তাদের একজন কি দুজনকেই মাত্র দেখা গেছে, কিন্তু অন্দরে যে আরও এতজন লুকিয়ে ছিল, তা কে জানত? তাছাড়া শুধু নিজের ঘরের মানুষই নয়, আছে পড়শীরাও। অন্তর্মুখীনতায় চেতনা যত সূক্ষ্ম তীক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর হয়, ততই শুধু নিজের গভীর হতে নয়, বিশ্ব-প্রকৃতির নানা ভূমি হতেও শক্তির বিচিত্র তরঙ্গে মানুষ সাড়া দিতে বাধ্য হয়।

তাকে প্রথমটায় আত্ম-আবিষ্কারের দাম দিতে হয় এমনিতর বিচিত্র বিক্ষুব্ধ ও বিরুদ্ধ শক্তির আবর্তে নাকানিচুবানি খেয়ে। অর্থাৎ যোগ করতে গিয়ে প্রথমটায় চঞ্চল চিত্ত আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে। কাঠে যতক্ষণ আগুন ধরেনি, ততক্ষণ সে ছিল ভাল। কিন্তু আগুন ধরতেই বেরতে লাগল ধোঁয়া আর গ্যাঁজলা—কোথায় তাপ, কোথায় আলো!

এ-সমস্যার প্রচলিত সমাধান হচ্ছে ঐকান্তিক (exclusive) একাগ্রতার সাধনা—নিজের সংস্কার এবং রুচি অনুযায়ী চিত্তের যে-কোনও একটি প্রবণতাকে ঊর্ধ্বমুখী করে আর-সবাইকে উচ্ছেদ করা বা দাবিয়ে রাখা। কেউ বেছে নিল ভক্তির পথ—জ্ঞানের কথা তার কাছে বিষ। আবার যে জ্ঞানের পথ ধরল, ভক্তি তার কাছে একটা মাতলামি মাত্র; সে চায় নিথর চেতনায় প্রজ্ঞার প্রশান্ত দীপ্তি, দেহ-মন-প্রাণের কোনও দাবিকেই সে আমল দিতে চায় না। আত্ম-আবিষ্কারের প্রাথমিক ঝামেলার হাত হতে রেহাই পাবারও ওই এক পথ; : চিত্তের সমস্ত বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে অন্তরের সব কোলাহল স্তব্ধ করে দাও, গুহাহিত হও; শক্তির তরঙ্গ ওই গুহার পাষাণপ্রাচীরে ঘা খেয়ে ফিরে যাবে। তুমি নিজেকে নিয়ে বা দেবতাকে নিয়ে মণিকোঠায় একলা থাকবে। জগৎ পড়ে থাকবে দেউলের বাইরে।

এমনি করে ঐকান্তিক একাগ্রতা পর্যবসিত হয় নিরোধে। নিরোধযোগের সার্থকতা যে নাই, তা নয়। কিন্তু তার ত্রুটিও আছে। প্রথম ত্রুটি, দৃষ্টির ঔদার্যের অভাবে নিরোধ যদি নিগ্রহের (repression) পথ ধরে, তাহলে আধারের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয় ত্রুটি, নিরোধ স্বভাবতই ব্যাপ্তিচৈতন্যের বিরোধী। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আমরা পাই শান্তি। শান্তি পেতেই হবে। কিন্তু ধ্যানের শান্তি যদি কর্মে বজায় না থাকে, তাহলে সে-শান্তিসাধনা হল একাঙ্গী এবং অপূর্ণ। সুতরাং পূর্ণযোগীর পক্ষে নিরোধের সাধনা একটা সাময়িক উপায় হলেও কখনও চরম লক্ষ্য হতে পারে না। নিরোধের ফল যে-উপশম (quiescence), তা জাগ্রতের ব্যাপ্তিচৈতন্যকে বজায় রেখেও নামিয়ে আনা যেতে পারে। গুহার অন্ধকারে যে-আকাশ নিথর হয়ে আছে, সেই আকাশই প্রশান্ত প্রসন্নতায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সমস্ত বিশ্বের 'পরে, আবিষ্ট হয়ে আছে তার অণুতে-অণুতে। তাকে চোখ মেলেই দেখা যায়। উপনিষদের ঋষি বলেন, তাকে সঞ্জীবন আনন্দরূপে এই হৃদয়ে নামিয়েও আনা যায়।

এই আকাশের প্রশান্ত প্রসন্ন বিস্তারের ভূমিকায় পূর্ণযোগের সাধনা। সে-সাধনা 'সর্বেষামবিরোধেন'—সবাইকে স্বীকার করে নিয়ে এক পরম চেতনায় সবার সুষম আপ্যায়নে। বাধার সঙ্গে লড়াই পূর্ণযোগীকেও করতে হয়—বরং তাঁর লড়াই আরও সঙ্কুল, আরও অশ্রান্ত। ঘরের লড়াই শেষ হলে তাঁর শুরু হয় বাইরের লড়াই, যুগযুগান্তেও তা থামতে চায় না। ব্যাপ্তিচৈতন্য যে-যোগের ভিত্তি, তার সাধনা একার জন্য নয়, সবার জন্য। আর চৈতন্যের সত্যকার ব্যাপ্তি তার বর্তুলতায় (globality)। সে শুধু অনায়াস ঔদাস্যে ছড়িয়েই পড়ে না, শক্তির বৈদ্যুতীতে অনুপ্রবিষ্টও হয় সব-কিছুর মর্মে-মর্মে। তাই আত্মপ্রকৃতির এবং বিশ্বপ্রকৃতির রূপান্তর হয় তার পরম সাধ্য। প্রবর্তসাধকের বেলায় একাগ্রতা তখন ধরে নিত্যসমনস্কতার রূপ। নিজের ইচ্ছামত একটা-কিছু ঘটিয়ে তোলা নয়, কিন্তু অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে সব-কিছু ঘটতে দেওয়া এক পরম চেতনায় নিত্যসচেতন থেকে—এই হল এই যোগানুশাসনের প্রথম সূত্র। বলা বাহুল্য, এটা সহজ নয়। কিন্তু এ যখন সহজ হয়, তখন আর পাওয়ার কিছুই বাকী থাকে না।

*
০

সব যোগের মুখ্য সাধন হল একাগ্রতা। দেখলাম, একাগ্রতার দুটি রূপ—একটি ঐকান্তিক, আরেকটি পরিব্যাপ্ত। একটিতে সাধক নিজের গভীরে তলিয়ে যায়, তখন জগৎ থাকে না; আরেকটিতে সবার মধ্যে সে ছড়িয়ে পড়ে, অথবা সবার মধ্যে যিনি ছড়িয়ে আছেন তাঁর কাছে নিত্যসমনস্কতার দ্বারা ধ্রুবা-স্মৃতির দ্বারা নিজেকে মেলে ধরে। একটি তপস্যা যেন বীজের, আরেকটি ফুলের। একটি বৃত্তির একাগ্রতা, আরেকটি ভাবের একাগ্রতা। শকুন্তলা জগৎ ভুলে দুষ্মন্তকে ভাবছিল, তাই তার জীবনে নেমে এল প্রত্যাখ্যান আর বিচ্ছেদের অভিশাপ। কিন্তু দুষ্মন্তের ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে চিত্তের বৃত্তিগুলিকে সে কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করত যদি, তাহলে তাকে কিছুই হারাতে হত না। বিশেষ-কোনও প্রয়োজনে বৃত্তির একাগ্রতা দরকার হতে পারে, কিন্তু পূর্ণযোগে ভাবের একাগ্রতাকে ঠাঁই দিতে হবে সবার উপরে।

কুঁড়ি যেমন করে গুটিয়ে থাকে তেমন করে নয়, ফুল যেমন করে আলোর দিকে দলগুলি মেলে ধরে তেমনি করে আধারের সবখানি তাঁর দিকে মেলে

ধরতে হবে। এই হল আসল কথা। মাছ যেমন সমুদ্রের মধ্যে ডুবে থেকে অবাধে সাঁতরে বেড়ায়, আমরা যেমন আলোর সমুদ্রে বায়ুর সমুদ্রে আকাশের সমুদ্রে ডুবে থেকে বিচরণ করছি, তেমনি করে তাঁর মধ্যে নিজেকে সবসময় নিমজ্জিত বলে অনুভব করতে হবে। এই ভাবনা যদি একাগ্র অকপট এবং নিরন্তর হয়, তাহলে সত্তার গভীরে একটা-কিছু যেন কম্পাসের কাঁটার মত নড়ে ওঠে, আর সাক্ষাৎভাবে ওই-বৃহতের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে চায়। গভীরের এই অভীপ্সার যে-বাহন, তাকে বলি চৈত্যপুরুষ। চৈত্যপুরুষই আমাদের মাঝে সত্যকার সাধক। তাঁর সাধনা আধারের স্বভাব-অনুযায়ী। কেউ সাড়া দেয় জ্ঞানে, কেউ-বা ভক্তিতে; অর্থাৎ কেউ তাঁকে ধরতে চায় বুদ্ধি দিয়ে, কেউ হৃদয় দিয়ে। যার যেমন স্বভাব সে তেমন করে সাধনা শুরু করবে বটে; কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, সাধকের বিচারবুদ্ধি যেন সবসময় সজাগ থাকে। মানুষ মনোময় জীব, মন হল তার প্রগতির মুখ্য সাধন। মনের উৎকর্ষ ঘটে বুদ্ধিতে, বুদ্ধির উৎকর্ষ বোধিতে। সাধকের বিচারবুদ্ধি হবে এই বোধির আশ্রিত। বোধির মধ্যে আছে সত্যকে অপরোক্ষভাবে জানবার একটা স্বাভাবিক সামর্থ্য। হৃদয় দিয়ে বোঝার সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে। একটা চলতি কথা আছে, 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।' বিচারবুদ্ধি যদি তর্ক-বুদ্ধিতে পর্যবসিত হয়, তাহলে চেতনা ধূমাচ্ছন্ন হয়ে যায়। বোধি তর্ক করে না, কিন্তু বস্তুর সত্য তার কাছে 'প্রতিভাত' হয়। এই জন্য যোগীচিত্তের এই অপরোক্ষকারী বৃত্তিকে বলে 'প্রাতিভ-সংবিৎ'। প্রাতিভ-সংবিৎ সবার মধ্যে আছে। দেহকে শুচি, প্রাণবাসনাকে প্রশান্ত এবং মনকে ভাবে একাগ্র করলে এই সংবিৎ বা বোধিচিত্ত আপনাহতে আমাদের মধ্যে ভেসে ওঠে। তখন মন-বুদ্ধিকে তার অধীন করে দিতে হয়। অনুভব করতে হয়, জ্ঞান বা ভাব বাইরে থেকে আসছে না, আসছে উপর থেকে—কেউ যেন তা আমার মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে। এইভাবে যা আসে, তা-ই মানসোত্তর বোধিজাত জ্ঞান। প্রথম-প্রথম এই জ্ঞানেও অবিদ্যামনের কিছু কিছু ভেজাল থাকে। কিন্তু চিত্ত যতই বাসনাশূন্য এবং অহংশূন্য হয়, ভোরের আকাশ আলো ফোটবার প্রতীক্ষায় যেমন স্তব্ধ হয়ে থাকে তেমনি ঊর্ধ্বশক্তির প্রকাশের প্রতীক্ষায় নিজেকে প্রশান্ত রাখতে পারে, ততই বোধির আলো স্বচ্ছ হয়ে ফোটে।

এই আলো ফোটবার সঙ্গে-সঙ্গে একাগ্রতার সাধনাও সহজ এবং সর্বাঙ্গীণ হয়ে আসে। চেতনার তিনটি বৃত্তি আমাদের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করছে—

বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়বৃত্তি আর সংকল্পবৃত্তি। মনের ভূমিতে সাধারণত এই তিনটির একটি প্রবল হয়ে আর দুটিকে দাবিয়ে রাখে, তাইতে সাধনা প্রায়ই একাংগী হয়ে যায়। কিন্তু পূর্ণযোগের সাধনা অখণ্ডের সাধনা। তর্কবুদ্ধি এই অখণ্ডের বোধ দিতে পারে না, দিতে পারে বোধি। বোধির উন্মেষেই বুদ্ধি হৃদয় আর সংকল্প এই তিনটির বৃত্তিকে যুগপৎ আশ্রয় করে পরিব্যাপ্ত একাগ্রতার সাধনা চলতে পারে। বোধি অপরোক্ষভাবে অনুভব করে সৌরকরোজ্জ্বল আকাশের মত এক সর্বব্যাপী সর্বাবগাহী পরম সত্তাকে, যার মধ্যে দেহপ্রাণমন নিমজ্জিত হয়ে আছে। সেই সত্তার জ্যোতিঃশক্তি আধারে আবিষ্ট হয়ে বুদ্ধিকে করে পরমের একাগ্রভাবনায় উদ্দীপ্ত, হৃদয়কে তাঁর তন্ময় আস্বাদনে নন্দিত, সংকল্পকে এক অব্যাভিচারী অভীপ্সায় উদ্যত। ভূমার আবেশই তখন হয় জীবনের দিশারী।

*

এই-যে পরম, এই-যে ভূমা, তাঁর স্বরূপ কি? সাধ্যের একটু-কিছু পরিচয় না পেলে একাগ্রতার সাধন চলবে কি করে? শাস্ত্র পড়ে বা গুরুর মুখে শুনে তাঁর সম্বন্ধে অনেক-কিছুই জানা যায়। তাতে হয়তো প্রাকৃত-মনের সংশয় দূর হয়, বুদ্ধি একটা লক্ষ্যে স্থির হয়। কিন্তু এটা হল জ্ঞান, বিজ্ঞান নয়। দুধ কেমন তা শুনলাম চোখেও দেখলাম, কিন্তু খেয়ে দেখলাম না। তাই শুধু বুদ্ধি দিয়ে তাঁর ধারণা করাই যথেষ্ট নয়। তাঁকে পেতে হবে হৃদয় দিয়ে, বোধে তাঁকে বোধ করতে হবে। দেহ-প্রাণ-মনের সবখানি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে তাঁর ছোঁয়ায়, তবে জানা হয়ে উঠবে পাওয়া।

বুদ্ধি দিয়ে যে সাধ্যবস্তুর প্রাথমিক ধারণা, তাও পূর্ণযোগের সাধকের বেলায় উদার এবং সর্বগ্রাহী হওয়া চাই। নানা জন নানা পথে নানাভাবে তাঁকে পেয়েছেন। সবার প্রাপ্তিই চরম এই অর্থে যে, যিনি যেভাবে চেয়েছেন, তিনি সেইভাবেই পেয়েছেন। কেউ তাঁর মধ্যে সব হারিয়ে সমস্ত অস্তিভাবের প্রলয়ে পৌঁছেছেন এক মহাশূন্যতার অমানিশায়; কারও বোধ পর্যবসিত হয়েছে এক নির্বিশেষ সত্তামাত্রে—সে-সত্তা কখনও আকাশ, কখনও বিন্দু; কেউ দেখেছেন চিদাকাশে নিস্তরংগ আলোর অমেয় পরিব্যাপ্তি; কেউ দেখেছেন সেই আলোর বুকে আনন্দের ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা; কেউ দেখেছেন দ্যুলোকের আলিংগনে

রোমাঞ্চিত পৃথিবীর বুকে এক লীলোচ্ছল অনির্বচনীয় রসোল্লাস; কে
দেখেছেন নটরাজের তান্ডবের তালে এক অনিরুদ্ধ শক্তির ঋতচ্ছন্দোময় উচ্ছ্বাস।
আরও কত বিচিত্র দর্শন—যার প্রত্যেকটি সত্য, প্রত্যেকটি তাঁর অনিঃশে
মহিমার একটি প্রকাশ। এইসব নিয়ে পূর্ণযোগীর সাধ্যের ভাবনা হবে অসীমে
সুনীল শূন্যতায় একটি সহস্রদল আলোর পদ্মের মত। তাঁর ব্রহ্ম নির্গু
আবার সগুণও। নির্গুণরূপে তিনি সর্বাধার অধিষ্ঠান, সগুণরূপে অন্তর্যা
যোগেশ্বর। যুগপৎ তিনি শূন্য, তিনি সত্তা, তিনি চৈতন্য, তিনি আনন্দ, তি
শক্তি—তিনি সর্বযোনি সর্বেশ্বর সর্বময় পুরুষোত্তম।

বৃহৎ হয়ে বৃহৎকে পেতে হবে। সে-পাওয়ার পথে বাধা আসে সঙ্কী
অহংএর কাছ থেকে। আমি আছি গুটিপোকার মত, নিজেরই রেশমের জা
নিজেকে জড়িয়ে আছি। আমার ছোটখাট কামনা-বাসনা আছে, সেগুলির তৃ
আমার আগে চাই। বৃহৎকে আমি ডরাই। তার প্লাবন যদি আমার বা
ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আমি কি নিয়ে থাকব, কোথায় থাকব?

তবুও এমন-একটা সময় আসে, যখন বৃহৎকেও আমি চাই। তাঁকে ছা
এ-সংসার যেন বিস্বাদ লাগে। তাঁকে চাই আমার মনের মতন করে।

মনের মতন চাইতে গিয়ে আবার ফাঁপরে পড়ি। অহমিকার সূক্ষ্মসংস্কা
যে তারও মধ্যে লুকিয়ে আছে। অবশ্য চাওয়াটা দোষের নয়। আবার তাঁ
চাওয়া হল সকল চাওয়ার চরম। শাস্ত্রে তাকে বলে 'সতী বাসনা'। আর-স
বাসনা অসতী।

কিন্তু তাঁকেও চাইতে জানতে হয়। চাইলেই পাওয়া যায় না—চাইতে হ
শুদ্ধ হয়ে, অহংবর্জিত হয়ে। বলতে শিখতে হবে, 'আমার মতন করে ন
তোমার মতন করে তুমি প্রকাশিত হও। তুমি আমাকে নিরাকৃত করনি, জানি
আমিও যেন তোমায় নিরাকৃত না করি। যে-রূপেই তুমি আস না কে
হৃদয়ের আসনখানি যেন তোমায় পেতে দিতে পারি।'

তাঁকে চাওয়ার অর্থ হল সম্পূর্ণ রিক্ত হওয়া। একটি-একটি করে কা
সরিয়ে নিলে আগুন আপনাথেকে নিবে যায়। তেমনি করে বাসনার আগু
নিবিয়ে দিতে হবে। দেহে-মনে-প্রাণে থাকবে শুধু এক পরিনির্বাণের প্রশান্তি
আর তারই মধ্যে পরিব্যাপ্ত সত্তার বোধ। 'ওম্—তুমি আছ। তাই আমি আছি
তুমি আছ বলেই আছি।'

ভোর হওয়ার আগে আকাশের মধ্যে যেমন থাকে আলোর জন্য এক স্ত

প্রতীক্ষা, তেমনিতর প্রতীক্ষার প্রশান্ত আকূতি সমস্ত হৃদয় জুড়ে আর-কিছু নয়। তা-ই নিয়ে চলছে ইষ্টের ধ্রুবা-স্মৃতির আবর্তন—জপমালার মত। একটি মুহূর্ত তাঁকে ভুলতে পারছি না।

আকূতি সার্থক হয়। আলো ফোটে, অন্তর-বাইর সব ছাপিয়ে ফোটে উষার আলো। সে-আলোতে দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির আপ্যায়ন হয়। তাদের সঙ্কীর্ণ বাসনার রূপান্তর হয় তাঁর দিব্যসঙ্কল্পে। আকাশভরা আলো নুয়ে পড়েছে ছোট্ট একটি ফুলের বুকে, পরম প্রেমে পরম প্রজ্ঞায় পরম নৈপুণ্যে তাকে ফুটিয়ে তুলছে। চোখের সামনে এই তো ঘটছে দেখছি। তবুও আমার বেলায় আমার অহং-বাসনা বাদী হয়ে দাঁড়ায়।

ওই ফুলের ভাব আরোপ করতে হয় নিজের মধ্যে। অসীমের কাছে অমনি করে নিজেকে মেলে ধরা—পরম নির্ভরে, পরম প্রত্যয়ে। তা-ই আত্মোৎসর্গের চরম।

*

দেহে-প্রাণে-মনে সর্বতোভাবে তাঁর হওয়া, অতীতের স্মৃতি বা ভবিষ্যতের কল্পনা বর্জন করে প্রতিমুহূর্তে তাঁর হয়ে ওঠা—এই দিয়ে সাধনার সত্যকার শুরু।

কিন্তু এ-ভাব তো প্রথম থেকেই আসে না। অনেকদিনের অভ্যাসে ধীরে-ধীরে তাকে চেতনায় ফুটিয়ে তুলতে হয়।

সাধনার শুরুতে দেখি, জীবন আছে একটা দোটানার মধ্যে। পরা-প্রকৃতির আকর্ষণ আছে যেমন, তেমন অপরা-প্রকৃতির দাবিও আছে। অপরা-প্রকৃতিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না, সুতরাং কাজ শুরু করতে হয় তাকে নিয়েই। আমি যা আছি, তা-ই নিয়ে সাধনার পথে আমায় পা বাড়াতে হবে।

প্রথমেই হল মোড় ফেরানোর সাধনা। দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সবার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁর দিকে; এদের স্বতঃস্ফূর্ত যে-ক্রিয়া তাকে রুদ্ধ করে নয়, তার পরিণাম যে তাঁরই বৃহৎ জ্যোতির্ময় প্রশান্তির প্রসন্নতা—সেই বোধটি জাগ্রত করে। প্রাকৃত-জীবনের প্রতিটি ক্রিয়ার পরিণাম কিন্তু এই প্রশান্তিতে, সমস্ত প্রবৃত্তিরই পর্যবসান নিবৃত্তিতে। প্রবৃত্তিতে শক্তির একটা বিস্ফোরণ, নিবৃত্তিতে উপশম। আবার বিস্ফোরণ, আবার উপশম—এই ছন্দের

দোলা চলছে সারা জীবন ধরে। আমরা প্রবৃত্তিকেই চিনি, উপশমকে চিনি না। তাকে চিনতে হবে। যে-উপশম শেষে, তার ভাবনাকে আনতে হবে গোড়ায়। উপশমের বুকেই প্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই উপশম বৃহৎ—আকাশের মত। তারই মত সর্বযোনি সর্বেশ্বর সর্বাবসান।

এই বৃহতের ভাবনা চেতনায় যতই প্রস্ফুট হবে, ততই তার শক্তিও সক্রিয় হয়ে উঠবে। অপরা-প্রকৃতির আবরণ বিদীর্ণ করে জাগবে পরা-প্রকৃতি—জাগবে এক আলোর শিশু। সাধনার ভার আর তখন সাধকের উপর নয়, পরমা-প্রকৃতির উপর। অমৃত-চেতনার এই নবজাতককে তখন লালন করবেন কুমারজননী স্বয়ং।

এমনি করে সাধনার ক্রমপরম্পরায় থাকবে তিনটি পর্ব। আদিপর্বে আত্ম-শক্তির সাধনা। তার প্রধান অবলম্বন হল বিবেক এবং বৈরাগ্য। দিব্য আর অদিব্যের মাঝে তফাত করতে শিখতে হবে এবং চিত্তের সমস্ত শক্তি দিয়ে অদিব্যকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এটা অগ্নিসমিন্ধনের পর্ব—চলে দীর্ঘদিন ধরে। প্রথমটায় আলোর চাইতে ধোঁয়াই হয় বেশী। তা হ'ক, তবুও হাল ছাড়তে নাই। নিজেকে উদ্যত রাখতে হবে, অতন্দ্র রাখতে হবে। শক্তির যোগান আসছে সেই মহাশক্তির কাছ থেকেই—এই বুদ্ধিতে আত্মশক্তির প্রয়োগ করতে হবে। কাঠের মজ্জায় একবার আগুন ঢুকলে আর ভাবনা নাই। তখন সে তার নিজের তেজে কাঠকে আগুন করে তোলে, তাকে আর ফুঁ দিয়ে জিইয়ে রাখতে হয় না। এইটা সাধনার দ্বিতীয় পর্ব। আর কাঠটা আগাগোড়া যখন আগুন হয়ে উঠল, তখন তৃতীয় পর্ব। তখন আর আয়াস নাই, রীতের বাঁধন নাই, বাউলের ভাষায় তখন 'জ্যান্ত সহজে'র অবস্থা।

এইগুলি হল যোগসাধনার ক্রম। ক্রম বুদ্ধির কল্পিত ছক। আসল ব্যাপারটা বুঝতে প্রবর্তসাধককে তা সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু যোগের ক্রিয়া অক্রমেও হতে পারে এবং হয়ও। বৃহতের যে-প্রজ্ঞা, যোগেশ্বরের যে-যোগবীর্য, তা-ই যোগের সত্যকার দিশারী। তা প্রাকৃত ন্যায়ের (logic) শাসন মেনে চলে না! তাঁর স্বাতন্ত্র্যের প্রশাসনে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারি যখন, তখন জানি আর ভয় নাই ভাবনাও নাই।

৩

কর্মযোগীর আত্মসমর্পণ—গীতোক্ত সাধনা

আগেই বলেছি যোগের সাধনা চলবে জীবন জুড়ে—জীবন হতে বিমুখ হয়ে নয়। কুঁড়ি যেমন আলোর ছোঁয়ায় ফুল হয়ে ফোটে, জীবনও তেমনি বৃহতের ছোঁয়ায় বৃহৎ হয়ে উঠবে। তার ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প সব-কিছুরই ঘটবে দিব্য-রূপান্তর। আত্মচেতনার এই বিস্ফারণ আর আত্মপ্রকৃতির রূপান্তর—এই হল যোগের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে আত্মসমর্পণে।

আত্মোৎসর্গের স্বাভাবিক পরিণাম আত্মসমর্পণ। পাহাড়ের বুক থেকে নদী ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে—কোনও বাধা সে মানে না, পিছনপানে ফিরেও তাকায় না। তারপর একদিন তার খাতবন্দী জলের ধারা সমুদ্রের বুকে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে তার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। নদীর এইখানে সারা, কিন্তু বলতে গেলে যোগীর এইখানেই শুরু।

আত্মসমর্পণ হল নিজেকে অমনি করে নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া। কার মাঝে?—না বৃহতের মাঝে। সে-বৃহৎ কোনও তর্কের বিষয় নয়, অপরোক্ষ-বোধের বিষয়। এই অপরোক্ষ-বোধ সবার হতে পারে, যদি সে একটু শান্ত আর অন্তর্মুখ হয়। প্রাকৃতচেতনার সমস্ত বৃত্তি সসীম; কিন্তু তাকে ঘিরে যে অসীমের বিস্তার স্তব্ধ হয়ে আছে, এটা জানতে বা মানতে কারও কোনও বাধা নাই। শুধু একটা পরম-সত্তার অনুভব—এই যেমন 'আমি আছি' অথবা 'ওই আকাশ আছে', আর সেই নির্বিশেষ থাকাটুকুকে আশ্রয় করে বিচিত্র নাম-রূপের উল্লাস। এই অস্তিত্বকেই বলি বৃহৎ—অন্তর্হৃদয়ে আকাশের শূন্যতা।

এই বৃহৎ কতদূর ছড়িয়ে আছে? যেখানে জগৎ ফুরিয়ে গেছে সেখানে সে আছে, জগৎ ছড়িয়ে আছে যেখানে সেখানেও আছে, আবার আছে প্রত্যেক জীবের চেতনার গভীরে গুহাহিত হয়ে। ব্রহ্ম বিশ্বোত্তীর্ণ, ব্রহ্ম বিশ্বাত্মক, ব্রহ্ম গুহাহিত।

এই কথাটাই আমাদের অহং বোঝে না বা বুঝতে চায় না। প্রাকৃত-জীবনের কেন্দ্রে অহং, তাকে ঘিরে ভাবনা-বেদনা-সঙ্কল্পের আবর্তন চলছে দিনরাত। সে ভাবে, এই আবর্তনের সে-ই নিয়ন্তা। কিন্তু তার জ্ঞান কত

সঙ্কীর্ণ। নিজেকে সে কতটুকু জানে, চেতনার অন্দরমহলের কতটুকু খবর সে রাখে? জগৎকে সে জানে আরও কম, অপরের সঙ্গে সেখানে মিলের চাইতে গরমিলই তার বেশী। আর যা লোকোত্তর, তার কথা ছেড়েই দিলাম।

এই অন্ধকূপের মধ্যে সবার জীবন কাটছে। অথচ তারই মধ্যে প্রকৃতির আলোর তপস্যাও চলছে। অহংএর মধ্যে তা-ই নিচ্ছে আত্মবিস্ফারণের রূপ। জগতে সবাই চায় বৃহৎ হতে। কিন্তু সে-চাওয়ার মধ্যে সুর থাকে না ছন্দ থাকে না—কেননা মানুষ সাধারণত বড় হতে চায় বাইরে, অন্তরে নয়। উপকরণের সঞ্চয়ে ভোগ আর ঐশ্বর্য নিরঙ্কুশ হ'ক—এই তার কামনা। এ-কামনা কোথাও সার্থক হয়, কোথাও-বা হয় না। সার্থক হলেও অপঘাত তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, কেননা উপকরণবাহুল্য মানুষের অন্তরাত্মাকে শেষ পর্যন্ত কখনই তৃপ্ত করতে পারে না। নচিকেতার মত একদিন তাকে বলতেই হয়, 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ', কারণ এই তর্পণের মধ্যে আছে জরার অভিশাপ। তাছাড়া একে উপলক্ষ্য করে অহংএর সঙ্গে অহংএর সংঘর্ষ আর তার ঝামেলা তো আছেই।

ভোগ আর ঐশ্বর্য বস্তুত নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তাদের সত্যকার রূপটি চেনা চাই। ভোগের স্বরূপ হল আত্মারামের আনন্দ, আর ঐশ্বর্যের স্বরূপ হল বিবিক্তের স্বাতন্ত্র্য। উপকরণনির্ভর না হয়েও তাদের পাওয়া যায়, আর সে-পাওয়াই হল সত্যকার পাওয়া। তার পথ হল অন্তরাবৃত্তি। প্রতিদিন যেমন ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যাই, তেমনি এই জাগ্রতেই মুহূর্তে-মুহূর্তে অনুভব করা হৃদয়ের গভীরে একটা বিরাট শূন্যতা—শুধু 'আমি আছি'র একটা নিষ্কিঞ্চন অনুভব, মৃত্যুর স্তব্ধতায় ছাওয়া সত্তার মাধুরী। আর এই 'আমি আছি'কে ঘিরে আর-এক মহাশূন্যতা—বৃহৎ আকাশের অপরিমেয় শূন্যতা। উপনিষদের ঋষির ভাষায় এক আকাশ এই হৃদয়ে, আরেক আকাশ ওই দ্যুলোকে অন্তরিক্ষে ভূলোকে সর্বত্র। এ-আকাশ মিলিয়ে যায় ওই আকাশে, ওই আকাশ জড়িয়ে ধরে এই আকাশকে। আর এই যুগনদ্ধ রিক্ততার সামরস্য হতে ফোটে সত্তার আনন্দ আর স্বাতন্ত্র্য। তার আলোর ছটা এসে পড়ে বাইরের উপকরণের 'পরে, ঘটায় ভোগ আর ঐশ্বর্যের রূপান্তর। মানুষ তখন স্বরাট হয়, তার জীবনায়ন হয় বিশ্ববিসৃষ্টির সঙ্গে সুরে গাঁথা আত্মবিসৃষ্টির উল্লাস।

আত্মচৈতন্যের এই সহস্রদল স্ফুরণ যোগের লক্ষ্য। এ-স্ফুরণ প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। অপরা-প্রকৃতিতে তার চেতনা অস্পষ্ট, ক্রিয়া বিশৃঙ্খল

এবং মন্থর; যোগ তাকে করতে চায় সচেতন ঋতচ্ছন্দা এবং ক্ষিপ্র। যোগের ফলে চেতনার উৎকর্ষের অনুষঙ্গে আসে আত্মপ্রকৃতিরও রূপান্তর। তারপর একটি আধারে চিন্ময়-পরিণাম সম্যক্‌সিদ্ধ হলে স্বভাবের নিয়মে তার প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আনে বিশ্বপ্রকৃতির মাঝেও একটা আলোড়ন। সর্ব-ভূতাত্মভূতাত্মা সিদ্ধের চেতনায় তখন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে লোকোত্তরের দিব্যসঙ্কল্প—সমষ্টি প্রকৃতির রূপান্তর।

পরমচৈতন্যের আবেশে আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ এবং আত্মপ্রকৃতি ও বিশ্ব-প্রকৃতির রূপান্তর—এই হল তাহলে পূর্ণযোগের লক্ষ্য।

যিনি আমার অন্তর্যামী তিনিই জীবনের নিয়ন্তা, আমার বহির্মুখ ক্ষুদ্র অহং নিয়ন্তা নয়—এই দৃষ্টিই সত্যকার যোগদৃষ্টি। অহং জীবনের প্রেরণা পায় প্রাণবাসনার চরিতার্থতা থেকে; তাকে শেখাতে হবে আপনাতে আপনি থেকেই কি করে নির্মল প্রসন্নতায় অন্তর ভরে উঠতে পারে। বাসনাই অহন্তার আশ্রয়। বাসনা না থাকলে সূর্যোদয়ে কুয়াসার মত অহংএর ছায়া মিলিয়ে যায়, তাঁর আলোয় জীবন ঝলমলিয়ে ওঠে। জীবন তাতে পঙ্গু হয় না, বরং বৃহতের যোগে আরও সমর্থ হয়। এখন মনবুদ্ধি চলছে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে, দিনকানার মত হাতড়ে-হাতড়ে; তখন তারা চলবে অন্তর হতে উপচে পড়া প্রসন্ন আলোর পথে। এখন বাসনার আবিলতা আছে বলে আমাদের সঙ্কল্প বাধা পায়; তখন তা হবে তাঁরই অবন্ধ্য ইচ্ছার স্বত-উৎসারণ। এখন হৃদয় অতৃপ্ত আতুর; তখন চৈত্য-সত্তার উন্মেষে সে হবে চিরনন্দন প্রেম ও রসোল্লাসে ডগমগ।

এক কথায় স্পর্শমণির ছোঁয়ায় জীবনকে আমাদের সোনা করে তুলতে হবে। এ যে অসম্ভব, তা নয়। বরং এ-ই আমাদের দিব্যনিয়তি। একথা যে বোঝে না, তার এখনও সময় হয়নি। কিন্তু আরেকটা জীবনের একটুখানিও আভাস যে পেয়েছে, বুঝতে হবে তার সময় হয়েছে—তিনি এসে তার হাত ধরেছেন। তখন আর ভাবনা-চিন্তা কিছুই নয়, পিছন পানে আর ফিরে তাকানো নয়; জীবনের সব ভার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে অনিঃশেষে নিজেকে তখন তাঁর মধ্যে ঢেলে দেওয়া—আকাশের বুকে আলোর মত। আমার আর 'করবার' কিছুই থাকবে না তখন, জীবনে সব-কিছুই 'ঘটবে' এবং ঘটবে তাঁরই ইচ্ছায়। সে-ইচ্ছাও আর যবনিকার আড়ালে থাকবে না, দেহ প্রাণ মনের প্রতি তন্ত্রে তা ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে। আরও আলো, আরও আনন্দ, আরও শক্তি বাঁধভাঙা প্লাবনের মত জীবনের কূল ছাপিয়ে চলবে।

অথচ জীবনের হারাবে না কিছুই, যা আছে তা-ই আরও সত্য এবং সার্থক হয়ে ফুটবে। আগুনের ছোঁয়ায় ইন্ধনে শক্তির মুক্তি ঘটে, তার প্রতিটি অণু অগ্নিময় হয়ে যায়। তখন তার আলো আর তাপ অনায়াসে তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রূপান্তর আনে স্বচ্ছন্দ বিকিরণের সামর্থ্য।

বস্তুত এই বিকিরণ তাঁরই ইচ্ছার বিকিরণ—সহস্ররশ্মির আত্মবিকিরণের মত। এই তাঁর দিব্য কর্ম। সেই কর্মেরই স্পন্দনে আমাদের জীবন। সে-স্পন্দন অব্যাহত হবে যখন, তখনই জীবনের সার্থকতা। আমরা তখন তাঁর নিমিত্ত, তাঁর শক্তিবিচ্ছুরণের আধার। এতেই কর্মযোগের পূর্ণ সিদ্ধি।

এই আত্মসমর্পণমূলক কর্মযোগ সবার সাধ্য—এমন-কি জ্ঞান বা ভক্তির দিকে যাদের প্রবণতা আছে, তাদেরও। বস্তুত জ্ঞান ভক্তি আর কর্মে কোনও বিরোধ নাই—একথা আগেও বলেছি। জ্ঞান আর ভক্তির প্রকাশ হয় অন্তরে, কর্মের প্রকাশ বাইরে। কিন্তু বাইর আর ভিতর দুটা তো আলাদা নয়, তারা একই সত্তার এপিঠ আর ওপিঠ। কর্মের উৎস হল শক্তি। কিন্তু শক্তিও তো একটা বোধ মাত্র। তাকে বলতে পারি জ্ঞান বা ভক্তির বীর্য। বীর্য আত্ম-বিচ্ছুরণে প্রকাশ পাবেই। যা ভিতরে আছে, তা বাইরে ফুটবেই—যেমন গাছের জীবনরস নিজেকে প্রকাশ করে ফুল আর পাতার বাহারে।

আবার কর্ম শুধু সিদ্ধের আত্মবিকিরণ নয়, সাধকেরও তা অপরিহার্য সাধন। চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম প্রাথমিক সাধন—এতো আছেই। কিন্তু শুদ্ধচিত্ত যে কেবল নিজের মধ্যে তলিয়ে যাবে, এতেও তো জীবনের পূর্ণ সার্থকতা নয়। অন্তরে ডুবে অবর-প্রকৃতির ঝামেলা হতে অব্যাহতি পেতে পারি, কিন্তু তার রূপান্তর ঘটাতে হলে বাইরে আমাকে আসতেই হবে। আর পূর্ণযোগের চরম লক্ষ্য যদি হয় সর্বজনীন রূপান্তর, তাহলে বিশ্বকর্ম নিরুদ্ধ হয়ে যাক এমন কথা তো ভাবাই চলবে না। বিশ্বের কর্ম যদি থাকে, তাহলে ব্যক্তির কর্মও থাকবে। কিন্তু কর্ম তখন হবে অভাবের তাড়নায় নয়, ভাবের স্ফূর্তিতে। জগৎ জুড়েই এমনি হবে। সেই সুদূর সিদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রেখে আমাদের ব্যষ্টিজীবনের সাধনার ছক বাঁধতে হবে। অবশ্য যোগের পথ স্বভাবের পথ। সুতরাং উদার বুদ্ধির উন্মেষ যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ স্বভাবের প্ররোচনায় সঙ্কীর্ণ পথে চলতেও কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, ক্রমে আমাদের মধ্যে থেকে যাতে সীমার সঙ্কোচ দূর হয়ে যায়, বিশ্বে এবং বিশ্বোত্তীর্ণে মুক্তি পেয়ে ব্যক্তির ভাবনা যাতে সার্থক হয়।

কর্মযোগীর আত্মসমর্পণ—গীতোক্ত সাধনা

*

চিন্ময় কর্মসাধনার সঙ্কেত আমরা পাই গীতার কর্মযোগে। সাধনার কথা সেখানে খুঁটিয়েই বলা হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধির কথা রয়েছে উহ্য। গীতার দর্শন অখণ্ড জীবনদর্শন। জীবনের কুরুক্ষেত্রেই তাঁকে পেতে হবে, জীবন থেকে সরে দাঁড়িয়ে নয়—এই হল গীতার অমোঘ নির্দেশ। কর্মের সাধনায় যেমন তাঁকে পাওয়া, তেমনি আবার তাঁকে পাওয়ার ভিতর দিয়ে কর্মপ্রবৃত্তির রূপান্তর ঘটানো—সাধনার মধ্যে এমনতর একটা অন্যোন্যভাবনা (reciprocity) হল গীতার মূল সুর। তৎপর হয়ে, সমস্ত কর্ম তাঁতে সন্ন্যস্ত করে আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়ে প্রাকৃতকর্মের রূপান্তর ঘটবে দিব্যকর্মে—এই সাধনার কথাই গীতায় আছে। কিন্তু তার ফলশ্রুতির কথাটুকু রয়ে গেছে রাজগুহ্য। সেইটুকু আমাদের ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট করে তুলতে হবে।

গীতোক্ত কর্মযোগের দুটি মূল সূত্র—সমত্ব আর একত্ব। সমত্বের সাধনা নিজের মধ্যে, আর সমস্ত বিশ্বে একত্বের সাধনা। বাইরের জগৎ আমাদের অহরহ নাড়া দিচ্ছে, আর আমরা তাতে সাড়া দিচ্ছি অন্তরের সুখ-দুঃখ বা রাগ-দ্বেষ দিয়ে—এই দ্বন্দ্বের দোলাটাই হল আমাদের জীবন। সমত্ব আমাদের এই দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠতে শেখায়। শুধু দুঃখেই অনুদ্বিগ্ন থাকা নয়, সুখেও থাকা—এই হল সমত্বের লক্ষণ। অন্তর হবে আকাশের মত প্রসন্ন এবং উদার—আলোর খেলা আর মেঘের ছায়া দুয়েতেই অসক্ত এবং নির্বিকার।

সমত্বের সাধনা সহজ হয় একত্বের ভাবনা থেকে। আবার ওই আকাশের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি—সবাইকে ছেয়ে সবার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সবাইকে ছাপিয়ে আছে এক আকাশ। যেমন সে আছে বাইরে, তেমনি আছে অন্তরে। বাইরে রূপ আর অন্তরে নাম (conceptual entity), সবই ফুটেছে ওই আকাশ থেকে—অরূপ থেকে ফুটছে রূপ, অনাম থেকে নাম, নৈঃশব্দ্য থেকে ভাব। এই সর্বব্যাপী সর্বাবগাহী সর্বাতিশয়ী একত্বের ভাবনায় সমত্ব সহজ হয়। অহংই বহু। তা-ই থেকে যেমন মেশামেশি, তেমনি আবার রেষারেষিও। কিন্তু বহু অহং একেরই বিভূতি, অন্তরে এই বোধ জাগ্রত থাকলে অভিষ্বঙ্গ (clinging) বা জুগুপ্সা (shrinking) কোনটাই থাকে না—চেতনা আলোর মত সহজে সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

এই হল বিদ্যার জীবন, সেখানে একের প্রশাসন। আর অহংতন্ত্রিত জীবন

অবিদ্যাগ্রস্ত, সেখানে বহুর শাসন। অহং নিজেকে মনে করে স্ব-তন্ত্র, কিন্তু বাস্তবিক সে কি তা-ই? পরতন্ত্র আমরা পদে-পদে। জীবনে কত-কিছুই আমরা ঘটাতে চাই, কিন্তু পারি কি? ভাবি এক, হয় আর—এ-ব্যর্থতার বেদনা কার নাই? কিন্তু এ-বেদনা হতে মুক্তি পেতে পারি, যদি সব ঘটনার পিছনে দেখি সেই একের স্পন্দনকে। আমার সঙ্কল্প তখন হয় তাঁর দিব্যসঙ্কল্পের অধীন। তার সার্থকতা বা ব্যর্থতার দায় তখন আর আমার নয়। সঙ্কল্প যদি সিদ্ধ হয়, সে তাঁর সিদ্ধি; যদি অসিদ্ধ হয়, সেও তাঁরই সিদ্ধি। আপাতত যা অসিদ্ধ, তাও এক পরম-সিদ্ধির অঙ্গীভূত—চেতনা অহং থেকে নির্মুক্ত হয়ে বৃহৎ ও প্রশান্ত না হলে এ-দৃষ্টি আসে না।

অথচ এটা হাল ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারও নয়। আমরা যে পরতন্ত্র, এতে কোনও ভুল নাই। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের অভিমানও তো আমাদের মধ্যে আছে। সে-স্বাতন্ত্র্য কার? যদি বলি অহংএর স্বাতন্ত্র্য, তাহলে যে ভুল হবে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যদি বলি, প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য, আমরা তার পরতন্ত্র—তাহলেও ভুল হবে। এ-দর্শন সম্যক্ দর্শন নয়, এও অবিদ্যার দর্শন। কিন্তু যদি বলি স্বাতন্ত্র্য তাঁরই, আমরা সেই একের পরতন্ত্র, তাহলেই স্বাতন্ত্র্যে আর পারতন্ত্র্যে বিবাদ ঘুচে যায়। তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে যখন জীবনে অনুভব করি, তখন তাঁর শক্তিকেও অনুভব করি—কেননা স্বাতন্ত্র্যের অর্থ হচ্ছে শক্তির অবাধিত স্ফূর্তি। তখন তাঁর স্বাতন্ত্র্যেই আমার স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ আমি তাঁর দিব্যসঙ্কল্পের বাহন, জীবনের কুরুক্ষেত্রে তাঁর সব্যসাচী নিমিত্ত।

প্রাকৃত কর্ম দিব্য হয়ে ওঠে এই বোধে।

*

সাংখ্যের বিবেকজ্ঞান দিয়ে সাধনা শুরু করা ভাল। সাংখ্য বলেন, প্রকৃতি আর পুরুষের মাঝে বিবেকের কথা। বিবেক মানে তফাত করা, প্রকৃতির ক্রিয়া থেকে পুরুষকে আলাদা করা।

আমাদের মধ্যে যে-চৈতন্য আছে, তা-ই হল পুরুষের লক্ষণ। এই চৈতন্যের তিনটি বৃত্তি আমরা দেখতে পাই—ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব আর দ্রষ্টৃত্ব। জগৎটা বাইরে থেকে বা ভিতরে থেকে অহরহ আমাদের নাড়া দিচ্ছে আর আমরা সুখ-দুঃখের বোধ দিয়ে তাতে সাড়া দিচ্ছি। এই হল আমাদের ভোক্তৃত্ব। আবার শুধু যে

অবশ হয়ে সাড়া দিয়ে যাচ্ছি তা নয়, উলটে জগৎটাকেও আমরা নাড়া দিচ্ছি—সুখ পেলে তাকে আঁকড়ে ধরে জিইয়ে রাখতে চাইছি, দুঃখ পেলে ছিটকে পড়ে তাকে তাড়া করছি। এই আমাদের কর্তৃত্ব। ভোক্তৃত্ব আর কর্তৃত্ব চৈতন্যের বৃত্তি হলেও সাংখ্যকার তাদের বলেন প্রকৃতির গুণক্রিয়া। এই ক্রিয়া যান্ত্রিক। ভাল লাগা আর মন্দ লাগা, সুখ খোঁজা আর দুঃখ এড়ানো—এর কতকগুলি বাঁধাধরা রীতি আছে। আমরা যন্ত্রের মত তার অনুবর্তন করি। অনুবর্তন করা আমার স্বভাব বা প্রকৃতি। আমরা প্রকৃতির বশ। সাংখ্যের ভাষায় পুরুষ বা চৈতন্য এখানে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, নিজেকে তাথেকে আলাদা করতে পারছে না বলে প্রকৃতির উপর তার কোনও প্রশাসনও নাই। এর নাম অবিবেক।

এই অবিবেকের অবস্থা থেকে চৈতন্য কিন্তু ভিতরে-ভিতরে ছাড়া পাবার চেষ্টাই করছে। এই চেষ্টার ফলে চৈতন্যের বিকাশের ধাপগুলিকে সাংখ্যকার বোঝবার চেষ্টা করেছেন প্রকৃতির গুণক্রিয়া দিয়ে। প্রথম ধাপে চৈতন্য আচ্ছন্ন থাকে—যেমন উদ্ভিদে। এটা তমোগুণের অবস্থা। তারপর তার অর্ধাচ্ছন্ন প্রকাশ হয়, কিন্তু কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকে না—যেমন পশুতে। এখানে তমোগুণের সঙ্গে খানিকটা রজোগুণের মিশ্রণ ঘটে। তারপর চৈতন্য অনেকটা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় মানুষে—তখন রজোগুণের সঙ্গে সত্ত্বগুণের মিশ্রণ ঘটে। বিশুদ্ধ সত্ত্ব মানুষের মধ্যেও খুব কম। তাকে ফুটিয়ে তোলাই হল যোগের লক্ষ্য।

শুদ্ধ-সত্ত্বের উপমা দেওয়া হয় আলোর সঙ্গে। আলো স্বচ্ছ, প্রশান্ত, প্রসন্ন তার কাছে সব-কিছু সুস্পষ্ট। পুরুষের প্রকৃতি যখন শুদ্ধসত্ত্ব হয়, তখন সে হয় এই আলোর মত। তাকে বলতে পারি—পরা-প্রকৃতি। যেখানে আলো-আঁধারি, সেখানে সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজোগুণের আর তমোগুণের ভেজাল আছে বুঝতে হবে। রজোগুণের ফলে সেখানে দেখা দেয় চাঞ্চল্য, আর তমোগুণের ফলে মূঢ়তা। বোকার মত ছটফট করছি—আমাদের সবারই বলতে গেলে এই দশা। ছটফটানিও কমে এল, শেষে আঁধারে সব ছেয়ে গেল—এর নাম তমঃ। আমাদের প্রকৃতির যেদিকটা আলো-আঁধারের মাঝে এমনি ছটফট করতে-করতে বারবার আঁধারে তলিয়ে যাচ্ছে, তাকে বলি অপরা-প্রকৃতি। এই অপরা-প্রকৃতির বশ্যতা হতে নিজেকে আলোর জগতে টেনে তুলতে হবে—বিবেক দিয়ে। বিবেক জাগে দ্রষ্টৃত্ব থেকে। এখন আমরা ভোগ করছি, কর্মও করছি—কিন্তু করছি অন্ধের মত। কিসে থেকে কি হচ্ছে, আমরা কিছুই জানছি না দেখছি না। দেখতে চাইলে প্রকৃতির এই যান্ত্রিক আবর্তনের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। সাংখ্যের

ভাষায় আমি তখন দ্রষ্টা এবং স্বরূপে অবস্থিত। আমি তখন হুঁশে আছি। আর হুঁশে আছি বলে অপরা-প্রকৃতিকে শাসনও করতে পারছি।

এইটি করতে পারলে অপরা-প্রকৃতির এলোমেলো চলনের মধ্যে ছন্দ আর সৌষম্য জাগে। তখন পরা-প্রকৃতির উন্মেষ। অপরা-প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক হল বিবেকের আর পরা-প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যের। পুরুষের অবিলুপ্ত দ্রষ্টৃত্ব তখন তাঁর ভোক্তৃগুণকে করে স্বস্থ ও স্বচ্ছ, কর্তৃত্বকে স্ব-তন্ত্র। পুরুষ আত্মার মহিমাকে অনুভব ক'রে তখন বিশ্ব এবং বিশ্বোত্তীর্ণের সঙ্গে এক হয়ে যান।

সদাজাগ্রত বিবেক দিয়ে অপরা-প্রকৃতির বশ্যতা হতে মুক্তিলাভ করা তাহলে সাধনার প্রথম সোপান।

*

কর্মযোগীর জীবনাদর্শ তাহলে এই :

তাকে কর্ম করতেই হবে। কিন্তু কর্ম করবে সে সর্বদা সজাগ থেকে, নিজের মধ্যে নিজেকে অবিচল রেখে। অহংকে কর্তা সাজিয়ে অথচ অপরা-প্রকৃতির গোলাম হয়ে সে কর্ম করবে না।

অপরা-প্রকৃতির গুণক্রিয়া হতে বিবিক্ত থাকবে বলেই তার মধ্যে জাগবে সমত্ব। তার ফলে কর্মে তার ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না, সিদ্ধি আর অসিদ্ধি তার কাছে সমান হবে। আর তার সর্বভূতে হবে সমদৃষ্টি।

এই সমত্ব এবং সমদৃষ্টি তার মধ্যে জাগাবে একত্বের বোধ। সে জানবে, এই বিশ্ব এবং বিশ্বকর্ম এক পরমপুরুষের প্রজ্ঞার বিসৃষ্টি এবং প্রাণের ছন্দ। তার জীবন এবং কর্ম তাঁর সত্তার সমুদ্রে একটা তরঙ্গমাত্র।

তখন তার যোগযুক্ত চেতনায় কর্মযোগের তিনটি পরম রহস্য একে-একে ফুটে উঠবে। প্রথম সে, অনুভব করবে—সে কিছুই করছে না, সে অকর্তা, প্রকৃতি-পরিণামের সাক্ষী মাত্র। তারপর সে অনুভব করবে—কর্মে তার পরা-প্রকৃতি তাঁরই যন্ত্র। যন্ত্রী তিনিই, সে তাঁর নিমিত্তমাত্র। অবশেষে তাঁর পরমা-প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যভাবনায় সে রূপান্তরিত হবে তাঁর শক্তিতে। তখন কর্ম হবে সাক্ষাৎভাবে তাঁর প্রজ্ঞা প্রাণ এবং আনন্দের বিসৃষ্টি। প্রথম অকর্তার কর্ম, তারপর নিমিত্তের কর্ম এবং অবশেষে দিব্যকর্ম। কর্মযোগের এই সিদ্ধি।

কর্মযোগীর আত্মসমর্পণ—গীতোক্ত সাধনা

*

প্রাকৃত-জীবনে অহং হল কর্মকর্তা, নিজেকে সে বসিয়েছে ঈশ্বরের জায়গায়। তার কর্মের লক্ষ্য হল ভোগ। ইচ্ছা হবে অপ্রতিহত আর কামনার তর্পণ হবে নিরঙ্কুশ—এই তার জীবনের লক্ষ্য। এ হল প্রবৃত্তির ধর্ম। প্রবৃত্তি মিথ্যা নয়, কিন্তু সে লক্ষ্যভ্রষ্ট। একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে প্রবৃত্তির চরিতার্থতার প্রয়াস দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। চেতনা তাতে ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—এই হল প্রবৃত্তির অভিশাপ। কিন্তু বৃহতের প্রশাসনে প্রবৃত্তি রূপান্তরিত হয় উদ্দীপনায়। কর্মের কর্তা তখন অহং নয়, অন্তর্যামী।

অহন্তা আর কামনা—কর্মযোগের এই দুটি হল সবচাইতে বড় বাধা। অহং কর্ম করে ফলের আশায়। সে-ফল স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে পরার্থসিদ্ধিও হতে পারে, বাইরের লাভ হতে পারে অন্তরের লাভও হতে পারে। যা-ই হ'ক না কেন, সবক্ষেত্রে আসল কথাটা হল—আমি একটা-কিছু চাই, আমি কাঙাল। কাঙালীপনার একটা হীনতা আছে। কিন্তু আত্মশক্তির দম্ভে সেটা আমাদের নজরে পড়ে না। যা চাই তা যদি পাই, তাহলে কেনোপনিষদের দেবতাদের মত ভাবি, এ আমরাই বিজয়, আমারই মহিমা। যদি না পাই, তাহলে মুষড়ে পড়ি। হীনতাটা তখন প্রকট হয়ে পড়ে। তাই যে বুদ্ধিমান সে লাভালাভ বা সিদ্ধি-অসিদ্ধির ঊর্ধ্বে থাকতে চায়। সে জানে, কর্ম স্বভাবের নিয়ম, সুতরাং কর্ম তাকে করতেই হবে। কোন্ কর্মের কি ফল সম্ভাবিত তাও সে জানে, কেননা সে বোকা নয়। কর্মের কল্যাণময় আদর্শের প্রেরণাও সে অনুভব করে, প্রেরণা-অনুযায়ী কর্মও করে। এই পর্যন্ত হল প্রবৃত্তির অধিকার। কিন্তু বুদ্ধিমান বলেই তার পরের অধিকারটুকু আর সে দাবি করে না—কর্মের ফল সে চায় না। উদ্দিষ্ট ফল ফলতেও পারে, নাও ফলতে পারে। কিন্তু তাতে তার হর্ষও নাই, শোকও নাই। গীতায় একেই বলা হয়েছে 'নিষ্কাম কর্ম'।

কাজ করব কিন্তু ফল চাইব না—এই হল কর্মযোগীর আদর্শ। কথাটা বলতে সোজা, কিন্তু জীবনে তাকে ফলিয়ে তোলা সোজা নয়। ফল চাই না, কিন্তু কর্তব্যবোধে কাজ করছি, ব্যর্থতার আঘাতেও অটল থাকছি, প্রশান্ত আনন্দে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিচ্ছি—এসবই ভাল কথা, উঁচু অবস্থার কথা। কিন্তু এও চরম অনুভব নয়। সে-অনুভব আসে অন্তর্যামীর সঙ্গে সাযুজ্যের বোধ থেকে। গীতায় ভগবান বলেছেন, 'আমার করবার কিছুই

নাই, কিছু পাইনি বা পেতে হবে তাও নয়; তবুও আমি কাজ নিয়েই আছি।' তাঁর এ-কর্ম কোন-কিছুর তাগিদে বা তাড়নায় নয়। এ তাঁর অচলপ্রতিষ্ঠ অমৃত-চেতনার আত্ম-উৎসারণ। তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হলে কর্মযোগীর কর্মও হয় এমনিতর। কামবাসনার তখন রূপান্তর ঘটে সত্যসঙ্কল্পে। সে-সঙ্কল্প অসীমের, কর্মযোগী তার বাহনমাত্র। কর্মে তখন দায় থাকে না ভার থাকে না আঁকুপাঁকু থাকে না, অথচ তার মুক্তধারায় ছেদও থাকে না।

এই কর্মই মুক্তের কর্ম। সমত্ব তার লক্ষণ। অক্ষুব্ধস্থিরমানসত্বই হল সমত্ব—আকাশের মত। তারই মত সমত্ব হল চেতনার একটা সহজ প্রসন্ন উদার এবং অবিচল প্রতিষ্ঠা। হতাশায় অভিমানে বা ঔদাস্যেও একরকম সমত্ব আসে—এ কিন্তু তা নয়। ওগুলি হল আত্মনিগ্রহ, তার মূলে কাজ করছে সঙ্কীর্ণ অহন্তা। আর, এ-সমত্ব হল অনিবাধ আত্মবিস্ফারণ।

তিতিক্ষাও সত্যকার সমত্ব নয়, যদিও সাধনার প্রথম অবস্থায় তিতিক্ষা অপরিহার্য। আঘাত এল, প্রত্যাঘাত করলাম না, সয়ে গেলাম, কিন্তু সূক্ষ্ম একটা ক্ষোভ হয়তো থেকেই গেল—এটা তিতিক্ষার প্রথম স্তর। দেহ-প্রাণ-মনে ক্ষোভ এলেও তার অভিব্যক্তি হল না, আর অন্তর অবিক্ষুব্ধই রইল—এটা হল দ্বিতীয় স্তর। কিন্তু অক্ষোভও একটা নেতিবাচক অবস্থা। তারও গভীরে রয়েছে অন্তরাত্মার একটা পরিব্যাপ্ত প্রসন্নতা। যখন তাতে আমাদের স্থিতি হয়, তখনই সমত্বের শুরু। আকাশের মত স্থিতি নিত্যকালীন হওয়া চাই। প্রশান্ত এবং পরিব্যাপ্ত প্রসন্নতা যখন দেহ-প্রাণ-মনের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়, তখনই সমত্বের সিদ্ধি। তখন ঐ আকাশবৎ সমত্বের ভূমিকায় চিৎসূর্যের উদয় হয়, শুরু হয় আত্মবিকিরণ—বিশ্বব্যাপী প্রশান্তির বিকিরণ। এই হল সমত্বসাধনার সাধ্যাবধি।

প্রশ্ন হবে, এমনি করে প্রশান্তিতেই যদি ডুবে যাই, তাহলে কর্ম করা কি সম্ভব হবে? উত্তরে বলব, নিশ্চয় হবে। প্রথম হয়তো সম্ভব হবে না, কিন্তু তাকে সম্ভব করে তোলাই হল যোগসাধনার লক্ষ্য। প্রাকৃত-জীবনে আমরা কর্ম করি ক্ষুদ্র অহংএর তর্পণের জন্য। কর্মের প্রেরণা আসে বাসনা হতে, কিন্তু বাসনার উৎস কোথায় তা জানি না। সুতরাং বস্তুত আমরা কর্ম করি অন্ধ-প্রবৃত্তির তাড়নায়—যন্ত্রের মত। কর্মযোগের লক্ষ্য, এই অন্ধতা আর যান্ত্রিকতা হতে চেতনাকে মুক্ত করা। তার উপায় হল বিবেক দ্বারা কর্ম হতে কর্তাকে আলাদা করে নেওয়া, যার কথা আগেই বলেছি। বিবিক্ত পুরুষ সাক্ষী,, সুতরাং

কর্মপ্রেরণার উৎস তাঁর অগোচর নয়। আবার তিনি স্ব-তন্ত্র, সুতরাং সুখ-দুঃখরূপ কর্মফলের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে যান না। তাইতে অকর্তা থেকে নিষ্কামভাবে কর্ম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। এই হল কর্মযোগের একটা দিক, যা জ্ঞানের সঙ্গে অন্বিত। গীতা প্রথম এই আদর্শের কথা বলে তার পর বলছেন আরও গূঢ় একটা রহস্যের কথা। যোগস্থ হয়ে সমত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকে কর্ম করা—সে তো আছেই। তার চাইতেও গভীর কথা হল তাঁতে সমস্ত কর্ম সন্ন্যস্ত করে যজ্ঞার্থে কর্ম করা। এই যজ্ঞভাবনাতেই কর্মযোগের পরম সিদ্ধি।

সমত্ব, ফলত্যাগ, যজ্ঞার্থে কর্ম—এই তিনটি হল গীতোক্ত কর্মযোগের মূল কথা।

৪

যজ্ঞ ও যজ্ঞেশ্বর

মীমাংসক বলেন, দেবতার উদ্দেশে যে-দ্রব্যত্যাগ, তা-ই হল যজ্ঞ। দ্রব্যত্যাগ বস্তুত আত্মত্যাগ। জীবনের যজ্ঞবেদিতে অভীপ্সার আগুন জ্বালিয়ে দেবতার উদ্দেশে নিজেকে আহুতি দিই, তা-ই সত্যকার যজ্ঞ। দ্রব্যযজ্ঞের চাইতে জ্ঞানযজ্ঞ বড়—এ হল গীতার কথা।

যজ্ঞের দুটি রূপ—দেবযজ্ঞ আর মানুষযজ্ঞ। বৈদিক ঋষি বলেন, দেবযজ্ঞ বা পুরুষযজ্ঞই 'প্রথম ধর্ম' বা আদিম যজ্ঞ। পুরুষ নিজেকে আহুতি দিয়েছেন আগে, তবে এই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। তাঁরই আত্মাহুতির আদর্শে মানুষ যজ্ঞ করতে শিখেছে। যজ্ঞ তার চেতনার উত্তরায়ণের সাধন।

দেবযজ্ঞ অবতরণ, আর মানুষযজ্ঞ উত্তরণ। বিশ্বের জীবনে এই দুটি ছন্দ। দুটি ওতপ্রোত। গীতা বলেন, এ হল দেবতা এবং মানুষের অন্যোন্যসম্ভাবন।

যিনি বৃহৎ, তিনি অকৃপণ—নিজেকে না দিয়ে তিনি পারেন না। মা যেমন সন্তানের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দেন। 'তাইতে সন্তান তিলে-তিলে বড় হয়ে ওঠে।

কিন্তু বড় হতে গেলেই ছাড়তে হয়। ছাড়তে হয় নিজের ক্ষুদ্রতাকে অঙ্গীকার করতে হয় বৃহৎকে। ভূমাকে স্বীকার করে অল্পকে ছাড়া, অথবা বৃহতের মধ্যে আত্মাহুতি দেওয়া—এই হল মানুষযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ আর মানুষ-যজ্ঞ ওতপ্রোত। বিশ্বের সমস্ত সার্থক কর্ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই যজ্ঞভাবনার দ্বারা। বৃহতের আত্মত্যাগে সর্বত্র ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়ে উঠছে আত্মোৎসর্গের ফলে। দেবতা সর্বত্র। তাঁর দান এই জীবন। এ-জীবন আবার তাঁকেই ফিরিয়ে দিতে হবে—দিয়ে তাকে ভোগ করতে হবে 'ত্যক্তেন', তাঁর প্রসাদরূপে। তাতেই এই পার্থিব-জীবন দিব্য হবে। গীতা বলেন, তাঁর দান তাঁকে না দিয়ে যে ভোগ করে, সে চোর।

যজ্ঞের মূলে আত্মত্যাগ। আবার এই আত্মত্যাগই যথার্থ আত্মসম্পূর্তি। মানুষের সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় বৃহতের উদ্দেশে, বৃহৎকে দিয়ে নিজেকেই আমরা পাই বৃহৎ করে এবং সেই বৃহৎ চেতনার দ্বারা বৃহৎকে বুঝতে পারি।

তখন বৃহতের সঙ্গে আমার সাযুজ্য ঘটে। অনুভব করি—বৃহতে আমি, আমাতে বৃহৎ। এই সাযুজ্যবোধই প্রেম। প্রেমেই অদ্বৈতসিদ্ধি।

এই প্রেম সহজ। এতে যেমন বঞ্চনা নাই, তেমনি কৃচ্ছ্রতাও নাই। বৃহৎকে দিয়ে কখনও আমি বঞ্চিত হই না। আমার দান প্রতি মুহূর্তে প্রতিদানে সার্থক হয়ে ওঠে। দিয়ে যেখানে বুক ভরল না, সেখানে বুঝতে হবে—দেবতাকে দিইনি, দিয়েছি আমারই অন্ধতাকে বা কামনাকে। দিতে যেখানে বুকে বাজে, সেখানেও দান সার্থক হয়নি,—কেননা বৃহৎকে সেখানে আমি দেখতে পাইনি, তাই আমার অহংই আমার অকুণ্ঠ আত্মদানের বাদী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূর্যের আলোয় যেমন কমল ফোটে, বৃহতের ছোঁয়ায় তেমনি হৃদয় আপনা হতে বিকশিত হয়—আত্মদানে তখন কৃচ্ছ্রতা থাকে না। যাজ্ঞবল্ক্য তাই বলেছিলেন, 'পত্নীর জন্য পত্নী আমাদের কাছে প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই প্রিয় হয়।'

যজ্ঞভাবনার তাহলে দুটি দিক। প্রথমত, চেতনায় প্রতিনিয়ত এই ভাবটি জাগিয়ে রাখতে হবে : তিনি বৃহৎ, আত্মদান বা আত্মবিকিরণ বৃহতের ধর্ম, তাই প্রতি মুহূর্তে তিনি নিজেকে আমার মধ্যে ঢেলে দিচ্ছেন। তারপর, এই অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে মুহূর্তে-মুহূর্তে নিজেকে তাঁর মধ্যে ঢেলে দেওয়া। আগুনের শিখা যেমন প্রতি মুহূর্তে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়, তেমনি আমার প্রত্যেকটি কর্ম প্রত্যেকটি ভাবনা এখানকার সঙ্কীর্ণ বাসনার বাঁধন কাটিয়ে প্রতি মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে তাঁর মধ্যে। আমি যা কিছু করব, তা আত্মতর্পণের জন্য নয়—করব যজ্ঞেশ্বরের বিশ্বযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দেবার জন্য।

*

এমনি করে জীবন আর যজ্ঞ আমাদের কাছে এক হয়ে যাবে। তখনই গীতার ভাষায় যজ্ঞার্থে অবন্ধন কর্ম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। স্বার্থ-প্রণোদিত যে-কর্ম, তা চেতনাকে সঙ্কুচিত করে, তা আত্মাবমাননা মাত্র। গীতা তাকে বলেছেন, 'কেবল নিজের জন্য পাক করা।' পরার্থে যে কর্ম তা স্বার্থিক কর্মের চাইতে শ্রেষ্ঠ, তাতে চেতনার বিস্ফারণ ঘটে। গীতা তাকে বলেছেন, 'লোকসংগ্রহার্থ' কর্ম—যা সমাজস্থিতির কারণ। কিন্তু যজ্ঞার্থে কর্ম তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। সে-কর্মের উদ্দিষ্ট দেবতা শুধু মানুষ নয়—মানুষের মধ্যে যে-

লোকোত্তরের প্রকাশ, সর্বভূতের যিনি অন্তর্যামী, কর্মের ভিতর দিয়ে আমার আত্মাহুতি তাঁরই উদ্দেশে। এমনকি যা-কিছু আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—সেই খাওয়া শোওয়া বসা চলা নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত হবে তাঁর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অঙ্গীভূত। দেহের প্রাণের মনের এমন-কোনও কর্মই আমার থাকবে না যা তাঁর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হবে। 'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।'

এমনিতর যজ্ঞভাবনার তিনটি ফল। প্রথম ফল, কর্মে সেবাবুদ্ধির উদয়। ভালবেসে যে-কর্ম, তার নাম সেবা। আমি মূঢ়ের মত কর্ম করছি না বা উগ্র অহংবোধ নিয়ে কিছু করছি না; করছি তাঁকে ভালবেসে, তাঁর হয়ে তাঁরই তৃপ্তির জন্যে তাঁর কাজ করে যাচ্ছি। ঘটে-ঘটে দেখছি তাঁকেই, আর আমার অন্তরের সমস্ত মাধুরী ঢেলে দিয়ে মৃন্ময়ের মধ্যে সেই চিন্ময়ের সেবা করে চলেছি। এই কর্ম কর্মযোগে ভক্তির সিদ্ধি।

দ্বিতীয় ফল হল কর্মের মধ্যে জ্ঞানের সিদ্ধি। জীবনের প্রত্যেক কর্ম এমনকি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত যদি যজ্ঞাঙ্গ হয়, তাহলে তো একমুহূর্তও তাঁকে ভুলে থাকা চলে না। উপনিষৎ একে বলেছেন 'ধ্রুবা স্মৃতি'। আর এই ধ্রুবা-স্মৃতিই হল তাঁর সহজ বিজ্ঞান। আমার প্রত্যেকটি কর্ম যদি যজ্ঞভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহলে অচেতনভাবে কোনও কর্মের অনুষ্ঠান আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। এই সচেতনতার একটি প্রান্তে রয়েছে আমার সেবার আকূতি—আমার সব দিয়ে আমি তাঁর পূজা করতে চাই। আর তার আরেক প্রান্তে রয়েছে তাঁর নিত্যসামীপ্যের বোধ। যাঁর সেবা করব তিনি তো দূরে নন—এই যে তিনি অন্তরে, এই যে তিনি বাইরে। হৃদয়ের আতটপূর্ণ আকাশে তিনি, আবার বাইরের সর্বাবগাহী আকাশেও তিনি। সেই আকাশের মধ্যে রূপের মেলায় অন্তরের ভাবনার উপচারে তাঁর নিত্যপূজা। এই অবিক্ষুব্ধ জ্ঞান যজ্ঞার্থক কর্মের দ্বিতীয় ফল।

তৃতীয় ফল হল অহংবুদ্ধির বিলোপ। 'আমি কর্তা' এ-বুদ্ধি গিয়ে আসছে 'বিশ্বের কুরুক্ষেত্রে আমি তাঁর সব্যসাচী নিমিত্তমাত্র' এই পরম স্বস্তিময় বোধ। সঙ্কল্প ছাড়া কর্ম হয় না; কিন্তু আমার কোনও সঙ্কল্প কামসঙ্কল্প নয়—নিত্যযুক্ত চেতনায় তাঁরই সত্যসঙ্কল্পের অভিব্যক্তিমাত্র।

এমনি করে যজ্ঞার্থক কর্ম একদিকে ভক্তির সঙ্গে এবং আরেকদিকে জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্বের যজ্ঞবেদিতে আত্মোৎসর্গের দ্বারা তাঁরই সঙ্কল্পকে

জীবনে জয়যুক্ত করে, জীবন হয় কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গমতীর্থ।

*

যজ্ঞেশ্বরকে লাভ করাই হল যজ্ঞের লক্ষ্য। মরমীয়ার এ-উক্তিকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় তর্জমা করে বলতে পারি, আমরা এমনভাবে কর্ম করব যাতে চেতনার পরিপূর্ণ উন্মেষ ঘটে। যে-কর্ম চেতনার উৎকর্ষ ঘটায় না, তা বিকর্ম—তাতে শুধু শক্তির অপচয় এবং বৃথাই আয়ুক্ষয়।

চেতনার উৎকর্ষ ঘটে ব্রহ্মসাযুজ্যে বা বৃহতের নিত্যজাগ্রত বোধে—যে-বৃহৎ আমার সঙ্কীর্ণ অহন্তার ঊর্ধ্বে, যে-বৃহৎ বিশ্বের সমস্ত অহন্তার অধিষ্ঠান। যেমন আকাশ। আমার ক্ষুদ্র আধারকে পূর্ণ করে আকাশ ছড়িয়ে আছে অনন্তে, জড়িয়ে আছে সবাইকে। এই আকাশকে যদি পাই, তাহলে আমাকেও যেমন পরিপূর্ণরূপে পাই তেমনি সবাইকে পাই আমার মধ্যে। আত্ম-পরের প্রাচীর তখন ভেঙে যায়, জীবনের সকল অস্বস্তি আর ঝামেলার অবসান ঘটে। কুরুক্ষেত্র রূপান্তরিত হয় শ্রীক্ষেত্রে। চেতনার উৎকর্ষণের এই ফল। এ যদি না হয়, তাহলে কর্ম কখনও যজ্ঞ হয়ে ওঠে না।

এইজন্য কর্মের মূলে একটা অন্তরাবৃত্ত চেতনার অধিষ্ঠান থাকা চাই। সে-চেতনা হয় বিবিক্ত এবং সাক্ষী আত্মচেতনা, অথবা বিশ্বের আধার ব্রহ্ম-চেতনা। যোগী এবং অযোগীর কর্ম বাহ্যদৃষ্টিতে এক হতে পারে, কিন্তু এই অন্তশ্চেতনার দিক থেকে তাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত হয়ে যায়। একজন কাজ করে হুঁশে, আরেকজন করে বেহুঁশ হয়ে। একজনের কর্ম, আরেকজনের বিকর্ম।

এই অন্তশ্চেতনাই যজ্ঞেশ্বরের স্বরূপ। তিনি আমার এবং বিশ্বের অন্তর্যামী। তাঁকে হৃদয়ে রেখে কর্ম করে যেতে হবে, যাতে তাঁর অনন্তস্বরূপ আমার চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেই বোধের অগ্নিবীর্যে আমার সমস্ত আধারকে যোগাগ্নিময় করে তুলতে পারে।

তাঁর স্বরূপের চেতনা আমাদের মধ্যে তিনভাবে ফুটতে পারে। কিন্তু জানতে হবে সমস্ত অনুভবই হল নির্বিশেষ অনন্তের অনুভব—সমস্ত সীমার অতীত এক অসীমের অনুভব। নাম-রূপ আছে, থাক্; কিন্তু জানব, তা অনামা অরূপেরই বিভূতি। জেনে নাম-রূপের সঙ্গে কখনও জড়িয়ে যাব না।

আকাশে যেমন তারা ফোটে, তেমনি অনন্তের বুকে ফুটছে সান্তের মেলা। তারাকে যখন দেখছি, সেই সঙ্গে আকাশকে দেখছি—আকাশকে বাদ দিয়ে তারাকে দেখা অসম্ভব। প্রাকৃত-মনের দৃষ্টিতেও আনতে হবে এই সীমাহীন দর্শনের ঔদার্য। অসীমের প্রাতিভ-সংবিৎ (intuitive experience) আগে, তারপর সীমার সংবিৎ—এমনি করে প্রাকৃত-দৃষ্টির বিপর্যয় ঘটাতে হবে। তবেই ঘটে-ঘটে তাঁকে দেখতে পাব—সব দর্শনই হবে তাঁর দর্শন, সব স্পর্শই তাঁর স্পর্শ, সব বোধই তাঁর বোধ।

আত্মচৈতন্যকে ভিত্তি করে এই আনন্ত্যের বোধ আনতে হবে—এই তার এক রূপ। 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা' এই হল তার মন্ত্র। চৈতন্যের প্রত্যক্ষ অনুভব হয় আমাতেই বা আত্মাতেই। প্রাকৃত-ভূমিতে এই আত্মচৈতন্যের চারদিকে থাকে অহংএর বেড়া। আমি তখন আমাকেই একান্ত করে দেখি, অপরকে দেখতে পাই না বা চাই না। অথচ আমার মধ্যে প্রেম বা বৈরাগ্যের অঙ্কুরও থাকে, যা আমাকে 'আমি'র গণ্ডির বাইরে টেনে আনে। আমার সঙ্গে অপরের ভেদ তখন লুপ্ত হয়ে যায়, আমার আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ ঘটে। এই বিস্ফারণ যদি প্রশান্ত ও স্বচ্ছ হয়, অহমিকার লেশমাত্র যদি তাতে না থাকে, তাহলে আত্ম-চৈতন্যের এক নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকায় অনুভব হয়—আত্মাতেই বিশ্ব বা আত্মাই বিশ্ব, আমাতেই বিশ্ব বা আমিই বিশ্ব।[৬] সে-আমি অবশ্য প্রাকৃত সান্ত অহং নয়, সর্বোপাধিনির্মুক্ত এক অনন্ত 'শিবোঽহম্'।

এ-অনুভব প্রত্যক্-বৃত্ত (subjective), এবং অনেকের পক্ষে স্বাভাবিকও —বিশেষত জ্ঞানযোগীর পক্ষে। আবার আনন্ত্যের একটা পরাক্-বৃত্ত (objective) অনুভবও আছে। তখন তাঁকে দেখি প্রথম আমার মধ্যে নয়, বিশ্বের মধ্যে। বিশ্ব এক অনন্ত অমৃতজ্যোতির বিভূতি, রূপে রূপে তাঁরই প্রতিরূপ। আকাশের আলোঝলমল চেতনা তিনি—সবার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সব-কিছু ছেয়ে আছেন। যেমন আছেন বাইরে, তেমনি আছেন অন্তরে। অসীম সমুদ্রের বুকে যেমন তরঙ্গ ফেনা আর বুদ্‌বুদ, তেমনি তাঁর মধ্যে তাঁরই সত্তায় আমার সত্তার দোলা আমার প্রাণন আমার মনন। আমার সবটাই তিনি। 'আমার দেহ-দেহী সকল তুমি, তবে কি আর রইলাম আমি।' আমি কোথাও নাই, আমার আমিটুকুও তোমারই এক বিচিত্র তুমি, অরূপের অপরূপ রূপায়ণ।

আগের অনুভব যদি বলি পুরুষের, তাহলে এ-অনুভব প্রকৃতির। একটির মূলে যেমন জ্ঞানের সংস্কার, তেমনি আরেকটির মূলে ভক্তির। কিন্তু দুটি

অনুভব অন্যোন্যসংগত। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি—সত্তার দ্বিদলে তাঁর যুগনদ্ধ প্রকাশ।

অনুভবের এই বিভঙ্গকে ছাপিয়ে আনন্ত্যের আর-একটি সর্বনাশা অনুভব আছে, যাকে বলা চলে সব অনুভবের চূড়ান্ত। অনুভবের কোনও উপাধি যখন থাকে না, তখন তা পর্যবসিত হয় বিশুদ্ধ সত্তার অনুভূতিতে। সে-অনুভব গাঢ়তর হলে সত্তারও বিলয় হয় এক অনুপাখ্য (ineffable) অসত্তায়। 'পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে শেষপর্যন্ত আর কিছুই থাকে না।' রঙ্গমঞ্চ শূন্য হয়ে গেল যখন, তখন থাকল শুধু একটি দীপ—যার আলোয় অভিনয় চলছিল। শেষকালে ঐ দীপটিও নিবে গেল। কি থাকল? কিছুই না। এই হল শূন্য বা নির্বাণ—নেতিপ্রত্যয়ের চরম অনুভব। এর ঊর্ধ্বে আর কিছুই নাই। হয়তো এর পরে আর মানুষ ফিরে আসে না। 'শোনা যায়, কালাপানিতে গেলে আর জাহাজ ফেরে না।' যদি কেউ ফিরে আসে, তার কাছে জগৎটা হয় স্বপ্নবৎ। যে-চিত্তের আভাস তখনও থাকে, তার মধ্যে নামে এক হিমশৃঙ্গের শান্তির শৈত্য।

'সব আমি' 'সব তুমি' অথবা 'সব শূন্য'—এই তিনটি হল অনন্তের তিনটি বিভঙ্গ। চেতনার উজান বেয়ে তাঁর স্বরূপের পাই এই পরিচয়। এ-পরিচয় মৌল, তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মানতে হবে, এ তাঁর স্থাণুরূপ—এখন তা অতিষ্ঠাই (transcendent) হ'ক বা প্রতিষ্ঠাই (immanent) হ'ক। এতে তাঁকে পেলাম 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্'-রূপে। কিন্তু শিব তো অশক্ত নন, তিনি যে নিত্যশক্তিযুক্ত। শক্তিতে যেমন তিনি আপনাতে আপনি আছেন, তেমনি আবার অনন্ত সম্ভূতিতে (Becoming) বিচ্ছুরিত হচ্ছেন। বলতে পারি, একটা তাঁর স্বরূপ (transcendent) লক্ষণ, আরেকটা তটস্থ (instrumental) লক্ষণ। স্বরূপে জানলে মূলকে জানি, আর তটস্থ বিভূতি দিয়ে জানলে স্থূলকে জানি। কিন্তু সবই যখন তিনি, তখন মূলে আর স্থূলে স্বরূপে আর তটস্থে তো কোনও বিরোধ নাই। যদি মূলকে বাদ দিয়ে স্থূলকে জানি, তবে সেটা নিশ্চয় অবিদ্যা। কিন্তু স্থূলকে বাদ দিয়ে মূলকে জানাও তো অবিদ্যা। মূলকে জেনে তারই আলোকে যদি স্থূলকে জানি, তাহলে রিক্ততার পটভূমিতে ফোটে জ্ঞানের ঐশ্বর্য। আর সেই জানাতেই পাই তাঁর অখণ্ড স্বরূপের পরিচয়।

যজ্ঞেশ্বরকে যেমন জানতে হবে তাঁর স্বরূপে, তেমনি জানতে হবে তাঁর

সম্ভূতিতে। স্বরূপ যেমন অধিষ্ঠান, সম্ভূতি তেমনি অধিষ্ঠিত। অধিষ্ঠান যদি সত্য হয়, তাহলে অধিষ্ঠিতও সত্য। পরমার্থসৎ যেমন সত্য, তেমনি তাঁর প্রতিরূপ জগৎও সত্য, 'সন্মূলাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।' মিথ্যা হচ্ছে এই কথাটা না জানা। 'অদ্বৈতের অর্থ হল, শুধু একই আছে, দুই নাই'—এ হল তর্কবুদ্ধির বিচার। কিন্তু মরমীয়ার হৃদয় বলে, 'দুয়ে যেখানে এক হয়ে আছে, তাকে বলি অদ্বৈত।'

এই অদ্বৈতদৃষ্টি নিয়ে লোকোত্তরের ভূমিকায় লোকাতীতের পরিচয় নিতে হবে। তাহলেই যজ্ঞেশ্বরকে পুরাপুরি জানতে পারব। তখন দেখব, উজান-পথে চলতে গিয়ে প্রথম একটা দ্বৈতভাবের সৃষ্টি হচ্ছে, আর যুগলের একটিকে বাদ দিয়ে আমরা অদ্বৈত-প্রতিষ্ঠা করছি। কিন্তু ভাটিয়ে এসে দেখছি, দুয়ে মিলে আবার এক হয়ে যাচ্ছে।

যজ্ঞেশ্বরের স্বরূপের পরিচয় নিতে গিয়ে দেখেছিলাম, কারও অনুভবে তিনি সৎ কারও-বা অনুভবে অসৎ। বলতে পারি, তাঁর সৎ-স্বরূপেরও আবার তিনটি বিভঙ্গ—তিনি ব্রহ্ম, তিনি পুরুষ, তিনি ঈশ্বর। তিনটি বিভঙ্গই শক্তিযুক্ত অতএব যুগনদ্ধ। এই যুগনদ্ধ বিভঙ্গের সংজ্ঞা হল—ব্রহ্ম-মায়া, পুরুষ-প্রকৃতি, ঈশ্বর-শক্তি। প্রথম দৃষ্টিতে আমরা শক্তিকে ছেড়ে শক্তিমানের উপর জোর দিই বেশী—কেননা প্রাকৃত-ভূমিতে আমরা জড়িয়ে আছি শক্তির জালে, তার বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়াই হয় আমাদের পুরুষার্থ। কিন্তু মুক্ত-চেতনায় শক্তির যথার্থরূপ যখন ফুটে ওঠে, তখন দেখি শক্তি-শক্তিমান অভেদ। দ্বৈতের দ্বিধা হতে উত্তীর্ণ হয়ে তখন আমরা প্রতিষ্ঠিত হই সত্যকার অদ্বৈত-বোধে।

একটি যুগনদ্ধ বিভঙ্গ হল ব্রহ্ম-মায়া। ব্রহ্মের পরিচয় হল তিনি অনন্ত সত্তা—যা এখানকার সব-কিছুর অধিষ্ঠান; তিনি অনন্ত চৈতন্য—এখানকার সান্তচৈতন্য যার ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া; তিনি অনন্ত আনন্দ—এখানকার সুখ যার স্ফুলিঙ্গমাত্র। অসীম দেশে এবং শাশ্বত কালে তাঁর বৃহৎ বিস্তার। তাঁর ভাবনায় এক অখণ্ড অসীম শাশ্বত সংবিতের উদয় হয়। এই সংবিৎসিদ্ধিই আমাদের পুরুষার্থ।

এই সংবিৎ প্রথম জাগে ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ ব্রহ্মকে বোধ হয় যেন জগৎ-ছাড়া। ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ, আর জগতে চেতনা ও আনন্দের প্রকাশ অনিত্য আচ্ছন্ন এবং বিড়ম্বিত। ধ্যানের গভীরে যে-সত্যকে প্রত্যক্ষ করি, জাগ্রৎ

ব্যবহারে তার দেখা পাই না। বাধ্য হয়ে তখন সত্যতার তারতম্য স্বীকার করতে হয়। বলি, ব্রহ্মের সত্যতা পরমার্থিক, আর জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা আপেক্ষিক। ব্রহ্মই জগৎকারণ, কিন্তু কারণের সঙ্গে কার্যের চেহারার মিল নাই। কেন এমন হয় তা বুঝতে পারি না, বলি মায়ার খেলা। ব্রহ্মের বোধ বিদ্যা, আর জগতের বোধ অবিদ্যা। বিদ্যা আর অবিদ্যা যেন আলো আর আঁধারের মত—দুয়ে নিত্য বিরোধ। আমি আঁধারে থাকতে চাই না, চাই আলো।

বিদ্যা আর অবিদ্যার বিরোধ আমরা আলো-আঁধারের উপমা দিয়ে বুঝতে চাই। কিন্তু কথাটা তাতে পরিষ্কার হয় না। এখানে আলো আর ওখানে আঁধার—এইভাবে যদি দেখি, তাহলে দুয়ে বিরোধ আছে মানতেই হবে। কিন্তু এ হল বস্তুস্থিতির দিক হতে বিচার করা। আবার, যেমন স্থিতি আছে, তেমনি গতিও তো আছে—যেখানে দেখি শক্তির প্রকাশ। শেষরাত্রে দেখি, অন্ধকার ক্রমে তরল হয়ে আলো ফুটছে। তখন দুয়ের বিরোধের চেহারা আরেকরকম হয়ে দেখা দেয়। যদি আলোর শক্তিকে বিশ্বাস করি, অন্ধকারকে আর ডরাই না।

তবুও পৃথিবীতে যতদিন থাকি, দিন-রাতের আবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে আলো-আঁধারের একটা পর্যায় থেকেই যায়। কিন্তু একবার যদি সূর্যে যেতে পারি, তাহলে এই পর্যায়ের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হয়। ব্রহ্মের মায়াতে যে ছায়া-তপের লীলা, তার ছায়ার দিকটাকে বড় করে দেখা তাই ঠিক নয়। আমার ইষ্টার্থের (value) বোধ বলছে, ছায়ার সত্যের চাইতে আতপের সত্যই বড়। বড় সত্য দিয়ে ছোট সত্যকে বিচার করতে পারলেই বিচার পরমপুরুষার্থের অনুকূল অতএব যথার্থ হয়। তাই অবিদ্যাকে বুঝতে চাইব বিদ্যা দিয়ে, তাহলেই তার রহস্য বুঝতে পারব এবং বিদ্যা আর অবিদ্যার বিরোধও তখন মিটে যাবে। ব্রহ্মের মায়াশক্তিকে তখন বলব বিদ্যারই শক্তি। অবিদ্যা তার কুক্ষিগত এবং বিদ্যার প্রশাসনেই তার গতি নিয়ন্ত্রিত। এ যখন বুঝতে পারি, তখন অবিদ্যা হতে শুধু উত্তীর্ণ হই না, তাকে বিদ্যার অনুকূলে ব্যবহারও করতে পারি। আগেরটা বিদ্যার মুক্তি, আর পরেরটা বিদ্যার সিদ্ধি। জ্ঞানের স্ফুরণে মুক্তি, আর শক্তির স্ফুরণে সিদ্ধি। জ্ঞান আর শক্তি, ব্রহ্ম আর মায়া যুগনদ্ধ অদ্বয়সত্তা।

ব্রহ্ম আর মায়ার মত আর-একটি বিভঙ্গ হচ্ছে পুরুষ আর প্রকৃতি। এখানেও প্রথমে সাধকের মধ্যে দেখা দেয় একটা দৃষ্টির দ্বৈত, তার অনুভূতি গভীরতর হলে তা পর্যবসিত হয় অদ্বৈতভাবনায়। ব্রহ্মের বোধ আসে

চেতনাকে আকাশের মত ছড়িয়ে দিয়ে; আর পুরুষের বোধ আসে তাকে নক্ষত্রের মত গুটিয়ে নিয়ে। প্রথমটি চরমে এনে দেয় মহতোমহীয়ানের বোধ, দ্বিতীয়টি অণোরণীয়ানের। ব্রহ্মের আত্মশক্তি যেমন মায়া, তেমনি পুরুষের আত্মশক্তি প্রকৃতি। মায়ার খেলা বিশ্বে, আর প্রকৃতির খেলা ব্যক্তিতে। অবশ্য দুয়ের মাঝে একটা ওতপ্রোত সম্বন্ধ আছে, কেননা ব্যক্তি আর বিশ্ব অন্যোন্যনির্ভর।

যদি আত্মভাবনা দিয়ে সাধনা শুরু করি, তাহলে প্রথমেই দেখি আমার সঙ্গে বা পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিরোধ। আমারই প্রকৃতি, অথচ সে আমার বশে নয়। আমার দেহ অসাড়, প্রাণ অতৃপ্ত, ইন্দ্রিয় দুর্বার, মন চঞ্চল—এ-ঝামেলার যেন আর অন্ত নাই। অথচ আমি চাইছি আমারই মধ্যে এমন-একটা কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে প্রতিষ্ঠিত থেকে এই নৈরাজ্যকে স্বারাজ্যে রূপান্তরিত করতে পারি। প্রথমেই লক্ষ্য করি, কোনও ক্রিয়াকে বশে আনতে হলে তার ঊর্ধ্বে থাকতে হয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে গেলে চলে না। চাকার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে, সে চালক হতে পারে না—সে চাকার খেয়ালে চলে, চাকা তার ইচ্ছায় চলে না। তাই প্রকৃতি-প্রশাসনের প্রথম উপায় হল প্রকৃতি থেকে তফাত থাকা। তাকে বলে বিবেক। প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক হল সাংখ্যসাধনা বা আত্মযোগের গোড়ার কথা।

বিবেকের শক্তি চলে নিরোধের দিকে, নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার দিকে। প্রথমটায় প্রকৃতিকে বাগ মানাতে গিয়ে তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে হয়। প্রকৃতি যা বলবে তা-ই করব, তা হবে না; তার প্রত্যেকটা প্ররোচনায় আমি যন্ত্রের মত সায় দেব না। রাস টেনে তার উদ্দাম গতিকে আমি সংযত করব। সংযম বিবেক-সাধনার ভিত্তি।

সংযমে নিজের শক্তি বাড়ে, নিজের উপর বিশ্বাস আসে। সঙ্গে-সঙ্গে আসে একটা প্রসন্নতা। এই প্রসন্ন এবং সমর্থ আত্মপ্রত্যয় দিয়ে প্রথম নিজেকে পুরুষ বলে চিনতে পারি। সত্যকার পুরুষের কাছে প্রকৃতিও যেন অন্যরকম হয়ে যায়, আগের মত অতটা খামখেয়ালি তার থাকে না। তবুও সংস্কার একেবারে যায় না। পৃথিবীর উপরটা ঠাণ্ডা, কিন্তু ভিতরে তার তাপ আছে। মাঝে-মাঝে অগ্ন্যুৎপাতে আর ভূমিকম্পে তা প্রকাশ পায়। তবে আত্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষকে তা বিচলিত করে না।

এই প্রথম তিনি অনুভব করেন, প্রকৃতির ক্রিয়াগুলি যান্ত্রিক। দুনিয়া জুড়ে

এই যন্ত্রের ক্রিয়া চলছে। তিনি তাতে যোগ দিতেও পারেন, না দিতেও পারেন। না দিলেই বেশ লাগে। তিনি উপশান্ত, উপদ্রষ্টা—সাক্ষী থেকে প্রকৃতির খেলা দেখে যাচ্ছেন। দুনিয়াতে তার নানারকম বেয়াড়াপনা চলছে, হয়তো চলবেই। তা চলুক। কিন্তু তাঁর ভিতরটা প্রশান্ত। তিনি আপনাতে আপনি আছেন—তিনি একা, তিনি নিঃসঙ্গ। সাংখ্যযোগের ভাষায় এ হল পুরুষের স্বরূপস্থিতি বা কৈবল্য। প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ বা বিবেকটা এমনি করে চরমে পৌঁছয়।

কিন্তু অনুভবের এই চরম নয়। যাথেকে বিবিক্ত বা তফাত হয়েছি, সে হল অপরা-প্রকৃতি। অপরা-প্রকৃতিও চিৎশক্তি—কিন্তু চেতনা সেখানে মূঢ় এবং চঞ্চল। যেমন চিমনি-ছাড়া লণ্ঠনের আলো। আলোর শিখা তখন ধূমল আর চঞ্চল। কিন্তু লণ্ঠনে চিমনি পরিয়ে দিলে সেই শিখাই অধূমক স্থির জ্যোতি নিয়ে জ্বলতে থাকে। স্বরূপস্থিত কেবল পুরুষের চেতনাও তা-ই। তারও আলো আছে, তাপ আছে। এই তাঁর আত্মপ্রকৃতির বা আত্মশক্তির রূপ। একে বলতে পারি পরা-প্রকৃতি। অপরা-প্রকৃতিই সংহত ও বিশুদ্ধ হয়ে পরা-প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, আত্মজ্যোতির অচঞ্চল অধূমক শিখা হয়ে জ্বলছে পুরুষের হৃদয়ে। প্রকৃতি পুরুষকে ছেড়ে যায়নি, আরও নিবিড় হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। সতী হয়েছে শিবের নিত্যসঙ্গতা। আবার দেখছি, পুরুষ আর প্রকৃতি এক যুগনদ্ধ অদ্বয়সত্তা। এখানেও আগে অপরা-প্রকৃতি হতে মুক্তি, তারপর পরা-প্রকৃতির সিদ্ধি ঐশ্বর্য বা বিভূতি। আলো আর তাপের বিকিরণ তখনও চলছে এবং আরও সুষম স্বাচ্ছন্দ্যে চলছে।

আরেকটি যুগনদ্ধ বিভঙ্গ হল ঈশ্বর-শক্তি। আগের দুটি মিথুন হতে এটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে গোড়াতেই দুয়ের সম্পর্ক মেলামেশার—ছাড়াছাড়ির নয়। বেদান্তের মায়াবাদে আর সাংখ্যের প্রকৃতিবাদে মায়া এবং প্রকৃতি যথাক্রমে ব্রহ্ম এবং পুরুষের বিরোধী তত্ত্ব। কিন্তু তন্ত্রের শক্তিবাদে এই বিরোধের ছায়া পড়েনি। শক্তিমান আর শক্তি অভেদ—এই সিদ্ধান্ত তন্ত্রের ভিত্তি। উপমা দেওয়া হয়, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। কল্পনায় দুটিকে আলাদা-আলাদা করে ভাবতে পারি, কিন্তু বাস্তবে পৃথক করতে পারি না। যেখানে শিব সেখানেই শক্তি, যেখানে শক্তি সেখানেই শিব—এটা যে একটা সহজ অনুভবের কথা। ভালবাসায় স্ত্রী-পুরুষ এক হয়ে যায়। বিচার করলে দেখি, দুটি আলাদা-আলাদা তত্ত্ব, দুয়ে গরমিল কত বেশী। কিন্তু সংসার চলছে দুয়ের গরমিলকে বড় করে নয়, যেখানে দুটিতে এক হয়েছে সেই সামরস্যকে

মুখ্য করে। দুটিতে যেখানে এক হয়েছে, সেখানে তারা পরস্পরের পরিপূরক—যেন গভীরের এক অদ্বয়সত্তারই দুটি বিভঙ্গ, একটিকে ছেড়ে আরেকটির কোনও অর্থ হয় না। যেমন দেহ আর আত্মা। দুটিতে মিলে এক অখণ্ড সত্তা। আত্মার প্রকাশ দেহে, দেহের আশ্রয় আত্মায়। এই অন্যোন্যভাব (mutuality) যতক্ষণ বজায় আছে, ততক্ষণই জীবন। আর জীবনের অনুভব হল সকল অনুভবের সার। মরণের অনুভব যদি এই জীবনেই ফোটে, তবেই নেতিবাদেরও সার্থকতা। অনুভবমাত্রেই জীবনধর্মী। অনুভব শিব, জীবন শক্তি; অথবা অনুভব বিষ্ণু, জীবন শ্রী। দুটিকে কি আলাদা করা যায়? থাকলে দুটিই আছে, না থাকলে কোনটিই নাই। যখন কিছুই থাকে না, তখনকার কথা ভাবছি এখানেই বসে—এটা একটা বস্তুশূন্য বিকল্প (unreal mental construction), কিনা মনের মায়া। ঈশ্বর-শক্তির এই যুগনদ্ধ তত্ত্ব ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনাকে আবিষ্ট করে আছে যুগ-যুগ ধরে, কেননা এ হল সহজবুদ্ধির কথা। মায়াকে যেই সে মা বলেছে, অমনি তার সঙ্গে তার সকল বিরোধের অবসান হয়েছে। মা-ই বেঁধেছেন, আবার মা-ই বাঁধন খুলে দেবেন—কেননা মা কল্যাণময়ী। বাবাকে চিনিয়ে দেবেন মা-ই, কেননা কেবল তিনিই তাঁকে চেনেন তাঁর হৃদয়েশ্বরী হয়ে। আমি শুধু মাকে জানি তাঁর হৃদয়ের সুধাসমুদ্রে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে। যক্ষ কে, তা অগ্নি জানতে পারলেন না, বায়ু পারলেন না, ইন্দ্রও না। অকস্মাৎ আকাশে ফুটে উঠল হৈমবতী উমার রূপ। তিনি জানিয়ে দিলেন, যক্ষ এই। এগুলি আপামরসাধারণ সহজ অনুভবের কথা, ভারতবর্ষের প্রাণের কথা।

তবে এই যুগনদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যেও একটা দ্বিধার চিড় কখনও-কখনও দেখা দেয়। একসময় হয়তো মনে হয় শিব বড়, আরেকসময় শক্তি বড়। কিন্তু এ-দ্বিধা স্থায়ী হয় না। সত্য বলতে, বেদান্তের ব্রহ্মবাদ আর সাংখ্যের পুরুষ-বাদের সার্থক পর্যবসান তন্ত্রের এই শক্ত্যা-লিঙ্গিতবিগ্রহ-মহেশ্বরবাদে।

তারপর আরও একটি যুগ্মসত্তা আছে—শূন্যতা আর বিগ্রহের দ্বিদল। পরমতত্ত্বকে যদি বলি ব্রহ্ম পুরুষ ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, তাহলে তার সৎ-রূপের পরিচয় দিই। কিন্তু সৎএরও উজানে আছে অসৎ, এমন-একটা ভূমি আছে যেখানে কিছুই নাই। এই নাস্তিত্বের নানা নাম—অসৎ, শূন্য, অসম্ভূতি, অব্যাকৃত ইত্যাদি। আর তার অনুভবের নাম নির্বাণ। নির্বাণ লোকোত্তর।

কিন্তু লোকোত্তরের উল্টাপিঠেই আবার লোক। লোকোত্তরে কিছুই নাই, আবার লোকে-লোকে আছে সবই। এই সবকে জড়িয়ে নিয়ে বলতে পারি 'এক'

—এক ব্রহ্ম, এক পরমাত্মা অথবা এক ঈশ্বর। ওই একের মধ্যে আবার পুঞ্জিত হয়ে আছে 'বহু'—একটা মৌচাকে অনেকগুলি ঘরের মত, একই দেহে বহু কোষের মত। প্রত্যেকটি কোষ একটি ব্যক্তি, যেন একটি পুরুষ। আবার সব ব্যক্তি জড়িয়ে এক 'মহা ব্যক্তি', উপনিষদের ভাষায় 'পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণম্'। আবার আদিত্যের ওপারে মহাশূন্য। শূন্য—এক—বহু। শূন্য নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal); ব্যক্তিভাবনা (Personality) আছে একে আর বহুতে। এক আর বহুর মাঝে শক্তিকে নিয়ে আছে দুয়ের খেলা বা মিথুনের লীলা, যার কথা আগেই বলেছি। তাহলে পরমার্থতত্ত্বের রূপায়ণের একটা ছক দাঁড়ায় : অবচন—একবচন—দ্বিবচন—বহুবচন। যেখানে বহুবচন, সেখানে ব্যক্তির বিগ্রহ; যেখানে অবচন, সেখানে ব্যক্তিও নাই বিগ্রহও নাই। আর মাঝ-খানটায় বিগ্রহ না থাকলেও ব্যক্তি আছে।

এখন প্রশ্ন হবে, অবিগ্রহে আর বিগ্রহে, নৈর্ব্যক্তিকতায় আর ব্যক্তিভাবনায় কি বিরোধ আছে? আপাতত মনে হয় আছে। কিন্তু আসলে তা নাই। বিগ্রহ থেকে অবিগ্রহের দিকে যখন যাই তখন দুয়ে বিরোধ দেখি—অবিগ্রহ তখন বিগ্রহের প্রতিষেধ। এটা হল প্রলয়ের দিক। কিন্তু অবিগ্রহে গিয়ে দেখি, বিগ্রহের সে-ই উৎস। কবির ভাষায় 'এঁকে-বেঁকে আকার এঁকে চলছে নিরাকার।' মরমীয়া বলছেন : প্রথম হ্রস্ব-ই দিয়ে বানান করলাম 'নিরাকার'; তারপর দীর্ঘ-ঈ দিয়ে করলাম 'নীরাকার'; এখন আবার দেখছি 'নরাকার'। সব বানানই ঠিক।

অরূপ রূপ ধরছেন, তার নাম সৃষ্টি। যেমন আগুন থেকে ঠিকরে পড়ছে ফুলকি, আকাশের নিকষকালো ফুটছে তারার চুমকি হয়ে। অসীম সীমার বাঁধন পরলেন বিগ্রহে। মনে হয়, যেন খাটো হয়ে গেলেন। কিন্তু সত্যি কি তা-ই? খাটো হলেন, না ঘন হলেন? অসীমের শক্তি পরমাণুতে সংহত হল। শক্তি সেখানে নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু তার বিস্ফোরণ কী প্রচণ্ড, তা বুঝতে পারি পরমাণুকে ভাঙলে।

বিগ্রহে শক্তি ঘনীভূত হচ্ছে—এই হল সৃষ্টির রহস্য। ঘনীভূত শক্তির মুক্তিই হল পুরুষার্থ। শিব শক্তিকে নিগৃহীত করে জীববিগ্রহ হয়েছেন। শক্তি যখন মুক্তি পেল, তখন জীব আবার হলেন শিব। কিন্তু শিব হতে গিয়ে কি হাওয়া হয়ে গেলেন? তা নয়। জীববিগ্রহই হল শিববিগ্রহ—'কেবলম্', অথচ 'জ্ঞানমূর্তিম্'। এই হওয়াই তো স্বাভাবিক, কেননা সবই যে শিব—শক্তিও, জীবও, বিগ্রহও।

উজানপথে চলছি যখন, তখন তাঁকে বলছি 'অকায়ম্ অব্রণম্'। আবার ভাটার মুখে দাঁড়িয়ে প্রথম বলছি 'স্বয়ম্ভূঃ পরিভূঃ'; আরও ভাটিয়ে এসে বলছি 'সর্বদেবময়ঃ'; আবার শেষে এই পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে বলছি, এই যে তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখছি, তুমি 'মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ'—এসেছ অবতার হয়ে, গুরু হয়ে, মনের মানুষ হয়ে। যদি না আসতে, আমার জগৎ মিথ্যা হয়ে যেত, আমার অস্তিত্বের কোনও তাৎপর্যই থাকত না। এ-জীবনের ভার তাহলে বইতাম কি করে?

অবিগ্রহের বিগ্রহ হওয়া—এ তর্কের কথা নয়, গাঢ়তম অনুভূতির কথা, যে-অনুভূতিতে আধারের রূপান্তর ঘটে, মৃন্ময় বিগ্রহ চিন্ময় হয়।

*

এই হল তাহলে যজ্ঞেশ্বরের পরিচয়। দেখলাম তিনি চতুষ্পাৎ। তিনি ব্রহ্ম-মায়া, পুরুষ-প্রকৃতি, ঈশ্বর-শক্তি, অবিগ্রহ-সবিগ্রহ। তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দঘন-বিগ্রহ পুরুষোত্তম। তিনি নিত্যশক্তিযুক্ত। আমার যজ্ঞ-তপস্যার তিনিই ভোক্তা।

যজ্ঞেশ্বরকে পাওয়াই হল জীবনযজ্ঞের লক্ষ্য। তাঁকে পেতে চাই পূর্ণরূপে—কিছু বাদসাদ দিয়ে পাওয়া নয়, একেবারে চার-পো পাওয়া, তাঁতে মিশে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে তাঁকে পাওয়া।

তার তিনটি ধাপ। প্রথম তাঁর স্বরূপসত্তার সঙ্গে এক হয়ে তাঁকে পাওয়া। এই হল জ্ঞানযোগীর সাধ্য—ফল অবিদ্যা হতে মুক্তি। তারপর তাঁতে নিত্যস্থিতির দ্বারা তাঁর স্বরূপানন্দের আস্বাদন। এই হল ভক্তিযোগের সাধ্য—ফল ভুক্তি। আর অবশেষে তাঁর স্বরূপশক্তিতে অবগাহন করে আত্মপ্রকৃতির রূপান্তর দ্বারা তাঁর সাধর্ম্যলাভ করা। এই হল কর্মযোগীর পরম পুরুষার্থ—ফল শক্তি। মুক্তি ভুক্তি আর শক্তি—এই তিনটিই পূর্ণযোগীর অখণ্ড সাধ্য। তাঁকে পাই, তাঁতে থাকি, থেকে তাঁরই কাজ করি—এতেই জীবনের পূর্ণতা। নিত্যযুক্ত থেকে দিব্যকর্মের যে-সাধনা, তা-ই আধারের রূপান্তরকে ক্ষিপ্র এবং সহজ করে। এই হল কর্মযোগের উত্তম রহস্য।

সব সাধনাই প্রথমটায় হল উজিয়ে যাওয়া, তারপর এখানে ভাটিয়ে আসা। ওখানে যা পেলাম, তাকে যদি এখানে প্রতিষ্ঠা না করতে পারি, তাহলে বুঝতে

হবে পাওয়া সম্পূর্ণ হয়নি। ওখানকার ভাব এখানে ধরে রাখা কঠিন। অথচ তাতেই শক্তির পরিচয়। আর শক্তি ছাড়া মুক্তি বা ভুক্তির সাধনা কোনটাই সার্থক হয় না।

ধৈর্য ধরে সাধনা করে যেতে হবে দীর্ঘদিন ধরে—'অনির্বিণ্ণেন চেতসা'। মনমরা ভাব যেন কিছুতেই না আসে। আর চাই আন্তরিকতা। আমার বাইরের আমিটা একটা নকল আমি। আসল আমি রয়েছে অন্তরের গভীরে—সে কেবল তাঁকেই চায়, আর কাউকে নয়। তার বোধকে যত স্পষ্ট করে তুলতে পারব, ততই সাধনা সহজ হবে।

এখন উৎকর্ণ হয়ে আছি, কখন বাঁশি বাজবে। চারদিকে কোলাহল, কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। একটু যদি নিজের মধ্যে থিতিয়ে যেতে পারি, তখন শুনি বাঁশী তো বাজছেই, চিরকাল ধরেই যে বাজছে। আমার চাওয়া ফোটবার আগেই যে তিনি আমায় চেয়ে রয়েছেন।

তাঁর এই স্বয়ংবরণকে যখন বুঝতে পারি, তখন সাধনা অভয় হয়, অনায়াস হয়।

৫

যজ্ঞভাবনার উদয়ন (ক)

প্রজ্ঞার কর্ম—চৈত্যপুরুষ

সমস্ত জীবনই একটা সাধনা। কিসের সাধনা? না আত্মাহুতির। আত্মাহুতিরই নাম যজ্ঞ। এই যজ্ঞের ভোক্তা সেই যজ্ঞেশ্বর, যাঁর কথা আগের অধ্যায়ে বলেছি।

কর্মযোগ জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ—সবারই মূলে রয়েছে যজ্ঞভাবনা। যজ্ঞভাবনা হল অন্তর্যাগ, যার অনুষ্ঠানে এক মুহূর্ত ফাঁক থাকে না। বহির্যাগ ছিল তারই প্রতিরূপ।

বহির্যাগে যজ্ঞবেদিতে আগুন জ্বালানো হত। সেই আগুনে দেবতার উদ্দেশে হোমদ্রব্য আহুতি দেওয়া হত। হোমদ্রব্যগুলিকে মনে করা হত যজমানের প্রতিনিধি। সুতরাং হবির আহুতি ছিল বস্তুত যজমানেরই আত্মাহুতি। আগুনের ছোঁয়ায় হোমদ্রব্য আগুন হয়ে উঠত। তার শিখা দ্যুলোকের দিকে উদ্যত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেত। মনে করা হত, মর্ত্য যজমান এমনি করে দ্যুলোকের দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে অমৃত হয়ে গেল।

বহির্যাগের তাৎপর্য সুস্পষ্ট। এই হৃদয়ই যজ্ঞবেদি। তাতে জ্বলছে অভীপ্সার আগুন। সে-আগুনও এসেছে দ্যুলোক হতে। সাধনশাস্ত্রের ভাষায় তাকে বলি দেবতার প্রসাদ বা শক্তিপাত। কোন-এক শুভলগ্নে তাঁর প্রেমের আগুন আমাকে স্পর্শ করল। আমি চমকে উঠলাম—দেবতা আমায় চান। 'দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি'—আমার শিরায়-শিরায় আগুনের স্রোত বইয়ে দিলেন যিনি, তিনি আজ পিপাসিত। আমার সব দিয়ে তাঁর পিপাসা মেটাতে হবে যে। শুরু হল উৎসর্গের তপস্যা। যা তাঁকে দিই, তা-ই আগুন হয়ে ওঠে। জড় চিন্ময় হয়। চেতনা ছড়িয়ে পড়ে ভূলোকে অন্তরিক্ষে দ্যুলোকে। বৃহতের সাযুজ্যে অগ্নিপিপাসার তর্পণ হয়। তারপর সপ্তসিন্ধুর মুক্তধারা নেমে

আসে জীবনের নাড়ীতে-নাড়ীতে। সাযুজ্য জাগায় সাধর্ম্যের বীর্য। তাইতে যজ্ঞভাবনার চরম উদয়ন, পরম সার্থকতা। সন্ধাভাষায় তার উল্লাস ছড়ানো আছে বেদের মধ্যে।

প্রশ্ন জাগে, এমনি করে যে-জীবনে আগুন জ্বলল, তাকে কি আর এই প্রাকৃত-জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যাবে? জবাবে কেউ বলেন বিচ্ছেদের কথা, কেউ-বা রফার কথা। কেউ বলেন, আগুন জ্বলুক অন্তরে, কিন্তু বাইরের জীবন যেমন চলছে তেমনি চলুক। তবে অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে প্রাকৃতজীবন যে মিশ খায় না, এবিষয়ে সবাই একমত। আধুনিক বেদান্তে সিদ্ধান্তটাকে দার্শনিক রূপ দেওয়া হয়েছে জ্ঞান-কর্মের অসমুচ্চয়বাদে : জ্ঞান আর কর্ম আলো আর আঁধারের মত, দুটির একসঙ্গে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। সমুচ্চয়বাদীরা কিন্তু এতদূর যান না। তাঁরা বলেন অর্চনা বা উপাসনার আকারে কর্ম থাকবে বই কি, কিন্তু এছাড়া আর-সব কর্মকে জানতে হবে হেয়। এক গীতাই বলছেন, কোনও কর্মই হেয় নয়, স্বধর্ম অনুসারে সব কর্মই করে যেতে হবে; আর স্বকর্ম দিয়ে যে তাঁর অর্চনা, তাইতে মানুষের সিদ্ধি। পূর্ণযোগের সিদ্ধান্ত অবশ্য গীতার সিদ্ধাতের অনুকূল। অধিকন্তু পূর্ণযোগী ভাবছেন চেতনার রূপান্তরের সঙ্গে-সঙ্গে কর্মের রীতিরও রূপান্তরের কথা। অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ না জন্মিয়ে তার সংগে কাঁধ মিলিয়ে বিজ্ঞানীকে এখনও বহুদিন পর্যন্ত কাজ করে যেতে হলেও একদিন যে দিব্য-ভাবনার প্রেরণায় কর্মের রীতিও আগাগোড়া পালটে যাবে—এ-নিশ্চয়তাকে স্বীকার না করে তিনি পারেন না।

চিন্ময়-ভাবনার দ্বারা কর্মরীতির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটানোর পক্ষে আমাদের সংস্কারের বাধাও কম নয়। অনেকসময় ধর্মাচরণকেই আমরা মনে করি আধ্যাত্মিকতা। এটা যে ভুল, তা বলাই বাহুল্য। সাধনার প্রথম অবস্থায় লোকধর্মের অনুবর্তন কিছুদিন পর্যন্ত প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু সে যদি বোঝা হয়ে সাধকের ঘাড়ে চেপে থাকে, তাহলেই বিপদ। যথার্থ আধ্যাত্মিকতায় চেতনার মুক্তি ঘটে; কোনও বিধি-নিষেধ দিয়ে তাকে সঙ্কুচিত করা চলে না। এইজন্য নীতির শাসনও আধ্যাত্মিকতার বেলায় শেষপর্যন্ত অচল। ধর্ম হ'ক, নীতি হ'ক—সবই মানুষের মনগড়া। মনের শাসন কখনও দিব্য প্রশাসন হতে পারে না। তাই বাঁধাধরা কোনও ধর্ম বা নীতির অনুশাসন মেনে চলা অধ্যাত্ম-চেতার পক্ষে শেষপর্যন্ত অসম্ভব। তাবলে তিনি অধার্মিক বা অনীতিপরায়ণ

নন। তাঁর ধর্ম এবং নীতির উৎস বিশ্বান্তর্যামীর অপরোক্ষ প্রশাসন— হৃদি-স্থিত হৃষীকেশ তাঁকে দিয়ে যা করান, তিনি তা-ই করেন। তিনি তাঁরই দাস, মানুষের মানস-সংস্কারের দাস নন।

আবার ভাববিহ্বল প্রমত্ততাও সত্যকার অধ্যাত্মসাধনার অনুকূল নয়—যদিও আমাদের দেশে এটাকে অধ্যাত্মজীবনে একটা খুব বড় স্থান দেওয়া হয়। অধ্যাত্মজীবন প্রশান্ত প্রসন্ন সুস্থ এবং স্বপ্রতিষ্ঠ। বিধি-নিষেধের কড়াক্কড় দিয়ে আত্মনিগ্রহ অথবা ভাবাবেশের মাতলামি দিয়ে সূক্ষ্ম আত্মতর্পণ—কোনটাতেই তার সত্যকার পরিচয় নয়।

জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে বাইরের শাসনে নয় বা অবিশুদ্ধ চিত্তের প্ররোচনাতেও নয়। সে চলবে অন্তর্যামীর প্রশাসন মেনে। তিনি হাল ধরলে তবে তরী স্বচ্ছন্দে কূলে ভিড়বে। কিন্তু তার জন্যও প্রস্তুতি চাই। 'আমি হাল ছাড়লে পরে তুমি হাল ধরবে জানি।' বাইরের 'আমি'টাই আমার শত্রু। সে-ই তো আমাকে তাঁর কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে। মনের সংস্কার প্রাণের বাসনা দেহের দাবি জড়নির্ভরতা—এইগুলি চেতনাকে বারবার বাইরে টেনে আনছে; ফলে অশান্তি আর ঝামেলা বেড়েই চলছে দিনের পর দিন। অথচ মনে করছি আমি বেশ আছি। এরই নাম অবিদ্যা। অবিদ্যার তলায় চাপা পড়েছে আমার চৈত্যসত্তা—যে আমার সত্যকার আমি। চৈত্যসত্তার সঙ্গে তাঁর যোগ নিত্য এবং অব্যবহিত। এই চৈত্যসত্তাকে নির্মুক্ত এবং সক্রিয় না করতে পারলে অধ্যাত্ম-সাধনা সত্য এবং সহজ হয় না—অন্ধ সংস্কার এবং মূঢ় অহমিকার আবর্তে তা কেবল পাক খেয়ে মরে।

চৈত্যসত্তাকে জাগাবার উপায় হল অন্তর্মুখীনতা, বৃহতের নিত্যজাগ্রত অনুভব এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ। চারদিকে আলো আর আকাশের অবাধ বিস্তার, তার মধ্যে কুঁড়ি সহজ আনন্দে ফুল হয়ে ফুটছে—এই হল চৈত্যসত্তার উন্মেষের ছবি। এই অনুভবকে জীবনে অনায়াস করতে হবে। তার জন্য প্রথমে চাই আধারশুদ্ধির জন্য একটা ব্যাকুলতা। তাঁর আনন্দ আর ভালবাসার জ্যোছনা অবিশ্রান্ত ঝরে পড়ছে আমার 'পরে, আমার সব কালোকে আলো করে তুলছে—এমনিতর একটা নীরন্ধ্র অনুভবকে বহন করা চাই। আর চাই নিজের চারদিকে একটা আলোর দেয়াল গড়ে তোলা—সাধনশাস্ত্রে যাকে বলে বিবিক্ত সেবিত্ব বা আপনাতে আপনি থাকা। চারাগাছ লাগিয়ে তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়, নইলে ছাগলে-গরুতে তাকে মুড়িয়ে খাবে বা উপড়ে ফেলবে।

তারপর বড় হলে তার গোড়ায় হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না। আত্মস্থ হওয়ার পর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তখন সবই তিনি—অন্তরে তিনি, বাইরেও তিনি। জীবন তাঁরই নিঃশ্বাসের ছন্দে হিল্লোলিত।

আকাশে বাতাসে মাটিতে যে-আলো আছে আনন্দ আছে রস আছে, তা-ই ফুটছে ফুল হয়ে। আমার জীবনেও তেমনি তাঁরই প্রকাশ। প্রকাশ আমার বুদ্ধিতে, আমার হৃদয়ে, আমার সঙ্কল্পে। বুদ্ধির ভাবনা হৃদয়ের ভাব আর সঙ্কল্পের ক্রিয়া—এই নিয়ে আমার জীবন। তার সবটাতেই তাঁর দিব্যকর্মের অভিব্যক্তি। আমার মধ্যে তা-ই প্রজ্ঞার কর্ম, প্রেমের কর্ম আর প্রাণের কর্ম। এই হল কর্মযোগের ত্রিপুটী। এখন একটি-একটি করে তাদের রীতি-প্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

*

প্রথম ধরা যাক প্রজ্ঞার কর্ম, যাকে বলতে পারি বিদ্যার সাধনা। শাস্ত্রে দুরকম বিদ্যার কথা আছে—এক পরা-বিদ্যা যা দিয়ে অক্ষরতত্ত্বকে জানা যায়, আর এক অপরা-বিদ্যা যা দিয়ে ক্ষরতত্ত্বের অনুশীলন করা চলে। বোধির রাজ্য থেকে নেমে পরা-বিদ্যা মানুষের মনের রাজ্যে এসে নিয়েছে দর্শন আর ধর্মের রূপ। সেখানে দর্শন ক্রমে পরিণত হয়েছে লোকোত্তর তত্ত্ব নিয়ে নানা কূটক-চালে, বাস্তব জীবন বা অপরোক্ষ অনুভবের সঙ্গে যার কোনও নাড়ীর যোগ নাই; আর ধর্ম তার দিব্য প্রেরণা এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হয়ে নেমে এসেছে সাম্প্রদায়িকতা গোঁড়ামি আচারসর্বস্বতা আর নৃশংস পরমতাসহিষ্ণুতায়। ...এদিকে অপরা-বিদ্যার কারবার হল লোকোত্তর নিয়ে নয়, লৌকিককে নিয়ে। সে চায় বিজ্ঞানের সহায়ে প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্ত করতে, শিল্পে আর কলায় রসচেতনাকে মুক্তি দিতে, ঐহিক জীবনকে জানতে বুঝতে এবং সমৃদ্ধ করতে। বর্তমানে এইদিকে মানুষের ঝোঁক পড়েছে এবং তার ফলে লোকোত্তর আর লৌকিক পুরুষার্থের সম্পর্কে মিত্রচ্ছন্দের জায়গায় দেখা দিয়েছে অরিচ্ছন্দ।

বলা বাহুল্য, পূর্ণযোগের সাধক লোকোত্তর আর লৌকিকে কোনও বিরোধ দেখেন না। দুয়ের মধ্যে তিনি দেখেন একই চিৎশক্তির প্রকাশ। তার লক্ষ্য জড়ের বন্ধন হতে চেতনার মুক্তি। সে-মুক্তি যেমন আসে প্রকৃতির বশীকারে, তেমনি প্রকৃতির উত্তরণে। জীবনে পুরুষের কৈবল্যও সত্য, আবার প্রকৃতির

বিভূতিও সত্য। জীবন যেমন অন্তরে-বাইরে প্রমুক্ত হবে, তেমনি আবার ঋদ্ধও হবে। যিনি যজ্ঞেশ্বর, তিনি যেমন বিশ্বোত্তীর্ণ তেমনি আবার বিশ্বাত্মকও। তিনি একাধারে আকাশের অবর্ণ শূন্যতা, আবার পুরুবর্ণা পৃথিবীর ঐশ্বর্যও। তাঁর সাধর্ম্যলাভেই জীবনযজ্ঞের পরম সার্থকতা। সুতরাং পূর্ণযোগী যেমন লোকোত্তরের আহবানে সাড়া দেন, তেমনি লৌকিককেও তিনি উপেক্ষা করেন না। পৃথিবীর সকল চাওয়াকে আলোর চাওয়াতে রূপান্তরিত করাতেই তিনি খুঁজে পান জীবনের সর্বাঙ্গীণ চরিতার্থতা।

তাইতে লৌকিক বিজ্ঞানের সাধনাকে তিনি কেবল ব্যক্তির বা জাতির অহমিকার আপ্যায়নের উপায়রূপে দেখেন না, অথবা শিল্প এবং কলার চর্চাকে কেবল আত্মরতি এবং প্রাণবাসনার তর্পণের সাধক বলে মনে করেন না। তিনি চান এক লোকোত্তর প্রজ্ঞা এবং আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরা সর্বতোভদ্র হ'ক, প্রকাশ ও প্রবৃত্তির যে-বাসনা জীবনের মর্মমূলে তা সার্থক হ'ক চেতনার উত্তরায়ণে।

পূর্ণযোগী লৌকিক প্রবৃত্তিকে প্রত্যাখ্যান করেন না। কিন্তু তাবলে তিনি তার দাসও নন। তিনি জানেন, লৌকিকের অভিযান চলেছে লোকোত্তরের দিকেই। দর্শনে ধর্মে বিজ্ঞানে শিল্পে কলায় বা জীবনায়নে যতটুকু সিদ্ধি আজ মানুষের আয়ত্ত হয়েছে, তা-ই যে পর্যাপ্ত তা কেউ বলবে না। এগুলির মধ্যে এখনও অন্যোন্যবিরোধ আছে, অপূর্ণতা আছে, এক সর্বব্যাপ্ত অনন্ত চেতনার সুষম প্রকাশ এখনও এদের মধ্যে ঘটেনি। লোকোত্তরের ভাবনায় জারিত করে এদের রূপান্তর ঘটানোই তাঁর কাম্য। তাই এদের তিনি স্বীকার করেন বটে, কিন্তু এদের লোকায়ত ভাবনাকে মূঢ়ের মত অনুবর্তন করেন না।

*

পরা-বিদ্যা এবং অপরা-বিদ্যার মাঝে তাহলে মৌলিক কোনও বিরোধ নাই, কেননা দুটিই এক পরমা প্রজ্ঞার প্রকাশ। তবুও একটিকে আমরা পরা বলি যেহেতু তার দৃষ্টি লোকোত্তরের দিকে, আরেকটিকে বলি অপরা যেহেতু তার দৃষ্টি লৌকিকের দিকে। কিন্তু লৌকিকও যদি লোকোত্তরের সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, তাহলে তাকে আর যোগবিঘ্ন বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। আসলে সবই নির্ভর করছে, আমাদের চেতনা কোন্ ভূমিতে রয়েছে তার 'পরে।

অপরা-বিদ্যার সাধনাও যদি চেতনাকে ঊর্ধ্বমুখী করে, সে যদি ভূমার সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে তাকেও স্বচ্ছন্দে যোগাঙ্গ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এদেশে দেখি, শুধু পরা-বিদ্যার নয়—অপরা-বিদ্যার প্রবর্তকদেরও আখ্যা হল 'ঋষি'। অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যাকেই যোগজ প্রজ্ঞার বিভূতি বলে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন রীতি। বলা বাহুল্য, এই দর্শনই সম্যক্-দর্শন। শুধু মানস-চেতনার সহায়ে যে-বিদ্যারই অনুশীলন করি না কেন তার মধ্যে খাদ থেকে যাবেই। কিন্তু মানসোত্তর চেতনার স্পর্শে স্বরূপ আবিষ্কারের ফলে সেই বিদ্যারই সার্থক রূপান্তর ঘটে। অবিদ্যাগ্রস্ত চিত্তের দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প কলার এক রূপ; আবার ঊর্ধ্বচেতনার স্পর্শে এগুলিরই দেখা দিতে পারে আরেক রূপ।

বিদ্যার সাধনায় তাহলে চেতনার উৎকর্ষণই হল বড় কথা। বিষয়বস্তু যা-ই হ'ক না কেন, কোন্ চেতনা দিয়ে আমরা তাকে গ্রহণ করতে যাচ্ছি, তা-ই দেখতে হবে সবার আগে। প্রাচীন কালে চেতনার উৎকর্ষসাধনকে শিক্ষার অঙ্গরূপে একটা মুখ্য স্থান দেওয়া হত। যে-কোনও বিদ্যার অনুশীলনের জন্য সংযম এবং তপস্যার দ্বারা আধারের প্রস্তুতি ছিল অপরিহার্য। এর প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায়নি। চেতনা বিশুদ্ধ থাকলেই বিদ্যাকে শুদ্ধভাবে গ্রহণ করা যায় এবং তার সিদ্ধিও মঙ্গল্য এবং সর্বার্থক হয়। তখন পরা এবং অপরা বিদ্যার মাঝে কোনও কৃত্রিম বিভাগের সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয় না। তখন দেখি, 'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ।'

চেতনার উৎকর্ষসাধন এবং বিদ্যার অনুশীলন সমান্তরালে চলবে। কিন্তু প্রধানত চেতনা যখন সাধনার নিয়ামক, তখন তার উৎকর্ষসাধনার দিকে কখনও-কখনও হয়তো বেশী জোর দিতে হবে। তার জন্য সাধকের সাময়িকভাবে বিদ্যার অনুশীলন হতে নিবৃত্ত হওয়াও হয়তো দরকার হতে পারে। অনুশীলনে মন-বুদ্ধিই মার্জিত হয়, কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টির স্বচ্ছতা তাতে আসে না। তার জন্য দরকার গুহাহিত হওয়া। নিবৃত্তি সেক্ষেত্রে প্রবৃত্তির উচ্ছেদক নয়, উদ্দীপক। প্রয়োজনমত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেবার অভ্যাস করতে পারলে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়, কর্মের মধ্যে অলখ হতে শুভশক্তির যোগান আসে।

এমনি করে মানসসাধনায়ও মানসোত্তর অধ্যাত্মশক্তিকে করতে হবে দিশারী। কে এটি কিভাবে করবে তার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই, কেননা মানুষের সংস্কার এবং অধিকার বিচিত্র। তবে এবিষয়ে দু-একটি সার্বভৌম সাধন-

সঙ্কেত যে দেওয়া যায় না, তা নয়। সঙ্কেতগুলি এই।

প্রথমত চাই বৃহতের একটা সুস্পষ্ট বোধ। দেহ-প্রাণ-মনের মধ্যে যে-তরঙ্গগুলি উঠছে, এখন আমরা তাদের নিয়েই জড়িয়ে আছি। অনুভব করতে হবে, এগুলি আকাশের মত বিপুল এবং স্বচ্ছ এক চৈতন্যসমুদ্রের তরঙ্গ। মনের একটা দিকে যদি প্রাকৃত-বৃত্তির কাজ চলতে থাকে তো তার আরেকটা দিক সবসময় এই বৃহৎকে ছুঁয়ে থাকবে। মাছ যেমন সমুদ্রের মধ্যে ডুবে থেকে চলছে-ফিরছে, আমরাও তেমনি বাইরে-ভিতরে অনন্তের মধ্যেই চলছি-ফিরছি। এই বৃহতের আবেশ যত নিরন্তর হবে, ততই সে যেন মনেরও গভীরে সত্তার মেরুতন্ত্রে আরেকটা চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলবে যাকে উপনিষদের ভাষায় অনুভব হবে 'সত্যাত্মা প্রাণারাম মন-আনন্দ' বলে। এইটি আমাদের মাঝে গুহাহিত চৈত্যপুরুষ। এই চৈত্যপুরুষের সঙ্গে বৃহতের একটা সহজ এবং অপরোক্ষ যোগ আছে। সে-যোগের বোধ যত নিবিড় হবে, ততই দেখব কর্মের প্রেরণা আসছে উপরভাসা সংস্কারান্ধ চেতনা হতে নয়—আসছে চিৎসত্তার একটা গভীরতর উৎস হতে। দেহ-প্রাণ-মন তখন হয়ে যায় এক নিপুণ যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রের মত। আমি তখন কাজ করি না—কেউ ভিতরে থেকে আমায় কাজ করায়, আমি ভাবি না—কেউ আমায় ভাবায়। তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে পারে। এখন মনের মধ্যে হাজার ভাবনা কিলবিল করছে; তখন একেকসময় সেগুলি ছায়ার মত কোথায় মিলিয়ে যাবে, মনটা যেন শিশুমনের মত ফাঁকা হয়ে পড়বে। আর সেই ফাঁকা মনে কোথা হতে কে যেন আলোঝলমল ভাবনার রাশ ঠেলে দেবে। প্রাকৃত-ভূমিতে আমরা একে বলি প্রতিভা, যা ভাবনার দৈবী সম্পদ। এমনি করে চৈত্যসত্তার যোগে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দিব্যমননের জ্যোতি-রৈশ্বর্যকে এই মনে নামিয়ে আনাতেই হল মানসসাধনার চরিতার্থতা।

এই সিদ্ধির দুটি লক্ষণ। প্রথমত, মনের পটভূমিকায় বৃহতের বোধ ক্রমে নিবিড় হবে। অথচ সে-বোধ যে মানসক্রিয়াকে সবসময় স্তম্ভিত করে রাখবে, তা নয়। এ যেন মনের মালঞ্চে আলোর প্রসাদ নেমে আসবে উপর থেকে, আর তাইতে তার ফুল ফোটানোর আর বিরাম থাকবে না। তখন যা ফুটবে, সবই আলোর ফুল। তারপর, মনশ্চেতনার এই রূপান্তর আধারে প্রতিষ্ঠিত করবে সেই দিব্য মনস্বানকে। মননের মন্তা তখন আর আমি নই—তিনি। আমার আমিকে আর তখন মনের ত্রিসীমায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে যদি থাকে তো থাকবে এক বিশুদ্ধ সংস্কারহীন নির্মুক্ত অস্তিত্বের বোধরূপে, যে-

বোধ তাঁরই সর্বগত বোধের বিচ্ছুরণ।

কিন্তু এও রূপান্তরের ভূমিকা মাত্র। বৃহতের বোধ যত গভীর হবে, ততই তাঁর দিব্যমননের চিন্ময় বৃত্তিগুলি আধারে উন্মেষিত হবে। তখন প্রাকৃত-মননের ধারার ঘটবে সম্পূর্ণ বিপর্যয়। এই চিদ্‌বৃত্তিগুলি নিয়ে ইতিপূর্বে দিব্যজীবন-প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এগুলির নাম হল উত্তরমানস, প্রভাস-মানস, বোধিমানস এবং অধিমানস—যারা ধাপে-ধাপে উঠে গেছে অতিমানসের দিকে। এই বৃত্তিগুলির উন্মেষের সাধারণ লক্ষণ : বস্তুজগতের গভীরে তখন ফুটে ওঠে একটা চিন্ময় ভাবের জগৎ। সে-জগতে ভাবই বস্তু—যে-ভাবের একটুখানি আবছায়া বুদ্ধির দৌলতে আমরা প্রাকৃত-ভূমিতেও পাই। কিন্তু মানসোত্তর জগতে ভাব আবছা নয়, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মতই স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ম। এই তীক্ষ্মতার হেতু রয়েছে তাদাত্ম্যবোধে—বিষয়ী এবং বিষয়ের একাত্মতায়। ভাবকে জানতে গিয়ে আমি আমাকেই জানছি এবং বস্তুকে দেখছি তার প্রতি-বিম্বরূপে। প্রতিবিম্ব ক্রমে বিম্বের দিকে এগিয়ে যায়। অবশেষে বিম্বের মধ্যে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলে যখন, তখন ফোটে অতিমানসের সৌরসংবিৎ। সেই সৌরচ্ছটা আবার মনের মালঞ্চেও দিব্যভাবনার ফুল হয়ে ফুটতে থাকে।

এই হল প্রজ্ঞার কর্মের স্বরূপ। একে জ্ঞানযজ্ঞও বলতে পারি। সে-যজ্ঞের যজমান হল মন। এ-সাধনার লক্ষ্য মনোবৃত্তির নিরোধের দ্বারা অমনীভাবে পৌঁছন নয়—যদিও মানস-অবিদ্যার মূলকে ওপড়াতে তারও সাহায্য নেওয়া দরকার হয়। এর আসল লক্ষ্য হল, মনের গভীরে অতিমানস শক্তির স্ফুরণ এবং সেই শক্তিকে প্রাকৃত-মননের পরিচিত সমস্ত বৃত্তির মধ্যে বইয়ে দিয়ে তাদের দিব্য রূপান্তর ঘটানো।

*

যেমন প্রজ্ঞার কর্ম আছে, তেমনি আছে প্রেমের কর্ম। প্রজ্ঞা আর প্রেম শিব-শক্তির মত চেতনায় যুগনদ্ধ হয়ে আছে। প্রজ্ঞা আনে চেতনার মুক্তি, আর প্রেম তার মধ্যে আনে রসসান্দ্রতা। প্রাকৃত-ভূমিতে প্রজ্ঞার আশ্রয় বুদ্ধি, আর প্রেমের আশ্রয় হৃদয়।

হৃদয়কে মানুষ ডরায়, কেননা তার আবেগ আর উচ্ছ্বাস অনেকসময় বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দেয়। কিন্তু তাবলে হৃদয়ের দাবিকে জীবন থেকে ছেঁটে

ফেলাও তো চলে না। প্রাকৃত-জগতে বিকার সবারই ঘটে—যেমন হৃদয়ের ঘটে, তেমনি বুদ্ধিরও ঘটে। কিন্তু হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে পারলে তার স্পর্শ বুদ্ধির মধ্যে সঞ্জীবনী বিদ্যুতের সঞ্চার করে। বৈদিক ঋষি বলেন, তাঁকে মন দিয়ে পাওয়া যায়, মনীষা দিয়েও পাওয়া যায়; কিন্তু পাওয়া সম্পূর্ণ হয়, যখন হৃদয় দিয়ে পাই।

সাধনায় যেমন বুদ্ধির শুদ্ধিতে প্রজ্ঞার স্ফুরণ হয়, তেমনি হৃদয়ের শুদ্ধিতে স্ফুরণ হয় প্রেমের। অশুদ্ধ হৃদয় প্রাণবাসনায় বিক্ষুব্ধ, আত্মরতির মোহে আচ্ছন্ন। অথচ এই হৃদয়েরই গভীরে রয়েছে চৈত্যসত্তার আনন্দকন্দ। অপরা-প্রকৃতির বিকার তাতে নাই, আছে তাঁর পরা-প্রকৃতির উল্লাস। আমার একটা আমি অহঙ্কারী, বুভুক্ষু—সে হল কামপুরুষ; আবার আমার আরেকটা আমি বৃহতের কাছে সমর্পণের মাধুরীতে প্রসন্ন, নিত্যতৃপ্ত—সে হল চৈত্যপুরুষ। এই চৈত্যপুরুষই অধ্যাত্মসাধনার সত্যকার সাধক। ইনি না জাগা পর্যন্ত সাধনা একটা কসরতের ব্যাপার থাকে শুধু—তাতে প্রাণসঞ্চার হয় না, সহজের সুরটি বেজে ওঠে না। অসীমের প্রতি শ্রদ্ধা, রতি, আকুতি—এইগুলি হল চৈত্যসত্তার জাগরণের লক্ষণ। শুধু মনের চাওয়াতে কিছুই হয় না, সে-চাওয়া হৃদয়ের চাওয়া হওয়া চাই। তবেই সমগ্র আধারে একটা আলোড়ন জাগে এবং তাইতে সবদিক দিয়ে তাঁকে পাওয়া সম্ভব হয়। প্রজ্ঞা দেয় লোকোত্তরের সন্ধান; আর সেই লোকোত্তরকে এই লোকে নামিয়ে আনে প্রেম। প্রেম ছাড়া সাধনা তাই পূর্ণ হয় না।

প্রজ্ঞার বৃত্তি যেমন ভাবনা, প্রেমের বৃত্তি তেমনি ভাব (feeling)। যেমন ভাবনার বেলায়, তেমনি ভাবের বেলাতেও বিবেকের প্রয়োজন। অশুদ্ধ ভাবকে বর্জন করে শুদ্ধ ভাবের আশ্রয় নিতে হবে। অশুদ্ধ ভাবের প্রয়োজক হল কাম, আর শুদ্ধ ভাবের প্রচোদক প্রেম। 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' কাম চায় সম্ভোগ, প্রেম দেয় সেবা। সেবা প্রেমের কর্মরূপ।

কার সেবা করব? ভক্ত বলেন, দেবতার সেবা কর। একমাত্র সেই সেবাই কর্ম, আর-সব বিকর্ম। কেউ বলেন, দেবতা মন্দিরে; কেউ বলেন, তিনি অন্তরে। কিন্তু যেখানেই তিনি থাকুন, শুধু একান্তে তাঁকে নিয়ে থাকলে সেবার পূর্ণ সার্থকতা হয় না। দেবতাকে নিয়ে ভাবের উদ্‌বেলতাতে সূক্ষ্ম প্রাণবাসনার তর্পণ হয় এবং অধিকাংশক্ষেত্রে জগৎ ও জীবনের অনেকখানি তার আমলে

আসে না। তাইতে কেউ-কেউ বলেন, নির্জনে নয়—সজনে দেবতার সেবা কর। মানবসেবাই সত্যকার দেবসেবা, সুতরাং নর-নারায়ণের পরিচর্যায় জীবন উৎসর্গ কর। আবার কেউ বলেন, মানবসেবাই একমাত্র ধর্ম; তার সঙ্গে আবার দেব-সেবার কল্পনাকে জুড়ে দেওয়া কেন?

প্রত্যেকের মতের কিছু-না-কিছু সার্থকতা আছে, কেননা এঁরা সবাই মানুষকে আত্মস্বার্থের সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। তবুও এসব মতের কোনটিকেই সম্যক্ দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে স্বীকার করা যায় না। এদের মধ্যে সেবা কোথাও কেবল লোকোত্তর ইষ্টার্থের সাধক, কোথাও অধ্যাত্মসিদ্ধির অবান্তর সাধন মাত্র, কোথাও-বা শুধু অধ্যাত্মভাবনা-নিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের উন্মেষক। মনঃকল্পিত আদর্শমাত্রেরই এই স্বরূপ, তারা কখনও খণ্ডভাবনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না।

বিশুদ্ধ অধ্যাত্মচেতনা বস্তুত এক অখণ্ড চেতনা। সে যে-প্রেমকে হৃদয়ে জাগায়, তা একটি সর্বাবগাহী সর্বতোভদ্র চিদ্‌বৃত্তি—তার মধ্যে ইহলোকে-পরলোকে বা দেবতায়-মানুষে ভাগাভাগি নাই। হৃদি-সন্নিবিষ্ট চৈত্যসত্তাই সে-প্রেমের আশ্রয়; এবং যিনি বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও বিশ্বাত্মক, সেই সর্বময় তার বিষয়। এই চৈত্যসত্তা হৃদয়ের পুরোধা না হওয়া পর্যন্ত সত্যকার প্রেমও আমাদের মধ্যে জাগে না।

চৈত্যসত্তার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করেছি। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বললেই হবে: চৈত্যপুরুষই আমাদের মধ্যে সত্যকার নিত্যজীব—উপনিষদের ভাষায় 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ, মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।' সূর্যমুখীর মত চিৎসূর্যের দিকে সবসময় তাঁর দৃষ্টি ফেরানো। প্রাকৃত-চেতনায় তাঁর প্রকাশ নাই, তবুও তিনি আছেন। জড়চেতনার পঙ্ক আর প্রাণবাসনার উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে সাবিত্রী-দীপ্তির দিকে ধীরে-ধীরে তিনি ফুটে উঠছেন—এই তাঁর স্বভাব। তাঁর স্ফুরণই আমাদের আধ্যাত্মিক দ্বিজত্ব।

চেতনায় অভীপ্সার উন্মেষ চৈত্যপুরুষের জাগরণের প্রথম লক্ষণ। জাগ্রত-বুদ্ধির সহায়ে তাকে আমরা খানিকটা ক্ষিপ্র করতে পারি। আধারশুদ্ধি হল সাধনার প্রথম পর্ব, আর এটা সাধককে তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে নিজের চেষ্টাতেই করতে হয়। চাই দেহবোধের শুদ্ধি এবং স্বচ্ছতা, প্রাণবাসনার প্রশম আর মনের সমাহিতি। বাইরে থেকে ভিতরের দিকে মোড় ফিরিয়ে চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে একাগ্রতার ভূমিতে। সে-ভূমি বোধির আলোকে

উদ্‌ভাসিত—পুরাণকারের রূপকের ভাষায় যেন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আনন্দ-বৃন্দাবন। পরমপুরুষের সঙ্গে চৈত্যসত্তার সেখানে সহজ যোগ—তিনি তার 'বন্ধুঃ আত্মা'। ধৃতি শক্তি প্রীতি রতি আর শান্তির বিশুদ্ধ প্রসাদ সেখানে চেতনার নিত্যসহচর। সেই প্রসাদে জীবন সমর্থ এবং প্রভাস্বর।

চৈত্যসত্তার সর্বোত্তম পরিচয় প্রেমে—অসীমের প্রতি এক সর্ববিস্মারী অবন্ধন আকুল আকর্ষণে। মানুষের ভালবাসার সঙ্গে এ-প্রেমের তুলনা হয় না। এ-প্রেম 'নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়'; আর মানুষের ভালবাসায় হাজার হলেও জড়ত্বের মোহ আর ক্ষিপ্ত বাসনার খাদ মেশানো আছে। দেহের মূঢ়তা আর প্রাণের ক্ষিপ্ততার ঊর্ধ্বে চেতনার বিক্ষিপ্তভূমিতে শুদ্ধমনোময় ভালবাসার আদর্শ মানুষের মধ্যেও কখনও-কখনও প্রতিফলিত হয়, কিন্তু একাগ্রতার অভাবে তা স্থায়ী হয় না। ভালবাসার সত্যকার রূপ ফোটে মনোভূমির ওপারে বিজ্ঞানভূমিতে—যোগিচেতনার অধিকারে। সে-প্রেম অপ্রাকৃত; তার আশ্রয় এবং বিষয় দুইই অপ্রাকৃত। সত্যের মানুষ এই মানুষকেও যদি ভালবাসে, তবুও তার মধ্যে সেই নিত্যের মানুষকেই ভালবাসে। আর সে ভালবাসে চিদ্‌ঘনবিগ্রহ গুরুকে, ভালবাসে তার পথের দোসর কল্যাণমিত্রকে।

অথচ সে-প্রেম নির্বীর্য নয়, জগতের প্রতি উদাসীনও নয়। যে-প্রেম দ্যুলোকের অভিসারে উৎশিখ হয়ে উঠেছিল, সেই প্রেম আবার করুণার সৌম্য-সুধায় বিগলিত হয়ে পড়ে পৃথিবীর 'পরে। রূপে-রূপে সে দেখে পরমের প্রতিরূপ। আর সে-প্রতিরূপকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চলে তার অশ্রান্ত তপশ্চর্যা। মহাশক্তির চিন্ময়ী সিসৃক্ষার অবন্ধ্য প্রবেগ আশ্রয় করে সে-প্রেমকে। মহদ্‌ভয় উদ্যত বজ্রের হানায় অবিদ্যার পাষাণ-প্রতিরোধকে সে বিদীর্ণ বিচূর্ণ করে, দিক্‌চক্রবালে নতুন ঊষার অরুণ স্বপ্নকে করে সার্থক।

এই একান্ত একাগ্র আদিত্যাভিসারী অথচ বিশ্বজীব-হৃদ্‌বিলোড়ন প্রেমই চৈত্যসত্তার স্বরূপধর্ম।

৬

যজ্ঞভাবনার উদয়ন (খ)

প্রেমের কর্ম—প্রাণের কর্ম

প্রজ্ঞার সাধনা প্রেমের সাধনা আর প্রাণের বা কর্মের সাধনা—এই তিনটিতে জীবনযজ্ঞের পূর্ণতা। আমাদের গুহাহিত চৈত্যপুরুষ সে-যজ্ঞের পুরোহিত, আর যজ্ঞেশ্বর পুরুষোত্তম তার ভোক্তা। তিনটি সাধনার মধ্যে প্রজ্ঞার সাধনাকে স্বভাবতঃ মনে হয় সবার চাইতে বড়। কেননা, তাঁর কাছে আমার আকাশবৎ প্রভাস্বর নির্মল চেতনার নৈবেদ্য যখন বয়ে আনি, তখন ভাবি এই বুঝি আমার সর্বোত্তম উপচার যার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁরই আত্মস্বরূপের নিরঞ্জন পরমসাম্যের প্রদ্যোত। কিন্তু সমস্ত-হৃদয়-লুটিয়ে-দেওয়া যে প্রেমের নৈবেদ্য, সেও তো তার চাইতে এক তিল ছোট নয়। আমার প্রেম যে তাঁরই আনন্দের ইন্দ্রধনুচ্ছটা। আলো হয়ে তিনি আমায় জড়িয়ে ধরেন, আনন্দ হয়ে আমার জীবনমালঞ্চে ফোটান বসন্তের ফুল। সব দিয়ে যেমন তাঁকে পাই বোধিতে, তেমনি পাই হৃদয়ে। প্রশান্ত পরিব্যাপ্ত অনুভব ভালবাসায় আরও নিবিড় হয়, সত্তার অণুতে-অণুতে জাগায় রোমাঞ্চ। তিনি এসে ধরা দেন আমার সব-কিছুতে।

তখন, তাঁকে ভালবাসি বলেই সবাইকে ভালবাসি। সে-ভালবাসা আকাশের মত প্রশান্ত স্বচ্ছ এবং নির্মল। দেহ-প্রাণ-মনের বুভুক্ষা তার মধ্যে নাই, আছে আত্মায়-আত্মায় যেন বিদ্যুতে-বিদ্যুতে মেশামেশি। সবার মাঝেই যে তিনি, তাই সবাই আমার আপন। সবার প্রাণেই আমার প্রাণের ঠাকুর, বাইরের মুখোস সরিয়ে ফেলে সবার মাঝেই যে দেখছি তাঁরই মুখ!

'যারে বলি ভালবাসা, তারই নাম পূজা।' ভালবাসা মাত্রেই বৃহতের আরতি। ভালবাসার পাত্র যত তুচ্ছই হ'ক না কেন, তার ভিতর দিয়েই তো আমি বৃহতের স্পর্শ পাচ্ছি, হৃদয়ের রুদ্ধ বাতায়ন খুলে গিয়ে সহসা সে অনিবাধ আকাশকে আমন্ত্রণ করে আনছে আমার চেতনায়। যার ভালবাসা স্পষ্টত পূজার রূপ ধরে উঠেছে, তার মধ্যে যত খাদই থাকুক না কেন, তবুও

জানতে হবে, ভালবাসার পাত্রের মধ্যে অসীমের একটু-না-একটু আভাস সে পেয়েছে বলেই আজ তার শিখা ঊর্ধ্বমুখ হয়ে জ্বলছে। পথের শেষ এখনও বহুদূরে, তবুও এই তার শুরু। কে না জানে, এই পূজারতির ক্ষণে-ক্ষণে মনের আকাশে অলখের বিদ্যুৎ চমকে যায়, মাটির পুতুলের মাঝ থেকে হঠাৎ উঁকি দেয় চিন্ময়ী প্রতিমার মুখ। সব পূজাই সেই অনন্তের পূজা—হ'ক সে দেবপূজা মূর্তিপূজা বা মানুষপূজা। তাই কারও পূজার মূর্তি ভাঙতে নাই। অসীমকে মানুষ ধরতে পারে না বলেই সীমার মধ্যে তাঁকে খোঁজে। এখানে ঐ খোঁজাটুকু ঐ প্রাণের আকৃতিটুকু হল বড় কথা। তাতেই মৃন্ময়ী প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, পাষাণী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী হয়ে দেখা দেন 'ভবতারিণী'র রূপে।

লোকোত্তর পরমভাবরূপে তাঁকে ভালবাসতে হয়, নইলে সীমার সংস্কার হতে চেতনার মুক্তি হয় না। আবার তাঁকে ভালবাসতে হয় সর্বান্তর্যামী ভূতমহেশ্বররূপে, নইলে চেতনার বৈপুল্য বাস্তব হয় না। তার পর 'মানুষীং তনুমাশ্রিতং' তাঁকেও ভালবাসতে হয়, নইলে চিন্ময়ে-মৃন্ময়ে একাকার হয়ে প্রেমের অদ্বৈত-সিদ্ধি হয় না। আঁখি আছে বলেই আমার 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে', অঙ্গ আছে বলেই 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'। রূপের সাধনায় বন্ধনের আশঙ্কা আছে সত্য, কিন্তু একান্তভাবে অরূপের সাধনাতেও কি একদেশদর্শিতা নাই? বস্তুত যেমন তিনি অরূপে, তেমনি আবার রূপেও। তিনি অবিগ্রহ আর সবিগ্রহ দুইই। রূপ সত্য হয়, যখন অরূপকে সে পায় অধিষ্ঠানরূপে; আবার অরূপের উল্লাস পূর্ণ হয় রূপের স্ফূর্তিতে। রূপ হতে ভাবে, আবার ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা চলছে—একমাত্র প্রেমই সেকথা জানে। তাঁকে ভালবেসেই জানতে পারি, তাঁর সব ভাবের মূলে যেমন এক পরমভাব, তেমনি সব রূপের মূলে এক কল্যাণতম রূপ। ভাব আর রূপ একই আবিঃ-স্বরূপের এপিঠ আর ওপিঠ।

যেমন ভালবাসি তাঁর পরমবিগ্রহকে, তেমনি ভালবাসি তাঁর বিশ্বরূপ বিভূতিকেও। তিনি অরূপ, তিনি স্বরূপ, আবার তিনি বিশ্বরূপ। প্রেমের দৃষ্টি তো কোথাও ব্যাহত হয় না। চোখ বুজে অন্তরে যাঁকে দেখি, চোখ মেলে তাঁকেই দেখি বাইরে—দেখি সব ঘটে, দেখি সব ঘটনায়। 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।' কাকে বলব, এ তো তুমি নও! এ যে তাঁরই চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা, তাঁরই হৃদয় দিয়ে সর্বত্র তাঁর হৃদয়ের ছোঁওয়া পাওয়া।

এ-অনুভবে যেমন মুক্তির পূর্ণতা, তেমনি শক্তিরও পূর্ণতা। এ শুধু তটস্থ থেকে স্বপ্নচ্ছবির দর্শন নয়, এ তাঁর ভালবাসায় জরজর তনু-প্রাণ-মন নিয়ে বিশ্বজোড়া তাঁর রাসচক্রে ঝাঁপিয়ে পড়া। প্রেমের অনির্বচনীয় রসায়নে তখন যে বিষও অমৃত হয়ে ওঠে, বেদনাও রূপান্তরিত হয় আনন্দে। তখন 'কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়!'

*

কিন্তু প্রেম তো শুধু অন্তরের রসোল্লাস নয়, সে আবার সেবার মাধুরীও। সেবা হল প্রেমের কর্মরূপ। আগেই বলেছি, সেবার দুটি আদর্শ আছে—সংসার থেকে দূরে সরে গিয়ে একান্তে ঠাকুরের সেবা, আবার সংসারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নরনারায়ণের সেবা। আজকাল এই শেষের আদর্শকেই বড় বলে প্রচার করবার একটা রীতি দাঁড়িয়ে গেছে। পূর্ণযোগের সাধক দুটি আদর্শকেই বড় বলে মানবেন; তবুও তিনি বলবেন, এদের কোনটিই সেবার সর্বজনীন সহজ রূপ নয়। কর্ম জীবনের আদি অন্ত জুড়ে আছে। সব কর্মকেই সেবাতে রূপান্তরিত করতে হবে। শুধু সচেতন ইচ্ছার প্রেরণাতে যে আমরা কর্ম করি তা নয়—নিশ্বাস-প্রশ্বাস থেকে শুরু করে ভাবনা-চিন্তা পর্যন্ত দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত স্বাভাবিক স্পন্দনগুলিও তো কর্ম। এসবই যে তাঁকে দিতে হবে। আমি বেঁচে আছি তাঁর মধ্যে তাঁরই জন্যে—জীবনের প্রতিমুহূর্তে তাঁর আলোয় তাঁরই আনন্দে সঞ্জীবিত হয়ে। আমার জীবনস্পন্দনে তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন, আমার কর্ম তাঁরই কর্ম। তাঁরই আনন্দ সুধার নির্ঝর হয়ে আমার হৃদয়ে নেমে এসে ধরছে প্রেমের রূপ। সেই প্রেমের অভিষেকে জীবনের সকল কর্ম রূপান্তরিত হচ্ছে সেবায়। প্রবৃত্তিরূপে কর্মের উৎস যেমন তিনি, তেমনি ফলরূপে তার সাগরসঙ্গমও তিনি। নরনারায়ণের সেবাতেও নর উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য সেই নারায়ণ।

কর্মের যা বাহ্য-পরিণাম, তার চাইতে বড় হল তার মূলে যে ভাবের প্রেরণা রয়েছে, তা-ই। ভাব যদি শুদ্ধ হয়, তবেই কর্ম সেবা হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে, প্রত্যেক কর্মের তিনটি অংশ আছে—একটি তার স্থূল বাস্তবরূপ, অপরটি তার প্রতীকধর্ম, আর তৃতীয়টি হল তার ভিতর দিয়ে যে-ভাবের অভিব্যক্তি ঘটছে তা-ই। ধরা যাক, ফুলচন্দন দিয়ে দেবতার অর্চনা করছি।

এই অর্চনার মূল ভাবটি হল আত্মনিবেদনের দ্বারা দেবতার সঙ্গে সাযুজ্যলাভের আকূতি। অর্চনার প্রতীকের ভিতর দিয়ে সে-আকূতিকে আমি প্রকাশ করছি। এ ছাড়া অর্চনারূপী একটা বাহ্যিক ব্যাপারও আছে। বাহ্যিক ব্যাপারটা নিরর্থক হয়ে যায়, যদি তা অন্তরের কোনও নিগূঢ় ভাবের প্রতীক না হয়।

সেবায় সমস্ত কর্ম হয়ে ওঠে ভালবাসার প্রতীক। ভালবাসায় চেতনার যে-উল্লাস, প্রতীককে আশ্রয় করে তা শোভন এবং সহজরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অর্চনার মূলেও এই কথা। দেবতাকে ভালবাসি, হৃদয়নন্দনরূপে তাঁকে অনুভব করি—তাই পুষ্প-চন্দন দিয়ে তাঁকে সাজাই, ধূপ-দীপ দিয়ে তাঁর আরতি করি। অন্তরের চারুতাকে এমনি করে বাইরের কর্ম দিয়ে রূপায়িত করি। এ-সাধনা রসের সাধনা, এর একটা একান্ত সার্থকতা আছে। যে-কোনও অর্চনা মানুষকে সুন্দর করে তোলে, যদি তার গভীরে ভাবের উল্লাস থাকে। কিন্তু বিপদ ঘটে তখন, যখন অর্চনা প্রথামাত্র হয়ে ওঠে। তখন তার মধ্যে বাহ্য-কর্মের খোলসটা শুধু থাকে—না থাকে প্রতীকধর্ম, না থাকে ভাব। আচার-সর্বস্বতা তখন চেতনার উপরে 'ভারসম চেপে থাকে আড়ষ্ট কঠিন'। এই আড়ষ্টতাকে দূর করতে হলে অর্চনার ভাবকে প্রসারিত করতে হবে। একটা সময়ে কোনও-একটা মন্দিরে বাইরের উপচার দিয়ে তাঁর অর্চনা নয় শুধু, অহরহ বিশ্বমন্দিরে জীবনের উপচার দিয়ে চলবে তাঁর অর্চনা। আমার চলন-বলন ভাবনা-চিন্তা সবই ফুলের মত সুন্দর দীপের মত উজ্জ্বল চন্দনের মত সুরভি হয়ে আত্মনিবেদনের ধূপারতিতে তাঁর মধ্যে মিলিয়ে যাবে। সমস্ত জীবন হবে তাঁর আনন্দের আর আমার ভালবাসার প্রতীক। প্রেম আর জীবন যখন একাকার হয়ে যাবে, তখনই প্রেমের কর্ম সহজ হবে সুন্দর হবে।

প্রেম শুধু নিষ্ক্রিয় সম্ভোগ নয়, তা সৃষ্টিধর্মীও বটে। প্রেম স্বভাবতই প্রকৃতিকে পরিশুদ্ধ করে, চিন্ময় করে, সুন্দর করে। আমার মধ্যে যা প্রেম, তাঁর মধ্যে তা-ই আনন্দ। আত্মারাম পুরুষের আনন্দ, আর সূর্যমুখী প্রকৃতির প্রেম—তাইতে জগৎ সুন্দর হয়েছে। আনন্দ প্রেম আর সৌন্দর্যের মাঝে একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। পুরুষের আনন্দ প্রতিফলিত হয় প্রকৃতির প্রেমে—এক যখন দুই হন; আর সেই প্রেমের মধ্যে চলে বহুবিচিত্র জগৎকে সুন্দর করে তোলবার তপস্যা। আনন্দ ও প্রেম তাই সৃষ্টির আদিতেও, অন্তেও। মাঝখানকার এই-যে অজ্ঞান বৈষম্য আর কুশ্রীতা—এ থাকবে না। পরমপুরুষের প্রশান্ত আনন্দের সৌরদীপ্তি অবিরাম ঝরে পড়ছে এর 'পরে,

আর পরমা-প্রকৃতির মাতৃহৃদয়ের সৌম্যমাধুরী একে জড়িয়ে আছে, সঞ্জীবিত করছে। সেই আনন্দ আর প্রেমই আমার জীবনের রসায়ন। আমার কর্মের মূলে উৎসর্গ-নির্মল প্রেমের প্রেরণা, আর প্রশান্ত-সুষম আনন্দে তার অবসান।

একটা তীব্র সংবেগ নিয়ে লক্ষ্যের দিকে আমরা এগিয়ে চলি যখন, তখন প্রায়শ প্রেমকে দূরে সরিয়ে রাখি, কর্মকে মনে করি পথের বাধা। অসঙ্গ বৈরাগ্যের বজ্রমুষ্টি হৃদয়কে তখন চেপে ধরে, হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু এটা সাধনার উদ্যোগপর্ব মাত্র। বৃহতের স্পর্শে একদিন সে-মুষ্টি শিথিল হয়, কঠিন হয় কোমল, দুরূহ হয় সহজ। অনিবাধ মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য যোগচেতনায় আনে প্রসন্নতা, আনে প্রেম—সেই পরমের প্রতি, এই জগতের প্রতি। কর্ম তখন আর জঞ্জাল নয়—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই তা সহজ, প্রজ্ঞার প্রশান্তিতে বিধৃত, আত্মসমর্পণের মাধুরীতে নন্দিত।

প্রেমে আধার-শুদ্ধি যত সহজে হয়, এমন আর-কিছুতেই নয়। প্রেম পরমা-প্রকৃতির স্বরূপশক্তি; তাই তার বীর্য অনায়াসে আধারের সর্বত্র সঞ্চারিত হতে পারে। আমরা যখন ভালবাসি, তখন দেহ-প্রাণ-মন দিয়েই ভালবাসি। সে-ভালবাসা যদি শুদ্ধ হয়, তাহলে তা আধারের সবখানিকেই শুদ্ধ করে তোলে, কোনও-কিছুকেই পাশ কাটিয়ে যায় না। আবার শূন্যে শূন্যে প্রেম হয় না। ভালবাসতে গেলে তার একটি পাত্র চাই, তার চিদ্‌বিলাসের একটা জগৎ চাই। সবটুকু দিয়ে সবাইকে নিয়েই তো ভালবাসা। তাঁকে যখন ভালবাসি, তখন আধারের সবটুকু দিয়ে সবাইকে নিয়েই ভালবাসি। এই প্রেমারতির ভাব যখন সত্যধর্মরূপে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হবে, তখনই সব মানুষ এক হবে, তাঁর আনন্দ-বৃন্দাবনের স্বপ্ন সফল হবে—তার আগে নয়।

প্রাকৃত-জীব তাঁকে ভালবাসে না। সে ভালবাসে নিজেকে। অথচ এই প্রাকৃতজীবের গভীরে গুহাহিত হয়ে আছে যে-চৈত্যসত্তা যে-সত্যজীব, সে তাঁকে ভালবাসে। সেই কিশোরীর প্রেমই জীবের স্বধর্ম। এই নিকষিত হেম-তুল্য প্রেম যতটুকু জীবনে ফোটে, ততটুকুই তার সার্থকতা। কিন্তু ফোটার কত-যে বাধা। অপরা-প্রকৃতির বাধা তো আছেই—যা কিছুতেই গতানুগতিকতার মূঢ় আবর্তনের বাইরে যেতে চায় না, আলোকে অস্বীকার করাই যার স্বভাব। কিন্তু আলোকে স্বীকার করেও দেবতার প্রসাদ পেয়েও মোহের ঘোর কাটতে চায় না। সে-প্রসাদকে মানুষ খাটায় আত্মতর্পণের প্রয়োজনে। সাধনার ফলে আলো আসে, আনন্দ আসে, শক্তি আসে; কিন্তু সাধক আত্ম-

সমর্পণের বিনম্র মাধুরী দিয়ে তাদের অভিনন্দিত না করে নিজের অহমিকাকে ফাঁপিয়ে তোলে তাদের দিয়ে, তাদের লাগায় অন্ধ প্রাণবাসনার পরিতর্পণে। অনেক উঁচুতে উঠেও মোহের ঘোর অনেকসময় কাটে না—এই তো বিপদ। তাছাড়া ভালবাসার মধ্যে একটা তীব্র মাদকশক্তি আছে। তাকে শাসনে না রাখতে পারলে ভাববিহ্বলতার পিচ্ছিল পথে সাধক সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণের দিকে গড়িয়ে যেতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে যায়ও। এইজন্য প্রাচীন যোগীরা 'রসাস্বাদ'কে যোগবিঘ্ন বলে বর্ণনা করেছেন এবং সাধককে তার সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছেন। সোজাকথায় ভাবের সাধনায় সিদ্ধ হতে হলে ভাব চাপতে শিখতে হয়, তাহলেই তার শক্তি বাড়ে। 'অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নৈব রোহিতঃ।' কিন্তু 'গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে।' অনেক ভাবুকেরই এই দশা। উত্তালতা যেমন আনন্দ নয়, তেমনি ভাবালুতার মাতলামিও প্রেম নয়। কিশোরীর প্রেম অপ্রগল্‌ভ স্নিগ্ধ অথচ প্রভাতের সৌরচ্ছটার মতই প্রোজ্জ্বলতায় অধৃষ্য। রসসান্দ্রতা চৈত্যসত্তার স্বভাবধর্ম হলেও তা প্রজ্ঞা এবং ঈশনা হতে বিযুক্ত নয়—এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

সাধনা অনন্তেরই সাধনা, অনন্তকেই আমাদের পেতে হবে। অনন্তকে পেতে গিয়ে সান্তকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, একথা বলছি না; কিন্তু অনন্তকে পরিপূর্ণরূপে না জানলে সান্তের রহস্যও তো বোঝা যায় না। অবিগ্রহের তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হলে তবে বিগ্রহের মধ্যে তাঁর অবতরণকে পুরাপুরি আস্বাদন করা সম্ভব হয়। লোকোত্তরই লৌকিকের উৎস, একথা ভুললে বিপদ আছে। মন লৌকিকের উপর লোকোত্তরের খানিকটা আরোপ করে তাকে মহীয়ান করে তুলতে পারে, কিন্তু তাতেই কি লোকোত্তরের স্বরূপের পরিচয় মেলে? আগে স্বরূপজ্ঞান হওয়া চাই, তবেই আরোপ সিদ্ধ হতে পারে। তাঁকে জেনে সব জানা, তাঁকে পেয়ে সব পাওয়া, তাঁর আনন্দে সবকিছুকে নন্দিত করা—এই হল সাধনার সত্য ধারা। কবি যতই বলুন না কেন, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি আর না করি, যোগাসনে কিন্তু সবাইকে বসতে হবে, মনের উজান ঠেলে অতিমানসের দিকে অভিযান চালাতেই হবে। নইলে দৃশ্যে-গন্ধে-গানে প্রাকৃত মনের আনন্দটুকুই ফিরে পাব, তাঁর আনন্দকে নয়।

যে-আনন্দ তাঁর আনন্দ, যে-প্রেম তাঁর আদিত্যহৃদয়ের হিরণ্যচ্ছটা, অতি-মানস বিজ্ঞানভূমিতেই তা নিরূঢ়। আগেই বলেছি, যোগিচিত্তের ভালবাসাই সত্যকার ভালবাসা। তাতে তামসিক মূঢ়তা নাই, রাজসিক ক্ষিপ্ততা নাই।

সত্ত্বের বিক্ষেপও নাই। অথচ শুদ্ধসত্ত্বের রসোল্লাস তাতে আছে। একাগ্রভূমিক প্রভাস্বর ধ্যানচিত্ত তার প্রতিষ্ঠা, নিরোধের সুনীল শূন্যতা তার পটভূমিকা। সে-প্রেম অবন্ধন থেকেই অদৃশ্য বাহুবন্ধনে সবাইকে হৃদয়ে বাঁধে, সমস্ত সম্বন্ধের অতীত থেকেই বিচিত্র সম্বন্ধের পরিবেষ্টনীতে ধরা দেয় সবার মধ্যে, অক্ষরের অতল নৈঃশব্দ্য হতে হৃদয়ে-হৃদয়ে ঝঙ্কৃত করে চলে অশ্রুত সুরের গুঞ্জন। সে-প্রেম অরূপকে দেয় রূপ, রূপের ঘটায় রূপান্তর। তার দৃষ্টি-সৃষ্টির বীর্য বহুর অন্তরে জ্বালায় একের হোমশিখা। বিশ্ব আর বিশ্বাতীতের মাঝে সে প্রেম হ্লাদিনীর সেতু।

*

জীবন-যজ্ঞানলের দুটি শিখার কথা বলা হল—প্রজ্ঞার শিখা আর প্রেমের শিখা। এইবার প্রাণের শিখার কথা বলি।

প্রজ্ঞার কারবার ভাব নিয়ে। প্রেম বস্তুকে আশ্রয় করলেও ভাবই তার স্বরূপ—বস্তু আর ভাবের মাঝে সে যোগসূত্র। কিন্তু প্রাণের কারবার বস্তুকে নিয়ে, যার উপরে জীবনের ভিত্তি। জীবন যেন একটা বনস্পতির মত। তার চূড়ায়-চূড়ায় প্রজ্ঞার আলোঝলমল আকাশে ফুটছে প্রেমের বিচিত্র ফুল। কিন্তু প্রাণ সেই বনস্পতির কান্ড শাখা প্রশাখা পল্লব; গুহাসঞ্চারী অগুনতি শিকড় দিয়ে মাটির বুক থেকে সে রস টানছে, পত্রপুট দিয়ে আলোবাতাস হতে শক্তি আহরণ করছে। সে ফুল নয়, কিন্তু সে না থাকলে ফুলও তো ফুটত না।

অধ্যাত্মসাধকের যত বিপদ এই প্রাণকে নিয়ে। মাটিঘেঁষা বলেই প্রজ্ঞা আর প্রেমের নির্মলতার মধ্যে মালিন্য ছড়ায় সে-ই। মানুষ আকাশে উড়তে চায়; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রাণ তাকে আবার মাটিতে নামিয়ে আনে। তাই বৈরাগী বলেন, ওর সঙ্গে অসহযোগ কর, নইলে আর উপায় নাই। অনুরাগী বলেন, কিছুদিন ওকে সইতে রাজি আছি; কিন্তু চিরকাল ওর বোঝা বইতে আমি পারব না, একদিন ওকে ছেড়ে যেতেই হবে।

প্রাণের বাধা যে আছে, একথা অস্বীকার করে লাভ নাই। দেহের জড়ত্ব, বাসনার উত্তালতা, মনের বিক্ষেপ—এগুলি কার মধ্যে নাই? এই নিয়েই তো ব্যক্তির জীবন, সমাজের জীবন। অভাবনীয়ের 'ক্বচিৎ-কিরণে' মন যদিই-বা

দীপ্ত হয়, সে-দীপ্তির কতক্ষণ আয়ু? আবার আসে চাঞ্চল্য, নামে অবসাদ। এই আবর্তন চলছে জীবনভোর। এ যেন সেই কুকুরের লেজ—যতই তাকে সিধা করে ধরে রাখ না কেন, ছেড়ে দিলেই যেই-কে-সেই। তবে আর মিছামিছি ও-চেষ্টায় গলদঘর্ম হওয়া কেন? লেজটা যদি কেটে ফেলা যায়, তাহলেই তো আপদ কাটে।

কিন্তু এসব হল রাগের কথা, ঝামেলা যে সইতে নারাজ তার কথা। একথা মনে রাখতে হবে, বাধাটা জীবনে কেবল লোকসানই নয়, তার একটা লাভের দিকও আছে। বাধার সঙ্গে লড়তে গিয়ে শক্তি বাড়ে, জীবনের দাম বাড়ে। আর সে-শক্তির যোগান আসে ওই প্রাণ থেকে। প্রাণের মধ্যেই প্রাণের সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। তার জন্য তার স্বরূপের জ্ঞান হওয়া দরকার। প্রাণ যখন বিশ্বব্যাপারের অঙ্গীভূত, তখন কোথাও-না-কোথাও তার একটা সার্থকতা আছেই। যদি তার স্বরূপের সন্ধান পাই তাহলে তার সার্থকতারও সন্ধান পাব।

প্রাণের স্বরূপ হল শক্তি। শক্তি নিজে ভালও নয়, মন্দও নয়—তাকে ভাল বা মন্দ বলি লক্ষ্যের বিচারে। ভাল কাজে যদি শক্তির প্রয়োগ করি তাহলে সে ভাল; মন্দ কাজে প্রয়োগ করলে মন্দ। যে-শক্তি মানুষকে নামায়, সেই শক্তিই আবার তাকে উপরের দিকে টেনে তোলে। তান্ত্রিক বলেন, যে-মা বাঁধেন, সেই মা-ই আবার বাঁধন খোলেন। বন্ধন থেকে মুক্তির দিকে চেতনার অভিযান চলছে—এই হল বিশ্বলীলার তাৎপর্য। এর সমস্তই শক্তির ব্যাপার, কি না প্রাণের ব্যাপার। অজ্ঞানে বন্ধন, জ্ঞানে মুক্তি; স্বার্থপরতায় বন্ধন, পরার্থপরতায় বা প্রেমে মুক্তি। প্রাণই সেই মুক্তি আনে। প্রাকৃতভূমিতে দেখছি, প্রাণ আমাদের বন্ধনের জালে জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু এটা সাময়িক-ভাবেই সত্য, নিত্যসত্য নয়। জড় হতে চেতনার উন্মেষের কতকগুলি ধাপ আছে—তার একটা ধাপে বন্ধন থাকবেই। আসক্তিই বন্ধন। কিন্তু চেতনাকে একটা ধাপে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে আসক্তিরও তো দরকার হয়। শাস্ত্রে তাকে বলে অভিনিবেশ। অভিনিবেশে একটা অন্ধতা আছে সত্য, কিন্তু তার মধ্যে নিজের ঘর গুছিয়ে নেবার একটা তাগিদও আছে। গোছানোর কাজ শেষ হলেই প্রাণ বলে, আর নয়, এইবার বেরিয়ে পড় নতুন প্রতিষ্ঠার খোঁজে। এমনি করে প্রাণের শক্তিতে জীবচেতনা ধাপে-ধাপে এগিয়ে চলেছে। এই এগিয়ে চলার শক্তি হল প্রাণের আসল শক্তি।

এগিয়ে চলার দুটো ধারা হতে পারে। এক, চেতনাকে বিবিক্ত অন্তর্মুখ সূক্ষ্ম এবং একাগ্র করে এগিয়ে চলা। স্বভাবতই জগৎ তখন আমাদের হিসাব থেকে বাদ পড়ে। আরেক ধারা হল, চেতনাকে সমস্ত অবরোধ থেকে মুক্ত করে আকাশজোড়া আলোর মত সবার উপরে ছড়িয়ে দেওয়া। জগৎ তখন বাদ পড়ে না। দুটি ধারাকে মিলিয়ে নিতে পারলে সাধনা পূর্ণাঙ্গ হয়। বস্তুর মূলে ভাব; অন্তরে ডুবি সেই ভাবকে ধরবার জন্য। কিন্তু ভাবকে পেয়ে যদি সেখানেই থেকে যাই, তাহলে পাওয়া পূর্ণ বা সুপ্রতিষ্ঠিত হল না। ঘুম থেকে জেগে ওঠার মত সমাধির পর ব্যুত্থান স্বভাবের নিয়মেই হয়। ঘুমের বিশ্রাম এবং তৃপ্তি যেমন জাগরণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে সমর্থ করে, তেমনি সমাধির প্রশান্তিও ব্যুত্থানের মধ্যে আলো আনন্দ আর বীর্যের সঞ্চার করতে পারে। বারবার এমনিতর সমাধিজ-শক্তির অভিষেকে ব্যুত্থানও ক্রমে সমাধিধর্মা হয়ে ওঠে। তাকেই গীতায় বলা হয়েছে স্থিতপ্রজ্ঞের জাগ্রৎ-সমাধি। মরমীয়ারা বলেন সহজ সমাধি। প্রজ্ঞা আর প্রেমের বীর্য তখন প্রাণকেও জারিত করে। পুরুষোত্তমকে তখন পাই শুধু অন্তরে নয়, বাইরেও। দেখি, তিনিই সব-কিছু হয়েছেন। অন্তরের গহনে তিনি সুপ্তিনিথর শান্তির পারাবার, ভাবলোকে আলোয় উচ্ছল, বহির্লোকে বিচিত্র শক্তিস্পন্দে স্পন্দিত। এই প্রাণস্পন্দটুকু বাদ দিয়ে তাঁকে পাওয়া পূর্ণ হয় না। বহির্মুখ চেতনায় অশুদ্ধ প্রাণের প্রমত্ততা—এও যেমন উপাদেয় নয়, তেমনি অন্তর্মুখ চেতনার নিরালোক গহনে বা প্রভাস্বর লোকে প্রাণের স্তম্ভনকে একমাত্র সত্য বলে জানা—একেও তো উপাদেয় বলতে পারি না। শিবের তপোবীর্যে শক্তি শুদ্ধ হবে, আর সেই পরিশুদ্ধ শক্তির সঙ্গে ঘটবে শিবের সামরস্য—তবেই জীবনে আসবে সিদ্ধির পূর্ণতা।

প্রজ্ঞা প্রেম আর প্রাণের সাধনা চলবে অঙ্গাঙ্গী হয়ে, কেননা জীবনেও তারা অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে। প্রজ্ঞা আর প্রেম নিঃসন্দেহে মানুষের পরম পুরুষার্থ; কিন্তু শক্তিও কি তার পুরুষার্থ নয়? শক্তির অপপ্রয়োগ সম্ভব বলেই কি আমরা শক্তির সাধনা করব না? আসুরিক শক্তি অন্ধ নিষ্করুণ প্রমত্ত। কিন্তু দেবতার শক্তি তার উপর বিজয়ী হোক—এই নিগূঢ় অনুভূতিই কি চিরকাল ধরে মানুষের প্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে আসছে না? প্রজ্ঞা আর প্রেমকে শক্তির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তুরীয়চেতনার নিরাপদ লোকে প্রতিষ্ঠিত করলেই কি তাদের চরম সার্থকতা? রূপান্তর ঘটানোর যুযুৎসু বীর্য হতে কি তারা

বঞ্চিত? বুদ্ধের প্রজ্ঞা আর গৌরাঙ্গের প্রেম কি জগতের মূঢ় আত্মরতি-পরায়ণ চেতনায় বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে চায়নি? ব্রহ্ম যেমন চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ, তেমনি তিনি শক্তিস্বরূপও। বিসৃষ্টির ধারা ধরে তাঁর শক্তি যেমন চিৎ হতে জড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, তেমনি আবার চিৎ-স্ফুরণের প্রবেগে জড় হতে উত্তরায়ণের ধারা ধরে উজিয়েও চলেছে। এই উত্তরায়ণই দিব্যকর্ম এবং প্রাণের তপস্যা। প্রজ্ঞা আর প্রেমেরও তা-ই স্বধর্ম। প্রজ্ঞা প্রেম আর প্রাণ—এ তিনের মাঝে মৌলিক কোনও বিরোধ নাই।

প্রাণের উদয়নে সঙ্কট দেখা দেয় কামনা হতে। কামনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ক্ষুদ্র অহন্তা। সে চায় আত্মতর্পণ, আত্মোৎসর্গ নয়। যজ্ঞ-ভাবনা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ধর্ম-কর্ম বল আর জগৎসেবাই বল, আমাদের সব-কিছুর মূলে সূক্ষ্মভাবে রয়ে গেছে অহমিকার তর্পণ। সঙ্কীর্ণ অহং যে শুধু বৃহতের উদার স্পর্শ হতে বঞ্চিত তা নয়, সে-ই জগৎজোড়া যত বিরোধ আর সঙ্ঘর্ষের মূল। এই অহংকে বলতে পারি কামপুরুষ। জীবন যতক্ষণ তার শাসন মেনে চলবে, ততক্ষণ কোথাও সোয়াস্তি নাই। কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না—এই তার দুর্ভাগ্য। অথচ এই কামপুরুষের আড়ালে রয়েছেন চৈত্যপুরুষ—যাঁকে বলতে পারি বৃহতের একটি কলা। তিনিই দিব্যপ্রাণ, পরম-পুরুষের দিব্যসঙ্কল্পের বাহন তিনি। কলায়-কলায় এই চিন্ময়-প্রাণের উপচয় আমাদের জীবনের পরম তাৎপর্য। সে-উপচয় ঘটে বৃহতের সঙ্গে যোগযুক্ত আত্মনিবেদনে, 'অসীম আমার সব ছেয়ে আছেন, আমার জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে তাঁরই ইচ্ছা তরঙ্গিত হয়ে চলেছে'—এই পরম আশ্বাসে এবং অকুণ্ঠ প্রত্যয়ে। যে-আমি তাঁরই চিৎকণ তাঁরই স্ফুলিঙ্গ, সেই আমিই সত্যকার আমি। তার উপচয় তাঁরই চেতনার আনন্দের এবং শক্তির উপচয়। আর এই উপচয়েই প্রাণের সার্থকতা। আমার কামনা (Desire) রূপান্তরিত হবে তাঁর সঙ্কল্পে (Will), আমি সম্পূর্ণভাবে তাঁর হব, তবেই জীবন হবে সর্বতোভদ্র এবং ঋতচ্ছন্দ। জীবনের এই দিব্য-রূপান্তরই প্রাণের কর্ম—যা অখণ্ড যজ্ঞভাবনার তৃতীয় পর্ব।

*

প্রেমের কর্ম—প্রাণের কর্ম

জীবনের উচ্ছেদ নয়, তার দিব্যরূপান্তর হল পূর্ণযোগের লক্ষ্য। এই রূপান্তরসিদ্ধির তিনটি শর্ত। প্রথমে চাই, জীবনের নিয়ন্তা হ'ক আমার কামনা নয়, তাঁর সঙ্কল্প। আমার আধারে গুহাহিত চৈত্যপুরুষকে জীবনের পুরোধা করতে হবে—এই হল দ্বিতীয় শর্ত। চৈত্যপুরুষ হবেন আমার প্রাণ-মনের দিশারী। আমার ধূমাচ্ছন্ন প্রমত্ত অহং এই চৈত্যপুরুষকে এখন আড়াল করে রেখেছে। অতএব ভাবনায় বেদনায় কর্মে অহংবুদ্ধির সম্পূর্ণ নিরাকরণ হল সিদ্ধির তৃতীয় শর্ত। আমি গেলে তবে তিনি আসবেন। আর এই তিনিই তো আমার সত্যকার আমি।

প্রথম শর্তটি আমাদের সুপরিচিত। সমস্ত অধ্যাত্মসাধনার এটি হল আসল বনিয়াদ। গীতায় আছে, কর্ম করবে কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা করবে না, তবেই কামনার উচ্ছেদ সহজ হবে। আর আছে সমত্বের উপদেশ—সুখ-দুঃখ শুভাশুভ জয়-পরাজয় সব-কিছুতেই সমভাব, ছোট-বড় শত্রু-মিত্র সবার প্রতি সমদৃষ্টি। আগেই বলেছি, এ-সমত্ব শুধু তিতিক্ষা বা ঔদাসীন্য নয়। এ হচ্ছে জীবনের গভীরে জগতের পিছনে এমন-একটা শাশ্বত অবিচল বৃহৎ সত্তাকে আবিষ্কার করা, যার নৈস্পন্দ্য হতে এই প্রাণস্পন্দের বিচ্ছুরণ—প্রশান্ত আকাশের গভীর হতে আলোর প্রচ্ছটার মত। এই বৃহতের কামনা নাই, আছে সঙ্কল্প; কেননা কামনা হল অজ্ঞান এবং অশক্তির ধর্ম, আর সঙ্কল্প হল অবন্ধ্য আত্মশক্তির অভিক্ষেপ। এই বৃহতের সঙ্কল্পকে যখন জীবনে রূপ ধরতে দেখি, তখন আর আমার কামনা থাকে না। তখন কর্ম হয় প্রাকৃত-অহংএর কামসঙ্কল্পের প্ররোচনায় নয়, দিব্যপুরুষের সত্যসঙ্কল্পের প্রেরণায়। আমি তখন একদিকে অকর্তা, আরেকদিকে তাঁর নিমিত্তমাত্র। আমি অকাম এবং সর্বত্র সমদর্শন, তাই অকর্তা। আমার সেই শূন্যতায় জ্বলে ওঠে তাঁরই চিৎশক্তির সৌরদীপ্তি, ধরে আমার প্রভাস্বর প্রাণময়পুরুষের রূপ। সেই পুরুষই তাঁর নিমিত্ত।

এই প্রাণময়পুরুষের প্রোজ্জ্বল চেতনাকে আশ্রয় করে আধারে ঘটে চৈত্য-পুরুষের আবির্ভাব। প্রাণময়পুরুষ নিমিত্ত, কিন্তু চৈত্যপুরুষ দিশারী—যদিও চরম দেশনার ভার তাঁর হাতে নাই। তিনি দিশারী—পরমপুরুষের প্রতিভূরূপে। ধ্রুবজ্যোতির ইশারায় চেতনাকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে আসা তাঁর কাজ। তাঁর আবেশে জীবন হয় সত্যসন্ধ। প্রাণকে তখন হাতড়ে-হাতড়ে পথ চলতে হয় না, অব্যভিচারী সত্যের অমোঘ প্রেরণায় তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ হয় নিয়ন্ত্রিত। চিত্তে আর তখন সংশয়ের ঘোর থাকে না,

কর্মে থাকে না দ্বিধা। বস্তুর স্বরূপজ্ঞানের জন্য বুদ্ধিকে তখন আর অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয় না, বোধিজাত আন্তর-প্রত্যক্ষ তখন বাহ্য প্রত্যক্ষের মত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আত্মপ্রকৃতি তখন হয় অনন্তের আহ্বানে জ্যোতিরভিসারিণী, প্রতি মুহূর্তে আত্মোৎসর্গের মাধুরীতে সুনন্দিতা।

এই হল সাধনার দ্বিতীয় পর্ব। তারপর চৈত্যপুরুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আধার যখন শুদ্ধসত্ত্ব হয়, তখন তাতে ঘটে দিব্য পুরুষের আবির্ভাব। তখন আর চাওয়া থাকে না, থাকে অনিঃশেষে শুধু পাওয়া। তখন আর আমার সাধনা নয়, তাঁর সিদ্ধির অনায়াস উন্মেষ। আমার 'এতদিনের আকাশ চাওয়া' তখন বিগলিত হয়ে যায় পলে-পলে যুগে-যুগে তাঁরই হওয়ার অফুরন্ত উল্লাসে। আমার সবটুকু তখন তিনি। এই হল তৃতীয় পর্ব।

কামনার উচ্ছেদ, সমত্ব, প্রাণপুরুষের উদয়ন, চৈত্যপুরুষের অনুশাসন এবং দিব্যপুরুষের আবেশ—এই ক্রম ধরে জীবনের দিব্য রূপান্তর ঘটে। কিন্তু এ-ক্রম সবসময় বজায় থাকে না, কেননা মানুষের স্বভাব সংস্কার এবং অধিকার বিচিত্র। এমনও হতে পারে, আধারের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না হতেই সাধকের তীব্র সংবেগের ফলে দিব্যপুরুষের আবেশ চকিতের মত নেমে এল। এল কিন্তু থাকল না, বিদ্যুল্লেখার মত নিমেষে আবার সে মিলিয়ে গেল। তারপর শুরু হল 'বিষামৃতে একত্র করিয়া' অন্তরমথনের দীর্ঘ পর্ব। এই দিন এই রাত, এই তিনি সামনে এই তিনি আড়ালে, এই অনায়াস অনুভবের আশ্বাস এই আবার গুপ্তশত্রুর অতর্কিত অভিঘাত—এ-নাগরদোলার যেন আর বিরাম রইল না। সাধককে তখন ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। 'একবার চকিতের দেখা যাঁর পেয়েছি জীবন ভরে তাঁকে একদিন পাবই'—এই গভীর প্রত্যয় নিয়ে অতন্দ্র থাকতে হয়। যোগীরা বলেন, দীর্ঘকাল নিরন্তর সৎকারের ফলে যোগ দৃঢ়ভূমি হয়। বাধা তো থাকবেই। এমন-কি চারদিক গুছিয়ে নিয়ে ক্রম অনুসারে যে সাধনা করছে, তারও পথের বাধা কি কিছু কম? কিন্তু তাবলে হাল ছাড়তে নাই। 'নিশ্চয়েন যোক্তব্যোঽনির্বিণ্ণেন চেতসা'—দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে মনমরা ভাবকে একদম আমল না দিয়ে সাধনা করে যেতে হবে। জানি, মা আমার সহায়, সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, হতাশা আমারই মনের মায়া। চারদিক অন্ধকার ভাবলে অন্ধকার আর আলো ভাবলেই আলো।

নিজেকে জানা জগৎকে জানা আর ব্রহ্মকে জানা—এই নিয়ে জানার পূর্ণতা।

আর জগৎকে জানা বা ব্রহ্মকে জানা সত্য হয় নিজের জানার ভিতর দিয়েই। সেই নিজেকে আমরা কতটুকু জানি? বলতে গেলে কিছুই নয়। যতক্ষণ জেগে আছি ততক্ষণই আমাদের জানাজানির কারবার। কিন্তু সে-জানাও তো একটা উপর-ভাসা জানা মাত্র। কথায় বলে, 'পরচিত্ত অন্ধকার।' কিন্তু নিজের চিত্তও কি তা-ই নয়? বাইরের জগতের নাড়া খেয়ে সাড়া দিয়ে চলেছি, সাড়া দিতে গিয়ে বাইরেই ছিটকে পড়ছি,—নিজের ভিতরের দিকে তাকাচ্ছি কোথায়? যদি তাকাতাম, তাহলে দেখতে পেতাম, যাকে আমরা জাগ্রৎ-চেতনা বলি, সে আমাদের সমষ্টি-চৈতন্যের একটা ভগ্নাংশ মাত্র। উত্তর-সমুদ্রে বরফের পাহাড় ভেসে চলে। তার চূড়াটুকুই জলের উপর জেগে থাকে, জলের তলায় থাকে এক বিশাল বিস্তার। আমাদেরও তেমনি চেতনার নীচে আছে অবচেতনা (subconscious), আর অধিচেতনা (subliminal consciousness), যাদের কোনও খবরই আমরা রাখি না। অথচ তাদের অলঙ্ঘ্য শাসনেই আমাদের বাইরের চেতনা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অবচেতনা থেকে জাগছে বাসনা, স্মৃতি আর সংস্কার তলিয়ে যাচ্ছে ওরই অতলে, আবার ওখান থেকে নতুন বাসনা হয়ে উপরে উঠে আসছে। ওখানে কি করে যে কি হচ্ছে, তার কোনও খবর কি আমরা রাখি? অবচেতনার তলায় রয়েছে অধিচেতনার বিশাল বিস্তার, যার মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। সেখানে শুধু ইহজন্মের বা ইহলোকের নয়—জন্মজন্মান্তরের লোক-লোকান্তরের বাসনা সংস্কার আর শক্তির খেলা চলছে। আমার বাইরের চেতনা তার কোনও খবর রাখে না, অথচ অন্তশ্চেতনার সঙ্গে রয়েছে তার অপরোক্ষ যোগ। অবচেতনাকে জানলে যেমন ব্যষ্টিপ্রকৃতির মূলকে জানা যায়, এই অধিচেতনাকে জানলেও তেমনি জানা যায় বিশ্বপ্রকৃতির মূলকে। অধিচেতনার ভিতর দিয়েই বিশ্বচেতনায় পৌঁছবার পথ। কিন্তু এতেই জানা শেষ হয় না। বরফের পাহাড়ের নীচে সমুদ্র, উপরে আকাশ—অথবা তাকে ঘিরে উপরে-নীচে আকাশবৎ অনন্তের বিস্তার। ওই-আকাশকেও জানতে হবে। আকাশ হল অতিচেতনা (superconscient)—মানসোত্তর চিৎশক্তিরাজির যা স্বধাম। অতিচেতনার তুঙ্গতা হতে অধিচেতনার ব্যাপ্তি আর অবচেতনার গহনতম দেশ পর্যন্ত যখন আত্মচৈতন্যের দীপ্তি প্রসারিত হবে, তখনই আমাদের জানা পূর্ণ হবে।

পুরুষের এই অখণ্ড সম্যক্-জ্ঞানেই (integral knowledge) প্রকৃতির শক্তির মুক্তি ঘটে। এখন আমাদের চেতনা দেহনির্ভর, আর তা দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বাইরের জগতে নিতান্ত উপরভাসা রকমে নিজেকে যতটুকু জানছি এ-জানায় আত্মশক্তি আর কতটুকু ছাড়া পাচ্ছে? কিন্তু এই জানাকেই গভীর বিপুল এবং উত্তুঙ্গ করতে হবে। মহাশক্তি তখন লাগবেন অবরুদ্ধ চেতনার চারদিককার দেয়াল ভাঙার কাজে। প্রথমেই তিনি ভাঙবেন দেহের দেয়াল। এখন দেহের মধ্যে চৈতন্য বন্দী হয়ে আছে—যেন মাটির হাঁড়িতে প্রদীপের মত। তার আলো বাইরে ছড়াতে পারছে না। দেহের বাইরে যে-জগৎ, সেটা আমাদের কাছে অনাত্মজগৎ। সে চিরকাল আমাদের বাইরেই পড়ে থাকে; ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দিয়েও তাকে আমরা আপন করে নিতে পারি না। কিন্তু হাঁড়ির দেয়ালটা যদি ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে? যদি সেটা মাটি থেকে কাচ হয়, এমন-কি কাচ থেকে আলো হয়ে যায়? তাহলে বাইরের আলো আর ভিতরের আলোয় কোনও ব্যবধান থাকে না। ভাণ্ডের বিজ্ঞান তখন পরিণত হয় ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞানে। বৈজ্ঞানিক আজ যেমন জড়শক্তি নিয়ে খেলা করছেন, যোগী তখন বিশ্বশক্তি নিয়ে তেমনি খেলা করতে পারেন। বিশ্বশক্তি স্বরূপত চিৎশক্তি—তারই অভিব্যক্তি মনঃশক্তি প্রাণশক্তি এবং জড়শক্তিতে। তিনটি শক্তি সম্পুটিত হয়ে আছে জীবশক্তিতে। যোগীর কারবার এই জীবশক্তিকে নিয়ে। তাই জড়কে তিনি জড়রূপেই শুধু দেখেন না, দেখেন চেতনার বাহনরূপে। সুতরাং জড়শক্তির উপর তিনি কাজ করেন আত্মচৈতন্যের আবেশ দিয়ে। এইখানে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তাঁর তফাত। যোগীর বেলায় শক্তির কাজ চলে বিশ্বচৈতন্যকে আশ্রয় করে বিশ্বমন ও বিশ্ব-প্রাণের ভিতর দিয়ে বিশ্বজড়ের উপর, যাতে জড়ও ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে তার অন্তর্গূঢ় চৈতন্যের স্ফুরণের আধার হতে পারে। আত্মগত ধাতুপ্রসাদ (transparency of substance) বিশ্বগত ধাতুপ্রসাদের প্রয়োজক হবে, যেমন কাঠের একটা অংশে আগুন ধরলে পরে সে-আগুন ক্রমে সমস্ত কাঠটায় ছড়িয়ে পড়ে তেমনি করে—এই হল যোগীর সাধনা।

এ-সাধনা সিদ্ধ হতে পারে অতিমানস শক্তির অবতরণে এবং আবেশে। সে-আবেশ হবে শুধু মনে এবং প্রাণে নয়—জড়েও, শুধু ব্যক্তিতে নয়—বিশ্বেও। ওই কাঠের উপমা দিয়ে বলা চলে, আগুন ধরতে পারে কাঠটার উপরে-উপরে, একেবারে তার মজ্জায় প্রবেশ নাও করতে পারে; কিংবা কাঠের একটা অংশ আগুন হয়ে উঠল, বাকিটা তাতল তবু জ্বলল না। কিন্তু আগুনের যদি জোর থাকে, তাহলে কাঠটা আগাগোড়া একেবারে ভিতর পর্যন্ত আগুন হয়ে উঠবে। এই জোর হল প্রাণের জোর। চিৎশক্তিকে বিশ্বজড় পর্যন্ত

সমাবিষ্ট করাই হল প্রাণের কর্ম। জড় এবং চৈতন্যের মাঝে প্রাণ সেতু বলেই তা সম্ভব।

*

দিব্যজীবনের উপযোগী ক্রিয়াযোগের মূলসূত্রগুলি কি, তা দেখলাম। এখন যোগের সঙ্গে জীবনের কি সম্পর্ক, সেকথা আবার খতিয়ে দেখতে পারি।

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, বাইরের জীবনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে কেবল অন্তরে তলিয়ে থাকা পূর্ণযোগের লক্ষ্য নয়। তবে সাময়িকভাবে এমনতর তলিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনও যে কখনও হতে পারে, সেকথাও অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু তলিয়ে যাওয়াটা উপায়ই, লক্ষ্য নয়।

কর্ম যোগযুক্ত হলে হয় সেবা। কিন্তু শুধু দেবসেবা বা জনসেবাই যে যোগীর কর্তব্য, তা নয়। সব কর্মের ভিতর দিয়ে ভগবৎসেবা করে যেতে হবে—এই হল যোগীর আদর্শ। কোন্ কর্ম হেয় আর কোন্ কর্ম উপাদেয়—তার নির্দেশ পাব অন্তর্যামীর কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে নয়। আমার কোনও আসক্তি থাকবে না—এই হল আসল কথা। আমি সবই করতে পারি, আবার কিছু না-ও করতে পারি : তিনি যেমন করান, আমি তেমনি করি।

তারপর, যোগের পথে কোনও রফা চলবে না। জীবনের খানিকটা আধ্যাত্মিক হবে আর খানিকটা হবে লৌকিক—এ হলে হয় না। বর্ণচোরা আমের উপমা এক্ষেত্রে অচল। ভিতরে যদি রসের পরিপাক হয়ে থাকে তো খোসা পর্যন্ত তার আভা ফেটে বেরবে। সমস্তটা জীবন নিয়েই যোগ, আর সে-যোগ রূপান্তরের যোগ—এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

দুটি দিকে খেয়াল থাকা চাই। অহংকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই চলবে না। সে চায় প্রাণবাসনার তর্পণ, আর তার জন্য মন-বুদ্ধিকে দাঁড় করিয়ে দেয় তার উকিল করে। এইখানে হুঁশিয়ার হতে হবে। সব চাওয়া শেষ করে দিতে হবে। সব ছাড়লেই তবে সব পাওয়া যায়—এই হল সত্য।

আর, ডুবতে হবে নিজের গভীরে : 'আমি কান পেতে রই আপন হৃদয়-গহনদ্বারে।' সেইখানে শুনি তাঁর বাণী, আর তারই আলোতে পথ চলি। বাণী আসে অগম শূন্য হতে, যেখানে আমার চাওয়া-পাওয়ার সমাধি। তাই তার আলোও রংছুট।

৭

সদাচার ও স্বাতন্ত্র্য

কর্ম করতেই হবে সবাইকে, না করে উপায় নাই। কিন্তু তবুও কর্মের ভাল-মন্দ আছে, কর্তব্য-অকর্তব্যের বিচার আছে। এ-বিচার করে মানুষের ধর্মশাস্ত্র, কর্তব্যকর্মের একটা ছক বা আদর্শ সে বেঁধে দেয়। এই ছকবাঁধা কর্মকে আমরা সাধারণত বলি 'সদাচার'।

সদাচারকে ব্যাপক অর্থে নিলে বলতে পারি, আধ্যাত্মিকতার তা বনিয়াদ। উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, দুশ্চরিত হতে যে বিরত নয়, সে তাঁকে পায় না। গীতায় কামচারীর নিন্দা আছে—যা-খুশি তা-ই করতে পারাই স্বাতন্ত্র্যের সত্যকার রূপ নয়। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগের গোড়াতেই আছে শম-দমের কথা, যা যোগজীবনের ভিত্তি। সুতরাং সদাচারকে আমরা অধ্যাত্মসাধনার অপরিহার্য প্রাথমিক সাধন বলে গ্রহণ করতে পারি।

প্রশ্ন হবে, সদচারের স্বরূপ কি? আচরণে কর্মে একটা আদর্শের শাসন মেনে চলব, এটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু আদর্শের সন্ধান কোথায় পাব—বাইরে না ভিতরে? কার শাসন মানব—মানুষের না অন্তর্যামীর?

সব ধর্মে সব সমাজেই সদাচারের একটা গতানুগতিক আদর্শ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বোধোদয় না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা তার শাসন মেনে চলি। কিন্তু বোধ জাগলে পরে দেখি, বাইরের শাস্ত্র মানতে গেলে অনেকসময় অন্তর্যামীর প্রশাসনকে অবহেলা করতে হয়। ফলে আত্মচৈতন্যের স্ফুরণে বাধা পড়ে। অন্ধভাবে গোষ্ঠীর শাসনকে মেনে চললে আত্মস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়, তাতে কারও কল্যাণ হয় না—না ব্যক্তির না গোষ্ঠীর।

এইখানে অন্তরাবৃত্তির কথা ওঠে। অন্তরাবৃত্তি ব্যক্তির ধর্ম—গোষ্ঠীর নয়। আবার অন্তরাবৃত্তিই আধ্যাত্মিকতার প্রাথমিক লক্ষণ। অন্তরাবৃত্তিতে বাইরের সঙ্গে বিরোধ নাও ঘটতে পারে। কিন্তু তবুও একথা সত্য, যে অন্তরাবৃত্ত সে সবক্ষেত্রে বাইরের শাসন মেনে চলতে বাধ্য নয়। বাইরকে সে মানে না, এইখানে সে স্ব-তন্ত্র। অথচ একটা-কিছু সে মানে—সে হল তার অন্তর্যামীর দেশনা (guidance); এইখানে সে পরতন্ত্র। তার এই স্বাতন্ত্র্যে আর পারতন্ত্র্যে

কোথাও বিরোধ নাই। উভয়ত্র সে প্রবুদ্ধ, এই তার বৈশিষ্ট্য।

প্রবুদ্ধচেতনা নিজের অন্তর্যামীকে অনুভব করে বিশ্বের অন্তর্যামিরূপে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তার একার জীবন—কিন্তু সবাইকে ছেড়ে নয়, সবাইকে নিয়েই। তার জীবনকে সে অনুভব করে বিশ্বজীবনের একটা অংশরূপে। বিশ্বলীলার যে চরম তাৎপর্য, তার সঙ্গে তার জীবনায়নের সুর মেলানো। সে-তাৎপর্য হল জড়-প্রাণ-মনের সঙ্কোচ হতে চেতনার মুক্তি এবং প্রসার। তার কর্ম এবং আচরণ হবে এই চিৎপ্রকাশের অনুগত।

চেতনার সঙ্কোচ ঘটায় আমাদের অহং। অহং বস্তুত পরতন্ত্র; কিন্তু নিজেকে যে সে স্ব-তন্ত্র মনে করে, এইখানে তার ভুল। অহং জ্ঞাতা, অহং ভোক্তা, আবার অহং কর্তাও। কর্তৃত্বের অভিমান হল তার সবচাইতে বড় অভিশাপ। এই অভিমানে সে মনে করে বসে, জগৎটা চলবে তারই খেয়ালে। তার নিজের ইষ্টসিদ্ধি ছাড়া জগতের আর-কোনও তাৎপর্য নাই, থাকতে পারেও না। তার চেতনা আর সংকল্প ছাড়া জগতের পিছনে বৃহত্তর কোনও চিন্ময় সত্য-সঙ্কল্পের প্রবর্তনা নাই।

এটা একটা হাস্যকর স্পর্ধার কথা বটে, কিন্তু তবুও জীবনের প্রথম পর্বে অহংএর এই স্বাতন্ত্র্যাভিমানেরও একটা সার্থকতা আছে। বিশ্বের সর্বগত শক্তিকে আত্মগত করবার জন্য অহংএর দরকার হয় প্রথমটায়। খোসার মধ্যে থেকেই বীজ পুষ্ট হয়; তারপর যখন সময় হয়, তখন খোসা ফাটিয়ে সে অঙ্কুরের পাখা মেলে। অহন্তাই ক্রমে পুষ্ট হয় আত্মভাবে। অহন্তার স্ফীতিতে দানবের আবির্ভাবও হয় বটে; কিন্তু দানব হওয়া মানবের নিয়তি নয়, তার নিয়তি দেবতা হওয়া। দানবত্ব প্রকৃতি-পরিণামের উপসৃষ্টি (by-product), দেবত্বই লক্ষ্য।

মানুষের মধ্যে দেবত্বের সূচনা হয় ব্যাপ্তিচৈতন্যের বোধ থেকে। ব্যাপ্তিবোধ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। যে জড়বাদী, সেও স্বীকার করবে, তার জড় দেহ এক অনন্তব্যাপ্ত মহাজড়ের অংশমাত্র। জড়ের ব্যাপ্তি যদি স্বীকার করি, তাহলে শক্তির ব্যাপ্তি স্বীকার করতেই-বা বাধা কোথায়, বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞানে জড় যখন শেষপর্যন্ত শক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে? আর শক্তির ব্যাপ্তিকে মানলে চেতনার ব্যাপ্তিকেই-বা মানব না কেন? জড়ের ব্যাপ্তি ইন্দ্রিয়গম্য, শক্তির ব্যাপ্তি অনুমানগম্য; চেতনার ব্যাপ্তিকে বলতে পারি বোধগম্য। জড়ত্বের কুসংস্কার না গেলে এ-বোধ জাগে না, তা সত্য। কুসংস্কার

যেতে সময় লাগে; বৈষয়িক মানুষেরও আধ্যাত্মিক হতে সময় লাগে—ওটা আসলে বোধোদয়ের ব্যাপার। আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তিতেই অনুভব হয়, বিশ্ব-লীলা এক বিশ্বান্তর্যামীর চিন্ময় প্রশাসনের লীলা। আমার জীবলীলা তারই ছন্দে বাঁধা। আত্মচেতনায় আমি স্ব-তন্ত্র, কিন্তু বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনায় আমি পরতন্ত্র। সেই চেতনাই আমার ধর্মের এবং কর্মের, ভাবনা বেদনা এবং সঙ্কল্পের নিয়ামক।

*

তা-ই যদি হয়, তাহলে আচারের গতানুগতিক বা মনঃকল্পিত আদর্শকে কখনও একান্ত করে তোলা চলে না। আচারের ভাল-মন্দ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে ভাল-মন্দের বিচার করতে হবে পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে। বলব, তা-ই ভাল যাতে দিব্যচেতনার উন্মেষ হয়, আর তা-ই মন্দ যাতে সে-উন্মেষে বাধা পড়ে। অবশ্য দিব্যচেতনার উন্মেষও কালের অপেক্ষা রাখে, সুতরাং কালক্রমে ভাল-মন্দের আদর্শেরও বদল হয়। আজ যা ভাল কাল তা মন্দ হয়ে যেতে পারে, তেমনি আজ যা মন্দ কাল তা ভালর পর্যায়ে উঠতেও পারে। একেবারে চরমে না পেঁছা পর্যন্ত এমনিতর একটা দ্বন্দ্ব থাকবেই। অবশেষে চেতনা যখন লোকোত্তর ভূমিতে উত্তীর্ণ হবে, তখন ভাল-মন্দের এই দ্বন্দ্ব আর থাকবে না। বৈদান্তিক বলবেন, তখন 'ন পুণ্যং ন পাপং, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্।'

কথাটা সাংঘাতিক, কিন্তু সত্য। 'ন পুণ্যং ন পাপম্'—তার অর্থ এই নয় যে এখন থেকে বেপরোয়া পাপাচরণের ফতোয়া পাওয়া গেল। আসল ব্যাপার হল, পুণ্য দিয়ে পাপকে নির্জিত করে-করেই এগিয়ে যেতে হবে এবং পাপের উপর বিজয় সম্পূর্ণ হলে পুণ্যের সংস্কারও বর্জন করতে হবে। এ যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা খুলে তার পর দুটি কাঁটাকেই ফেলে দেওয়া। কাঁটা যখন নাই, তখন ব্যথাও নাই, সুতরাং খোঁচাখুঁচিও নাই। চেতনা তখন স্বচ্ছ এবং স্ব-স্থ।

এই স্বচ্ছ-চেতনা যখন সক্রিয় হয় তখন যোগের ভাষায় বলা যেতে পারে, সে হয় 'ধর্মমেঘ' অর্থাৎ সে কেবল ধর্মই বর্ষণ করে, অধর্মের আভাসমাত্র তাতে থাকে না। কিন্তু সে-ধর্মকে লোকধর্মের মাপকাঠি দিয়ে মাপা চলে না। লৌকিক বিচারে জ্ঞাতিবধ পাপ। কুরুক্ষেত্রে জ্ঞাতিবধ হবে বলে অর্জুন বললেন, 'আমি যুদ্ধ করব না।' ভগবান বললেন, 'তুমি বুদ্ধির শরণ নাও; যে

বুদ্ধিযুক্ত, সে সুকৃত-দুষ্কৃত দুইই ছাপিয়ে ওঠে।' আবার বললেন, 'সব ধর্ম ছেড়ে একমাত্র আমার শরণ নাও, আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব।' নরহত্যা পাপ। কিন্তু রাজা যখন গুরু অপরাধে প্রাণদণ্ড দেন, তখন রাজার পাপ হয় না। অর্থাৎ প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে, ভাগবত দৃষ্টিতে, সমষ্টির দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্যের লৌকিক মাপকাঠি অচল। প্রজ্ঞা তটস্থ থেকে দেখছে—পাপ-পুণ্য নয়, প্রকৃতির ক্রিয়া। সে-ক্রিয়া লক্ষ্যহীন নয়, তার একটা পারার্থ্য আছে। যা-কিছু সে করছে, তা তার চাইতে পরতর (higher) একটা তত্ত্বের জন্যই করছে। এই পরতত্ত্ব হল চৈতন্য—আকাশের মত অনিবাধ বিপুল আত্মচৈতন্য। এই চৈতন্যের উন্মেষই প্রকৃতির পরমার্থ। উন্মেষ পর্বে-পর্বে হয়। পর্বগুলিতে দ্বন্দ্ব থাকে, চরম পর্বে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়। সুখ-দুঃখ-ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব সেখানে নাই, আছে অবর পর্বগুলিতে। তাই চরম ভূমি হতে প্রকৃতির ক্রিয়াকে যিনি দেখেন, তাঁর কাছে সুখ-দুঃখ নাই—আছে পরম আনন্দ, পাপ-পুণ্য নাই—আছে পরম কল্যাণ। যেখানে পাপ-পুণ্যের বোধ আছে, সেখানে নিশ্চয় সদাচারেরও আবশ্যকতা আছে। কিন্তু তাহলেই সদাচারের অধিকার সীমিত। তার সার্থকতার চরম বিচার হবে প্রজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে।

সদাচারের মোটামুটি চারটি আদর্শ আছে বলা যেতে পারে। প্রথম আদর্শের নিয়ামক হল ব্যক্তির স্বার্থ; দ্বিতীয়ের, সমষ্টির হিতকল্পে রচিত আইনকানুন; তৃতীয়ের, অন্তরঙ্গ ধর্মবোধ; আর সর্বশেষের, সর্বভূতান্তর্যামীর দিব্য প্রশাসন।

প্রাকৃত-মানুষের আচারের নিয়ামক হল প্রথম দুটি। দেহের আর প্রাণের প্রাকৃত দাবিগুলি তার কাছে বড়—স্থূল আত্মতর্পণই হল তার জীবনের লক্ষ্য। মূলত তার আচার নিয়ন্ত্রিত হয় স্বার্থের দ্বারা। নিরঙ্কুশ স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ থাকলে সে আর কারও ধার ধারত না। কিন্তু মানুষকে সমাজে থাকতে হয়, দশের মুখ চেয়ে চলতে হয়। তাই বাধ্য হয়ে তাকে খানিকটা পরার্থপরও হতে হয়। আমার যেমন স্বার্থ আছে, তেমনি অপরেরও তো আছে। স্বার্থে-স্বার্থে সংঘাত না বাধিয়ে রফা করতে পারলে শেষপর্যন্ত নিজের স্বার্থেরই পুষ্টি হয়। মানুষের পরার্থপরতা প্রথম আসে এইদিক থেকে। কিন্তু এই আপসরফার মহিমাও যে সে খুব ভাল বোঝে, তা মনে হয় না। তা হলে ভদ্রবেশী বর্বরতায় আজ জগৎ ছেয়ে যেত না।

স্বার্থসিদ্ধিই আগে, পরার্থপরতা তার আনুষঙ্গিক—প্রাকৃত-মানুষ জীবন

শুরু করে এই নীতি মেনে। পরার্থপরতায় তার চেতনা অহংএর সংকোচ হতে খানিকটা মুক্তি পায়। এই মুক্তির একটা আনন্দ আছে। গৃহাহিত শুভবুদ্ধি তাকে দেয় শ্রেয়ের আসন। প্রেয় ভাল নিশ্চয়ই, কিন্তু শ্রেয় যেন আরও ভাল। খেয়ে সুখ আছে, কিন্তু খাইয়ে আরও সুখ। সবার মধ্যে না হ'ক, অন্ততঃ কারও-কারও মধ্যে পরার্থপরতার অনুশীলনে শ্রেয়ের সংস্কার এমনি করে ক্রমে পাকা হতে থাকে। অবশেষে দেখা দেয় সমষ্টির জন্য আত্মবিসর্জনের প্রেরণা। ব্যক্তির অহং প্রসারিত হয় সমাজের অহংএ, দেশের অহংএ, এমন-কি বিশ্ব-মানবের অহংএ। তা-ই থেকে একধরনের নতুন ধর্মবোধের সৃষ্টি হয়—আধুনিক কালে যার নাম হয়েছে মানবতাবাদ (humanism)। বাউলের প্রতিধ্বনি করে সে বলে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য।' কিন্তু সে যে বাউলের 'মনের মানুষ, বা 'নিত্যের মানুষ'—একথা সে বলে না। এই আটপৌরে মানুষই তার দেবতা, তাদের প্রাকৃত-জীবনের পুষ্টিই তার জীবনব্রত।

সমষ্টির জন্য ব্যষ্টির আত্মবিসর্জন নিশ্চয় একটা খুব বড় ধর্ম। কিন্তু ব্যষ্টির আত্মপ্রতিষ্ঠাও তো একটা ধর্ম। যে আত্মপ্রতিষ্ঠ, সে আত্মসচেতন। আত্মসচেতনের আত্মবিসর্জনই সত্যকার ধর্ম। সামাজিক বিকাশের প্রথম অবস্থায় যূথসংস্কারের (herd instinct) বশে ব্যষ্টি মানুষ অচেতনভাবে সমষ্টির কাছে আত্মবিসর্জন করে এসেছে। কিন্তু কেবল তাতেই যে সমাজের প্রগতি সম্ভব হয়েছে, একথা সত্য নয়। সমাজ বস্তুত এগিয়ে গেছে আত্মসচেতন ব্যক্তির প্রেরণাকে আশ্রয় করে।

তখন প্রশ্ন ওঠে, কে বড়—ব্যক্তি, না সমাজ? জবাবে বলা যেতে পারে, দুইই অন্যোন্যনির্ভর। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজই ব্যক্তির প্রথম ধাত্রী। সেখানে সমাজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু সমাজকে আবার এগিয়ে নিয়ে চলে ব্যক্তির উদ্বুদ্ধ চেতনা। সমাজচেতনা সাধারণত মূঢ়, গতানুগতিকতার দাস। ব্যক্তির বিপ্লবী চেতনাই তার মধ্যে প্রগতির বেগ সঞ্চার করে। আজকাল আমরা যাকে সমাজ-সচেতনতা বলি, তা এখনও ব্যক্তিরই ধর্ম। এইদিক দিয়ে ব্যক্তির গুরুত্ব। সমাজের সব ব্যক্তি একদিন পূর্ণভাবে আত্মসচেতন হয়ে উঠবে, সে-সিদ্ধি এখনও বহুদূরে। সেদিন আসবে যখন, তখন ব্যক্তি আর সমাজের দ্বৈতও থাকবে না।

*

এখনও দ্বৈত আছে, দ্বন্দ্বও আছে। এই দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে দুটি মতবাদের ভিতর দিয়ে— একটি সমাজতন্ত্রবাদ, আর একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। সমাজতন্ত্রী বলেন, সমাজের জন্যই ব্যক্তি। ব্যক্তি সমাজদেহের একটি কোষমাত্র। সমাজসত্তার মধ্যে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেওয়াই তার পরম পুরুষার্থ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলেন, ব্যক্তির জন্যই সমাজ। সমাজ হল ব্যক্তির আত্মবিকাশের ক্ষেত্র। সমাজের কর্তব্য, তার সমস্ত সুযোগ করে দেওয়া। ব্যক্তিকে পূর্ণ বিকশিত করে তোলাই সমাজের পরম পুরুষার্থ।

দুটি মত নিয়ে আজকাল বাদ-বিসংবাদের অন্ত নাই। কিন্তু আগেই বলেছি, সমাজ আর ব্যক্তি অন্যোন্যনির্ভর। সমাজ বড় হলে যেমন ব্যক্তি বড় হবার সুযোগ পায়, তেমনি ব্যক্তি বড় হলেও সমাজকে সে বড় করে তোলে। প্রকৃতি প্রথম ঝোঁক দেয় সমাজের উপর। সমাজচেতনা তখন অস্ফুট ব্যক্তিচেতনার ধাত্রী। আদিম সমাজে তাই দেখি, সমাজচেতনাই সর্বেসর্বা, ব্যক্তিচেতনা কিছুই নয়। কিন্তু সে-সমাজচেতনা মূঢ় আচ্ছন্ন যান্ত্রিক। আঘাত দিয়ে তার মূঢ়তা ভাঙে ব্যক্তিই। একটি-দুটি সচেতন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে সমাজচেতনা ক্রমে দীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে-দীপ্তি আবার স্তিমিত হয়ে যায়, আঘাত দিয়ে আবার তাকে উস্‌কে তোলে ব্যক্তিই। সাংখ্যের ভাষায় বলতে পারি, সমাজ যেন প্রকৃতি বা ক্ষেত্র, আর ব্যক্তি তার অধিষ্ঠাতা পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ। পুরুষ প্রকৃতির গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং তার দ্বারা শাসিত হয়েও আত্মচৈতন্যের আবেশে প্রকৃতিকে চিন্ময়ী করে তোলে। প্রকৃতির চিন্ময়-পরিণাম চলছে এই ধারা ধরে।

ব্যক্তির মধ্যে যে আত্মবিকাশের নিগূঢ় প্রেরণা আছে, সমাজের চাপে যদি তা ব্যাহত হয়, তাহলেই হয় সমাজদ্রোহী না হয় সমাজত্যাগী সন্ন্যাসীর সৃষ্টি হয়। দুয়ের মধ্যেই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে খানিক মর্যাদা দিয়ে একটা রফার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু রফাতে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। আসলে ব্যক্তি বড় না সমাজ বড়—এই তর্কই ভুলে যেতে হবে। ব্যক্তি আর সমাজের ঊর্ধ্বে আছে তৃতীয় একটা তত্ত্ব যার মধ্যে দুইটি বিধৃত রয়েছে। সে-তত্ত্ব হল চৈতন্য। কি সমাজ কি ব্যক্তি—দুয়ের মধ্যে চৈতন্যের স্ফুরণই হল প্রকৃতির লক্ষ্য। এই স্ফুরণের একটা ক্রম আছে। দেহের মধ্যে চৈতন্যের যতটুকু স্ফূর্তি, তার চাইতে বেশী স্ফূর্তি প্রাণে, তার চাইতে বেশী মনে, তার চাইতে বেশী আত্ম-

বোধে। এইখানে এসে ব্যষ্টি আর সমষ্টিতে ব্যক্তি আর সমাজে যে-ভেদ
লোপ পেয়ে যায়। 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা'—এই উদার বোধে ব্যক্তি আর সমা
এক। সমাজে থেকেই দেহ-প্রাণ-মনের ভূমির ভিতর দিয়ে চৈতন্যের ক্রমি
প্রসার ঘটিয়ে আত্মচৈতন্যের বিশ্বময় প্রসারের ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া প্রকৃ
পরিণামের নিগূঢ় লক্ষ্য। সমাজ ও ব্যক্তির মাঝে যে-দ্বন্দ্ব, তার সমাধান
ভূমিতেই হতে পারে। আর, যতই আমরা চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষের একে
ভূমি পার হয়ে যাব, ততই এই সমাধানের নিকটবর্তী হব। দেহ-প্রা
ভূমিতে এই দ্বন্দ্ব তীব্র; কিন্তু মনের ভূমিতে এলে তার তীব্রতা হ্রাস পা
কি করে তা হয়, তা-ই দেখা যাক।

*

স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত ততক্ষণই চলে, যতক্ষণ মানুষের ম
প্রাকৃত প্রাণবাসনার দাবি প্রবল থাকে। সংসারে আর সমাজে, এমন-কি জাতি
জাতিতে ততক্ষণই রেষারেষি আর হানাহানি। বুদ্ধি একটু স্থির হলে মা
বুঝতে পারে, বাসনার তর্পণকে নিরঙ্কুশ করতে হলে স্বার্থের দাবি
খানিকটা খাটো করতে হয়, নিজের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থের এ
রফা করতে হয়। মানুষের সমাজচেতনা এখন এই রফার পর্বে এসে পৌঁছে
সমাজের চাপে ব্যক্তিস্বার্থের নখ-দন্ত খানিকটা গোটানো থাকে—রফায় এই
লাভ। কিন্তু একে সমস্যার সমাধান বলা চলে না।

বুদ্ধি আরও একটু স্থির হলে মানুষ বুঝতে পারে, যার জন্য হানাহা
তা বাইরে নয়, অন্তরে। সুখ বস্তুতে নয়, অনুভবে। চিত্ত যদি অন্তর্মুখ
প্রশান্ত হয়, তাহলে আত্মতৃপ্তির জন্য বস্তুনির্ভর না হলেও মানুষের চ
ভোগাকাঙ্ক্ষার জায়গায় তখন দেখা দেয় আত্মোৎসর্গের প্রেরণা। সবা
সুখী করেই নিজের যথার্থ সুখ, এই কথাটা মানুষ তখন বুঝতে পা
চেতনার প্রসারে তখন অন্তরে দৈবীসম্পদের আবির্ভাব হয়—জাগে ধর্মবু
ন্যায়পরায়ণতা, প্রেম, সদ্‌বিবেচনা। মানুষ যেন নিজের মধ্যে এক লোকো
শিব-সুন্দরের জ্যোতির আভাস পায়। সে চায়, এই আলোই মানুষের আচা
নিয়ন্তা হ'ক।

শুভবুদ্ধির উন্মেষে এই-যে আলোর চেতনা—এ কিন্তু ব্যক্তির ম

ফোটে। ক্রমে ব্যক্তি থেকে তা ধীরে-ধীরে সঞ্চারিত হয় সমাজের মধ্যে। সমাজ-চেতনার রূপান্তর ঘটাতে ব্যক্তির প্রভাব যে অপরিহার্য, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। সেইসঙ্গে এও মানতে হবে, ব্যক্তির সিদ্ধির সঙ্গে সমাজের সিদ্ধির অনুপাত কখনও সমান হয় না। সমষ্টির মধ্যে এখনপর্যন্ত প্রবৃত্তির বেগই প্রবল, ব্যক্তির সদাচারের আদর্শ তাকে কোনমতে ঠেকিয়ে রেখেছে মাত্র। সুযোগ পেলেই মানুষের ভিতরের পশুটার নখ-দাঁত বেরিয়ে পড়ে। মূঢ়তা হিংসাদ্বেষ প্রমত্ততা প্রবৃত্তিপরায়ণতা—এগুলির প্রভাব যত সহজে ছড়িয়ে পড়ে, দৈবী-সম্পদের আদর্শ কিন্তু ততটা সাড়া জাগায় না। কদাচ-কখনও সাড়া জাগালেও প্রাকৃত-মানুষ দুদিনের মধ্যেই তাকে নিজের মূঢ়বুদ্ধির ছাঁচে ফেলে একটা নিরুত্তাপ যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত করে।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগেও মানুষ প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে?, কোনও-না-কোনও আকারে প্রথার দাসত্ব সে আজও করে চলেছে। প্রগতি যে কিছুই হয়নি, একথা অবশ্য বলা চলে না। মানুষ আজকাল ভাবতে শিখেছে, পারিপার্শ্বিকের কল্যাণসম্পর্কে আগের চাইতে সে বেশী সচেতন হয়েছে। যুদ্ধবিজয়ের চাইতে ধর্মবিজয় যে বড়, আঘাত করে যে ফুল ফোটানো যায় না, ফোটাতে গেলে আলো ছড়াতে হয়—একথাটা সাধারণ মানুষও একটু-একটু যেন বুঝতে পারছে। কিন্তু মানুষ যখন অন্তরে-বাইরে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে, অন্তরের স্ফূর্তির সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের সবরকমের চাপ একেবারে দূর হয়ে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিরোধ থাকবে না বলে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজেরও কোনও বিরোধ থাকবে না—সেদিন এখনও অনেক দূরে। আজও পৃথিবীতে অমরাবতীর স্বপ্ন দেখে ব্যক্তিই। কিন্তু সে-স্বপ্নকে সমষ্টির মধ্যে রূপ দিতে গিয়ে জড়ত্বের কী বিপুল বাধার সঙ্গে যে তাকে লড়তে হয়, তা ভুক্তভোগীই জানে।

আর, সবার স্বপ্নই যে হিরণ্যগর্ভের স্বপ্ন, অখণ্ডসত্যের দিব্যস্বপ্ন—তাও কি বলা চলে? এখানেও মনের মায়া অখণ্ডকে খণ্ডিত ক'রে একটা খণ্ডকেই আবার একান্ত করে তোলে, কিংবা বস্তুস্থিতির প্রতি অন্ধ হয়ে মানুষের কাছে অসম্ভব একটা-কিছু দাবি করে বসে। কেউ বলে সমাজগঠনের ভিত্তি হবে প্রেম; কেউ বলে, প্রেমে দুর্বলতা আছে পক্ষপাত আছে, সুতরাং ভিত্তি করতে হবে ন্যায়কে। কেউ বলে, সামাজিক প্রগতি হবে ধীরে-ধীরে; অজ্ঞের বুদ্ধিভেদ জন্মানো কোনমতেই কল্যাণকর নয়। কেউ বলে, বিপ্লব ছাড়া

সমাজচেতনার রূপান্তর হবে, এ-আশা করা অন্যায়; আবর্জনা আপনি যাবে না, তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। নানা মুনির নানা মত এবং অন্ধ দুরাগ্রহের বশে নিজের মত ছাড়তে কেউই রাজী নয়। সুতরাং সমাজের হিত করতে গিয়েই হিতকারীদের মধ্যে লাঠালাঠিটা অনিবার্য হয়ে পড়ে। হয়তো সবার মতই সত্য। একেকজন সমস্যাটাকে একেকদিক হতে দেখেছে এবং সেই অনুযায়ী তার সমাধান করেছে। দেখাটা ভুল নয়, আবার সত্যও নয়। এক-দেশদর্শিতা সত্য হলেও তার মধ্যে বিরোধের বীজ থাকে বলে আরেকদিক দিয়ে তা মিথ্যাও। মনের দর্শনের সঙ্গে প্রজ্ঞার দর্শনের তফাত এইখানে। মন একটা দিক দেখেই চূড়ান্ত রায় দিয়ে বসে এবং চায়, তার রায়টা তৎক্ষণ তামিল হয়। প্রজ্ঞা চায় সর্বদিক মিলিয়ে দেখতে, অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে সৌষম্যের যে একটা নিগূঢ় ছন্দ আছে তাকে আবিষ্কার করতে। সে অসহিষ্ণু নয়, অনুদার নয়। সে জানে, প্রগতির পথ তীরের মত সোজা নয়, নদীর মত আঁকাবাঁকা। মানুষের জীবনে অনেক জটিলতা; অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে সে-জট ছাড়াতে-ছাড়াতে অগ্রসর হতে হবে। একটা আদর্শ যত ভালই হোক, জোর করে তা চাপিয়ে দিতে গেলে স্বভাবের প্রতি অত্যাচারই করা হয় এবং তার ফল কখনও ভাল হয় না।

*

মন যখন জীবনাদর্শ-নিরূপণের ভার নেয়, তখন যেকোন-একটা দৈব সম্পদের অনুশীলনকে সে একান্ত করে তোলে। কারও আদর্শ প্রজ্ঞাবাদ, কারও মৈত্রীবাদ, কারও সাম্যবাদ, কারও কর্মবাদ। প্রত্যেক আদর্শের মধ্যে চেতনার ঊর্ধ্বায়ন এবং ব্যাপ্তির প্রেরণা আছে, সুতরাং কোনও আদর্শই নিরর্থক নয়। কিন্তু তাবলে মনগড়া একটা আদর্শের খোপে জীবনকে পুরে দিলেই তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব হয় না। প্রত্যেক আদর্শেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে। কিন্তু তাদের সবার নজর জীবনের একেকটা বিশেষ দিকের প্রতি, গোটা জীবনকে তারা কেউই দেখে না। মনের পরকলার ভিতর দিয়ে সে-দেখা সম্ভব নয়। তারজন্য যেতে হবে মনের উজানে অতিমানস ভূমিতে—যেখানে সমস্ত বিশেষ উত্তীর্ণ হয়েছে এক পর-সামান্যে (supreme universal), সমস্ত বিরোধের সমন্বয় হয়েছে এক পরম সৌষম্যে।

বাইরে সমাজের আইন আছে, অন্তরে আছে ধর্মবুদ্ধির আইন। দুয়ের

উদ্দেশ্য মানুষকে সদাচারী করা। উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই। কিন্তু এরাই যে মানুষের জীবনের সর্বময় শাস্তা, একথা তো বলা চলে না। সমাজের শাসন নিতান্তই বাইরের, ব্যক্তির ধর্মবুদ্ধি তাকে সবসময় মানতে বাধ্য নয়। আবার ব্যক্তির ধর্মবুদ্ধিই আচরণের চরম নিয়ন্তা, একথাই-বা বলি কি করে? ধর্মবুদ্ধিরও একটা ক্রমিক পরিণাম আছে, চেতনার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে তারও রূপের বদল হয়। কুরুক্ষেত্রে অর্জুন জাতিধর্ম আর কুলধর্মকে শাশ্বত ধরে নিয়ে তাদের হয়ে অনেক ওকালতি করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কথাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এ তোমার প্রজ্ঞাবাদ। যে অবিনাশী পরম তত্ত্ব সব ছেয়ে আছে, তাকে না জানলে ধর্মসম্মোহ থেকে চেতনা মুক্ত হয় না কখনও।' অর্থাৎ মানব-ধর্মের উপরেও আছে ভাগবতধর্ম। সে-ধর্ম একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বভাবের অনুগত, আরেকদিক দিয়ে তেমনি বিশ্বগতিরও অনুগত। দুর্যোধন বা অর্জুনের চোখে কুরুক্ষেত্রের অর্থ যা, শ্রীকৃষ্ণের চোখে তা নয়। দুর্যোধন দেখছে স্বার্থকে। অর্জুন ভাবছেন, স্বার্থকে ছাপিয়ে তিনি দেখছেন পরার্থকে, সুতরাং দুর্যোধনের যুদ্ধে প্রবৃত্তি পাপ আর তাঁর যুদ্ধে নিবৃত্তি পুণ্য। কিন্তু বিশ্ব-রূপের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের স্বরূপ দেখবার মত দিব্যচক্ষু তো কারও ছিল না। সুতরাং তাঁদের বিচারও অসম্যক হতে বাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন, ধর্মসংস্থাপনের জন্য কুরুক্ষেত্র অপরিহার্য, আর অর্জুনকে নিমিত্ত করেই তা ঘটাতে হবে, কেননা এ তাঁর স্বভাবের অনুকূল এবং তিনি দৈবীসম্পদে অভিজাত অর্থাৎ ভাগবত-ধর্মের দিকেই তাঁর অন্তরের প্রবণতা।

সদাচারের মূলভিত্তি তাহলে সমাজের অনুশাসনও নয়, ধর্মের অনুশাসনও নয়—অন্তর্যামীর প্রশাসন। আচারকে নিয়ন্ত্রিত করবে অন্তঃপ্রজ্ঞা—যে-প্রজ্ঞা আত্মাকে জানে এবং বিশ্বেশ্বরকে জানে বলেই বিশ্বকেও জানে, জানে বিশ্বে তার স্থান কোথায়, বিশ্বেশ্বরের কোন্ সত্যসঙ্কল্পের সে বাহন। এই প্রজ্ঞার শাসন আমার স্বভাবের অনুগত বলে একদিক দিয়ে যেমন আজ্ঞাসিদ্ধ (imperative), আরেকদিক দিয়ে তেমনি পুরুষোত্তমের স্বাতন্ত্র্যের আবেশে স্বচ্ছন্দ। আমি তাঁর নিমিত্ত—এইখানে নিয়তি; আবার তাঁর ইচ্ছার আবেশে আমার স্বভাবেরই মুক্তি—এইখানে স্বাতন্ত্র্য। নিয়তি আর স্বাতন্ত্র্য একই শক্তি-পরিণামের এপিঠ আর ওপিঠ। এই হল পরমধর্মের স্বরূপ।

এই পরমধর্মকে খুঁজতে গিয়ে মানুষ নানা মতবাদের সৃষ্টি করেছে। কখনও সে বলেছে, মানুষের আচারের নিয়ামক হল আত্মসুখ; কখনও বলেছে,

না, তা নয়—সমষ্টির হিত; আবার বলেছে, তাও নয়—শুদ্ধবুদ্ধির অনুশাসন; আবার বলেছে, না, তা নয়—সহজাত ধর্মবোধ। বলা বাহুল্য, এর কোনটা মতেই চূড়ান্ত নয়। আমার কি কর্তব্য, তা তখনই ঠিক বুঝতে পারি, যখন যিনি আমার কর্তা তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাই।

আরেকটা আছে, শাস্ত্রের শাসন। শাস্ত্র মহাপুরুষের বাণী, অবতারের বাণী, ঈশ্বরের বাণী। বুদ্ধির মীমাংসার চাইতে তার দাম নিশ্চয় বেশী, কেননা তার ভিতর দিয়ে এমন-একটা আলোর আভাস পাওয়া যায় যা বুদ্ধির ওপারে যা হৃদয়কে স্পর্শ করে। কিন্তু তবুও বলব, শাস্ত্রের শাসন পরোক্ষ, আর অন্তর্যামীর প্রশাসন হল অপরোক্ষ। শাস্ত্রব্যবস্থা কর্তব্যাকর্তব্যের প্রাথমিক নিয়ামকই হতে পারে—যখন আমি 'কার্পণ্যাপহতস্বভাব' এবং 'ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ'। কিন্তু বাণী জীবনে সত্য হয়ে ওঠা চাই। তিনি পুথির পাতায় থেকে কথা কইবেন না, কথা কইবেন আমার বুকে থেকে—তবে না আমার চলা সহজ হবে, কখনও আর বেচালে পা পড়বে না। তত্ত্বদর্শীদের অতীত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় রূপে শাস্ত্রের একটা মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তবুও অতীত অতীতই: তাকে বর্তমানে জীবন্ত না করে তুলতে পারলে সে ভূত হয়ে ঘাড়ে চেপে থাকবে। তত্ত্বদর্শনদ্বারা আমার শাস্ত্র আমাকেই সৃষ্টি করতে হবে নতুন করে। পুরাতনকে নতুন করে আবিষ্কার করলেই তা সত্য হয়।

এই অপরোক্ষদর্শনই আচরণের সত্যকার নিয়ামক। তার আলোয় দুচোখ ভরে যায় যখন, তখনই পথ চলা সহজ হয়, স্বচ্ছন্দ হয়। তখন আর বাইরের কোনও শাসনকে মানবার দায় থাকে না। বাইরের অনুশাসনে ফাঁকি চলতে পারে, কিন্তু এখানে তো ফাঁকি চলে না। বাইরের অনুশাসন আড়ষ্ট, আচরণে একটা ছক বাঁধতে পারলেই সে খুশী। কিন্তু অন্তর্যামীর প্রশাসন প্রাণোচ্ছল স্বাতন্ত্র্যের উল্লাসে নিরঙ্কুশ অথচ ঋতচ্ছন্দ। এই প্রশাসনের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হবে। আমার ইচ্ছা বলে কিছুই থাকবে না—সমস্তই তাঁর ইচ্ছা। আর তাঁর ইচ্ছা অন্ধ নয়—প্রজ্ঞানে প্রভাস্বর, অল্পদর্শী নয়—বিশ্বতশ্চক্ষু, সঙ্কীর্ণ নয়—অনিবাধ বৈপুল্যে উদার। তা আত্মচেতনাকে প্রসারিত করে বিশ্বচেতনায়, বিশ্বোত্তীর্ণকে আবিষ্ট করে ব্যক্তিবিগ্রহে এবং আধারের ঘটায় দিব্যরূপান্তর। চলা তখন শুধু বাইরের সঙ্গে মানিয়ে চলা নয়—চলা মানে হওয়া, আর সেই হওয়ার উল্লাসে মুহূর্তে-মুহূর্তে নিজেকে সবার মধ্যে বিকীর্ণ করা।

সদাচার ও স্বাতন্ত্র্য

*

আচরণ বা কর্ম বস্তুত শক্তির প্রকাশ। আর মানুষের স্বরূপ-শক্তি হল চিৎশক্তি। সুতরাং পূর্ণযোগীর সমস্ত আচরণ হবে অন্তর্নিহিত চিৎশক্তির প্রকাশ। তাঁর অন্তরে যে-প্রজ্ঞা আর প্রেম, তারই বিচ্ছুরণ তাঁর শিবসঙ্কল্পে আর কল্যাণকর্মে। বিশ্বের মূলে রয়েছে পুরুষোত্তমের সত্যসংকল্প—অন্ধকারের বক্ষ হতে আলোকে উৎসারিত করাই তার তপস্যা। পূর্ণযোগী সেই সত্যসংকল্পের বাহন। তাঁর জীবন পুরুষোত্তমের দেবযজ্ঞের উত্তরবেদি। অরণিমন্থনে বৈশ্বানর প্রদীপ্ত হয়েছেন সেখানে, আধারকে সমিন্ধিত করে করেছেন যোগাগ্নিময়। আগুন চাপা থাকে না। সে আলো ছড়ায়, আশপাশকে তাতিয়ে তোলে, ইন্ধন পেলে তাকেও আগুন করে তোলে। একটি সিদ্ধ ব্যক্তি-সত্তাকে কেন্দ্র করে এমনিভাবে গড়ে ওঠে একটি দিব্যসঙ্ঘ। সঙ্ঘ অবশ্যম্ভাবী সত্যযুগ-চেতনার পুরোধা। সঙ্ঘ পুরুষোত্তমেরই হিরণ্যগর্ভ দিব্যবিগ্রহ। ব্যক্তি সেই বিগ্রহের একটি চিন্ময় কোষ। সে বিদ্যুদ্‌গর্ভ। তার চেতনার বৈদ্যুতী আত্মকেন্দ্রে সংহত, বিগ্রহে ব্যাপ্ত, বিশ্বে পরিব্যাপ্ত এবং বিকীর্ণ, বিশ্বাতীতে নিথর। আবার এ-চেতনা তাঁরই চেতনা—বিশ্বোত্তীর্ণের শূন্যতা হতে ব্যক্তির আণবসত্তায় ঘনীভূত। দুয়ের মাঝে নিত্যযোগ, বিদ্যুৎপ্রবাহের নিত্য গতায়াত।

এই অনুভবই অতিমানস কর্মের ভিত্তি। পূর্ণযোগীর আচরণ তারই অনুগত। সত্যের আচরণ বলেই তা সদাচার, বিশ্বান্তর্যামীর স্ব-তন্ত্র প্রশাসনেই তার স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা।

৮

ব্রহ্ম-সঙ্কল্প

জীবনের অভিযান চলেছে জড় হতে চেতনার দিকে, অবিদ্যা হতে বিদ্যা দিকে। জড়ে বন্ধন, চেতনায় মুক্তি। বন্ধন একদিনে কাটে না, চেতনার মু ঘটে ধীরে-ধীরে—প্রাকৃত দেহ প্রাণ-মনের মাঝে কুণ্ডলিত অহন্তার অনেক মূ দাবি মিটিয়ে। অহন্তা মূঢ় বটে, কিন্তু তবুও নিজেকে বিস্ফারিত করব একটা আকূতি তার মধ্যে আছেই। এই আত্মবিস্ফারণের তাগিদে তার মধ্যে জাগে আদর্শের বোধ, আর তা-ই তার আচারকে নিয়ন্ত্রিত করে ধর্মের দ্বারা প্রথম দেখা দেয় ব্যক্তিগত ধর্মের, তারপর বিশ্বগত নীতিধর্মের শাসন। অবশে চেতনা উত্তীর্ণ হয় লোকোত্তর দিব্য চেতনার অনিবাধ স্বাতন্ত্র্যে। তখ লৌকিক পাপ-পুণ্যের বন্ধন তার খসে যায়। গীতার ভাষায়, সে তখন সমস্ত ধর্মের অনুশাসন ছেড়ে শরণ নেয় সেই পরম একের—যিনি সবার অন্তর্যামী সর্বভূতের 'নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ'। এই শরণাগতিতেই আচারের বন্ধন হতে সে মুক্তি পায় দিব্য-সঙ্কল্পের স্বাতন্ত্র্যে।

এই স্বাতন্ত্র্যে পৌঁছবার তিনটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে আমাদে দেহানুগত প্রাকৃত জীবন। সেখানে ভাল-মন্দের মান নিরূপিত হয় মুখ্য দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ দিয়ে। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য তো একার হলে চলে না— কেননা মানুষ সামাজিক জীব, তাকে বাঁচতে হয় দশজনকে নিয়েই। সুতরা স্বাচ্ছন্দ্যকে সর্বগত করতে গিয়ে দশের দাবির সঙ্গে একের দাবির রফা করতে হয়। কিন্তু রফার মধ্যে একটা পীড়াবোধ আছে। এই পীড়াবোধ ক্রমে দূ হয় মানুষ যখন স্বার্থত্যাগে অভ্যস্ত হয়। ত্যাগের ভিতর দিয়ে সে পা মনোময় জীবনের সন্ধান, দেখে ইন্দ্রিয়-সুখের চাইতে মনের সুখ বড় মানুষের চেতনার মোড় তখন ফিরে যায় অন্তরের দিকে, মনোগত আদর্শে অনুশীলন হয় তার পুরুষার্থ। অগ্রগতির পথে এই হল জীবনের দ্বিতী ধাপ। অধ্যাত্মজীবন তারও পরে। সে-জীবন শুরু হয়, অন্তর্মুখীনতার ফলে মানুষ যখন একটা বিবিক্ত আত্মসত্তাকে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে। এ-সত্ত একাধারে তার কূটস্থসত্তা এবং চৈত্যসত্তা দুইই। কূটস্থসত্তা নির্মেঘ আকাশে

মত নির্বিকার স্বচ্ছ এবং প্রসন্ন, আর চৈত্যসত্তা যেন তারই মধ্যে একটি আলোর কমলের দল মেলা। অন্তর্যামীর প্রশাসনই তখন মানুষের জীবনের দিশারী, লৌকিক ধর্মাধর্ম-বোধের দায় হতে সে তখন মুক্ত। তার ভাবনায় বেদনায় এবং আচরণে তখন বৃহতের সত্যসঙ্কল্পের প্রকাশ।

*

জীব একাধারে কর্তা ভোক্তা এবং দ্রষ্টা—এই তার স্বভাবের পরিচয়। তার কর্তৃত্বে শক্তির প্রকাশ, ভোক্তৃত্বে আনন্দের, আর দ্রষ্টৃত্বে জ্ঞানের। বিজ্ঞান আনন্দ ও শক্তি ব্রহ্মেরও স্বভাব। কিন্তু ব্রহ্মে যা অসীম, জীবে তা সসীম। সীমার সঙ্কোচ ঘটায় অহন্তা। অহং প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন। সে নিজের গরজে কাজ করে, ভোগও করে—কিন্তু কেন করে তা জানে না। জানে না বলেই পদে-পদে তাকে ঠোক্কর খেয়ে চলতে হয়, সংসারের এত ঝামেলা সইতে হয়। জানতে হলে কর্তৃত্ব আর ভোক্তৃত্বের প্ররোচনাকে ছাপিয়ে বিবিক্ত দ্রষ্টৃত্বকে প্রবল করতে হবে। কাজ করছি না, দেখছি কাজ হচ্ছে; ভোগ করছি না, দেখছি ভোগ হচ্ছে : সকল অবস্থাতেই এই তটস্থ ভাবটুকু জাগিয়ে রাখতে পারলে ক্রমে চেতনার সঙ্কোচ দূর হয়ে যায়, অহংএর স্থান এসে অধিকার করেন ভূমা। তখন কর্ম আর ভোগের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পায়। অনুভব হয়, আমার কর্ম এক দিব্যসঙ্কল্পের শক্তিস্পন্দ, আমার ভোগ এক চিন্ময় অন্তরারামের প্রশান্ত প্রসন্নতা। আমার কর্মও তাঁর, আমার ভোগও তাঁর।

এ হল ব্যক্তির অন্তর্জগতের কথা। কিন্তু তাছাড়া একটা বাইরের জগৎও আছে। সেখানে মানুষকে সমষ্টি-অহংএর শাসন মেনে চলতে হয়। সমষ্টি গড়ে ওঠে পরিবার সমাজ দেশ বা সম্প্রদায়কে নিয়ে। এরা ব্যক্তির কাছে আত্ম-বিলোপের দাবি করে। দাবি একেবারে অসঙ্গতও নয়, কেননা সমষ্টির জন্য আত্মত্যাগে ব্যষ্টি-অহংএর প্রসার ঘটে। কিন্তু দিব্যকর্মযোগের সাধক জানবেন, 'এহো বাহ্য'। সমষ্টি তাঁর প্রশাস্তা নয়, তাঁর প্রশাস্তা অন্তর্যামী। বিশ্বে যিনি অন্তর্যামী তিনি তাঁরও অন্তর্যামী। সুতরাং সাধকের কর্ম হবে তাঁরই বিশ্ববিধানের অনুগত। যে-পরিবেশে তাঁর কর্ম, অজ্ঞের বুদ্ধিভেদ না জন্মিয়ে হয়তো কখনও তিনি তার অনুগত হয়ে চলবেন; আবার কখনও হয়তো

প্রগতির তাগিদে বিপ্লব ঘটাবেন। কিন্তু যা-ই করুন না কেন, নিজের বা দলের স্বার্থের জন্য বা কোনও কিছুর চাপে তিনি কিছুই করবেন না। তাঁর প্রত্যেক কর্মই হবে বিশ্বান্তর্যামীর সঙ্গে যোগযুক্তের কর্ম।

গোষ্ঠীর শাসনের পরেও ধর্মের অনুশাসন। সাধককে অনেকদূর পর্যন্ত তা মেনে চলতে হয় বটে, কিন্তু অন্তর্যামীর সাক্ষাৎ প্রশাসন জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠে যখন, তখন এ-বাঁধনও তাঁর থাকে না। ধর্মের আশ্রয় হল সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণ ভাল নিশ্চয়, কিন্তু তাহলেও সে 'গুণ' কিনা বাঁধবার দড়ি! শিকল লোহার না হয়ে সোনার হ'ক, তবুও সে শিকলই। যোগস্থের কর্ম হবে গুণাতীত ভূমি থেকে, গুণের ভূমি থেকে নয়। সে-কর্ম আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দ-স্বভাবের স্ফুরণ—প্রকৃতির গুণক্রিয়া তারই অনুগত, তার নিয়ামক নয়।

কর্মের বেলায় যে যার প্রকৃতিকে অনুসরণ করে চলবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এ হল গোড়ার কথা। প্রকৃতির রূপান্তর ঘটবে—এই হল মানুষের দিব্য নিয়তি। অপরা-প্রকৃতি রূপান্তরিত হবে পরা-প্রকৃতিতে, পরা-প্রকৃতি উত্তীর্ণ হবে পরমা-প্রকৃতিতে। প্রকৃতির এই উত্তরায়ণে বিশুদ্ধ সত্তা চেতনা ও আনন্দের নির্মুক্ত প্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশেই কর্ম অবন্ধন হয়, গুণের বিকার হতে মুক্ত হয়। কর্মের সূচনা নিমিত্ত বা পরিবেশ যা-ই হ'ক না কেন, বৃহতের আলো আনন্দ শক্তি যেন তাকে অভিষিক্ত করে—এই হবে সাধকের আকূতি।

*

কর্ম আমার নয় তাঁর, ব্রহ্মেরই সঙ্কল্প আমার সঙ্কল্পে রূপ ধরেছে—এই বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সাধককে কাজ করে যেতে হবে। প্রশ্ন হবে, এই ব্রহ্ম-সঙ্কল্পের স্বরূপ কি? আমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

আমাদের প্রাকৃত জীবনের কেন্দ্রে রয়েছে অহং। আমি কর্তা, আমি ভোক্তা—এই অনুভব আমাদের সর্বজনীন। এই অহং আমাদের সর্বস্ব, এর বাইরে বা পিছনে আর-কিছুকেই আমরা সাধারণত দেখতে পাই না। অহং নিজেকে মনে করে স্ববশ, কিন্তু পদে-পদে প্রমাণ হয়ে যায়, সে একটা বৃহত্তর শক্তির যন্ত্র মাত্র। এই শক্তির নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির ক্রিয়া চলছে জগৎ জুড়ে, সে-ই সব গড়ছে আর ভাঙছে। আমার দেহ প্রাণ মন এমন-কি আমার অহংটি পর্যন্ত এই প্রকৃতির গড়া। প্রকৃতির ক্রিয়া ছাড়া আমার মধ্যে আরেকটি বস্তু রয়েছে, সে হচ্ছে আমার চৈতন্য। এই চৈতন্যকে বলি পুরুষ। পুরুষ এখন প্রকৃতির

কুক্ষিগত—তার সুখ-দুঃখের বোধ বা কর্মপ্রেরণা সবই আসছে প্রকৃতি থেকে। কিন্তু এই পুরুষের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে—সে হল তার স্বাতন্ত্র্য। পুরুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত, তখনও তার এই স্বাতন্ত্র্যের অভিমান ফুটে ওঠে অহংরূপে। অহং প্রকৃতিপরতন্ত্র হয়েও নিজেকে স্ব-তন্ত্র ভাবে—এর নাম অবিদ্যা।

কিন্তু অহংএর স্বাতন্ত্র্যাভিমানের একটা ভিত্তি আছে। পুরুষ বস্তুতই স্ব-তন্ত্র। প্রাকৃতভূমিতে এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় সে দিতে পারে তটস্থতার দ্বারা। প্রকৃতির ক্রিয়ার সঙ্গে স্বভাবত আমি জড়িয়ে যাই, কিন্তু না জড়ালেও পারি। যে-আমি জড়িয়ে যায় সে কাঁচা, যে-আমি জড়ায় না—সে পাকা। কাঁচা আমিকে বলতে পারি অহং, আর পাকা আমিকে আত্মা। অহং প্রকৃতিরই একটা বিকার, আর আত্মা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে।

সাধনার প্রথম ধাপ হল আত্মস্থ হওয়া, প্রকৃতির উপদ্রষ্টা হওয়া। পুরুষ প্রকৃতি হতে বিবিক্ত, বহিঃপ্রকৃতি বা অন্তঃপ্রকৃতির কোনও ক্রিয়াই তাকে স্পর্শ করছে না—এই হল সাংখ্যের কৈবল্য। কৈবল্য খুব উঁচু অবস্থা এবং অধ্যাত্ম-সিদ্ধির পক্ষে তা অপরিহার্য। কিন্তু এটাই চরম অবস্থা নয়। সাংখ্যের সাধনায় প্রকৃতি আর পুরুষ আলাদা হয়ে পড়ল, পুরুষ স্ব-তন্ত্র হল প্রকৃতির সঙ্গে অসহযোগ করে। এ-পুরুষ স্পষ্টতই ব্যষ্টি-পুরুষ। প্রকৃতির সে নিয়ন্তা নয়, উপদ্রষ্টা মাত্র—এইখানে তার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। প্রকৃতির নিয়ন্তা তাহলে কে? প্রকৃতি তো একটা অন্ধ জড়শক্তির খামখেয়ালি নয়, তার মধ্যে যে চিৎ-শক্তিরও ক্রিয়া দেখতে পাই। সর্বত্র দেখছি, চিৎ প্রথমটায় জড়ের কুক্ষিগত থাকে, কিন্তু ক্রমে সে স্ব-তন্ত্র হয়ে জড়ের প্রশাসনের ভার নেয়। আমার নিজের বেলাতেও দেখতে পাচ্ছি, আমি যখন আত্মস্থ, তখন আমি আমার আত্মপ্রকৃতির তটস্থ উপদ্রষ্টা মাত্র নই—আমি তার অনুমন্তা ভর্তা এবং নিয়ন্তাও বটে। আমার আত্মপ্রকৃতির বেলায় যা সত্য, বিশ্বপ্রকৃতির বেলাতেও তা-ই সত্য। বিশ্বপ্রকৃতি স্বরূপত চিন্ময়ী; যিনি তাঁর ভর্তা ভোক্তা এবং নিয়ন্তা, তিনি পরমাত্মা বা মহেশ্বর। মহেশ্বর আর মহাশক্তি যুগনদ্ধ। যেমন পুরুষের স্বাতন্ত্র্যের ছায়া পড়ে অহংএ, তেমনি এই যুগনদ্ধতার ছায়া পড়ে প্রাকৃত-ভূমিতে প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেকে বা মেশামেশিতে। ছায়াকে দূর করবার জন্যই সাংখ্যের বিবেকসাধনা; কিন্তু তার পর্যবসান ঈশ্বর-শক্তির সামরস্যের অনুভবে।

জীব স্বরূপত শিব। শিব চিন্ময়, আনন্দময়, সত্যসঙ্কল্প। তাঁর সবটুকুই আলো। কিন্তু জীবের মধ্যে রয়েছে আলো-আঁধারের মেশামেশি। তার জ্ঞানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অজ্ঞান, সুখের সঙ্গে দুঃখ, সিদ্ধির সঙ্গে অসিদ্ধি। কিন্তু আঁধারের বাধা কেটে গিয়ে সব আলো হয়ে উঠুক, এ-আকূতি জীবের জীবনের মর্মমূলে।

*

এ-আকূতিকে সার্থক করবার একটা সাধনা আছে। তার প্রথম পর্ব হল বিবেক—প্রকৃতির ক্রিয়া হতে পুরুষকে বা চেতনাকে আলাদা করা, যার কথা এইমাত্র বললাম। বিবিক্ত পুরুষ প্রকৃতির উপদ্রষ্টা। অন্তঃপ্রকৃতিতে শক্তির পরিণাম চলছে প্রতিনিয়ত, আমি অক্ষুব্ধ থেকে তা দেখছি। এই দেখাটা প্রথমত তটস্থতামাত্র : প্রকৃতিতে যা ঘটবার ঘটুক, আমার সঙ্গে তার কোনও যোগ নাই—এমনিতর একটা ভাব। কিন্তু দেখা যত গভীর হয়, অক্ষুব্ধ আত্মস্থতার ভাব ততই বাড়ে; তখন খুশিমত প্রকৃতির খেলায় যোগ দিতে পুরুষের আর বাধে না। এই অবস্থায় পুরুষ হয় প্রকৃতির অনুমন্তা, অর্থাৎ প্রকৃতির উপচারকে গ্রহণ করা বা না করা হয় তার স্বেচ্ছাধীন। এই স্বাতন্ত্র্যের ফলে পুরুষের দৃষ্টি আরও গভীর হয়, তখন প্রকৃতির উপরভাসা চলনের গহনে যে নিগূঢ় চিৎশক্তির প্রবর্তনা রয়েছে, পুরুষ তাকে অনুভব করে। এই চিৎশক্তির সঙ্গে পুরুষের কোনও বিরোধ থাকতে পারে না, কেননা এ তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি এবং পুরুষ তার ভর্তা। এ-অবস্থায় পুরুষের চেতনায় কোনও দ্বন্দ্ব থাকে না। দ্বন্দ্বের বাসা হল উপরভাসা চেতনায়। চেতনার গভীরে আছে এক অতল সমুদ্রের নিস্তব্ধতা। সে-নিস্তব্ধতার মধ্যে পুরুষ যুগনদ্ধ হয়ে আছেন তাঁর আত্মপ্রকৃতির সঙ্গে। আনন্দের মৃদু-শিহরনে চেতনা দুলছে শুধু—তা-ই শক্তির অবন্ধ্য ক্রিয়া। পুরুষ তার ভোক্তা, পুরুষ মহেশ্বর। এই হল জীবত্বের শিবত্বে পর্যবসান। এই বোধ নিয়ে জীব জাগে যখন, তখন কাম-সঙ্কল্পের বিড়ম্বনা আর তার মাঝে থাকে না, তার জীবন হয় অন্তর্যামীর সত্য-সঙ্কল্পের বাহন।

ব্রহ্মের এই সত্য-সঙ্কল্পকে উপনিষদের ঋষি বলছেন 'ঈক্ষা'। ঈক্ষা একাধারে দৃষ্টি এবং সৃষ্টি। যা হবে তা তিনি দেখছেন—এই তাঁর মায়া বা

'জ্ঞানশক্তি'। আবার যা দেখছেন তাকেই রূপায়িত করছেন—এই তাঁর প্রকৃতি বা 'ক্রিয়াশক্তি'। ইচ্ছা জ্ঞান আর ক্রিয়া তাঁর মধ্যে অবিনাভূত, তিনটিই তাঁর চিৎশক্তির ক্রমিক স্ফুরণমাত্র। ব্রহ্মসংকল্পের এই স্বরূপ। আমাদেরও জীবনের মূলে রয়েছে, এই সংকল্পেরই প্রেরণা। আঁধার ঘুচিয়ে সে আলো ফোটাতে চাইছে, জীবকে করতে চাইছে শিব—এই তার পরিচয়।

শরণাগতের একমাত্র আকূতি, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক।' এ শুধু একটা অনির্দেশ্য কিছুর কাছে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা নয়। শান্ত হয়ে অন্তর্মুখ হয়ে সত্তার গভীরে ডুবতে হবে, অন্তর্যামীর নিবিড়তম স্পর্শের বৈদ্যুতীকে অনুভব করতে হবে শিরায়-শিরায়। ধীরে-ধীরে আমার সবটুকু গলে যাবে, আলোর বুদ্‌বুদ্‌ মিলে যাবে আলোর সমুদ্রে। শুধু অনন্তব্যাপ্ত অস্তিত্বের বোধ—আর কোনও-কিছু নাই। সেই বোধের কেন্দ্রে আবার আবির্ভূত হবে একটি চিদ্‌ঘন বিন্দু—আমার আমির নতুন রূপ। এ-আমি তাঁর আমি—শিশিরকণায় সৌরদীপ্তির প্রতিবিম্ব। আমার প্রবৃত্তিতে তখন তাঁরই দিব্যসংকল্পের অনিরুদ্ধ ধারা—আমি শুধু নিমিত্তমাত্র।

বোধ হতে সংকল্পের উৎসারণ—এই হল সত্যকর্মের ঋতচ্ছন্দ। নির্দ্বন্দ্ব নিঃসংশয় পরিব্যাপ্ত বোধ আর তারই উল্লাসে কর্মের স্বচ্ছন্দ প্রবর্তনা—পূর্ণ-সাযুজ্যের আগেও এটি মাঝে-মাঝে আসতে পারে। কিন্তু আধারে তার স্থায়ী হতে একটু দেরি হয়। প্রাকৃত-বুদ্ধির বাধা একদিনে দূর হয় না, হৃদয় গলতে সময় লাগে। কিন্তু আবেশের ক্রিয়া একবার শুরু হলে সে যে কোথাও হার মানবে না—এ-বিশ্বাসও থাকা চাই। পথের বাধা যত দুস্তরই হক, কিছুতেই হার মানব না। কেননা, আমি জানি, আমি তাঁর স্বয়ং-বৃত। আমার চাওয়ার পিছনে রয়েছে তাঁরই চাওয়া। সে-চাওয়ার জয় হবেই। ব্রহ্মের ইচ্ছা অপরাজিতা।

৯

সমত্ববোধ এবং অহন্তার প্রলয়

কর্ম করতে হবে উৎসর্গের ভাবনা নিয়ে। 'আমার কাজ নয়—তাঁর কাজ, আমার ইচ্ছায় আমার শক্তিতে কাজ নয়—তাঁর ইচ্ছায় তাঁর শক্তিতে কাজ': অহরহ অনুধ্যানের দ্বারা এই ভাবনাকে একেবারে অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে হবে। তখন আলোর ছোঁয়ায় গাছে যেমন ফুল ফোটে, সে-ফুল যেমন আলোর কাছে নিজেকে মেলে ধরে, আবার আলোরই চুম্বনে আলোর কোলে ঢলে পড়ে—আমার কাজ হবে তেমনিতর ফুল ফোটা।

কি কাজ করব আর কি ভাব নিয়ে করব—কর্মযোগের এই হল দুটি দিক। আমার সহজবুদ্ধিই বলে দেবে, কি আমায় করতে হবে। তার প্রেরণা আসতে পারে কর্তব্যবোধ হতে, সমবেদনা হতে, ভূতহিতৈষণা হতে অথবা গুরুর নির্দেশ হতে। প্রেরণা যেখান থেকেই আসুক, কোনও কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করব না—এই বুদ্ধিতে কিন্তু কাজ করে যেতে হবে। 'আমি তো আমার স্বার্থে কাজ করছি না, করছি গুরুর কাজ, তাঁর কাজ, তবে কেন ফল চাইব না'—এ-বুদ্ধি সর্বনাশা। এ হল তাঁর নাম ভাঙিয়ে নিজের প্রচ্ছন্ন অহংএর পরিতর্পণ।

এই অহংসম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকতে হবে, একে কিছুতেই আমল দিলে চলবে না। অহং থাকবে চাকরের মত। সে শুধু কাজ করে যাবে তাঁর আদেশে, ফলের ভাবনা ভাববে না। ফল তাঁর হাতে। গীতারও এই উপদেশ: 'কর্মেই তোমার অধিকার শুধু, ফলে কখনও নয়।' কর্ম করতে গিয়ে কেবল যে ফল চাইব না, তা নয়; কি ধরনের কাজ হবে, শেষপর্যন্ত তাও দেখতে চাইব না। সব কাজই তাঁর কাজ, আমার আবার তার মধ্যে বাছবিচার করবার কি আছে। স্বভাবের অনুকূল কাজ পাই, ভাল; না পাই, নালিশ করব না। যতটুকু পারি স্বচ্ছন্দ অমায়িক সেবা-বুদ্ধিতে কাজ করে যাব। তাঁর শক্তিতে তাঁর কাজ করে যাচ্ছি—এতে স্বাচ্ছন্দ্য আছে, আনন্দ আছে। নিজেকে ছাড়তে পারলেই আনন্দ। আমি কোথাও নাই—না কর্মের বাছাইএ, না তার ফলে, না তার কর্তৃত্বে। আমি স্বরূপত অবন্ধন হয়েই তাঁর বিশ্বকর্মের নিমিত্তমাত্র।

*

ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ হতে আসে সমত্ববোধ। যা করবার, শান্তচিত্তে তা-ই করে যাচ্ছি, ফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করছি না : তখন সিদ্ধি-অসিদ্ধি লাভ-অলাভ জয়-পরাজয় সুখ-দুঃখ শুভ-অশুভ সব আমার কাছে সমান। শুধু একটি লক্ষ্য, যা করছি তা অন্তর্যামীর প্রচোদনাতেই করছি, বাইরের কোনও প্ররোচনায় বা জবরদস্তিতে নয়। যে-কর্মে ভূমানন্দের স্ফুরণ হয়, তা-ই ধর্ম। এই ধর্ম-বোধ জাগে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হতে। আবার প্রশান্তি আসে যদি আপনাতে আপনি থাকি, কোনও-কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে না যাই। গীতায় একেই বলা হয়েছে অনাসক্ত হয়ে যোগস্থ হয়ে অকর্তা হয়ে কর্ম করা।

ফলাকাঙ্ক্ষা যখন থাকবে না, তখন যা-কিছুই ঘটুক না কেন ভগবানের বিরুদ্ধে কোনও নালিশও থাকবে না। নালিশ করা অর্বাচীনতার লক্ষণ। 'ঈশ্বর যা করেন, তা মঙ্গলের জন্যই করেন।' অবশ্য আমার ব্যক্তিগত ইষ্ট-সিদ্ধিকে মঙ্গল বলা চলে না। জীবের একমাত্র মঙ্গল হল চিৎশক্তির স্ফুরণ। বিশ্বের বিধান তারই অনুগত। একথাটা প্রথম-প্রথম বুঝতে পারি না বলেই দুঃখের বিরুদ্ধে আমরা নালিশ জানাই। কিন্তু অভিজ্ঞতার পরিপাকে চেতনার এমন-একটা অবস্থা আসে, যখন লোহাতে চকমকি ঠোকার মত দুঃখের আঘাতে ভিতর হতে আগুনের ফুলকিই ঠিকরে পড়ে। সুখ আর দুঃখ দুটিকেই তখন তাঁর দান বলে মাথায় তুলে নিতে পারি।

সমত্বের সহচর হল সমদর্শন। গীতাতে আছে, 'ব্রাহ্মণে গরুতে হাতিতে কুকুরে চণ্ডালে পণ্ডিতেরা সমদর্শী।' তার অর্থ এ নয় যে পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণে-গরুতে কোনও ভেদ করেন না। জগতে ভেদ আছে, বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু সব ভেদ এক অভেদতত্ত্বের স্ফুরণ। ওই অভেদের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভেদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার হল যথার্থ সমদর্শন। অন্তরের সমত্বের ভূমিকায় বাইরের বৈচিত্র্যের দর্শন : কারও প্রতি আমার অনুরাগও নাই, বিরাগই নাই। এই দৃষ্টি বিজ্ঞানীর দৃষ্টি—যেমন নাকি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি, যার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাল-লাগা মন্দ-লাগার বালাই নাই।

সমদর্শনে চেতনা উদার হয়, গভীর হয়। তাইতে বৈচিত্র্যের স্বরূপকেও ঠিক-ঠিক বোঝা যায়। সমদর্শীর বিচারে ভাল-মন্দের মার্কা থাকে না, থাকে পূর্ণ আর অপূর্ণের। জগৎ চলছে চিদ্‌বিকাশের দিকে, অপূর্ণতা হতে পূর্ণতার দিকে। অখণ্ড-সচ্চিদানন্দই পূর্ণতত্ত্ব। তাঁকে লক্ষ্য করেই চলছে সবাই। পথের মধ্যে কেউ এগিয়ে গেছে, কেউ এখনও পিছিয়ে আছে। যে পিছিয়ে আছে,

সমদর্শীর তার প্রতি ঘৃণা নাই বিদ্বেষ নাই—আছে কারুণ্য, আছে প্রেম। বীর্যহীন প্রেম নয়—প্রয়োজন হলে যে-প্রেম রুদ্রতেজে অশিবকে দগ্ধ করতে পারে, সেই ক্ষেমঙ্কর প্রেম। কিন্তু সে-দাহনে জ্বালা নাই।

সমদর্শী নিষ্ক্রিয় নন। মহাপ্রকৃতির মধ্যে চলছে রূপান্তরের তপস্যা। জড়কে তা প্রতিনিয়ত চিৎপ্রকাশের যোগ্য বাহন করে তুলছে। সমদর্শীর প্রাণেও জ্বলছে সেই তপস্যার আগুন। অসত্য অচিতি আর কুশ্রীতা দূর হ'ক, আবির্ভূত হ'ক সত্য প্রজ্ঞান আর সৌষম্য—এই তাঁর আকূতি। তাঁর ঋতচ্ছন্দ জীবনে এরই প্রকাশ। তাঁর সমদর্শনের বিবিক্ত প্রশান্তি এই আকূতিকে রূপ দেবার ভূমিকা মাত্র।

* *

দীর্ঘদিনের সাধনায় সমত্ব সিদ্ধ হতে পারে। সে-সাধনারও আবার স্তরভেদ আছে। প্রথম স্তর হল তিতিক্ষা। তার লক্ষণ, 'সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতিকার-পূর্বকম্'—প্রতিকার না খুঁজে দুঃখকে সয়ে যাওয়ার অভ্যাস করা। এটা তপস্যার অঙ্গ। সুখে চিত্ত এলিয়ে পড়ে, দুঃখে সে সজাগ হয় কঠিন হয়। দুঃখের প্রতিকূল বেদনা অন্তরে বীর্যের আবির্ভাব ঘটায়। সাধককে বীর হতে হবে—নাড়ীকাতুরে হলে চলবে না। তাকে বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, 'ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অচল রব।' আবার এই অচলতার মধ্যে প্রসন্নতারও একটা আমেজ লাগে, যখন ভাবি দুঃখও তাঁরই দান। এ অকল্যাণ নয়, মূর্ছিত চেতনার গভীরে তাঁরই বিদ্যুন্ময় স্পর্শের হানা।

তিতিক্ষার পরের স্তর হল উদাসীনতা। এই হল সত্যকার সমত্ব। 'উদাসীনো গতব্যথঃ'—যিনি উদাসীন তাঁর কোন-কিছুতেই দোলা লাগে না। তাঁর অন্তরের গভীর ছেয়ে থাকে একটা নির্মল প্রশান্তির অনুভব, তাইতে বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতগুলি চেতনায় কোন উত্তালতার সৃষ্টি করে না। 'উদাসীন' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'ঊর্ধ্বে আসীন'। উদাসীন সুখ-দুঃখ ইষ্টানিষ্ট প্রভৃতি সমস্ত দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে। অথচ তিনি যে জগৎকে ভুলে আছেন, তাও নয়। প্রসন্ন দৃষ্টিতে সব দেখছেন তিনি, প্রসন্ন চিত্তেই সব করছেন, কিন্তু কোন-কিছুতে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হচ্ছেন না। তিতিক্ষার বেলায় দেখি, ক্ষোভ জাগছে কিন্তু আত্মশক্তির জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখছি বা তলিয়ে দিচ্ছি। আর উদাসীনতায় ক্ষোভ জাগেই না, দুয়ের মাঝে এই তফাত।

একটা পরম-দর্শন না হলে এই অক্ষোভ্যতা আসে না। আত্মপ্রতিষ্ঠার এমন-একটা ভূমি লাভ করা চাই যা সব-কিছুকে ছাপিয়ে আছে, অথচ নিঃশব্দে সব-কিছুর মধ্যে অনুস্যূত হয়ে চলেছে। প্রাকৃত-চেতনায় সুষুপ্তি হল লোকোত্তর-ভূমি, সেখানে কিছুই নাই; আর জাগ্রৎ হল লোকভূমি, সেখানে সব-কিছুই আছে। সুষুপ্তি আর জাগ্রতে সেখানে বিরোধ। কিন্তু ধ্যানচিত্ততার অভ্যাসদ্বারা সুষুপ্তিকে আমরা যদি জাগ্রতের ভূমিতেও নামিয়ে আনতে পারি, তাহলে সব-কিছুর ঊর্ধ্বে থেকেও সব-কিছুর মধ্যে সহজ আনন্দে নিজেকে বইয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। বৈদিক ঋষির ভাষায় তিনিও এমনি করে 'এই ভূমিকে চারদিক থেকে আবৃত করে দশ আঙুল ছাপিয়ে আছেন'। যুগপৎ তিনি জগতের অতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠা। অতিষ্ঠা আর প্রতিষ্ঠা যেখানে মিলছে, সেইখানে আনন্দ। অতিষ্ঠায় উপশম (quiescence), আর প্রতিষ্ঠায় উল্লাস। উপশম সমত্বের চরম, আর উল্লাস তার শক্তিরূপ। সমত্ব তখনই সার্থক, যখন তা স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে স্বচ্ছন্দ। সমত্বসাধনার এই হল তৃতীয় স্তর।

*

অহংএর সম্পূর্ণ বিলোপ না হলে সমত্ব সিদ্ধ হয় না। কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা যেমন ছাড়তে হবে, তেমনি 'আমি কর্তা' 'আমি ভোক্তা' এই অভিমানও ছাড়তে হবে। চেতনার কেন্দ্রে একটা আমি থাকা অবশ্যই দরকার, নইলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বা সুখ-দুঃখের বোধ হবে কার? কিন্তু এ-আমি কাঁচা আমি বা অবিদ্যার আমি না হয়ে পাকা আমি বা বিদ্যার আমি হওয়া চাই। বৃহতের অনুভবই হল বিদ্যা। পাকা আমি তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত। প্রতি মুহূর্তে সে অনুভব করে, সে যেন বাঁশিওয়ালার হাতের বাঁশি। বাঁশির সাতটা রন্ধ্রই শূন্য; তাতে কোন সুর বাজবে তা সে-বাঁশিওয়ালাই জানেন।

সুখে-দুঃখে প্রবৃত্তিতে-নিবৃত্তিতে এমনি করে বেজে চলার একটা গভীর আনন্দ আছে। যে এই আনন্দের ভোক্তা, তাকে বলি চৈত্যপুরুষ। চৈত্যপুরুষই সত্য জীব, পরমপুরুষের পরা-প্রকৃতি বা 'অংশঃ সনাতনঃ'। তাঁর আনন্দ সম্ভুক্তের আনন্দ, তাঁর কর্তৃত্ব প্রযোজ্য বা নিমিত্তের কর্তৃত্ব। 'তোমার আনন্দে আমার আনন্দ, তোমার ইচ্ছায় আমার কর্ম'—এ-অনুভব তাঁর সহজ ধর্ম। এই চৈত্যপুরুষই আমাদের পাকা আমি। কাঁচা আমিকে সরিয়ে এঁকে জীবনের পুরোধা করাই হল যোগজীবনের লক্ষ্য।

প্রাকৃতপুরুষের মুখ্য সাধন (instrument) হল মন, আর চৈত্যপুরুষের মুখ্য সাধন বোধি। মনের মধ্যে আছে তামসিক মূঢ়তা আর রাজসিক বিক্ষেপ। মূঢ়তা তাঁকে আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে, তিনিই যে আমাদের ভাবনা বেদনা সঙ্কল্পের নিয়ন্তা একথা ভুলিয়ে দেয়; আর বিক্ষেপ হতে জন্মায় আত্মাভিমান বা অহন্তা। এ-দুটিতে আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন এবং বিক্ষুব্ধ করে রাখে। আমাদের সত্য স্বরূপকে জানতে পারি যখন আমরা শান্ত হই, অন্তর্মুখ হই। তখন এই মূঢ় এবং বিক্ষিপ্ত অথচ অহঙ্কৃত চেতনার অন্তরালে এক শুদ্ধসত্ত্ব সত্তার সাক্ষাৎ পাই। এই সত্তা বৃহতের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, বৃহতেরই সে বিভূতি। তার মধ্যে আছে চিদাবেশের একটা নিত্য অনুভব। তাঁর শান্তিতে সে নিথর, তাঁর প্রকাশে স্বচ্ছ, তাঁর আনন্দে হিল্লোলিত, তাঁর শক্তিতে বিদ্যুদ্‌গর্ভ। এই চিদাবিষ্ট সত্তার যে প্রজ্ঞাবৃত্তি, তা-ই বোধি। বোধির প্রেরণাতেই কর্ম সত্য হয়। তার মূলে তখন আর অহং বা অবচেতনায় অন্তর্গূঢ় কামবাসনার প্ররোচনা থাকে না।

বোধির মধ্যে যেমন আছে শুদ্ধ প্রবৃত্তির প্রেরণা, তেমনি আবার আছে নিবৃত্তির গভীর নিথরতাও। বোধির ভূমি হতে দেখি, কর্ম উৎসারিত হচ্ছে অকর্ম হতে। যিনি অকর্তা, তিনি সাক্ষী। সাক্ষীর দৃষ্টি প্রকৃতির মর্মভেদী—আধারের গভীরে গুপ্ত সংস্কারকে সে বাইরে টেনে আনে। এই হল আত্মপরিচয়ের আরেকটা দিক। আলোর দিকটা যেমন জানতে হবে, তেমনি আঁধারের দিকটাও জানতে হবে। সাক্ষীর দৃষ্টি নির্মোহ, নির্ভীক—তার মধ্যে প্রশাসনের একটা শক্তি আছে। এই প্রশাসন প্রাকৃত গুণের রূপান্তর ঘটায়। তামসিক মূঢ়তাকে সে পরিণত করে অটল স্থৈর্যে, রাজসিক বিক্ষেপকে অধৃষ্য বীর্যে; আর তাইতে সত্ত্ব শুদ্ধ হয়, জ্ঞানময় তপঃশক্তিতে বিচ্ছুরিত হয়। এই হল প্রাকৃত গুণের কল্যাণগুণে রূপান্তর। প্রকৃতি তখন আত্মার স্বীয়া প্রকৃতি, শিবশক্ত্যালিঙ্গিত-বিগ্রহ। অথচ সাক্ষীর প্রপঞ্চোপশম প্রশান্তিতেই তাঁর অতিস্থিতি।

শিব-শক্তির এই সামরস্যের অনুভবই জীবের পুরুষার্থ। এ-অনুভব তটস্থ নয়, শক্তির বিকিরণে প্রভাস্বর। এই ভাস্বরতাই তাঁর দিব্য-সঙ্কল্প, উৎসর্গ সাধকের চেতনাকে যা বহন করে তাঁর সিদ্ধির বাহনরূপে।

১০

ত্রিগুণা প্রকৃতি

দেহ প্রাণ আর মন নিয়ে আমাদের জীবন—এইটুকুই সাধারণত আমরা দেখতে পাই। কিন্তু দেহ-প্রাণ-মনকে জড়িয়ে অথচ তাকে ছাপিয়ে আরেকটা তত্ত্ব আছে—তাকে বলি চিৎ, সাংখ্যবাদীরা বলেন পুরুষ। চিৎ পুরুষ; আর যে দেহ-প্রাণ-মনকে আশ্রয় করে তার প্রকাশ, তাকে বলতে পারি প্রকৃতি। প্রকৃতি বস্তুত শক্তি। পুরুষেরই সে শক্তি, কিন্তু তবুও সে পুরুষকে বাঁধে, তার স্বাতন্ত্র্য হরণ করে। যে-প্রকৃতি বাঁধে, তাকে বলি 'অপরা'। পুরুষ যে বাঁধা পড়েছে, এটা সে প্রথমে বুঝতে পারে না। ক্রমে তার হুঁশ হয়। তখন সে বাঁধন কাটিয়ে উঠতে চায় আত্মশক্তিতে। এ-শক্তিও প্রকৃতি। একে বলতে পারি 'পরা'। পরা আর অপরা এক লোকোত্তর শক্তিরই দুটি বিভাব—সে-শক্তিকে বলতে পারি 'পরমা প্রকৃতি'। পুরুষ তখন পুরুষোত্তম।

অপরা-প্রকৃতি পুরুষকে কি দিয়ে বাঁধে? সাংখ্যবাদীরা বলেন, গুণ দিয়ে। তিনটি গুণের কথা তাঁরা বলেন—তমঃ রজঃ আর সত্ত্ব। গুণলীলার ছবিটি নেওয়া হয়েছে সূর্যোদয় থেকে। চিৎ বা পুরুষ যেন সূর্যের আলো। রাত্রিতে আলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, সে ফুটতে চায় কিন্তু ফুটতে পারে না—এই হল 'তমঃ'। ভোরবেলা আলো ফুটি-ফুটি করে, আকাশ লাল হয়ে ওঠে—এই হল 'রজঃ'। তারপর সাবিত্রলগ্নে আকাশ ধূসর প্রভায় ছেয়ে যায়—তাকে বলে 'সত্ত্ব'। তারপর আলোঝলমল সূর্যের উদয়—এই হল স্বপ্রকাশ পুরুষের মহিমা। প্রকৃতি যখন আধারে অর্থাৎ দেহ-প্রাণ-মনে আলো ফুট্‌তে দেয় না তখন সে অপরা, যখন দেয় তখন সে পরা। অপরা-প্রকৃতির বন্ধন হতে পরা-প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যে উত্তীর্ণ হওয়াই হল পুরুষার্থ।

এখন রূপক ভেঙে গুণের পরিচয় নেওয়া যাক। তমোগুণ চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ আধারে চেতনার নিগূঢ় ক্রিয়া তখনও সমানভাবে চলে। কিন্তু সে-ক্রিয়া হয় যান্ত্রিক। দেহে তমোগুণের প্রাবল্য আনে আলস্য আর নিদ্রা, প্রাণে ভয়, মনে প্রমাদ আর জড়ত্ব। তামসিক মানুষ গতানুগতিকতার দাস, নতুন-কিছুকে বোঝা বা গ্রহণ করা তার অসাধ্য। তার জীবন অনেক-

পরিমাণে উদ্ভিদ্-জীবনের সগোত্র।

রজোগুণের প্রধান লক্ষণ হল চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপ। তামসিক অবসাদ ও আচ্ছন্নতা তার মধ্যে নাই আছে দুর্বার প্রাণের সংবেগ। রাজসিক মানুষ চা ভোগ আর ঐশ্বর্য। শক্তির মত্ততায় সে কখনও-কখনও অসুর রাক্ষস ও পিশাচের পর্যায়ে ওঠে। দৃষ্টির ঔদার্য এবং স্বচ্ছতা না থাকায় প্রায়ই তা শক্তিমত্ততা ঠেকে গিয়ে অপঘাতে। রাজস জীবনে প্রবল হয় পাশবতা।

সত্ত্বগুণ চেতনায় আনে প্রশান্তি সৌষম্য এবং স্বচ্ছতা। তামসিক জড় বা রাজসিক চাঞ্চল্য তার মধ্যে নাই। সাত্ত্বিক মানুষ সত্য জ্ঞান আনন্দ এ কল্যাণের উপাসক। এক কথায় সে দেবস্বভাব।

অপরা-প্রকৃতিতে তিনটি গুণের ক্রিয়া হয় মিশ্রভাবে। কোনও-এক গুণের ক্রিয়া অতিমাত্রায় প্রবল হওয়ার দরুন আমরা মানুষকে তামসিক রাজসি বা সাত্ত্বিক প্রকৃতির বলে চিহ্নিত করতে পারি বটে। কিন্তু তবুও যতদিন ন মানুষ অপরা-প্রকৃতির সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারছে, ততদিন গুণমিশ্রণে হাত হতে সে অব্যাহতি পায় না। তাইতে সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষের মধ্যে যেমন সময়বিশেষে মূঢ়তা বা চাঞ্চল্য দেখা দিতে পারে, তেমনি তামসিক ব রাজসিক প্রকৃতির মধ্যেও 'হঠাৎআলোর ঝলকানি' একেবারে দুর্লভ নয়। তাছা একই মানুষ আধারের এক অংশে সাত্ত্বিক, আরেক অংশে রাজসিক আব আরেক অংশে তামসিক—এও দেখা যায়। প্রকৃতিতে তিনটি গুণ থাকবে নইলে শক্তির বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু গুণগুলির মধ্যে অবিচ্ছন্দ ন মিত্রচ্ছন্দ থাকবে, তারা চিৎপ্রকাশের অনুকূল না প্রতিকূল হবে—সেই হ সমস্যা।

*

মানুষ 'অনীশঃ শোচমানঃ'—সে দুঃখ পায়, কেননা সে ঈশ্বর নয়। প্রকৃতি উপর তার প্রশাসন নির্বাধ নয়, তার কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব ব্যাহত হয় বারে-বারে এই তার দুঃখবীজ। দুঃখ দূর করবার লৌকিক উপায় সবসময় সফল হয় না অথচ দুঃখের হাত হতে বাঁচা তার চাইই। বাঁচবার একটিই অমোঘ উপা আছে—বিবিক্ত হওয়া। দুঃখবোধ চেতনাকে ক্ষুব্ধ করে। সে-ক্ষোভের ঊর্ধে ওঠবার শক্তি মানুষের মধ্যে আছে। অন্তরাবৃত্তির দ্বারা চেতনাকে সে দুঃ

করে নিতে পারে; তার একভাগ প্রকৃতির অভিঘাতে টলছে, আরেকভাগ টলছে না। যে-ভাগ টলছে না, সে হল মানুষের মধ্যে বিবিক্ত পুরুষ। তিনি স্বয়ং অক্ষুব্ধ থেকে ক্ষোভের সাক্ষী।

সাক্ষিত্ব হল প্রাকৃত-চেতনার অতিরেক। সাক্ষি-চেতনা না থাকলেও প্রাকৃত-চেতনার কাজ যন্ত্রের মত চলতেই থাকে—যেমন দেখি পশুর মধ্যে। প্রকৃতির এই যন্ত্রাচারের ভিতর দিয়েও চেতনার অগ্রাভিযান চলে—কিন্তু চলে মন্থর লয়ে। প্রগতি দ্রুত হয়, যখন একজন যন্ত্রী এসে যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের ভার নেয়। যন্ত্রী আত্মসচেতন। অন্তরাবৃত্তি আর আত্মসচেতনতাই সাক্ষিত্বের লক্ষণ।

সাক্ষী বিবিক্ত এবং প্রশান্তাও। প্রকৃতির ক্রিয়া আমার ইষ্টসিদ্ধির অনুকূল হ'ক—এমন-একটা অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা সবার মধ্যেই আছে। কিন্তু কেমন করে তা হবে, তা আমাদের ভাল করে জানা নাই; যথার্থ ইষ্টই-বা কি, তার বোধও আমাদের খুব পরিষ্কার নয়। সাক্ষিত্ব সেই বোধকে স্পষ্ট করে তোলে এবং প্রকৃতির ক্রিয়াকে তার অনুকূলে পরিচালিত করতে পারে। জীবন তখন অনেক ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়। বিবিক্ততার এই লাভ।

চেতনার প্রগতিতে বাধা আসে তামসিকতা ও রাজসিকতা হতে। তমোগুণ চেতনাকে অসাড় আড়ষ্ট এবং আচ্ছন্ন করে রাখে, সে আর এগবার পথ পায় না, চলতে গিয়ে একটা বাঁধা রাস্তায় কেবল পাক খেয়ে মরে। এই জড়ত্ব আর যান্ত্রিক আবর্তন থেকে চেতনাকে মুক্ত করে রজোগুণ; কিন্তু তার চাঞ্চল্য বিক্ষোভ আর উদ্দামতা বারবার চেতনাকে পথভ্রষ্ট করে। তমোগুণ আলোকে যেমন আড়াল করে রাখে, রজোগুণ তেমনি আবার তাকে নিজের খেয়ালের রঙে রাঙিয়ে তোলে। তার স্বচ্ছ শুভ্র দিব্য প্রকাশ কোনটাতেই সম্ভব হয় না।

সাধককে আশ্রয় নিতে হবে সত্ত্বগুণের। শুদ্ধসত্ত্বে চেতনার আবরণও নাই, বিক্ষেপও নাই। সে তখন নিবাত-নিষ্কম্প শিখার মত। উপমাটিকে কিন্তু আমরা অনেকসময় ভুল বুঝি। ভাবি, শিখাতে শুধু আলোই আছে—তাপ নাই, দাহিকাশক্তি নাই। সত্ত্বের সাধনা তাই আমাদের মধ্যে প্রায়শই নিস্তাপ মরা আলোর সাধনায় পর্যবসিত হয়। এ কিন্তু তামসিকতারই নামান্তর। আবার সত্ত্বের মধ্যে তেজ সঞ্চার করতে গিয়ে তার মধ্যে খানিকটা রজোগুণের মিশাল দিই যদি, তাহলেও বিপদ আছে। আধ্যাত্মিকতা তখন পর্যবসিত হয় ধর্মোন্মাদে। সেও তো ভাল নয়। সমস্যার তাহলে সমাধান কি?

শুদ্ধসত্ত্বে পেঁছতে হলে সাধককে প্রথমে তিনটি গুণের বাইরে চলে যে[illegible] হবে। গুণ প্রকৃতির; পুরুষ প্রকৃতির ভর্তা হয়েও তার ঊর্ধ্বে। চেতন[illegible] এমন-একটা ভূমি আছে যেখানে কোনও তরঙ্গই নাই—আলোও নাই, আঁধার[illegible] নাই। আছে শুধু এক মহাকাশের নির্বর্ণ শূন্যতা। শক্তি সেখানে নিথ[illegible] অথচ ওই নিথরতাই তার উল্লসনের উৎস। ওই অবর্ণের সঙ্গে যুক্ত থে[illegible] শক্তির যে আদিম বিচ্ছুরণ, তা-ই হল শুদ্ধসত্ত্বের শুভ্রতা। যেমন আকাশে[illegible] নীল বুকে সাবিত্রীর দ্যুতি। এই শুদ্ধসত্ত্বই অপরা-প্রকৃতির গুণলীলার আধার[illegible] অপরা-প্রকৃতির মধ্যে যে-সত্ত্বের লীলা, তা অবিশুদ্ধ। তাও বন্ধনের কার[illegible] গীতা বলেন, গুণ আমাদের বাঁধে আসক্তি দিয়ে; সত্ত্বগুণ বাঁধে সুখ আর জ্ঞানে[illegible] প্রতি আসক্তির সহায়ে। আসক্তির বন্ধন কাটাতে হলে চাই পরবৈরাগ্য বা গু[illegible] বৈতৃষ্ণ্য। প্রকৃতির রজোগুণ বা তমোগুণের প্রতি তৃষ্ণা তো থাকবেই না, স[illegible] গুণের প্রতিও না। চেতনা হবে নির্বর্ণ সাক্ষি-চেতনা; তারই আরেক পি[illegible] থাকবে শুভ্রবর্ণ ঐশ্বর-চেতনা—প্রকৃতির বহুধা বর্ণালীতে যার বিচ্ছুরণ।

*

সাক্ষিভাবনার একটা ফল, ওতে আত্মপ্রকৃতির সমস্ত রহস্য সাধকের কা[illegible] অনাবৃত হয়ে পড়ে। যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছি, ততক্ষণ আম[illegible] নিজেদের বলতে গেলে কিছুই চিনি না। প্রকৃতির প্রণোদনা আসে আধারে[illegible] গভীর হতে, তার প্রভাবে স্রোতের মুখে কুটার মত আমরা ভেসে চলি, কি[illegible] কি হচ্ছে তা বুঝতে পারি না বলে নিজেকে সামলাতেও পারি না। কি[illegible] অন্তর্মুখ হয়ে 'শুধু আমি আছি' এই প্রত্যয়ের মধ্যে নিজেকে যদি সমাহি[illegible] করি, তাহলে পর্দায় ছায়াছবির মত নিজের মধ্যে প্রাকৃত গুণলীলাকে স্প[illegible] প্রত্যক্ষ করতে পারি। তখন দেখি, এক আমিই একদিকে অহং হয়ে অপ[illegible] প্রকৃতিকে জড়িয়ে তার গুণক্ষোভে আন্দোলিত হচ্ছে, আরেকদিকে আলো[illegible] নাওয়া আকাশের মত প্রশান্ত পরিব্যাপ্তিতে নিথর হয়ে আছে। এই প্রশান্তি[illegible] প্রতিতুলনায় ওই ক্ষোভের একটা সূক্ষ্ম বেদনা তখন চেতনাকে পীড়িত করে[illegible] নিজের অহংকে তখন মনে হয় বড় ক্ষুদ্র বড় মলিন অথচ বড় প্রগল্‌ভ। [illegible] তামসিক আমি একটা নিরুদ্যম জড়পিণ্ড আর যে রাজসিক আমি প্রাণবাস[illegible] বিক্ষুব্ধ এবং মুখর, তাদের অসহ্য তো ঠেকেই, এমন-কি যে সাত্ত্বিক আ[illegible]

মনস্বিতা আধ্যাত্মিকতা বা জনহিতৈষণার গৌরব করে, মনে হয় সে-আমিও যেন ফানুসের মত ফাঁপা। আমি কোথাও নাই, আমি শূন্যবৎ—আমি শুদ্ধ সত্তামাত্র। এই সত্তার গভীরে আছে এক পরমা প্রশান্তি যা একটা লঘু ব্যাপ্তিবোধের দ্বারা আধারের গ্রন্থিগুলিকে শিথিল করে দেয়, আর তাদের ফাঁকে-ফাঁকে তাদের গলিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আলোর এক নিস্তরঙ্গ পারাবার। এই আলোর পারাবারই তখন সত্য, প্রাকৃত-জগৎ তার সুদূর উপকূলের ছায়ামাত্র।

জগৎ তখন ছায়া। তার কোনও মায়াই আর উদাসীন চেতনায় তরঙ্গ তোলে না—অবসাদেও না, দুঃখেও না। কিন্তু এমনি করে একদিক যেমন শূন্য হয়ে যায়, আরেকদিক আবার তেমনি ভরে ওঠে—যেমন জাগ্রতের কোলাহল থেমে গেলে ফোটে স্বপ্নের জ্যোছনা, সুষুপ্তির স্তব্ধতা। শূন্যের বুকে তখন নামে লোকোত্তর জ্যোতির প্লাবন। বারবার নামে আর আলোর পলিতে শূন্যতাকে ভরাট করে তোলে। চেতনার গভীরে এক চিন্ময় নতুন মহাদেশের সৃষ্টি হয়, যার স্বরূপ হল প্রজ্ঞানঘনতা। প্রজ্ঞানঘনতা সৌরমণ্ডলের মত। সে নিষ্ক্রিয় নয়—তার যেমন আলো আছে; তেমনি তেজও আছে। তার তেজস্ক্রিয়া সৃষ্টিধর্মী। সৌরদ্যুতির মতই সে দ্যুলোক হতে নেমে আসে ভূলোকে আর তার তেজে আধারকে নতুন করে গুড়ে তোলে। অপরা-প্রকৃতির গুণলীলায় এতদিন যে-অরিচ্ছন্দ ছিল যার জন্য বিবেক সাধনা হয়ে পড়েছিল অপরিহার্য, তা এখন রূপান্তরিত হয়ে মিত্রচ্ছন্দে। দেহ-প্রাণ-মন তখন আর চিৎশক্তির অবন্ধ্য প্রকাশের বাধক নয়—সাধক।

দেহ তমোগুণের সৃষ্টি, জড়ক্রিয়ার পৌনঃপুনিকতা তার ধর্ম। প্রাণ রজোগুণের সৃষ্টি, বাসনার অন্ধ প্রমত্ততা হল তার ধর্ম। আর মন সত্ত্বগুণের সৃষ্টি, চেতনার স্বচ্ছ প্রকাশের আকূতি তার স্বভাবগত। প্রাকৃত-জীবনে এই আকূতি বাধা পায় দেহের জড়তায় আর প্রাণের উত্তালতায়। অথচ দেহ আর প্রাণকে আশ্রয় করেই মনের স্ফুরণ সম্ভব—তিনটি অঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। তিনের মধ্যে যে-বৈষম্য আর সংঘর্ষ, তা আপনাথেকে দূর হবার নয়—এমন-কি মনের শক্তিতেও নয়। তার জন্য চাই একটা তুরীয় শক্তির আবেশ। চিৎ হল সেই তুরীয় শক্তি। চিৎশক্তি দেহ-প্রাণ-মনের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে, কিন্তু সেখানে তার প্রকাশ বিশুদ্ধ নয়। তার বিশুদ্ধ প্রকাশ হল দেহ-প্রাণ-মনের ঊর্ধ্বে। তার শুদ্ধ স্বরূপকে জানবার জন্যই বিবেক এবং বৈরাগ্যের সাধনা। শুধু জানাতেই সাধনার শেষ নয়, সেই জানাকে আবার প্রাকৃত-ভূমিতে

নামিয়ে আনতেও হবে।

বিজ্ঞান আধারে সক্রিয় হতে পারে—ব্যক্তির চেষ্টাতে নয়, মহাশক্তির আবেশে। অহং-নিরসন এইজন্যই অধ্যাত্ম-সিদ্ধির আদিম এবং অন্তিম সাধন। আমি গেলে তবে তিনি আসবেন—আসবেন এক রূপান্তরিত আমি হয়ে। সে-আমির দেহ আর চিৎপ্রকাশের বাধা নয়, তার অণুতে-অণুতে তখন চিৎশক্তির বিচ্ছুরণ। প্রাণ তাঁর অশ্রান্ত আনন্দের নির্ঝরণে হিল্লোলিত, মন লোকোত্তর জ্যোতির প্রশান্তিতে উদ্‌ভাস্বর। কয়লায় তখন আগুন ধরে যায়। তার ময়লা ছোটে, ধোঁয়া কাটে, অণুতে-অণুতে ফুটে বেরয় আগুনের আভা। উত্তরশক্তির প্রচণ্ড চাপে হয়তো সে হীরা হয়ে যায়।

গুণের রূপান্তরের জন্যই নিস্ত্রৈগুণ্যের সাধনা। প্রাকৃত গুণের ঊর্ধ্বে যেতে হবে আধারে দিব্য গুণকে স্ফুরিত করবার জন্য। গুণবিক্ষোভ অপরা-প্রকৃতির ভূমিতে; আর পরমা-প্রকৃতিতে গুণসাম্যের ভিত্তিতেই দিব্যগুণের স্ফুরণ। তখন তমঃ রূপান্তরিত হয় প্রশান্তিতে, সত্তার অচল প্রতিষ্ঠায়; রজঃ রূপান্তরিত হয় সত্যসঙ্কল্পের অধৃষ্য বীর্যে; আর সত্ত্ব রূপান্তরিত হয় চিৎ ও আনন্দের অবাধিত উল্লাসে। এও গুণসাম্য, কেননা কোনও গুণের সঙ্গে কোনও গুণের এখানে বৈষম্য নাই। প্রচলিত সাংখ্যে যে প্রকৃতির গুণসাম্যের কথা বলা হয়, তা হল সত্তার কুমেরু; আর পুরুষের এই গুণসাম্য তার সুমেরু। তন্ত্রের যন্ত্রে একটি অধস্ত্রিকোণ, আরেকটি ঊর্ধ্বত্রিকোণ। ত্রিকোণ সমবাহু বলে সাম্যের প্রতীক। পরা-সত্তায় দুটি ত্রিকোণ যুগনদ্ধ।

১১

কর্মাধ্যক্ষ

জীবন কর্মময়। কর্ম শক্তির প্রকাশ। এ কার শক্তি? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আমার শক্তি। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। পদে-পদে দেখতে পাই, শক্তি আমার বশে নয়। বরং আমিই তার বশীভূত। আবার আমার মধ্যে যে-শক্তির প্রকাশ, তা এক মহাশক্তির বিভূতিমাত্র। এই মহাশক্তির যিনি ভর্তা এবং ভোক্তা, তিনি মহেশ্বর। আবার মহেশ্বর মহাশক্তি আর আমি বা জীব—এই নিয়ে এক অখণ্ড অস্তিত্বের ত্রিপুটী। তিনের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে একই চৈতন্য। মহেশ্বরের পরমচৈতন্য স্ফুরিত হচ্ছে আমার আত্মচৈতন্যে। মহেশ্বর দূরে নন, তিনি আমার অন্তর্যামী। তিনি বিশ্বের অন্তর্যামী। আবার তিনি বিশ্বাতীত। আত্মচৈতন্যে বিশ্বচৈতন্যে এবং বিশ্বাতীত চৈতন্যে তাঁর অনুভব আমরা পেতে পারি—চেতনার বিস্ফারণে। এই অনুভবে আমাদের মধ্যে জাগে আনন্দ, জাগে শক্তি। সে-আনন্দ অবাধিত, সে-শক্তি নিরঙ্কুশ; কেননা তারা বৃহতের আনন্দ, বৃহতেরই শক্তি। নিজেকে জানা বৃহতের বিভূতিরূপে, জেনে তাঁকে ভালবাসা, ভালবেসে তাঁর শক্তির শরিক হওয়া, আর সেই শক্তিতে তাঁর চিন্ময় সঙ্কল্পকে জীবনে মূর্ত করে তোলা—এই হল যোগের লক্ষ্য।

*

কিন্তু সে-লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে দীর্ঘ পথ অতিবাহন করতে হবে। আর সে-পথও যে আগাগোড়া ফুলে-ছাওয়া, তা নয়। উপনিষদ বলেন, সে যেন 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'। সত্যি তা-ই। পথ যে দীর্ঘ আর দুর্গম, একথা সাধকের গোড়া থেকেই জেনে রাখা ভাল। অনেক বাধা অনেক ব্যর্থতার জন্য নিজেকে তৈরী রাখতে হবে। তার জন্য চাই শ্রদ্ধা, আর চাই ধৈর্য। 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে'—এর নাম শ্রদ্ধা। পথ জটিল হ'ক, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছন যে সুনিশ্চিত এতে তো কোনও ভুল নাই। বাইরে

একটা-কিছু পেতে গিয়ে আমি ফাঁকিতে পড়তে পারি, কিন্তু অন্তরের পাওয়ার
কোনও ফাঁকি থাকতেই পারে না। যে ঠিক-ঠিক জোরের সঙ্গে চাইতে পারে
বাধা তাকে আরও উদ্দীপ্ত করে তোলে, পাথরে-পাথরে ঠুকে আগুন ঠিক
পড়ে তার ভিতর থেকে। সঙ্কল্পে নিথর যে-সাধক, তার ভিতরটা অমনি
পাথরের মত। সে হার মানবে না কিছুতেই, এইখানে তার ধৈর্যের পরিচয়
আর এই ধৈর্য বীর্যের উলটা পিঠ। যে দুর্বল, সেই চায় সস্তায় কিস্তিমাত
করতে। 'তুমি ডাকলে পরে দাও না দেখা, আমার জনম গেল কাঁদতে'—এ
কথা সে-ই বলে। আসলে ডাকার মত ডাকতেই সে পারেনি। যে কাঁদুনি গায়
সে তামসিক; যে হঠাৎ-সিদ্ধির জন্য ছটফট করে, সে রাজসিক। ওরা নিজের
নিজের পথে বাধার সৃষ্টি করে। সাধকের চিত্ত হবে ভোরের আকাশের মত
প্রশান্ত উদার এবং প্রসন্ন। সে-আকাশে আঁধার থাকলেও আলোর ছোঁয়ায় তা
তরল হয়ে আসছে। নিজের আলোকে কেউ ঠেকাতে পারে না—এ-আশ্বাস
অবিনশ্বর। আকাশকে মেঘে ছেয়ে ফেললেও দিনের আলো কিছুতেই মরে না,
মেঘ চুঁইয়ে সে পৃথিবীর বুকে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এমনিতর আলোর আশ্বাস
যে পেয়েছে, সেই শ্রদ্ধাবানের হৃদয়ে তিনি তাঁর অতন্দ্র অথচ প্রশান্ত প্রতীক্ষা
সার্থক করে ধীরে-ধীরে ফুটে ওঠেন।

*

কর্ম তখনই সত্য হয়, যখন তা রূপান্তরিত হয় যোগে। যোগের লক্ষ্য
চেতনার বিস্ফারণ। বিস্ফারিত চেতনায় নেমে আসে শান্তি আলো আনন্দ
আর শক্তি। এগুলি দৈবী-সম্পৎ, এরা জীবনকে দিব্য করে তোলে। প্রত্যেকের
মধ্যে এদের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে বীজের আকারে। যোগের শক্তি সে-বীজকে
অঙ্কুরিত করে। আবার সে-শক্তি অন্তর্যামীর শক্তি। তিনিই আমাদের জীবন
শিল্পী, আমাদের যোগেশ্বর, আমাদের সকল কর্মের নিয়ন্তা।

তিনি তিলে-তিলে আমাদের দিব্যরূপান্তর ঘটিয়ে চলেছেন। তাঁর
রূপায়ণ নিঃশব্দ দুর্জ্ঞেয় অথচ এক পুরাণী প্রজ্ঞার প্রশাসনে নিধ্রুব। বাইরে
থেকে আমরা তার রহস্য কিছুই বুঝতে পারি না। যদি বুঝতাম, তাহলে
দেখতাম, তাঁর শিল্পকৃতির তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে তাঁর শক্তির কাজ চলে
নেপথ্যে—বীজকে ভ্রূণকে গুহাশয়নের নিরাপত্তায় রেখে সে তাকে পুষ্ট করে

তারপর দ্বিতীয় পর্বে আসে বিশ্বশক্তির সঙ্গে তার মোকাবিলা করবার সময়। বীজ তখন অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই অনুকূল এবং প্রতিকূল দু'রকম শক্তির সম্পর্কে তাকে আসতে হয়। এই সময় আমাদের প্রবুদ্ধ চেতনায় দেখা দেয় সত্য-মিথ্যা সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব। ক্ষুব্ধ হয়ে আমরা তখন প্রশ্ন করি, অসত্য দুঃখ আর অশিব তো আমরা চাই না, তবুও জীবনে তাদের ঝামেলা পোয়াতে হয় কেন? ভিতরে একটা অস্থিরতা আসে, কি করে তাড়াতাড়ি পথের শেষে পৌঁছব। আগে চেতনায় একটা তামসিকতার পর্ব গেছে, তারই অনুবৃত্তিতে চলে এই রাজসিকতার পর্ব। শ্রদ্ধা বীর্য আর ধৈর্য নিয়ে এটা পার হতে হয়। অবাঞ্ছিত হলেও জানতে হবে এটা তৃতীয় পর্বেরই প্রস্তুতি। যখন আলো-আঁধারির দ্বন্দ্ব কেটে গিয়ে কেবল আলো ফুটবে, তখন প্রজ্ঞাদৃষ্টি খুলে যাবে। সেই দৃষ্টিতে দেখব, তাঁর অবন্ধ্য সঙ্কল্প আগাগোড়া ঋতচ্ছন্দা হয়ে কাজ করে গেছে জীবনে। ভ্রান্তি ব্যর্থতা দুঃখ অন্যায় পাপ—যাদের অনর্থ বলে ভেবেছি, তাদেরও অর্থ ছিল, অবিদ্যার খেলার মূলেও ছিল বিদ্যার প্রশাসন। যাকে মনে করেছিলাম আবর্জনা, তাকে পচিয়ে তিনি সার করেছেন, আর সেই সার হতে ফুটিয়েছেন ফুলের বাহার।

'ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।' বুদ্ধি দিয়ে টীকা করে তাঁর লীলা বোঝা যায় না; বোঝা যায় বোধি দিয়ে, একান্তভাবে তাঁর হয়ে। তিনি আলো, আমি ফুলের কুঁড়ি। তাঁর রংবাহার ঘুমিয়ে আছে আমার পাপড়ির বুকে, সে জাগবে তাঁরই ছোঁয়ায়। এই পরমা নিয়তির অবিচল প্রত্যয় হল শ্রদ্ধা, অথবা তাঁর আলোর প্রসাদ, তাঁর আবেশ। তাঁর সঙ্গে আমার রাখিবন্ধন এই শ্রদ্ধাতে। শ্রদ্ধাই হৃদয়কে আশ্বস্ত করে প্রশান্ত করে প্রসন্ন করে। আত্মসমর্পণ তখন সহজ হয়। তাঁর মধ্যে লুটিয়ে দিয়েই নিজেকে তখন আরও সত্য করে আরও বেশী করে পাই। আমি তাঁর আলোর ফুল, এই আমার সত্য পরিচয়। সহজের মাধুরীতে হৃদয়ের এই ঘট ভরে দিলেন তিনি, এই তো আমার ধন্যতা। আমার কৈশোর এল, তারুণ্যও আসবে। কিন্তু আসবে কৈশোরের লাবণ্যে ঝলমল হয়ে। তখন তাঁর শক্তিও ফুটবে আমার মধ্যে সহজ হয়ে অনায়াস হয়ে। ঝড়ের মত্ততায় নয়, আলোর নিঃশব্দ প্রসারে।

এমনি করে তাঁর মধ্যে সহজ হওয়ার জন্যই দীর্ঘদিনের কঠিন সাধনা। তার ধাপগুলির কথা আগেও বলেছি। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে এই বোধ নিয়ে সজাগ থাকতে হবে : আমি তোমার, অনিঃশেষে তোমার। আমার কর্ম তোমার

শক্তির হিল্লোল, তোমারই বিশ্বযজ্ঞের আহুতি। আমি যা করছি, তার মূলে তুমি, ফলেও তুমি। আমি ফল চাই না, তুমি যে আমায় চেয়েছ তোমার শক্তির লীলায়—এইটুকু শুধু বুঝতে চাই। আমি কর্তা হতে চাই না; হতে চাই করণ, তোমার হাতের বাঁশি। তোমার প্রাণ দিয়ে তার শূন্যতাকে পূর্ণ করে যে-সুর খুশি বাজাও তুমি—আকাশের সুর, আলোর সুর, ঝড়ের সুর, সমুদ্রের সুর। আমি কেবল শুনি, কেবল শুনি।

*

'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, শক্তি আমার নয় তোমার'—এগুলি শুদ্ধভাবের কথা। কিন্তু এরও মধ্যে অহঙ্কারের ফাঁকি থাকতে পারে। আর সে-অহং বড় সর্বনাশা। তাঁর কাছে নিজেকে যখন সঁপে দিই, তখন শক্তি আসে। শক্তির স্ফুরণে হয়তো অঘটনও ঘটে। বেশ বুঝতে পারি, যা ঘটল তা আমার শক্তিতে নয়, তাঁরই শক্তিতে। কিন্তু তবুও আমিই যে বিশেষ করে তাঁর শক্তির বাহন হলাম, আমার এ-গুমর ঠেকায় কে। কর্তৃত্বের অভিমান গেল তো নিমিত্তের অভিমান এসে হৃদয় দখল করল। সমুখদুয়ার দিয়ে অহংকে খেদিয়ে দিলাম তো সে পিছনদুয়ার দিয়ে এসে জাঁকিয়ে বসল। সাধকের অহং গেল তো তার জায়গায় এল সিদ্ধের অহং। বলছি বুঝছিও, এ আমার শক্তি নয়, তাঁরই শক্তি; কিন্তু তবুও যে সে-শক্তি এসে আমাকেই আশ্রয় করল, এটা কি সোজা কথা। রন্ধ্রপথে শনি এসে আধারে ভর করল। যেমন শক্তি বাড়তে থাকল, তেমনি অহংও ফাঁপতে লাগল। এ-অহং তখন দেবতার মুখোসপরা অসুর। ঋষিরা বলেন, সব অসুরই যে মন্দ তা নয়। ভাল অসুরও আছে, তারা শিবের উপাসনা করে, দেবকর্মও করে। কিন্তু শেষ আহুতিটি দেয় নিজের মুখে। অহংএর এই আসুরী ছলনা আরও মারাত্মক।

সাধনায় শক্তি আসে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু শিব না হলে শক্তিকে সামাল দেওয়া যায় না, শেষরক্ষাও হয় না। শিব আকাশবৎ—নিথর উদার প্রসন্ন। অহং গেলে চেতনার এই অবস্থা হয়। আমি অকর্তা হই অথবা তাঁর নিমিত্তই হই, সত্তার গভীরে আমার অবিক্ষুব্ধ প্রশান্তি কিছুতেই টুটবে না। শক্তির ঝড় বয়ে যাক আকাশের বুকে, তবুও তাকে ছাপিয়ে আকাশ নিস্তরঙ্গ। যেমন অক্ষোভ্যতায় নিস্তরঙ্গ, তেমনি অনাসক্তিতেও নিস্তরঙ্গ। যে নিমিত্ত, সে

কিছু ঘটিয়ে তোলে না, অত্যন্ত সহজ থেকে সব-কিছু সে ঘটতে দেয়। শক্তির উৎসারণও যদি হয় তার ভিতর থেকে, সে হয় ফুল ফোটার মতই অনায়াস। তার রসের যোগান আসে অদৃশ্যের গভীর হতে। আকাশ-বাতাস-আলোর সঙ্গে তার মিতালি, সে বৃহতের স্বপ্ন।

*

অহংকে মিলিয়ে দিতে হবে ব্রহ্মের মধ্যে, ব্রহ্মের শক্তির মধ্যে। শক্তিমান আর শক্তি অভেদ, তবুও ক্রিয়া দেখে শক্তির অনুমান করি বলে মনে করি নির্গুণ ব্রহ্ম বুঝি নিঃশক্তিক। আসলে ক্রিয়াতে শক্তির উন্মেষ, অক্রিয়াতে নিমেষ; অর্থাৎ শক্তির চোখ মেলা আর চোখ বোজা যেন। কিন্তু প্রবৃত্তিতে যেমন শক্তির পরিচয়, তেমনি তার পরিচয় নিবৃত্তিতেও। ব্রহ্ম আকাশবৎ। সে-আকাশে কখনও আলো, কখনও-বা কালো। আলোতে প্রপঞ্চের উল্লাস, কালোতে তার উপশম। দুটিই শক্তির লীলা। এখন দেখছি, দুটি যেন পর্যায়ক্রমে ঘটছে। কিন্তু আসলে দুটি রয়েছে যুগপৎ। উপশমেরই উল্লাস, উল্লাসেরই উপশম। এই অখণ্ড ভাবনাই ব্রহ্মের সম্যক্ বিজ্ঞান।

উপশমের উপাসনায় মুক্তি। মুক্তি অপরিহার্য। মনে হয়, সে বুঝি প্রলয়। কিন্তু প্রলয় হলেও সে সৃষ্টির ভূমিকা। প্রলয় আর সৃষ্টি দুটিকেই গ্রহণ করতে হবে, উপশম আর উল্লাস দুটিকেই জীবনে অর্থাৎ নিত্যজাগ্রত অনুভবে রূপ দিতে হবে। গীতার সূত্র : 'যোগস্থ হয়ে কর্ম কর, সমত্বই যোগ।'

সমত্বে মুক্তির নিশানা। কিন্তু সে-মুক্তি শক্তিগর্ভ। তার আরেক নাম স্বাতন্ত্র্য। মুক্তের বন্ধন নাই, এটা হল প্রথম কথা। তার পরের কথা হল, বন্ধন নাই বলেই তিনি যা-খুশি-তাই করতে পারেন। শক্তির এই স্বচ্ছন্দ প্রয়োগের নাম হল স্বাতন্ত্র্য।

প্রকৃতির 'গুণ' আছে অর্থাৎ বাঁধবার দড়ি আছে। আমাকে সে বাঁধল যখন, তখন আমি গুণাধীন। প্রকৃতি তখন অপরা। গুণের বাঁধন ছিঁড়ে আমি গুণাতীত হলাম। তাও প্রকৃতিরই শক্তিতে। সে-প্রকৃতিকে বলি পরমা, অপরা প্রকৃতি তাঁরই একটা বিভূতি। গুণাধীন আর গুণাতীত—তারও পরে একটা অবস্থা আছে গুণাধীশের। যিনি গুণাতীত, তিনি গুণাধীশ হয়ে গুণ নিয়ে খেলা করেন। এই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। তার লক্ষ্য অপরা প্রকৃতির গুণের রূপান্তর।

পূর্ণযোগের সিদ্ধি রূপান্তরে। গুণ তখন 'দোষ ছিল গুণ হল বিদ্যার বিদ্যায়'।

অহং আমায় যতক্ষণ জড়িয়ে আছে, ততক্ষণ আমি গুণাধীন। আমি বস্তুত তখন যন্ত্র, কিন্তু নিজেকে মনে করি যন্ত্রী, অজ্ঞ হয়েও নিজেকে ভাবি বিজ্ঞ। আঘাত পেয়েই হ'ক কিংবা স্বভাবের প্রচোদনাতেই হ'ক, একসময় অহমিকার ঘোর কেটে যায়। দেখি প্রকৃতির খেলা চলছে বিশ্ব জুড়ে, আমি তাতে যোগ না দিতে পারি, পাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখে যেতেও পারি। খেলা গুণের খেলা, রাগ-দ্বেষ-মোহের খেলা। কিন্তু আমাকে তারা আর স্পর্শ করছে না। আমি অকর্তা, আমি উপদ্রষ্টা। তখন আর আমার অহং নাই, কিন্তু আত্মবোধ আছে। অহং গুণের অধীন, আর আত্মা গুণের অতীত।

গুণাতীতের ভূমিকায় পাকা হলে পর প্রকৃতির গুণলীলায় যোগ দেওয়াও যায়। দেওয়া সম্ভব হয়, প্রকৃতির পিছনে পুরুষের অধিষ্ঠানকে আবিষ্কার করি বলে। প্রথমে দেখেছিলাম বিরাট প্রকৃতি, আমি তার কুক্ষিগত, তাকে সামাল দিতে পারি না বলে দুঃখ পাই। দুঃখের হাত হতে এড়াবার জন্য তাই প্রকৃতি হতে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। তাইতে কিন্তু চোখ খুলে গেল, দেখলাম বিরাট প্রকৃতির পিছনে বিরাট পুরুষকে। প্রকৃতির পিছনে কাজ করছে তাঁরই সঙ্কল্প। সঙ্কল্পমাত্রেই অর্থযুক্ত। জগতের একটা অর্থ আছে, সুতরাং আমার জীবনেরও একটা অর্থ আছে। শাশ্বত কাল ধরে অর্থের বিধান করে চলেছেন সেই 'কবির্মনীষী' পুরুষ। তিনি প্রকৃতির অনুমন্তা এবং ভর্তা, তাঁর সায়ে তাঁর আশ্রয়েই প্রকৃতির কাজ চলছে। আমার জীবন তাঁর হাতের যন্ত্র। আমার হৃদয়ে স্থিত হয়ে আমাকে যেমন ভাবে নিয়োজিত করছেন তিনি, আমি তা-ই করে চলেছি।

এই বোধ হল অধ্যাত্মচেতার বোধ। সাধক তখন একদিকে যেমন অকর্তা, আরেকদিকে তেমনি আবার নিমিত্তকর্তা। অকর্মের পর নিমিত্তকর্ম—কর্মযোগের খুব উঁচু অবস্থা। কিন্তু তারও পরে আছে দিব্যকর্ম। ওটি হল অতিমানস ভূমির কর্ম।

নিমিত্তকর্মের অবস্থাতেও যন্ত্র আর যন্ত্রীর পৃথক বোধ থাকে, সুতরাং অহংএর সংস্কারও থাকে—যদিও সে-অহং শুদ্ধ অহং, একান্তভাবে তাঁর অহং। এ-অহং তাঁর দ্বারা আবিষ্ট। আবেশ যখন তীব্রতম হয়, তখন যন্ত্র আর যন্ত্রীর মাঝে সূক্ষ্ম ভেদটুকু ঘুচে যায় : তখন যন্ত্রীই যন্ত্র। তখন প্রকৃতি তাঁর সম্ভূতি, তিনিই সব হয়েছেন, তিনিই আমি হয়েছেন। এই সম্ভূতিতে প্রকাশ পাচ্ছে

তাঁর আত্মসম্ভোগের আনন্দ, তাঁর আত্মলীলায়নের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য। তিনি 'ভোক্তা মহেশ্বরঃ'। তাঁর ভোগ আর ঐশ্বর্যই পরমা প্রকৃতি, দেবী মায়া। তাইতে এই প্রপঞ্চের উল্লাস। এই তাঁর দিব্যকর্ম। তারই স্ফুরণ আমার কর্মে—যে-আমি তাঁর অংশ-বিভূতি এবং বিসৃষ্টি। আমার কর্ম তখন বিশ্বকর্মারই কর্ম।

অথচ আমি অকর্তা, কেননা তিনিও অকর্তা। সম্ভূতিতে তিনি বিশ্বাত্মক —তিনি সব হয়েছেন। আবার অসম্ভূতিতে তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ—সব হয়েও তিনি ফুরিয়ে যাননি। যেখানে তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ, সেখানে তিনি অকর্তা। তা-ই আমিও অকর্তা।

অকর্তা হয়েও তিনি বিশ্বকর্মা, আবার তিনি জীবভূত নিমিত্তকর্তা। শক্তির অবতরণের দিক থেকে এই তিনটি পর্ব। আমার দিক থেকে তা-ই আবার উত্তরণের তিনটি পর্ব—আমি নিমিত্তকর্তা, আমি বিশ্বকর্মা, আমি অকর্তা। উত্তরণের সঙ্গে অবতরণ জড়িয়ে আছে। এই বোধে তাঁর অনিঃশেষ আবেশে যে-দিব্যকর্ম, তাতেই কর্মযোগের পরমা সিদ্ধি।

*

তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ, তিনি বিশ্বাত্মক, তিনি জীবভূত। শেষ পর্বে তিনি আমি হয়েছেন। আমি স্ফুলিঙ্গ, কিন্তু বৈশ্বানরের স্ফুলিঙ্গ। এই স্ফুলিঙ্গ-চেতনায় বৈশ্বানরের মহিমাকে স্ফুরিত করাই আমার পুরুষার্থ। আমার জীবন আর কর্মের তা-ই লক্ষ্য।

সেই লক্ষ্যে পেঁছিতে গেলে ধরতে হবে চেতনার বিস্ফারণের পথ। অহংএর মধ্যে এখন আমি কুণ্ডলিত হয়ে আছি। এই কুণ্ডলনকে বিস্ফারিত করতে হবে, তার বিশ্বাত্মকতার অনুসরণে আমাকে ছড়িয়ে দিতে হবে সবার মধ্যে। আমার ভাবনা বেদনা কর্ম হবে সবার জন্যে। আবার সবাইকে ছাপিয়ে না গেলে সবার মধ্যে ছড়ানোটা সত্যকার সার্থকতায় পেঁছিয় না। তাই বিশ্বকে আমাকে আরও গভীর করে পাবার জন্য ঝাঁপ দিতে হয় বিশ্বোত্তীর্ণের অকূলে।

এদিক থেকে এই অকূলতাকে মনে করতে পারি শূন্য। কিন্তু ওখানে পেঁছিলে দেখি, ওই হল পূর্ণতার উৎস। যা বুদ্ধির অতীত, তা-ই রহস্য হয়ে অনুস্যূত হয়ে আছে বিশ্বের মধ্যে, জীবের মধ্যে। একদিকে এই রহস্য অপ্রকাশ, আরেকদিকে এক হিরণ্যচ্ছটায় স্বপ্রকাশ। বিশ্বোত্তীর্ণের হিরণ্যচ্ছটা হল

অতিমানস—যা মনের কাছে অব্যক্ত, অথচ মন যার অস্পষ্ট অভিব্যক্তি। বিশ্বোত্তীর্ণ তাঁর অতিমানস শক্তি নিয়ে পুরুষের মধ্যে গুহাহিত হয়ে আছেন অন্তর্যামী পুরুষোত্তম হয়ে। তাঁরই প্রচোদনায় তাঁর আড়াল ঘোচানো হয় আমাদের জীবনের একমাত্র তপস্যা।

পুরুষোত্তমকে যতক্ষণ না হৃদয়ে পাই, ততক্ষণ চেতনার বিস্ফারণের পথে চলেও বোধের সকল দ্বন্দ্ব ঘোচে না। দ্বন্দ্ব দুতরফা। এক, বিশ্বোত্তীর্ণের সঙ্গে বিশ্বাত্মকের দ্বন্দ্ব—যিনি সব-কিছুর অতীত, তিনিই আবার সব-কিছু হলেন কি করে; আরেক, আমার সঙ্গে সংসারের দ্বন্দ্ব—আমার মুক্তি না হয় হল, কিন্তু সারা সংসারের বন্ধন তো তাতে কাটল না।

এই দ্বন্দ্ববোধের মূলে যে দার্শনিক প্রত্যয় রয়েছে, তার চেহারা এই : ব্রহ্ম বিশ্বোত্তীর্ণ, বিশ্ব মায়া; পুরুষ গুণাতীত, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, কৈবল্যে প্রতিষ্ঠাই পুরুষের লক্ষ্য। অখণ্ড সত্তাকে এতে দ্বিখণ্ডিত করা হয়, আর তাদের জোড় মেলানো যায় না।

কিন্তু পুরুষোত্তমের প্রত্যয় অবিভক্ত। তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্বাত্মক এবং সবিগ্রহ। তিনি সন্মাত্র চিন্ময় এবং আনন্দঘন। তিনি ঈশ্বর আর শক্তির যুগনদ্ধতা। বিশ্বের রূপে-রূপে তিনি প্রতিরূপ। আমার মধ্যে তিনি সত্তার শান্তি, চৈতন্যের আলো, আনন্দের শিহরন, শক্তির উল্লাস। আমি তাঁর পরা প্রকৃতি।

গীতায় তিনি বলছেন, 'আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম, তাই আমি পুরুষোত্তম।' এইখানে সর্বভূতের মধ্যে তাঁর ক্ষরলীলা, আর ওইখানে লোকোত্তরে পরমব্রহ্মরূপে তাঁর অক্ষরমহিমা। এখান থেকে ওখানে উজিয়ে যেতে-যেতে এই বোধ হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে দ্বৈতের ছোঁয়াচ থাকে: ক্ষরের অতীতে অক্ষর, সুতরাং ক্ষর মায়া আর অক্ষরই সত্য। অথচ ভাটার পথে দেখি, অক্ষর হতে ক্ষর উপচে পড়ছেন। অক্ষর শূন্য নন, আনন্দ ও শক্তিতে হিরণ্যগর্ভ। অক্ষরের মহিমাকে যখন ক্ষরের মধ্যে পাই, তখন তাঁকে পাই পুরুষোত্তমরূপে। দেখি, অরূপ রূপ ধরেছেন, নেমে এসেছেন, অবতার হয়েছেন। তিনি শুধু ওইখানে নন, এইখানেও। শুধু চিন্ময় নন, চিন্ময়-মৃন্ময় —তাঁর ছোঁয়াতে এই পৃথিবী হল হিরণ্যবক্ষা অদিতি। তাঁর অসীম শূন্যতায় শুধু হারিয়ে যাই না, এই হৃদয়-আকাশে সসীম পূর্ণতায় ফোটে তাঁর আলোর কমল—তিনি আমার প্রভু সখা বঁধু গুরু পিতা মাতা। সম্বন্ধে তখন আর

বন্ধনের বেদনা থাকে না, থাকে বুক ভরে পাওয়ার নিবিড় মাধুরী। অসীম-সসীমে দ্বন্দ্ব তখন ঘুচে যায়।

এমনি করে অসীমকে প্রথম পাই একান্তভাবে আমার করে। আমার আর জগতের মাঝে তখনও একটা ফাঁক থেকে যায়। কিন্তু পাওয়ার নিবিড়তায় চেতনার বিস্ফারণ ঘটে যখন, তখন দেখি তিনি আমার, তিনি সবার, সবাই আমার, আমিও সবার। হৃদয়ের সকল গ্রন্থি তখন আলগা হয়ে যায়—তাঁকে পাই যেমন এই রূপে, তেমনি ওই অরূপে, আবার এই রূপে-রূপে। সে-পাওয়া শুধু আমার তাঁকে পাওয়াই নয়, আমার মধ্যে বিশ্বের মধ্যে তাঁরই নিজেকে অপরূপ করে পাওয়া। এই পাওয়া তাঁর শক্তির সত্য, দিব্যকর্ম। আমার জীবনে বিশ্বের জীবনে তারই সমূর্ধ্ববেগ উচ্ছলন্।

*

তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ, তিনি বিশ্বাত্মক, তিনি সর্বিগ্রহ। একেরই তিনটি বিভাব—তিনে এক, একে তিন। কিন্তু অধ্যাত্মচেতনার উত্তুঙ্গতায় পোঁছেও মনের মায়ায় আমরা তিনের মাঝে ভেদ করি। তিনের একটিকে একান্ত করে সাধনার পথে চলতে শুরু করি সংস্কার বা সামর্থ্য অনুসারে, আর দুটিকে বুঝেও বুঝতে চাই না। সব বিভাবেই তিনি অনন্ত। অনন্তকে পেয়ে সান্তের চরিতার্থতা ঘটে। কিন্তু সিদ্ধিতে হয়তো একদেশিতা থেকে যায়, তাঁকে 'সর্বভাবেন' পাওয়া হয়ে ওঠে না।

পূর্ণযোগী চান তাঁকে সবার অবিরোধে সবরকমে পেতে। প্রথমে চাই চেতনার মুক্তি, অহংকে ছাপিয়ে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি। বিশুদ্ধ আত্মবোধ প্রথমটায় জাগে সত্তার গভীরে কৈবল্যের বিন্দুঘন প্রত্যয়রূপে। তারপর ঘটে চেতনার ব্যাপ্তি, বিন্দু বিস্ফারিত হয় আকাশের আনন্ত্যে, বিজ্ঞানের আনন্ত্যে। উপনিষদের ভাষায় জ্ঞান-আত্মা আরও গভীর হন মহান্-আত্মার ব্যাপ্তিতে। তারও পরে মাধ্যন্দিন সূর্যের আভাস্বর মহিমা সমস্ত সংজ্ঞার অতীত এক অকিঞ্চন শূন্যতায় শান্ত হয়ে যায়, মহান্ আত্মা আরও গভীর হন শান্ত-আত্মাতে।

এসব অনুভব পৃথিবীর উজানে, দ্যুলোকের পরম উত্তুঙ্গতায়। কিন্তু পৃথিবীও তো আছে। যেমন আছে উজিয়ে-যাওয়া, তেমনি আছে ভাটিয়ে-আসা।

যদি ভাবি উজিয়ে-যাওয়া মুক্তি আর ভাটিয়ে-আসা বন্ধন, এখানে এলে যে আবার সেই পৃথিবীর ডামাডোলে জড়িয়ে পড়ব—তাহলে সে হবে মনের মায়া। নেমে-আসাটা বন্ধনের সম্ভাবনা না হয়ে ঐশ্বর্যের উল্লাসও হতে পারে। বিশ্বোত্তীর্ণে আর বিশ্বে তো কোনও বিরোধ নাই। বিসৃষ্টির উল্লাসে তিনি যে এমনি করেই নেমে এসেছেন—চিৎশক্তিকে পর্বে-পর্বে নিগৃহিত করে শেষপর্যন্ত হয়েছেন জড়। কিন্তু তাঁর শক্তির উল্লাস এইখানে এসে থেমে যায়নি, জড়ের অন্ধতমিস্রা হতে আবার চলেছে তাঁর চিন্ময়-পরিণামের অভিযান। সাধনার গোড়াতে আমরা এই উজানপথই ধরেছিলাম। উজান আর ভাটা দুই-ই তাঁর চিৎশক্তির উল্লাস। একটা বিদ্যার খেলা, আরেকটা অবিদ্যার খেলা—এ আমাদের মানস বুদ্ধির বিচার। তত্ত্বত দুই-ই বিদ্যার খেলা।

যেমন বিদ্যায় উজিয়ে যাওয়া, তেমনি বিদ্যায় আবার ভাটিয়ে আসা অর্থাৎ সমাধির প্রত্যয় নিয়েই ব্যুত্থান, সমাধি থেকে ব্যুত্থানে ছিটকে পড়া নয়। এ তো অসম্ভব বলতে পারি না। ভাটিয়ে-আসা তখন অশক্তির ব্যাপার নয়, সার্থক শক্তিযোগের ব্যাপার। ওখানকার আলো আনন্দ আর শক্তিকে তখন এখানে নামিয়ে আনি, মানসোত্তর শক্তি দিয়ে ঘটাই মন প্রাণ আর দেহের রূপান্তর।

*

দীর্ঘ পথ। কিন্তু এ-পথে আমি একা নই। তিনি আমার নিত্যসহচর। পথ চলা শুরু করিনি যখন, তখনও তিনি আমায় জড়িয়ে বসে ছিলেন চলার অপেক্ষায়। আমার মধ্যে অবচেতনা হতে চেতনার উন্মেষ, সে তো তাঁরই উন্মেষ। দেখছি, আভাসে তাঁকে পাওয়া ধীরে-ধীরে প্রভাস হয়ে উঠছে। আমার জড়ে তিনিই স্তব্ধ হয়ে ছিলেন, আমার প্রাণবাসনায় তিনি উত্তাল হয়ে উঠলেন, আমার মনের কল্পনায় তিনি ফুটলেন দিব্যভাবনার বিচিত্র রূপায়ণে। রূপের গভীরে তাঁকে আবিষ্কার করলাম ভাবরূপে—দেখলাম তিনি জ্ঞান, তিনি প্রেম, তিনি কল্যাণ, তিনি আনন্দ। তাঁর ছোঁয়ায় মিথ্যার বাঁধন ছেঁড়বার তীব্র অভীপ্সা জাগল হৃদয়ে, ঝাঁপ দিলাম তাঁর অগম রহস্যের মধ্যে—তখনও তিনি আমার সাথী। রহস্যসমুদ্র মন্থন করে পেলাম তাঁকে সর্বেশ্বররূপে—তিনি আমার অন্তরে, আমার বাইরে, তাঁর অসীম প্রজ্ঞান আনন্দ আর শক্তির প্লাবনে আমি প্লাবিত। আরও গভীর করে বিচিত্র সম্বন্ধের মাধুরীতে তাঁকে পেলাম প্রভু পিতা মাতা সখা বঁধুরূপে।

বিচিত্র রূপে বিচিত্র ভাবে তাঁকে পাওয়া। কোনটাই তো মিথ্যা নয় বা কল্পছবি নয়। যে-রূপেই তাঁকে পাই না কেন, তাঁর একাগ্রভাবনায় চেতনা যখন গভীর হয়, তখন অসীমের ব্যঞ্জনা ঠিকরে পড়ে অরূপের গহন হতে। অবশেষে অতিমানসের উপান্তে এসে সব ভাব সান্দ্র হয় এক চিদ্‌ঘনবিগ্রহের অনির্বচনীয়তায়। অরূপ স্বরূপ আর পুরুরূপ—সব এক হয়ে যায়।

এইটুকু বুঝতে হবে, অরূপের এই-যে বিচিত্র রূপায়ণ, এর কিছুই মিথ্যা নয়। অরূপ অশক্ত নন; রূপায়ণ তাঁর শক্তির উল্লাস। আত্মশক্তিতে তিনি গুটিপোকার মত হিরণ্যসূত্রের জালে নিজেকে জড়ান, আবার আত্মশক্তিতে সে-জাল কেটে বেরিয়ে পড়েন প্রজাপতির রঙিন পাখা মেলে। এই আবরণ আর উন্মোচনের প্রত্যেকটি পর্ব তাঁর সত্তায় সত্য, তাঁর প্রজ্ঞায় ভাস্বর, তাঁর আনন্দে নন্দিত, তাঁর শক্তিতে আকুণ্ঠ। যখন সর্বাত্মভাবের গভীরে নিমজ্‌জিত হই, তখন এ-অনুভব করামলকের মত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। বিশ্বলীলা আর জীবলীলাকে তখন আর মায়ার খেলা বলে মনে হয় না। দেখি, তাঁর সত্যে জীব সত্য, বিশ্বও সত্য। তিনি জীবের অন্তর্যামী—আত্মচৈতন্যের স্ফুলিঙ্গ-রূপে। নিজেকে বিস্ফারিত করার তপস্যায় তিনি অতন্দ্র। এই তাঁর দিব্যকর্ম। বিশ্ব সেই কর্মের ক্ষেত্র আমাদের জীবন তার আধার। তাঁর সাধনাই আমাদের সাধনা, তাঁর কর্মই আমাদের কর্ম। অন্তর্যামিরূপে তিনিই আমাদের কর্মাধ্যক্ষ, জীবনের নিয়ন্তা।

১২

দিব্য কর্ম

এখন একটা প্রশ্নের জবাব বাকী। দেখলাম, যোগের পথে চলতে গে
সমত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, অহংকে নির্মূল করতে হবে, আধারের সব-ক্রি
উৎসর্গ করতে হবে অন্তর্যামীকে। তাঁর মধ্যে থেকে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে তাঁ
প্রশাসনে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত হতে দিতে হবে। এগুলি হল যোগস্থ হও
শর্ত। এখন প্রশ্ন হবে, কর্মযোগীকেও যদি এমনি করে যোগস্থ হতে হ
তার পরেও কি তার করণীয় কিছু থাকে?

*

এদেশের সাধকসমাজে একটা ধারণা আছে, যোগসিদ্ধির পরিণাম হল প্র
(quiescence)। 'মুক্তিই মানুষের পরম-পুরুষার্থ, মুক্তের কর্মক্ষয় হওয়া
ফলে তাঁর আর করণীয় কিছুই থাকে না। কর্মক্ষয় হলে দেহও থাকে ন
'একুশদিন পরে জীর্ণপত্রের মত দেহটা খসে পড়ে'। যদি-বা দেহ থাকে, থা
শুধু প্রারব্ধক্ষয়ের জন্য। প্রারব্ধকর্ম ক্ষয় হয়ে গেলে তাঁর সংসারের নির্বা
হয়, আর তাঁকে এখানে ফিরে আসতে হয় না।

এসব ধারণার মূলে রয়েছে এই সংস্কার : সব কর্মই অবিদ্যার কর্ম, বিদ্যা
কর্ম বলে কিছুই নাই। মানুষ কর্ম করে অবশ হয়ে প্রবৃত্তির চঞ্চলতায় বাসনা
প্ররোচনায়। মুক্তের যখন বাসনা নাই, তখন তিনি কর্ম করবেন কিসের গরজে

কিন্তু কথাটা একপেশে। যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ কর্ম আছেই
মানুষের বাসনাকে আশ্রয় করেই যে কেবল কর্ম হয়, তা নয়। আসলে মহ
প্রকৃতির পরিস্পন্দনই হল কর্ম। তা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর ক
না, বরং আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাই তার উপর নির্ভর করে। যদি বল, ও
প্রকৃতিস্পন্দের মূলেও তো বাসনা আছে; তাহলে বলব, সে-বাসনা জগতে
মূলীভূত নিত্যবাসনা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ছন্দে তার নিত্য বিকাশ, ত
পুরুষের স্বরূপশক্তিরই উল্লাস। আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা যদি সেই ভুবনেশ্বরী ইচ্ছা
সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে কর্মে আর বন্ধন থাকে না।' গাছে ফুল ফোট

মত কর্ম তখন হয় অন্তর্গূঢ় চেতনার রসোদ্গার। সে-কর্ম তাঁর কর্ম, অতএব বিদ্যার কর্ম—বিশ্বে তাঁর দিব্যসঙ্কল্পকে ফুটিয়ে তোলবার সাধন।

অবশ্য চেতনার অন্তর্মুখীনতা এবং প্রসারের ফলে চিত্তের রাজসিক ক্ষোভ যখন দূর হয়ে যায়, তখন এমন বোধ হয়, সবই তাঁর ইচ্ছায় হচ্ছে সুতরাং সাধকের যেন করবার আর-কিছুই নাই। শাস্ত্রে একেই বলা হয়েছে কর্মক্ষয়ের অবস্থা। এ-অবস্থায় অহং নাই, তাই বাসনার প্ররোচনাও নাই। কিন্তু তাবলে শক্তির ক্রিয়াও যে নাই, তা নয়। নির্বাণের উপান্তে আসীন বুদ্ধচেতনা হতে শান্তির তরঙ্গ বিশ্বভুবনে ছড়িয়ে পড়ছে—এও তো কর্ম। আসলে যোগসিদ্ধির ফলে শক্তির ক্রিয়া দূর হয় না, দূর হয় চেতনার সঙ্কোচ। চৈতন্য আর শক্তি অবিনাভূত (inseparable)। চৈতন্য যখন স্পন্দিত তখন বলি শক্তির প্রবৃত্তি, চৈতন্য যখন নিস্পন্দ তখন বলি শক্তির নিবৃত্তি। কিন্তু নিবৃত্তিও শক্তিগর্ভ। আমি নিশ্চুপ, নিশ্চিন্ত, আত্মসমাহিত; কিন্তু এই সমাধির জন্য যেমন শক্তির দরকার, তেমনি তাকে ধরে রাখবার জন্যও শক্তি চাই। প্রথম-প্রথম সমাধি আর ব্যুত্থান আসে পর্যায়ক্রমে। তারপর সমাধির মধ্যেই ব্যুত্থান হয়, নৈস্পন্দ্যের মধ্যে জাগে চিৎস্পন্দ। শক্তির মধ্যে তখন যুগপৎ চিদ্‌বৃত্তি আর প্রবৃত্তির খেলা। এইটি বোঝাতে গিয়ে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন : 'তিনলোকে আমার কর্তব্য কিছুই নাই; তবুও দেখ, আমি কর্ম নিয়েই আছি।' কর্মযোগীরও এই অবস্থা হতে পারে। তাঁর সঙ্কল্প কর্মাধ্যক্ষের দিব্যসঙ্কল্পেরই পরিণাম—এই বোধে একদিক দিয়ে তিনি যেমন কর্মের সাক্ষী, আরেকদিক দিয়ে তেমনি নিমিত্তকর্তা মাত্র। তাঁর কর্মে হয় তখন সেবার আনন্দ নয়তো সৃষ্টির উল্লাস। দুয়েরই যা প্রয়োজক, তা বাসনা নয়—প্রেরণা বা প্রচোদনা। কর্মের মূলে বাসনার প্ররোচনা থাকতে পারে প্রাকৃতভূমিতে, যোগভূমিতে নয়। প্রাকৃতভূমিতেও কি মানুষ সব কাজ খুশিমত করতে পারে? অধিকাংশ কাজই তো সে করে অজ্ঞানে বা অনিচ্ছায়। বাসনা কর্মের মধ্যে বেগ সঞ্চার করে যেমন, প্রেরণাও তা-ই করে। অধিকন্তু বাসনার মূলে থাকে অবিদ্যা, আর প্রেরণার মূলে বিদ্যা। বিশ্বের বিসৃষ্টির মূলেও অবিদ্যা নয়, বিদ্যাই। যোগস্থের কর্ম তাই বিদ্যারই কর্ম।

*

আমাদের মধ্যে আরেকটা ধারণা আছে, যোগসিদ্ধির পর যোগীকে যখন শুধু প্রারব্ধক্ষয়ের জন্য দেহে থাকতে হয়, তখন আর তাঁর নতুন করে কোনও

কর্মের পত্তন করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কর্ম মানেই তো বন্ধন। জা
থেকে বেরিয়ে এসে আবার জালে জড়ানো কেন?

যোগী কর্ম করেন নিত্যযুক্ত থেকে। কর্মাধ্যক্ষের সত্যসংকল্পকে নিজে
স্বভাবের অনুকূলে জীবনে বা জগতে রূপ দেওয়াই তাঁর কর্ম। কি যে তাঁ
প্রারব্ধ, তা বাইরে থেকে কেউ বলে দিতে পারে না। তাঁর সত্যকার প্রার
হল অন্তর্যামীর প্রেরণা। সে-প্রারব্ধের বেগ যদি আত্মমুক্তি পর্যন্ত নিঃশেষি
হয়ে যায়, তাহলে তো চুকেই গেল। কিন্তু তার পরেও যদি কর্মাধ্যক্ষ তাঁ
জগৎ-হিতের চাপরাস দিয়ে দেন, তাহলে তাঁর প্রারব্ধের চেহারাও বদলে যায়
এখানে অহংশূন্য হয়ে দেখতে হবে, কাকে কতটুকু অধিকার তিনি দিয়েছে
অনেককেই তিনি ছেড়ে দেন, কিন্তু আধিকারিক পুরুষকে ছাড়েন না
তাঁদের সাধনা 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ', তাঁরা জগতে থাকে
'বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ'। আমটি খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলবার উপা
তাঁদের থাকে না। তাঁদের প্রারব্ধ জড়িয়ে থাকে বিশ্বের প্রারব্ধের সঙ্গে।

*

আমাদের অনেকের কাছেই মুক্তির অর্থ হল অনাবৃত্তি—আর যেন জন্ম
নিতে না হয়, সংসারে ফিরে আসতে না হয়। 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য
কোনখানে।' ওপারে স্বর্গ বা ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠ বা নির্বাণ—যার যেমন ধারণা
আসল লক্ষ্য হল, এখানকার ঝামেলা হতে ছুটি নেওয়া। সংসার যেমন চলছে
চলুক, আমি শুধু তাথেকে মুক্তি চাই। মুক্তি লোকোত্তরে।

লোকোত্তরবাদীদের মুক্তির ভাবনাকে প্রাকৃতচেতনার সঙ্গে মিলিয়ে তা
স্বরূপ বোঝবার চেষ্টা করতে পারি। প্রাকৃতচেতনার তিনটি স্তর—জাগ্রৎ স্বপ্ন
আর সুষুপ্তি। জাগ্রতে আর স্বপ্নে চেতনার বিষয় থাকে, সুষুপ্তিতে চেত
নির্বিষয়। জাগ্রতের বিষয়ভোগ দুঃখমিশ্রিত, স্বপ্নে তা পরিশুদ্ধ হতে পারে
যেমন কল্পনাতেও হয়। সুষুপ্তি নির্বিষয়, সুতরাং সেখানে দুঃখ নাই
জাগ্রতের দুঃখ এড়াতে আমরা যেতে পারি স্বপ্নে অথবা সুষুপ্তিতে। লোকোত্ত
স্বর্গ (ব্যাপক অর্থে, প্রাচীন পরিভাষা হল 'সুবর্গ') অথবা নির্বাণের (বা
সামান্যত 'অপবর্গের') আকাঙ্ক্ষাও এরই অনুরূপ। একটি দিব্য স্বপ্ন, আরেক
দিব্য সুষুপ্তি—বৈদিক ঋষিদের ভাবনায় দ্যুলোক আর পরমব্যোম। দু

চেতনার দিব্যভূমি সন্দেহ নাই। কিন্তু হিসাব থেকে বাদ পড়ল জাগ্রৎ বা পৃথিবী—যেন এরা কখনও দিব্য হতে পারে না।

এমনতর লোকোত্তর মোক্ষভাবনার ন্যূনতাগুলি স্পষ্টই চোখে পড়ে। প্রথমত, এ-ভাবনায় ব্রহ্মের অখণ্ড স্বরূপের স্বীকৃতি নাই। ব্রহ্ম লোকোত্তর হয়েও যে লোকাত্মক, একথা জোরের সঙ্গে এখানে বলা হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, এ-সাধনায় বীর্যের প্রকাশও অপূর্ণ। সাধকের মধ্যে উজিয়ে যাবার বীর্য আছে, কিন্তু ভাটিয়ে আসবার সাহস নাই। তৃতীয়ত, এখানেও সাধনা অহংএর সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত নয়। জগতের দিকে পিছন ফিরে আমি খুঁজছি শুধু আমার মুক্তিটুকু। এটা হীনযানীর পথ, মহাযানীর পথ নয়।

অমিতাভ বুদ্ধ নির্বাণের উপান্তে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি নির্বাণ চাই না, জন্মনিরোধ চাই না, সবার মধ্যে আমি অনুপ্রবিষ্ট থাকতে চাই তাদের দুঃখকে দূর করতে।' বিবেকানন্দ বললেন, 'আমি মুক্তি চাই না, দুঃখ সইতে বার-বার আমি পৃথিবীতে আসব আর তাঁরই উপাসনা করব যিনি জীবঘন—দেবতা হতে কীট পর্যন্ত সবই হয়েছেন, অতীত-ভবিষ্যৎ জীবন-মৃত্যু আসা-যাওয়া সব যাঁর মধ্যে একাকার।'

এই হল মুক্তির সত্যকার রূপ। শুধু এপার হতে ওপারে যাওয়াই মুক্তি নয়, মুক্তি হল তাঁর মধ্যে মিশে গিয়ে সবার সঙ্গে এক হওয়া—এক হওয়া তাঁর অখণ্ড সত্তার চেতনায় আনন্দে এবং তাঁর শক্তিতেও। সে-শক্তি আমাকে যেমন মুক্ত করেছে, তেমনি জগৎকেও মুক্ত করছে। আর এই মুক্তির সাধনাতে চিন্ময় ঐশ্বর্যেরও বিকাশ ঘটাচ্ছে। আমাকেও তাঁর এই বিশ্বজনীন সাধনায় যোগ দিতে হবে, তাঁর বিশ্বযজ্ঞের ঋত্বিক হতে হবে। সুতরাং মুক্তিতেও বিশ্বকর্মার বিশ্বকর্মযোগ হতে বিযুক্ত হতে তো আমি পারব না।

*

যোগীর দিব্যকর্ম কোনও মানসিক বা লৌকিক অনুশাসন মেনে চলে না। যোগীর চেতনা অনন্তের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, সুতরাং তাঁর কর্মের প্রেরণাও আসে অনন্তের চিৎশক্তির নিত্যবিচ্ছুরণ হতে। বিশ্বকর্মার পুরাণী প্রজ্ঞার অনুশাসনই তাঁর কর্মে এবং আচারে রূপ ধরে। গীতা বলেন, 'যে-ভাবেই থাকুন না কেন, সে-যোগী আমাতেই থাকেন।' সুতরাং তাঁর ক্রিয়া-মুদ্রার রহস্য 'বিজ্ঞে না বুঝয়'। তিনি ঘর ছাড়বেন না ঘরে থাকবেন, গুহাহিত হবেন না কর্মে ঝাঁপিয়ে

পড়বেন, বুদ্ধ খ্রীষ্ট শঙ্করের মত জগদ্‌গুরু হবেন না জনকের মত রাজ্য করবেন কি শ্রীকৃষ্ণের মত কুরুক্ষেত্রের নায়ক হবেন, সনাতনী হবেন না বিপ্লবী হবেন, কি খাবেন, কি পরবেন, কেমন করে চলবেন বা বলবেন—এসবের কিছুতেই কিছু আসে যায় না। তাঁর আচরণ মানুষের বিচারের ঊর্ধ্বে। অন্তর্যামীর প্রশাসনই তাঁর জীবনে একমাত্র সত্য।

তাঁর কর্ম বাইরের কোনও শাসন মানে না, কিন্তু অন্তরের একটি শাসন মেনে চলে সবসময় : নিজের স্বার্থের জন্য তিনি কিছুই করেন না। গীতার ভাষায় বলতে গেলে তাঁর কর্ম 'লোকসংগ্রহের জন্য' অর্থাৎ বিশ্বের শাশ্বত মৌল বিধানকে অব্যাহত রাখবার জন্য। সে-বিধান হল জড় হতে চেতনার ক্রমিক স্ফুরণ। যজ্ঞেশ্বরের বিশ্বযজ্ঞের এই হল স্বরূপ—তিনি মৃন্ময়কে চিন্ময় করে তুলছেন। কর্মযোগীও তাঁর এই যজ্ঞের ঋত্বিক। তিনি যা-কিছু ভাবেন বলেন বা করেন, তার মূলে অজপার ছন্দে এই একটি প্রবর্তনাই নিঃশ্বসিত হয়ে চলেছে : 'সবার চৈতন্য হ'ক।' তাঁর দেবতাও বলেন, 'ত্রিলোকে আমার করবার বা পাবার কিছুই নাই, তবুও আমি কাজ নিয়েই আছি।' সে-কাজ মৃন্ময়কে চিন্ময় করে তোলা। কর্মযোগীরও এই কাজ।

কিভাবে তিনি একাজ করবেন, তার কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম থাকতে পারে না। আগেই বলেছি, নিমিত্তকর্ম বা দিব্যকর্ম বাইরের কোনও অনুশাসন মেনে চলে না—এমন-কি তথাকথিত ধর্মের অনুশাসনও নয়। মুক্তের কর্ম ধর্মাধর্মের বন্ধন হতেও মুক্ত। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারেন : 'জানি ধর্ম কি, কিন্তু তাতে প্রবৃত্তি আমার নয়; জানি অধর্ম কি, কিন্তু তাহ'তে নিবৃত্তি আমার নয়: হৃষীকেশ, তুমি হৃদয়ে আছ; আমাকে যেমন তুমি নিয়োজিত করছ, আমি তেমনি করছি।' অবশ্য কর্মযোগের প্রথম অবস্থায় যতক্ষণ সাধক গুণের অধীন, ততক্ষণ তাঁর পক্ষে ধর্মের শাসন মেনে চলা প্রয়োজন হতে পারে। লৌকিক ধর্মানুশাসনের মূলে আছে সত্ত্বগুণের প্রেরণা। কিন্তু তা শুদ্ধসত্ত্ব নয়, তার মধ্যে রজোগুণ আর তমোগুণের ভেজাল আছে। তাইতে স্থান-কাল-পাত্রভেদে ধর্মের রূপ বদলায়, ধর্ম মূঢ় গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে। কিন্তু যোগী যে-ধর্মকে অনুসরণ করেন, তার প্রতিষ্ঠা গুণাতীতে, তার স্ফুরণ শুদ্ধসত্ত্বে। সে-ধর্মকে অন্তরে ছাড়া বাইরে পাওয়া যায় না। সে-ধর্মও বিচিত্র হতে পারে, কিন্তু তার মূল শাশ্বত, প্রজ্ঞার স্থিরদীপ্তিতে তা আলোকিত।

*

গীতা তাইতে বলছেন, 'স্বভাব বা স্বধর্মের অনুসরণে কর্ম কর।' এই স্বভাব বস্তুত শুদ্ধসত্ত্বময় আত্মভাব, প্রাকৃত দেহ-মনের গুণতন্ত্রিত ভাবনা নয়। আমাদের প্রকৃতির দুটি বিভাবের কথা আগেও বলেছি—একটি পরা, আরেকটি অপরা। অপরা-প্রকৃতি দ্বন্দ্বসংকুল, তার আশ্রয় হল অহং। আর পরা-প্রকৃতি নির্দ্বন্দ্ব, তার আশ্রয় আত্মা বা পরমপুরুষ। পরা-প্রকৃতিতেও বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু তাতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় না। এই পরা-প্রকৃতি আমাদের স্ব-ভাব বা স্ব-ধর্ম—আমাদের চৈত্যসত্তার ধর্ম। অন্তর্মুখ হয়ে এই চৈত্যসত্তাকে আবিষ্কার না করা পর্যন্ত স্বভাবানুযায়ী কর্ম করা সম্ভব হয় না। চৈত্যসত্তা অন্তর্যামীর প্রতিভূ, তাঁরই 'অংশঃ সনাতনঃ', অতএব সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত। যে তাঁর শরণাগত, কোনও লৌকিক অনুশাসন্ বা অহংএর কোনও প্ররোচনা তার শরণ হতে পারে না। গীতাতে তাই জীবনের কুরুক্ষেত্রে ধর্মসম্মূঢ়চেতা কর্মযোগীকে ভগবান বলছেন, 'তুমি সব ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণ নাও।' এই শরণাগতিই কর্মযোগীর পরম অবস্থা।

শরণাগতির ফল সাযুজ্য। তাঁকে সব দিয়ে তাঁর হলাম। তখন আমার সব কর্ম তাঁরই কর্ম। একদিকে আমি অকর্তা, আমি আকাশবৎ শূন্য। এইখানে তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ সত্তার সঙ্গে আমার সাযুজ্য। আবার আমি আকাশবৎ হয়েও তাঁরই প্রাণে স্পন্দিত। এই প্রাণস্পন্দনই তাঁর কর্ম, আমার মধ্যে তাঁর কর্ম। তা-ই আমারও কর্ম। এই কর্মের কেন্দ্রে অহং নাই, কিন্তু বিশুদ্ধ ব্যক্তিসত্তা আছে—তাঁর চিৎস্ফুলিঙ্গরূপে। সে তাঁর নিমিত্তমাত্র। এই নিমিত্তপুরুষই চৈত্যপুরুষ—যিনি বিশ্বোত্তীর্ণ এবং বিশ্বাত্মক পরমপুরুষের সাযুজ্যভোগী এবং বিশ্বে তাঁর দিব্যসঙ্কল্পের বাহন।

জ্ঞান ভক্তি আর কর্ম—দিব্যকর্মযোগীর জীবন যোগের এই ত্রিধারার সঙ্গমতীর্থ। সব-কিছু করেও তিনি কিছুই করছেন না। অথবা কিছু করবার না থাকলেও তিনি সব-কিছুই করছেন—এই অকর্তৃত্বের সিদ্ধিতে তাঁর সংবিৎসিদ্ধি। এই হল জ্ঞানীর কর্ম। আবার যা-কিছু তিনি করছেন, তা তাঁর হয়ে করছেন পরম আনন্দে সন্তর্পণ মমতায় তাঁরই প্রীত্যর্থে—এই তাঁর প্রেমসেবোত্তরা গতির সিদ্ধি। এই হল ভক্তের কর্ম। এমনিতর দিব্যভাবনায় আবিষ্ট হয়ে যিনি কর্ম করেন, তাঁর মধ্যে অনিরুদ্ধ ধারায় নেমে আসে মহাশক্তির সংবেগ। তাঁর জীবন হয় মুক্তি ভক্তি আর শক্তির ত্রিবেণী।

১৩

অতিমানস ও কর্মযোগ

পূর্ণযোগের লক্ষ্য হল দেহ প্রাণ মন ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প সব-কিছুকে আনন্দ-চিন্ময় করে তোলা—এককথায় আধারের সর্বাঙ্গীণ দিব্যরূপান্তর ঘটানো। কাজটি সহজসাধ্য নয়, অধিকার এবং সামর্থ্যও সবার সমান নয়। সংস্কার এবং রুচি অনুযায়ী সাধনার বেলায় কেউ হয়তো জোর দেবে ভাবনার উপর, কেউ বেদনার (feeling) উপর, কেউ-বা সঙ্কল্পের উপর। কর্মযোগ যার স্বভাবের অনুকূল সাধন, সে ধরে সঙ্কল্পের পথ। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে মিলিয়ে দিয়ে জাগ্রতের প্রতিমুহূর্তে তাঁর আবেশকে হৃদয়ে বহন ক'রে অহন্তার কুণ্ডলিত চেতনাকে সে ক্রমে বিস্ফারিত করে চলে আনন্ত্যের মধ্যে। কিন্তু যে যে-পথ ধরেই চলুক না কেন, পূর্ণযোগের সাধক হতে হলে তাকে ভাবনা বেদনা ও সঙ্কল্পের অভঙ্গ-সমাহরণ (integration) ঘটিয়ে আধারকে সহস্রদল সুষমায় বিকশিত করতে হবে। অতিমানসের ভূমিতে না পোঁছলে এটি সম্ভব নয়।

অতিমানস হল ঋত-চিৎ (Truth-Consciousness), সেখানে অনৃতের ছায়াটুকুও নাই। পূর্ণপ্রজ্ঞার সঙ্গে মহাশক্তি সেখানে যুগনদ্ধ, সিন্ধুর প্রতি বিন্দুতে সেখানে অখণ্ড আনন্ত্যের আনন্দ-কল্লোল। মহিমা সেখানে ঘনীভূত হয় বীজভাবে—এই তার সীমার রহস্য; তাইতে প্রজ্ঞা বা শক্তি সেখানে কোন-মতেই কুণ্ঠিত হয় না। এই অতিমানসে উত্তরণ এবং আধারের অণুতে-অণুতে তার চিৎশক্তির অবতারণ—এই হল পূর্ণযোগের সাধ্যাবধি।

কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে, অতিমানসের জন্য আমরা অতি-মানসকে চাইছি না; অতিমানস যাঁর স্বরূপশক্তি, চাইছি সেই পুরুষোত্তমকে। তাঁকে পাওয়ার জন্যই অতিমানসের সাধনা, শক্তিকে ধরে শক্তিমানে পোঁছনো। প্রত্যেক শক্তির বিভূতি আছে, অতিমানসেরও আছে। যদি মনে করি, অতিমানস আমায় পোঁছে দেবে অতিমানবতায়, তাহলে কিন্তু লক্ষ্য ভুল হয়ে যাবে। বিভূতি যোগের চরম লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য কৈবল্য। কৈবল্যে প্রতিষ্ঠিত হলে বিভূতি আপনাহতে উৎসারিত হবে। অথচ তখন তাকে আর প্রত্যাখ্যান করব না, তার

মধ্যে দেখব স্বরূপের উল্লাস। কিন্তু রূপের মোহে স্বরূপকে ভুললে তো চলবে না। তমসার পরপারে আদিত্যবর্ণ হয়ে জ্বলতে হলে আকাশ হতে হবে, পূর্ণকে পেতে হলে শূন্য হতে হবে। এইখানে আসুরচেতনার ভুল হয়ে যায়। শুম্ভ মহাশূন্যে দেবীকে জড়িয়ে ধরল—বাহুযুদ্ধে; পরে সেখান থেকে প্রত্যাহত হয়ে ছিটকে পড়ল 'ধরণীতলে'। শক্তিকে পেয়েও সে পেল না, কেননা সে শিব নয়।

তাছাড়া আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে। অতিমানস সিদ্ধি হল যোগের শেষ কথা, তার আগে সাধকের অনেক-কিছু করবার আছে। প্রথমেই প্রাকৃত অযোগচেতনাকে রূপান্তরিত করতে হবে যোগচেতনায়, ধ্যানচিত্ততাকে স্বভাবে পরিণত করতে হবে লোকোত্তরের আবেশ এবং অনুস্মৃতির দ্বারা। তারপর নিজের গভীরে ডুবে আবিষ্কার করতে হবে নিজের স্বরূপসত্তাকে বা চৈত্য-পুরুষকে। আধারের চৈত্য-রূপান্তর হতে সত্যকার যোগের শুরু। তারপর গভীর থেকে তুঙ্গতায় আরোহণ করে পরিব্যাপ্ত হতে হবে বিশ্বচেতনায়, আনন্ত্যের শক্তিপাত এবং অভিষেকে আধারের ঘটাতে হবে চিন্ময়-রূপান্তর। অতিমানস-রূপান্তর হল তারও পরের পর্ব। তারও অনেকগুলি ধাপ। উঠতে হবে ধীরে-ধীরে, ধাপে-ধাপে। প্রত্যেকটি ভূমিকে স্বভাবগত করে তারপর তার পরের ভূমিতে পা বাড়াতে হবে। লাফ দিয়ে গাছের আগায় ওঠবার চেষ্টা করলে হাত-পা ভেঙে মাটিতে পড়তে হবে। যোগ হঠকারিতার ব্যাপার নয়, একটা আজগবী কাণ্ডকারখানাও নয়—বিশেষত এই পূর্ণযোগ। এর মধ্যে অতি-প্রাকৃতের কোনও স্থান নাই। সহজ উদার সুনির্মল বোধি এর ভিত্তি। শুদ্ধবুদ্ধি এর মুখ্য সাধন, তাকে অবলম্বন করে পৌঁছতে হবে বুদ্ধির উত্তর-ভূমিতে। চেতনার উত্তরণে অপ্রাকৃত অনুভূতি আসবে, কিন্তু তাতে উত্তেজিত হলে চলবে না। সব-কিছুকে গ্রহণ করতে হবে শান্ত ও সহজ ভাবে, কাণ্ডজ্ঞান হারানো কিছুতেই চলবে না। মনে রাখতে হবে, সত্যের এবং শক্তির মহত্তম প্রকাশ শেষপর্যন্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ, আলোর মতই স্বচ্ছন্দ। বিশুদ্ধ অস্তিতার বোধই সব বোধ এবং শক্তির আশ্রয়। যোগে চেতনার আড় ভাঙবে, তাতে এই বোধ সহজ হবে প্রসন্ন হবে উদার হবে।

আরেকটা বিষয়ে সাধককে সাবধান থাকতে হবে। কোনও একটা অপ্রাকৃত অনুভূতিকে—এখন সে যত উঁচুস্তরেই হ'ক না কেন—সে যেন অতিমানস অনুভূতি বলে ভুল করে না বসে। মনের ওপারে মানসোত্তর অনেকগুলি স্তর

আছে, তাদের ছাড়িয়ে তবে অতিমানসের এলাকা। প্রত্যেকটি ভূমি অদ্বৈত-বোধের বিভূতিতে সমৃদ্ধ, অন্যত্র তাদের নিয়ে আলোচনা করেছি। এদের যে-কোনটিকে সিদ্ধির পরমভূমি বলে ভুল করা সাধকের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। কিন্তু এ-সবার প্রত্যেকটিতে অবিদ্যামানসের কিছু-না-কিছু ছোঁয়াচ আছেই। শিব না হতেই শিবত্বের অভিমান জন্মিয়ে দেওয়া হল অবিদ্যাশক্তির একটা কাজ। তথাকথিত সিদ্ধচেতনাও এই দুর্দৈবের হাত হতে মুক্তি পায় না। সুতরাং সাধককে প্রতিপদে হুঁশিয়ার থাকতে হয়—শম্ভু হতে গিয়ে সে যেন শুম্ভ হয়ে না বসে।

॥ প্রথম পাদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় পাদ

সম্যক্ জ্ঞানযোগ

১

ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা

কর্ম জ্ঞান ভক্তি আর এই তিনের সমন্বয়ে জীবনের সম্যক্ সিদ্ধি—পূর্ণযোগের এই চারটি পাদ। প্রত্যেক পাদে যোগের সাধনা একেকটি বিশেষ দিক হতে আলোচিত হলেও তারা পরস্পর ওতপ্রোত হয়ে আছে। সর্বত্র লক্ষ্য হল জীবনের দিব্য রূপায়ণ। প্রথম পাদে কর্মের সাধনা আলোচিত হয়েছে। এইবার আলোচনার বিষয় হল জ্ঞানের সাধনা।

জ্ঞানের বিষয় দুরকম—লৌকিক আর লোকোত্তর। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞান লৌকিক। আর আত্মা শক্তি ও ব্রহ্মের জ্ঞানকে বলতে পারি লোকোত্তর। আরেকদিক দিয়ে বলা চলে, লৌকিক জ্ঞানে জ্ঞানের বিষয় বিষয়ী বা জ্ঞাতার বাইরে থাকে, আর লোকোত্তর জ্ঞানে বিষয় ও বিষয়ী এক হয়ে যায়। তাইতে আগেরটিতে জ্ঞানবৃত্তির মুখ ফেরানো থাকে বাইরের দিকে, আর পরেরটিতে ভিতরের দিকে। একটি প্রচলিত অর্থে শুধু 'জানা', আরেকটি 'হয়ে জানা'। জ্ঞানযোগ লোকোত্তর জ্ঞানের সাধনা। তা যখন সম্যক্ (integral) হয়, তখন তা লৌকিক জ্ঞানকেও জারিত ক'রে তার দিব্যরূপান্তর ঘটায়, আর আনন্দের উচ্ছলনে এবং শক্তির বিচ্ছুরণে জীবনে সহজরূপে ফুটে ওঠে।

জ্ঞানযোগের লক্ষ্য হল ব্রহ্ম। সত্তা চৈতন্য আনন্দ আর শক্তি—এইগুলি ব্রহ্মের লক্ষণ। এসবই চিদ্‌বৃত্তি বা বোধরূপ। আমাদের মধ্যেও এসব বোধ আছে, কিন্তু আছে অল্প এবং খণ্ডিত হয়ে। আমাদের সত্তা অশাশ্বত চঞ্চল, চেতনা আচ্ছন্ন, শক্তি কুণ্ঠিত, আনন্দ স্তিমিত। এই দীনতার একটা পীড়া আছে যা আমাদের স্থির থাকতে দেয় না। তাইতে অল্পে আমাদের সুখ নাই, আমরা চাই ভূমা হতে বৃহৎ হতে। এটা আমাদের মধ্যে প্রাণধর্মের তাগিদ।

বৃহৎ হওয়ার একটা উপায় হল আনন্দ আর শক্তির সাধনা—গীতার ভাষায় ভোগ আর ঐশ্বর্যের সাধনা। এই সাধনা বহির্মুখ হয়ে করলে পাই উপকরণ-সমৃদ্ধ প্রাকৃত জীবন। উপনিষদ বলছেন, এতে বিত্তলাভ হয়, কিন্তু 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ', 'ন বিত্তেন অমৃতস্য আশা অস্তি'। জীবনে একটা সময় আসে, যখন মানুষের চেতনা বাইরে থেকে ভিতরের দিকে মোড় নেয়। সে

তখন বিষয়কেই জানতে বা পেতে চায় না, চায় নিজেকেও। চিত্তের ঝোঁক পড়ে বিশুদ্ধ চিৎসত্তার দিকে। এইটাই জ্ঞানসাধনার ঝোঁক।

ব্রহ্মের চারটি বিভাবের কথা বলেছিলাম—সত্তা চৈতন্য আনন্দ আর শক্তি। এর মধ্যে সত্তা আর চৈতন্যকে বলা চলে অতিষ্ঠার (transcendence) বিভাব, আর আনন্দ ও শক্তি প্রতিষ্ঠার (immanence)—যেমন আমাদের চেতনায় আছে নিবৃত্তি (withdrawal) আর প্রবৃত্তি (outpouring)। আমি আমাতেই আছি, থেকে আমাকেই জানছি; এই জানায় আমার চেতনা নন্দিত হচ্ছে এবং শক্তিতে টলমল করছে। এই সহজ অনুভবটি আমরা সবাই পেতে পারি। এরই মধ্যে দেখছি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিফলিত হচ্ছে—সত্তা আর চৈতন্য আনন্দে আর শক্তিতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

স্বভাবের বশেই এটি হয়। কিন্তু তবুও এটিকে ভাল করে জানতে হয়; শুধু মন দিয়ে নয়, বেদ বলেন মনীষা এবং হৃদয় দিয়েও এই ধরনের জানাই যোগ। আত্মস্থ আর আত্মসচেতন হয়ে যদি ভোগ আর ঐশ্বর্যকে ব্যবহার করি, তাহলে আর কোনও ঝামেলা থাকে না। ভোগ আর ঐশ্বর্যকে তখন খুঁজতে হয় না, দেখি আনন্দ আর শক্তিরূপে আমারই চিন্ময় আত্মসত্তার তারা সহজ প্রকাশ। এটি যোগেরও ফল : আত্মস্থিতি জ্ঞানযোগের, আনন্দ ভক্তিযোগের, আর শক্তি কর্মযোগের। তিনটি যোগ অন্যোন্যসংগত, কেননা তারা আমাদের চেতনার ভাবনা বেদনা (feeling) ও সংকল্পরূপ স্বাভাবিক বৃত্তির উৎকর্ষণমাত্র।

*

বৃহৎকে বা ব্রহ্মকে জানতে হবে অর্থাৎ আত্মচেতনাকে শান্ত প্রদীপ্ত এবং বিস্ফারিত করতে হবে। না করলে আনন্দকে নিষ্কলুষ আর শক্তিকে নিরঙ্কুশ রাখতে পারব না।

ব্রহ্মের সত্তা এবং চৈতন্যকে বলতে পারি পুরুষ, আর আনন্দ এবং শক্তিকে বলতে পারি তাঁর আত্মপ্রকৃতি। পুরুষ প্রকৃতির অধ্যক্ষ প্রশাস্তা এবং পরায়ণ। আমাদের জীবনেও আমরা যদি আত্মস্থ হতে পারি, তাহলেই আত্মপ্রকৃতি ঋতচ্ছন্দা হয়। আত্মস্থ হওয়ার জন্যই জ্ঞানের সাধনা—চেতনার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে।

এ-জ্ঞান ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দিয়ে জানার ঊর্ধ্বে। এ হল বোধি দিয়ে জানা বা বোধে পাওয়া। পাওয়া বৃহৎকে : অথবা আত্মচৈতন্যকেই বৃহৎ করে পাওয়া। অনুভব তখন নির্মেঘ আকাশের মত প্রশান্ত প্রসন্ন প্রভাস্বর। আকাশের দীপ্তিই আত্মস্থিতির পরমচেতনা। সে-চেতনায় দ্যুলোক অন্তরিক্ষ ভূলোক ভাসছে। সবাইকে জড়িয়ে সবার মধ্যে অনুস্যূত স্পন্দিত হচ্ছে সে-চেতনা। এই আধারকে কেন্দ্র করে সে-চেতনা রয়েছে হৃদয়ে ভ্রূমধ্যে মূর্ধন্য মহাশূন্যতায়। সে-চেতনা সর্বত্র সর্বকালে—জাগ্রতে স্বপ্নে সুষুপ্তিতে।

এই ব্রহ্মচৈতন্যকে পাবার দুটি উপায় আছে—একটি মনের সুপ্তি, আরেকটি বোধের জাগৃতি। সাধারণত আমরা ধরি সুপ্তির পথ। ভাবি, যেখানে পরম চৈতন্য, সেখানে মন নাই। ব্রহ্ম মনের অগোচর। সুতরাং ব্রহ্মকে পেতে হলে মনকে নিরুদ্ধ করতে হবে। মন যদি না থাকে, তাহলে জগৎও থাকবে না—যেমন সুষুপ্তিতে থাকে না। সুষুপ্তিতে প্রপঞ্চের উপশম, তার অনুভব হল শূন্যতা। সুতরাং ব্রহ্মচৈতন্যও হয় সন্মাত্র, নয়তো শূন্য। এই সন্মাত্রে অথবা শূন্যে পৌঁছবার উপায় হল ঐকান্তিক (exclusive) একাগ্রতায় সর্বনিরোধের পথ ধরা। জ্ঞানযোগীর কাছে বাইরের জগৎ মুছে যাবে, তাঁর কোনও কর্ম থাকবে না। চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমটায় কিছু কর্ম থাকলেও শেষপর্যন্ত নৈষ্কর্ম্যের নিস্তরঙ্গতায় পৌঁছনই হল যোগীর লক্ষ্য। সাংসারিক কর্তব্য জীবসেবা বা দেবার্চন—শেষপর্যন্ত সব কর্মই ছাড়তে হবে। কেননা জ্ঞান কর্মের ফল হতে পারে না। কর্মে দ্বৈতবুদ্ধি থাকবেই, সুতরাং বিশুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞানের সঙ্গে তার সমুচ্চয় হওয়া কখনই সম্ভব নয়। কর্মস্পন্দ যেমন বাইরে থাকবে না, তেমনি ভিতরেও থাকবে না। চিত্তস্পন্দও তো কর্ম। সুতরাং নিশ্চিন্ত সত্তা বা শূন্যতায় লীন না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান সিদ্ধ হয়েছে একথা বলা চলবে না।

এইধরনের জ্ঞানযোগের সাধনা হল বুদ্ধি, যার বৃত্তি হচ্ছে ভাবনা (thought)। ভাবনা বেদনা আর সঙ্কল্প—চিত্তের এই তিনটি বৃত্তির কথা আমরা জানি। এও জানি, এই তিনটি বৃত্তিকে অন্তর্মুখ করে যথাক্রমে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ আর কর্মযোগ—যোগের এই ত্রিপুটীকে আমরা পেতে পারি। অবিমিশ্র জ্ঞানযোগের যাঁরা সাধক, তাঁরা ভক্তি এবং কর্মের সাধনাকে এড়িয়ে চলেন। এই বর্জননীতি তাঁরা গ্রহণ করেন সাংখ্যের কাছ থেকে। সাংখ্য বলেন, আত্মাতে দ্রষ্টৃত্ব ভোক্তৃত্ব আর কর্তৃত্ব—প্রাকৃতদশায় এই তিনটি বৃত্তি আছে। কিন্তু

তাদের মধ্যে দ্রষ্টৃত্বই হল আত্মার যথার্থ স্বরূপ। ভোক্তৃত্ব আর কর্তৃত্বে আত্মা প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে যান, বিবিক্ত হতে পারেন কেবল দ্রষ্টৃত্বেই। অতএব দ্রষ্টৃত্বই পুরুষের একমাত্র সাধ্য হওয়া উচিত। প্রচলিত জ্ঞানযোগে সাংখ্যের এই ভাবনাকে সাধনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ভোক্তৃত্ব এবং কর্তৃত্ব দুইই ছাড়তে হবে, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনদ্বারা অনুশীলন করতে হবে বিশুদ্ধ দ্রষ্টৃত্বের। চরমে দ্রষ্টৃত্বও থাকবে না : 'তত্র কঃ কেন কিং পশ্যেৎ?' থাকবে সন্মাত্র অথবা শূন্যতা। তারও পরে জ্ঞানী যদি জগতে ফিরে আসেন, তিনি থাকেন শুধু সাক্ষী হয়ে, তাঁর ভোগও থাকে না কর্মও থাকে না।

*

এই জ্ঞানবাদের একটা বৈশিষ্ট্য হল শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা অথবা গৌণ করে দেখা। এ-ভাবনাও যে সাংখ্য হতে এসেছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। সাংখ্য পুরুষ আর প্রকৃতির বিবেকের কথা বলেন, আর সেই অনুসারে বৃত্তির মধ্যে একটা ভাগাভাগিও করেন। দ্রষ্টৃত্ব পড়ে পুরুষের ভাগে, আর প্রকৃতির ভাগে ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব। প্রাকৃতদশায় ভোগ আর কর্মের প্ররোচনাতেই আমরা জড়িয়ে পড়ি; আর মুক্ত হই, যখন না জড়িয়ে তাদের শুধু দেখে যাই। এই দেখে-যাওয়ার সংস্কার যখন একান্তভাবে দৃঢ়মূল হয়, তখন প্রবৃত্তির উচ্ছেদ হয়, পুরুষের ভোগও থাকে না কর্মও থাকে না। প্রকৃতির খেলা বা শক্তির খেলা তখন পুরুষের বাইরে পড়ে থাকে।

এ-অবস্থা অনুভবসিদ্ধ এবং তার প্রয়োজনও যে আছে তা বলাই বাহুল্য। তবুও একে সম্যক্-জ্ঞান বলতে পারি না দুই কারণে। প্রথমত, এ-জ্ঞান শক্তিজ্ঞান হতে বিযুক্ত অথবা শক্তির অদিব্য এবং অবর (lower) দিকটার সম্পর্কেই সচেতন। দ্বিতীয়ত, এ-জ্ঞান ব্যষ্টি আত্মারই জ্ঞান, পরমাত্মার জ্ঞান নয়। সর্ব-নিরোধে একলা আমার কাছে শক্তির লীলায়ন নিবৃত্ত হয়, তাতে আমারই চেতনায় জগৎ থাকে না; কিন্তু আমার বাইরে শক্তির লীলায়ন তো সমানে চলতে থাকে। সে চলে কার আশ্রয়ে? ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যষ্টি জীবচৈতন্যের আশ্রয়েই শুধু? শক্তির বিক্ষিপ্ত ক্রিয়াকে সমাহৃত করে আমরা যেমন এক মহাশক্তির কল্পনা করি, তেমনি চৈতন্যের বিক্ষিপ্ত প্রকাশকে সমাহৃত করে এক মহাচৈতন্যের কল্পনাই-বা করতে পারব না কেন?

বস্তুত উপনিষদে এই মহাচৈতন্যকেই বলা হয়েছে ব্রহ্ম। তিনি সর্বভূতের অন্তর্যামী, সর্বভূত তাঁর বিস্ফুলিঙ্গ, শক্তির সমস্ত লীলায়ন সেই দেবতার আত্মশক্তির 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া'। সাংখ্যযোগীও এই মহাচৈতন্যের সাক্ষাৎ পান, যখন নিরুদ্ধ অবস্থা থেকে ফিরে এসে তিনি জগতের সাক্ষী হন। ব্যাপ্তিচৈতন্য ছাড়া জগৎ-সাক্ষিত্ব সম্ভব নয়। সাংখ্যোপনিষদে এই চেতনাকে বলা হয়েছে 'মহান্ আত্মা'—'জ্ঞান আত্মা' (Individual Self) আর 'শান্ত আত্মা'র (Transcendent Self) মাঝে যা সেতুস্বরূপ।

মহান্ আত্মাকে যদি শুধু দ্রষ্টারূপে দেখি, তাহলে পাই বেদান্তের সাংখ্য-ধারা। কিন্তু একেই তাঁর স্বরূপের পূর্ণ পরিচয় বলতে পারি না। গীতার ভাষায়, যিনি প্রকৃতির উপদ্রষ্টা, তিনিই আবার তার 'অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ', পরমপুরুষ পরমাত্মারূপে তিনি এই দেহেই আছেন। সুতরাং দ্রষ্টৃত্বের অনুভবের পরিপাকে স্বভাবতই ভোক্তা মহেশ্বরের অনুভব এসে যায়। ব্রহ্ম যেমন জগতের দ্রষ্টা, তেমনি তার ভোক্তা এবং কর্তাও। তাঁকে এইভাবে দেখাই হল বেদান্তের তান্ত্রিকধারা। এটি সাংখ্যধারার পরিপূরক। সাংখ্যের ভাবনা ব্যষ্টিকে নিয়ে, আর তন্ত্রের ভাবনা সমষ্টিকে নিয়ে। দুটি ভাবনার সমন্বয়ে জ্ঞানের পূর্ণতা।

তাছাড়া জ্ঞান আর শক্তি অবিনাভূত (inseparable)। প্রবৃত্তিতে বা নিবৃত্তিতে যেমন জ্ঞানের উচ্ছেদ হয় না, তেমনি শক্তিরও উচ্ছেদ হয় না। নিরোধেও শক্তির বেগ অনুভূত হয়—অন্তরাবৃত্তির অভিমুখে। প্রবৃত্তির শক্তি অপরা, নিবৃত্তির শক্তি পরা। সে-শক্তি যেমন আত্মশক্তি, তেমনি আবার অপরা-শক্তির প্রশাসিকা। আমি আত্মস্থ হয়েই অপরা-প্রকৃতিকে শাসনে আনতে পারি। এই প্রশাসনে প্রকৃতির উচ্ছেদ না হয়ে তার সুমঙ্গল রূপান্তর হতে পারে এবং হয়ও। নিরোধে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন শক্তির প্রলয় ঘটল; কিন্তু বস্তুত নিরোধের বিন্দুঘনতা হতেই আবার দেখা দেয় শক্তির হিরণ্ময় বিচ্ছুরণ।

আমাদের মধ্যে শক্তির ঘনিষ্ঠ রূপ প্রকাশ পায় সঙ্কল্পে। যেমন কাম-সঙ্কল্প আছে, তেমনি সত্যসঙ্কল্পও আছে। যোগচেতনায় ফোটে সত্যসঙ্কল্প, সদ্‌বস্তুলাভের তীব্র অভীপ্সা। এই অভীপ্সা চৈত্যপুরুষের ধর্ম। চৈত্যপুরুষ পরমপুরুষের সঙ্গে যোগযুক্ত। আমার অভীপ্সায় রূপ ধরে বিশ্বেশ্বরেরই বিশ্বমূল সত্যসঙ্কল্প। সে-সঙ্কল্প চায় জড়ত্বের তমিস্রা হতে চেতনার আলো ফুটিয়ে তুলতে। ভাবনায় আমরা তার আভাস পাই, কিন্তু আভাসকে প্রভাসে

রূপান্তরিত করতে পারে অভীপ্সাই। অতএব অভীপ্সাই মৌল যোগশক্তি।

আভাস প্রভাস হয়, ভাব যখন হয় বস্তুগত। দেহ প্রাণ মন হৃদয়—এই-গুলিকে বলি বস্তু। জীবনের গোড়া হতে এদের সঙ্গে আমার নিবিড়তম যোগ। অনুভবকে ভাবনার দ্বারা এদের উজানে ঠেলে নেওয়া যায় এবং এদের পরিশুদ্ধির জন্য তার প্রয়োজনও হয়। কিন্তু অনুভব তখনই সম্যক্ হতে পারে, যখন তা দেহ-প্রাণ-মন-হৃদয়কে আবিষ্ট জারিত ও রূপান্তরিত করে। শাস্ত্রেও আছে দক্ষিণামূর্তি গুরুর কথা, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবানের কথা। তাঁকে পাওয়াতেই অনুভবের পরম পর্যবসান। পেতে হবে শুধু বস্তুনিরপেক্ষ ভাবনা দিয়ে নয়, এই দেহ-প্রাণ-মন-হৃদয় দিয়ে।

তবে একথাও মনে রাখতে হবে, বস্তুনিরপেক্ষ ভাবনা অসার্থক নয়, বরং ওই হল বস্তুসিদ্ধির বনিয়াদ। এখন বস্তুর জালে জড়িয়ে আছি, সে-জাল কাটতেই হবে। সাংখ্যের বিবেক বা জ্ঞানীর নেতিবাদের দরকার এইখানে। শুদ্ধ ভাবনাই হল রূপান্তরের ভিত্তি। সুতরাং সাংখ্যের ধারায় উজিয়ে গিয়ে আবার তন্ত্রের ধারায় ভাটিয়ে আসতে হবে। তবেই যোগের সাধনা পূর্ণ হবে।

*

জ্ঞান খুঁজছে বিশ্বের মূল তত্ত্বকে। মূল কি, তা নিয়ে মতভেদ আছে। মতভেদের কারণ দৃষ্টির সূক্ষ্মতার তারতম্য।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, জড়ই বিশ্বের মূল। জড়ই প্রাক্তন, প্রাণ-মন তার উপসৃষ্টি (by-product) মাত্র। কিন্তু চরম প্রয়োজনের বিচারে প্রাক্তনতার দাবিই বড় নয়। শুদ্ধ জড় নিয়ে আমাদের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে না, যদি সে-জড় শক্তির বাহন না হয়। কয়লাকে পুড়িয়ে তাপ পাই, আর তাইতে কয়লার সার্থকতা। আবার সে-সার্থকতা আমারই কাছে, যে-আমি মনোময় জীব। মনোময় জীবরূপে আমি জড়কে ব্যবহার করি, তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করি। এতেই জীবনের সার্থকতা। আর সার্থকতাই হল তত্ত্বনিরূপণের একটা বড় মাপকাঠি।

বিশ্বে জড় আছে শক্তি আছে চেতনা আছে। তিনটি তত্ত্বই মৌলিক। আমার মধ্যে তিনটি তত্ত্বের সমাহার দেখতে পাচ্ছি : আমার দেহ আছে প্রাণ আছে মন আছে। তিনটি তত্ত্ব ওতপ্রোত হয়ে আছে। আর তাদের মধ্যে মনের

দামই আমার কাছে সবচাইতে বেশি। আমার মন প্রাণ আর দেহের নিয়ন্তা—এমন একটা অভিমানে আমি আরাম পাই, আশ্বস্ত হই।

এখন সার্থকতার দিক থেকে যদি মনকেই আমার জীবনের মূল বলে ধরি, তাহলে ভুল হয় কি? অবশ্য মূল বলার অর্থ প্রাণকে বা দেহকে অস্বীকার করা নয়। দেহ-প্রাণকে আশ্রয় করেই মনের বিকাশ হয়েছে একথা মানতে আপত্তি বা লজ্জার কিছুই নাই। কিন্তু সার্থকতার বিচারে মনের দাম যে তাদের দামকে ছাপিয়ে উঠেছে, এও তো অস্বীকার করতে পারি না। দেহ এবং প্রাণ অপরিহার্য হলেও তাদের মধ্যে মনোধর্মের প্রকাশ যত সুষ্ঠু এবং অব্যাহত হবে, ততই জীবনের সার্থকতা—একথাও তো সত্য।

কিন্তু মনোধর্মের যতটুকু প্রকাশ আমাদের সমষ্টিগত জীবনে আজপর্যন্ত হয়েছে, তা-ই কি পর্যাপ্ত? সভ্যতার বর্তমান চেহারা দেখে তো তা মনে হয় না।

মনোধর্মের নিয়ামক হল আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধি। তার দৃষ্টি বাইরের দিকে ফেরানো। এই দৃষ্টির একটা ন্যূনতা আছে। চেতনার একই ভূমিতে থেকে এ-দৃষ্টি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাতে অনেক-কিছু জানা যায়, কিন্তু সব-কিছু হওয়া যায় না। অথচ হওয়াও দরকার। নইলে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয় না।

হওয়ার জন্য চাই অন্তরাবৃত্তি—নিজের মধ্যে ডোবা। ডুবতে পারলে বিক্ষিপ্ত চেতনা একাগ্র হয়, একাগ্র চেতনার স্বোত্তরণ (self-exceeding) ঘটে। চেতনার উত্তরণে বুদ্ধি দীপ্ত স্বচ্ছ এবং উদার হয়। কি ব্যষ্টিগত কি সমষ্টিগত ভাবে জীবনের সমস্যার সমাধান তখন সুষ্ঠুতর হয়।

বহিরাবৃত্তিতে ভোগ, অন্তরাবৃত্তিতে যোগ। যোগ যদি ভোগের প্রশাস্তা হয় তবেই কল্যাণ।

বুদ্ধিকে ছাপিয়ে আছে বোধি, যার স্বরূপ প্রকাশ পায় অন্তরাবৃত্তিতে। বোধিতে চেতনার যে-উত্তরণ ও বিস্ফারণ ঘটে, তা-ই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। মানুষের মন সোজা-বাঁকা নানা পথ দিয়ে এই ব্রহ্মের দিকে চেতনার সৌরকরোজ্জ্বল বিস্ফারণের দিকে চলেছে। তাই জীবনের সার্থকতার দিক দিয়ে এই ব্রহ্মকে বলতে পারি বিশ্বমূল।

*

যা বিশ্বমূল তা যুগপৎ বিশ্বোত্তীর্ণ এবং বিশ্বাত্মক। তত্ত্বের স্বভাব এই, যার তত্ত্ব তাকে সে ছাপিয়ে গিয়ে তাতে অনুস্যূত হয়ে থাকে। ব্রহ্মচৈতন্যও তেমনি বিশ্বাতীত চৈতন্য, আবার বিশ্বচৈতন্যও।

এই চৈতন্যের অপরোক্ষ অনুভব হয় আত্মচৈতন্যে। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'- অনুভবের এই চরম কোটি। যে-আমি বিন্দুঘন, সেই আমিই বিশ্বব্যাপ্ত, আবার বিশ্বাতীতও। চেতনার পরাবৃত্তিতে (regression) তিনটি অনুভব পর-পর সিদ্ধ হতে পারে। গুটিয়ে যাওয়ার পর ছড়িয়ে পড়া স্বভাবেই ঘটে, যদি প্রলয়ের সংস্কার তার প্রতিবন্ধী না হয়। প্রলয় আসে তার পরে—নিবর্তনের (withdrawal) তীব্রসংবেগ থেকে। চেতনা তখন বিশ্বোত্তীর্ণ। সেখানে কিছুই নাই, না আমি না জগৎ।

অথচ এই শূন্যতাই জগৎপ্রসূতি, অব্যক্তই ব্যক্তের উৎস। অব্যক্তে আর ব্যক্তে বিরোধ দেখে মন। ব্যক্তকে নিয়ে মনের কারবার, অব্যক্তে গেলে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলে—যেমন নিদ্রায়। অথচ অব্যক্তেরও বোধ আছে। মনের কাছে সে-বোধ অব্যাকৃত (indeterminate)—যেমন নিদ্রার বোধ। তবুও বলা চলে, সেখানেও একটা-কিছু আছে। কি আছে তা বোঝা যায়, ঘুমের মধ্যে যদি জেগে ওঠা যায়। সুষুপ্তির বোধ তখন একদিকে নেতিবাচক, আরেকদিকে ইতিবাচক। যা ইতিবাচক, তা হল বিশুদ্ধ শক্তির বোধ। সে-শক্তি 'প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় সর্বেশ্বর সর্বযোনি'। বোধ আর শক্তি সেখানে অবিনাভূত। এ বোধেরই শক্তি। আর এই বোধ অতিমানস—যার মধ্যে প্রপঞ্চোপশম আর প্রপঞ্চোল্লাসের, নেতি আর ইতির কোনও দ্বন্দ্ব নাই।

অতিমানস চেতনায় বিশ্ব এবং ব্যক্তি বিশ্বোত্তীর্ণের প্রতিরূপ। আভাস নয়, প্রতিরূপ—এই কথাটি মনে রাখতে হবে। আভাসদর্শনে মনঃকল্পিত দ্বৈতের সংস্কার থাকে। তাতে মনে হয় : এই সত্য, আর ওই মায়া। কিন্তু প্রতিরূপ দর্শনে সবই সত্য, সবই ব্রহ্ম।

জ্ঞান থেকে শক্তিকে যদি বিচ্ছিন্ন না করি, তাহলে এই বোধ হয়। এই বোধ জীবন্মুক্তের—যিনি সর্ববিৎ এবং সর্বকৃৎ। তাঁর জানা আর করার অর্থই হল হওয়া। অথচ সে-হওয়া শূন্যের গহন হতে আলোর বিচ্ছুরণ।

২

ব্রাহ্মী স্থিতি

ব্রহ্মকে জানতে হবে। ব্রহ্মই জীব আর জগৎ হয়েছেন। সুতরাং ব্রহ্মকে জানতে হলে জানতে হবে জীব আর জগতের তত্ত্ব কি। জ্ঞানের সাধনা তখন দুভাগ হয়ে পড়বে—একটি হবে আত্মজ্ঞানের সাধনা, আরেকটি বিশ্বজ্ঞানের। আত্মজ্ঞানের বেলায় দৃষ্টিকে অন্তর্মুখ করতে হবে, আর বিশ্বজ্ঞানের বেলায় তা থাকবে বহির্মুখ। সার্থক জীবনায়নের পক্ষে দুটি জ্ঞানই প্রয়োজনীয়।

আবার সাধনহিসাবে জ্ঞানের আরেকরকম বিভাগ করা চলে। জ্ঞানের সাধন হতে পারে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এবং বোধি। চেতনার দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই সাধনগুলির মধ্যে একটা ক্রমিক উৎকর্ষ আছে, যার ফলে জ্ঞানের তারতম্য ঘটে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের জোর আছে, কিন্তু তার ব্যাপ্তি কম, কেননা তার কারবার শুধু বিশেষকে নিয়ে। বিশেষের কতকগুলি ছাপ নিয়ে মন সামান্যের একটা আদর্শ গড়ে, আর তাকে স্পষ্ট করে তোলে বুদ্ধি। বুদ্ধির সামান্যভাবনা ইন্দ্রিয়নির্ভর এবং বহিরাশ্রয়ী হতে পারে, তার ফলে আমরা পাই বিজ্ঞান ও দর্শন, উপনিষদ যাকে বলেছেন অপরা বিদ্যা। আবার এই বুদ্ধি অন্তর্মুখ হলে জাগে বোধি, যা দিয়ে আমরা পাই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। উপনিষদ তাকে বলেছেন পরা বিদ্যা। যোগের মুখ্য সাধন হল বোধি। বুদ্ধি তার আশ্রিত।

বুদ্ধি আর বোধিতে একটা মৌলিক তফাত আছে। বুদ্ধির দ্বারা সামান্য-জ্ঞান সম্ভব হলেও জ্ঞানের বিষয় সেখানে জ্ঞাতার বাইরে পড়ে থাকে। আর বোধিতে জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় এক হয়ে যায়, যাতে বোধির জানাকে বলা চলে 'হয়ে জানা'। যেমন, বুদ্ধি ব্রহ্মকে নিয়ে দর্শনের এক বিরাট ইমারত গড়ে তুলতে পারে, কিন্তু তাতেই সে ব্রহ্মকে জেনেছে একথা বলা চলে না। ঋষি বলেন, 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি'—ব্রহ্মকে যে জানে সে ব্রহ্মই হয়। এই হওয়াটা অত্যন্ত সহজ এবং অপরোক্ষ একটা অনুভব—চোখ দিয়ে দেখা বা প্রাণ দিয়ে অনুভব করার মত। বুদ্ধির ঐশ্বর্য সে-অনুভবের কাছে নিস্তেজ নিষ্প্রাণ।

*

অথচ জ্ঞানের সাধনায় বুদ্ধির যে কোনও স্থান নাই তা নয়। অধিকাংশ-ক্ষেত্রে আমাদের সাধনা শুরু করতে হয় মন-বুদ্ধিকে নিয়ে। বিচার আর বিবেক জ্ঞানযোগের প্রথম ধাপ। তারা বুদ্ধির বৃত্তি।

বিবেকেরও মূলে আছে বৈরাগ্য। বস্তুত অধ্যাত্মসাধনার শুরু হয় বৈরাগ্য থেকে। ভরা সংসারের মধ্যে থেকেও মন একদিন কেঁদে ওঠে, বলে, এ চাই না, চাই না। কি চাই তাও স্পষ্ট করে বোঝাতে পারে না, শুধু গুমরে-গুমরে কাঁদে। এ যেন বয়ঃসন্ধির বেদনা। শৈশব গেছে, যৌবন আসছে। শুধু নিজেকে নিয়ে আর ভাল লাগে না, এবার আর-কিছু চাই, আর-কাউকে চাই।

যাকে চাই, সে বাইরে নয়, অন্তরে। তার যদি রূপও থাকে, সে-রূপ বস্তুর নয়, ভাবের। ভাব দিয়ে ভাবকে ছোঁয়া, বোধ দিয়ে বোধকে পাওয়া—এই হল অধ্যাত্মভাবনার রীতি।

কিন্তু আমার ভাব শুদ্ধ না হলে তো মহাভাবকে ধরতে পারব না। ভাবসংশুদ্ধি তাই সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। তারই জন্য দৃষ্টিকে অন্তরের দিকে ফেরানো, বাইরে থেকে ভিতরে ঢোকা।

অন্তরে ঢুকে দেখি, সেখানে নির্ঋতির (chaos) তাণ্ডব চলছে। ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প—সব-কিছু সেখানে বানচাল। এই নির্ঋতির মধ্যে ঋতচ্ছন্দ আনতে হবে। কে আনবে? আনবে বুদ্ধি—বিচার দিয়ে বিবেক দিয়ে। শ্রদ্ধার যেটুকু আলো হৃদয়ে ফুটেছে, তা-ই দিয়ে সবাইকে সে পরখ করবে যাচাই করবে। প্রসন্ন আকাশ আর মেঘের ছায়ার মাঝে সে তফাত করবে। সৌষম্যের যা বিরোধী, নির্মম হয়ে তাকে উৎখাত করবে। এমনই করে ভিতরটা সদাশুচি সমনস্কতায় গুছিয়ে এলে যা চাই তার ছবিটি ধারণার ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এই পর্যন্ত বুদ্ধির কাজ।

*

সুস্পষ্ট ধারণায় মন নিঃসংশয় হয়। কিন্তু জ্ঞানযোগের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট নয়। ধারণাকে রূপান্তরিত করতে হবে উপলব্ধিতে। অর্থাৎ যা ভাবনামাত্র, তাকে বেদনায় (feeling) রসঘন এবং সঙ্কল্পে স্ফুরন্ত (dynamic) করে তুলতে হবে। 'কেউ দুধ দেখেছে, কেউ-বা দুধ খেয়েছে,

খেয়ে গায়ে জোর করেছে।' আলোর আভাসেই শুধু তৃপ্ত হলে চলবে না, দেহ-প্রাণ-মনে সেই আলোকে নামিয়ে এনে বসন্তের মালঞ্চ করতে হবে আধারকে।

এই উপলব্ধির তিনটি ধাপ : আন্তর দর্শন, আন্তর অনুভব এবং সর্বশেষে সাযুজ্য।

অন্তরদর্শন বা দৃষ্টিতে একটা নতুন চোখ ফোটে—বোধির চোখ। যোগীরা বলেন তৃতীয় নয়ন। বাইরের চোখ দিয়ে বাইরের বস্তু দেখে যেমন আমরা নিঃসংশয় হই, এই চোখ দিয়েও তেমনি সত্যকে নিঃসংশয়রূপে দর্শন করি। তখন আর পরের কাছে শুনে আশ্বস্ত হওয়া নয়, নিজের চোখে দেখে ওয়াকিফহাল হওয়া। প্রথম দর্শনটা হয় ভাবের। এখন যেমন বাইরের আলোতে জগৎকে ভাসতে দেখি, তখন তেমনি ভাবদৃষ্টিতে এক লোকোত্তর জ্যোতিঃসত্তায় এই জগতের মর্মরহস্যকে উদ্ভাসিত দেখি। কার্যের পিছনে দেখি কারণকে, বহুর পিছনে এককে—এক অবিচল আত্মসম্ভূতির (self-becoming) প্রত্যয়রূপে। বারবার দেখার ফলে ভাব ঘনীভূত হয়ে চিদ্‌বস্তুর রূপ ধরে। এই চোখে দেখার মত করেই চিৎসূর্যের জ্যোতিঃপ্লাবনে মহাকাশকে উদ্ভাসিত দেখি।

কিন্তু দেখাই উপলব্ধির সবটুকু নয়। দেখা অনুভবের একটা দিক। অনুভবকে সর্বাঙ্গীন না করতে পারলে উপলব্ধি পূর্ণ হয় না। শুধু আলোর দর্শনই নয়, চাই তার আবেশ। সে-আবেশ মনকে প্রাণকে দেহকে পর্যন্ত জারিত করবে। মনের ভাবনা প্রাণের বেদনা রসের আকৃতি ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা—সব তখন এক জ্যোতির্ঘন তর্পণে তৃপ্ত হবে।

এমনি করে জ্যোতিরাবেশের সান্দ্রতা নিয়ে আসবে সাযুজ্যের পরম উপলব্ধি। তখন জ্ঞানীর অনুভব : 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মাই ব্রহ্ম। অনুভব আবেশে এবং উদ্দীপনায়। এই নিত্যজাগ্রত উপলব্ধিই আমাদের পরম পুরুষার্থ। এর নাম ব্রাহ্মী স্থিতি।

৩

শুদ্ধ-বুদ্ধি

ব্রাহ্মী স্থিতি সম্ভব হয় অতিমানস উপলব্ধির ফলে। মন-বুদ্ধিকে নিয়েই অতিমানসের দিকে আমাদের যাত্রা শুরু। সেখানে পৌঁছে তুরীয়ের জ্যোতিতে যদি দেহ-প্রাণ-মনকে আবিষ্ট জারিত এবং রূপান্তরিত করিতে পারি, তাহলেই অতিমানসী ব্রাহ্মী স্থিতি সিদ্ধ হল বলা চলে। এই সিদ্ধি একটা জন্মান্তর। দেবজন্মের সাধনাতেই আমাদের জীবনের সার্থকতা।

সাধনা একটা দীর্ঘ মন্থর কৃচ্ছ্র প্রস্তুতির পর্ব। কৃচ্ছ্রতা যখন সহজ হয়, সম্ভাবিত হয় সুনিশ্চিত বাস্তব, তখনই সিদ্ধি। তবে সাধনা আর সিদ্ধি ওতপ্রোত, দুয়ের মাঝে পৌর্বাপর্যের নিয়মটা একেবারে অনড় নয়। সাধনা যেমন সিদ্ধিকে এগিয়ে আনে, আংশিক সিদ্ধিও তেমনি সাধনার মধ্যে বেগ সঞ্চার করে। সব ছাপিয়ে থাকে সহজের আবেশ। অতর্কিত বিদ্যুৎঝলকের মত বারবার তা পথের আদি-অন্ত উদ্ভাসিত করে, চেতনাকে আশ্বস্ত এবং সবল করে।

সাধনার গোড়ার কথা হল আধারের সর্বাঙ্গীণ শুদ্ধি। দেহ প্রাণ মন হৃদয় সব শুদ্ধ হওয়া চাই। আলোর প্রকাশ তাদের মধ্যে অব্যাহত হবে, কোথাও মূঢ়তা চাঞ্চল্য বৈষম্য বা সঙ্কোচ থাকবে না—এই হল শুদ্ধির স্বরূপ। জ্ঞানের সাধনায় বুদ্ধির শুদ্ধি চাই সবার আগে, কিন্তু তার জন্য আধারের অন্যান্য বৃত্তিও শুদ্ধ হওয়া দরকার—বিশেষ করে হৃদয়। ভাবের শুদ্ধি আর বুদ্ধির শুদ্ধি পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। হৃদয় যখন প্রশান্ত প্রসন্ন এবং উদার, স্বভাবতই বুদ্ধি তখন হয় উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ, তার দৃষ্টিতে তখন কোনও কুহেলিকা থাকে না। আবার স্বচ্ছ দৃষ্টিই পারে ভাবাবেগের রাস টেনে রাখতে। ভাবের শক্তি অসাধারণ, কিন্তু সে-শক্তিকে ঠিক পথে চালিয়ে নিতে পারে বুদ্ধিই। প্রাকৃত ভূমিতে দুটি বৃত্তির মাঝে আপাতত খানিকটা বিরোধ দেখা দেয় সত্য; কিন্তু তার ঊর্ধ্বে সত্তার নিস্তরঙ্গতায় অবগাহন করলে পর এ-বিরোধ আর থাকে না। তখন দেখি, বুদ্ধি এবং ভাব আলো আর তাপের মত ওতপ্রোত, বুদ্ধির চিৎস্বভাব আর ভাবের আনন্দরূপ একই সত্তার বৃন্তে জোড়াফুলের মত ফুটে আছে।

*

বুদ্ধি জ্ঞানের প্রকৃষ্ট সাধন। প্রাথমিক সাধন হল ইন্দ্রিয় আর মন। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে বাইরের জ্ঞান হয়, মন তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। তার বিশেষ কাজ হল জ্ঞানকে বাছাই করা, স্পষ্ট করা, স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা, আবার প্রয়োজনমত সেখান থেকে বার করে দেওয়া। এসবের মাঝে চৈতন্যের ক্রিয়ার একটা ছক আছে। এই ছকটাকে বলা যেতে পারে বুদ্ধিকল্পিত। অলক্ষ্যে থেকে মন আর ইন্দ্রিয়কে সে শাসন করে।

যেমন বাইরের ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ জ্ঞান, তেমনি আবার ভিতরের ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞান হল কতকগুলি আন্তর প্রত্যক্ষ ভাবনা বেদনা স্মৃতি কল্পনা সঙ্কল্প প্রভৃতির সমষ্টি। মন তাদের কারবারী। কিন্তু সে গুছিয়ে কারবার করতে পারে না। ফলে চেতনার ক্ষেত্রে একটা আতান (tension) আর সংঘর্ষ সবসময় লেগেই থাকে। আমরা তাকে বলি মনের চাঞ্চল্য, সাধনার পক্ষে যা সবচাইতে বড় বাধা।

কিন্তু এই নির্ঋতির মাঝে ঋতচ্ছন্দ আনবার একটা প্রচেষ্টা চলছেই। এইটি বুদ্ধির কাজ। ইন্দ্রিয় কাজ করে যন্ত্রের মত অবশ হয়ে, মন স্ববশ হতে চায় কিন্তু পারে না। বুদ্ধি স্ববশ, লক্ষ্যের সুস্পষ্ট চেতনায় উজ্জ্বল। জ্ঞানকে গুছিয়ে নিয়ে অভীষ্টের প্রতি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রয়োগ করবার নৈপুণ্য তার আছে।

কিন্তু প্রাকৃত চেতনায় এই বুদ্ধির ক্রিয়া সবসময় বিশুদ্ধ হয় না, প্রায়শই তার মধ্যে ইন্দ্রিয় প্রাণবাসনা ও মনের নানা অবাঞ্ছিত সংস্কারের ভেজাল থাকে। দেখা যায়, বুদ্ধি তাদের প্রভু নয়, তারাই বুদ্ধির প্রভু।

সংস্কারমুক্ত নির্মোহ বুদ্ধি হতে পারে দার্শনিকের অথবা বৈজ্ঞানিকের। এ-বুদ্ধি দীর্ঘ অনুশীলনের ফল। এর মধ্যে ব্যাপ্তি ছন্দ এবং সত্যৈষণা আছে। জ্ঞানযোগের প্রাথমিক যে-মনন, এ-বুদ্ধি তার অনুকূল।

কিন্তু তবুও একে আমরা শুদ্ধ-বুদ্ধি বলতে পারি না। তার কারণ, দর্শনের ক্ষেত্রেই হ'ক বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই হ'ক, যে-সামান্যভাবনা নিয়ে এ-বুদ্ধির কারবার, তার সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ের কোনও সাক্ষাৎ যোগ নাই। দার্শনিক বুদ্ধি ব্রহ্মের ধারণা করতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম হতে পারে না। তেমনি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ব্রহ্মাণ্ডের বা শক্তির ধারণা করতে পারে, কিন্তু তা হতে পারে না। অথচ আমরা

জানি, জ্ঞানের চরম সার্থকতা হওয়াতে। এরই মধ্যে রয়েছে তার রূপকৃৎ বীর্য। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির এ-বীর্য নাই বলে আজও তারা জীবনের রূপান্তর ঘটাতে পারল না।

জানা হওয়ায় রূপান্তরিত হয় বোধিতে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের যে অপরোক্ষতা আছে, বোধিরও তা-ই আছে, অথচ বোধির বিষয় অতীন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য। বোধির প্রত্যক্ষ যোগজ সন্নিকর্ষের (contact) ফল, তার মননও যোগজ প্রজ্ঞানের (spiritual apprehension) ফল। যোগ চেতনার অন্তরাবর্তন। তাতে যেমন অবিশুদ্ধ ক্লিষ্টবৃত্তির নিরোধ হয়, তেমনি শুদ্ধসত্ত্ব অক্লিষ্টবৃত্তিরও উন্মেষ ঘটে। এইগুলিই বোধির বৃত্তি।

*

শুদ্ধ-বুদ্ধি বলতে আমরা লক্ষ্য করছি এই বোধিকে। মনের উজানে যেমন বুদ্ধি, তেমনি বুদ্ধির উজানে রয়েছে বোধি। অথচ বোধি চেতনার সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। খুব নীচের স্তরে সে ধরে সহজ সংস্কারের রূপ, আবার মন-বুদ্ধির মধ্যে দেখা দেয় প্রাতিভসংবিতের ঝলক হয়ে। কিন্তু তার বিশুদ্ধ রূপটি কোথাও পাওয়া যায় না।

বুদ্ধিকে শুদ্ধ করতে হলে প্রথমত সঙ্কল্পকে শুদ্ধ করা দরকার। সঙ্কল্প দু'রকমের—এক কামসঙ্কল্প, আরেক সত্যসঙ্কল্প। কামসঙ্কল্প বস্তুনির্ভর, তার মূলে রয়েছে অভাবের বেদনা। আর সত্যসঙ্কল্প আত্মনির্ভর, তার মূলে আছে শুদ্ধসত্ত্বের উল্লাস। বাস্তবিক মানুষ বস্তুকে চায় না, তাকে উপলক্ষ্য করে চায় ভাবকেই। জ্ঞান প্রেম আনন্দ—এগুলিই তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত। এদের যেমন বস্তুনিরপেক্ষ চিন্ময় রূপ আছে, তেমনি আবার বস্তুনির্ভর স্থূল রূপও আছে। স্বভাবতই সে-রূপ অশুদ্ধ। অশুদ্ধির দুটি হেতু—একটি অহং-চেতনার সঙ্কীর্ণতা, আরেকটি তারই দরুন ক্ষুদ্র বাসনার আবিলতা। আমি ছোট হয়ে আছি বলেই ছোট জিনিসকে চাই, আর যা চাই তাকে বাইরে খুঁজি। এতে বুদ্ধিও আবিল হয়ে ওঠে। তার দেশনা (guidance) হয় এক অন্ধকে নিয়ে আরেক অন্ধের দেশনা। বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করতে হলে চেতনাকে অন্তর্মুখ করতে হবে। অন্তর্মুখ চেতনা স্বভাবতই উদার হয়, প্রশান্ত হয়। বাইরের বস্তু বা ঘটনার প্রতি তখন আসে সমত্বের ভাব। সমত্ব হতে প্রাতিভসংবিতের (spiri-

tual intuition) স্ফুরণ হয়। তারই সহযোগী হয়ে সঙ্কল্প তখন হয় দিব্যসঙ্কল্পের সঙ্গে যুক্ত চিৎশক্তির বিচ্ছুরণ। শুদ্ধ-বুদ্ধি তখন সত্যসঙ্কল্পের বাহন।

বুদ্ধির অশুদ্ধির দ্বিতীয় কারণ হল ইন্দ্রিয়মানসের উপর নির্ভরতা। ইন্দ্রিয় বহির্মুখ, তার জ্ঞান অপূর্ণ বিক্ষিপ্ত এবং সঙ্কুল। মন সে-জ্ঞানকে ভিতরে টেনে নিয়ে খানিকটা ছন্দ আনবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। প্রচেষ্টার ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় চিন্তার পৌনঃপুনিকতা—যাদের অধিকাংশই বৃথা চিন্তা। আমরা প্রায়ই বলি, ভেবে আর কূল পাচ্ছি না। একজায়গাতেই নোঙর করে যদি নৌকা বাইতে থাকি, কূল না পাওয়ারই কথা। ব্যর্থচিন্তার পৌনঃপুনিকতা হতে বাঁচতে হলে চিন্তার পিছনে চলে গিয়ে সাক্ষীর আসন নিতে হবে। দেহচেতনার কোনও-একটা কেন্দ্রে (যার যেমন সুবিধা) চিত্তকে অন্তর্ধারণার দ্বারা নিবদ্ধ করে সেখান থেকে মনের বিক্ষোভকে দেখে যেতে হবে। বহিশ্চেতনার পিছনে অন্তশ্চেতনাকে আবিষ্কার করে যতই তাকে স্পষ্ট করে তুলতে পারব, বাইরের দাপাদাপি ততই নিস্তেজ হয়ে আসবে; এমন-কি কখনও-কখনও রঙ্গমঞ্চটা একেবারে শূন্য হয়ে যাবে। বুদ্ধিকে শুদ্ধ করবার জন্য নিরোধযোগের এই কৌশলটুকু জেনে রাখা এবং তার অনুশীলন করা খুবই ভাল।

বুদ্ধির অশুদ্ধির তৃতীয় কারণ রয়েছে তার নিজের মধ্যেই। অখণ্ড সত্যের একদেশকে আশ্রয় করে বুদ্ধি একাগ্র হতে পারে এবং সেই একদেশী সত্যকেই সত্যের পূর্ণরূপ বলে ধরে নিতে পারে। বিজ্ঞান দর্শন বা অধ্যাত্মভাবনার খুব উঁচু স্তরে উঠেও যে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বা রেষারেষি থেকে যায়, তার কারণ বুদ্ধির এই মতুয়ারি (dogmatism)। এ হল বুদ্ধির মধ্যে সূক্ষ্ম মানসিক সংস্কার এবং পক্ষপাতের ভেজাল। শুদ্ধবুদ্ধি অদ্বৈতদর্শী আর সে-দর্শন আকাশেরই মত উদার সর্বাশ্রয় এবং সর্বাবগাহী।

*

শুদ্ধবুদ্ধিই জ্ঞানের সাধন। কিন্তু জ্ঞান বলতে যদি পরমার্থ-বিজ্ঞানকে বুঝি, তাহলে বলব, সে-বিজ্ঞান বুদ্ধিরও ওপারে। বুদ্ধির ওপারে আছে বোধি। এই বোধি হল পরিব্যাপ্ত আত্মসত্তার অপরোক্ষ অনুভব—নিস্তরঙ্গ আকাশের

জানি, জ্ঞানের চরম সার্থকতা হওয়াতে। এরই মধ্যে রয়েছে তার রূপকৃৎ বীর্য। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির এ-বীর্য নাই বলে আজও তারা জীবনের রূপান্তর ঘটাতে পারল না।

জানা হওয়ায় রূপান্তরিত হয় বোধিতে। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের যে অপরোক্ষতা আছে, বোধিরও তা-ই আছে, অথচ বোধির বিষয় অতীন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য। বোধির প্রত্যক্ষ যোগজ সন্নিকর্ষের (contact) ফল, তার মননও যোগজ প্রজ্ঞানের (spiritual apprehension) ফল। যোগ চেতনার অন্তরাবর্তন। তাতে যেমন অবিশুদ্ধ ক্লিষ্টবৃত্তির নিরোধ হয়, তেমনি শুদ্ধসত্ত্ব অক্লিষ্টবৃত্তিরও উন্মেষ ঘটে। এইগুলিই বোধির বৃত্তি।

*

শুদ্ধ-বুদ্ধি বলতে আমরা লক্ষ্য করছি এই বোধিকে। মনের উজানে যেমন বুদ্ধি, তেমনি বুদ্ধির উজানে রয়েছে বোধি। অথচ বোধি চেতনার সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। খুব নীচের স্তরে সে ধরে সহজ সংস্কারের রূপ, আবার মন-বুদ্ধির মধ্যে দেখা দেয় প্রাতিভসংবিতের ঝলক হয়ে। কিন্তু তার বিশুদ্ধ রূপটি কোথাও পাওয়া যায় না।

বুদ্ধিকে শুদ্ধ করতে হলে প্রথমত সঙ্কল্পকে শুদ্ধ করা দরকার। সঙ্কল্প দু'রকমের—এক কামসঙ্কল্প, আরেক সত্যসংকল্প। কামসঙ্কল্প বস্তুনির্ভর, তার মূলে রয়েছে অভাবের বেদনা। আর সত্যসঙ্কল্প আত্মনির্ভর, তার মূলে আছে শুদ্ধসত্ত্বের উল্লাস। বাস্তবিক মানুষ বস্তুকে চায় না, তাকে উপলক্ষ্য করে চায় ভাবকেই। জ্ঞান প্রেম আনন্দ—এগুলিই তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত। এদের যেমন বস্তুনিরপেক্ষ চিন্ময় রূপ আছে, তেমনি আবার বস্তুনির্ভর স্থূল রূপও আছে। স্বভাবতই সে-রূপ অশুদ্ধ। অশুদ্ধির দুটি হেতু—একটি অহং-চেতনার সঙ্কীর্ণতা, আরেকটি তারই দরুন ক্ষুদ্র বাসনার আবিলতা। আমি ছোট হয়ে আছি বলেই ছোট জিনিসকে চাই, আর যা চাই তাকে বাইরে খুঁজি। এতে বুদ্ধিও আবিল হয়ে ওঠে। তার দেশনা (guidance) হয় এক অন্ধকে নিয়ে আরেক অন্ধের দেশনা। বুদ্ধিকে স্বচ্ছ করতে হলে চেতনাকে অন্তর্মুখ করতে হবে। অন্তর্মুখ চেতনা স্বভাবতই উদার হয়, প্রশান্ত হয়। বাইরের বস্তু বা ঘটনার প্রতি তখন আসে সমত্বের ভাব। সমত্ব হতে প্রাতিভসংবিতের (spiri-

tual intuition) স্ফুরণ হয়। তারই সহযোগী হয়ে সঙ্কল্প তখন হয় দিব্যসঙ্কল্পের সঙ্গে যুক্ত চিৎশক্তির বিচ্ছুরণ। শুদ্ধ-বুদ্ধি তখন সত্যসঙ্কল্পের বাহন।

বুদ্ধির অশুদ্ধির দ্বিতীয় কারণ হল ইন্দ্রিয়মানসের উপর নির্ভরতা। ইন্দ্রিয় বহির্মুখ, তার জ্ঞান অপূর্ণ বিক্ষিপ্ত এবং সঙ্কুল। মন সে-জ্ঞানকে ভিতরে টেনে নিয়ে খানিকটা ছন্দ আনবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। প্রচেষ্টার ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় চিন্তার পৌনঃপুনিকতা—যাদের অধিকাংশই বৃথা চিন্তা। আমরা প্রায়ই বলি, ভেবে আর কূল পাচ্ছি না। একজায়গাতেই নোঙর করে যদি নৌকা বাইতে থাকি, কূল না পাওয়ারই কথা। ব্যর্থচিন্তার পৌনঃ-পুনিকতা হতে বাঁচতে হলে চিন্তার পিছনে চলে গিয়ে সাক্ষীর আসন নিতে হবে। দেহচেতনার কোনও-একটা কেন্দ্রে (যার যেমন সুবিধা) চিত্তকে অন্তর্ধারণার দ্বারা নিবন্ধ করে সেখান থেকে মনের বিক্ষোভকে দেখে যেতে হবে। বহিশ্চেতনার পিছনে অন্তশ্চেতনাকে আবিষ্কার করে যতই তাকে স্পষ্ট করে তুলতে পারব, বাইরের দাপাদাপি ততই নিস্তেজ হয়ে আসবে; এমন-কি কখনও-কখনও রঙ্গমঞ্চটা একেবারে শূন্য হয়ে যাবে। বুদ্ধিকে শুদ্ধ করবার জন্য নিরোধযোগের এই কৌশলটুকু জেনে রাখা এবং তার অনুশীলন করা খুবই ভাল।

বুদ্ধির অশুদ্ধির তৃতীয় কারণ রয়েছে তার নিজের মধ্যেই। অখণ্ড সত্যের একদেশকে আশ্রয় করে বুদ্ধি একাগ্র হতে পারে এবং সেই একদেশী সত্যকেই সত্যের পূর্ণরূপ বলে ধরে নিতে পারে। বিজ্ঞান দর্শন বা অধ্যাত্মভাবনার খুব উঁচু স্তরে উঠেও যে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বা রেষারেষি থেকে যায়, তার কারণ বুদ্ধির এই মতুয়ারি (dogmatism)। এ হল বুদ্ধির মধ্যে সূক্ষ্ম মানসিক সংস্কার এবং পক্ষপাতের ভেজাল। শুদ্ধবুদ্ধি অদ্বৈতদর্শী আর সে-দর্শন আকাশেরই মত উদার সর্বাশ্রয় এবং সর্বাবগাহী।

*

শুদ্ধবুদ্ধিই জ্ঞানের সাধন। কিন্তু জ্ঞান বলতে যদি পরমার্থ-বিজ্ঞানকে বুঝি, তাহলে বলব, সে-বিজ্ঞান বুদ্ধিরও ওপারে। বুদ্ধির ওপারে আছে বোধি। এই বোধি হল পরিব্যাপ্ত আত্মসত্তার অপরোক্ষ অনুভব—নিস্তরঙ্গ আকাশের

আদিগন্ত জুড়ে আলোর পসরার মত। যে-আলোতে সবই ভাসছে, সবই হচ্ছে। এই সম্ভূতির বিজ্ঞান বোধির স্বাভাবিক ধর্ম এবং তা-ই শুদ্ধ-বুদ্ধির প্রয়োজক। বোধি বুদ্ধিকে ব্যাপারিত করবে, কিন্তু তাবলে সে নিজে বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়—এই বিবেকটুকু কিন্তু জাগিয়ে রাখতে হবে।

অর্থাৎ বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য বুদ্ধিরও নির্বাণ প্রয়োজন। গীতায় আছে 'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'—মনকে আত্মায় সংস্থিত করে কিছুই চিন্তা করবে না। এই নিশ্চিন্ততা সহজ কথা নয়। অথচ এটি না হলে বোধ জাগতে পারে না। বোধে চিন্তা নাই, মনঃস্পন্দ নাই, অথচ সেই নৈস্পন্দ্যই চিন্তার উৎস। এ যেন কালো আকাশে আলোর খেলা। আলো সে-কালোকে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু তার দ্বারাই প্রকাশিত হয়।

আলোর উৎস ঐ পরঃকৃষ্ণকে কি করে পাব? পাওয়ার কথা এখানে ওঠেই না—সে কথা উঠতে পারে আলোর বেলায়। কালো আলোর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। জোনাকির আলোকে মাঝে-মাঝে নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকার যেমন নিজেকে জানান দেয়, তেমনি বুদ্ধির নির্বাণে শুদ্ধবোধও নিজেকে জানিয়ে দেয়—আপনা হতে। তখন আর করবার কিছুই থাকে না—এদিক হতে ওদিকে যাবার শক্তি অবশ হয়ে ঢলে পড়ে মহেশ্বরের বুকে। বাউল বলেন, 'আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে।' আর সে-তিমিরে তখন সহস্র নক্ষত্রের স্ফুলিঙ্গ—ডুবছে, ভাসছে, আবার ডুবছে।

৪

একাগ্রতা

জ্ঞানের আরেকটি সাধন হল একাগ্রতা। শুদ্ধি আর একাগ্রতা পরস্পর ওতপ্রোত। চিত্ত শুদ্ধ না হলে একাগ্র হয় না, আবার একাগ্রতা ছাড়া শুদ্ধির বীর্যও প্রকাশ পায় না। শুদ্ধির উপমা দিয়েছি নির্মল নিস্তরঙ্গ উদার আকাশের সঙ্গে। একাগ্রতা যেন সেই আকাশে সূর্যের মত—পরিব্যাপ্ত প্রশান্ত চেতনার শক্তি তার মধ্যে ঘনীভূত হয়েছে। একাগ্রতাকে বলতে পারি শুদ্ধির শক্তিরূপ।

প্রবর্তকসাধকের এক নালিশ, মন কিছুতেই স্থির হয় না। না হওয়াটা বিচিত্র নয়। প্রাকৃত চিত্তের অভিযান চলেছে তম হতে সত্ত্বের দিকে—অন্ধকার হতে আলোর দিকে। মাঝখানে আলো-আঁধারির একটা দ্বন্দ্বসঙ্কুল অবস্থা তো থাকবেই। আঁধারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে আলোর দিকে এগিয়ে যেতে চাই যদি, দ্বন্দ্ব বাড়বে। কিন্তু আলোর প্রসাদ অন্ধকারের উপর নিঃশব্দে নেমে আসছে এই বোধে যদি অতন্দ্র আর উন্মুখ থাকি, তাহলে মাঝখানকার ওই অস্বস্তির পথটা আর এত দুঃখ দেয় না, একাগ্রতা সহজ হয়। তখন তম থেকে সত্ত্বে যাওয়ার জন্য ছট্‌ফট্‌ করি না, সত্ত্বকেই ধারাসারে নামিয়ে আনি তমের মধ্যে।

আলোর পরিব্যাপ্তির মত একাগ্রভাবনারও যে একটা পরিব্যাপ্ত রূপ আছে, এটা সাধারণত আমরা খেয়ালে আনি না। যোগের পরিভাষায় বলতে গেলে 'বৃত্তির' একাগ্রতাকেই আমরা একাগ্রতা বলে মনে করি, 'ভূমির' একাগ্রতাকে হিসাব থেকে বাদ দিই। একটাকিছু নিবিষ্ট চিত্তে ভাবছি—এ হল বৃত্তির একাগ্রতা। আর কিছুই ভাবছি না, সমস্ত প্রযত্ন শিথিল করে চেতনাকে অনন্তে ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে আছি, এটা হল একাগ্রভূমিক চিত্তের রূপ। একটি যেন বিন্দুতে সংহত হওয়া, আরেকটি সিন্ধুতে ছড়িয়ে পড়া। ধৃতি—যা একাগ্রতার প্রাণ—দুয়ের মধ্যেই আছে। একাগ্রভূমিক চিত্তেই বৃত্তির একাগ্রতা সহজ হয়—এটি জেনে রাখা ভাল। আর একাগ্রভূমিকতা বিশেষ করে শুদ্ধির সগোত্র। কেননা নিস্তরঙ্গ ব্যাপ্তি দুয়েরই স্বধর্ম।

একাগ্রতা একটা শক্তি। তার তিনটি প্রয়োগ সম্ভব। প্রথমত একাগ্রতার ফলে

বস্তু তত্ত্ব এবং শক্তির জ্ঞান হতে পারে। দ্বিতীয়ত অন্তর্মুখ চিত্তের একাগ্রতায় বিভূতিলাভ হয়, যোগে যাকে বলে সমাধিজ সিদ্ধি। তৃতীয়ত আত্মচৈতন্যের একাগ্রতায় চেতনার উত্তরায়ণ ও রূপান্তর ঘটতে পারে। বলা বাহুল্য, একাগ্রতার এই প্রয়োগই কাম্য।

*

বৃত্তির একাগ্রতা হতে বৃত্তির নিরোধ এবং তার ফলে পুরুষের কৈবল্য—এই হল রাজযোগের লক্ষ্য। রাজযোগের আবার অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ ভেদ আছে। বহিরঙ্গ সাধনা হল ব্যবহার এবং চিত্তের বিশোধন, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে দেহ-প্রাণ-মনের শক্তিকে অন্তর্মুখ এবং একাগ্র করা। অন্তরঙ্গ সাধনা হল চিত্তকে কোনও-এক-জায়গায় বেঁধে রাখা, তারপর তার মধ্যে ভাবনার একটানা একটা স্রোত বইয়ে দেওয়া এবং অবশেষে তার ফলে আত্মহারা হয়ে যাওয়া। এই শেষের অবস্থাকে বলে সমাধি। তবে রাজযোগে সমাধির যে-অর্থ, তাছাড়া অন্য ব্যাপক অর্থও সম্ভব—যেমন দেখি গীতাতে। সমাপত্তির (absorption) বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়ে চেতনাকে অমনীভাবের নিস্তরঙ্গতায় উত্তীর্ণ করা—এই হল রাজযোগের লক্ষ্য। উপনিষদে এই ভূমিকে বলা হয়েছে প্রণবের তুরীয় পাদ, যা 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্'। এই বিশ্বোত্তীর্ণ (Transcendent) তুরীয়ে পৌঁছনই হল সব জ্ঞানযোগের সাধ্যাবধি।

পূর্ণযোগও এই তুরীয়কে চায়, কিন্তু তার মধ্যে হারিয়ে যেতে চায় না। প্রপঞ্চোপশম বিশ্বোত্তীর্ণ হতেই বিশ্বের উল্লাস, যিনি সব-কিছুকে ছাপিয়ে রয়েছেন তিনিই আবার সব-কিছু হয়েছেন, শিব আর শক্তি অবিনাভূত—এই ভাবনায় পূর্ণযোগ সৎ-চিৎ-আনন্দকে শুধু বিশ্বের ওপারেই নয়, বিশ্বের মধ্যেও অনুভব করতে চায়। পূর্ণযোগে তাই সমাধি আর ব্যুত্থানে কোনও বিরোধ নাই, সমাধির শান্ত প্রজ্ঞা আনন্দ আর বীর্যকে সে ব্যুত্থানেও পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখতে চায়। সুতরাং তার সমাধি জাগ্রতেরও সমাধি, গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধি। পাতঞ্জলোক্ত সমাধির পরিপাকে মরমীয়াদেরও শেষপর্যন্ত এই সমাধিই আসে। তাঁরা বলেন, 'আঁখ ন মুদূঁ কান ন রুধূঁ, সহজ সমাধি ভালা'; বলেন 'যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ'। ইন্দ্রিয়ের পথেই তখন অতীন্দ্রিয়ের বিলাস, সব ছাপিয়ে থেকেও যিনি সব হয়েছেন তাঁকে সবরকমে পাওয়া।

সমাধি তখন আমাদের মধ্যে তাঁর জ্ঞানময় তপঃশক্তির আবেশ। উপনিষদ বলেন, সৃষ্টি তাঁর তপঃশক্তির বিচ্ছুরণ। যেমন সূর্যের আলো আর তাপ। একই সময়ে তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ঘনীভাব আর বিচ্ছুরণ। একই তপঃশক্তিতে ব্রহ্ম আত্মারাম হয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখছেন, আবার কবিক্রতুতে (Knowledge-Will) বা প্রজ্ঞাবীর্যে বিশ্বরূপে নিজেকে বিকীর্ণ করছেন। এই তাঁর ঐশ্বর-যোগের রহস্য। আমাদেরও যোগের লক্ষ্য তাঁর রহস্যে অবগাহন করে তাঁর সঙ্গে ভাবে এবং শক্তিতে এক হওয়া।

*

চিত্তের একাগ্রতা জ্ঞানযোগের মুখ্য সাধন। সাধনা করতে হয় ভাবনাকে (Idea) অবলম্বন করে। কিন্তু আগেই বলেছি, এ-সাধনায় বৃত্তিনিরোধ উপেক্ষিত না হলেও জোর দিতে হবে ভূমির একাগ্রতার উপর। চিত্তের ভূমি হল চেতনার সমগ্র ক্ষেত্র। একাগ্রতার দ্বারা এই সমগ্র ক্ষেত্রকেই উপরপানে তুলে ধরতে হবে—যেমন নাকি হয় আবেশে বা উদ্দীপনায়। ভাবনা বলতে সাধারণত আমরা বুঝি মনের বিশেষ কোনও একটি চিন্তা। চিন্তাকে অবলম্বন করে একাগ্রভাবনা প্রবর্তিত হতে পারে, কিন্তু তাকে পরিব্যাপ্ত বোধে রূপান্তরিত করাই হল সাধনার লক্ষ্য। যেমন 'শিবোহম্' একটি ভাবনা। বস্তুত এটি স্বরূপের ভাবনা। কিন্তু স্বরূপ রূপকে বাদ দিয়ে নয়। অরূপ আর রূপ দুয়ে মিলে তবে স্বরূপ। সুতরাং অরূপের ভাবনা এখানে রূপকেও জারিত করবে। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি—চেতনার এই তিনটি ভূমিকেই শিবত্বের ভাবনার দ্বারা পরিসিক্ত করতে হবে। শিবসূত্রকার তাই বলেন, 'ত্রিষু চতুর্থং তৈলবদাসেচ্যম্'—জলের উপর তেল যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি করে তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়েই চতুর্থ অবস্থাটি ছড়িয়ে পড়বে। ভাবনার ব্যাপ্তি এবং গাঢ়তায় এ সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয় দিয়ে জগৎ দেখছি—এ হল চেতনার জাগ্রৎ-ভূমি। কিন্তু শুধু রূপই দেখছি না, দিব্যভাবনায় আবিষ্ট হয়ে রূপের গভীরে দেখছি ভাবকে। উপনিষদের ভাষায় এই হল স্বপ্নস্থান। আবার তারও গভীরে অনুভব করছি মহাশক্তির প্রজ্ঞানঘন উল্লাসকে, যা ওই ভাবের প্রবর্তক। এই সুষুপ্তি-স্থান। আবার সবাইকে ধরে সবাইকে ছাপিয়ে অনুভব করছি এক অবর্ণ শূন্যতা। এইটি তুরীয়। চারটি দর্শন যে-অনুভবে সমাহৃত হয় তা-ই তুর্যাতীত, তা-ই সম্যক্-জ্ঞান।

এই হল অতিমানসী স্থিতি। এখানে ভাবনা অদ্বয় অথচ সর্বাবগাহী। সর্ববিৎ সর্বকৃৎ পরিব্যাপ্ত বোধ হল তার স্বরূপ। অখণ্ডত্ব তার স্বভাব। অথচ খণ্ড এখানে লোপ পায় না, অনন্ত আকাশের বুকে তারার মত ঝিকিয়ে ওঠে। একেকটি তারার কনীনিকার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেই আকাশকেই। সিন্ধুর প্রতিটি বিন্দু সিন্ধুরই প্রতিরূপ। সবার ভিতর দিয়ে পূর্ণেরই প্রকাশ —শক্তির অখণ্ড অবাধ উল্লসনে।

*

এই অনুভব হল ব্রাহ্মী স্থিতি। আর এখানে পেঁছবার উপায় হল একাগ্রতা।

একাগ্রতার প্রকারভেদ আছে। প্রাকৃত চেতনাতেও একধরনের একাগ্রতা আছে, যা অনিচ্ছাকৃত। যেমন ঘুরে-ঘুরে একটা কথাই মনে পড়া। অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই এটি হল চিন্তার যান্ত্রিক আবর্তন, যার কথা আগেও বলেছি। যোগের পথে একে পুরাপুরি বর্জন করে চলতে হবে। সমনস্ক ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হলেই একাগ্রতা সার্থক হয়। সুতরাং একাগ্রতার সুস্পষ্ট একটা লক্ষ্য থাকা চাই।

যোগে এই লক্ষ্য হল চেতনার আন্তর পরিণাম। সুতরাং প্রথম থেকেই চেতনার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে বস্তু থেকে ভাবের দিকে। যেমন ধরা যাক ইষ্টের ভাবনা। প্রথমটায় ভাবনা রূপকে আশ্রয় করে প্রবর্তিত হবে। কিন্তু বস্তুর রূপ একটা ভাবের দ্যোতক। রূপের ভিতর দিয়ে আমি একটা শাশ্বত ভাবকেই চাইছি। শুধু রূপস্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার মধ্যে একটা আয়াস আছে। কিন্তু রূপ যখন ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন অনুধ্যান সহজ হয়, কেননা বস্তুকে ভাবে পাওয়ার অর্থ হল তাকে আত্মবোধের সঙ্গে জড়িয়ে পাওয়া।

চেতনার অন্তরাবৃত্তির দ্বারা রূপ থেকে ভাবে যাওয়া হল একাগ্রতার প্রথম ধাপ। তার পরের ধাপ ভাবকে বিশুদ্ধ ভাবনায় নিয়ে যাওয়া। ইষ্টভাবনার অর্থ তখন সন্মাত্রের বোধ। ভাব সেই সত্তারই বিভূতি। ইষ্টের অস্তিই তাঁর ভাতি প্রীতি এবং শক্তি। তাঁর অস্তিত্বেই আমার অস্তিত্ব এবং সব-কিছু সেই অস্তিত্বের বিচ্ছুরণ। এই হল একাগ্রতার দ্বিতীয় ধাপ।

এই সত্তার বোধে চিত্ত প্রশান্ত হয়ে যায়। স্বভাবতই প্রশান্তি আকাশের মত বিবিক্ত এবং ব্যাপ্তিধর্মা। বিবিক্ত চেতনা বিশ্বকে ছাপিয়ে থাকে—মহাশূন্যে।

সে-শূন্যতা নির্বর্ণ, কিন্তু নাস্তি নয় নিঃশক্তিক নয়। বরং সে-ই অস্তিত্বের শক্তিগর্ভ পরম চেতনা। একাগ্রতার এই হল পরমভূমি।

একে যদি বলি ব্রহ্মের একাগ্রতা বা তাঁর লোকোত্তর তপঃসমাধি এবং আমার মধ্যে তাকে আবিষ্ট বলে অনুভব করি, তাহলে স্বাতন্ত্র্যের (freedom) আকারে একাগ্রতার শক্তিরূপ আমাদের মধ্যে ফুটে ওঠে। তখন দেখি, যিনি লোকোত্তর তিনিই সহজের ছন্দে লোক-লীলায় উল্লসিত, আমার মনে প্রাণে দেহে চেতনার সর্বস্তরে তাঁর চিন্ময় আনন্দের হিল্লোল।

সবই তিনি—এই হল সমাহিতচেতনার পরম অনুভব।

৫

বৈরাগ্য

সত্যের সঙ্গে মিথ্যা জড়িয়ে আছে জীবনে। সত্যার্থীকে এই মিথ্যার জাল হতে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। সত্যের অনুভব আকাশবৎ—তেমনি পরিব্যাপ্ত প্রশান্ত প্রোজ্জ্বল এবং প্রসন্ন, সবাইকে ছাপিয়ে থেকেও সবাইকে জড়িয়ে আছে। এই অনুভবকে যা আচ্ছন্ন ক্ষুব্ধ বা পীড়িত করে, তা-ই মিথ্যা। মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করবার শক্তি আসে বৈরাগ্য থেকে, যেমন বুদ্ধির স্বচ্ছতা এবং চেতনার একাগ্রতা থেকে অনপেক্ষ সত্যের অনুভব আমাদের মধ্যে জোর ধরে। বৈরাগ্য পূর্ণসিদ্ধির অপরিহার্য সাধন।

কিন্তু বৈরাগ্য বলতে কি বুঝব? তার অধিকার কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবে? বৈরাগ্য কি শুধু সাধন (means), না তা সাধ্যও (end)?

যেসমস্ত সাধনায় নৈতিবাদ প্রধান, তাদের মতে বৈরাগ্যই হল সাধ্যাবধি। তারা বলে, জগৎ আর জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করতে পারলে পরমসত্যের মুখামুখি হওয়া যায় না। জীবনে পেয়েছি কি?—শুধু দুঃখ, শুধু ঝামেলা, শুধু পরাভবের গ্লানি। নির্ভেজালসুখ কোথাও পাইনি। সংসারের কোনও সুখই তো শাশ্বত বা পরম নয়। যে মূঢ় সে তা নিয়ে ভুলে থাকতে পারে, কিন্তু বিবেকী পারে না। 'সর্বং দুঃখং বিবেকিনঃ'—বিবেকীর কাছে কৈবল্যের নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি ছাড়া আর সবই দুঃখময়। যে-আকাশ পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে, তার বায়ুমণ্ডল দূষিত; অন্তরিক্ষের আকাশে মেঘ আর ঝড়ের হানাহানি; দ্যুলোকের আকাশেও এই আলো এই আঁধার। অতএব সব ছাড়িয়ে চলে যাও অনস্তিত্ববৎ বিশুদ্ধ অস্তিত্বের নির্বর্ণ আকাশে। এই পরিনির্বাণই পরম সত্য। এই হল চেতনার সাধ্যাবধি। সুতরাং গুণবৈতৃষ্ণ্যরূপ পরবৈরাগ্যই হল বিবেকীর সাধন এবং সাধ্য দুই-ই।

*

কিন্তু পূর্ণযোগীর কাছে বৈরাগ্য অধ্যাত্মসিদ্ধির সাধনমাত্র, সাধ্যাবধি নয়। অপরা-প্রকৃতির সম্মোহ আর বিকারের ঘোর কাটিয়ে ওঠবার জন্য বৈরাগ্যের

দরকার, একথা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু যে-বৈরাগ্য জীবনকে আর জগৎকে নস্যাৎ করে দেওয়াকেই পরম পুরুষার্থ বলে মনে করি, তাকে তিনি মানতে পারেন না। দুঃখের চেতনা আছে এবং তা হেয়—একথা সত্য। কিন্তু চেতনাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে দুঃখ ঘোচাতে হবে, সমস্যার এই সর্বনাশা সমাধানে তাঁর সায় নাই। সংসারে এলেই দুঃখ পেতে হবে, অতএব আর যেন এ-সংসারে না আসতে হয়—এ-বুদ্ধি কাপুরুষের। যে নির্বীর্য, দুঃখ তারই চেতনাকে অবসন্ন করে। বীরের কাছে দুঃখ অপরা-প্রকৃতির একটা মালসাটের মত, তা তার চেতনাকে উদ্বুদ্ধই করে। এইখানে দুঃখের সার্থকতা। উদ্বুদ্ধ চেতনা দুঃখকে শুধু পরাভূতই করে না, তাকে আনন্দে রূপান্তরিতও করতে পারে।

তাছাড়া সম্যক্-সম্বুদ্ধের মধ্যে দুঃখ ধরে করুণার রূপ। অধ্যাত্মসিদ্ধির পরম তাৎপর্য যদি হয় চেতনার বিস্ফারণ, তাহলে আমার সম্বুদ্ধ চেতনা হতে জগৎকে আমি কিছুতেই ছেঁটে ফেলতে পারি না। জগতের সুখ-দুঃখ তখন আমারই সুখ-দুঃখ। শুধু এইটুকু তফাত, জগৎ যেখানে আচ্ছন্ন আমি সেখানে জাগ্রত, জগৎ যেখানে অবশ আমি সেখানে স্ববশ। আমি আত্মবীর্যের দ্বারা দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠেছি 'জগদুদ্দিধীর্ষুঃ'—জগৎকেও কেই ঊর্ধ্বভূমিতে উঠিয়ে নেবার জন্য। সুতরাং আত্মমুক্তিতেই আমার সাধনা শেষ হয়ে যায় না, তারও পরে থাকে বিশ্বমুক্তির দায়। আর সে-দায়কে আমি মাথায় তুলে নিই তাঁর দিব্যসঙ্কল্পের বাহন হয়ে। বিশ্বপ্রাণের মর্মে রয়েছে সে-সঙ্কল্পের প্রেষণা, জড়ত্বকে তা বিচিত্র উপায়ে রূপান্তরিত করে চলেছে চিদ্‌বীর্যে। বিশ্বেশ্বরের এই 'জ্ঞানময়ং তপঃ'র আমিও শরিক। এই ভাবনা হতেই জগতের দুঃখবীজ সম্যক্-সম্বুদ্ধের চেতনায় ধরে অমোঘবীর্য মহাকরুণার রূপ।

তারপর সংসারের গতি শুধু চক্রাবর্তন নয়, বস্তুত তা কম্বুরেখ (spiral)। চেতনার ক্রমিক উন্মেষ যেমন ব্যষ্টির জীবনে হচ্ছে, তেমনি সমষ্টির জীবনেও হচ্ছে। সুতরাং সংসার শুধু অবিদ্যা আর দুঃখের ক্ষেত্র এবং চিরকাল তা-ই সে ছিল, ভবিষ্যতেও তা-ই থাকবে—একথা অশ্রদ্ধেয়। অচিতির ভিত্তি হতে পরমচেতনার ক্রমিক প্রকাশ—এই হল সংসার গতির আসল তাৎপর্য। দুঃখ সে-প্রকাশের একটা অশাশ্বত মধ্যপর্ব মাত্র। দুঃখ বস্তুত চেতনার তপোবীর্যের একটা তির্যকরূপ। তার লক্ষ্য আনন্দে উত্তরণ। সমস্ত জগৎ চলেছে এক আনন্দচিন্ময় ভূমির দিকে। আমার আত্মচৈতন্যের আকূতি হতেই তা টের পাই। সুতরাং আমার সাধনা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত। এইজন্যই শুধু আমাকে

পাওয়া নয়, আমার মধ্যে সবাইকে পেয়ে তবে আমার পাওয়ার সার্থকতা।

সুতরাং এমনি করে পাওয়ার জন্যই পূর্ণযোগীর বৈরাগ্যের সাধনা, শুধু বৈরাগ্যের জন্যই বৈরাগ্যের সাধনা নয়। অথচ তাঁর বৈরাগ্য নিষ্পক্ষ পূর্ণবৈরাগ্য। তার মধ্যে যেমন সংসারে আসক্তি নাই, তেমনি নির্বাণেও আসক্তি নাই। ভ… আর নির্বাণ তাঁর কাছে এক।

*

এতেই বোঝা যায়, বৈরাগ্য শুধু কৃচ্ছ্রতা বা নিষ্কিঞ্চনতার উপাসনা নয়। তার সত্যকার স্বরূপ হল অনাসক্তি। অনাসক্তি অন্তরের ধর্ম। প্রাকৃত চেতনায় তিনটি গ্রন্থি আছে—বাসনা সংস্কার আর অহন্তার। আসক্তির মূল এদের মধ্যে। বৈরাগ্যের ভাবনার দ্বারা আসক্তিকে উৎখাত করতে হবে।

বাসনা প্রাণের ধর্ম। প্রাণ চায় ভোগ আর ঐশ্বর্য। ভোগে রসচেতনার তর্পণ হয়, আর ঐশ্বর্যে শক্তিচেতনার। রস আর শক্তি হেয় নয়, বস্তুর প্রপঞ্চোল্লাস রস আর শক্তিরই খেলা। কিন্তু প্রাকৃত চেতনায় আমরা তাদের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে পাই না। অবিশুদ্ধির দুটি কারণ—একটি চিত্তের বস্তুনির্ভরতা, আরেকটি অবিবেক। আমরা সাধারণত মনে করি, রস আর শক্তির যোগান আসে বাইরে থেকে; আর তাইতে বস্তুর সঙ্গে জড়িয়ে যাই। কিন্তু রস আর শক্তি আমার অনুভবে। অনুভব বস্তুকে উপলক্ষ্য করে দেখা দিলেও তা বস্তুনিরপেক্ষ হতে পারে। অনুভবের জগৎ ভাবের জগৎ। আর ভাব বস্তুর অতিরেক। বস্তুকে ছাপিয়ে ভাবে যখন প্রতিষ্ঠিত হই, তখন বস্তু আমার বশে আসে। ভোগ আর ঐশ্বর্য তখন অবশ নয়, স্ববশ। যিনি উপদ্রষ্টা তিনিই যথার্থ 'ভোক্তা মহেশ্বরঃ'। তাঁর ভোগের আনন্দ উপচে পড়ে আত্মশক্তির উল্লাস হতে। এই ভোগ আর ঐশ্বর্য অকামহত স্বভাবের স্ফুরণ।

প্রাকৃত চেতনার আরেকটি গ্রন্থি হল সংস্কারের অন্ধতা। এটি মনের ধর্ম। মনের মতুয়ারি (dogmatism) জ্ঞানযোগের একটা মস্ত বাধা। আমি যা বুঝেছি তার বাইরে আর-কিছুই বুঝতে চাইব না—এর নাম অবিদ্যা। আর বিদ্যার মুখোস প'রে আসে বলে এ-অবিদ্যা আরও সর্বনাশা। বিদ্যা আলোর মত। তার মধ্যে সঙ্কোচ নাই, একদেশিতা নাই। সব রংই তার রং, অথচ নিজে সে রংছুট। সংস্কারমুক্ত মনও তা-ই। যত মত যত পথ সবাইকে …

আপন করে নেয়, কিন্তু কোনটাতেই বাঁধা পড়ে না।

প্রাণ আর মনের অশুদ্ধির কারণ রয়েছে আরও গভীরে—আমাদের অহন্তার মধ্যে। অহন্তাই হল চেতনার আসল গ্রন্থি। একদিকে অহং, আরেকদিকে আত্মা—বলা যেতে পারে চেতনার যেন কুমেরু আর সুমেরু। একটিকে চিনি, আরেকটিকে চিনি না। চেনার জগতে আছে মূঢ়তা, ক্ষোভ আর দ্বন্দ্ব, ক্বচিৎ আলো আনন্দ আর শক্তির ঝলক। কিন্তু সবপেয়েছির দেশ সে নয়। সে-দেশের জন্য মন কাঁদে, কিন্তু কোথায় সে আছে তা জানি না।

অথচ আছে এই প্রাকৃত চেতনারই উল্টা পিঠে। চেতনার প্রবৃত্তিতে অহন্তা, নিবৃত্তিতে আত্মচৈতন্য। হাঁসফাঁস করি, বাইরের দিকে ছুটে যাই প্রকৃতির তাড়নায়—এর মূলে আছে অহং। এই অহংই আবার ভিতরের দিকে গুটিয়ে গিয়ে নিথর হয়ে যেতে পারে। তখন ফোটে আত্মচৈতন্য—ছায়াছবির পিছনে আলোর পরদার মত। চুপ থেকে দেখি, ওই আলোই বাইরে ঠিকরে পড়ছে বর্ণের বৈচিত্র্যে। অহংএর প্রবৃত্তির মূলে আত্মচৈতন্যেরই প্রেষণা। অথচ নিবৃত্তির পথ না ধরলে অহং তার সাক্ষাৎ পায় না।

আত্মচৈতন্যের আবেশে অহং রূপান্তরিত হয় চৈত্যসত্ত্বে। তখন আর তার মধ্যে প্রমাদ দুঃখ বা অশক্তির বেদনা থাকে না। চৈত্যসত্ত্ব অন্তর্যামীর প্রতিভূ, চলে তাঁরই প্রশাসনে। তাই স্বভাবতই সে বস্তুনির্ভর নয়, ভাবনির্ভর। বস্তুর উপর যে নির্ভর করে, তার বন্ধন পদে-পদে। বন্ধনের বেদনা আছে, তবুও তাকে সে ছাড়তে পারে না। এরই নাম আসক্তি। বস্তুর মূলে ভাবকে যে আবিষ্কার করেছে, সে আপনাতে আপনি থাকতে পারে। তার আসক্তি নাই, বন্ধন নাই। সে স্ব-তন্ত্র। স্বাতন্ত্র্যেই বৈরাগ্যের পর্যবসান।

*

আসক্তির মূলে এই-যে অহন্তা, কত সূক্ষ্ম ছলনাই যে তার আছে তা বলবার নয়। যতক্ষণ 'আমি আমি' করছি, ততক্ষণই বিষয়ে জড়িয়ে যাচ্ছি—জড়িয়ে যাচ্ছি পাপে-পুণ্যে, সুখে-দুঃখে, ভালো-মন্দের হাজার ঝামেলায়। গীতায় দেখি, অর্জুন একবার বলছেন, ওরা অন্যায় করছে, ওদের আমি মারব; আবার বলছেন, না ওরাই আমায় মারুক, আমি সব ছেড়ে চলে যাব। দুটাই প্রাকৃত বুদ্ধির কথা। একটার মূলে আছে রাজসিক ক্ষোভ, আরেকটার মূলে

তামসিক অবসাদ। শেষেরটাই মারাত্মক, অহন্তা সেখানে এসেছে নৈষ্কর্ম্যের মুখোস প'রে। এই তামসিকতাকে শ্রীকৃষ্ণ তীব্র আঘাত করলেন। বললেন, 'এ তোমার ক্লৈব্য, তোমার হৃদয়দৌর্বল্য। মুখেই তুমি প্রজ্ঞার বুলি আওড়াচ্ছ, কিন্তু প্রজ্ঞার লোকোত্তর প্রশান্তি তোমার মধ্যে কোথায়? নিজের ছোট্ট আমিটিকে বসিয়েছ বিশ্বের কেন্দ্রে, আর সেইখান থেকে বিচার করছ, বলছ এ করব আর এ করব না। যে লোকোত্তর অবিনাশী সত্তার মধ্যে এ-জগৎ, তাকে দেখতে পেতে যদি, তাহলে এ-কার্পণ্য ধর্মাধর্ম আর কর্ম-নৈষ্কর্ম্যের এ-দ্বন্দ্ব তোমার থাকত না।'

এই হল আসল কথা। লোকোত্তরের মধ্যে লোককে, অনন্তের মধ্যে সান্তকে, আত্মার মধ্যে অহংকে রেখে জগৎকে দেখ্‌তে শিখতে হবে। তাহলে দৃষ্টির সত্য আর সৃষ্টির সত্য এক হবে। 'আমি' কি নাই? আছে। কিন্তু আছে তাঁর হয়ে। তিনি প্রয়োজক, আমি নিমিত্ত—এই হল সত্যের সম্বন্ধ। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরছে—তা নয়; সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী ঘুরছে। এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই বৈরাগ্য সহজ হয়, ক্ষেমঙ্কর হয়।

গীতার শিক্ষা, ত্যাগ বাইরে নয়, অন্তরে। বিষয় ছাড়লে বা কর্ম ছাড়লে কিছু হবে না, যদি আমার আমিটিকে না ছাড়তে পারি। আবার আমি যেখানে অনাসক্ত, সেখানে কর্ম বা ভোগ কিছুই আমায় বাঁধতে পারে না। বন্ধন কাকে বলি? চেতনার সঙ্কোচকে। আমার এই ক্ষুদ্র আমিটিকে নিয়ে পড়ে থাকার চাইতে বিড়ম্বনা আর নাই, যদিও এটা বুঝতে সময় লাগে। চেতনার বিস্ফারণে আমিত্বের প্রসার ঘটে, এই আত্মাই হয় ব্রহ্ম। তখন দেখি, এক আমিই আছে, সে-আমি তিনি। বিশ্বব্যাপী প্রজ্বলন্ত বৈশ্বানরের এক আমি, আর সব আমি তারই স্ফুলিঙ্গ। সে-আমি বিশ্বের ভূতে-ভূতে, সে-আমি বিশ্বের অতীতে, সে-আমি আমার এই আমিতে। সে-আমি সব-কিছুর দ্রষ্টা ভোক্তা এবং কর্তা, এ-আমি শুধু চেয়ে আছে সে-আমির পানে। চেয়ে থাকতে-থাকতে আবার চোখ বুজছে, অনুভব করছে ওই-দৃষ্টির আলোতেই এ-দৃষ্টি ফুটছে ফুলের মত। সিন্ধুর একটি বিন্দুতে সমগ্র সিন্ধু কল্লোলিত হয়ে ওঠে তখন। এ কার অনুভব, কে বলবে?

এমনি করে তাঁর জ্ঞানে-জ্ঞান, তা-ই হল সম্যক্‌-জ্ঞান।

*

কৃচ্ছ্রতা আত্মনিগ্রহ বা বর্জনবুদ্ধির উপাসক যে-বৈরাগ্য, তা হ'ল কাঁচা বৈরাগ্য। অবশ্য সাধনার প্রথম অবস্থায় এরও প্রয়োজন আছে। বারবার বাইরে ছুটে যাওয়া, বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া—এগুলি মনের কতদিনের অভ্যাস। এ-অভ্যাসের মোড় ফেরাতে প্রথমটায় মনের উপর জোর করতে হয় বই কি। তাছাড়া আছে ভাবের ঘরে চুরি হবার ভয়। ভাবছি, কোথাও আমার আসক্তি নাই। কিন্তু চেতনার গভীরে রসতৃষ্ণা লুকিয়ে আছে কি না কি করে বলব? সংস্কার একদিনে যায় না। চিত্তের অতলে তার শিকড় মেলা রয়েছে। তাকে একেবারে উপড়ে ফেলা সহজ নয়। নিষ্কিঞ্চন শূন্যতায় স্থিতি যতক্ষণ না সম্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ বলতে পারব না যে কোথাও আমার আসক্তি নাই। তাই নিজেকে যাচাই করবার জন্যই কৃচ্ছ্রতারও প্রয়োজন হয় বই কি।

কিন্তু কৃচ্ছ্রতাই শেষ নয়, কেননা সম্যক্‌সিদ্ধি তো একটা নেতিবাচক সংজ্ঞা নয়। অল্পকে ছাড়ছি ভূমাকে পাব বলে। আবার সে-ভূমা অল্পেরই সার সত্য। চিনির রস যে পেয়েছে, তার আর চিটাতে মন মজে না। এই হলেই তবে বৈরাগ্য পাকা হতে পারে। তার আসল সঙ্কেত হচ্ছে অন্তর্মুখীনতার দিকে। বিষয়ভোগে রস আছে অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু রসবোধ তো চেতনারই ধর্ম। বিষয়কে ছেড়েও চেতনায় তার স্থিতি সম্ভব। এই স্থিতিকালটুকুকে বাড়াতে পারলে ক্রমে নির্বিষয় রসাস্বাদও সম্ভব হয়। এই হল আত্মস্থিতির আনন্দ, বৈরাগ্য-সাধনারও সিদ্ধি। গীতার ভাষায়, ইন্দ্রিয় তখন আত্মবশ হয়ে বিষয়ে বিচরণ করছে, তার রাগও নাই দ্বেষও নাই; আছে শুধু নিজেকে বৃহতের অধীন করে দেওয়ার প্রসন্নতা।

যেমন ব্যাবহারিক প্রসন্নতা, তেমনি আবার পারমার্থিক প্রসন্নতাও আছে। বৈরাগ্যসিদ্ধির সে হল আরেক দিক। বৈদান্তিক বলেন 'ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগের' কথা। অর্থাৎ ভোগতৃষ্ণা ছাড়তে হবে যেমন এখানে, তেমনি ওখানেও। বাইরের বিষয়কে ভিতরে টেনে এনে সূক্ষ্মভাবে ভোগ করা—এও একধরনের বিষয়তৃষ্ণার তর্পণ। রসের সাধনা যারা করে, এই তাদের এক বিপত্তি। উপনিষদ বলছেন, যেমন বিত্তৈষণা ছাড়তে হবে, তেমনি ছাড়তে হবে লোকৈষণাও। লোক হল চেতনার যে-কোনও অপ্রাকৃত ভূমি। তার প্রলোভনও সাধককে ছাড়তে হবে। পথের শেষে না পৌঁছন পর্যন্ত কোথাও খুঁটি গেড়ে বসলে তার চলবে না। আর যেখানে শেষ, সেখানে সব-কিছুরই শেষ—যেমন আঁধারের, তেমনি আলোরও। 'ন দিবা ন রাত্রিঃ, ন সন্ন চাসৎ'—সেখানে দিনও নাই

রাতও নাই, সৎও নাই অসৎও নাই। অথচ সেই নিরালোকের আলোতেই সব-কিছু ভাসছে। ওই অগমলোকে না পৌঁছন পর্যন্ত সহজ প্রসন্নতায় সব-কিছুকে গ্রহণ করবার অধিকার জন্মায় না। 'সব ছোড়ে সব পাওএ।' যেমন তিনি। সবাইকে ছাপিয়ে আবার সবাইকে জড়িয়ে আছেন। ছাপিয়ে থাকার দিক থেকে বৈরাগ্য, আবার জড়িয়ে থাকার দিক থেকে ঐশ্বর্য। দুয়ে তো কোনও বিরোধ নাই।

৬

সাধনসমন্বয়

একাগ্রতা আর বৈরাগ্যের কথা সাধারণভাবে আলোচিত হল। কর্ম জ্ঞান বা ভক্তি, সব পথেই যে এ-দুটি অপরিহার্য, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখতে হবে, জ্ঞানের সাধনায় এদের বিশিষ্ট প্রয়োগ হবে কেমন করে।

'আত্মানং বিদ্ধি'—আত্মাকে জান, এই হল জ্ঞানসাধনার গোড়ার কথা। সংসারে জড়িয়ে থেকে আমার যে-পরিচয়, তা কখনও সত্য নয়, মহৎ নয়। আমি এখন আচ্ছন্ন আর্ত অশক্ত; অথবা আমি মদান্ধ মূঢ়তায় অসম্যক্-দর্শী। আকাশের মত প্রশান্ত প্রভাস্বর প্রসন্ন উদার চেতনা আমার নাই। তাই বাইরে-ভিতরে আমার এত বিক্ষোভ, এত দ্বন্দ্ব। কি করে দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে গিয়ে আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, সেই হল আমার জীবনের প্রধান সমস্যা।

সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজা চলে। কিন্তু সে-পথ আমরা ধরতে চাই না। বনে গেলেও মন আমার সঙ্গে যাবে, তার মূঢ়তা আর বৈকল্যকে ঠেকাব কি করে? সুতরাং বোঝাপড়া করতে হবে আগে নিজের সঙ্গেই, সংসারের সঙ্গে নয়। আমাকে যে ক্ষুব্ধ করে, তার বিরুদ্ধে আমার নালিশ নাই। নালিশ আমার নিজেরই বিরুদ্ধে : আমি কেন ক্ষুব্ধ হই? ক্ষোভের কারণ হ'ল চেতনার সঙ্কোচ। একটা ডোবাতে ঢিল ছুঁড়লে তার জলে তোলপাড় শুরু হয়, আর মহাসমুদ্রে জাহাজডুবি হলেও কিছু হয় না। এই সমুদ্র-চেতনা আমারও গভীরে রয়েছে। কিন্তু দৃষ্টি বহির্মুখ বলে আমি তার অনুভব পাই না। আমার অষ্টপ্রহরের কারবার হল বাইরের জগৎটা নিয়ে, আর আমার সীমিত দেহ-প্রাণ-মন দিয়ে। বাইরের অভিঘাতে তাদের মধ্যে যে-তরঙ্গ উঠছে, তা-ই হল আমার প্রাকৃত চেতনার স্বরূপ। প্রায়ই তার পরিণাম উত্তেজনা আর অবসাদ—ক্বচিৎ-বা উদ্দীপনা। কিন্তু কোনটাই একটা বড়-কিছু নয়।

যা বৃহৎ, তা হল ওই আকাশ। এই দেহ-প্রাণ-মনকে ছাপিয়ে। তাহলে এরা কি মিথ্যা? মিথ্যা নয়, কিন্তু ওই আকাশকে আশ্রয় করেই এদের পরম সত্যতা। দেহবোধে চেতনা তীক্ষ্ণ হয়, কিন্তু হারায় তার বৈপুল্য, তার সাবলীলতা। উত্তাল প্রাণের উত্তেজনা আছে, কিন্তু ভোরের আলোর মত ছড়িয়ে-পড়ে-উপচে-

ওঠা স্বাতন্ত্র্য তার মধ্যে কই? মন ভাবনার জাল বুনে চলেছে, নিজের জালে নিজেই বন্দী হয়ে আছে গুটিপোকার মত, প্রজাপতির পাখা তার কই? দেহ-প্রাণ-মন তাই বন্ধন, যতক্ষণ ওই আকাশকে না পাচ্ছি।

দেহ-প্রাণ-মন নিয়েই প্রাকৃত জীবনের শুরু। তিনটিতে ওতপ্রোত, চেতনা তিনটির মধ্যে অনুস্যূত হয়ে চলেছে। আবার অধিকারভেদে একেকটার উপর ঝোঁক পড়ছে বেশী। জীবনের বনিয়াদ হল 'আমি দেহ'—এই বোধ। কিন্তু এ দর্শনকে যদি একান্ত করে তুলি, তাহলে মনে হবে, যতটুকু দেহ ততটুকুই আমি, যতক্ষণ দেহ ততক্ষণই আমি, দেশ বা কালের ব্যাপ্তিতে অসীমের চেতনা আমার কাছে একটা আলেয়া। অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টি দেহকে ছাপিয়ে আর দূরে যেতে চায় না। এই হল আধ্যাত্মিক জড়বাদ বা দেহাত্মবাদ। আত্মচৈতন্যের এ হল শৈশব।

চেতনা আরেকটু স্বচ্ছ হলে তার মধ্যে প্রাণের ছোঁয়া লাগে। দেহধর্মের গতানুগতিকতায় মানুষ আর তখন বাঁধা থাকে না, নিত্য-নতুন রূপায়ণের উল্লাস জাগে তার মধ্যে। নিজেকে সে অনুভব করে প্রাণ বলে। প্রাণের অনুভব যদি দেহকে ছাপিয়ে না উঠতে পারে, তাহলে মনে হয়, যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণই প্রাণের উল্লাস, মরলেই সব ফুরিয়ে গেল। আর দৃষ্টি একটু অন্তর্মুখ হলে সে দেখে প্রাণের এক অবিচ্ছেদ প্রবাহে জন্মজন্মান্তর ধরে একই জীবসত্ত্বের আবর্তন। এই হল প্রাণাত্মবাদ। তাকে বলতে পারি আত্মচৈতন্যের কৈশোর।

চেতনা আরও স্বচ্ছ হলে প্রাণের পিছনে ফোটে মনের আলো। মনকেই তখন অনুভব হয় আত্মভাবের বনিয়াদ বলে। প্রাণাত্মবাদের মত মন-আত্মভাবনারও দুটি স্তর আছে। এক স্তরে মন জড়িয়ে থাকে দেহের সঙ্গে, দেহ পড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারও ভাবনা বেদনার অবসান হয়। আরেক স্তরে মনশ্চেতনার অবিচ্ছেদ প্রবাহে আবার চলে জন্মজন্মান্তরের আবর্তন। তাছাড়া মন-আত্মবাদের আরও-একটা ধারা আছে। যাঁরা মনকেই চেতনার সর্বস্ব বলে জানেন, তাঁরা অমনীভাব বা মনোলয়কে ভাবেন পরম পুরুষার্থ। এদেশের নিরোধবাদী দার্শনিকদের মধ্যে এ-ভাবনা খুবই প্রবল। মন-আত্মবাদকে বলতে পারি আত্মচৈতন্যের তারুণ্য।

দেহ-প্রাণ-মন মিথ্যা নয়, অতত্ত্ব নয়। তাদের ব্যক্তিগত বা বিশ্বগত দুটি রূপ আছে। দুটি রূপই সত্য। দেহ-প্রাণ-মনের চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষ ঘটছে এ-ও সত্য। কিন্তু আমাকে যদি দেহ-প্রাণ-মনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে ভাবি

এর বাইরে আর কিছুই নাই, তাহলে সেটা ঘোর মিথ্যা। সাংখ্যের ভাষায় এই মিথ্যাভাবনাকে বলে অবিবেক (identification)। অবিবেক হল অবিদ্যা, নিজেকে পুরাপুরি না জানা। আমি শুধু দেহ প্রাণ বা মন নই, আমি তারও অতীত কিছু, আমি চৈতন্য স্বরূপ, আমি আত্মস্বরূপ, দেহ-প্রাণ-মন সেই চৈতন্যেরই বিভূতি—এই হল বিদ্যা, নিজেকে সত্য করে জানা। দেহ-প্রাণ-মনের ভিতর দিয়ে চেতনা প্রকাশ পাচ্ছে গুণীভূত হয়ে—দেহচেতনায় তমোগুণ, প্রাণচেতনায় রজোগুণ, মনশ্চেতনায় সত্ত্বগুণ। কিন্তু প্রাকৃত দশায় সব গুণই ব্যামিশ্র। মনের সত্ত্বগুণের মধ্যেও তামসিক অবসাদ আর রাজসিক উত্তেজনার ভেজাল আছে। তাই সাধনার প্রথম লক্ষ্য হবে মনকে শুদ্ধসত্ত্ব করা। তখন আর তাকে মন না বলে উপনিষদের ভাষায় বলতে পারি বিজ্ঞান। আত্মচৈতন্যের বোধ হয় এই বিজ্ঞানে।

*

বিষয়কে জানছি, চলতি কথায় তাকে বলে জ্ঞান; আর যে জানছে তাকে জানছি, তার নাম হল বিজ্ঞান। সুতরাং বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল অন্তরাবৃত্ত হয়ে বিশুদ্ধ আত্মবোধে স্থিত হওয়া। এ-বোধ শুদ্ধ অস্তিত্বের বোধ, আলোর মতই রংছুট। তার দিকে চিত্তকে একাগ্র করতে গিয়ে সব শূন্য হয়ে যায়, চেতনা বিষয়ের দিকে প্রবর্তিত না হয়ে পরাবর্তিত হয় নিজের উপরে। তখন বাইরে-ভিতরে কোথাও কিছু থাকে না।

এই অবস্থায় পৌঁছবার জন্য সাধারণত দুটি উপায় অবলম্বন করা হয়—একটি নেতিভাবনা, আরেকটি নিরোধের সাধনা। নেতিভাবনা হল বিচারের পথ। আত্মবোধ যা-কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে মলিন হচ্ছে, তা থেকে তাকে তফাত করতে হবে। তার প্রথম ধাপ হল দেহ থেকে তাকে পৃথক করা, অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ভাবনা করা—'আমি দেহ নই'। এমনি করে ভাবনাকে ক্রমসূক্ষ্ম এবং অন্তর্মুখ করে অনুভব করা—'আমি প্রাণ নই, ইন্দ্রিয় নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমি নিজবোধরূপ শুদ্ধ সন্মাত্র।' এমনি করে জগৎ হতে পরাবৃত্ত চেতনাকে বিশুদ্ধ সত্তায় পর্যবসিত করে একেবারে ফাঁকা হয়ে যেতে হবে। নিরোধের সাধনা হল চিত্তকে প্রথম থেকেই সন্মাত্র অথবা শূন্যতার ভাবনায় একান্তভাবে লগ্ন করা, নিস্পন্দ ব্রহ্মাকার বৃত্তি ছাড়া আর কোনও বৃত্তিই তার মধ্যে উঠতে না দেওয়া। চিত্তের প্রলয় হলে জগতেরও প্রলয় হবে, লোকোত্তরের অবর্ণ অনুভব ছাড়া আর-কিছুই তখন থাকবে না।

নেতিভাবনায় বা নিরোধসাধনায় বিশ্বের প্রলয় হয়—ব্যক্তির কাছে। যেমন হয় আমাদের ঘুমে। এ-অবস্থায় যদি দেহ পড়ে যায়, তাহলে আত্মার ব্রহ্মনির্বাণ ঘটে, 'জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিলায় জলে'। কিন্তু দেহপাতের পূর্বে এ-অবস্থা থেকে ব্যুত্থান হওয়া খুবই সম্ভব। তখন নিরোধসংস্কার প্রবল হওয়ার দরুন জগৎকে ঝাপসা বলে মনে হয়। জগৎ তখন মায়া, নাম-রূপের বিকারমাত্র, সত্য সেই অবর্ণ শূন্যতা।

এ-অনুভব সত্য, কিন্তু খণ্ডিত। তার খণ্ডতার হেতু চিৎশক্তি সম্পর্কে ধারণার অপূর্ণতায়। শুধু দ্রষ্টৃত্বই নয়, ভোক্তৃত্ব এবং কর্তৃত্বও চেতনার ধর্ম। ব্যক্তিগত সিদ্ধির গরজে শেষের দুটিকে আমি বাদ দিতে পারি। ভোগ আর কর্ম নিরুদ্ধ হলে জগৎ থাকবে না, 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' হবে আমার অনুভব। কিন্তু ব্রহ্মচৈতন্যের এ হল একদিক। তার আরেকদিকে রয়েছে প্রপঞ্চোল্লাস। সেখানে তাঁর ভোক্তৃত্ব এবং কর্তৃত্ব অব্যাহত, তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির 'ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।' তিনিই সব-কিছু হয়ে আবার সব-কিছুকে ছাপিয়ে গেছেন। বিশুদ্ধ দ্রষ্টৃত্বে এই ছাপিয়ে যাওয়ার অনুভব হয়, কিন্তু সব-কিছু হওয়ার অনুভব বাকী থাকে। দুটিকে মিলিয়ে নিলে তবে আত্মানুভব এবং ব্রহ্মানুভবের পূর্ণতা।

উপনিষদে চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের কথা আছে। ব্রহ্ম বিরাট্, তিনি তৈজস, তিনি প্রাজ্ঞ, আবার তিনি প্রপঞ্চোপশম তুরীয়। এই প্রপঞ্চে তিনি বিরাট্, তিনিই সব-কিছু হয়েছেন—এই তাঁর বস্তুরূপ। আবার বস্তু তো শুধু বস্তু নয়, তার মূলে রয়েছে ভাব। তিনি সেই ভাবরূপও; তখন তাঁকে বলি তৈজস। বস্তু স্থূল, ভাব সূক্ষ্ম; দুয়ের মূলে রয়েছে কারণ বা শক্তি। বহির্বিশ্ব বা অন্তর্বিশ্বের মূলে চিৎশক্তির যে-প্রেষণা, তিনি তাও। বিশ্ব তাঁর শক্তিরূপ, তিনি তখন প্রাজ্ঞ। আবার শক্তির অধিষ্ঠান হল চৈতন্য—যা শক্তিতে উল্লসিত হয়, আবার শক্তিকে ছাপিয়েও থাকে। ব্রহ্মকে তখন বলি, বস্তু ভাব আর শক্তি এই তিনের অতীত তুরীয়।

এই চারটি বিভাবের শুধু যে-কোনও একটির উপর জোর দিলে সিদ্ধি পূর্ণাঙ্গ হয় না। পূর্ণযোগের তা লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যের অনুভব—আত্মাতে বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে, বস্তুতে ভাবে শক্তিতে এবং চেতনায়। অনুভব বিলোমক্রমে, আবার অনুলোমক্রমেও। সব ছাপিয়ে গিয়ে আবার সব হয়ে।

৭

দেহবশ্যতা হতে বিমুক্তি

বিবেকই হচ্ছে জ্ঞানযোগের মুখ্য সাধন। অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলতে বুঝি চেতনার সঙ্কোচ। এই সঙ্কোচের হেতু হল 'অবিবেক' অর্থাৎ অপরা-প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা। দেহ প্রাণ হৃদয় মন এবং অহং—এই নিয়ে আমার আত্মপ্রকৃতি। এরা যখন আমার বশে থাকে না, এদের অন্ধতা এবং গতানুগতিকতা যখন আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তখন এদের বলি অপরা-প্রকৃতি। আত্মচৈতন্যকে একে-একে অপরা-প্রকৃতির কবল হতে মুক্ত করতে হবে, প্রকৃতির ঈশান হতে হবে, স্বরাট্ হতে হবে—এই হল জ্ঞানযোগের লক্ষ্য।

প্রথমত দেহবশ্যতা হতে চেতনাকে মুক্ত করতে হবে। দেহবশ্যতাকে প্রশ্রয় দেয় জড়বাদ, বিশেষত বৈজ্ঞানিক জড়বাদ। যদিও জড়কে বশে আনা বিজ্ঞানের লক্ষ্য, তবুও জড় নিয়ে কারবার করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি তার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে জড়োত্তর কোনও তত্ত্বকে তার ন্যায্য মর্যাদা দিতে সে নারাজ। আধিভৌতিক স্বাচ্ছন্দ্যই তার কাম্য, আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যের সাধনা তার মতে হয় নিষ্প্রয়োজন, নয় তো পাগলামি। ভোগোপকরণের প্রাচুর্য দিয়ে যদি দেহের সকল দাবি মেটাতে পারি তাহলে তাকে উপোসী রাখব কেন—এই তার মত। মানুষের দৃষ্টি যখন বাইরের দিকে ফেরানো থাকে, চেতনা যখন হয় একান্ত বস্তুনির্ভর, তখন এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বস্তুসাপেক্ষ স্বাচ্ছন্দ্য আর বস্তুনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য—দুয়ের মাঝে চেতনার উৎকর্ষের তারতম্য আছেই। জড়প্রকৃতিকে বশে আনা একটা পুরুষার্থ নিশ্চয়। কিন্তু আত্মপ্রকৃতিকে বশে আনাও একটা পুরুষার্থ এবং তার চাইতে বড় পুরুষার্থ, কেননা মানুষের মনুষ্যত্বের সত্যকার পরিচয় এইখানেই। ভোগে আর যোগে বাস্তবিকই কোনও বিরোধ থাকে না, যদি যোগী হয়ে ভোগ করতে পারি, শিবত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকে শক্তির উল্লাসকে মুক্তি দিতে পারি।

*

'আমি দেহ নই'—এমনতর একটা দৃঢ় ভাবনা হল দেহবিমুক্তিসাধনার ভিত্তি। তার প্রাথমিক সাধন হচ্ছে দেহব্যাপারের প্রতি তটস্থ নিরপেক্ষতার ভাব। খাওয়া-শোওয়া চলা-ফেরা আরাম-ব্যারাম এগুলি নিয়ে অহরহ ব্যতিব্যস্ত থাকা যোগের অনুকূল নয়। তাবলে তপস্যার নাম করে দেহকে পীড়ন করাও উচিত নয়। গীতায় আছে, আহারে-বিহারে নিদ্রায়-জাগরণে কর্মচেষ্টায় সাধককে যুক্ত থাকতে হবে, এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি বা পীড়াপীড়ি কোনটাই স্বাস্থ্যকর নয়। স্বাস্থ্য মানেই আপনাতে আপনি থাকা; গীতায় তাকে বলা হয়েছে 'যুক্ততা'। নিরপেক্ষতার অর্থ তখন সমত্ব বা অবিক্ষোভ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা রোগ-জ্বালার আক্রমণ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু তা-ই নিয়ে সোরগোল করা জড়বুদ্ধির পরিচয়।

তারপর খাওয়া নিয়ে বাছবিচারের কথা। উপনিষদে আছে, আহারশুদ্ধি থেকে সত্ত্বশুদ্ধি হয়; গীতাতেও সাত্ত্বিক আহারের কথা পাই। সাধনার প্রথমটায় আহারনির্বাচনে সাবধান হওয়া প্রয়োজন হয়। কিন্তু কি বস্তু খেলাম তার চাইতে বড় কথা হচ্ছে কি ভাব নিয়ে খেলাম। মাত্রা ঠিক রেখে নির্লোভ হয়ে খাওয়া হল আহারশুদ্ধির গোড়ার কথা। আহার শুধু ক্ষুন্নিবারণ বা রসনাতর্পণের জন্য নয়; এ একটা যজ্ঞ, অন্নকে চিদগ্নিতে আহুতি দিয়ে অন্নময় চেতনার রূপান্তর ঘটানো তার উদ্দেশ্য—এই বুদ্ধিতে আহার করা ভাল। তারপর সবসময় অন্নগত প্রাণ হয়ে থাকাও একটা সংস্কারান্ধতা মাত্র। কেবল স্থূল অন্নই যে আমাদের আহার্য তা নয়। প্রাণ ও মনের সূক্ষ্মতর শক্তিকে আশ্রয় করে স্থূল আহারের প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি কমিয়ে আনা যেতে পারে। সেকথা পরে হবে। আপাতত এইটুকু জেনে রাখা ভাল, দেহের উপাদান জড় বলে তাকে জড়নির্ভর করে রাখা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়।

*

দেহবিমুক্তির সত্যকার সাধনা হল ভাবনা। দেহ শুধু জড় নয়, সে প্রাণময় মনোময় জড়—এই হল তার যথার্থ পরিচয়। দেহেরই মধ্যে মনশ্চেতনার উন্মেষ ঘটে—এ দৃষ্টি জড়বাদের। কিন্তু মনশ্চেতনা একবার সুপ্রতিষ্ঠ হলে দেহের উপরেও তার প্রশাসন চলতে পারে, সুতরাং মনোময় পুরুষই দেহের নিয়ন্তা—এ-দৃষ্টি চিদ্‌বাদীর। বলা বাহুল্য, চিদ্‌বাদই হল যৌগিক ভাবনা ও সাধনার ভিত্তি।

দেহবশ্যতা হতে বিমুক্তি

ভাবনার প্রথম সূত্র হল: দেহ শুদ্ধ জড় নয়, সে বোধের বাহন বা বোধরূপ—চেতনায় এই সংস্কার উৎপন্ন করা। তার জন্য একই চেতনা মনে সাত্ত্বিক, প্রাণে রাজসিক আর দেহে তামসিক—এইভাবে আত্মপ্রকৃতির সব-কিছুকে চেতনার বিভূতি বলে ধারণা করতে শিখতে হবে। আবার সেই ইন্ধন আর আগুনের উপমা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে পারি। ইন্ধনের মধ্যে আগুন আছে, তার প্রকাশেই ইন্ধনের সার্থকতা। কিন্তু আগুনের প্রকাশ হতে গিয়ে ইন্ধনে প্রথমটায় ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। আগুন জোর ধরলে তার ধোঁয়া কেটে যায়, সমস্তটা ইন্ধনই আগুন হয়ে তাপ আর আলো ছড়ায়। এখানে ইন্ধনকে বলতে পারি দেহ, তাপকে প্রাণশক্তি, আর আলোকে চিৎশক্তি। দেহকে এমনি করে যোগাগ্নিময় করা, উদ্দীপ্ত শক্তি ও বোধের বাহন করাই হল দেহবিমুক্তির লক্ষ্য।

'আমি দেহ নই' এই নেতিভাবনার পরিপূরক হল 'আমি দেহের ঈশ্বর' এই ইতিভাবনা। আমি দেহের ঈশ্বর—চিদ্‌বিগ্রহরূপে। এই বোধ পাকা করবার জন্যই প্রথমে নেতিভাবনা বিবেক আর প্রত্যাহারের প্রয়োজন হয়। বিবেক সুপ্রতিষ্ঠ হয় প্রত্যাহারে। প্রত্যাহারের অর্থ হল চেতনার মোড় বাইর থেকে ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। দেহটা নিয়ে ছটফট করছি, তার আরাম-ব্যারাম নিয়ে সোরগোল করছি—এ হল দেহচেতনার অবিশুদ্ধ বহির্মুখ প্রকাশ। কিন্তু যোগাসনে নিস্পন্দ এবং স্বচ্ছ হয়ে যদি দেহকে অনুভব করতে যাই, তাহলে একটা স্থিরসুখময় বোধে দেহচেতনার অন্তরঙ্গ বিশুদ্ধপ্রকাশের পরিচয় পাই। এই হল প্রত্যাহারের দিক। প্রত্যাহারে যে-বোধের প্রকাশ হল, তাকে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারলেই দেহ থেকে বিমুক্ত বা বিবিক্ত আত্মচৈতন্যের প্রকাশ হয়। তখন অনুভব করি, আমি দেহ থেকে আলাদা, দেহ আমারই আশ্রিত, আমার উদ্দীপ্ত বোধের সে বাহনমাত্র।

*

এমনি করে আত্মচৈতন্যকে যদি দেহের অধিষ্ঠানরূপে ধারণা করতে পারি, তাহলে ক্রমে তার সমস্ত ক্রিয়ার উপর বশীকার সম্ভব হতে পারে। তার প্রথম ধাপ হল তিতিক্ষার সাধনা, দেহের সুখ-দুঃখে নিজেকে অবিচলিত রাখা। খানিকটা তিতিক্ষা জীবনে সবারই দরকার হয়। কিন্তু তার শক্তিকে বাড়ানো যায়, যদি অন্তর্মুখীনতার দ্বারা অনুভবের কেন্দ্রকে আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত

করতে পারি। আমাদের সমস্ত অনুভবই আপেক্ষিক। অন্তর্মুখ অনুভবকে যদি গাঢ় এবং জোরালো করা যায়, বাইরের অনুভব তাহলে আপনাহতেই ফিকা হয়ে আসে। আত্মানুভবের গাঢ়তার সঙ্গে ব্যাপ্তিবোধকে জুড়ে দিলে সাধনা আরও সহজ হয়। এখন মনে হচ্ছে, দেহের মধ্যে আমি আছি। ব্যাপ্তিবোধে মনে হবে, আমার মধ্যে দেহ রয়েছে, আমি আকাশবৎ। যেমন আকাশে আদিত্যের মণ্ডল, তেমনি আমার ব্যাপ্তিচৈতন্যের মধ্যেই আত্মবোধের চিদ্‌ঘনতা।

এই ভাবনায় আমরা ক্রমে দেহবশ্যতা হতে মুক্ত হতে পারি। তার প্রথম লক্ষণ হল উপদ্রষ্টৃত্ব : দেহের মধ্যে যা-কিছু ঘটছে, আমি তটস্থ থেকে তা দেখে যাচ্ছি, কোনমতেই তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছি না। এই ভাবনা প্রবল হলে আমি আর দেহ আলাদা হয়ে পড়ি। তখন দেহের মধ্যে যা ঘটে, মনে হয় সে যেন আর-কারও মধ্যে ঘটছে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'দেখছি এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তার মধ্যে গলার ঘা-টা একপাশে পড়ে রয়েছে।' এই চিৎপ্রতিষ্ঠা থেকে আবার আনন্দস্বভাবের স্ফুরণ হয়, দেহের তীব্রতম দুঃখকেও তখন অনুভব হয় আনন্দের তির্যক বিলাসরূপে। দেহের অভ্যস্ত সংস্কারের তখন বিপর্যয় ঘটে, আর তাইতে আত্মচৈতন্য উপদ্রষ্টার ভূমিকা হতে উত্তীর্ণ হয় অনুমন্তার ভূমিকায়। দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করতে পারে যে-শক্তি, তার ঐশ্বর্যের শেষ নাই। দেহকে সে আত্মবশ্য এবং একান্তনমনীয় আধাররূপে চিদ্‌বিভূতির বিচিত্র প্রকাশের বাহন করতে পারে। দেহ তখন হয় নিপুণ যন্ত্রীর হাতে স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের যন্ত্রের মত।

*

দেহের বশীকার হতে সিদ্ধ হয় প্রাণের বশীকার। প্রাণ হল চৈতন্যের শক্তি। তার ক্রিয়া চলছে যেমন দেহে, তেমনি মনে। দেহে তার ক্রিয়া বেশির ভাগই অবচেতন, কতকটা যান্ত্রিক—যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা কর্মপ্রেরণা অবসাদ আরোগ্য ব্যাধি ইত্যাদিতে। সমস্তটা মিলিয়ে আছে একটা জিজীবিষা বা বেঁচে থাকবার ইচ্ছা। তার বিপরীত হল মৃত্যুভয়। মৃত্যুভয় জিজীবিষাকে জড়িয়ে আছে, বলতে গেলে আচ্ছন্ন করে আছে। প্রাণের উল্লাসের চাইতে প্রাণের ভয়ই আমাদের মধ্যে প্রবল। দেহবশ্যতার এই হল চরম রূপ। একে অতিক্রম করা অধ্যাত্মসাধনার একটা প্রধান লক্ষ্য।

দেহের প্রাকৃত ধর্ম হল জরা এবং মৃত্যু। চেতনার দিক থেকে দেখতে গেলে তার একটা সম্ভাবিত রূপ হচ্ছে চেতনার ক্রমিক অবক্ষয় এবং অবশেষে চিরবিলোপ। কিন্তু সবার বেলায় তা নাও হতে পারে। উদ্দীপ্ত মনশ্চেতনা দেহের জরাকে ছাপিয়ে ওঠে, এ আমরা প্রাকৃত জীবনেও দেখতে পাই। যোগচেতনা তেমনি জীবনের চ্যুতিক্ষণ বা মৃত্যুস্পৃষ্ট অন্তিম মুহূর্তকেও ছাপিয়ে বিস্ফারিত হতে পারে। যেমন ঘুমের মধ্যে জেগে থাকা, তেমনি মৃত্যুর সময়ও প্রাণের সংহরণকে তটস্থ থেকে প্রত্যক্ষ করা যোগীর পক্ষে অসম্ভব নয়। জীবন থাকতেই আমরা জীবনের ওপারকে ছুঁয়ে আসতে পারি, যদি চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত করি। যোগীর জড়সমাধি একরকমের জীবন্মৃত্যু। চেতনার চরম নিগূহনে (involution) যেখানে জড়ের উৎপত্তি, এই সমাধি সেই 'অপ্রকেতং গহনং গভীরম্'কে ছুঁয়ে থাকে। এটি অসৎকল্প বিশুদ্ধ সত্তার বোধ, যা আমাদের প্রাকৃত দেহবোধের মর্মসত্য। অভ্যাসের দ্বারা বোধকে জাগ্রতেও প্রবর্তিত করা যেতে পারে। আগে যে আকাশবৎ ব্যাপ্তিচৈতন্যের কথা বলেছি, তার সঙ্গে এই বোধের নিবিড় যোগ আছে। আকাশভাবনা গভীর হয়ে যখন অনন্ত সত্তার শান্তিতে আধারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন চেতনা প্রাকৃত জীবন-মরণের দ্বন্দ হতে নির্মুক্ত হয়। সমুদ্রের মধ্যে বুদ্‌বুদ উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। বুদ্‌বুদ যখন সমুদ্রকে জানে না, অর্থাৎ কোথা হতে আসছে কোথায় আছে কোথায় যাচ্ছে জানে না, তখন এই ভাসা আর ডোবাকে তার সঙ্কীর্ণ চেতনা দিয়ে সে ভাবতে পারে জীবন আর মরণ। কিন্তু সমুদ্রচেতনায় আবিষ্ট হলে এই জীবন-মরণই হয় অজর অমর প্রাণের উল্লাস। মৃত্যু তখন ছায়ার মায়া।

এমনি করে মৃত্যুঞ্জয় হওয়াই দেহবিমুক্তির চরম পর্ব।

*

দেহবিমুক্তির সিদ্ধি নির্ভর করছে বিবেকের উপর। বিবেকের একটা উপাদান হল তটস্থতা। তার অর্থ হতে পারে নৈষ্কর্ম্য। যাঁরা কর্মে আর জ্ঞানে বিরোধ কল্পনা করেন, তাঁরা নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিকেই জ্ঞানযোগের পরম সিদ্ধি বলে ধরে নেন। কিন্তু পূর্ণযোগী তা মনে করেন না। নৈষ্কর্ম্যকে অবশ্য তিনি অবাঞ্ছনীয় ভাবেন না, কেননা তিনি জানেন, শক্তি থাকতেও কিছু না করার

অর্থ হতে পারে শক্তির রাস টেনে রাখা। আর সেটা শক্তিরই পরিচয়। তবে শক্তির রাস টানতে হয় শক্তিকে ঋতচ্ছন্দা করবার জন্যই। কর্মে বিরক্তি আর নৈষ্কর্ম্যে আসক্তি যদি শক্তিসংহরণের প্রয়োজক হয়, তাহলে তাকে পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ বলা চলে না। এখানে সাধককে অবলম্বন করতে হবে গীতার পথ। গীতায় বলা হয়েছে যোগস্থ হয়ে কর্ম করার কথা। অন্তরের সমত্ব হল যোগ। আমি সেখানে অকর্তা—আকাশবৎ প্রশান্ত নির্বিকার। আমাকে কর্ম করতেই হবে এমন কোনও দায় আমার নাই। আবার কর্ম ছাড়তেই হবে এমন ঝোঁকও নাই। হাওয়া চলতে-চলতে থেমে গেল; আকাশ তবু আকাশই। আকাশের এই প্রশান্ত ব্যাপ্তির মধ্যে সাধককে বারবার ফিরে যেতে হবে।

অবশ্য সাধনার এটি প্রথম পর্ব—শক্তিসংহরণের পর্ব। তারও পরে আছে শক্তির ঈশ্বর হয়ে শক্তিবিকিরণের পর্ব।

৮

চিত্তবিমুক্তি

যেমন দেহকে আমাদের ছাপিয়ে উঠতে হবে, তেমনি চিত্তকেও। মূঢ় ও চঞ্চল প্রাকৃত চিত্তকে রূপান্তরিত করতে হবে প্রভাস্বর যোগচিত্তে।

ইন্দ্রিয়সংবিৎ (sensation), ভাব (emotion), ভাবনা, বাসনা এবং অহন্তা—এইগুলি প্রাকৃত চিত্তের উপাদান। এদের কেন্দ্রবিন্দু হল অহং। অহং আর আত্মার তফাতের কথা আগেও বলেছি—একটিতে চেতনার সঙ্কোচ, আরেকটিতে বিস্তার। আমাদের জীবভাবের বনিয়াদ হল অহং। অহংকে জড়িয়ে আছে বাসনা, তাকে বলতে পারি অহংএর শক্তিরূপ। তত্ত্বদৃষ্টিতে আকাশ আর প্রাণে যে-সম্পর্ক, অহং আর বাসনাতেও সেই সম্পর্ক। আকাশে প্রাণের স্পন্দন যেমন এই বিশ্বজগৎ, তেমনি অহংএ বাসনার স্পন্দন আমাদের প্রাকৃত জীবন।

*

বাসনা অবিদ্যাচ্ছন্ন। চাই-চাই করা তার স্বভাব, কিন্তু কি চাই কেন চাই তা সে স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারে না। জীবন চলছে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির তাগিদে, তার দৃষ্টি উদার বা গভীর নয়, অনপেক্ষও নয়। সঙ্কীর্ণ অহংএর পরিতর্পণই তার লক্ষ্য, তাকে ছাপিয়ে তার ভাবনা বৃহতে ছড়ায় না বা গভীরে ডোবে না। ইন্দ্রিয়সংবিৎ ভাব আর ভাবনা সাধারণত এই অবিদ্যাচ্ছন্ন অহন্তাক্লিষ্ট প্রাকৃত জীবনের তাঁবেদার। সে-জীবন অধিকাংশক্ষেত্রে দ্বন্দ্বসঙ্কুল, বিক্ষুব্ধ, অচরিতার্থতায় ম্রিয়মাণ। এককথায় প্রাকৃত জীবন দুঃখময়, যদিও সে-দুঃখের সম্পর্কে আমাদের চেতনা অপরিশীলিত এবং ক্ষীণ।

অথচ পরাভবের এই দৈন্য যে আমাদের জীবনের নিয়তি তা নয়। এমন-একটা সময় আসে যখন প্রবৃত্তির বেগ আমাদের মন্দীভূত হয়, বাইরের প্রতি বীতরাগ হয়ে দৃষ্টি ফেরে অন্তরের দিকে। তখন যে-আমি জীবনের সহস্র ঝামেলায় জড়িয়ে আছে তারও পিছনে দেখতে পাই তটস্থ এক আমিকে—যে শুধু এই নয়, আরও-কিছু। এই বিবিক্ত গুহাহিত আমির চেতনা যত স্পষ্ট

হয়ে ওঠে আমাদের মধ্যে, বাইরের জীবনে ততই ছন্দ আসে। ছন্দ ব্যক্তি-সত্ত্বকে (personality) উদ্বুদ্ধ করে। এই ব্যক্তিসত্ত্ব বস্তুত আমাদের চৈত্যসত্তার বিভূতি। প্রাকৃত জীবনকে অপ্রাকৃত চৈত্যসত্তার অধীন করা হল যোগ-জীবনের প্রথম লক্ষ্য।

বুভুক্ষা রসতৃষ্ণা বা বাসনা অবর প্রাণের ধর্ম। তার তর্পণের উপাদান ছড়িয়ে আছে বাইরে, ইন্দ্রিয় তার খবর এনে দেয় মনের কাছে। ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনার সঙ্গে মন যখন জড়িয়ে যায়, তাকে তখন বলি ইন্দ্রিয়মানস (sense-mind)। ইন্দ্রিয়মানসের জোটানো উপাদানকে আস্বাদনের সামগ্রী করে তোলে মনের যেসব বৃত্তি, তাদের দিয়ে গড়ে উঠেছে ভাবমানস (emotional mind)। সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্য আগ্রহ-নির্বেদ বা রুচি-অরুচির দ্বন্দ্ব হল তার বৃত্তি। ইন্দ্রিয়মানস আর ভাবমানসেরও পরে আছে ভাবনামানস (thought-mind)—বিবেক বিতর্ক বিচার স্মৃতি কল্পনা এইসবের সহায়ে বিষয়ের তত্ত্ব আহরণ করা তার স্বভাব। এই তিনটি মানসের ক্রিয়াই প্রাকৃত ভূমিতে প্রাণবাসনার সংস্পর্শে অবিশুদ্ধ।

*

মানসক্রিয়ার নিরোধ নয়, চাই তাদের বিশোধন এবং উদ্দীপন। নিরোধ সাময়িক উপায় হতে পারে, কিন্তু যোগের চরম লক্ষ্য তা নয়। চিত্তবিশোধনের অন্যতম সাধন হল চিত্তপ্রসাদন। চিত্ত প্রসন্ন হয় চৈত্যসত্তার উদ্বোধনে। এই প্রাকৃত সত্তার পিছনেই তার অধিষ্ঠান। আমাদের সবার মধ্যে রয়েছে এক চির-কিশোর—অসীমের সঙ্গে তার নিত্যযোগ, তাঁর আলোয় সে উদ্ভাসিত, তাঁরই আনন্দে নন্দিত। এইটি আমাদের চৈত্যসত্তা, পরম-পুরুষের পরা-প্রকৃতি। এটি এখন আড়াল হয়ে আছে; অন্তর্মুখ আত্মসচেতনতার দ্বারা এটিকে নিয়ে আসতে হবে চেতনার পুরোভাগে। 'আমি তাঁর'—এই প্রসন্ন বোধের মাধুরীতে তখন শুরু হবে মানসের রূপান্তর। ইন্দ্রিয়মানস তখন মাত্রাস্পর্শের ভিতর দিয়েই পাবে ব্রহ্মসংস্পর্শের আনন্দ, জগৎ তার কাছে হবে মধুময়। ভাবমানসের প্রসন্নতায় হৃদয়ে খুলে যাবে রসের ফোয়ারা, তাঁকে ভালবেসে সবাইকে ভালবাসার সহজ আকৃতিতে হৃদয় ভরে উঠবে কানায়-কানায়। ভাবনামানসের মধ্যেও আসবে অভাবনীয় রূপান্তর : বুদ্ধি হবে স্বচ্ছ এবং ক্রান্তদর্শী, মানসোত্তর

বোধির জ্যোতিঃসম্পাতে তর্কের কৌটিল্য ঘুচে গিয়ে ঋজুচারী মেধার আবির্ভাব হবে।

প্রাকৃত চেতনার যত অনর্থ, অহংগ্রন্থিই তার মূল। অহন্তার স্বরূপ হল আত্মরতি—'আপনারে শুধু ঘিরিয়া-ঘিরিয়া ঘুরে মরা পলে-পলে'। জাগ্রত মনের মধ্যে এই আত্মরতি মুখর হয়ে উঠলেও বস্তুত তার শিকড় রয়েছে অবচেতনার গভীরে। সেখানে বুভুক্ষু আদিমপ্রাণের সম্মোহ চেতনাকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে মন যদি-বা জাগে, প্রাণ কিন্তু কিছুতেই জাগতে চায় না, জান্তব বাসনার পাকে-পাকে কেবলই সে জগৎটাকে জড়িয়ে ধরে।

*

মনোময় পুরুষকে এই অন্ধ প্রাণবাসনার জাল হতে মুক্ত হতে হবে। মুক্তির সাধন হল প্রকৃতি আর পুরুষের বিবেক। অপরা-প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ দ্বন্দ্বসঙ্কুল অতৃপ্ত—তার পরিচয় আমরা ভাল করেই জানি। জানি না, এই প্রকৃতিই আমাদের আত্মপ্রকৃতির সবটুকু নয় কিংবা এর বশীভূত হয়ে থাকা আমাদের নিয়তি নয়। এই প্রকৃতির পিছনেই আছে এক প্রশান্ত নির্দ্বন্দ্ব প্রসন্ন চেতনা—নির্মেঘ আকাশের স্বয়ম্প্রভ ব্যাপ্তির মত। এই চেতনা পুরুষ। প্রকৃতির উপদ্রষ্টরূপে এই পুরুষকে আবিষ্কার করতে হবে।

উপদ্রষ্টৃত্ব একদিনে আসে না, দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর প্রযত্নের দরকার হয় তার জন্যে। সবসময় হুঁশে থাকা তার একটা প্রধান উপায়। আমার অগোচরে আমার মধ্যে কিছুই ঘটবে না, স্বভাবের বশেও যা আসবে, প্রশান্ত অপলক দৃষ্টিতে আমি তা চেয়ে দেখব। উপনিষদে একে বলা হয়েছে সমনস্কতা।

সমনস্কতায় চেতনা দুভাগ হয়ে পড়ে—একভাগ দেখে, আরেকভাগ ভোগে বা করে। দ্রষ্টৃত্ব পুরুষের, ভোক্তৃত্ব আর কর্তৃত্ব প্রকৃতির। এতদিন তিনটি বৃত্তিতে জড়াজড়ি হয়ে ছিল, সমনস্কতায় দ্রষ্টৃত্ব আর-দুটি বৃত্তি হতে আলাদা হয়ে যায়। আমার মধ্যেই আমার আরেক আমিকে খুঁজে পাই, যে-আমি সবাইকে আশ্রয় দিয়েও কিছুতেই কারও সঙ্গে জড়িয়ে যায় না। প্রাক্তন সংস্কারের বশে ভোগ আর কর্মের প্রক্ষোভ তখনও হয়তো চেতনার প্রশান্ত আকাশে মেঘবাষ্পের মত ভেসে আসে, কিন্তু আকাশকে তা আচ্ছন্ন করে না।

আচ্ছন্নতা আসে অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব হতে। অনুরাগ-বিরাগ হল প্রাকৃত চিত্তের রস। অনুরাগ-বিরাগের দোলাতেই সে-চিত্ত সজাগ থাকে। এই দোলাটুকু না থাকলে সে জড় হয়ে যায়। আবার থাকলেও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল অবসাদ। যেদিক দিয়ে দেখি না কেন, প্রাকৃত চিত্ত আচ্ছন্নতার হাত হতে কিছুতেই মুক্তি পায় না।

অপ্রাকৃত চেতনা অনুরাগ-বিরাগের ঊর্ধ্বে। অথচ তা জড় নয়। দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে চেতনাকে নিতে গিয়ে যে-প্রত্যাহারের (withdrawal) দরকার হয়, তা-ই চেতনাকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ রাখে। সাংখ্যের ভাষায় প্রকৃতির পরিণাম তখনও চলতে থাকে, কিন্তু তা হয় সদৃশপরিণাম—দ্বন্দ্বসঙ্কুল চেতনার মত গুণের বিভঙ্গ তার মধ্যে নাই। এই চেতনার প্রধান ধর্ম হল সমত্ব (equality)।

সমত্ব আর ঔদাসীন্য এক কথা নয়। ঔদাসীন্যে বিরক্তির একটুখানি ছোঁয়াচ থেকে যায়। সে যেন দেখে না, দেখতে চায় না। কিন্তু সমত্ব কোনও-কিছু হতেই মুখ ফিরিয়ে থাকে না। আকাশে আলো ফুটুক আঁধার নামুক, আকাশ কোনও কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করে না। আলো আর আঁধার দুইই তার কাছে সমান। তারা মূল্যহীন বলে যে সমান তা নয়। উপরভাসা মূল্যের চাইতে একটা গভীরতর মূল্য আছে বলেই তারা সমান। এই মূল্য দেয় আত্মবোধের প্রশান্তি।

দু'চোখ ভরে সব যে দেখছে, দৃশ্যকে সে ভোগও করছে। কিন্তু সে-ভোগ সুখ-দুঃখের নয়—প্রসাদের। আমি আলোতেও প্রসন্ন, আঁধারেও প্রসন্ন। তাইতে আমি আলো-আঁধারের ঊর্ধ্বে। এই প্রসন্নতার অনুভবে নিজেকে আমি যেন নতুন করে আবিষ্কার করি। এই বোধই আমার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠে : প্রসন্নতা আমার স্বভাব। আপনাতে আপনি থেকে আমি নন্দিত। স্বত-উৎসারিত সেই আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে সব-কিছুর উপরে—নির্মেঘ আকাশের নীলিমাকে করে গাঢ়তর, শুভ্র মেঘকে জ্যোতির্ময়, কালো মেঘকে ইন্দ্রধনুশ্ছটায় মনোহারী।

এও প্রকৃতির কাজ—কিন্তু অপরা-প্রকৃতির নয়, পরা-প্রকৃতির অথবা পরমা-প্রকৃতির। দ্বন্দ্বের জগতের মূলে সে আবিষ্কার করে এক নির্দ্বন্দ্ব আনন্দের দোলা। প্রতিবোধ থেকে জাগে শক্তি, পুরুষের মধ্যে জাগে ঈশনা।

আলো আর আনন্দ যদি আত্মচৈতন্যের স্বরূপসত্য হয়, তাহলে তা জগতেরও সত্য। যেমন তা অন্তর্জগতের সত্য, তেমনি বহির্জগতেরও। আমার অন্তর্জগতে সে-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি বুদ্ধির শুদ্ধি একাগ্রতা এবং

বৈরাগ্যের দ্বারা। আমাতে যে-শক্তি ঘনীভূত হল, বাইরে তা ছড়িয়ে পড়বেই। পরিবেশ ততক্ষণই আমায় নিয়ন্ত্রিত করে যতক্ষণ আমি পশু। আমি যখন মানুষ, তখন আমিই পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করি। করি আত্মচৈতন্যের ঈশনার দ্বারা। যাঁর ঈশনা আছে, প্রকৃতির তিনি শুধু উপদ্রষ্টা বা অনুমন্তা নন, তিনি তার ভর্তাও। উপদ্রষ্টা কিছু বলেন না, শুধু চেয়ে দেখেন। অনুমন্তা আরও সুপ্রতিষ্ঠ বলে প্রসন্ন হয়ে সায় দিয়ে চলেন। ভর্তা প্রশাসন করেন। তাঁর প্রশাসন অনৃতকে রূপান্তরিত করে ঋতে, প্রক্ষোভকে প্রসন্নতায়, অবসাদকে বীর্যে।

*

এমনি করে প্রকৃতির ঈশান হওয়াতে চিত্তবিমুক্তির সার্থকতা। বিমুক্ত চিত্ত নির্দ্বন্দ্ব। কিন্তু আগেই বলেছি, সে-নির্দ্বন্দ্বতা ঔদাসীন্য নয়, জগৎকে প্রত্যাখ্যান করা নয়। অবশ্য চেতনাকে কূটস্থ করবার জন্য প্রত্যাখ্যানের একটা সাময়িক উপযোগিতা আছে। কিন্তু সাধনার তা আদিপর্ব মাত্র। আঘাতে টলছি না—সুখে নয় দুঃখেও নয়, এ হল সাধনার নেতির দিক। ইতির দিক হল, যা আসুক না কেন, তাহতেই আনন্দ ঠিকরে পড়ছে। আনন্দ প্রতিফলিত হচ্ছে অনাত্মবস্তু হতে নয়, আত্মচৈতন্য হতেই তা উৎসারিত হচ্ছে।

আত্মবোধ প্রগাঢ় না হলে এটি হয় না। তার জন্য শুধু বাসনামানসকে নিরাকৃত করলে হবে না, ভাবনামানসকেও নিরাকৃত করবার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। সাধনার প্রথম অবস্থায় ভাবনা (thought) দিয়ে বাসনাকে দূর করতে হয়। ভাবনা তখন অবলম্বন করে বিবেক এবং বৈরাগ্যকে। এদের অনুশীলনে ভাবনা বাসনার আবিলতা হতে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও প্রসন্ন হয়। কিন্তু তবুও তার মধ্যে বৃত্তির তরঙ্গ থাকে। যে-আত্মসত্তা থেকে ভাবনার উদ্ভব, তার সঙ্গে যোগযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নিস্তরঙ্গতা সম্ভব নয়। শুধু বোধ অর্থাৎ নির্বিশেষ সত্তার বোধ নিস্তরঙ্গ, উপনিষদের ভাষায় তা 'অস্তীত্যুপলব্ধিঃ'। এই অস্তিত্বের বোধে ভাবনাকে ডুবিয়ে দিতে হবে। বোধ ভাবনা নয়, এমন-কি বহির্জগতের বোধও তা নয়। সব বোধই নির্মম, নিঃশব্দ। সত্তা আর বোধ অভিন্ন। এক সত্তা এক বোধ অন্তরে-বাইরে সব-কিছুকে নিঃশব্দে ছেয়ে আছে।

এই নৈঃশব্দ্যে অবগাহন চিত্তবিমুক্তির অপরিহার্য সাধন।

৯

অহন্তাবিমুক্তি

দেহচেতনা প্রাণচেতনা আর মনশ্চেতনা—এই হল প্রাকৃত জীবনের উপাদান। এ-তিনের মূলে রয়েছে অহং। আমার দেহ, আমার প্রাণ, আমার মন। কিন্তু আমি কি?

একা আমিই আছি, তা তো নয়। আমাকে ঘিরে আছে বিরাট একটা জগৎ। সেখানে শক্তি আর চৈতন্যের খেলা। শক্তির অকূল সমুদ্র, আমি তার মধ্যে একটা বুদ্বুদ মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে এই শক্তির সমুদ্র অচেতন, অর্থহীন। কিন্তু তার বুকে অহন্তার এই বুদ্বুদটি সচেতন এবং সার্থক।

ওই সমুদ্রদোলার কোনও লক্ষ্য থাক বা না থাক, অহংএর কিন্তু একটা লক্ষ্য আছে। সে চায় বৃহৎ হতে, সমৃদ্ধ হতে। বীজ বনস্পতিতে বিস্ফারিত হতে চায়। এই চাওয়াতে প্রকাশ পায় শক্তি, আর পাওয়াতে আনন্দ। চেতনার বিস্ফারণ, শক্তির নিরঙ্কুশতা আর আনন্দের অজস্রতা—এইগুলি পুরুষার্থ।

কিন্তু চাওয়া আর পাওয়ার তারতম্য আছে। অহংএর পরিতৃপ্তি সবার পক্ষে এক নয়, তার মধ্যে একটা পর্বভেদও আছে।

প্রথম চাওয়া বুভুক্ষু প্রাণের চাওয়া, বাইরের উপাদানকে আত্মসাৎ করে অহংএর পরিতর্পণ। পরিতর্পণ বস্তুত চেতনারই হয়, কিন্তু চেতনা তখন বস্তুনির্ভর। বস্তুর ইন্ধন না জোগাতে পারলে চেতনা নিবে যায়। অহং তখন পরতন্ত্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর।

কিন্তু চেতনার বিস্ফারণ যখন অহংএর নিয়তি, তখন আত্মস্বার্থকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে সে পারে না। চেতনার স্বভাববশেই সে অনুভব করে, খেয়ে যে-সুখ, খাওয়ানোর সুখ তার চাইতে বড়। একার অহং তখন ছড়িয়ে পড়ে দশের মধ্যে। শুধু শরীরযাত্রাসিদ্ধির জান্তব আদর্শ রূপান্তরিত হয় লোকসংগ্রহের মানব আদর্শে। অহং বিস্ফারিত হয়, তবুও সে বস্তুনির্ভরই থাকে।

প্রবৃত্তিপথের সীমা এইপর্যন্ত। কিন্তু এতে বিশুদ্ধ অহংএর বা আত্মভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না। চেতনার স্বভাববশে কারও-কারও মধ্যে সে সন্ধিৎসা জাগে। কেননা কেবল প্রবৃত্তিমুখে চেতনার গতি নয়, একটা নিবৃত্তি

মুখী টানও তার মধ্যে আছে। সে যেমন বস্তুর আকর্ষণে বাইরে ছোটে, তেমনি আবার অন্তরের তাগিদে ভিতরেও গুটিয়ে আসে। কর্ম আর বিশ্রাম, জাগরণ আর নিদ্রা—জীবনের এই যুগল ছন্দ। প্রবৃত্তিতে যেমন আনন্দ, নিবৃত্তিতেও তেমনি। বরং একদিন বোধ হয়, প্রবৃত্তির আনন্দ পরতন্ত্র, কিন্তু নিবৃত্তির আনন্দ স্ব-তন্ত্র। প্রবৃত্তিতে আমি জড়িয়ে যাই, নিবৃত্তিতে মুক্ত থাকি। প্রবৃত্তির অহং অবিশুদ্ধ, নিবৃত্তির অহং পরিশুদ্ধ। সে-ই আমার সত্যকার আমি।

অধ্যাত্মচেতা অন্তর্মুখ হয়ে তাই সত্য আমির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। খুঁজতে গিয়ে কারও আমি মহাশূন্যের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। কারও আদিত্যদ্যুতিতে আকাশের বুকে ঝলমলিয়ে ওঠে। মহাশূন্য বা আদিত্যদ্যুতি দুইই অসংখ্যেয়। সেখানে বহু নাই, আছে এক, অথবা কিছুই নাই। কিন্তু কারও আমি হাজার তারার মেলায় একটি তারা হয়ে জ্বলতে থাকে। তার যেমন আকাশ আছে, তেমনি আছে ধ্রুবসত্তার মণিবিন্দুও।

অহন্তার বিস্ফারণের এই ছবি। এথেকে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু আপনাকে নিয়ে থাকা কখনও আমাদের পুরুষার্থ হতে পারে না। জ্ঞান প্রেম আনন্দ শক্তি—কিছুরই পরিপূর্ণ চরিতার্থতা আসবে না, যদি নিজেকে না ছড়াতে পারি। উপনিষদের ঋষি তাই বলেন, 'ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি'—ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। আমার সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধ আমিই 'অল্প', যে-আমি বিশ্বাত্মক অথবা বিশ্বোত্তীর্ণ তা-ই 'ভূমা'।

বিশ্বময় নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ারও দুটি রীতি আছে—একটি আধিভৌতিক, আরেকটি আধ্যাত্মিক। অহংব্যাপ্তির আধিভৌতিক রূপ ফুটে ওঠে তথাকথিত মানব-হিতৈষণায়। এইটি এখনকার লোকায়ত ধর্ম। কিন্তু একে একান্ত এবং পরম ধর্ম বলতে পারি না। একথা মানি, নিজেকে পরের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া খুব ভাল। কিন্তু দেখতে হবে, কোন্ আমিকে ছড়াচ্ছি। আমি যাকে হিত মনে করছি, তার কোনও শাশ্বত মূল্য আছে কি না। শুধু প্রবৃত্তির চরিতার্থতাকে আমি হিত বলছি, না নিবৃত্তিকেও তার যথাযোগ্য মূল্য দিচ্ছি। প্রবৃত্তির সাধনায় বুদ্ধির উৎকর্ষ হতে পারে এবং তা নিশ্চয় হিতকর। কিন্তু চেতনার চরম বিকাশ বুদ্ধিতে নয়। বুদ্ধির পরেও আছে বোধি, আছে আত্মবোধ। তার জন্য চাই নিবৃত্তির সাধনা, নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে আপনাতে আপনি থাকবার অভ্যাস।

স্পষ্টত এ-সাধনা একার। প্রবৃত্তিতে আমি সবার সঙ্গে মিলতে পারি, কিন্তু

নিবৃত্তিতে একা হয়ে যাই। এই একাকিত্ব কখনও-কখনও সর্বনিরোধের পথ ধরে। নিরোধে সব ফাঁকা হয়ে যায়। তাকে বলে ব্রহ্মনির্বাণ। জ্ঞানযোগের এও একটা লক্ষ্য। কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য নয়। শূন্যকে না পেলে পূর্ণকে ঠিকমত পাওয়া যায় না, একথা সত্য। কিন্তু তাবলে শূন্যই সব নয়। শূন্যের বুকে পূর্ণ—এই হল সমগ্র সত্যের ছবি। গীতার 'অভিতো ব্রহ্মনির্বাণম্'এর মধ্যেই অনুভব করতে হবে প্রপঞ্চের উল্লাস।

এ-অনুভব ব্যক্তির। প্রত্যেকের কাছে আত্মসত্তাই মুখ্য। আমাকে কেন্দ্র করে আমার জগৎ। আমি তার কেন্দ্র থেকে পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ি। ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির এই সত্যকার সম্পর্ক। আত্মকেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে তবে সবার মধ্যে ছড়াতে হবে। নইলে যে ছড়াবে, সে শুধু আমার অহং জাতির অহং বা প্রবৃত্তির অহং। অহংকে কখনও বলতে পারি না ক্ষেমঙ্কর। এই অহংএর নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই সব ছেড়ে সব পাওয়ার সাধনা।

*

অহংএর শিকড় নেমেছে একেবারে পাতাল পর্যন্ত। চেতনার চরম মূঢ়তার মধ্যে একধরনের অহং লুকিয়ে থাকে, যোগীরা যাকে বলেন 'অস্মিতারূপ ক্লেশ'। 'ক্লেশ' মানে চেতনার আচ্ছন্নতা এবং সঙ্কীর্ণতা। অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব একটা ক্লেশ। কিন্তু তাতে মানুষ তবুও সচেতন থাকে। এর চাইতেও দুর্জয় ক্লেশ হল 'অভিনিবেশ' বা চেতনার সুপ্তি—যেমন অসাড়তায় মোহে বা নিদ্রায়। চেতনা তখন ফিরে যায় আদিম অবিদ্যার অন্ধতমিস্রায়। বোধের সম্ভাবনা তখনও থাকে, নইলে আবার জেগে ওঠা সম্ভব হত না। কিন্তু সে-বোধ চেতনার কুমেরু। এই বোধকে জড়িয়ে যে-অহং থাকে, তাকে বলতে পারি 'মূলাহন্তা' (Substratum Ego)।

মূলাহন্তার কোনও বিশেষণ নাই। কিন্তু স্বয়ং নির্বিশেষ হয়েও স্থূল অহন্তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সে বীজভূমি। এই মূলাহন্তা যেমন প্রকাশ পায় প্রাকৃত চেতনার মূঢ়তায় বা সুপ্তিতে, তেমনি যোগের পথেও সে প্রকাশ পায় এক গভীর তমিস্রায়—যোগীরা যাকে বলেন প্রকৃতিলয়। অনেক অপ্রজ্ঞার সমাধি এই প্রকৃতিলয় ছাড়া কিছুই নয়। এইসব সমাধি হতে ব্যুত্থানের পর চেতনার কোনও গভীর রূপান্তর হতে দেখা যায় না, অথচ সাধকের মনে

আত্মপ্রসাদ জন্মে, আমি একটা কিছু পেয়েছি। এই মূঢ়তা প্রাকৃত অহঙ্কারের চাইতেও মারাত্মক।

অন্ধতমিস্রার গহ্বর হতে অহংএর শিকড়কে উপড়ে ফেলতে হবে, নতুবা চেতনার রূপান্তর ঘটবে না। যেমন আলোর ভুবনগুলিকে জয় করতে হবে, তেমনি করতে হবে আঁধারের ভুবনগুলিকেও। দুটি ভুবনই বিধৃত রয়েছে পরম পুরুষের মধ্যে। আলোর ভুবনে তিনি ব্যক্ত, অন্ধকারের ভুবনে অব্যক্ত। অব্যক্তের মধ্যে শক্তি কুণ্ডলিত হয়ে থাকে, আর সেই কুণ্ডলনের চাপে ব্যক্ত ভুবনের প্রকাশ হয়। শক্তির অব্যক্ত কুহর হতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি ঘটানোই পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থ জীবের। জীব অব্যক্ত আর ব্যক্তের মধ্যবিন্দু। অব্যক্তের নিগূহিত শক্তি তাই অভিব্যক্তির পথে প্রকাশ পায় জীবচেতনাকেই আশ্রয় করে।

জীব চিদাভাসমাত্র নয়, চিদ্‌ঘন। দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি কিংবা তাদের সমষ্টিই জীব নয়। এগুলি প্রকৃতির সৃষ্ট জীবাধার মাত্র। আধারে নিষিক্ত চিদ্‌বীজই হল জীব।

এই বীজ গোড়ায় বহু, কিন্তু পরিণামে এক। পরিণতির পর্বে-পর্বে বহুর উল্লাস। চরমে ব্রহ্ম জীবঘন—যেন মৌচাকের মত। একের বহুভাবনা জীবভাবের হেতু।

বহুর মধ্যে আপাতবিরোধ যেখানে, সেইখানে অহং। আমার অহংএ আর তোমার অহংএ তাই রেষারেষি। অথচ দুজনেই বুঝতে পারি, গরমিলটা সত্য নয়, দুয়ের গভীরে কোথাও একটা মিল আছেই। যেখানে মিল, সেখানে আর অহং নয়, জীব বা আত্মা। তাকে নিয়েও বহুর উল্লাস চলতে পারে। তার মধ্যে তখন আর বিরোধ থাকে না, থাকে বৈচিত্র্য। অবশেষে বহুর সবগুলি দল সমাহৃত হয় একের মধ্যে। বলতে পারি, বিরোধে অহন্তা, বৈচিত্র্যে পূর্ণাহন্তা, আর সমাহারে পরাহন্তা। সমস্তই অহংএর বিকাশ—আত্মাতে অথবা ব্রহ্মে।

*

অহন্তার সঙ্কোচ ঘুচিয়ে জীবকে পেঁছতে হবে ব্রহ্মে। পেঁছবার অনেকগুলি পথের কথা এদেশের সাধনশাস্ত্রে পাওয়া যায়। তাদের মোটামুটি

দুটি ভাগ—একটি জ্ঞানপথ, আরেকটি ভক্তিপথ। জ্ঞানীরা ব্রহ্মকে বলেন নির্বিশেষ। তাঁদের পরম উপলব্ধি হল শূন্যতা অথবা 'একং সৎ'। এই উপলব্ধিতে জীব বা জগৎ কিছুই থাকে না। ভক্তের ব্রহ্ম সবিশেষ। জীব-জগৎকে তাঁরা মায়া বলে উড়িয়ে দেন না, বলেন তারা ব্রহ্মেরই পরিণাম। আবহমান কাল দুটি মতের মাঝে একটা বিরোধ চলে এসেছে। লক্ষণীয়, কর্মযোগ কোনও পথেই তার স্বারসিক মর্যাদা পায়নি। কর্ম সাধনার গোড়ার দিকে থাকতে পারে, কিন্তু সিদ্ধের কোনও কর্ম নাই, থাকলেও তা গৌণ—এই ভাব আমাদের মজ্জাগত।

বলা বাহুল্য, পূর্ণযোগের সাধনায় এমনতর কোনও একদেশিতা নাই। জ্ঞান ভক্তি আর কর্ম তিনের সাধনাই ত্যর মধ্যে ওতপ্রোত। আর প্রত্যেকটি সাধনায় ব্যক্তিগত বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তর—চেতনার এই তিন পর্বই পরিপূর্ণ মর্যাদা পায়। জ্ঞানের সাধনায় পূর্ণযোগী যেমন অন্তরাবৃত্ত হয়ে প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি সে-অপরোক্ষানুভূতির বীর্যকে ছড়িয়ে দেন বিশ্বের সর্বত্র এবং ব্যাপ্তিচৈতন্যের ক্রমবিরলতায় সব-কিছুকে ছাপিয়ে থাকেন নৈঃশব্দ্যের মহারিক্ততায়। প্রেমের সান্দ্রতা তাঁকে নিয়ে যায় অদ্বৈতানুভবের তুঙ্গতায়, অথচ আত্মচৈতন্যের আতত তন্ত্রীতে সেখানে কাঁপে বিলাসের মূর্ছনা, উপচিত হৃদয়ের আনন্দ উছলে চলে ভুবনের কূলে-কূলে। তাঁর কর্মপ্রেরণা সেই দিব্য সঙ্কল্পের পরীবাহ : আত্মসত্তার গহনে নৈষ্কর্ম্যে নিস্পন্দ হয়েও তিনি বিশ্বকর্মার অতন্দ্র আত্মবিচ্ছুরণের নিমিত্ত—প্রবেগে অধৃষ্য, রূপায়ণে ক্ষিপ্র, সেবায় মধুর।

প্রাকৃত চেতনার ক্ষুদ্র অহন্তা এমনি করে রূপান্তরিত হয় ভূমায়, পূর্ণাহন্তা বিস্ফারিত হয় পরাহন্তার লোকোত্তর অনির্বচনীয়তায়।

*

অহন্তার এই রূপান্তরের জন্য সাধককে প্রথমটায় নেতিবাদের আশ্রয় নিতেই হয়। নেতিবাদ মোক্ষবাদের অঙ্গীভূত, আর তার সাধন হল মন। সংসারে বাঁধা পড়েছে মন, সুতরাং বাঁধন খসাবার ভারও তাকেই নিতে হবে। বহুর সঙ্গে জড়িয়ে সে ছোট হয়ে আছে, তাকে মুক্তি দিতে হবে একের আনন্ত্যে। এক আকাশ, অনন্ত আকাশ—আপনাতে আপনি স্তব্ধ হয়ে আছে, অনুস্যূত

পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সবার মধ্যে। এই অন্তহীন একের ভাবনায় মনকে অভ্যস্ত করতে হবে। তাকে বারবার বলতে হবে, বহু সত্য নয়, সান্ত সত্য নয়—সত্য সেই অন্তহীন এক।

একের ভাবনা মনের পক্ষে সহজ নয়, কিন্তু বোধের পক্ষে সহজ, বোধের তা স্বধর্ম। মন আর বোধের তফাতটুকু সাধনার গোড়ায় বুঝে নেওয়া ভাল। মনের স্বভাব হচ্ছে টুকরা-টুকরা করে দেখা, আর বোধের স্বভাব হচ্ছে এক-রসপ্রত্যয়দ্বারা আস্বাদন করা। মনশ্চেতনা যেন আকাশে তারার ফুলকি, আর বোধ যেন সমস্ত আকাশ-ছাওয়া সবিতার আলো। স্ফুলিঙ্গ-চৈতন্যের পিছনেই আছে ব্যাপ্তিচৈতন্য, যা দেহ-প্রাণ-মন সবকিছুকে আবিষ্ট করে ইন্ধনে তাপ আর দীপ্তির মত জ্বলছে। মন যখন এককে ভাবে, তখন এই বোধের একটুখানি আভাস পায়। আভাসকে প্রভাসে রূপান্তরিত করবার প্রাথমিক দায় তার।

এই দায় নির্বাহ করা যেতে পারে দুই উপায়ে—পুরুষকারের দ্বারা আর প্রসাদের দ্বারা। পুরুষকার চাইবে তীব্রসংবেগের ফলে শক্তিকে উজানমুখে ঠেলে তুলতে। মনের পক্ষে এটা কতকটা সহজ। কি চাই তা সে না বুঝুক, কিন্তু কি যে চাই না তা সে বেশ বুঝতে পারে। যা চাই না, তাকে সে সবলে প্রত্যাখ্যান করে চলল—এর নাম নেতিসাধনা। নেতিতে সব দৃশ্য মুছে ফাঁকা হয়ে গেল। সেই ফাঁকাকে এসে পূর্ণ করল অদৃশ্যের আলো। মন সে-আলোতে হারিয়ে গেল। যা থাকল, তা বিশুদ্ধ বোধ মাত্র।

বোধে মনের সমাধি। সমাধির পর আবার ব্যুত্থান হয়, মন আবার এখানে ফিরে আসে। কিন্তু প্রথমেই সে রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসতে পারে না। যেমন সে হু-হু করে উপরে উঠে গিয়েছিল, তেমনি ধুপ করে আবার নীচে নেমে আসে। সমাধি আর ব্যুত্থানে তাই একটা বিরোধ দেখা দেয়। মনে হয়, সমাধি ওখানেই, এখানে নয়। তবে আর এখানে ফিরে আসা কেন? মন তখন ধরে সর্বনিরোধের পথ, পুরুষকারের যা চরম পরিণাম।

পুরুষকারে অহংএর ঝাঁঝটুকু থেকেই যায়। সম্যক্-দর্শনের পক্ষে সেটা মস্ত বাধা। কিন্তু পুরুষকারকে প্রসাদের অধীন করলে আর এ-ভয় থাকে না। প্রসাদের অনুভব হয় বোধে। বাইরে আলো, ভিতরে আলো—সব আলোয় আলোময়। তারই ছোঁয়ায় কমল ফুটছে। আভাস তিলে-তিলে প্রভাস হয়ে উঠছে। আমি কি নাই? আছি, কিন্তু তাঁর হয়ে। পুরুষকার কি নাই? আছে, কিন্তু সে সেই পরমপুরুষেরই পুরুষকার। তাঁরই সাধনা আমার মধ্যে। তাঁর

হওয়াই আমার হওয়া।

এই হওয়ার মধ্যে একটা তীব্র সংবেগ আছে। কূলছাড়া অতলের দিকে সমুদ্রের আকর্ষণ—এও আছে বই কি। কিন্তু যে-সমুদ্র অকূলে টানে, সেই সমুদ্র আবার কূলে ফিরিয়ে দেয়। বিন্দুতে তখন সিন্ধুর বৈভব, সমাধি আর ব্যুত্থানে একাকার। এই হল গীতার ব্রাহ্মী স্থিতি, মরমীয়ার সহজ সমাধি।

*

যেমন করে হ'ক, কূলের মায়া ছাড়তে হবে, সমুদ্রের অতলপানে ঝাঁপ দিতেই হবে। একদিকে আছে প্রকৃতির অতলান্ত—'অপ্রকেতং গহনং গভীরম্'; সেইখানে আমার অব্যাকৃত অহন্তার মূল। আরেকদিকে আছে পুরুষের অতলান্ত—অবর্ণ জ্যোতির পারাবার; সেইখানে আমার পরাহন্তার অনুপাখ্যতা। দুটি সিন্ধু এসে মিলেছে একটি বিন্দুতে। সেই বিন্দুতে অবগাহন না করলে অহংএর বিমুক্তি হয় না।

বিমুক্ত অহং রূপান্তরিত হয় আত্মভাবের চিদ্ঘনতায়। নারায়ণ তখন নরে, নরে-নারায়ণে এক যুগনদ্ধ অদ্বৈত সত্তা।

১০

সর্বাত্মভাব

জ্ঞানযোগের প্রথম সাধনা হল নিজেকে জানা। যে-আমি দেহ-প্রাণ-মনের নানা বিকারের সঙ্গে জড়িয়ে আছি, সে-আমি সত্য নয়, আমার আত্মস্বরূপ নয়। আত্মা অপরাপ্রকৃতি হতে বিবিক্ত, কূটস্থ শাশ্বত অস্তিত্বের প্রত্যয়ে অবিচল। এই আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আমাদের মুখ্য পুরুষার্থ।

আগেই দেখেছি, অপরা-প্রকৃতি হতে আত্মচৈতন্যকে বিবিক্ত করতে গিয়ে একেবারে শূন্যতার অতল গহনে অবগাহন করতে হয়, নইলে মূলাহন্তার শিকড়কে উপড়ে ফেলা যায় না, সুতরাং বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের বিজ্ঞানও সম্ভব হয় না। প্রকৃতি হতে মুখ ফিরিয়ে এই গভীরে তলিয়ে যাওয়ার পথকে বলতে পারি বিনাশের পথ। এই পথ ধরলে, এখন আমাদের চেতনার উপরে জাগ্রতের যে-দৃঢ়মুষ্টি তা শিথিল হয়ে যায়, অতিপরিচিত এই দেখাশোনার জগৎ ক্রমে আবছা হয়ে আসে, জোর ধরে অন্তরাবৃত্ত চেতনার এক স্থির দীপ্তি। বাইরের জগৎ তখন স্বপ্নবৎ, যেন ছায়ার ছবি। অন্তশ্চেতনা আরও প্রগাঢ় হলে আর সে-ছবিও থাকে না, স্বপ্ন পরিণত হয় সুষুপ্তিতে। তখন জগৎ নাই, শুধু আমি আছি; অথবা আমিও নাই, আছে এক প্রপঞ্চোপশম অস্তিত্বের শূন্যতা।

এই বিনাশের অনুভব চেতনার উত্তরায়ণের পরম কোটি। অনেকের মতে এই নীরূপ নির্ণাম নৈঃশব্দ্যে অবগাহন করাই জ্ঞানযোগীর পরম পুরুষার্থ। বিনাশদ্বারা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হতে হবে, আঁধারে ঝাঁপ দিয়ে আঁধারের গ্রন্থিকে বিকীর্ণ করতেই হবে, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও জানতে হবে বিনাশ (Non-being) পরমার্থের একটি বিভাব মাত্র, তার তুল্যবল আরেকটি বিভাব হল সম্ভূতি (Becoming)। বিনাশ মৃত্যুতরণ; কিন্তু অমৃতের সম্ভোগ সম্ভূতিতেই। বৈবস্বত মৃত্যুর হৃদয় হতে অমৃতদ্যুতিকে ছিনিয়ে এনে মর্তের প্রতীতিতে প্রতিষ্ঠিত করা—নচিকেতার দুঃসাহসী জৈত্র অভিযানের এই পরম তাৎপর্য।

*

অহন্তার সঙ্কোচ হতে মুক্ত হয়ে আত্মচৈতন্য বৃহৎ হবে এবং সেই বৃহ[illegible] চৈতন্য জগৎকে আবৃত করবে—বস্তুত এই হল আমাদের পরম পুরুষার্থ। অপরা-প্রকৃতি হতে অতএব জগতের মায়ার খেলা হতে নিজেকে সরিয়ে নি[illegible] বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপকে পাবার জন্য। সেই প্রগাঢ় পাওয়ার সুষুপ্তিকে আবা[র] এই জাগ্রতে ফিরিয়ে আনতে হবে, জাগ্রতে যে বহুর মেলা তার সর্বত্র অনুস্যূ[ত] এবং অবগাঢ় দেখতে হবে সেই পরম এককে। যিনি সবার অতীত, তিনি[ই] সব-কিছু হয়েছেন, যিনি 'একং সৎ' 'ঋতং বৃহৎ' বা ব্রহ্ম, তিনিই এই বহু[র] মেলা বা বিশ্ব। সুতরাং ব্রহ্মের কাছে বিশ্ব ব্রহ্মের প্রতিষেধ নয়। এই বৃহৎকে যখন আমি আত্মচৈতন্যে পাই, যখন অনুভব করি, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', তখ[ন] জগৎকেও সেই অনুভবের বিচ্ছুরণরূপে পাই। সুষুপ্তির আনন্দঘন একর[স] প্রত্যয় তখন জাগ্রতের প্রত্যেকটি অনুভব হতে বিকীর্ণ করে পরমের হিরণ্ম[য়] দ্যুতি। জগৎ তখন ব্রহ্ম; অর্থাৎ জগতের প্রতিটি অনুভব তখন সচ্চিদানন্দ ঘন। অনুভব আমারই অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের তা প্রস্ফুরণ। অতএব যেম[ন] 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—অনুভবের এই এক কোটি, তেমনি 'সর্বমাত্মৈব'—অনুভবে[র] এই আরেক কোটি। সোজা কথায় ব্রহ্ম জগৎ এবং আত্মা একে তিন, তিনে এক। যে-আত্মচৈতন্য বৃহৎ হতে গিয়ে মহাশূন্যতায় হারিয়ে যায়, সে-ই আবা[র] ফিরে আসে জগৎ হয়ে। এই উজিয়ে যাওয়া আর ভাটিয়ে আসাতেই অধ্যাত্ম-সাধনার পরিক্রমা পূর্ণ হয়।

যে-চেতনা উজিয়ে গেল, সেই চেতনা ভাটিয়ে এসে সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। চোখ বুজে অন্তরের গভীরে যাঁকে দেখছিলাম, চোখ মেলে বাইরে [যে] তাঁকেই দেখছি। দেখছি, 'এঁকেবেঁকে আকার এঁকে-এঁকে চলছে নিরাকার।' অন্তরে যাঁকে পাই, বাইরেও যদি তাঁকে না পাই, তাহলে তো পাওয়া পূর্ণ হল না।

অন্তরের পাওয়া যখন সত্যি-সত্যি গভীর হয়, তখন বাইরটা কিছুতেই তার বাদ সাধতে পারে না, অন্তরের রঙে সেও তখন রঙীন হয়ে ওঠে। বাইরের দোলায় অন্তরও তখন গভীরের কাঁপনে কেঁপে ওঠে। এটা অসম্ভব কিছুই নয়, চিদ্‌বিলাসের এই রীতি। প্রাকৃত জীবনেও দেখি এর ব্যত্যয় নাই। হৃদয় যখন পূর্ণ, জগৎ তখন মধুময়; আর জগতের মাধুরীতে হৃদয়ের আরও উল্লাস। পুরুষ আর প্রকৃতিতে তখন বিরোধ নাই, তখন 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং'— ওও পূর্ণ, এও পূর্ণ।

সর্বাত্মভাব

শূন্যতার অনুভব থেকে এমনি করে পূর্ণতায় উপচে ওঠা, সব-কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়ে আবার সব-কিছুকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরা—এরই নাম সর্বাত্মভাব বা আত্মচৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যে পরিব্যাপ্তি। এর জন্য দুটি সাধনার প্রয়োজন—এক সত্ত্বশুদ্ধি, আরেক অন্তরাবৃত্তি বা নিজের গভীরে ডোবা। আপনাতে আপনি থাকা—এ হল মুখ্য সাধন। আত্মবোধকে জাগ্রত করতে হবে সবার আগে। এখন আমরা নির্বোধ, দুনিয়ার সব কাজ করছি বটে, কিন্তু হুঁশে করছি না। কাজের ভূত চিন্তার ভূত ঘাড়ে চেপে আছে, সে-ই সব করিয়ে বা ভাবিয়ে নিচ্ছে। তাকে বিদায় করি এ-সাধ্য আমার নাই। একমুহূর্ত আমি খেলাচ্ছলেও নিষ্কর্মা বা নিশ্চুপ হতে পারি না। তাই আমার গভীরের আমিকে আমি জানি না। সত্য বলতে এটা আমার পৌরুষের পরাভব। আমি প্রকৃতির ক্রীড়নক।

এই পরাভবের গ্লানি দূর হতে পারে অন্তরাবৃত্তিতে, একাগ্রভূমিক ধ্যান-চিত্ততায়। চেতনার স্রোত প্রবৃত্তির খাতে বয়ে চলেছে, তাকে বাঁধলেই তার শক্তি বাড়ে। স্তম্ভিত চিত্তশক্তিকে অন্তর্মুখ করলে সে সূচীমুখ হয়ে আবিষ্কার করে চেতনার আরও গভীর স্তর। আত্মবোধ তখন জাগ্রত হয় এবং সেই বোধ প্রাকৃত চেতনার প্রশাস্তা হয়ে তার বৃত্তিগুলিকে পরিশুদ্ধ করে। বৃত্তির এই পরিশুদ্ধিকে বলে সত্ত্বশুদ্ধি। শুদ্ধ সত্ত্ব এই জগতের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারকে মার্জিত করে। প্রাকৃত ব্যবহারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনুরাগ বিরাগ এবং ভয়। এগুলি চিত্তের মল। এতে বস্তুর স্বরূপজ্ঞান বাধিত হয়। কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্বের দৃষ্টি স্বচ্ছ উজ্জ্বল এবং প্রসন্ন। এই দৃষ্টিতে জগৎকে সহজরূপে দেখতে পাই। তখন আর জগতে বিকার দেখি না—দেখি বিভূতি, পরম অদ্বৈতের উৎস হতে উৎসারিত বহুর লীলায়ন। নিবৃত্তি তখন প্রবৃত্তির রাস টেনে রাখে, তাই তার ছন্দ হয় সুষম, কোনও কারণে কোথাও বেচালে পা পড়ে না।

এমনি করে প্রপঞ্চোপশম আর প্রপঞ্চোল্লাস, ধ্যান আর কর্ম, নিবৃত্তি আর প্রবৃত্তি, সুষুপ্তি আর জাগ্রৎ—দুটিই যদি ওতপ্রোত হয়ে থাকে জীবনে, তাহলেই অদ্বৈতসিদ্ধির পূর্ণতা।

*

আত্মচৈতন্যকে বিস্ফারিত করা ব্রহ্মচৈতন্যে এবং সেই চেতনাকে পরিব্যা[প্ত] করা বিশ্বচৈতন্যে—অদ্বৈতসিদ্ধির এই রীতি। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই প্রত্যক্-বৃত্ত (subjective) অনুভব হতে পেঁছলাম 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এ[ই] পরাক্-বৃত্ত (objective) অনুভবে। এই হতেই সিদ্ধ হয় 'সর্বমাত্মৈব'। আত্মা ব্রহ্ম আর জগৎ—সম্বোধিতে (integral knowledge) তিন এক হ[য়ে] যায়।

অনুভবের কেন্দ্রে রয়েছে আত্মভাব, কেননা সমস্ত অনুভবের মধ্যে একমা[ত্র] আত্মানুভবই হল অপরোক্ষ। আমার যা-কিছু নিবিড়তমরূপে পাওয়া, [তা] হল আমার চেতনাতেই পাওয়া। অহংচেতনা সংকীর্ণ, তাই সে পায় অল্পকে আর আত্মচৈতন্য বৃহৎ, তাই সে পায় ভূমাকে। এইজন্য অহংচেতনার আত্ম-চৈতন্যে রূপান্তর হল সকল সাধনার গোড়ার কথা।

আত্মচৈতন্যের সর্বাত্মভাবে পরিণামের তিনটি ধাপের কথা বলেছেন উপনিষদের ঋষিরা। অন্যত্র তাকে আমরা অতিমানসের ত্রিপুটীরূপে বর্ণনা করেছি। তিনটি ধাপ হল আত্মাতে সর্বভূতের দর্শন, সর্বভূতে আত্মার দর্শন এবং সর্বভূতকে আত্মরূপে দর্শন। তিনটি অনুভবই অদ্বৈতানুভব, কিন্তু তাদের মধ্যে গাঢ়তার তারতম্য আছে। গোড়াতে একথাও বলে রাখা ভাল, এ-দর্শন নিত্যজাগ্রত ভূমির বা সহজসমাধির দর্শন, নইলে সর্বভূতের কথা এখানে আসত না। জগৎ এখানে মিথ্যা নয়, সত্য এবং আত্মচৈতন্যের অপরোক্ষতায় অনপলাপ্যরূপেই সত্য। তবে এও ঠিক, চোখ মেলে পরমার্থ-সৎকে প্রত্যক্ষ করবার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আগে চোখ বুজতেই হয়। অন্তরের অনুভব পাকা না হলে বাইরের অনুভব সত্য হয় না।

প্রথম অনুভব হল আত্মাকে সমস্ত-কিছুর অধিষ্ঠানরূপে দর্শন করা। আত্মচৈতন্য তখন সাক্ষি-চৈতন্য। এই চৈতন্যে জগৎ ভাসছে। আকাশভাবনায় এই অনুভবটি আনা সহজ হয়। আকাশ প্রশান্ত প্রোজ্জ্বল এবং প্রসন্ন—আলো আঁধার ঝড় বর্ষণ বিদ্যুৎ সবই চলেছে তার বুকের উপর দিয়ে, কিন্তু তবুও সে অক্ষোভ্য। সাধনার প্রথম অবস্থায় আকাশভাবনা ধরে তিতিক্ষার রূপ। সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের ঝড়ঝাপটা আমার উপর এসে পড়ছে, কিন্তু আমি টলছি না। এই অটলতার ইতির দিকটা হচ্ছে দেহ-প্রাণ-মনব্যাপী এ[ক] প্রশান্তির অনুভব। আর এই প্রশান্তি এক নিগূঢ় অস্তিত্বের দ্যোতক।

কিন্তু এই অস্তিত্ব ব্যাপ্তিধর্মা। আত্মচৈতন্যের কেন্দ্রে অস্তিত্বের অনুভ[ব]

জগতের প্রলয় হত। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না, তখন আমার অস্তিতার বোধ যুগপৎ রয়েছে কেন্দ্রে এবং পরিধিতে। কেন্দ্রে চৈতন্য সংহত, পরিধিতে ব্যাপ্ত। আত্মদীপের প্রভা বিশ্বকে তখন আলোকিত করছে।

এ-দেখা যখন খোলা চোখের দেখা অর্থাৎ এ-দেখায় যখন আমার দেহ-প্রাণ-মন সক্রিয়, তখন এ-দৃষ্টির বীর্য আমার প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটাবে। আমি দেখব এক নতুন চোখ নিয়ে, নতুন প্রাণ দিয়ে সাড়া দেব, এক অনিরুদ্ধ শক্তির প্রপাতে আপনাকে প্লাবিত অনুভব করব।

এই শক্তিপাত অনুভবকে আরও গভীর ক'রে আমায় উত্তীর্ণ করবে দ্বিতীয় পর্যায়ে। তখন দেখব, যে-আমি আমাতে, সেই আমি সবাতে। বলা বাহুল্য, আমার আমি তখন আর অহং নয়, কেননা অহং কখনও অপরের মধ্যে নিজেকে দেখতে পায় না। আবার এ-আমি কূটস্থ আত্মসত্তা নয় শুধু, এ-আমি সূত্রাত্মা অন্তর্যামী। আমার মধ্যে যে পরম আমির অপরোক্ষ অনুভব পাচ্ছি, তাকেই দেখছি ঘটে-ঘটে অনুপ্রবিষ্ট পরিস্পন্দিত এবং বিভাব্যমান। আত্মায় সর্বভূত শুধু আছে নয়, হচ্ছেও। বিশ্ব শুধু চৈতন্যে প্রকাশিত নয়, চৈতন্যে স্পন্দিত।

এই চিৎস্পন্দ বা হওয়ার প্রবেগকে একদিন আমার মধ্যেও অনুভব করেছিলাম, নইলে অধিষ্ঠান-চৈতন্যে পেঁছিন আমার দ্বারা সম্ভব হত না। কিন্তু সে-অনুভব ছিল বিবিক্ত, বিশ্বেও যে এই স্পন্দনের বেগ সমানে বয়ে চলেছে, এ-চেতনা আমার মধ্যে স্পষ্ট ছিল না। আজ দেখছি বিশ্বের অধিষ্ঠান এবং বিশ্বের স্পন্দনের মূলে একই চৈতন্য। চৈতন্য আর শক্তি পৃথক নয়, অরূপেরই রূপায়ণ রূপে-রূপে, ভূতে-ভূতে কোনও ব্যবধান নাই। বহু কোষের সমবায়ে যেমন এক দেহ, তেমনি বহু জীবের সমবায়ে এক বিরাট। শক্তি চৈতন্যেরই তরঙ্গ, আর সেই তরঙ্গায়ণে চৈতন্যের রূপে সংহনন। বিশ্বরূপ পরম আত্মভাবের চিদ্‌ঘনবিগ্রহ।

১১

আত্মার বিভাব

চেতনাকে বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে জগৎকে জানছি—এই হল জ্ঞানের প্রথম ধাপ। এটা প্রাকৃতভূমির সত্য। চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত করে যে জানছে তাকে জানছি—এই হল তার পরের ধাপ। নিজেকে জানা দিয়ে জ্ঞানযোগের শুরু।

নিজেকে দেখতে গিয়ে প্রথম দেখি নিজের চঞ্চল মনকে। দেখতে-দেখতে দৃষ্টি আরও গভীরে চলে যায়, দেখতে পাই চঞ্চল মনের অধিষ্ঠানরূপে এক অচঞ্চল বোধকে। যেন ঝিকিমিকি তারার পিছনে এক প্রশান্ত পরিব্যাপ্ত আকাশের মহিমা। এই বোধ হল বিজ্ঞান। তাকে জড়িয়ে আছে এক স্বচ্ছ প্রসন্নতা। সব জড়িয়ে এক সুনিবিড় অস্তিত্বের বোধ। এই হল আত্মবোধ: বিদ্যুদ্‌গর্ভ প্রসন্ন অবিচল অস্তিত্বের বোধ।

শুধু অন্তরাবৃত্তিতে নয়, ক্রমে চেতনার বহির্বৃত্তিতেও এই বোধ অবিচ্ছিন্ন থাকে। তখন দেখি, এ-বোধ শুধু আমারই গভীরে নয়—সবার গভীরে। 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা।' শুধু তা-ই নয়, এ-বোধ সব-কিছুরই গভীরে। যাকে বলি চেতনা আর প্রাণ তার গভীরে তো আছেই, যাকে বলি জড় তারও গভীরে স্তব্ধ হয়ে আছে এই বোধ। যেমন আমার দেহে আর প্রাণে, তেমনি বিশ্বের জড়ে আর শক্তিতে একই নিস্তব্ধ-চিন্ময় অস্তিত্বের উল্লাস। জড়ে আর শক্তিতে আমাতে আর বিশ্বে কোনও ভেদ নাই। সবই এক অখণ্ড একরস প্রত্যয়। আমার আত্মকেন্দ্র বিশ্বেরও নাভি। এই বোধ ব্রহ্মবোধ। আত্মবোধে আর ব্রহ্মবোধে কোনও তফাত নাই। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।'

অন্তরে-বাইরে এই বোধ, এই বোধ জাগ্রতে-স্বপ্নে-সুষুপ্তিতে, ভাবনায় সঙ্কল্পে কর্মে এই বোধের বিচ্ছুরণ—যোগজীবনের এই লক্ষ্য।

আত্মবোধের পরিব্যাপ্তিতে ব্রহ্মের বোধ। এ-বোধ অন্বয়। বহুর নিরসনে অন্বয় নয়, বহুর সমাহারে অন্বয়। অন্বয় অধিষ্ঠান, বহু তার বিভঙ্গ। এক আর বহুতে কোনও বিরোধ নাই, বিরোধের কল্পনা মনের মায়া। দার্শনিক স্বগতবিরোধের কথা বলেন—যেমন গাছের ডাল-পাতা-ফুল-ফলে। কিন্তু বিরোধ না বলে সেখানে বলা উচিত স্বগতবৈচিত্র্য। ডাল পাতা ফুল ফল

নিয়েই গাছ। আবার সবার মধ্যে একই প্রাণ একই রসের খেলা। আত্মা বা ব্রহ্মও এমনি করে বৈচিত্র্যের সমষ্টি এবং সার দুইই।

বিভূতিবৈচিত্র্যে শক্তির উল্লাস। আবার এমন ভূমিও আছে, যেখানে এ-উল্লাস নাই। ব্রহ্ম সব হয়েছেন, কিন্তু হয়ে ফুরিয়ে যাননি। সবাইকে ছাপিয়েও তিনি আছেন, আছেন নির্বিশেষ হয়ে। ব্রহ্ম বিশ্বাতীতে নির্বিশেষ, বিশ্বে বিচিত্র, ব্যক্তিতে একক। তাঁর তিনটি বিভাব, তিনটিতে ওতপ্রোত। প্রমাণ আমার আত্মচৈতন্যে। চেতনার বিচিত্র বৃত্তি এসে মিলেছে যে-বিন্দুতে, সেখানে আমি একক। আবার চেতনার এমন ভূমি আছে, যেখানে কোনও বৃত্তিই নাই। বৃত্তিহীন শূন্যতায় আমি একা, বৃত্তিবৈচিত্র্যের বিধৃতিরূপে আমি একক। সর্বাবস্থায় অন্বয় এই আমি এক পরম-আমিরই আ-ভাস। অনুভব গাঢ় হলে দেখি, সেই আমির কুক্ষিগত এই আমি।

এই আমি সত্য। কিন্তু কিভাবে সত্য তা বুঝতে গেলে একটু গভীরে ডুবতে হবে।

*

যেমন সত্য আমি আছে, তেমনি আছে মিথ্যা আমিও। একটিকে বলি আত্মা, আরেকটিকে অহং। চঞ্চল মনের কথা বলেছি, বলেছি তারই পিছনে স্থির বোধের কথা। চঞ্চল মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে-আমি, সে হল অহং; আর স্থির বোধরূপে তার যে-অধিষ্ঠান, তা-ই আত্মা।

অহংএর চেতনা আছে, কিন্তু আত্মা চিৎস্বরূপ। দুয়ের মধ্যেই চৈতন্য—কিন্তু একটিতে চৈতন্য বহিরাবৃত্ত, আরেকটিতে অন্তরাবৃত্ত। বাইরে বিষয়কে দেখে অহং; আর আমাকে আমি যখন দেখছি অর্থাৎ বিষয় আর বিষয়ী যখন একাকার তখন আমি আত্মা। এই আত্মবোধে চেতনা যেমন ঘনীভূত হয়, তেমনি আবার পরিব্যাপ্তও হয়। ঘনীভূত বিন্দুচেতনার বহু হতে কোনও বাধা নাই। আর পরিব্যাপ্ত চেতনা সব-সময়ই এক। যেমন আকাশে অগণিত নক্ষত্র। তাদের বিন্দুজ্যোতি বহু, কিন্তু সব মিলিয়ে ব্যাপ্তজ্যোতি এক। সাংখ্যের পরিভাষায় বলতে পারি, বহু বিন্দুজ্যোতি বহু আত্মা, আর ব্যাপ্তজ্যোতি এক পরমাত্মা। তটস্থ দৃষ্টিতে তাঁকে বলি ব্রহ্ম, আর ষোলকলায় পূর্ণ পুরুষ-রূপে যখন দেখি, তখন বলি ভগবান্। ব্যাপ্তজ্যোতিতে ব্রহ্ম পরমাত্মা বা

ভগবান যা-ই বলি না কেন, তার অংশভূত বিন্দুজ্যোতি কিন্তু সত্য এ
নিত্য।

একটা কথা এখানে বলে রাখা ভাল, অংশ বলতে কিন্তু টুকরা বোঝা
না, বোঝায় অংশু বা কিরণ। বেদে অংশ বলে একজন আদিত্য ছিলেন
আদিত্যচেতনার পরম প্রকাশ যে-বরুণে, তিনি তাঁর সযুক্ এবং সমধর্মা। এ
অংশই গীতার 'মমৈবাংশঃ সনাতনঃ' বা জীবাত্মা অর্থাৎ সত্য এবং নিত্য স্বাং
ইনি মিথ্যা নন, মিথ্যা হল এর নকলে যে-অহংএর সৃষ্টি হয় তা-ই। বহু জী
আবার নিত্য জীব। একত্বই সত্য আর বহুত্ব মিথ্যা, এটা মনে করা ভুল। মি
হল 'নানাত্ব' অর্থাৎ বহুর মেলায় একের সঙ্গে আরেকের তফাত করাটা
মিথ্যা। আকাশ জুড়ে একই তারার-আলো, আবার কত তারার ঝিকিমিকি
এর কোনটাও তো মিথ্যা নয়। সবই যে আলো, সবই যে সত্য।

শুধু স্বরূপে সত্য নয়, প্রকৃতিতেও সত্য। অর্থাৎ শুধু নিত্যের সত্য নয়
লীলারও সত্য। গীতায় তাই পুরুষোত্তম বললেন, আমার দুটি প্রকৃতি-
একটি পরা, আরেকটি অপরা। অপরা-প্রকৃতির আশ্রয়ে যে ফোটে, সে হল
অহং। সে বহু এবং মিথ্যা। আর পরাপ্রকৃতিকে আশ্রয় করে যিনি ফোটেন
তিনি জীবাত্মা। তিনি বহু এবং সত্য। বহুতে তখন কোনও বিরোধ নাই।
যেন আলোতে-আলোতে মেশামেশি। সেখানে অভেদের মধ্যে ভেদ। তাইতে
সম্বন্ধের উল্লাস, লীলার আস্বাদন, জগতের চিন্ময় সত্যতা। ভক্ত তাই বলেন
আমি চিনি হতে চাই না, চিনি খেতে চাই। কথাটা একদিক দিয়ে সত্য
অনুভব রসবর্জিত নয়, তাতে আস্বাদন আছে। আস্বাদন থাকলেই সম্বন্ধ
আছে, ভেদ আছে। কিন্তু সে-ভেদ আলাদা করে না, নিবিড় করে কাছে টানে
এক পরম অভেদে সব ভেদ ডুবিয়ে দেয়। তখন চিনি খেতে-খেতে আমি
চিনি হয়ে যাই। আবার চিনি হয়ে চিনি খাই। তখন সবই চিনি, সবই মধুর
মধুর রসে সবই মধুর।

শুধু সমাধির সুষুপ্তিতে বা ধ্যানের স্বপ্নে একরস মাধুর্যের অনুভব
নয়। এ-অনুভব জাগ্রতের বৈচিত্র্যে। আমার দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় আর মন, আমার
ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প আর কর্ম সবই মধুর, ব্রহ্মসংস্পর্শের অত্যন্তসুখে
নন্দিত। তাঁর সত্যে সব সত্য, তাঁর চৈতন্যে সব চিন্ময়, তাঁর প্রাণে সব প্রাণময়।
সবই তিনি, সবই তাঁর আত্মবিভাবনার (self-formulation) বিচিত্র উল্লাস।
তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর-কেউ নাই : 'একমেব—অদ্বিতীয়ম্'।

আর-কিছুই নাই : 'ন কিঞ্চন মিষৎ'। বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু বিরোধ নাই : 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'।

*

অপরা-প্রকৃতির আশ্রিত অহং, পরা-প্রকৃতিকে আশ্রয় করে জীবাত্মভাব, আর পরমাপ্রকৃতির সঙ্গে যুগনদ্ধ পরম-পুরুষ—একের আত্মবিভাবনার এই এক ত্রিপুটী। আবার গীতাতে আরেকটি ত্রিপুটীর কথা আছে—ক্ষরপুরুষ, অক্ষর-পুরুষ আর পুরুষোত্তম। সবই পুরুষ : 'পুরুষ এব ইদং সর্বম্'। একই পুরুষ ভূতে-ভূতে বিচিত্র রূপে অভিব্যক্ত : 'মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'। তখন তিনি ক্ষরপুরুষ। যেমন তিনি ব্যক্ত, তেমনি তিনি আবার অব্যক্ত; রূপে-রূপে নিজেকে রূপায়িত করেও তিনি অরূপ : 'ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য'। তখন তিনি অক্ষরপুরুষ। ক্ষরপুরুষ আর অক্ষরপুরুষ আলাদা নন, অথবা দুয়ে কোনও ক্রমপর্যায় নাই। বেদের ভাষায় এ যেন 'অক্ষীয়মাণম্ উৎস শতধারম্'। একটি অক্ষয় জলাধার, তাহতে শত-ধারায় জল বয়ে চলেছে। ধারা কাঁপছে, কিন্তু আধার অচঞ্চল। ধারা অশ্রান্ত, আধার অক্ষয়। একদিকে শক্তির উন্মেষ, আরেকদিকে নিমেষ। সত্তার নৈস্পন্দ্যে স্পন্দ—যুগপৎ। দুয়ের মাঝে কোনও দ্বিধা নাই, কিন্তু দ্বিধা জাগে মনে। ক্ষরস্রোতে যখন সে ভেসে চলেছে, তখন অক্ষরের খবর সে রাখে না। আবার অক্ষরের মাঝে স্থিত হতে গিয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলে, ক্ষর তখন তার কাছে বিলুপ্ত। তাই একবার সে বলে, শুধু ক্ষরই আছে—যখন সে নাস্তিক; আবার সে বলে, শুধু অক্ষরই আছে—যখন সে নেতিবাদী।

তবে সত্যকে পুরাপুরি জানতে হলে ক্ষর হতে অক্ষরের দিকে উজিয়ে যেতেই হয়। অক্ষরস্থিতি হল তুরীয় পুরুষার্থ—ওই অক্ষীয়মাণ উৎসে পৌঁছন। কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ হল ওইখান থেকে আবার শতধারায় নির্ঝরিত হওয়া।

ক্ষরপুরুষের অতীত অক্ষরপুরুষ। তাঁর থেকে উত্তম হলেন পুরুষোত্তম—যিনি অক্ষর আধার আর ক্ষরন্ত ধারা দুইই। পুরুষোত্তমকে পাই পরিব্যাপ্ত গভীর সমগ্রবোধ দিয়ে। এই বোধ দ্বিধাবিভক্ত নয়—দ্বিদল, অথবা সহস্রদল। অক্ষরস্থিতির প্রশান্তি হতেই শক্তির উচ্ছলনের অনুভব। শক্তি তখন মুক্তির আনন্দহিল্লোল, আত্মবিসৃষ্টির উল্লাস। এই ক্ষরাতীত অক্ষরোত্তম পুরুষোত্তম-যোগই চেতনার উত্তম রহস্য।

*

তারপর আবার পাই ব্রহ্মের আর-দুটি বিভাব—সগুণ এবং নির্গুণ। একটা প্রচলিত সংস্কার আছে, সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মের চাইতে খাটো। আবার এমন দর্শনও আছে যা বলে, নির্গুণ তো ফাঁকা বুলি, তাকে ছাপিয়ে আছে সগুণ।

কিন্তু এমনি করে নির্গুণে-সগুণে বিবাদ বাধানো—এও একটা মনের মায়া। আসলে ব্রহ্ম 'নির্গুণো গুণী' নির্গুণ এবং সগুণ দুইই। তার মধ্যে ছোট-বড়র কোনও কথা ওঠেই না। গুণের প্রকাশ হয় চেতনার কাছে। সুতরাং গুণ দৃশ্য, আর দ্রষ্টা স্বরূপত নির্গুণ। যেমন আয়নায় রঙের ছায়া পড়ল; কিন্তু আয়নাতে নিজের কোনও রং নাই, থাকলে দৃশ্যের রূপটি সে ঠিক-ঠিক ধরতে পারত না। আবার রঙের প্রকাশের তারতম্য আছে। সব রং চলেছে রংছুটের দিকে; তাছাড়া সব রং মিলিয়ে হয় সাদা, তাকে ঠিক রং বলা চলে না। চৈতন্যও তেমনি যুগপৎ রংছুট অথবা সমস্ত রঙের সমাহারে সাদা। রংছুটকে বলি নির্গুণ, আর সাদাকে বলি সগুণ। সগুণ তাহলে অনন্তগুণের সমাহার—যতটুকু আমাদের বোধে আসে। বোধাতীত গুণও আছে, সে পড়ে নির্গুণের এলাকায়। সুতরাং নির্গুণের অর্থ গুণহীন নয়, বোধ্য গুণের অতীত। বোধ্য গুণের পরম সমাহার হল সগুণ। নির্গুণের মধ্যেই সগুণ, যেমন প্রাচীনদের দৃষ্টিতে অবর্ণ আকাশে আদিত্যের শুভ্রতা, আবার তাথেকে অনন্ত বর্ণের বিচ্ছুরণ। সব নিয়ে অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য। যেমন তিনি গুণাতীত, তেমনি গুণময়—আবার গুণাধীশও।

এইখানে আরেকটা কথা ওঠে। ব্রহ্মের অনন্ত গুণ—বোধে। তেমনি তাঁর অনন্ত শক্তি—ক্রিয়াতে। বেদান্তে আছে, বোধের দিক দিয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সাম্য হতে পারে, কিন্তু শক্তির দিক দিয়ে নয়। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি'—ব্রহ্মকে যে জানে সে ব্রহ্মই হয় : এটা কেবল বোধের ব্যাপার। কিন্তু ব্রহ্মের পূর্ণ শক্তি তাতে বর্তায় না। ব্রহ্ম যখন শক্তিময়, বেদান্তের মতে তিনি তখন ঈশ্বর। বলা হয়, জীব ব্রহ্ম হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর হতে পারে না।

কথাটার মধ্যে একটা ফাঁক আছে। ব্যষ্টি জীব কখনও ঈশ্বর হতে পারে না, কেননা তার ব্যষ্টিত্বের অর্থই হল শক্তির সঙ্কোচ। সুতরাং এদিক দিয়ে কথাটা সত্য। কিন্তু ব্রহ্মকে 'পেয়ে' যিনি ব্রহ্ম হন, তাঁর পুরাপুরি ব্রহ্ম হতে বাধা কোথায়? তাঁর মধ্যে ব্রহ্মের স্থিতির অনুভব যেমন পূর্ণ, গতির অনুভবও তেমনি পূর্ণ। সাধারণত জ্ঞান বলতে আমরা বুঝি এই স্থিতির অনুভব।

কিন্তু স্থিতি হতেই তো গতি। স্থিতির অনুভব যাঁর হয়েছে, তাঁর গতির অনুভব হতেও বাধা নাই। স্থিতির অনুভবে ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ; গতির অনুভবে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। অনুভব দুয়েরই হতে পারে, এবং একসঙ্গে হওয়াও সম্ভব। বরং স্থিতির অনুভব পূর্ণতা পায় গতির অনুভবে। ব্রহ্মের সত্তা চৈতন্য আর আনন্দকে অনুভব করেই থেমে যাই না, সেইসঙ্গে অনুভব করি তাঁর শক্তিকেও। জ্ঞান আর শক্তি যুগনদ্ধ, একটির অনুভব আরেকটির অনুভব আনবেই। সাংখ্যও বলেন, কৈবল্যজ্ঞানের দিকে যত এগিয়ে যাই, ততই ফোটে বিভূতি বা ঐশ্বর্য। পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য হল ব্রহ্মের জগদ্ভাব। যিনি আত্মাতে ব্রহ্মকে পান, তিনি জগৎকেও পান। ব্রহ্মভাব আর ঈশ্বরভাব তাঁর আত্মানুভবের এপিঠ-ওপিঠ। এইটিই গীতোক্ত সাধর্ম্যমুক্তি যা সাযুজ্যমুক্তির স্বাভাবিক পরিণাম।

ঈশ্বর হওয়ার অর্থ হল জগতের সঙ্গে এক হওয়া—শুধু অধিষ্ঠানে নয়, পরিণামেও। ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্প জগৎরূপে পরিণত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানী এই সঙ্কল্পশক্তির সঙ্গে এক হয়ে যান। এইখানেই তাঁর ঈশ্বরত্ব। অজ্ঞেরা মনে করে, ঈশ্বর যা-খুশি তা-ই করতে পারেন, জীব তো তা পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের খুশিটা জীব বুঝতে পারে, সেই খুশির সঙ্গে এক হয়েও যেতে পারে। সে-খুশির কালাপেক্ষা আছে। ঈশ্বরের সঙ্কল্পে সব হয়েই আছে, কিন্তু জগতে তার অভিব্যক্তি হয় কালকে ধরে। বিজ্ঞানীর অন্তরঙ্গ চেতনা ওই সঙ্কল্পের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, অর্থাৎ সেখানে তিনি কালাতীত ঈশ্বর; আর তাঁর বহিরঙ্গ চেতনা জগতে ঈশ্বরসঙ্কল্পের নিমিত্ত বা বাহন, সেখানে তিনি ঈশ্বরের কালবাহিত যন্ত্র।

সুতরাং ব্রহ্মকে পেয়ে ব্রহ্ম হওয়ার অর্থ ঈশ্বর হওয়াও।

*

নির্গুণ আর সগুণের মাঝে সে-সম্পর্ক, ব্রহ্ম আর দেবতাতেও সেই সম্পর্ক। ব্রহ্ম সর্বদেবময়, দেবতারা তাঁর বিভূতি। দেবতারা পুরুষবিধ বা পুরুষের মত (Personal), আর ব্রহ্ম অমানব (Impersonal) অথচ পুরুষবিধতার অধিষ্ঠান এবং উৎস। পরমার্থসৎকে (Absolute) আমরা নাম-রূপের ভিতর দিয়ে উপাসনা করতে পারি, কেননা যেমন তিনি নির্নাম ও নীরূপ, তেমনি আবার অনন্তনাম অনন্তরূপও।

নাম-রূপের উপাসনার স্তরভেদ আছে, ধাপে-ধাপে উঠে যেতে হয় নির্নাম-নীরূপের দিকে। প্রথমত বেছে নিই আমার মনের মত নাম আর রূপ; তিনিই আমার ইষ্টদেবতা। যেমন বহুর মধ্যে আমি অনন্য, তেমনি বহু দেবতার মধ্যে আমার ইষ্টদেবতাও অনন্য। আমি একান্তভাবে তাঁরই উপাসক। উপাসনার এই প্রথম ধাপ।

কিন্তু আত্মচৈতন্যের অনুধ্যানে যেমন তার ব্যাপ্তি ঘটে, আমার আমিকে আমি দেখতে পাই সবার আমিতে, তেমনি ইষ্টদেবতার অনুধ্যানেও দেবানুভবের ব্যাপ্তি ঘটে : দেখি সব দেবতাই তাঁর বিভূতি—তিনি অনন্তরূপ অনন্তনাম অনন্তগুণ। দেবতায়-দেবতায় কোনও বিরোধ নাই, যেমন আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তিতে তোমাতে-আমাতে কোনও বিরোধ নাই। উপাসনার এই দ্বিতীয় ধাপ।

তৃতীয় ধাপে সব নাম-রূপের সমাহার ঘটে এক পরমপুরুষে। উপনিষদে তাঁকে কখনও বলা হয়েছে 'পুরুষ', কখনও-বা শুধু 'সঃ'। পুরুষবিধতার অনুভবের এই হল চরম। তখন এক চিন্ময় নাম, চিন্ময় রূপ।

এই পুরুষ আবার নিরুপাধিক 'তৎ'স্বরূপ। তিনি নির্নাম নীরূপ অমানব। নাম-রূপের উপাসনায় শেষপর্যন্ত পেঁছতে হবে এইখানে।

আবার এখানে এসে দেখব, যিনি অবিগ্রহ এবং অমানব, তিনিই সবিগ্রহ এবং পুরুষবিধ। অরূপই সরূপ বিশ্বরূপ এবং ইষ্টরূপ।

কিন্তু সব মিলে এক অখন্ড অদ্বয় তত্ত্ব। অরূপে-রূপে কোনও বিরোধ নাই। অরূপে অনুরক্তি আর রূপে বিরক্তি, অথবা রূপে অনুরক্তি আর অরূপে বিরক্তি মনের মায়া মাত্র।

১২

সচ্চিদানন্দের অনুভব

আত্মচৈতন্যের বা ব্রহ্মচৈতন্যের, অথবা উপনিষদের ভাষায় পুরুষের তাহলে এই কয়টি বিভাব (mode) দেখতে পাচ্ছি। একই পুরুষ একাধারে ব্যক্তি বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত। আবার তিনি ক্ষর অক্ষর এবং পুরুষোত্তম; সগুণ ও নির্গুণ; সবিগ্রহ এবং অবিগ্রহ। এই বিভিন্ন বিভাবের মাঝে পরস্পর কোনও বিরোধ নাই, তারা একেরই মহিমা।

এই এককে জানতে হবে—সমস্ত বৈচিত্র্যের অতীতে শুধু নয়, সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও। আবার জানতে হবে শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়—বোধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। অবশ্য বুদ্ধির জানার একটা মূল্য আছে, মনের এলোমেলো জানাকে সে একটা সংহত তত্ত্বরূপ দেয়, বহুর পিছনে আবিষ্কার করে এককে। কিন্তু সবার পিছনে সবার মধ্যে আছেন সেই এক। এ শুধু জানলেই হবে না, সেই এক হতেও হবে। জানাকে হওয়ায় রূপান্তরিত করার কৌশলই হল যোগ।

যোগের দুটি ধারা—একটি উত্তরণ, আরেকটি অবতরণ। উত্তরণে ক্লিষ্ট প্রাকৃত চেতনা হতে আমরা মুক্তি পাই—ধ্যানের দ্বারা, বিজ্ঞানের দ্বারা, অন্তর্মুখ অনুভূতির প্রগাঢ়তার দ্বারা। অবতরণে সেই লোকোত্তর অনুভবকেই নামিয়ে আনি এই লোকে, এখানে থেকেও সেইখানে থাকি, বহুর মধ্যেও দেখি সেই এককে। বহুকে তখন অনুভব করি একের প্রতিষেধরূপে নয়, বিভূতিরূপে। বহুর মধ্যে এলেই যদি একের জ্ঞান হারিয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে জ্ঞান এখনও পাকা হয়নি। এককে জানাই আমাদের পরমপুরুষার্থ নিশ্চয়, কিন্তু তাঁকে জানতে হবে যেমন নিঃসঙ্গ একাকিত্বে, তেমনি আবার সম্বন্ধবৈচিত্র্যের উল্লাসে। তাছাড়া, জানার যেমন আনন্দরূপ আছে, তেমনি আছে শক্তিরূপ। এককে আনন্দরূপে যখন জানি, তখন এই বহুর মেলার মধ্যে থেকেই সব-কিছুকে অবিরোধে গ্রহণ করতে পারি, সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সব-কিছুকে তখন অনুভব করি এক চিন্ময় সমুদ্রের তরঙ্গদোলার রূপে। আর এই অসঙ্কোচ নিঃশঙ্ক অনুভব যখন আরও গাঢ় হয়, তখন দেখি জ্ঞানের শক্তিরূপ। আত্মানুভব তখন

হয় আত্মবিকিরণ। তখনই জ্ঞানের পূর্ণতা—শুধু লোকোত্তরে নয়, ইহলোকেও জ্ঞানের সিদ্ধি।

*

আকাশের মত সবার মধ্যে আবার সব ছাপিয়ে যে-এক, বেদান্তে তাকে বলা হয়েছে সৎ-চিৎ-আনন্দ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। সত্তা চৈতন্য আর আনন্দ—তিনটি আলাদা-আলাদা নয়; তারা একে তিন, তিনে এক। অবশ্য প্রাকৃত মন তাদের আলাদা ভাবতে পারে এবং ভাবেও। সে বলবে, আমি থাকলেই যে সবসময় আমার চেতনা থাকবে বা আনন্দ থাকবে, তা তো নয়। মূর্ছায় বা ঘুমে আমার চেতনা থাকে না, জাগ্রতে বা স্বপ্নে আমার সবসময় আনন্দ থাকে না। মরে গেলে আমি ফুরিয়ে যাব, আমার সত্তাও তখন থাকবে না। সুতরাং চৈতন্য বা আনন্দ তো সত্তার সঙ্গে অবিনাভূত (inseparable) নয়, আবার সত্তাও তো শাশ্বত নয়।

সত্তার দিক থেকেই মনের এই আপত্তিগুলির বিচার করা যাক। প্রথমেই দেখছি, ব্যষ্টি আমির সত্তা শাশ্বত না হতে পারে, কিন্তু সত্তা একটা শাশ্বত তত্ত্ব নয়—একথা বলা চলে না। আমি একসময় না থাকতে পারি, তবুও যা হতে আমার উৎপত্তি, আমার প্রলয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তারও প্রলয় হয় না। সমুদ্রের বুকে বুদ্‌বুদ উঠে আবার মিলিয়ে যায়, কিন্তু সমুদ্র তবুও থাকে। সব-কিছুর প্রলয়ে যে-শূন্যতা, তারও সত্তা আছে। কেউ-কেউ তাকে 'অসৎ' বলেছেন। কিন্তু বস্তুত অসৎও সৎ। তার নেতিবাচকতা আমাদের দিক থেকেই, স্বরূপত সে নেতিবাচক নয়। সত্তা একটি অনপলাপ্য সিদ্ধ তত্ত্ব।

মন এই সন্মাত্র থেকে চৈতন্য ও আনন্দের ক্রমিক অভিব্যক্তি কল্পনা করতে পারে। অভিব্যক্তির গোড়ায় চৈতন্য আচ্ছন্ন, এমন-কি নাস্তি-প্রায়। আনন্দও তা-ই। কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে একটা স্ফুরত্তার প্রবেগ আছে। চাই আরও আলো আরও আনন্দ—এ আকূতি প্রাণের মূলে। তার তর্পণ যে প্রবৃত্তির পথে হতে পারে, তা আমরা দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু চেতনা যে শুধু বাইরে ছড়ায় তা নয়, ভিতরেও সে গুটিয়ে আসে। তাকে বলি নি-বৃত্তি। নি-বৃত্তি-চেতনার পরাবর্তন অর্থাৎ তার নিজের মধ্যে আবার ফিরে আসা। সহজ কথায় তাকে বলতে পারি আত্মসচেতনতা। চেতনার প্রগতির একটা পর্বে আত্মসচেতনতা স্বভাবতই প্রবল হয়ে ওঠে। বহির্মুখ চেতনা অন্তর্মুখ হয়ে হয় যোগচেতনা।

যোগচেতনার গতি বিশুদ্ধ সন্মাত্রের বোধের দিকে। বহির্মুখ চেতনায় যেমন বিশেষের (particulars) প্রকাশ, অন্তর্মুখ যোগচেতনায় তেমনি প্রকাশ পায় সামান্য (universals)। সামান্য কালাতীত সম্ভাবনা মাত্র। বহু তার মধ্যে এক হয়ে আছে। বহুর বিবিক্ত বোধ সেখানে নাই, কিন্তু তার সমাহারের ঘনীভূত প্রত্যয় তবুও আছে। এই প্রত্যয়ে বিষয় আর বিষয়ীর মাঝে ব্যবধান ক্রমে লুপ্ত হয়ে আসে। অবশেষে অনুভূত হয় বিষয়ীর কেন্দ্র হতেই বিষয়ের বিচ্ছুরণের উদ্যত সম্ভাবনা। বিষয়ী তখন ব্যাপ্তিচৈতন্য।

এই বোধকে উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে 'সন্মূল সদায়তন সৎপ্রতিষ্ঠা' বলে। নিরুপাধিক এক সত্তা সব উপাধির মূলে, দেশে ও কালে এক সত্তার ব্যাপ্তি, এক সত্তাই সমস্ত ক্রিয়ার অধিষ্ঠান।

বাইরের চোখ দিয়ে যেমন আলো দেখি, তাকে অস্বীকার করবার কথাই যেমন ওঠে না, তেমনি অনুভবের চোখেও সন্মাত্রকে প্রত্যক্ষ করা যায়; তাকেই-বা অস্বীকার করব কেন? বাহ্য প্রত্যক্ষ এবং আন্তর প্রত্যক্ষ দুইই প্রত্যক্ষ, অতএব দুয়েরই তাত্ত্বিকতা অখণ্ডনীয়। একটিতে চেতনা প্র-বৃত্ত, আরেকটিতে নি-বৃত্ত —এইমাত্র তফাত। আর সে-তফাতও বুদ্ধির কাছে। বস্তুর প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি দুই নিয়েই এক অখণ্ড চেতনা। উপনিষদের ঋষিরা বললেন, যেমন বাইরের আকাশে সব-কিছু আছে, তেমনি আছে হৃদয়ের আকাশে। বাইরে-ভিতরে একই আকাশ।

এই আকাশ বিশুদ্ধ সত্তার প্রতীক। সমস্ত বিশেষের প্রতিষ্ঠারূপে সে নির্বিশেষ পরসামান্য (Supreme Universal)।

*

যেমন আকাশে আলো অথবা আকাশেরই আলো, তেমনি সত্তারই চৈতন্য। সত্তা আর চৈতন্যকে পৃথক করা যায় না।

আমার বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তা যেমন নির্বিশেষ সন্মাত্রের প্রমাপক নয়, বরং ঐ সন্মাত্রের সত্তাতেই আমার সত্তা, তেমনি আমার সীমিত মানসচৈতন্য ব্রহ্ম-চৈতন্যের প্রমাপক নয়। যেমন সত্তার বেলায়, তেমনি চৈতন্যের বেলাতেও প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিয়ম সমানে খাটে।

চৈতন্য বলতে আমরা সাধারণত বুঝি মানসচেতনা, আর সেটা বহুলাংশে

ইন্দ্রিয়নির্ভর জাগ্রৎ-চেতনার ব্যাপার। কিন্তু আমাদের মাঝে চেতনার পরিসর যে এত সঙ্কীর্ণ নয়, তা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি। আমাদের যেমন চেতনার জাগ্রৎ-ভূমি আছে, তেমনি আছে স্বপ্ন আর সুষুপ্তির ভূমি। সাধারণত ওদুটি ভূমি আমাদের স্ববশে নয়, যদিও সাধনার দ্বারা জাগ্রতের মতই তাদের বশে আনা যেতে পারে। জাগ্রৎ-চেতনারও আবার সদরমহল আর অন্দর-মহল আছে। অবচেতনা আর অচেতনা হল জাগ্রৎ-চেতনার অন্দরমহল। জাগ্রতের মধ্যে অলক্ষ্যে তাদের ক্রিয়া চলছে। তাছাড়া চেতনার উৎকর্ষের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে, আমাদের চেতনা যে পুরাপুরি মানুষের চেতনা, তাও বলা চলে না। আমরা মনে মানুষ, প্রাণের বহু প্রবৃত্তিতে পশু বা উদ্ভিদের মত, দেহে জড়ের মত। দেহের বহু মৌলক্রিয়া বিশুদ্ধ জড়ক্রিয়ার মত। আবার বৌদ্ধিক ক্রিয়াকে যদি চেতনার লক্ষণ ধরি, তাহলে জড়ের মধ্যেও তার অসম্ভাব দেখি না।

আসলে ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল। শুধু প্রাকৃতচেতনার উপর নির্ভর করে তার মীমাংসা করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতচেতনা নিজের বাইরে সব-কিছুকে জড় বলতে বাধ্য। অথচ ক্রিয়া দেখে অপরের মধ্যেও চেতনার অনুমান করতে তার বাধে না। বালকবুদ্ধিতে একসময় সব-কিছুর মধ্যে চৈতন্যের আরোপ সে করেছে। আবার সেয়ানা হয়ে সেই চৈতন্যকে অবশেষে সে গুটিয়ে এনেছে এনে নিজের মধ্যে। একটায় অগভীর চেতনার পরিচয় পাই, আরেকটাতে খণ্ডিত চেতনার। সমস্যার মীমাংসা হয় যদি চেতনাকে আত্মকেন্দ্রে সংহত করে তাকে আরও গভীর করি অর্থাৎ পরাক্-বৃত্ত চেতনাকে করি প্রত্যক্-বৃত্ত। এটা যোগের পথ।

এই পথে গিয়ে দেখি, যেমন সত্তার বেলায়, তেমনি চৈতন্যের বেলাতেও নিরুপাধিক অন্তরাবৃত্তিতে আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তি ঘটে। তখন সমস্ত-কিছুর মূলে সবার আয়তন ও প্রতিষ্ঠারূপে দেখি এক অখণ্ড চৈতন্য। যা সন্মাত্র তা-ই চিন্ময়; সত্তা আর চৈতন্যের মাঝে এক অবিনাভাবের সম্পর্ক।

সত্তা আর চৈতন্য একই তত্ত্বের দুটি বিভাব, তাই তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা প্রভেদ আছে। প্রভেদের প্রত্যয় জাগে শক্তির দিক থেকে। সত্তার শক্তি সুষুপ্তির মত অব্যক্ত, আর চেতনার শক্তিতে রয়েছে একটা স্ফুরত্তা। যেমন নিথর নির্বর্ণ আকাশে আলো ফুটছে। ফোটার তারতম্য আছে, তাই চেতনার মধ্যেও আমরা অপকর্ষ আর উৎকর্ষের একটা ক্রম দেখতে পাই।

গীতার একটি পরিভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি, আমাদের প্রাকৃত-চেতনা 'ব্যক্তমধ্য'—তার নীচে অব্যক্ত, উপরেও অব্যক্ত। এক মেরুতে অচেতনার অব্যক্ত, আরেক মেরুতে অতিচেতনার অব্যক্ত—আমাদের ব্যক্ত চৈতন্যের কাছে দুইই সমান অন্ধকার। বহুর প্রত্যয় দুর্মোচন হয়ে আছে এই ব্যক্তমধ্যের রাজ্যে। তাই চিৎ আর অচিতের কৃত্রিম ভেদেরও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অন্তরাবৃত্ত চেতনায় চিদ্‌বিশেষ যখন রূপান্তরিত হয় চিৎসামান্যে, তখন ঊর্ধ্বে এবং অধে চেতনার সমস্ত লোকগুলি প্রকট হয়ে পড়ে এক অখণ্ড সত্তাকে আশ্রয় করে। তিনিই বেদের 'বিরাট্' বা 'বিশ্বরূপ', বিশ্বভুবন তাঁরই প্রতিরূপ।

এমনি করে অন্তরাবৃত্ত আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তিতে বিরাটের অনুভবই জানিয়ে দেয়, সত্তায় আর চৈতন্যে কোনও ভেদ নাই। বলা বাহুল্য, এ-অনুভব মানসোত্তর, চেতনা যেখানে বিষয়কে বিষয়ী হতে বিবিক্ত করে জানে না মানসচেতনার মত, জানে তাদাত্ম্যবোধের দ্বারা আত্মবিভাবনার উল্লাসরূপে। বিশ্বকে জানার অর্থ তখন বিশ্ব হওয়া। চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিচয় এই হওয়াতে।

*

এই হওয়া হল সত্তার শক্তিরূপ। শক্তির নিমেষ-উন্মেষ আছে। বীজের মধ্যে বনস্পতি গুটিয়ে আছে, এটি শক্তির নিমেষদশা। বীজ বনস্পতিতে বিস্ফারিত হচ্ছে, এটি শক্তির উন্মেষদশা। আছে এবং হচ্ছে—দুইই সত্তার দুটি বিভাব। অস্তিত্বে যা নিস্পন্দ, তা-ই ভাবনায় বা হওয়াতে স্পন্দিত। নৈস্পন্দ্য আর স্পন্দনের আয়তন হল চৈতন্য। দুয়েরই বোধ হয় এবং হয় যুগপৎ। যেমন আমি আমাতে নিথর থেকেই আবার ছলকে পড়ছি। স্বপ্রতিষ্ঠ কবি-চেতনা হতে ছলকে পড়ছে কাব্য। সমস্ত বোধেরই এই ধারা। এক অক্ষর উৎস হতে সব-কিছু ক্ষরিত হচ্ছে। অক্ষরের ক্ষরণ এবং তার বোধ—তিনে একাকার। অক্ষর সন্মাত্র, ক্ষরণ শক্তি, দুটিকে ব্যাপ্ত করে আছে চৈতন্য।

নিস্তব্ধ একটি মুহূর্তে বোধ হচ্ছে, আমি হচ্ছি। এটি একটি মৌলসত্যের সাক্ষাৎকার। প্রত্যক্ষ করি, যেমন অশেষ আমার স্তব্ধতা, তেমনি অশেষ আমার হওয়া—তেমনি অশেষ বোধও। যা আমার সত্য, তা বিশ্বেরও সত্য—বিরাট

হয়ে বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে এটা আমি প্রত্যক্ষ করতে পারি। তার নাম লি
এক অখণ্ড অমেয় অনির্বচনীয় অস্তিত্বের চিন্ময় বিচ্ছুরণ।

বিচ্ছুরণ বা শক্তিক্রিয়ার দুটি বিভাব—এক বৈচিত্র্য, আর হল অকুণ্ঠ প্রবে
দুয়ের অনুভব ধরে আনন্দরূপ। বহুর মধ্যে যদি বৈষম্য দেখা দেয়, তাহলে
বেদনার সৃষ্টি হয়। তাও চেতনার সঙ্কোচের ফল। পরিব্যাপ্ত চেতনা বহু
মধ্যে আবিষ্কার করে সৌষম্য। সুখ-দুঃখ আলো-ছায়ার ছন্দোময় বিন্যা
শুভ্র চেতনায় অপরূপ বর্ণসুষমার বিচ্ছুরণ। সব-কিছু ছাপিয়ে এ-অনু
আনন্দের, কেননা এ-অনুভব বৃহতের।

তেমনি আনন্দ শক্তির মুক্তিতে, বিরাটের হওয়ার স্রোতে অপ্রতিহত বে
ভেসে চলাতে। যা-কিছু হচ্ছে, তারই লক্ষ্য চৈতন্যের বিস্ফারণ। অ
অনুভব সেখানে অবাধিত, শক্তি অকুণ্ঠ। অতএব তা আনন্দ।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, আত্মচৈতন্যের এমন পরমভূমি আছে যেখানে সৎ
চৈতন্য শক্তি ও আনন্দকে অবিনাভূতরূপে অনুভব করা যেতে পারে। এই
অনুভব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনুভব। এ-অনুভব যত প্রগাঢ় হয়, আত্মচেত
ততই বিস্ফারিত হতে থাকে। চরম অনুভব 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মা
ব্রহ্ম। চেতনার সকল ভূমিতেই যখন এ-অনুভব অব্যাহত থাকে, তখন তা
পরিণাম ঘটে দুটি অনুভবে : 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই সব-কিছুই ব্রহ্ম; আ
'আত্মৈব সর্বমভূৎ'—আত্মাই সব-কিছু হয়েছেন।

আত্মা বিশ্ব আর ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানই সম্যক্-জ্ঞান।

১৩

মনের বাধা

জ্ঞানযোগের দুটি লক্ষ্যের কথা বলেছি—আত্মজ্ঞান আর ব্রহ্মজ্ঞান। সবার আগে চাই আত্মজ্ঞান। জানতে হবে, দেহ-প্রাণ-মনের মূঢ়তা আর চাঞ্চল্য আমার স্বরূপ নয়, তাদের ছাপিয়েও আমার গভীরে এক প্রসন্ন-গম্ভীর প্রোজ্জ্বল বোধের ভূমি আবিষ্কার করা সম্ভব। এই বোধই আত্মবোধ—যা অকামহত, দুঃখে অবিচল, সুখে অনুচ্ছ্বসিত। তিতিক্ষায় পাই তার প্রথম পরিচয় : আঘাতে টলি না, ভিতরে গুটিয়ে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। এই স্তব্ধতার যে অন্তর্মুখ সংবেগ, তা চেতনার গভীরে উদ্ঘাটিত করে এক অসঙ্গ মহিমার বোধ। দেখি, জগৎ থেকে আমি আলাদা হয়ে গেছি, আমি আমাতেই পর্যাপ্ত।

এই আত্মবোধের পরিপাকে দেখা দেয় ব্রহ্মবোধ। অন্তর্মুখীনতায় যে-চেতনা বিবিক্ত আত্মবোধে সংহত হয়েছিল, তা-ই আবার অনায়াস ব্যাপ্তিচৈতন্যে বিস্ফারিত হয়। বোধের আকাশে একটি যেন ধ্রুবতারার বিন্দুঘনতা, আরেকটি যেন সেই আকাশেরই প্রভাতরল অমেয় বিস্তার। যুগপৎ দুটি বোধই সম্ভব। তখন বলি, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।'

বোধের এই প্রথম সমাহার। কিন্তু তারও মধ্যে আবার উজান-ভাটা আছে। এ-বোধে জগৎ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। প্রথমত প্রাকৃত জগদ্-বোধের উজানে গিয়েই আমরা আত্ম-ব্রহ্মের বোধকে আবিষ্কার করি। তখন একসময় জগৎ বিলুপ্ত হয়ে যায়। বোধের আকাশে সূর্য চন্দ্র তারার ঝিকিমিকি কিছুই থাকে না। আবার দেখি, সুষুপ্তির মধ্যে যেমন স্বপ্ন ফোটে, তেমনি অনালোকের রিক্ততায় ফোটে ভাবের বর্ণোচ্ছ্বাস, ভাব পরিকীর্ণ হয় বস্তুর স্ফুলিঙ্গে। কিন্তু তখনও আকাশ আকাশই থাকে।

আকাশের বুকে আলো, আলোর বুকে বর্ণবিভঙ্গ, তিনটিকে যুগপৎ ধারণা করতে পারলে পাই বোধের দ্বিতীয় সমাহার। এই সমাহারে উপলব্ধির পূর্ণতা এবং তা-ই পুরুষোত্তমের স্বরূপ।

দেখতে পাচ্ছি, দেহ-প্রাণ-মন সব ছাপিয়ে নির্বর্ণ আকাশে যে তলিয়ে যাওয়া, তা-ই উপলব্ধির শেষ নয়, যদিও পরম উপলব্ধির তা অপরিহার্য

ভিত্তি। দেহ-প্রাণ-মনের উজানে সচ্চিদানন্দের অনুভব নিশ্চয় : কিন্তু সে অনুভব দিয়ে এদের যদি আবিষ্ট জারিত এবং রূপান্তরিত করতে না পারি তাহলে আমার সিদ্ধি অর্ধসিদ্ধি মাত্র। পূর্ণসিদ্ধিতে আমি যেমন বিশ্বাতীত তেমনি আবার বিশ্বাত্মক, যেমন আমি দেশ ও কালের অতীত অব্যক্তের আনন্দ তেমনি দেশ ও কালে তরঙ্গিত প্রপঞ্চের অফুরন্ত উল্লাস। আমার ব্যুত্থানে সমাধিতে তখন বিরোধ নাই—আমি ব্যুত্থানে সমাহিত, আবার সমাধিতে তেজস্ক্রিয়ায় নন্দিত এবং ব্যুত্থিত।

অবশ্য এমনতর অখন্ড নিটোল অনুভব অতিমানস ভূমিতেই সম্ভব। কিন্তু মানুষকে সাধনা শুরু করতে হয় মন দিয়ে। অতিমানসকে বোঝবার পথে মনের কতকগুলি বাধা আছে। এই বাধাগুলিকে ভাল করে চিনে নিয়ে তারপর অতিমানসের প্রসাদ এবং অভ্যাসযোগের অনুশীলনের দ্বারা তাদের জয় করতে হবে।

*

মনোময় পুরুষ আর চিন্ময় পুরুষের স্বরূপ আলাদা। প্রাকৃত মানুষ মনোময় পুরুষ—দেহ প্রাণ আর মন নিয়েই সাধারণত তার যত কারবার। আর চিন্ময় পুরুষ দিব্য-স্বভাব—অনন্ত সত্তা, অনন্ত চিৎ-শক্তি, অনন্ত আনন্দ আর অতিমানস বিজ্ঞানের অনন্ত সামর্থ্য তাঁর স্বধর্ম। দিব্যপুরুষ অমৃত-স্বরূপ; আর প্রাকৃত পুরুষ মরণধর্মা, যদিও অমৃতের পিপাসা তার আছে। দিব্যপুরুষের চেতনা সবাইকে জড়িয়ে, আবার সবাইকে ছাপিয়ে; আর প্রাকৃত পুরুষের জ্ঞান আধারের সঙ্কোচে সঙ্কুচিত—পরকে জানতে গিয়ে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আর অনুমানের উপর ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে তাকে চলতে হয়। দিব্যপুরুষের আনন্দ সবাইকে নিয়ে, অথচ কারও উপর তার নির্ভর নয়; আর প্রাকৃতপুরুষের বিষয়রতিতে কেবল সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব। দিব্যপুরুষের অতি-মানস চেতনায় প্রজ্ঞা সঙ্কল্প আর সিদ্ধিতে কোনও ব্যবধান নাই; আর প্রাকৃতপুরুষের মানস চেতনায় কেবল জ্ঞানের জোড়াতালি, আর তাই সঙ্কল্পের সামর্থ্যও কুণ্ঠিত। দিব্যপুরুষ অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত অতএব স্বরাট্; আর প্রাকৃতপুরুষ সংহত বিকীর্ণ অতএব পরবশ। দুটি চেতনার মাঝে তাই এক দুস্তর ব্যবধান।

দেবতাকে মানুষ তাই চেনে না, চিনতে চায় না, বা চিনতে গিয়েও ফাঁপরে পড়ে। দেবতা কাছের নন, অনেক অনেক দূরের—এই তার মনের প্রথম রায়। তাঁকে পেতে হলে অকূলে ভাসতে হবে; আর একবার ভাসলে পরে একূলে ফেরা যাবে না। তাঁকে শূন্য বল, সদ্‌ব্রহ্ম বল, আর ঈশ্বরই বল—সবই ওকূলের পরিচয়, একূলের নয়। ওকূলে কেবলই আলো, আর একূলে আলো-ছায়ায় মেশামিশি—দুয়ের মাঝে মিল কই?

এই হল মনের মায়া। আর এ-মায়া 'দুরত্যয়া'—অধ্যাত্মচেতনার উত্তুঙ্গে উঠেও এ-মায়ার ঘোর কাটতে চায় না। দিব্যে আর অদিব্যে একটা ব্যবধানের কল্পনা নিয়ে মন সাধারণত তার সাধনা শুরু করে। অধিকাংশক্ষেত্রে সাধনার ভিত্তি হল দুঃখবাদ—আনন্দবাদ নয়। আর একূলে-ওকূলে ব্যবধানের সংস্কার এসেছে দুঃখবাদ থেকেই। দুঃখবাদী বলেন : এখানে যে দুঃখ আছে একথার কাটান নাই। এই দুঃখের হাত থেকে রেহাই চাই। সার্থকভাবে তা পেতে পারি একমাত্র চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে, নিজের গভীরে তলিয়ে গিয়ে। তখন এক অবিচল চিদানন্দময় সত্তার সাক্ষাৎ পাই। যতক্ষণ তার মধ্যে ডুবে থাকি, ততক্ষণই আমার অস্তিত্বের সার্থকতা। ওখান থেকে ফিরে এলে আবার সেই সংসার সেই ঝামেলা সেই দুঃখের আবর্ত। সুতরাং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ওকূল দিব্য আর একূল অদিব্য। দুয়ের মাঝে সেতুবন্ধন অসম্ভব।

*

অথচ সেতুবন্ধন করতেই হবে। অখণ্ড সত্তাকে যে-মন অন্যোন্যবিরোধে খণ্ডিত করল, সেই মনই আবার অনুভব করে, এ-বিরোধের সমাধান কোথাও আছে। মনও অদ্বৈতকেই চায়। এখন প্রশ্ন এই : অদ্বৈত কি দ্বৈতকে বাদ দিয়ে, না দ্বৈতকে নিয়েই? ব্রহ্ম কি জীব-জগতের অতীত, না তিনি জীবজগদ্-বিশিষ্ট? অদ্বৈতের স্বরূপ কি?—তার পর্যবসানে কি বিনাশে, না সমন্বয়ে?

এ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে ঝগড়ার অন্ত নাই। ঝগড়াটা অবশ্য মনগড়া। মনের স্বভাব হল একটা-কিছুকে একান্ত করে দেখা। তার কাছে যখন জগৎ আছে, তখন ব্রহ্ম নাই; আবার যখন ব্রহ্ম আছেন, তখন জগৎ নাই। তাই অদ্বৈতভাবনায় স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়ে বিনাশের দিকে।

কিন্তু মনই অদ্বৈতসিদ্ধির একমাত্র সাধন নয়। মনের পরেও আছে বোধি।

তার মধ্যে আছে সমন্বয়ের একটা সহজ দৃষ্টি। এ-দৃষ্টি বিনাশ আর সম্ভূতিকে একসঙ্গে দেখতে পায় বলে পূর্ণাদ্বৈতের সে প্রকৃষ্ট সাধন। মনের অদ্বৈত আর বোধির অদ্বৈত—অদ্বৈতসাধনার এই দুটি দিক নিয়েই আলোচনা করি পর-পর।

মনশ্চেতনা হল প্রাকৃত জীবনের বনিয়াদ। মনের ভাবনা (thinking) বিক্ষিপ্ত, বেদনা (feeling) সুখ-দুঃখে বিকল। জীবনে তাই এত অস্বস্তি। এই অস্বস্তির মোক্ষম প্রতিকার হতে পারে, যদি মনকে মেরে ফেলা যায়। যোগী তাই ধরেন নিরোধের পথ। প্রবৃত্তির বশে মন বাইরে ছোটে, এখন তাকে টেনে তাকে অন্তর্মুখ করতে হবে। তার জন্য চাই বিষয়ে বৈরাগ্য, কর্মে অনাসক্তি, ইন্দ্রিয়ের দ্বাররোধ। এমনি করে বাইরের ব্যাপারকে শান্ত করে আন্তর ব্যাপারকেও শান্ত করতে হবে। বৃত্তিনিরোধের ফলে চিৎ-শক্তি একাগ্র হবে এবং তাতে নানা অভূতপূর্ব দর্শন ও বিভূতির উন্মেষ হবে। কিন্তু যোগী জানবেন, এগুলি মনের মায়া। তাঁর লক্ষ্য অমনীভাব, কৈবল্য। সমাধির প্রত্যন্তে এসে তাঁর চেতনায় আর কিছুই ভাসবে না। তখন বস্তুও নাই, ভাবও নাই—আছে এক অবর্ণ শূন্যতা।

কিন্তু এ-অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকা যায় না। মাটির টানে যোগীকে আবার নীচে নেমে আসতে হয়। তখন তাঁর মনে হয়, মাটির টান মানেই দেহের টান। যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ পিছটান আছে, সুতরাং বন্ধনেরও সম্ভাবনা আছে। তাই সমাধিতে চাই শুধু মনের নিরোধ নয়—প্রাণেরও নিরোধ, প্রপঞ্চের উপশম শুধু নয়—জীবনেরও উপশম। বিদেহমুক্তিই যোগীর পরম পুরুষার্থ, জীবন্মুক্তি তাঁর কাছে হেয়।

যোগচেতনার পরম উজানে এই শূন্যতার বোধ। আগেও বলেছি, এ-অনুভব মিথ্যা নয় কিংবা পূর্ণযোগের সাধনায় উপেক্ষণীয়ও নয়। কিন্তু এ যদি মনের দুরাগ্রহ বা সাধনায় হঠকারিতার পরিণাম হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে পূর্ণযোগীর নালিশ আছে।

প্রথম নালিশ নিরোধবাদের দার্শনিক উপপত্তির বিরুদ্ধে। জীবনের মূলে কেবল দুঃখ, একথা সত্য নয়। জীবনে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি সুখও আছে, আর জীবনের প্রবর্তিকা শক্তি সে-ই। প্রাণ আর আনন্দ অবিনাভূত। যে-দর্শন আনন্দকে প্রত্যাখ্যান করে, সে একদেশদর্শী। তাছাড়া দুঃখের উচ্ছেদ করতে গিয়ে চেতনার বিলোপ ঘটানোই যদি একমাত্র পথ হয়, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায়

মাথা কেটে ফেলে মাথাব্যথা আরাম করার মত। আর দুঃখকে এত ভয়ই-বা কেন? তার মূল্য কি কেবল নেতিবাচক? তার কি রূপান্তর ঘটে না? প্রবুদ্ধ পুরুষের চিত্তে সে কি বীর্য জাগায় না? বিপ্রলম্ভের বেদনায় মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ, পৃথিবীর বিমূঢ় আর্তিতে সম্যক্‌সম্বুদ্ধের মহাকরুণা—এ কি লোকোত্তর চেতনায় দুঃখেরই মহার্ঘ রূপান্তর নয়?

দ্বিতীয় কথা, অসংস্কৃত মনকে জোর করে নিরুদ্ধ করলেই যে তা পরম-চেতনায় সমাপন্ন (absorbed) হবে, তার কোনও প্রমাণ নাই। প্রাচীন যোগীরা একথা জানতেন। তাঁরা তাই জড়সমাধির ফলে প্রকৃতিলয়ের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। ব্যাপারটা একরকম তামসী যোগনিদ্রা। সাধারণ ঘুমেও মনোলয় হয়ে একধরনের সমাধি হয়, কিন্তু তাতে চেতনার কোনও রূপান্তর হয় না—ঘুমের আগে মানুষ যা ছিল, ঘুমিয়ে উঠেও তা-ই থাকে। জবরদস্তির সমাধিও এইধরনের। সুইচ্ তুলে মনের আলো নিবিয়ে দিয়ে সমাধি আনা—অভ্যাসবলে এমনটা সম্ভব হয়। কিন্তু সমাধির পর ব্যুত্থানে ফিরে এলে দেখা যায়, মানুষটার প্রাকৃত স্বভাবের কোনও বদল হয়নি। তাই প্রজ্ঞাপূর্বক সমাধির পরিপাক না হলে তাকে যোগ বলা চলে না। আর হঠের দ্বারা বিদেহ হতে পারলেই যে সাধক ভবচক্রের আবর্তন হতে নিস্তার পাবে—যা নাকি তার লক্ষ্য—তার কোনও প্রমাণ নাই। কেননা যে-অবিদ্যা হতে এই আবর্তনের সৃষ্টি, একমাত্র বিদ্যাতেই তার নাশ বা রূপান্তর সম্ভব। সাধক সেপথের ধার দিয়েও গেল না। সুতরাং অবিদ্যার সংস্কার তার মধ্যে কায়েমই থেকে গেল। এক্ষেত্রে চক্রাবর্তনের নিবৃত্তি কি করে সম্ভব হবে?

*

মনকে পরমচেতনার দিকে ঠেলে তোলা যেমন যোগের একটি পথ, তেমনি সেই চেতনাকে এই মনের মধ্যে নামিয়ে আনা হল আরেকটি পথ। এই পথই অপেক্ষাকৃত সহজ এবং নিরাপদ।

এক্ষেত্রেও সাধনা শুরু করতে হবে মনকে ধরেই। কিন্তু তাকে ব্যবহার করতে হবে আরেকধরনে। মনের একটা ধর্ম হচ্ছে আয়নার মত—সে শান্ত থেকে সব-কিছুর প্রতিবিম্বকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে। আয়না কোনও ছায়াকে তার বুক থেকে মুছে ফেলতে চায় না, যা আসে তাকেই সে নির্বিবাদে

গ্রহণ করে। সে জানে, ছায়া আসবে আবার চলেও যাবে; সে কাউকেও আঁক[ড়ে] থাকবে না। সে অনাসক্ত।

এমনিতর চেতনার পারিভাষিক নাম হল সাক্ষিচৈতন্য। সাক্ষিচৈতন্য খু[ব] দুর্লভ নয়, আমাদের প্রাকৃত জীবনেও আমরা তার দেখা পাই। একটু তফা[তে] থেকে একনজরে একটা ব্যাপারের সমগ্র পরিধির উপর চোখ বুলিয়ে নি[তে] পারলে তবে তার একটা সুরাহা সম্ভব—এ-অভিজ্ঞতা আমাদের সবারই আ[ছে]। এ হল জীবনে সাক্ষিচৈতন্যের সার্থক প্রয়োগ। অবশ্য এ-প্রয়োগ নিজে[র] গরজে—যোগের জন্য নয়।

যোগের জন্য চাই বিশুদ্ধ সাক্ষিচৈতন্যের অনুশীলন। সাক্ষিচৈতন্যকে তখনই বলতে পারি বিশুদ্ধ, যখন দৃশ্য থেকে দৃষ্টির মোড় ফিরে যায় দ্রষ্টা[র] দিকে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্।

আমি নিশ্চুপ হয়ে প্রশান্ত মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। আমা[র] মনের আয়নায় বহিঃপ্রকৃতির ছায়া পড়েছে। চেতনা তখন স্বচ্ছন্দ প্রশান্ত পরিব্যাপ্ত এবং প্রসন্ন। এই মনকে আকাশের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যে-আমি এমনি করে বাইরের দৃশ্যকে দেখছে, দৃষ্টিকে অন্তরাবৃত্ত করে যদি তার উপর নিবদ্ধ করা যায়, তাহলে বিশুদ্ধ সাক্ষিচৈতন্যের অনুভব পাওয়া যাবে। এই অনুভবকে আরও গভীর করে অন্তর্দৃশ্যেরও সাক্ষী হওয়া যায়।

এমনি করে আমাদের উপরভাসা ছটফটে আমির পিছনে আকাশবৎ প্রশান্ত ও প্রসন্ন একটা আমিকে সহজেই জাগিয়ে তোলা যায়। এই আমির বোধ কোনও ভাবনা নয়, আধারের সর্বত্র ব্যাপ্ত একটা স্বচ্ছন্দ সংবিৎ (awareness)। অভ্যাসে এই আত্মসংবিৎ গাঢ় হলে পর অনুভব হয়, আমার আমিকে ছাপিয়ে রয়েছে এক অনন্ত চিন্ময় মহাকাশ এবং তা তুষারপ্রপাতের মত আমার মূর্ধন্য চেতনাকে অভিভূত করে আমার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আমাকে আবিষ্ট এবং জারিত করছে। এক সুগভীর শান্তির সম্প্রসাদে (radiant bliss) আমার চেতনা তখন নিস্পন্দ।

এই আবেশের ফলে যোগীর মধ্যে একধরনের জাগ্রৎ-সমাধির আবির্ভাব হয়। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া তখন নিবৃত্ত হয় না বটে, কিন্তু মনের সঙ্গে তার কোনও যোগ থাকে না। বোধ আছে, কিন্তু মন নাই, মনের কোনও কর্তৃত্ব নাই, সবই চলছে যেন যন্ত্রের মত—যোগীর তখন এই এক অনির্বচনীয় অবস্থা।

কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের কাছে 'এহো বাহ্য'। মনের প্রশমই

(quiescence) তাঁর অভীষ্ট নয়, তিনি চান তার উদ্দীপন, অতিমানসের আবেশে তার মধ্যে মানসোত্তর ভূমিসমূহের স্ফুরণ। মনের বিনাশ তিনি চান না, চান তার দিব্য রূপান্তর।

*

একমাত্র ঊর্ধ্বচেতনার আবেশে রূপান্তর সিদ্ধ হতে পারে। বলেছি, ঊর্ধ্বচেতনাকে অধিগত করবার দুটি পথ : এক তার দিকে উজিয়ে যাওয়া, আরেক তাকে এখানে নামিয়ে আনা। উজিয়ে গিয়ে আবার ভাটিয়ে এলে পর চেতনা খানিকটা আবিষ্ট হয়ে ফিরে আসে—যদি না আমরা হঠের পথ ধরি। আবেশ এবং রূপান্তর অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, যদি ঊর্ধ্বচেতনার কাছে নিজেকে মেলে ধরে এখানেই তাকে নামিয়ে আনতে পারি।

কিন্তু এখানেও মনের বাধা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের বোধ আমাদের লক্ষ্য। সে-বোধ একটি নিটোল অথচ সর্বতোমুখ একরস প্রত্যয়—আমাদের সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনবোধেরই মত। কিন্তু অখণ্ডকে খণ্ডিত করা হল মনের স্বভাব। তাই সে কখনও ঝোঁক দেবে ব্রহ্মের সদ্‌বিভাবের প্রতি, কখনও-বা চিদ্‌বিভাবের প্রতি, কখনও-বা আনন্দবিভাবের প্রতি। যদি লোকোত্তরণই (transcendence of cosmic existence) সাধনার লক্ষ্য হয়, তাহলে এর যে-কোনও একটি বিভাবকে ধরে চেতনাকে উজানে ঠেলে দেওয়া যায়। তার ফলে যদি চেতনার প্রলয় না ঘটে, তাহলে ঊর্ধ্বতন বিভাবের আবেশকে এখানে নামিয়েও আনা যায়। কিন্তু তাতে সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি অখণ্ড এবং বিশ্বতোমুখ হয় না।

পূর্ণযোগের সাধক চান পূর্ণব্রহ্মকে—তাঁর বিশেষ কোনও একটি বিভাবকে নয়। তাই গোড়া হতেই তাঁর চেতনাকে মনের একদেশদর্শিতার সংস্কার হতে মুক্ত রাখতে হবে। এইটুকু জানতে হবে, মনই চেতনার সবখানি নয়। মনের পিছনে রয়েছে বোধি। মনের ধর্ম যেমন কোনও-কিছুকে বাইরে রেখে জানবার চেষ্টা করা, তেমনি এই বোধির ধর্ম হচ্ছে হয়ে জানা। মন দিয়ে 'জানি'—তা আভাস মাত্র। আর বোধে 'হই'—তা হল বিশুদ্ধ উদ্‌ভাস। যেমন মনের আয়নায় আকাশের প্রতিবিম্বনে সাক্ষিচৈতন্যের উদ্‌ভাস। এটি বিশুদ্ধ বোধের রূপ। তাদিয়ে আকাশকে জানি না শুধু, আকাশ হই।

অদ্বৈতোপলব্ধির তিনটি ধাপের কথা অন্যত্র বলেছি। প্রথম ধাপ হল ব্রহ্মের মধ্যে সব-কিছুকে দেখা। ব্রহ্ম তখন অধিষ্ঠান। দ্বিতীয় ধাপে সব-কিছুর মধ্যে ব্রহ্মকে দেখা। ব্রহ্ম তখন অন্তর্যামী। এই দুটি দর্শন হল এক আর বহুর মাঝে আপাতবিরোধের সমন্বয়। প্রাকৃতমনের মধ্যে এই বিরোধের সংস্কার এতই পাকা যে অনুভবের উত্তুঙ্গ ভূমিতেও তার জের চলে, যার ফলে বহুকে লুপ্ত না করে দিয়ে একের অনুভব সম্ভব হয় না। উপরি-উক্ত দুটি দর্শনে ভেদের সংস্কার অনেকটা শিথিল হয়ে গেলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় না। অধিষ্ঠান আর অন্তর্যামীকে মনে হয় যেন প্রপঞ্চ হতে কথঞ্চিৎ বিবিক্ত একটা কিছু। এই হল মানস সংস্কারের শেষ বাধা। কিন্তু ঊর্ধ্বচৈতন্যের আবেশের ফলে অবশেষে জাগ্রতেই ভেদসংস্কারহীন বিশুদ্ধ অদ্বৈতানুভবের আবির্ভাব হয়। তখন বোধ হয়—এই সব-কিছুই ব্রহ্ম। যেমন দেহ-প্রাণ-মনের বিচিত্র অনুভব ও ক্রিয়ার অভঙ্গ সমাহরণে (integration) আমার অস্তিত্বের এক অখণ্ড বোধ—এও তেমনি।

আর এ-বোধ আবেশের ফল। তাঁর বোধে আমার বোধ—এই তার রূপ।

১৪

ব্রহ্মে অস্পন্দ ও স্পন্দ

আমি আছি আর জগৎ আছে—এই অনুভব হল বাস্তবজীবনের বনিয়াদ। জগতের সঙ্গে আমার একটা লেনদেনের কারবার আছে, যার হিসাব সহজ নয়। তাকে সহজ করবার অবিরাম প্রয়াস হল জীবনযাত্রার তাৎপর্য। প্রয়াসের সিদ্ধি আসতে পারে দুদিক থেকে—জগৎকে বদলে দিয়ে, অথবা নিজেকে বদলে নিয়ে। আগেরটা হল বিজ্ঞানের সাধ্য, পরেরটা দর্শনের। অবশ্য দুয়ে কোনও বিরোধ হবার কথা নয়, তবুও বিজ্ঞানের কারবার বাইরকে নিয়ে আর দর্শনের কারবার ভিতরকে নিয়ে—এই থেকে একটা বিরোধাভাস দেখা দেয় বই কি। কিন্তু আমরা সমন্বয়বাদী, তাই বিরোধকে আমরা কখনও একান্ত করে দেখি না। তবে তার সমাধান আগে খুঁজি অন্তরে, তারপর তাকে প্রয়োগ করি বাইরে। দর্শন এমনি করে হয়ে ওঠে যোগ—যাকে বলতে পারি দর্শনের ফলিত দিক বা বিজ্ঞান।

অন্তরাবৃত্ত হয়ে আত্মসত্তা আর বিশ্বসত্তার মাঝে সমন্বয়সাধনের প্রয়াস হল যোগ। এই সমন্বয় ঘটে সেই বৃহতের চেতনায়, যার মধ্যে আমি আর জগৎ দুইই বিধৃত। আবার এই বৃহতের কেন্দ্র কিন্তু আমাতেই। আমার আত্ম-চৈতন্যের বিস্ফারণেই ব্রহ্মচৈতন্য। আমি যখন বৃহৎ হই, জগৎকে তখন ছাপিয়ে উঠি। জগৎ তখন আমার মধ্যে। আমার বিস্ফারিত চেতনার পরিমণ্ডলের মধ্যে সে আছে বলেই তার দ্বন্দ্ব আমায় তখন বিচলিত করে না। শুধু তা-ই নয়, চেতনার বিস্ফারণে মৃন্ময় জগতের গভীরে এবং তাকে ছাপিয়ে চিন্ময় জগতের ক্রমোর্ধ্ব স্তরগুলিও তখন আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। তাইতে দিব্য-সঙ্কল্পের প্রবর্তনায় দ্বন্দ্বের প্রশাসনও সহজ হয়। আত্মস্থিতি ভোগ এবং ঐশ্বর্যের সমন্বয়ে এই অবস্থা হল ব্রাহ্মীস্থিতির পরম ভূমি।

এই অবস্থায় পৌঁছবার দুটি ধারা আছে। একটি ধারা ক্রমবিকাশের অর্থাৎ চেতনার ক্রমিক স্ফুরণের, আরেকটি উল্লম্ফনের। প্রথমটি হল, উষার আলো যেমন ধীরে-ধীরে মধ্যাহ্নদীপ্তিতে ফুটে ওঠে, তেমনি দেহ প্রাণ মন বিজ্ঞান ও আনন্দের চেতনার ভিতর দিয়েই আত্মচৈতন্যের ভাস্বরতায় উত্তীর্ণ

হওয়া—কোনও-কিছুকে বাদ না দিয়ে। গোড়া হতেই একটি অখণ্ড পরিব্যাপ্তি এবং বর্তুল বোধ হচ্ছে তার সাধন। এ যেন সমুদ্রে মীনের মতন বৃহতের আবেশে প্রতিনিয়ত উদ্দীপ্ত হয়ে বিচরণ করা। আর উল্লম্ফনের রীতি হল প্রাকৃত ভূমি হতে লোকোত্তর ভূমিতে চেতনাকে সবেগে উৎক্ষিপ্ত করা। এখানে ওখানে তখন দুস্তর ব্যবধান। আর এ-ব্যবধান মনের কল্পনা। তাই এ-পথের প্রধান সাধন হল মন : মনকে ধরেই মনের উজানে যাওয়া, বোধকে দিয়ে তাকে জারিত এবং রূপান্তরিত করা নয়। তাইতে চিন্ময়ী সিদ্ধির তুঙ্গভূমিতে গিয়েও চেতনায় মনের দ্বৈতসংস্কার একেবারে মুছে যায় না। পূর্ণযোগের সাধনায় এও একটা মনের বাধা, সুতরাং তার বিশ্লেষণ দরকার।

*

জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছি বলে দুঃখ পাচ্ছি। এই দুঃখ হতে মুক্তি চাই। এই মুমুক্ষার তাগিদে সাধক ধরে প্রলয়ের পথ, তীব্রসংবেগে জগৎ আর জীবন হতে ছিটকে সে বেরিয়ে পড়তে চায়। তখন বিবেক আর বৈরাগ্য তার প্রধান সাধন। বিবেক তাকে শেখায় প্রেয় হতে শ্রেয়কে তফাত করতে, আর বৈরাগ্য আনে প্রেয়ের প্রতি বৈতৃষ্ণ্য। দেহ প্রাণ মন আর অহং দিয়ে আমরা যা পাই, তা কখনও পুরাপুরি পাওয়া নয়। সে-পাওয়ার বিড়ম্বনা পদে-পদে। তাই চাওয়া-পাওয়ার ঝামেলা একেবারে চুকিয়ে দিয়ে সাধক এমন-একটা ভূমিতে পৌঁছতে চায়, যেখানে চেতনায় অপরা-প্রকৃতির কোনও তরঙ্গই ওঠে না। এই ভূমির পারিভাষিক নাম পুরুষের স্বরূপস্থিতি বা কৈবল্য। পুরুষ তখন প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত। যতদিন সে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, ততদিন তার মধ্যে তিনটি বৃত্তির খেলা চলছিল—দ্রষ্টৃত্ব ভোক্তৃত্ব এবং কর্তৃত্ব। এখন তার চেতনায় শেষ দুটির পাট চুকে গেছে—তার ভোগ নাই কর্মও নাই, আছে শুধু দ্রষ্টৃত্ব।

এই স্বরূপস্থিতির গাঢ়তার আবার তারতম্য আছে। তা চেতনার নিবর্তনের (regression) স্বাভাবিক নিয়মকে অনুসরণ করে চলে। প্রাকৃতভূমিতেও আমরা প্রতিদিন স্বরূপস্থিতির দিকে ঝুঁকি, যখন জাগ্রৎ থেকে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে সুষুপ্তির মধ্যে তলিয়ে যাই। বস্তুত প্রাকৃত সুষুপ্তি আর যোগের সমাধি একদিক দিয়ে সমধর্মা, দুয়েরই লক্ষণ হচ্ছে বৃত্তির নিরোধ। দুয়ের

মাঝে তফাত এই, সুষুপ্তি আসে অবশে আর অজ্ঞানে, কিন্তু সমাধি আনা হয় স্ববশে এবং সজ্ঞানে। যেমন সুষুপ্তি থেকে জাগ্রৎ, তেমনি আবার সমাধি থেকেও ব্যুত্থান। কিন্তু ব্যুত্থানে সমাধিজ প্রত্যয়ের রেশ থাকে; শুধু তা-ই নয়, আবার সেই সমাধির মধ্যে তলিয়ে যাবার একটা ঝোঁকেও পেয়ে বসে—ঘুমকাতুরের ঘুমে পাওয়ার মত। এই থেকে নিবর্তনের পথে সমাধিচেতনায় জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির মত পর-পর স্বরূপস্থিতির তিনটি ভূমি দেখা দেয়। প্রথম ভূমি জাগ্রৎ-সমাধির : পুরুষ তখন তটস্থ থেকে জগৎকে দেখেন ছবির মত। গভীরের আকর্ষণ আরও প্রবল হলে আসে স্বপ্ন-সমাধি : ছবিটা তখন ঝাপসা, স্বপ্নের মত অবাস্তব। আরও গভীরে সুষুপ্তি-সমাধি : তখন স্বপ্নও মিলিয়ে গেছে, কোথাও কিছু নাই—না দৃশ্য, না দ্রষ্টা।

মন বলে, এই শূন্যতাই একমাত্র সত্য—জগৎ মিথ্যা, ব্যবহার মিথ্যা। দ্বৈতের সংস্কার মনের মধ্যে প্রবল, সুতরাং অখণ্ডের একটা দিক সত্য, আরেকটা দিক মিথ্যা—এমন একটা ভাগাভাগির আগ্রহ তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বোধি বলবে, শূন্যতাও সত্য, কিন্তু তাবলে জগৎ মিথ্যা নয়। তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়, তখন তোমার কাছেই জগৎ থাকে না, কিন্তু তোমার অবোধের বাইরে তার একটা শাশ্বত সত্তা থাকেই। তেমনি ভোগ আর কর্মের কুণ্ঠিত প্রাকৃত রূপই একমাত্র সত্য নয়, তাদের দিব্য রূপান্তরের সম্ভাবনা তার চাইতেও বৃহৎ সত্য। মন খণ্ডদর্শী, সে দেখে ব্যষ্টির দিক থেকে; তাই তার দর্শনে বিরোধ থাকে। কিন্তু বোধি অখণ্ডদর্শী, সে দেখে সমষ্টির দিক থেকে; তাই বিরোধাভাসের সমাধান তার পক্ষে সহজ। পূর্ণযোগের মুখ্য সাধন বোধি, মন তার অনুচরমাত্র।

*

অখণ্ড সত্যকে জানতে হলে উজান-ভাটা দুটি ধারারই খবর রাখা দরকার। পূর্ণযোগের সাধনায় তাই শূন্যতার দিকে উজিয়ে যাবারও দরকার আছে। তবে কি না এ উজিয়ে যাওয়া জগৎ বা জীবনকে বাদ দিয়ে নয়। জগতের এই উচ্ছলতার মধ্যেই আছে রিক্ততা, বহুর মেলাতে সমাহিত হয়ে আছে একের নিঃসঙ্গতা : সেইটি আবিষ্কার করে চেতনাকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে।

আকাশভাবনায় এ সহজ হতে পারে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি

মহাকাশের রিক্ততা—পরিব্যাপ্ত প্রশান্ত প্রসন্ন এক শূন্যতা। অথচ সে সবার মধ্যে অনুস্যূত। সবাইকে আবৃত এবং আবিষ্ট করে আবার সবাইকে সে ছাপিয়ে আছে। এই আকাশ যেমন আমার বাইরে, তেমনি আমার অন্তরে। বাইরে ভূতাকাশ, অন্তরে চিদাকাশ। আকাশের আনন্ত্য আর বিজ্ঞানের আনন্ত্য এক।

এমনি করে বাইরে-ভিতরে আকাশ দেখতে-দেখতে আকাশ হয়ে যাওয়া। মন তখন দেখে, ভাব আর বস্তু নাম আর রূপ এই আকাশের বুকে আলগোছে ভেসে চলেছে। তারা মিথ্যা নয় বিভ্রম নয়, আবার নিরেট বাস্তবও তারা নয়। সত্যকার বাস্তব হল আমার চিদাকাশের অগাধ প্রশান্তি। সেখানে কোনও ঢেউ নেই, সুতরাং চিত্তও নাই। অথবা চিত্ত যদি থাকেও, আছে চেতনা হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত হয়ে। এতদিন চিত্তের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম, তার তরঙ্গায়ণের বাইরে আমার কোনও অস্তিত্বকে খুঁজে পাইনি। আজ দেখছি, চিত্তের দোলা মহাপ্রকৃতির একটা ব্যাপার মাত্র। সব চিত্তই এক অলক্ষ্য শক্তির স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে, আমার বা তোমার বলে তাদের চিহ্নিত করা মূঢ়তা।

এই হল সাংখ্যের বিবেকদর্শন। একদিকে পুরুষের নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি, আরেকদিকে প্রকৃতির গুণবিক্ষোভ বা শক্তিপরিণাম। জড়ের খেলা প্রাণের খেলা মনের খেলা সবই এক মহাশক্তির স্পন্দমাত্র। সব তার দেহ, তার প্রাণ, তারই মন। তোমার-আমার এর-তার সবার দেহ-প্রাণ-মন একই প্রকৃতির নিয়মে একই ধরনে স্পন্দিত হচ্ছে। সুতরাং প্রকৃতির দিক দিয়ে জড়ে-প্রাণে-মনে তফাত করবার তো কোনও প্রয়োজন নাই : স্বচ্ছন্দে বলা চলে সবই জড়—কেবল ওদের মধ্যে গুণের তারতম্য। তথাকথিত জড়ে তমোগুণের প্রাবল্য, প্রাণে রজোগুণের, আর মনে সত্ত্বগুণের। স্বচ্ছতার তারতম্যে গুণের তফাত। পুরুষ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ—স্ফটিকের মত; আর প্রকৃতির মধ্যে কালো-লাল-সাদা রংএর খেলা। পুরুষের নিজের কোনও রং নাই। তবুও প্রকৃতির সান্নিধ্যে তার গায়ে রংএর ছোপ পড়ে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই সে প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যেতে পারে। তখন তার গায়ের রংও অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই পুরুষ চিৎস্বরূপ। যে-চৈতন্যে কোনও রং নাই, তা হল দ্রষ্টৃচৈতন্য। ভোক্তৃচৈতন্যে আর কর্তৃচৈতন্যে রং আছে। চেতনা তখন জড়িয়ে গেছে রস আর শক্তির সঙ্গে, অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে। আমার ভোগ আর কর্ম প্রাকৃত। তারও সঙ্গে জড়িত আছে আমার দ্রষ্টৃত্ব বা স্বানুভব। তবে বিশুদ্ধ হয়ে নাই। ভোগ আর কর্ম হতে তাকে যদি আলাদা করে নিতে পারি, তাহলে

তা বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ দ্রষ্টৃত্ব রংছুট। তা-ই পুরুষের স্বরূপস্থিতি।

সাংখ্যের এই বিশ্লেষণ ব্যষ্টি আত্মাকে নিয়ে। আত্মার এই স্বরূপ যদি বিশ্বাত্মায় উপচরিত করি, তাহলে পাই বেদান্তের নির্গুণ-ব্রহ্মবাদ। মূলত দুটি দর্শন এক।

*

সাংখ্যের বিবেকদর্শন পূর্ণযোগের সাধনায় অপরিহার্য কিন্তু ঐকান্তিক (exclusive) নয়। প্রকৃতি থেকে পুরুষকে যাঁরা একান্তভাবে বিবিক্ত করতে চান, তাঁরা শুধু মনের নয়, প্রাণের ও দেহের ক্রিয়াকেও নিরুদ্ধ করে জীবন্মৃত হওয়াকে মনে করেন পুরুষার্থ। কিন্তু পূর্ণযোগের সাধক তা চান না। তিনি চান জীবন্মুক্ত হতে। তার প্রাথমিক সাধন হল অন্তরের ভাবনা বেদনা ও সঙ্কল্পকে সম্পূর্ণ প্রশমিত রেখেও বাইরের কর্মে যুক্তচেষ্ট হওয়া।

প্রশ্ন হবে, চিত্ত যদি নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে বাইরে কর্ম করা কি সম্ভব? কর্মের প্রেরণা আমরা পাই মনের আবেগ আর ভাবনা হতে। বৃত্তি-শূন্য মনে আবেগ নাই, ভাবনাও নাই। তাহলে কর্ম চলবে কিসের জোরে? অবশ্য দেহ-প্রাণের অনেক ক্রিয়া চলে আমাদের মনের অগোচরে। কিন্তু সজাগ মনের ক্রিয়া তো সেভাবে চলতে পারে না।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান কিন্তু একথায় সায় দেয় না। সে বলে, আমাদের ভাবনা বেদনা ও সঙ্কল্পের অনেকখানির প্রেরণা আসে অবচেতন মন থেকে, সম্মোহনের বেলায় পরের মন থেকে। বস্তুত সজাগ মন আমাদের চেতনার ব্যক্তমধ্য মাত্র; তার উপরে-নীচে দুটি অব্যক্তের বিপুল অধিকার—তার একটি অবমানস, আরেকটি মানসোত্তর। একটির খবর আমরা পাই আধুনিক মনো-বিজ্ঞানে, আরেকটির যোগবিজ্ঞানে। প্রাচীন পরিভাষা অনুসারে একটি হল 'আশয়', আরেকটি 'বোধি'। যোগে চেতনা অন্তরাবৃত্ত হলে বোধির উন্মেষ হয়। বোধি মনের সাহায্য না নিয়ে 'কেবল ইন্দ্রিয়ের সহায়ে' নিখুঁতভাবে সব কাজ করে যেতে পারে—যেমন দেখি, মনের ক্রিয়া ছাড়াই ইতরপ্রাণীরা সহজ-সংস্কারের বশে এমন-সব কাজ করে যায় যা আমাদের কাছে ঠেকে বিস্ময়কর। বাস্তবিক, আমাদের জাগ্রৎ-মনই বুদ্ধির একমাত্র ভাণ্ডার—এ-ধারণা একটা

কুসংস্কার মাত্র। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিশ্বগত এক বিশালবুদ্ধির আংশিক প্রকাশ। সে-বুদ্ধি জড় প্রাণ মন সব-কিছুর মধ্যে সক্রিয়। সাংখ্য তার নাম দিয়েছেন 'মহৎ তত্ত্ব'—যা অব্যক্তের অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির প্রচ্ছটা। পুরুষ তারও ওপারে। যোগী এই পুরুষে প্রতিষ্ঠিত হলে পর আধারের সমস্ত ক্রিয়া তাঁর বিবিক্ত চেতনার সামনে চলতে থাকে মহাপ্রকৃতির প্রশাসনে। তিনি তখন অন্তরে নিস্পন্দ থেকেই বাইরে স্পন্দিত। বাইরের স্পন্দ তাঁর অন্তরের নৈস্পন্দ্যকে স্পর্শও করে না বলে তিনি তখন আর প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন—তিনি স্ব-তন্ত্র (free)।

এই স্বাতন্ত্র্য আছে বলে পুরুষ তখন কর্ম করেও কোনও কর্ম করেন না, কেননা কর্মের কর্তা তখন আর তিনি নন—পরমপুরুষের অধ্যক্ষতায় বিশ্ব-প্রকৃতি তখন তাঁর মধ্যে কাজ করে চলেছেন। তিনি স্বয়ং কর্মের উদাসীন সাক্ষী মাত্র (গীতা)।

*

এটি যোগের খুব উঁচু অবস্থা সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্ণযোগের সিদ্ধির পক্ষে এই তটস্থ স্থিতিও পর্যাপ্ত নয়। কেন, তা বলছি।

অন্যত্র বলেছি, ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপলক্ষণ চারটি—সত্তা চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তি। প্রাকৃতচেতনায় সত্তার অনুভব অস্পষ্ট, চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তির অনুভব কুণ্ঠিত। এই বাধা দূর করবার জন্য সাধক অভীপ্সার তীব্রসংবেগ নিয়ে ধরেন উজানের পথ। শক্তির স্পন্দ এবং আনন্দের উদ্‌বেলন নিরুদ্ধ করে চৈতন্যকে তিনি পরাবর্তিত করেন চৈতন্যের মধ্যেই। তখন তাঁর স্থিতি হয় বিশুদ্ধ সন্মাত্রে—প্রপঞ্চ তখন তাঁর কাছে উপশান্ত। আগেই দেখেছি, এই ব্রহ্মসদ্‌ভাব শেষপর্যন্ত অসৎ বা শূন্যতায় পর্যবসিত হতে পারে। উজানপথের এই হল অবধি। তারপর ভাটার পালা।

শূন্যতা এবং সত্তা পুরুষের স্বরূপস্থিতির এপিঠ আর ওপিঠ—যেমন রাতের আকাশ আর দিনের আকাশ। এই আকাশে স্ফুরিত হল চিৎসূর্যের প্রভাস্বর মহিমা—ভাটার দিকে পৌরুষেয় বোধের এই হল অবধি। এ-বোধে জগৎ ভাসছে, কিন্তু পুরুষ তার ভোক্তা নন, কর্তাও নন—উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। ভোগ আর কর্ম পড়ছে শক্তি বা প্রকৃতির এলাকায়, পুরুষ তাহতে বিবিক্ত।

পুরুষ স্ব-তন্ত্র বলে প্রকৃতি থেকে তিনি তফাত থাকতে পারেন; কিন্তু এই তফাত থাকাতেই আরেকদিক দিয়ে তাঁর স্বরূপের পূর্ণতাহানি ঘটে। চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের দুটি পাদকে স্বীকার করা এবং আর-দুটি পাদকে বর্জন করবার চেষ্টা করা—এ তো সম্যক্‌সিদ্ধির পরিচয় নয়।

অবশ্য বিবিক্ত পুরুষের প্রভাস্বর চেতনাতেও আনন্দ বা শক্তি বর্জিত হয় না। আনন্দ সেখানে ফোটে প্রশমে, শক্তি নিবৃত্তিতে। উল্লাসের রাস টেনে নিস্পন্দ হয়ে থাকা—তাতেও শক্তির পরিচয় এবং তারও একটা তৃপ্তি আছে বই কি। কিন্তু প্রশ্ন হবে, উল্লাসের প্রতি পুরুষের এই বৈরাগ্যই-বা কেন? প্রকৃতিকে এত ভয় কেন? অপরা-প্রকৃতি কামপুরুষকে বাঁধে; কিন্তু উত্তম-পুরুষের প্রকৃতি শুদ্ধসত্ত্বা, সে তো পুরুষের স্বীয়া প্রকৃতি। তাকে আশ্রয় করেই না পুরুষের স্বাতন্ত্র্যের স্ফুরণ—আনন্দে এবং শক্তিতে, ভোগে এবং ঐশ্বর্যে। পুরুষ শুধু উপদ্রষ্টা নন—তিনি ভোক্তাও, মহেশ্বরও।

এই অখণ্ড ব্রহ্মের ভাবনা হল পূর্ণযোগের অনুকূল। ব্রহ্ম শুধু সৎ চিৎ নন, তিনি আনন্দময় এবং শক্তিমানও। আনন্দ ও শক্তি তাঁর স্বরূপপ্রকৃতি। সত্তায় এবং চেতনায় যিনি উপশান্ত, তিনিই আনন্দে এবং শক্তিতে উল্লসিত। এই উল্লাস তাঁর আত্মবিচ্ছুরণ—সৌরতেজের বিচ্ছুরণের মত। তা-ই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর অবন্ধন দিব্যকর্ম এবং অকুণ্ঠিত ঐশ্বর্য—যার আস্বাদনই তাঁর আনন্দ। এই তাঁর স্বারাজ্য।

আত্মচৈতন্যের ব্রহ্মচৈতন্যে বিস্ফারণ যদি আমাদের সাধনার লক্ষ্য হয়, তাহলে ব্রহ্মের মত আমাদের আত্মাও হবে চতুষ্পাৎ। তার মধ্যে সত্তার প্রশান্তি চৈতন্যের দীপ্তি আনন্দের উদ্‌বেলন এবং শক্তির বিচ্ছুরণ কোনটার অভাব হবে না, অথবা কারও সঙ্গে কারও মনগড়া বিরোধও থাকবে না। আকাশের আদিত্য আত্মদীপ্তিতে ঝলমল করেও মাটির বুকে বিচিত্র বর্ণের ফুল ফোটায়, খনির গর্ভে কয়লার মধ্যেও সান্দ্র হয় হীরকের দ্যুতিতে। এর কোনটাই তো মিথ্যা নয়: যেমন সত্য অস্পন্দ আকাশ, তেমনি সত্য আদিত্যের হৃদয়ে ব্রহ্মক্ষোভের পরিস্পন্দ। অস্পন্দেরই স্পন্দ—এই ধৃতিই সত্যধৃতি।

১৫

বিশ্বচেতনা

দেহ প্রাণ মন নিয়ে 'আমি'। সাংখ্যের ভাষায় বলতে পারি, এই আমি
পুরুষ, আর দেহ প্রাণ মন তার প্রকৃতি। প্রকৃতির পরিণাম (change)
তার তুলনায় পুরুষ অপরিণামী, প্রকৃতিপরিণামের সে যেন অধিষ্ঠান।
চেতনার সাধারণ ভূমিতে পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে সে
অপরিণামী নয়, প্রকৃতির আন্দোলনে সেও আন্দোলিত। প্রকৃতির
বা পরিণামের দুটি ধারা আছে—একটি অধঃপরিণাম, আরেকটি ঊর্ধ্বপরি
আমাদের মধ্যে যে-গতানুগতিকতা এবং তার দরুন অবক্ষয়ের দিকে একটা
আছে, তাকে বলতে পারি প্রকৃতির অধঃপরিণাম। কিন্তু এই
রুদ্ধ করে চেতনার উৎকর্ষসাধনের দিকেও আমাদের একটা প্রচেষ্টা আছে,
বলা চলে প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণাম। যে-আমি অধঃপরিণামের সঙ্গে যুক্ত,
নাম দিতে পারি 'ভূতাত্মা'; আর ঊর্ধ্বপরিণামের সঙ্গে যুক্ত আমিকে
পারি 'জীবাত্মা'। ভূতাত্মা কাঁচা আমি, জীবাত্মা পাকা আমি। জীবাত্মা
যোগের সাধক।

অধ্যাত্মসাধনার একটা ভূমিতে জীবাত্মা নিজেকে অনুভব করে
ঊর্ধ্বে অপরিণামী চিৎস্বরূপ বলে। একে বলতে পারি 'কূটস্থ আ
কূটস্থাত্মায় যে-ব্যষ্টিভাবনার সংস্কার আছে তা মুছে গিয়ে বিশুদ্ধ
অনুভব জাগতে পারে এবং তাও অবশেষে শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে
কূটস্থ সৎ আর অসৎ এই তিনটি ভূমিতে হল জীবাত্মার অতিস্থিতি
বিশ্বোত্তীর্ণতা (transcendence): তার সামনেই চলছে বিশ্বপ্র
খেলা। অতিস্থিতিতে অস্পন্দ, আর বিশ্বপ্রকৃতিতে স্পন্দ। দুয়ের মাঝে
বিশ্বচেতন পুরুষ বা 'বিশ্বাত্মা'। জীবাত্মাকে এই বিশ্বাত্মার অনুভবও
হবে, জানতে হবে 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা'—সবার গভীরে যে-আমি আর
মধ্যে যে-আমি, দুইই এক। এই অনুভব আসতে পারে এখানে থেকেই
চৈতন্যকে বিস্ফারিত ক'রে, অথবা অতিস্থিতিতে নিগূঢ় শক্তির আবেশকে
নামিয়ে এনে, অথবা দুয়ের সমাহারে।

মন দিয়ে সাধনা করতে গিয়ে অনুভব করি, আতিস্থিতির চেতনা বিশ্বচেতনার অধিষ্ঠান। সবাইকে ছাপিয়ে থাকতে পারলেই সবাইকে আমার মধ্যে অনুভব করা সহজ হয়। সে-থাকা বস্তুত আত্মচৈতন্যের আকাশবৎ প্রশান্ত পরিব্যাপ্তিতে অবিচল থাকা। অবিচল থেকে দেখছি চাঞ্চল্যের লীলা, দেখছি সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব—দেখছি আকাশের অনেক নীচে অথচ তারই মধ্যে অন্তরিক্ষে মেঘ-রৌদ্রের খেলা, পৃথিবীর বুকে হাসি-কান্নার মেলা। ওরা আছে, কিন্তু ওদের অস্তিত্বের নির্ভর ওই আকাশে। আকাশ আছে বলেই ওরা আছে; ওরা না থাকলেও আকাশ আছেই। আর তার এই থাকা আত্মসমাহিত অধিষ্ঠান-চৈতন্যের প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত।

এই হল আকাশের শিবরূপ। কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার শক্তিরূপ। স্বরূপস্থিতি যখন সুপ্রতিষ্ঠ এবং সহজ হয়, তখন আমরা তার অনুভব পাই। দেখি আকাশ শুধু নির্ণাম নীরূপ নয়, নাম-রূপের নির্বাহও হচ্ছে আকাশ হতেই। যিনি আকাশবৎ, তিনিই আবার আদিত্যবর্ণ—প্রজ্ঞানে আনন্দে শক্তিতে বিচ্ছুরিত। শুধু রূপের উৎস তিনি নন, দেখি রূপে-রূপে তাঁরই প্রতিরূপ। আত্মচৈতন্যের উদ্দীপনে অন্তরে চিন্ময়রূপে যাঁকে পেয়েছি, মৃন্ময় আধারের অন্তরালে তাঁকেই দেখি বিচিত্র বর্ণের গুণ্ঠনে—দেখি আমাকেই। অনুভব আরও গভীর হলে মৃন্ময়ে-চিন্ময়ে আর ভেদ থাকে না: তখন সব তাঁর প্রতিরূপ শুধু নয়, সবই তিনি। বিন্দুতে সিন্ধুর উল্লাস, যত আড়াল সবই আলোর আড়াল, যত দুঃখ সবই পরমানন্দের তির্যক্ বিলাস। বাউলের ভাষায় তখন 'অন্তরে-বাহিরে প্রেম প্রেম ঘরে-ঘরে, ভোগে প্রেম যোগে প্রেম রোগে প্রেম ঝরে।'

এই হল অদ্বৈতানুভবের যথার্থ স্বরূপ—আত্মচৈতন্য বিশ্বাতীতচৈতন্য আর বিশ্বচৈতন্যের পরম সমন্বয়।

*

আত্মচৈতন্যেই বিশ্বচৈতন্যের অনুভব হয়। আর এ-অনুভব শুধু সমাধিতে হয় না, হয় ব্যুত্থানেও। বিশ্বচেতনার আবেশে আমার চেতনা বিস্ফারিত হল, নির্দ্বন্দ্ব হল; কিন্তু আমার দেহ-প্রাণ-মনের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হল না; শুধু আমার কাঁচা আমির জায়গায় এল পাকা আমি—যে-আমি অবিরোধে

সবার আমি। এই আমির অনুভবের গাঢ়তার প্রকারভেদ আছে।

একটি অনুভব : বিশ্বচেতনার উল্লাসের আমি দ্রষ্টা এবং ভোক্তা। রূপে রূপে তার যে-প্রতিরূপ, তাদের সঙ্গে সহবেদনায় যুক্ত হয়েও আমি বিবিক্ত। অভিনয় দেখে আমি তখন আনন্দ পাচ্ছি, কিন্তু নিজে অভিনয় করছি না। আমি দ্রষ্টা এবং ভোক্তা, কিন্তু কর্তা নই। প্রপঞ্চে শক্তির উল্লাস, কিন্তু আমার মধ্যে রয়েছে তার প্রশম।

কিন্তু একসময় আমার মধ্যে শক্তির মুক্তিও হতে পারে। আমি তখন দশজনের সঙ্গে অভিনয়ে যোগ দিয়েই তার দ্রষ্টা এবং ভোক্তা। দশজনের মধ্যে নিজেকে তখন দেখছি যেমন, তেমনি আবার সব ছাপিয়ে দেখছি সূত্রধারের প্রয়োজনা-নৈপুণ্যও। তাঁর ভাবনাকে যেমন তিনি সবার মধ্যে প্রবাহিত করছেন, তেমনি আমার মধ্যেও। আমিও তাঁর নিমিত্ত (instrument)।

এই অনুভবে বিশ্বচেতনার উল্লাসের বোধ পরিপূর্ণ হয়, ব্যক্তিকে বিশ্বকে এবং বিশ্বাতীতকে আমরা এক অখণ্ড চৈতন্যের পরিস্পন্দরূপে আস্বাদন করতে পারি। কিন্তু সাধারণত জ্ঞানযোগীরা ব্যাপ্তিচৈতন্যকে আনন্দ এবং শক্তির উল্লাসবর্জিতরূপে ভাবনা করেন। আত্মচৈতন্য বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে নিত্যজাগ্রত বোধে যোগযুক্ত হয়ে আছে—তাঁদের মতে এর চাইতে বড় অবস্থা হচ্ছে যেখানে আত্মচৈতন্য এবং বিশ্বচৈতন্য লুপ্ত হয়ে গেছে বিশ্বাতীত পরচৈতন্যে। নুনের পুতুল সমুদ্রে নেমে গলে গেল, আর ফিরে এল না। সমুদ্রের সঙ্গে এই সাযুজ্যই হল তাঁদের মতে জ্ঞানীর চরম পুরুষার্থ।

আগেও বলেছি, এ হল অনুভবের একটা দিক—নিরোধের দিক প্রলয়ের দিক। কিন্তু তেমনি আবার সৃষ্টির দিক উল্লাসের দিকও আছে। সমুদ্র যেমন পুতুল গলায়, তেমনি গড়েও। নিজের নুন দিয়েই সে এমন পুতুল গড়ে যা জমে পাথর হয়ে গেছে। ভক্তেরা তাকে বলেন সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ—সৎ চৈতন্য আনন্দ জমাট বেঁধে বিগ্রহ হয়েছে। তার মধ্যে যেমন আছে ব্যাপ্তি, তেমনি আবার আছে সংহনন। ব্যাপ্তিতে মুক্তি, আর সংহননে ভুক্তি এবং শক্তি। যোগীর চেতনায় এ-অবস্থা সেই পরম ব্যুত্থানের যা সমাধির রসে জারিত। এ-অনুভব অরূপ আর রূপের মাঝে সমাধি আর ব্যুত্থানের মাঝে মনের মেরুসম্পর্কের (polarity) কল্পনা করে না। এ হল বোধির অখণ্ড অনুভব।

এই অনুভব নেমে আসে পূর্ণযোগীর জাগ্রতে এবং ব্যবহারে। তখন জগতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হয় আরেকরকম। সে-দৃষ্টি বিদ্যার দৃষ্টি

বিশ্বাত্মভাবের দৃষ্টি, অবিদ্যাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ অহন্তার দৃষ্টি নয়। অহংএর খণ্ডিত চেতনায় মোহ আছে শোক আছে, আছে বিজ্ঞানের দৈন্য আনন্দের বৈকল্য শক্তির কুণ্ঠা। অহং যা-কিছু দেখে তা-ই খাটো করে দেখে—যেমন নিজের ভিতরে, তেমনি বাইরেও। কিন্তু বিশ্বাত্মভাবক যোগীর দৃষ্টি স্বানুভবের মহিমার দ্বারা উদ্দীপ্ত। আত্মচেতনায় যে-মহিমাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন, তারই সম্ভাবনাকে তিনি জাগ্রত এবং উদ্যত দেখেন ভূতে-ভূতে। ফোটা ফুলের পূর্ণতা দিয়ে তিনি বিচার করেন কুঁড়ির অপূর্ণতাকে। অবিদ্যা আর বিদ্যার মাঝে তিনি নিত্যবিরোধ দেখেন না; দেখেন, অবিদ্যা বিদ্যার আত্মসংহরণ মাত্র, কিন্তু তার অন্তরের প্রবেগ তাকে স্ফুরিত করছে বিদ্যাতেই—ভোরের আঁধারে আলোরই সূচনা। তাই শক্তির কোনও আপাতপ্রতিকূলতা তাঁকে বিচলিত করে না, কেননা তাঁর সৃষ্টিক্ষম দৃষ্টি তাকে অতিক্রম করে দেখে দিব্যনিয়তির নিশ্চিত সার্থকতাকে।

কিন্তু সাধকের মধ্যে মনের সংস্কার যতক্ষণ প্রবল থাকে, ততক্ষণ দৃষ্টির এই পূর্ণতা তাঁর মধ্যে ফোটে না। তাইতে জ্ঞানযোগীদেরও সত্যের মধ্যে পারমার্থিক (noumenal) আর প্রাতিভাসিকের (phenomenal) ভেদ করতে দেখা যায়। অখণ্ড ব্রহ্মসত্তাকে দুভাগ করে তাঁরা বলেন, তার এই ভাগ সত্য আর ওই ভাগ মিথ্যা। মিথ্যা হতে সত্যে জগৎ হতে ব্রহ্মে উত্তীর্ণ হওয়া মুক্তি, আর মুক্তিই জীবের পরমার্থ। তাইতে তাঁরা ব্রহ্মের মধ্যে প্রপঞ্চো-পশম শিবকেই মানেন, প্রপঞ্চে উল্লসিত শক্তিকে মানেন না। ব্যুত্থানেও তাঁরা দেহ-প্রাণ-মনের মধ্যে অনুচ্ছ্বসিত প্রশমকে শুধু আমল দেন, তাদের মধ্যে দিব্যভাবের স্ফুরত্তাকে (dynamism) ভাবেন মায়ার খেলা।

বলা বাহুল্য, এ-দৃষ্টি পূর্ণাদ্বৈতের নয়, এর মধ্যে কাজ করছে মনের দ্বৈতের সংস্কার। অখণ্ডকে অন্যোন্যবিরোধে খণ্ডিত করা হল মনের স্বভাব। সে বলে 'নেতি নেতি'; আর বোধি বলে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। একসময় নেতি-ভাবনার দরকার হয় সত্যি, যখন মন দিয়ে আমরা অপরা-প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করি। কিন্তু এ-ভাবনা একদেশী : তার পূর্ণতা ওই ইতিভাবনায়—যখন সব-কিছুর মধ্যে দেখি পরমপুরুষের পরমা-প্রকৃতির উল্লাস। তখন সবই ব্রহ্মের চিদাবিষ্ট শক্তি এবং আনন্দের রূপ, অতএব সবই সত্য।

*

এই পরিপূর্ণ অদ্বৈতের ভাবনা নিয়েও বিশ্বাত্মভাবের সাধনা চলতে পারে। তার সাধন হল সংবেগ নয়, আবেশ। বিশ্ব হতে বিশ্বোত্তীর্ণের দিকে ছিটকে পড়ছি না তখন, দেহ-প্রাণ-মনের সব বাতায়ন খুলে দিয়ে বিশ্বোত্তীর্ণকেই নামিয়ে আনছি এইখানে। 'আনছি' বলাও ঠিক নয়, 'তিনি আসছেন' এইটি অনুভব করছি আমার সব দিয়ে। স্বাহামন্ত্রে তাঁর আবাহন। চিন্ময় আবিষ্ট হচ্ছেন মৃন্ময় আধারে, তাইতে দেহ-প্রাণ-মন সব চিন্ময় হয়ে উঠছে।

তখন দেখি, দেহ প্রাণ মন এরা তো আলাদা-আলাদা নয়—সবই যে সেই চিৎসমুদ্রের তরঙ্গ। তরঙ্গে-তরঙ্গে ব্যবধানটা উপরভাসা, কিন্তু জলের অতলে সব যে একই সমুদ্রহৃদয়ের আন্দোলন। তাইতো বিশ্ব জুড়ে 'হৃদয় পানে হৃদয় ছোটে', অভেদসাধনে ভেদের বাধা ঘোচাবার জন্য মরমীয়ার এত আকুলিবিকুলি। বাস্তবিক, সজাতীয় আর বিজাতীয় ভেদ নিছক মনের মায়া, আর স্বগতভেদ শুদ্ধসত্ত্বেরই চিন্ময় উল্লাস। ছোট আমির সঙ্গেই ছোট আমির বিরোধ। কিন্তু যে-আমি বৃহৎ এবং সর্বগত, তার তো কারও সঙ্গে বিরোধ নাই। সবার সঙ্গে আমি এক, কারও হতে কিছু হতেই আমি বিবিক্ত নই। সবার ভাবনা সবার বেদনা আমারই ভাবনা আর বেদনা—এমন-কি এই দেহের বীণাও যে বিশ্বদেহের বীণার সঙ্গে একই ঘাটে বাঁধা, ওখানকার সুখ-দুঃখের ঝঙ্কার যে এখানেও অনুরণন জাগায় অনুক্ষণ। এও অদ্বৈতের উপলব্ধি—শুধু সর্বাধার হয়ে নয় সর্বগত হয়ে, চিন্ময় হয়েই নয় চিদ্‌ঘন হয়ে নিখিলের অন্তরঙ্গ আস্বাদন।

কিন্তু এই বিশ্বাত্মভাবনারও স্তরভেদ আছে। সবার সুখ-দুঃখকে আপন করে নেওয়া হল তার প্রথম স্তর এবং নিশ্চয় তা অধ্যাত্মসিদ্ধির একটা উঁচু ধাপ। বেদের ভাষায় একে বলতে পারি বৈশ্বানরের ভোক্তৃত্ব। প্রাকৃত নরের ভোক্তৃত্ব হতে এর জাত আলাদা, কেননা আত্মচেতনার বিস্ফারণ এর অঙ্গীভূত। শুধু আত্মসুখ নিয়ে আমি ভুলে নাই, বিশ্বের দুঃখে আমার হৃদয় করুণার্দ্র—এর একটা মহিমা এবং সুষমা আছে বই কি। কিন্তু এই করুণার সঙ্গে যদি শক্তির যোগ না ঘটে, তাহলে তাকে বলব, 'এহো বাহ্য'। অপরের দুঃখের সমানুভব যেমন চাই, তেমনি চাই তার প্রতিকারের সামর্থ্য। রোগীর দুঃখে আত্মীয়েরা অসহায়ভাবে দুঃখ পায়, এটা তাদের মমতার পরিচয়। কিন্তু স্থিরবুদ্ধি চিকিৎসক সেক্ষেত্রে করেন শক্তির প্রয়োগ, যাতে রোগীর দুঃখ দূর

হয়ে যায়। এখানে সার্থকভাবে কাজ করে তাঁর প্রজ্ঞা এবং বীর্য, অথচ তাঁর সমানুভব যে নাই তাও নয়। অধ্যাত্মসিদ্ধিতেও তেমনি ভোক্তৃত্বের পর আসে কর্তৃত্ব। বৈশ্বানর তখন শুধু ভোক্তা নন, তিনি 'ভোক্তা মহেশ্বরঃ'। যে-তপোবীর্য একদিন আমাকে নিজের দুঃখ ঘোচাতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, তা-ই এখন আমায় উদ্দীপ্ত করে বিশ্বের দুঃখমোচনে। আমি বিশ্বের সঙ্গে তখন এক—যেমন প্রজ্ঞায় এবং আনন্দে, তেমনি ভাবনায় বেদনায় এবং তপস্যাতেও। সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে আনন্দের এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধির ঊর্ধ্বে বীর্যের স্ফুরত্তায় আমি তখন 'স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ'।

১৬

একত্ব

জ্ঞানযোগের সাধনায় উজান-ভাটা দুটি ধারার কথা বলেছি। প্রথম উজান ধারা ধরে চলতে হয়, অন্তত অধিকাংশ সাধকের পক্ষে তা অত্যাবশ্যক। যে-অহংচেতনা দেহ-প্রাণ-মনকে জড়িয়ে আছে, তাকে বিবিক্ত এবং পরিশুদ্ধ করে রূপান্তরিত করতে হবে আত্মচৈতন্যে এবং তাকেও উজিয়ে নিতে হয় অক্ষরব্রহ্মের নির্বিশেষ চৈতন্যে। অনেক জ্ঞানযোগীর কাছে অক্ষরস্থিতিই হয় পরমপুরুষার্থ। উজানপথে যেতে-যেতে অহন্তার কুণ্ডলী ভেঙে যাওয়ায় চেতনা বিশ্বচৈতন্যে পরিব্যাপ্ত হয় এবং বিশ্বের অন্তর্যামী ঈশ্বরকে আবিষ্কার করে, এমন-কি ব্যুত্থানে বিশ্বাত্মভাবের অনুভবও জ্ঞানযোগীদের আসে। কিন্তু সাধারণত তাঁরা এই অনুভবগুলিতে অক্ষরস্থিতির পূর্ণতা না দেখে দেখেন ন্যূনতা। পূর্ণযোগীর ধারণা তার বিপরীত। অক্ষরস্থিতি তাঁরও কাম্য : কিন্তু তাঁর কাছে তার তাৎপর্য শুধু প্রপঞ্চের উপশমে নয়, উল্লাসেও; মোক্ষের পরিণাম শুধু জীবনবিমুখ নৈষ্কর্ম্য নয়, দিব্যজীবনের দিব্যকর্মেই তার সত্যকার সার্থকতা।

অতিমুক্ত চেতনায় যেখানে উল্লাস আছে কর্ম আছে, সেখানে বহুর স্বীকৃতিও আছে। বহুর প্রপঞ্চ সেখানে একেরই শক্তিবৈচিত্রীর উল্লাস। একই রূপে-রূপে ফুটছেন প্রতিরূপ হয়ে। বাইরের দৃষ্টিতে রূপের সীমা আছে, কিন্তু ভাবদৃষ্টিতে তো তার সীমা নাই। ইন্দ্রিয় যাকে সসীম দেখছে, ভাব তারই মধ্যে আবিষ্কার করছে অসীমকে। মরমীয়ার দৃষ্টি তাই বিন্দুর মাঝে দেখে সিন্ধুর উদ্বেলন, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের পরিপূর্ণ প্রকাশ।

এই অনুভব আসে দৃষ্টির গভীরতা হতে, যার পরিচয় প্রচলিত জ্ঞান-যোগের মধ্যে আমরা পাই না। সেখানে একত্বকে কল্পনা করা হয় তটস্থ আধাররূপে—বহুর মেলাকে সে ধরে আছে মাত্র। কিন্তু সে-ই যে বহু হয়েছে এবং বহুর প্রত্যেক বিভাবে পূর্ণরূপে আবিষ্ট হয়ে আছে, এ-চেতনা সেখানে ক্ষীণ। আমরা উপরভাসা দৃষ্টিতে জগৎকে দেখি, যেন একটা আবছা একত্বের পটভূমিকায় বহুর সুগোচর মেলা। জ্ঞানযোগীরা আবছা একত্বকে সুগোচর

করতে গিয়ে বহুকে আবছা করে তোলেন। ফলে দুটি দৃষ্টির কোনটিই পরিপূর্ণ অদ্বৈতদৃষ্টির গভীরতা পায় না।

পূর্ণযোগীর সম্যক্‌জ্ঞানে কিন্তু এক আর বহুর মাঝে এই বিরোধ নাই। অব্যক্তে-ব্যক্তে নির্গুণে-সগুণে অবিগ্রহে-সবিগ্রহে তিনি পান এক পরমেরই নিবিড় অনুভব। তাঁর দৃষ্টিতে অরূপ যেমন রূপে অপরূপ, তেমনি অরূপের মধ্যেই রূপের স্ব-রূপ। আর তাঁর এই অনুভব শুধু ধ্যানের নিস্তরঙ্গ গভীরতাতে নয়, ব্যবহারের স্বচ্ছন্দ প্রবর্তনাতেও।

*

ব্রহ্মস্বরূপের সাতটি বিভাবের কথা অন্যত্র বলেছি : ব্রহ্ম সন্মাত্র (Being), চিৎতপস্‌ (Consciousness-Force), আনন্দ, অতিমানস সঙ্কল্পশক্তি—এই তাঁর স্বরূপের পরার্ধ; আবার তিনি বিশ্বভূত মন, প্রাণ এবং রূপধাতু (Substance) —এই তার অপরার্ধ। সাধারণত এই পরার্ধ আর অপরার্ধের মাঝে একটা ভেদ বা তারতম্যের কল্পনা করা হয়। প্রবর্তসাধকের কাছে পরার্ধের চেতনা অস্পষ্ট বলে তাকে স্পষ্ট করবার একটা আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক এবং তাইতে ভেদবুদ্ধিকে খানিকটা আমল দেওয়া খুব দোষের নয়। কিন্তু সিদ্ধের অনুভবে আবছা বলে কিছুই নাই। অতএব পরার্ধে এবং অপরার্ধে, প্রপঞ্চের উপশমে এবং উল্লাসে তাঁর কাছে তারতম্যের কিছুই নাই। উপশমকে যদি বলি পুরুষ এবং উল্লাসকে প্রকৃতি, তাহলে তাঁর অর্ধনারীশ্বর চেতনায় পুরুষ আর প্রকৃতি যুগনদ্ধ এবং ব্রহ্মস্বরূপের সাতটি বিভাব যে-কোনও ভূমিতে ওতপ্রোত।

আপাতদৃষ্টিতে পরার্ধ আর অপরার্ধের মাঝে যে-তারতম্য আমরা দেখতে পাই, তা ঘুচে যায় যখন পরার্ধের আবেশে অপরার্ধের রূপান্তর ঘটে। আর এই রূপান্তরই বস্তুত সিদ্ধির পূর্ণতা। যদি অনুভব করি : যে-জড়ে রূপ-ধাতুর প্রকাশ এবং যা আমার এই দেহের উপাদান, তা ব্রহ্মের সন্মাত্রের বিভূতি এবং তাঁর জ্যোতি আনন্দ আর শক্তির বিচ্ছুরণের আধারমাত্র; আমার প্রাণে ব্রহ্মের চিন্ময় তপঃশক্তির হিল্লোল; আমার মন ব্রহ্মের অতিমানস প্রজ্ঞা এবং সঙ্কল্পের প্রতিভূ; আমার হৃদয়ের বৃত্তিতে ব্রহ্মেরই হ্লাদিনী শক্তির উল্লাস; তাহলে ঐ পরার্ধ আর অপরার্ধের আড়াল ঘুচে যায়—আমার চেতনায়। আমার

মধ্যে যা সিদ্ধ, তা বিশ্বের সুনিশ্চিত সাধ্য—কেননা আমার আত্মচৈতন্য বিশ্ব-চৈতন্যেরই প্রতিভূ। সুতরাং কি ব্যক্তিতে কি বিশ্বে পরার্ধে এবং অপরার্ধে বস্তুত কোনও ভেদ নাই। ব্রহ্ম সর্বত্র সমব্যাপ্ত চিদ্‌ঘন এবং একরস।

*

পরার্ধে এবং অপরার্ধে ভেদ ঘোচে যেমন রূপান্তরে, তেমনি রূপান্তর সিদ্ধ হয় অতিমানসের আবেশে। অতিমানস ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি। তার একটি লক্ষণ, প্রজ্ঞা আর সঙ্কল্প সেখানে এক এবং সঙ্কল্প আর সিদ্ধিতে কোনও ব্যবধান নাই। অর্থাৎ জানা আর হওয়া সেখানে এক; আর সে হওয়ার প্রবেগ চিৎ হতে জড় পর্যন্ত অকুণ্ঠে প্রবাহিত। আমাদের মন এই অতিমানসের বিভূতি। কিন্তু জানা আর হওয়া তার মধ্যে এক নয়। মন জানতে পারে অনেক-কিছুই, কিন্তু শক্তির কুণ্ঠায় তার জানা হওয়াতে পর্যবসিত হয় না। শক্তির কুণ্ঠা আসে ইন্দ্রিয় হৃদয় আর বুদ্ধির সঙ্কোচ হতে। এই কুণ্ঠাকে দূর করবার জন্য সাধারণত জ্ঞানযোগীরা মনোলয়ের পথ ধরেন। তাতে পরার্ধ-ভূমিতে ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব তাঁদের হতে পারে, কিন্তু সে-অপরোক্ষতাকে অপরার্ধভূমিতে নামিয়ে আনা সম্ভব বা সহজ হয় না।

উৎক্ষেপের পথ না ধরে যাঁরা আবেশের পথ ধরেন, গোড়া হতেই একটা সংবর্তুল প্রত্যয়ের স্বাচ্ছন্দ্য তাঁদের মধ্যে থাকলেও মনের বাধা তাঁদের বেলাতেও প্রথমটায় একেবারে দূর হয় না। পরার্ধচৈতন্যের আবেশ আসে ঝলকে-ঝলকে, কিন্তু অপরার্ধভূমিতে তা স্থায়ী হয় না। তবে এক্ষেত্রে এপারে-ওপারে ব্যবধানের কোনও পাকাপাকি সংস্কার সাধকের মধ্যে না থাকায় প্রতি আবেশেই স্থায়িত্বের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

অবশেষে ঊর্ধ্ব হতে আধারে অতিমানস জ্যোতির নির্ঝরণ হয় নিরন্তর এবং তার আবেশে রূপান্তরের ক্রিয়া হয় যেন অন্তর্গূঢ় দিব্যস্বভাবের প্রস্ফুরণ। মনের বিক্ষেপ তখন সংহত হয় এক অখণ্ড সত্যভাবনার সৌষম্যে, কামসঙ্কল্পের অন্ধ আবর্তন মুক্তি পায় সত্যসঙ্কল্পের ঋজুসঞ্চারী সার্থকতার ছন্দে, হৃদয়ের দ্বন্দ্ব ও বেদনার বিধুরতা নিমজ্জিত হয় এক অক্ষুব্ধ আনন্দের গহন গভীরে। এমনি করে জীবনের সমস্ত বিরোধের সমাধান হয় এক পরম জীবনের মহাবৈপুল্যের সুরসঙ্গতির মধ্যে। সুখ দুঃখ আর মোহ তখন

রূপান্তরিত হয় স্বরূপস্থিতির আনন্দে, সিদ্ধি আর অসিদ্ধি এক মহাশক্তির অবন্ধ্য লীলায়নে, বিদ্যা আর অবিদ্যা এক সর্ববিদ্যার ভাস্বরতায়, সত্তার সঙ্কোচ আর প্রসার এক অনিবাধ সন্মাত্রের আত্মরূপায়ণের বিচিত্র ভঙ্গিমায়।

এমনি করে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের আবেশে এপারে আর ওপারে একে আর বহুতে মনঃকল্পিত সকল বিরোধের অবসান ঘটে।

*

জ্ঞান কর্ম আর ভক্তি—সাধনার এই ত্রিমার্গের মধ্যেও তখন আর ভেদ থাকে না। জ্ঞানের লক্ষ্য ব্রহ্মের সদ্ভাবে স্থিত হওয়া; কর্মের লক্ষ্য তাঁর চিৎ-তপসের শরীক হওয়া; আর ভক্তির লক্ষ্য তাঁর আনন্দস্বরূপে অবগাহন করা। অর্থাৎ তিনটি সাধনারই লক্ষ্য সেই সৎ-চিৎ-আনন্দকে উপলব্ধি করা—যার-যার নিজস্ব ভঙ্গিতে। কিন্তু উপলব্ধির বস্তুটি ত্রিভঙ্গিম হয়েও স্বরূপত এক। সুতরাং যে-পথই ধরি না কেন, চরম উপলব্ধিতে তো কারও সঙ্গে কারও বিরোধ থাকতে পারে না।

ব্রাহ্মী স্থিতি হল জ্ঞানযোগীর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু আগেই দেখেছি, এই স্থিতি বিশ্বোত্তীর্ণতার নির্বিশেষ প্রশান্তিতেই নয়, বিশ্বাত্মকতার অনিবাধ উল্লাসেও। আমার মধ্যে আমি যেমন একা, তেমনি আবার সবার মধ্যে আমি এক। এক বহুতে ছড়িয়ে পড়ছেন শক্তির উল্লাসে। ব্রহ্মের জ্ঞান আমার সম্পূর্ণ হবে না যদি তাঁর শক্তির জ্ঞানকে অঙ্গীকার না করি। শক্তির উল্লাস তাঁর দিব্যকর্ম এবং সে-কর্মের আমিও শরীক। সৃষ্টি যেমন তাঁর 'জ্ঞানময়ং তপঃ', আমার জীবনও আমার কাছে তা-ই। ব্রহ্মের জ্ঞান আমাকে সর্বতোভাবে মুক্ত করেছে বলেই কর্ম আমার কাছে আর বন্ধন নয়, আমার স্বরূপশক্তির বিচ্ছুরণ।

এই বিচ্ছুরণে বহুর সঙ্গে একের সম্পর্ক নিবিড় হয়—রসের উল্লাসে। যেমন ব্রহ্ম সৎ এবং চিৎ, তেমনি তিনি আবার শক্তি এবং আনন্দও। একটিতে তিনি পুরুষ, আরেকটিতে তিনি প্রকৃতি। কিন্তু দুটিতে আবার এক যুগনদ্ধ তত্ত্ব। তাঁর দিব্যকর্মের যেমন তিনি দ্রষ্টা এবং ভর্তা, তেমনি তার ভোক্তাও। অর্থাৎ মহেশ্বররূপে তাঁর আত্মপ্রকৃতিরই তিনি ভর্তা এবং ভোক্তা। ভরণে শক্তি, ভোগে আনন্দ। তাঁর প্রকৃতিকে তিনি অন্তর হতে বিচ্ছুরিত করে আবার

অন্তরে আকর্ষণ করছেন। এই আকর্ষণে পুরুষের আনন্দ আর প্রকৃ
প্রেম। তার উপলব্ধিতে আমরা আবিষ্কার করি ব্রহ্মের রসস্বরূপ। নী
বিধৃত আকাশের এই রসচেতনায়। একে উপলব্ধি না করলে তো ব্রহ্মোপল
পূর্ণ হবে না।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, সম্যক্-জ্ঞানের সিদ্ধি শেষপর্যন্ত আমাদের পৌঁ
দেবে পরম একত্বের উপলব্ধিতে। সে-একত্ব সর্বসমঞ্জস—যেমন ব্রহ্মের স্বরূ
তেমনি আমাদের সাধনায়। জ্ঞান শক্তি ও আনন্দ হতে বিযুক্ত নয়। তি
ব্রহ্মের স্বগত একত্বেরই বিভঙ্গ।

১৭

পুরুষ ও প্রকৃতি

এতক্ষণ যে-একত্বের কথা বললাম, বস্তুত তা দ্বিদল। দ্বিদলতা একত্বের স্বভাব। বিশ্বের সর্বত্র এক ভেঙে দুই হচ্ছে, আবার দুই জুড়ে হচ্ছে এক। এই দ্বৈতসম্পর্ক অদ্বৈতে সম্পুটিত। অভেদে ভেদ আর ভেদে অভেদ—এই তার মর্মরহস্য।

একের চেতনাকে অব্যাহত রেখে তার মধ্যে দুয়ের লীলাকে দেখতে হলে চাই দৃষ্টির গভীরতা। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—একই আছে দুই নাই, এ-দৃষ্টিতে আছে নির্বিশেষ ব্যক্তিচৈতন্যের প্রশান্তি। এ-অনুভব নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু এ-ই সব নয়। তাই উপনিষদই আবার বলছেন, 'স একাকী নৈব রেমে'—তিনি একাকী থেকে কিছুতেই নন্দিত হলেন না। তাঁর শক্তি ও আনন্দ বিচ্ছুরিত হল শতরূপা প্রকৃতিতে। সেই প্রকৃতি আবার ফিরে এল তাঁরই মধ্যে। বিচ্ছুরণ আর সঙ্কর্ষণে সত্তা আর আনন্দের মাঝে খেলতে লাগল চেতনার বিদ্যুৎ। সমস্ত জগৎ এই অনাদি-মিথুনের লীলাবিলাসের অপরূপ কাব্য। জগৎসম্পর্কে এই রসানুভূতিতেই দৃষ্টির পূর্ণতা। আর এই দৃষ্টিতেই প্রকৃতির রূপান্তর সম্ভব হয়—যা পূর্ণযোগীর একান্ত কাম্য।

মানুষ খুঁজছে পরমকে (Absolute)। পরমের অনুভব সে পেতে পারে চেতনার চরম উৎকর্ষে। কিন্তু এখানে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির রাজ্যে তার চেতনা কুণ্ঠিত। তাই সে পরমকে খোঁজে এবং পায় অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে। সে-পাওয়া সাধারণত হয় সর্বনাশা। এপার থেকে ওপারে যে যায়, এপারে আর সে ফিরে আসতে চায় না। কিন্তু এপারের প্রতি এই বিতৃষ্ণা মনের মায়া। অমায়িক অনুভবে ওপারের চেতনা প্রগাঢ় হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আপনি বিচ্ছুরিত হয়। তখন এপারে আসা সহজ হয়, ওপারের অনুভব এপারেও বজায় থাকে। তাইতে ইন্দ্রিয়ানুভূতি অপরূপের ব্যঞ্জনায় গভীর হয়। যা ছিল নিছক বস্তু, তা হয় ভাবঘন, রেখার অর্থ স্ফুরিত হয় রূপে। তখন কবির দৃষ্টিতে দেখি, পরম শুধু ওখানেই নয়, পরম এখানেও। ওখানে প্রশমের পরমতা, এখানে উল্লাসের।

ওখানে প্রকৃতির নিমেষে পুরুষের কৈবল্য, এখানে তার উন্মেষে প্রকৃতি-পুরুষ যুগনদ্ধতা। বিষয়ানন্দেও তখন ব্রহ্মানন্দ।

*

অখণ্ডের এই দ্বিদলতাকে দর্শনে নানা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তি[illegible] সংজ্ঞা আমাদের পরিচিত : সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি, বেদান্তের ব্রহ্ম-মায়া, [illegible] তন্ত্র-পুরাণের ঈশ্বর-শক্তি। সাংখ্যের বিচার ব্যষ্টিকে নিয়ে : প্রতি জী[illegible] মাঝেই সে চৈতন্যরূপে দেখে পুরুষকে আর ক্রিয়ারূপে প্রকৃতিকে। পুরু[illegible] আর প্রকৃতি দুইই তার কাছে সত্য, যদিও প্রকৃতি হতে বিযুক্ত পুরুষের কৈ[illegible] হচ্ছে তার কাছে পরমার্থ। বেদান্তের বিচার সমষ্টিকে নিয়ে : বিশ্বের মূ[illegible] সে দেখে ব্রহ্মচৈতন্য আর তার মায়াশক্তি। তার মধ্যে ব্রহ্মই সত্য; মা[illegible] অনির্বচনীয়া, আর তার কর্ম এই জগৎ ব্রহ্মে আরোপমাত্র, অতএব মিথ্যা। তন্[illegible] পুরাণের বিচার সমগ্রকে নিয়ে : ঈশ্বর আর শক্তি দুইই সত্য, দুইই চিন্[illegible] দুইই অবিনাভূত (inseparable)। এখন দেখতে হবে, দর্শনে স্বীকৃত এ[illegible] দ্বিদলতত্ত্ব আমাদের জীবনে কি রূপ ধরেছে।

জীবনে দ্বৈত আছে, একথা অনস্বীকার্য। এই দ্বৈতকে বলতে পা[illegible] জীবচৈতন্য আর প্রকৃতি। প্রকৃতির ক্রিয়া চলছে যেমন আমার আধারে, তেম[illegible] বহির্বিশ্বে। সে-ক্রিয়ার বোধ যার মধ্যে হচ্ছে, তাকে বলি জীবচৈতন্য। বিশু[illegible] জড়বাদ বলে, জীবচৈতন্য জড়ক্রিয়ার পরিণামমাত্র। কোনও-কোনও জড়বা[illegible] তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। কিন্তু অপরের বোধকে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা[illegible] দ্বারা উড়িয়ে দিলেও নিজের বোধকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একদিকে ক্রি[illegible] আরেকদিকে বোধ—এদুটি মুখামুখি দাঁড়িয়ে আছে; তাদের কাউকে অস্বীকা[illegible] করা চলে না। জীবচৈতন্য প্রকৃতিপরিণামের ফল অতএব যান্ত্রিক একথা মে[illegible] নিলেও দেখি, চৈতন্য ক্রমে যন্ত্রের কবল থেকে নিজেকে উদ্ধার করে যন্ত্রী হবার চেষ্টা করছে, এই তার বৈশিষ্ট্য। সাংখ্যদর্শনে চৈতন্যের এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট[illegible] সেখানে বুদ্ধিকে পর্যন্ত প্রকৃতিপরিণাম অতএব জড় (=দৃশ্য) বলে স্বীকার করেও আত্মচৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য ঘোষিত হয়েছে। প্রকৃতিই সব, আত্মভাব মিথ্যা— এ-মত যেমন আধুনিক জড়বাদের, তেমনি বৌদ্ধদর্শনেরও। তবে জড়বাদে লোকোত্তরের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে লোকোত্তরই পরমপুরুষার্থ।

মোটের উপর বলা চলে, আমাদের জীবনে প্রকৃতির ক্রিয়া যেমন সত্য, তেমনি জীব চৈতন্যের স্বাতন্ত্র্যস্পৃহাও সত্য। প্রকৃতির সকল ক্রিয়া বোধের কাছে অনুকূল বলে প্রতিভাত হয় না। প্রতিকূল বেদনাকে পরিহার করবার প্রচেষ্টা জীবচৈতন্যের একটা বৈশিষ্ট্য। এই থেকে দার্শনিক দুঃখবাদের উৎপত্তি। দুঃখ হতে দুঃখাভাবে উত্তরণকে সেখানে জীবের পরমপুরুষার্থ বলে গণ্য করা হয়েছে। তার উপায় হল প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক অর্থাৎ জীব-চৈতন্যকে প্রকৃতির ক্রিয়ার ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া। এই সাধনার শুরু তিতিক্ষায় এবং পর্যবসান পুরুষের কৈবল্যে। কৈবল্যে পুরুষ স্বরূপে অবস্থিত এবং স্ব-তন্ত্র; অন্যত্রে সে প্রকৃতিতন্ত্রিত। কৈবল্য জীবচৈতন্যের একটি সমূর্ধ্ব এবং কাম্য স্থিতি, তাতে সন্দেহ নাই। সাংখ্যের পরিভাষা অনুসারে তখন জীবকে বলতে পারি পুরুষ।

*

প্রকৃতি হতে বিবিক্ত পুরুষ প্রকৃতির প্রতি উদাসীন। 'উদাসীন' অর্থে তিনি প্রকৃতির ঊর্ধ্বে আসীন, তার ক্রিয়ায় অবিক্ষুব্ধ। অবিক্ষোভ নেতিবাচক সংজ্ঞা, তার ইতিরূপ হল প্রশান্তি। পুরুষের প্রশান্তি গভীর হতে গভীরতর হয়ে অবশেষে পর্যবসিত হয় আত্মারামতায়। পুরুষ তখন নিজের মধ্যে ডুবে গেছেন, প্রকৃতি তাঁর কাছে উপশান্ত অবলুপ্ত।

সাধনার প্রথম ফলস্বরূপ এ-অবস্থান কাম্য সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরুষ আর প্রকৃতির মাঝে এই চিরবিচ্ছেদই কি একমাত্র পুরুষার্থ? এমনি করে ব্যষ্টি-পুরুষ না হয় বিশ্বপ্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে গেলেন; কিন্তু তাতে পরমপুরুষের সঙ্গে পরমা-প্রকৃতির সম্বন্ধের সব রহস্য তো ধরা পড়ল না। জীব প্রকৃতি থেকে দুঃখ পায়, তাই প্রকৃতির সঙ্গে তার এই অসহযোগ—নিজের গরজে। কিন্তু শিবেরও কি এমনতর অসহযোগের কোনও প্রয়োজন আছে? যদি না থাকে, তাহলে জীবও কি শিবস্বভাবের অনুসরণ করতে পারে না? প্রথম অবস্থায় তা সম্ভব নয় জানি; কিন্তু স্বরূপস্থিতির পরিপাকে চৈতন্যের উল্লাস অসম্ভব বা বর্জনীয় কেন হবে? বরং তা-ই কি স্বরূপস্থিতির স্বাভাবিক পরিণাম হবে না?

অতিমুক্তির (utter freedom) সাধনায় তা-ই হয়। বিবেকের সাধনায়

চেতনা প্রকৃতি হতে গুটিয়ে এসে কেন্দ্রে সংহত হল, গুণক্ষোভ থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্থ হল। কিন্তু মুক্তিতে সে কেবল উদাসীন হবে কেন, স্বরাট্ হবে না কেন, প্রকৃতির প্রশাসনের ভার কেন সে নেবে না?

বস্তুত চেতনার সংহনন সিদ্ধির প্রাথমিক পর্ব মাত্র। মনের বিরুদ্ধ সংস্কারের বাধা যদি না থাকে, তাহলে সংহননের পরে স্বভাবের নিয়মেই দেখা দেয় বিস্ফারণ : আত্মচৈতন্য বিস্ফারিত হয় বিশ্বচৈতন্যে, উপনিষদের ভাষায় জ্ঞান-আত্মা হয় মহান্ আত্মা, চিদগ্নির শিখা আদিত্যদ্যুতিতে পরিভাস্বর হয়ে ওঠে। বিশ্বপ্রকৃতি তখন বিশ্বচেতন পুরুষ হতে বিবিক্ত নয়—আদিত্যের প্রভা-মণ্ডলের সে কুক্ষিগত, তার দ্বারা অধিকৃত আবিষ্ট এবং প্রাণিত।

ব্যষ্টির সত্তা তখন সমষ্টির মধ্যে হারিয়ে যায়; অথবা তার মধ্যে সে জেগে থাকে তাঁর প্রজ্ঞা এবং সংকল্পের বাহন হয়ে। তার স্বকীয় ভাবনা বেদনা সংকল্প তখন স্পর্শমণির ছোঁয়ায় সোনা হয়ে যায়। বিশ্বভাবন পুরুষের সাযুজ্যে প্রমুক্ত আত্মচৈতন্যে নামে শক্তির নির্ঝর।

শুধু ঔদাসীন্য নয়, স্বারাজ্যসিদ্ধিই পূর্ণযোগীর পুরুষার্থ।

*

স্বারাজ্যসিদ্ধির ধাপগুলির একটা ইঙ্গিত গীতায় আছে। বলা হয়েছে এই দেহেই পরমাত্মা পরমপুরুষ আছেন, তিনি উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা এবং মহেশ্বর। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক ধাপে-ধাপে নিবিড় হয়ে উঠেছে। উপদ্রষ্টৃত্বে যার শুরু, মহেশ্বরত্বে তার শেষ।

প্রথমত পুরুষ হতে পারেন প্রকৃতির দ্রষ্টা মাত্র—কর্তাও নন, ভোক্তাও নন। অন্তরে-বাইরে প্রকৃতির ক্রিয়াকে তিনি প্রশান্ত ঔদাসীন্যে দেখে যাচ্ছেন, কিছুরই সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন না—এমন-কি এ যে তাঁর প্রকৃতি একথাও বলছেন না। প্রকৃতি থেকে তিনি সম্পূর্ণ বিবিক্ত। অপরা-প্রকৃতির বশ্যতা হতে মুক্ত হবার জন্য এই বিবেক যে অপরিহার্য, একথা আগেও বলেছি। তবে এ-দ্রষ্টৃত্বের রকমফের আছে। বিশুদ্ধ দ্রষ্টৃত্ব একবারে আয়ত্ত হয় না। প্রথম তার মধ্যে তিতিক্ষার সংমিশ্রণ থাকে। অসাড় হয়ে প্রকৃতির ক্রিয়াকে সয়ে যাচ্ছি—এ হল তামসিক দ্রষ্টৃত্ব। বিতৃষ্ণা নিয়ে সইছি—এ হল রাজসিক। প্রসন্ন হয়ে সইছি—এ হল সাত্ত্বিক। কিন্তু বিশুদ্ধ দ্রষ্টৃত্বে সওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। অন্তরে-

বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির লীলা দেখে তখন নন্দিত হচ্ছি। অথচ তাহতে আমি বিবিক্ত, ইচ্ছামাত্রে দেখার পাট চুকিয়ে দেবার স্বাতন্ত্র্য আমার আছে।

যিনি দ্রষ্টা, প্রকৃতির ক্রিয়ার তিনি কর্তা নন। কর্তৃত্ব হয় ঈশ্বরের, নয়তো প্রকৃতির নিজের। ভোক্তাও তিনি নন, কেননা সুখ-দুঃখ বা ইচ্ছা-দ্বেষের আন্দোলন তাঁর মধ্যে নাই। দেখার একটা আনন্দ থাকতে পারে, কিন্তু তা উল্লাস নয়, আপনাতে আপনি থাকার প্রশান্ত প্রসন্নতা। আকাশের মত এই প্রসন্নতা দৃশ্য থাকলেও আছে, না থাকলেও আছে। সুতরাং তাকে ঠিক ভোগ বলা চলে না।

কিন্তু এই বিশুদ্ধ দ্রষ্টাই আবার ভোক্তা হন প্রমুক্ত অনুভবের প্রগাঢ়তায় এবং পরিব্যাপ্তিতে। দ্রষ্টৃত্ব এসেছিল বিবেক থেকে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে তফাত হওয়া থেকে। তফাত হওয়ার মূলে ছিল প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার ভয়। কিন্তু পুরুষ স্বপ্রতিষ্ঠ হলে ক্রমে তাঁর এই ভয় থাকে না। 'চারা গাছকে প্রথম বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, নইলে গরু-ছাগলে মুড়িয়ে খায়। কিন্তু গুঁড়ি মোটা হয়ে গেলে তাতে হাতি বেঁধে রাখলেও কিছু হয় না।' অভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে আসে স্বাচ্ছন্দ্য, আসে চেতনার পরিব্যাপ্তি। তখন অনুভব হয়, জগৎ আমারই মধ্যে। আত্মস্থ হয়ে আমি যেমন আত্মপ্রকৃতির ভর্তা বা ধারক, তেমনি পরিব্যাপ্ত চেতনায় আমি বিশ্বপ্রকৃতিরও ভর্তা।

পুরুষ ভর্তা, কিন্তু তবুও প্রকৃতির প্রশাসনের ভার যেন তাঁর উপরে নাই। যদিও শক্তির সঙ্গে এখন তিনি যুক্ত, তবুও সে যেন স্ব-তন্ত্র, সে যেন তাঁর শক্তি নয়। কিন্তু অনুভবের প্রগাঢ়তায় শেষে এই আলাদা ভাবটুকু আর থাকে না। পুরুষ তখন দেখেন, শক্তি তাঁর আত্মশক্তি, প্রকৃতির ক্রিয়া চৈতন্যেরই বিচ্ছুরণ—যেমন ব্যক্তিতে, তেমনি বিশ্বে। চৈতন্যের ক্রিয়া লক্ষ্যাভিসারী (teleological), তার এলোমেলো চলনেরও পরিণাম একটা সুনিরূপিত ছন্দের দিকে—যেমন শিশুর টলে-টলে চলার পরিণাম সুনিয়ন্ত্রিত অথচ স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে চৈতন্যের নির্বাচনী শক্তি (selectivity), যাকে বলতে পারি চৈতন্যের একটা প্রধান লক্ষণ। পুরুষ যখন প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হতে চেয়েছেন, তখনও এই নির্বাচনী শক্তি তাঁর মধ্যে কাজ করেছে, যার জন্য তিনি বলেছেন 'অবিবেক হেয় আর বিবেক উপাদেয়'। বিবেকের প্রেরণায় প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়াকে তিনি নিরুদ্ধ করতে চেয়েছেন স্বরূপাবস্থানকে অটল করবার জন্য। আগেই বলেছি, তার মধ্যে খানিকটা ভয় ছিল, 'পাছে বেসামাল হয়ে

পড়ি।' কিন্তু স্বরূপাবস্থান পাকা হওয়ার পর আর শক্তির রাস টেনে রাখবার প্রয়োজন হয় না, তখন তাকে স্বচ্ছন্দে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে উল্লাসে। শক্তি তখন আত্মচৈতন্যের ছন্দোময় বিচ্ছুরণ। এ যেন যে-শিশু একদিন টলতে-টলতে চলতে শিখছিল, পদক্ষেপের দৃঢ়তাকে আয়ত্ত করে সে আজ তাকে নৃত্যে হিল্লোলিত করে তুলল। নৃত্যের মধ্যে একদিকে যেমন আছে স্বাচ্ছন্দ্য, তেমনি আছে কঠোর নিয়ন্ত্রণ যা প্রত্যেকটি অঙ্গহারকে (bodily movement) একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্যের অনুকূলে বেছে নিচ্ছে। এর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে চৈতন্যের নির্বাচনী শক্তি। চৈতন্য তখন শক্তির বিজ্ঞাতা অনুমন্তা এবং ঈশ্বর। যে-শিব কালীর পায়ের তলায় শব হয়ে ছিলেন, তিনিই এখন নটরাজ।

নটরাজ আনন্দময়, তিনিই প্রকৃতির ভোক্তা মহেশ্বর। অবরভূমিতে ভোক্তা ছিল সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে বিধুর। কিন্তু পরমভূমি দ্বন্দ্বাতীত। এই ভূমিতে চেতনা প্রশান্ত বলেই প্রসন্ন, প্রসন্ন বলেই অভয়, অভয় বলেই আনন্দময়। প্রকৃতিতে শক্তির যে-উল্লাস, তার নিরঙ্কুশ সম্ভোগই পুরুষের আনন্দ।

অতএব আদিতে যে-পুরুষ প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে ছিলেন শুধু দ্রষ্টা, বিজ্ঞানের পরিপাকে ও শক্তির মুক্তিতে তিনিই এখন প্রকৃতির ভর্তা কর্তা এবং ভোক্তা মহেশ্বর।

অখণ্ড সচ্চিদানন্দই পুরুষ এবং প্রকৃতিতে দ্বিদল। পুরুষে তাঁর চিন্ময় সন্মাত্রের প্রকাশ আর প্রকৃতিতে তাঁর তপশ্চিক্রয় (radiant) শক্তির। দুটি অবিনাভূত : দুয়ের মিলনই আনন্দ। এই আনন্দ যেমন লোকোত্তরে শক্তির সংহরণে, তেমনি আবার বিশ্বলোকে শক্তির বিচ্ছুরণে।

প্রকৃতি-পুরুষের যে-সামরস্য ব্রহ্মে, তা নিত্যযুক্ত অতএব ব্রহ্মভূত শিব-জীবের অতিমুক্ত চেতনাতেও।

১৮

জীবের মুক্তি

বারবার বলেছি, পূর্ণযোগের লক্ষ্য প্রকৃতির রূপান্তর। তা-ই আমাদের জীবনে পরমপুরুষার্থ। আমরা অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত জীবনকে আঁকড়ে থাকতে চাই না; আবার মুক্তির সন্ধানে লোকোত্তরে উধাও হয়ে যেতেও চাই না। চাই দিব্য জীবন—যা ওখানে যেমন পূর্ণ তেমনি এখানেও পূর্ণ, প্রতিমুহূর্তে যার পূর্ণতা হতে পূর্ণতাই উপচে পড়ছে, আবার সর্বশূন্যতার অগম রহস্যেও যা অনিঃশেষ পূর্ণতায় থমথম করছে। আমরা যেমন আকাশকে মানি, তেমনি পৃথিবীকেও মানি—পৃথিবীর হিরণ্যবক্ষে দেখি আকাশের আনন্দরূপ, তারই আলোয় আর তাপে দেখি হৃদয়ে-হৃদয়ে পূর্ণতায় অপূর্ণের দল মেলা। আমাদের চেতনায় পুরুষ শুধু প্রকৃতির বিবিক্ত উপদ্রষ্টা নন, তিনি তার ভোক্তা মহেশ্বরও।

এই বোধ এক সর্বসমঞ্জস অদ্বৈতোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। সব-কিছু ছাপিয়ে যেমন অদ্বৈত, তেমনি আবার সব-কিছু নিয়েই অদ্বৈত—এই হল সম্যক্ জ্ঞান। এই অদ্বৈত একটা আচ্ছিন্ন প্রত্যয় (abstraction) নয়। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার প্রতি কোষে প্রাণ যেমন ওতপ্রোত হয়ে একটি সমগ্র অর্থের বিধান করে চলেছে এখানে-সেখানে আপাতবিকলতা সত্ত্বেও, তেমনি ব্রহ্মের একত্ব সর্বানুস্যূত হয়ে সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধের সমাহার ও সমাধানের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলছে এক বৃহৎ সুরসঙ্গতি। বুদ্ধির কল্পিত স্বগতভেদ সেখানে বোধির দৃষ্টিতে সর্বগত অভেদের বিলাস। অন্তরের গভীরে এই অভেদের অনুভবে চেতনা যখন ব্যাপ্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়-মনের দেখা বাইরের ভেদকে সে অনায়াসে বহন করে চলে। জগতের সঙ্গে জীবের কোথাও আর তখন বিরোধ থাকে না।

আগেও বলেছি, এই এক কিন্তু একা নয়—দ্বিদল। তার একটি দল পুরুষ বা চৈতন্য, আরেকটি দল প্রকৃতি বা শক্তি। চৈতন্য যখন আপনাতে আপনি বিভোর, শক্তি তখন গুটিয়ে আছে তার মধ্যে। আবার সে-চৈতন্যই যখন আত্ম-বিচ্ছুরণে উল্লসিত, শক্তি তখন ছাড়া পেয়েছে বিচিত্র কর্মে। অথচ এটি

মুক্তি, তেমনি অতিমানসের জ্যোতিঃশক্তিতে মনের রূপান্তরেও মুক্তি। বরং পরেরটিতেই মুক্তির পূর্ণতা, তাই তাকে বলি অতিমুক্তি। অতিমুক্তিতে জীব-ভাব শূন্যে মিলিয়ে যায় না, প্রাকৃত জীব সত্য জীব হয়ে ওঠে। সেই সত্যজীবের সঙ্গে তখন চলে ব্রহ্মের বিচিত্র সম্বন্ধের উল্লাস। প্রাকৃত সম্বন্ধের ন্যূনতা পরিপূরিত হয় অপ্রাকৃত আনন্ত্যের অমৃত-আস্বাদনে।

জীবনের মূলে তাহলে পুরুষ বা ব্রহ্ম, প্রকৃতি বা শক্তি, আর শুদ্ধ জীবত্ব—এই তিনটি তত্ত্ব। সম্যক্-জ্ঞান এদের কোনটিকে প্রত্যাখ্যান করে না—প্রত্যাখ্যান করে শুধু অবিদ্যাকে যার মূলে রয়েছে অহন্তার সঙ্কোচ। আমার কাঁচা আমি ব্রহ্মকে বা আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তিকে জানে না, তাই সে প্রকৃতির ক্রীড়নক হয়ে দুঃখ পায়। এই তার বন্ধন। পাকা আমি সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সবাইকে ছাপিয়ে যায়। তার চেতনায় তখন নাম-রূপ দেশ-কাল বা জন্ম-মৃত্যুর কোনও গণ্ডি থাকে না। আকাশের মত সে শাশ্বত সর্বগত; সর্বাধার হয়ে সে সবার প্রবর্তক। সে সবার অতীত, এই তার অসম্ভূতি (Non-birth); আবার সে তার শুদ্ধজীবত্বে সংহত, আর সেই কেন্দ্র থেকে সবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বিশ্বরূপ—এই তার সম্ভূতি (Becoming)। অসম্ভূতি আর সম্ভূতির সহবেদনই মুক্তি এবং অমৃতত্ব।

*

মুক্তি আর অমৃতত্ব : কিন্তু চেতনার কোন্ ভূমিতে? একটা সাধারণ জবাব হচ্ছে—লোকোত্তরে। কথাটা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়, কেননা তার মধ্যে অনুভবের সায় আছে। প্রাকৃতভূমিতে বন্ধন আর মৃত্যু অবিসংবাদিত প্রত্যক্ষ। তাকে ছাপিয়ে ওঠবার তাগিদ যদি যোগীর মধ্যে প্রবল হয়, সে মাঝপথে কোথাও থামতে চাইবে না, কোন-কিছুর সঙ্গে রফা করতে চাইবে না, দেবলোকের অবন্ধন অমৃতত্বের কল্পনাও তাকে লুব্ধ করবে না। যেখানে রূপ আছে, ভোগ আছে, দ্বৈতের এতটুকু আভাস আছে, তারই শেষে হাঁ করে আছে বিনাশের অতল গহ্বর। অতএব অস্তিত্বের পরিনির্বাণই একমাত্র সত্য। সে-নির্বাণ আত্মভাবের, জগতের, ঈশ্বরের—এককথায় সব-কিছুর। ছাড়তে যখন একবার আরম্ভ করেছি, তখন কিছুকেই আর আঁকড়ে থাকব না। 'পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে শেষপর্যন্ত আর-কিছুই থাকে না'। কোনও কার্য নয়,

ভোগ্য নয়—এমনকি দৃশ্যও নয়। এরাই প্রকৃতি, এরাই বন্ধন। এরা খ
পড়লেই পুরুষ মুক্ত, প্রকৃতি হতে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এবং তিনি অ
কেননা শক্তি নিস্পন্দ বলে তার মধ্যে আবৃত্তি নাই, সুতরাং মৃত্যুও নাই।

এই অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের দীপও যদি নিবে যায়, তবে তো স
চুকেই গেল। অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য তাহলে হবে উল্কার বেগে এক মহাশূ
মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। উল্কা জ্বলতে-জ্বলতে ছুটেছে বটে; কি
জ্বলা তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য নিবে যাওয়া। জীবনের পরিসমাপ্তি যেমন ম
তেমনি চিৎপ্রকর্ষেরও পর্যবসান নির্বাণে। বৌদ্ধ এবং নির্বিশেষাদ্বৈতব
দর্শনের মূল সুর এখানে একই।

কিন্তু চরম অনুভবের পর সবারই জীবন ফুরিয়ে যায় না, অনেককে আব
এখানে ফিরে আসতে হয়। তখন জগৎকে তাঁরা কি দৃষ্টিতে দেখেন তা আ
বলেছি। দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি : তখন যাঁর ম
সুপ্তির ঝোঁক প্রবল, তিনি হন অজাতিবাদী—জগৎ তাঁর কাছে থেকেও না
স্বপ্নের ঘোর যাঁর মধ্যে থাকে, তিনি হন মায়াবাদী—জগৎ তাঁর কাছে আছ
আর যিনি আবার এখানে জেগে ওঠেন, তিনি হন জীবন্মুক্তিবাদী—কি
জগতের উপদ্রষ্টা হয়েও তিনি উদাসীন, তাঁর জীবনের ভোগ বা কর্ম কে
প্রারব্ধক্ষয়ের জন্য। তিনটি অনুভবই 'উচ্চকোটির, কিন্তু কোনটিই অদ্বৈ
পূর্ণতায় নিবিড় নয়। ব্রহ্ম আর জগতের মাঝে পর আর অবর (higher &
lower) সত্যের যে-ভেদ নিয়ে মন সাধনা শুরু করেছিল, তার সংস্
এদের মধ্যে এখনও অনবলুপ্তই আছে।

*

কিন্তু পূর্ণযোগের অনুভব হবে আরেকধরনের। পূর্ণযোগী হয় জা
এর অনুভবকে ক্রমে নিবিড় হতে নিবিড় করে তোলেন—তাঁকে আর উৎক্রে
পথ ধরতে হয় না; অথবা ধরলেও তিনি আবার জাগ্রৎএ যখন ফিরে আসে
তখন স্বপ্ন আর সুপ্তির গাঢ়তাকে তার মধ্যে সঞ্চারিত করেন। ফলে স
অবস্থাতেই বস্তু তাঁর কাছে অনাত্ম অতএব বহিরঙ্গ নয়, ভাব ও শ
আবেশে তা তাঁর অন্তরঙ্গ এবং আত্মভূত। জাগ্রৎএর প্রাকৃতভূমিতে ব
স্পষ্ট, কিন্তু ভাব আবছা, শক্তি অদৃশ্যপ্রায়। যেমন একটা মানুষকে চর্মচ

খুব স্পষ্ট করে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু মর্মচক্ষে তার ভাবের অতিসামান্য পরিচয়ই পাই, আর তার অন্তশ্চেতনার গভীরে শক্তির ব্যঞ্জনাকে তো মোটেই দেখি না। কারণ আর কিছুই নয়—মানুষটি বস্তুরূপে আমার কাছে অনাত্মীয়। আমি অযোগী, আত্মবোধহীন; তাই বস্তু আমার কাছে বস্তুমাত্র, অথবা তার মধ্যে আমি যে-ভাবের আরোপ করি তা মনঃকল্পিত। মুশকিল এই, যোগ করতে গিয়েও বস্তুজগতের প্রতি অনাত্মীয়ভাবনার সংস্কার আমাদের ছেড়ে যায় না। ফলে, যোগে আমি আমাকে পাই, কিন্তু জগৎকে আমার করে ফিরে পাই না। উৎক্ষেপের সাধনাতেও সাধককে ভাব আর শক্তির জগতের ভিতর দিয়ে যেতে হয় তুরীয়ে—উপনিষদ যাদের বলেছেন স্বপ্নস্থান আর সুষুপ্তিস্থান। উজিয়ে যাবার সময় এদের যদি আত্মচৈতন্যের সত্য সম্ভূতি বলে স্বীকার না করি, তাহলে ভাটিয়ে এসে বস্তুজগতে আমি এদের খুঁজে পাব না—বস্তুজগৎ আগেকার মতই আমার কাছে আবছা হয়ে থাকবে, ভাবে রসে শক্তিতে নিবিড় সুস্বাদু ও জীবন্ত হয়ে উঠবে না। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের অনুভব আমি পাব শুধু বিবিক্ত আত্মানুভূতিতে, সে-অনুভব গভীর হয়ে সচ্চিদানন্দঘন বিশ্বানুভূতিতে উপচে পড়বে না।

বলা বাহুল্য, পূর্ণযোগের লক্ষ্য ব্রহ্মানুভবের এই দৈন্যকে নিরাকৃত করা। ব্রহ্মই জীব আর জগৎ হয়েছেন একথা যদি সত্য হয়, তাহলে জীবও যেমন সচ্চিদানন্দ, জগৎও তেমনি সচ্চিদানন্দ। জগৎ যে সচ্চিদানন্দ তা বুঝবে কে? বুঝব আমি—প্রাকৃত জীবত্বের সঙ্কোচ পরিহার করে আমি যখন সচ্চিদানন্দ হব। কিন্তু সে-আমি তখন আর কাঁচা আমি নয়—পাকা আমি, সবার আমি। সবার সঙ্গে আমার অভেদই তখন সত্য, ভেদটা আপতিক (apparent)। যেমন সমুদ্রের উপরে-উপরে দ্বীপগুলি আলাদা হয়ে ভাসছে, কিন্তু সমুদ্রের গভীরে তারা এক। আমার চেতনা সেই বিশাল গভীর সমুদ্রের চেতনা। এই চেতনাই ব্রহ্মচেতনা। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। আমার দৃষ্টি ব্রহ্মেরই দৃষ্টি। শুধু দৃষ্টি নয়, ভুক্তি এবং শক্তিও। দৃষ্টিতে হল বিশ্বোত্তীর্ণতার প্রতিষ্ঠা, আর ভুক্তি ও শক্তিতে বিশ্বাত্মকতার। আরেকভাবে বলতে গেলে পুরুষের দৃষ্টি বা চৈতন্য, আর প্রকৃতির শক্তি। দুয়ের যুগনদ্ধতায় আনন্দ। সব মিলে ব্রহ্মসদ্ভাব।

এই অখণ্ড ব্রহ্মানুভবেই আত্মানুভবের পূর্ণতা। বিশ্বোত্তীর্ণতায় আমি যেমন প্রকৃতির অতিষ্ঠা (transcendent) তেমনি বিশ্বাত্মকতায় তার প্রতিষ্ঠা

(essential substratum)। একা আমাকে নিয়ে যেমন আমার পূর্ণতা, তেমনি সবাইকে নিয়েও আমার পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই অতিমুক্তি। ব্যক্তির মুক্তির তপস্যা তখন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু চলছে বিশ্বের মুক্তির তপস্যা। সে-তপস্যা আর আয়াস নয়—উল্লাস, শক্তির অমোঘসিদ্ধির স্বচ্ছন্দ বিকিরণ। তাও আনন্দ। যেমন ফুল ফোটানোতে আনন্দ। আবার ফোটা ফুল দেখায় আনন্দ। দেখা মর্মে—প্রকৃতি যেখানে সহস্রদলে বিকসিতা কমলা।

১৯

লোকসংস্থান

অতিমুক্ত পুরুষ স্বচ্ছন্দে প্রকৃতির উপদ্রষ্টা ভোক্তা এবং নিয়ন্তা। অতি-মুক্তি সম্ভব হয় পরমপুরুষের সাযুজ্যে। তার জন্য ইহলোক থেকে পুরুষকে উজিয়ে যেতে হয় লোকোত্তরের দিকে। এখানে পুরুষ প্রকৃতির বশ। মনের ঐশ্বর্য তার মধ্যে ফুটেছে বলে নিজেকে সে স্বাধীন মনে করতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুত তার মনের শক্তিও সীমিত। এই শক্তিতে বহিঃপ্রকৃতিকে খানিকটা বশে আনতে পারলেও অন্তঃপ্রকৃতির ঈশ্বর হতে সে পারে না। আর তা নাহলে তার জীবন শিবহীন দক্ষযজ্ঞে পরিণত হতে বাধ্য। অন্তঃপ্রকৃতির প্রশাসন হতে পারে যোগে। যোগশক্তির উৎস মনের উজানে। তাই প্রকৃতির যথার্থ অধীশ্বর হওয়ার জন্য পুরুষকে ধরতে হয় এই উজানের পথ, তাকে যোগী হতে হয়।

প্রচলিত যোগে চেতনার দুটি ভূমি বা লোককে মাত্র স্বীকার করা হয়েছে—একটি ইহলোক, আরেকটি লোকোত্তর। ইহলোকে পুরুষের বন্ধন, আর লোকোত্তরে তার মুক্তি। আগেও বলেছি, ইহলোকের প্রতি তীব্র বৈরাগ্যের ফলে লোকোত্তরের আকর্ষণ সাধকের মধ্যে প্রবল বলে তিনি আর মাঝপথে কোথাও থামতে চান না। ইহলোক আর লোকোত্তরের মাঝে আছে লোক-সংস্থানের পরম্পরা। তাদের মধ্যে দেখা দেয় চেতনার বিচিত্র প্রকর্ষ, পরমা-প্রকৃতির আনন্দ ও শক্তির উল্লাস। ইহলোকে আনন্দ ও শক্তির কুণ্ঠায় বিরক্ত হয়ে যিনি লোকোত্তরের পথ ধরেছেন, তিনি আর কোথাও তাদের উপর আস্থা রাখতে পারেন না। তাই মানসোত্তর ভূমির ভোগ আর ঐশ্বর্যকে তিনি ভাবেন মায়ার প্রলোভন, তাঁর নিশ্চল স্বরূপাবস্থানের পক্ষে অতিসূক্ষ্ম বাধাই কেবল।

বলা বাহুল্য, এ হল নেতিবাদীর দৃষ্টিভঙ্গি। নেতি-নেতি বলে নির্বিশেষের দিকে উজিয়ে যেতে হয় সত্য, কিন্তু ইতিভাবনায় আবার সেখান থেকে ভাটিয়ে না এলে সত্যস্বরূপকে পুরাপুরি পাওয়া যায় না। লোকোত্তরে যাঁর নিশ্চল প্রতিষ্ঠা, লোকে-লোকে তাঁরই আনন্দ ও শক্তির বিচ্ছুরণ। প্রকৃতি তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি—তাঁরই আত্মজা এবং আত্মস্বরূপা। আত্মস্থ পুরুষের

তাকে ভয় করবার বা এড়িয়ে যাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আত্মস্থ হয়ে যেমন লোকোত্তরের নৈঃশব্দ্যকে অধিগত করতে হবে, তেমনি আত্মস্থ থেকে লোকে-লোকে আত্মপ্রকৃতির সুরমূর্ছনাকেও হিল্লোলিত করতে হবে—এই যোগের পূর্ণতা।

মানসচেতনার ঊর্ধ্বে যেসব লোক আছে, রহস্যবিদ্যায় তাদের খবর মেলে। এযুগ তাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেও প্রাচীনকালে পৃথিবীর সবদেশেই তার কদর ছিল। বিদ্যাটা উপেক্ষণীয় নয়। জড়বিদ্যার মতই তারও ভিত্তি তথ্য আর প্রাকৃতিক নিয়মের উপর। তবে কিনা এ-বিদ্যার প্রধান সাধন হচ্ছে যোগ, যার প্রতিষ্ঠা চেতনার অন্তরাবৃত্তির উপর। পতঞ্জলির যোগসূত্রে একটি পাদ হল বিভূতিপাদ, যাতে জ্ঞান ও ক্রিয়া দুদিক থেকে রহস্যবিদ্যার সোপপত্তিক আলোচনা আছে। রহস্যবিদ্যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু জ্ঞানযোগের সাধনায় তার প্রসঙ্গ একেবারে এড়িয়ে যাওয়াও চলে না। কেননা পুরুষের কৈবল্য শুধু জ্ঞানের বিষয় নয়, প্রকৃতির বিভূতিবিজ্ঞানও তার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের আলোচনায় পতঞ্জলিকে অনুসরণ না করে আমরা উপনিষদের ধারাকে অনুসরণ করব, কেননা তাতে বিষয়টা প্রাসঙ্গিক এবং সহজবোধ্য হবে।

যা বাইরে আছে তা ভিতরেও আছে, যা বিশ্বচৈতন্যে তা-ই আছে আত্মচৈতন্যে—এটি উপনিষদ্-বিজ্ঞানের একটি মূলসূত্র। আগের ভাবনাকে বলা হত অধিদৈবত, পরেরটিকে অধ্যাত্ম। অধিদৈবত দৃষ্টিতে যা 'লোক', অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তা হল চেতনার 'ভূমি'। প্রাকৃত চেতনার তিনটি ভূমির সঙ্গে আমরা পরিচিত—অন্নময় (বা দৈহ্য), প্রাণময় এবং মনোময়। এই তিনটি হল জীবচৈতন্যের বনিয়াদ। কিন্তু জীব শুধু এই তিনটি ভূমিতে আবদ্ধ থাকে না; মনকে ছাপিয়ে মানসোত্তর ভূমিতে নিজেকে সে প্রসারিত করতে পারে—চলতি কথায় জীব ব্রহ্ম হতে পারে। ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ। সুতরাং সত্তা চিৎ-তপস্ আর আনন্দ হল অপ্রাকৃত চেতনার আর তিনটি ভূমি। এটিকে বলা হয় পরার্ধ আর আগেরটিকে অপরার্ধ। দুয়ের মাঝে সেতু হল 'বিজ্ঞান' বা ব্রহ্মের অতি-মানস। যেমন আমাদের মধ্যে অথবা পিণ্ডে চেতনার সাতটি ভূমি, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডে সাতটি লোক—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ এবং সত্য।

প্রত্যেক লোকে বা ভূমিতে পুরুষ আর প্রকৃতি বা চৈতন্য আর শক্তি যুগনদ্ধ হয়ে আছে। এই যুগনদ্ধতার তিনটি বিভঙ্গ (mode) আছে,

পূর্বোল্লিখিত ব্রহ্মস্বরূপের সঙ্গে অবিনাভূত। বিশ্বের যা-কিছু, তার মূল অধিষ্ঠান হল সত্তা। তাকে আমরা উপমিত করতে পারি আকাশের সঙ্গে। আকাশকে আশ্রয় করে যা ফোটে তা হল প্রকাশ এবং তাপ—যেমন দেখি আদিত্যের মধ্যে। এই হল সদব্রহ্মে চিৎ-তপসের নিত্য স্ফুরণ : অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে আমাদের নিস্তরঙ্গ আত্মচৈতন্যে প্রজ্ঞা-বীর্যের অনপলাপ্য স্ফূর্তি। তারপর আদিত্যের তেজ বিচিত্র বর্ণে এবং ক্রিয়ার রূপায়িত হয়। তার সঙ্গে তুলনা করে উপনিষদ বিশ্বের বিভাতিকে বলেছেন ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ। অতিমুক্তের চেতনায় তার অধ্যাত্ম প্রতিরূপ খুঁজে পাওয়া কিছু কঠিন নয়।

বলা যেতে পারে, পুরুষের সত্তা চৈতন্য শক্তি আর আনন্দকে লোকে-লোকে চেতনার ভূমিতে-ভূমিতে রূপায়িত করাই প্রকৃতির কাজ। এই দৃষ্টি নিয়ে এইবার আমাদের আত্মপরিচিতির পালা শুরু হক।

*

সত্তার প্রথমে পাই জড়লোক। জড় যেন চৈতন্যের একেবারে বিপরীত মেরু। চৈতন্যের যা-কিছু ঐশ্বর্য বলে আমরা জানি, তা এখানে নিগূহিত, প্রসুপ্ত। অথচ জড় নিঃশক্তিক নয়। শক্তিতে জড়ের পরিণাম হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রথমটায় দেখি, সে-পরিণাম যেন লক্ষ্যহীন, নিরর্থক। কিন্তু চৈতন্যের উন্মেষে তার মধ্যে একটা লক্ষ্য দেখা দেয়। শক্তি তখন হয় প্রাণ। প্রাণ রূপ গড়ে—চেতনার উন্মেষের আধাররূপে। জড় সে-রূপায়ণের আধার। অস্তিত্বের গভীরে নিগূহিত চেতনাকে ধীরে-ধীরে উন্মেষিত করাতে তার সার্থকতা।

রূপ অবয়বী অর্থাৎ বহু অবয়বের সমাহার। অবয়বের চরম পর্যবসান পরমাণু-কল্পে। পরমাণুতে পরিকীর্ণ হওয়া জড়ের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি পরমাণু বিশিষ্ট। এই বিশিষ্টতা হল বাহ্যত্বের ভিত্তি।

জড় যেমন বহু পরমাণুতে পরিকীর্ণ, তেমনি আবার পরমাণুর সমবায়ে পুঞ্জিতও। এই পুঞ্জভাব হল রূপ বা বিগ্রহ। বিশ্বে এক রূপ নয়, বহু রূপ। আমাদের দেহ এমনি একটি রূপ।

দেহ সপ্রাণ প্রাণ চৈতন্যের শক্তি। পরিকীর্ণতা বা খণ্ডতা যেমন জড়ের ধর্ম, তেমনি চৈতন্যের ধর্ম হল অখণ্ড পরিব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিভাব প্রাণেও আছে, সে চায় সব-কিছুকে আত্মসাৎ করে বৃহৎ হতে। কিন্তু দেহের মধ্যে

জড়ের আদিম পরিকীর্ণতা অনুস্যূত থাকায় একটি দেহ আরেকটি দেহ হতে পৃথক। দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণও তাই বিচ্ছিন্ন। অখণ্ড প্রাণ আধারে-আধারে আলাদা হয়ে কাজ করছে জড়ত্বের সীমায় সঙ্কুচিত হয়ে, এই হল আমাদের সত্তার আদিরূপ।

দেহের মধ্যে চিৎ-শক্তির প্রকাশ মনে। কিন্তু প্রাণেরই মত সে-প্রকাশ দেহধর্মদ্বারা আচ্ছন্ন অতএব সঙ্কুচিত। প্রতি জীবের যেমন দেহ আলাদা, তেমনি প্রাণ ও মনের ক্রিয়াও আলাদা। তাইতে জীবে-জীবে দেহে যেমন ভেদ, তেমনি সমষ্টি প্রাণ ও মনের সঙ্গেও ব্যষ্টি প্রাণ ও মনের ভেদ। অথচ চৈতন্য চায় এই ভেদ দূর করে সবার সঙ্গে সবার যোগ সাধতে। কিন্তু জড়ত্বের বাধা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে সে তা পেরে ওঠে না।

একই কারণে দেহের মধ্যে অবরুদ্ধ জীবের আনন্দানুভূতিও সঙ্কুচিত। মনের নির্ভর ইন্দ্রিয়ের উপর, ইন্দ্রিয়ের প্রসর দেহের জড়ধর্মের দ্বারা ব্যাহত। তাই জীবের ভোগ অপূর্ণ। সব-কিছুতে নিরঙ্কুশ আনন্দ আস্বাদনের অধিকার তার নাই, তার সীমিত সুখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দুঃখ আর অসাড়তার অভিশাপ।

চলতি কথায় বলে, 'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' বাস্তবিক জড়লোকে বা দৈহ্যচেতনার ভূমিতে জীবের এই দশা। প্রকৃতি এখানে পুরুষকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। আত্মসচেতন হয়ে পুরুষ হয়তো তা বুঝতে পারে, কিন্তু এই জগদ্দল পাষাণের চাপ সরিয়ে অনিবাধ সত্তার চৈতন্য এবং আনন্দকে বিস্ফারিত করা তার সাধ্যে কুলায় না। অথচ তার সাধ আছে। তাই তার এই কান্না।

সাধনার দ্বারা জড়ত্বের বাধা পুরুষকে কাটিয়ে উঠতেই হবে—চৈতন্যের শক্তিতে। ইন্ধনের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত এখন চৈতন্যের যে ক্ষীণ প্রকাশ, ওই ইন্ধনকে আশ্রয় করেই তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে। সুতরাং দেহের প্রতি অনাদর বা তার কর্শন কখনও যোগসিদ্ধির অনুকূল নয়। ওতে যে মূঢ়তা বা ক্ষোভ প্রকাশ পায়, তা চিত্তের তামস ও রাজস বিকার মাত্র। চিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব না হলে যোগ হয় না।

*

ভূলোক বা দৈহ্যচেতনার ঊর্ধ্বে রয়েছে ভুবর্লোক বা প্রাণচেতনা। ঊর্ধ্বে বলতে বোঝায় চেতনার প্রকর্ষ। দেহের চাইতে প্রাণের মধ্যে চেতনার প্রকাশ আরও স্বচ্ছন্দ। দেহে যা আচ্ছন্ন বা যান্ত্রিক, প্রাণে তা চঞ্চল এবং উদ্দাম। গুণের দিক দিয়ে বলা যেতে পারে, দেহচেতনা তামস আর প্রাণচেতনা রাজস।

প্রাণ রূপকৃৎ। বিশ্বজোড়া পরিকীর্ণ জড়াণুকে পুঞ্জে-পুঞ্জে সংহত করে বিচিত্র আধারে সে সৃষ্টি করে চলেছে রূপের মেলা। কিন্তু তার এই আধার-সৃষ্টি বস্তুত চৈতন্যের বা পুরুষের সম্ভোগের জন্য। তাই দেখি, ভোগ আর ঐশ্বর্যের বাসনা আমাদের প্রাণের ধর্ম। প্রাণলোক বস্তুত কামলোক—উপনিষদের ভাষায় গন্ধর্বলোক। এটা অবশ্য প্রাণলোকের জ্যোতির্ভাগ—বাসনার পরিতর্পণ যেখানে স্বচ্ছন্দ, কিংবা চিৎপ্রকর্ষের অনুকূল। কিন্তু বাসনার ব্যাঘাত বা বিকারও আছে। তা হল দুঃখ এবং দুরাগ্রহের হেতু। তা-ই প্রাণলোকের তমোভাগ, যাহতে রহস্যবিদ্যায় এসেছে নরক অবীচী পাতাল প্রভৃতির কল্পনা।

এইখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, লোককল্পনার প্রমাণ আছে কিন্তু আমাদের আধারেই। আমাদের দেহ প্রাণ মন সব-কিছুর একটা স্ব-তন্ত্র বৃহত্তর উৎস রয়েছে। তাকেই বলা যেতে পারে 'লোক'। সংজ্ঞাটির প্রাচীন অর্থ ছিল 'বিশ্বচৈতন্যের দীপ্তি'। এই দীপ্তি আমাদের ব্যষ্টি আধারে পরম্পরাক্রমে হয়েছে চেতনার বিভিন্ন 'ভূমি', আবার সমষ্টিতে তেমনি 'লোক'। যেমন আমার মধ্যে দেহচেতনার ভূমি, তেমনি বিশ্বে ভূলোক—যেখানে চৈতন্য জড়ত্বের মধ্যে সংবৃত্ত (involved), যেমন এই পৃথিবীতে। সুতরাং আমার চেতনার স্বর্গ-নরক দিয়েই বুঝতে পারি, তাদের উৎসরূপে স্ব-তন্ত্র স্বর্গ-নরক আছে। আমার স্বর্গ-নরকের প্রমাণ আমার আন্তর-প্রত্যক্ষ। তেমনি স্ব-তন্ত্র স্বর্গ-নরকের প্রমাণ যোগজ-প্রত্যক্ষে—যা বস্তুত আমার অনধিগম্য নয়। এখন আমার মধ্যে স্থূল ইন্দ্রিয়শক্তিই প্রকট, যা শুধু জড়কে দেখে—সে-দেখারও আবার ঘাট বাঁধা। তার বাইরে যা-কিছু, নিজের বেলায় তা প্রত্যক্ষ 'অনুভব' করি, আর অন্যত্র 'অনুমান' করি মাত্র। কিন্তু অনুভবে আর অনুমানে ব্যবধানটা দুস্তর নয়। চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত করলে অনুমান অনুভবে পর্যবসিত হতে পারে—যেমন হয় কারও সঙ্গে কারও মন মজলে। চেতনার অন্তরাবৃত্তি যোগের মূলে, আর তাতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তির প্রকটন এবং আরও গভীর সাযুজ্যবোধের উন্মেষ অসম্ভব কিছুই নয়। তখন দেখা যায়, ভূলোকে যেমন জড় পুঞ্জিত হয়ে জীবের

সৃষ্টি হচ্ছে, ভুবর্লোকেও তেমনি হচ্ছে প্রাণের পুঞ্জনে। রহস্যাবিদ্যায় তাদের একটা সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে 'দেবজন'। এখানকার জীবের সঙ্গে যেমন অপরোক্ষে আমাদের কারবার চলছে, তেমনি তাদের সঙ্গেও চলছে—পরোক্ষে।

বস্তুত, এই আধারে যেমন দেখতে পাচ্ছি দেহে আর প্রাণে কোনও বিচ্ছেদ নাই, তেমনি জড়লোক আর প্রাণ-লোকেও কোনও বিচ্ছেদ নাই। জড়ের চাইতে প্রাণে চেতনার উন্মেষ স্ফুটতর; আর জড় প্রাণ ও চেতনার প্রকাশের আধার হলেও বস্তুত চেতনাই তার নিয়ন্তা। অন্তত জীবের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এই রীতি। এই সূত্র ধরে বলতে পারি, জড়লোক বাস্তবিক প্রাণলোকের একটা পুরঃক্ষেপ (projection)। ভোগ এবং ঐশ্বর্যের বিচিত্র পরম্পরার ভিতর দিয়ে চেতনাকে স্ফূর্ত করবার জন্য প্রাণই তার আয়তনরূপে জড়কে সৃষ্টি করেছে। জড়ের মধ্যে প্রাণ যেমন ওতপ্রোত হয়ে আছে, তেমনি আবার সূক্ষ্মতর তত্ত্ব বলে জড়ের ঊর্ধ্বে তার সাবলীল এবং স্ব-তন্ত্র একটা সত্তাও আছে—চেতনার অন্তরাবৃত্তির দ্বারা আমরা যার সন্ধান পেতে পারি।

*

এমনি করে জড় আর প্রাণকে জারিত করে অথচ তাদেরও ঊর্ধ্বে আছে মন। তাকে উপাদান করে আমাদের আধারে যেমন আছে মনশ্চেতনার ভূমি, তেমনি বিশ্বে আছে বিশুদ্ধ মনোময় লোক, অথবা রহস্যাবিদ্যার ভাষায় স্বর্লোক। গুণের দিক দিয়ে দেখলে এখানে সত্ত্বের প্রাধান্য। ভোরের আলোর মত সত্ত্ব প্রকাশধর্মী, যেমন রজঃ প্রবৃত্তিধর্মী আর তমঃ স্থিতিধর্মী। তিনটি গুণের মিশ্রণে আমাদের প্রাকৃতচেতনার ভূমি, আর বিশ্বের ত্রিলোকী। এই ত্রিলোকীর মধ্যেই চলছে আমাদের প্রাকৃত জীবন আর জন্মপরম্পরার আবর্তন। শাস্ত্রে আবর্তনের আরেক নাম হল সংসার। সংসারেই বন্ধন—ত্রিগুণের বন্ধন। বন্ধনের হেতু গুণের মিশ্রভাব, যার জন্য বিশেষ করে দায়ী রাজসিক চাঞ্চল্য আর তামসিক মূঢ়তা। বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশকে তারাই ব্যাহত করছে। প্রাকৃত মন সাত্ত্বিক, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব নয়। সত্ত্ব রজস্তমোলেশশূন্য হয়ে শুদ্ধ হয় বিজ্ঞানে। বিজ্ঞান থেকে মানসোত্তর যোগভূমিসমূহের শুরু।

আমাদের মধ্যে যা বিজ্ঞান, বিশ্বে তা মহর্লোক। তার ঊর্ধ্বে আর তিনটি লোক—জন তপঃ এবং সত্য। তাদের মধ্যে ব্রহ্মের আনন্দ চিৎ আর সৎস্বরূপের

প্রকাশ, যা নিয়ে সত্তার পরার্ধ। ত্রিলোকী নিয়ে অপরার্ধ, বিজ্ঞান বা অতিমানস দুয়ের মাঝে সেতু। অতিমানসী শক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি এবং আমাদের চিৎ-প্রকর্ষের সাধনায় এই শক্তিই যোগেশ্বরী।

ব্রহ্মের সত্তা চৈতন্য (চিৎ-তপস্) এবং আনন্দ আমাদের মধ্যে নিগূহিত আছে। তাদের স্ফুরিত করাই আমাদের পরমপুরুষার্থ। স্ফুরণের সাধন হল বিজ্ঞান। সাতমহলা রাজবাড়ী, তার নীচের তিনটি মহলেই এখন আমাদের আনাগোনা। ভুলে গেছি যে আমরা রাজার ছেলে, সাতমহলের চাবিই আমাদের দেওয়া আছে। চাবিটা হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

লোকসংস্থান সম্পর্কে আরেকটা কথা স্পষ্ট করে নিতে হবে। জড় প্রাণ মন বিজ্ঞান আনন্দ চিৎ এবং সৎ—এই সাতটি তত্ত্ব দিয়ে সাতটি লোক। প্রথম তিনটি লোক নিয়ে অপরার্ধ। তার মধ্যে তত্ত্বগুলির যে-পরিচয় আমরা পাই তা অবিশুদ্ধ। কিন্তু তাদের শুদ্ধরূপও আছে। অশুদ্ধ দেহ প্রাণ মনের পিছনেই আছে শুদ্ধ দেহ প্রাণ মন। তা-ই হল শুদ্ধ, যার মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশের বাধা নাই। তখন প্রকৃতিকে বলা হয় পরা-প্রকৃতি। তার সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক বিবেকের নয়, সাযুজ্যের। অবিশুদ্ধ প্রকৃতি হল অপরা-প্রকৃতি, তারই সঙ্গে পুরুষের যত বিরোধ। অপরার্ধের ঊর্ধ্বে আর অবিশুদ্ধি নাই, আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব নাই—আছে শুধু আলোর খেলা। অপরার্ধেও যে পুরুষ-প্রকৃতির শুদ্ধ সম্পর্ক সম্ভব, তা বোঝাবার জন্য উপনিষদে আছে বিশুদ্ধ অন্নময় প্রাণময় মনোময় পুরুষের কথা।

২০

অপরার্ধের ত্রিপুরুষ

দেখলাম, লোকসংস্থানের আদিতে ভূলোক অন্তে সত্যলোক। প্রথম তিন লোক নিয়ে অপরার্ধ পরের তিনটিতে পরার্ধ। প্রাকৃতচেতনা অপরার্ধকে চেনে, পরার্ধ তার কাছে রহস্য। অপরার্ধে তিনটি তত্ত্বের প্রকাশ—জড় প্রাণ আর মন। জড় চৈতন্যযুক্ত হলে হয় দেহ। দেহকে আশ্রয় করে ফোটে প্রাণ আর মন। চৈতন্য তিনটিতেই অনুস্যূত বলে তাদের ক্রিয়াও ওতপ্রোত।

দেহ-প্রাণ-মনের সমাহারে জীব। জীবের মধ্যে মানুষেই দেখা দিয়েছে মনের উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ সূচিত হয় দুটি ব্যাপারে—কল্পনায় আর অহংচেতনায়। কল্পনায় অতীন্দ্রিয় বোধের প্রথম উন্মেষ। ইন্দ্রিয়বোধ সব জীবেরই আছে, তার সংস্কারও তাদের মধ্যে উৎপন্ন হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযোগ থেকে আচ্ছিন্ন করে বোধকে ছবির মত ভিতরে ফুটিয়ে তোলার সামর্থ্য দেখা দিয়েছে মানুষেই। এই অতীন্দ্রিয় বোধ থেকে দেখা দেয় সামান্যজ্ঞান (conceptual knowledge)। সামান্যজ্ঞান সবরকম বৈজ্ঞানিক ভাবনার ভিত্তি। বিজ্ঞান বাহ্যপ্রকৃতিকে বশে আনবার সাধনায় নিযুক্ত।

বাহ্যপ্রকৃতির বাস্তব সার্থকতা অন্তরের বোধে। বাইরের আঘাতে জিজীবিষাকে (will to live) আশ্রয় করে অন্তরে জাগে সুখ-দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতির দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ববোধ ক্রমে সংহত হয় অহংচেতনায়। এটি স্পষ্ট হয় মানুষের মধ্যে। মানুষই প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে 'অয়মহং ভোঃ'। কল্পনা যেমন ইন্দ্রিয়বোধ থেকে আচ্ছিন্ন হয়ে বাহ্যপ্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তার করে, অহংচেতনাও তেমনি জীবের জীবনযোনিপ্রযত্ন (life function) হতে আচ্ছিন্ন হয়ে অন্তঃপ্রকৃতির প্রভু হতে পারে। অন্তঃপ্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব এবং তার উৎকর্ষ সাধনই হল অধ্যাত্মভাবনার লক্ষ্য। অধ্যাত্মভাবনার বৌদ্ধিক রূপ হল দর্শন। বিজ্ঞান আর দর্শন দুয়ের সমাহারে মানুষের চিৎপ্রকর্ষের সাধনার সার্থকতা।

বিজ্ঞান জোর দেয় বস্তুর উপর, দর্শন ভাবের উপর। বস্তু ছাড়া ভাব দাঁড়াতে পারে না সত্য, কিন্তু বস্তুতে ভাবের অনুপ্রবেশেই বস্তু সার্থক হ

দেহ আছে বলেই চৈতন্য আছে মানলাম; কিন্তু চৈতন্য যদি দেহের ঈশ্বর না হতে পারে, তাহলে? জিজীবিষার সার্থকতা সুতরাং চিৎপ্রকর্ষে, তার মূলাধার যা-ই হক না কেন। অধ্যাত্মভাবনার অপরিসীম মূল্য এইখানে।

অধ্যাত্মভাবনার প্রথম সূচনা মানুষের ধর্মবোধে। ধর্মবোধের আদিমরূপে অনেক মূঢ়তা আছে। কিন্তু তার মূল হল চেতনার স্বোত্তরণ (self-transcendence)। অহংচেতনার মধ্যেই তার প্রথম উন্মেষ। বীজ যেমন বনস্পতিতে বিস্ফারিত হতে চায়, তেমনি অহং বিস্ফারিত হতে চায় ব্রহ্মে বা বৃহতের চেতনায়। এই আত্মবিস্ফারণের প্রথম আশ্রয় হয় বস্তু। নিরঙ্কুশ ভোগ আর ঐশ্বর্য তখন মানুষের পুরুষার্থ। খানিকটা ভোগৈশ্বর্য সে আয়ত্ত করে লৌকিক উপায়ে। লৌকিক উপায় যেখানে ব্যর্থ হয়, সেখানে সে ধরে অলৌকিকের পথ। তার বিশ্বাস, নিরঙ্কুশ ভোগৈশ্বর্য কোথাও আছে—আছে দেবলোকে। শুরু হয় দেবতার উপাসনা, যা সকলধর্মেরই গোড়ার কথা। তারও মূলে ওই এক ব্যাপার : দেবতাকে বা দেবকল্পনাকে ধরে আত্মবিস্ফারণ।

এরই মধ্যে কারও-কারও চেতনা অন্তরাবৃত্ত হয়ে দেখে, কোনও বাইরের নিমিত্তকে আশ্রয় না করেও আত্মবিস্ফারণ সম্ভব। দেবতা বাইরে নন, আমিই দেবতা। এরই পরিশুদ্ধ রূপ হল 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। এ-বোধের স্বরূপ হল আত্মচৈতন্যের অনন্তে বিস্ফারণ। আকাশের মত যা কোনও-কিছুর আশ্রিত নয়, তা-ই অনন্ত; এবং একই কারণে তা অমৃত। আত্মাও তেমনি অনন্ত এবং অমৃত।

'আত্মা অমৃত' এই নিগূঢ় দর্শনকে আশ্রয় করে সব ধর্মেই নানা জল্পনা আছে—আছে জীবের উৎক্রান্তি লোকান্তর জন্মান্তর ইত্যাদির প্রসঙ্গ। তা নিয়ে বিচার করবার আমাদের এখন কোনও প্রয়োজন নাই। এইখানে এই আধারে থেকেই অহংচেতনাকে বা আত্মবোধকে কি করে ব্রহ্মবোধে বিস্ফারিত করা যায়, এখন আমাদের তা-ই দেখতে হবে। লোকসংস্থানের কথা তাতে আসবে, কিন্তু আসবে বাইরের সত্য হয়ে নয়—অন্তরের সত্য অনুভবের সত্য হয়ে। চেতনার প্রকর্ষের দ্বারাই এই পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের অনুভব হবে আমাদের সাধ্য।

*

চিৎপ্রকর্ষের ধাপ আছে। উপনিষদে পাই পাঁচটি কোশে পাঁচটি পুরুষের কথা : অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আর আনন্দময় পুরুষ। কোশগুলি চৈতন্যের আধার বা প্রকৃতি। যেমন পিণ্ডকোশ আছে, তেমনি আছে ব্রহ্মাণ্ডকোশ। একটিকে বলা যায় ভূমি, আরেকটিকে লোক—একথা আগে বলেছি। চিৎপ্রকর্ষ দুই উপায়ে ঘটে—ভূমি হতে লোকে ব্যষ্টি হতে সমষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ে, আবার এক ভূমি হতে আরেক ভূমিতে এক লোক হতে আরেক লোকে উত্তীর্ণ হয়ে। চরম লোক সত্যলোক, উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে হিরণ্ময় পরম কোশ যাতে আছেন 'বিরজো ব্রহ্ম নিষ্কলম্'। অন্নময় চেতনার ভূমি হতে আমাদের পেঁছিতে হবে তাঁর মধ্যে।

অন্নময় কোশে চেতনার প্রথম উন্মেষ—যেমন পিণ্ডে, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডে। আমরা যাকে নিষ্প্রাণ জড় বলি, তারও মধ্যে চৈতন্য অনুস্যূত আছে—বেদের ভাষায় 'ভূতপতি' বা নিয়ামিকা শক্তি হয়ে। সমস্ত কোশেই চৈতন্য সমভাবে অনুস্যূত বলে তারা ওতপ্রোত। সুতরাং অন্নময় কোশেও প্রাণ ও মন অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে, কিন্তু অন্ন বা জড়ের অধীন হয়ে। প্রাকৃত অন্নময় পুরুষের মধ্যে তার পরিচয় পাই। সে একান্তভাবে দেহাসক্ত, তমসাচ্ছন্ন, মূঢ়; তার জীবন বহুলাংশে গতানুগতিকতা এবং দুরাগ্রহের জীবন। এর মোহ কাটিয়ে ওঠা তার পক্ষে বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন।

কিন্তু চৈতন্যের মধ্যে প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের একটা প্রেরণা নিহিত আছে, বৈদিক ঋষিরা যাকে তুলনা করতেন অগ্নিশিখার সঙ্গে। কাঠের মধ্যে আগুন নিগূঢ় হয়ে আছে; মন্থনে যখন তা প্রকাশ পায়, তখন তার শিখা স্বভাবত উচ্ছ্রিত হয় আদিত্যের দিকে যা তাপ ও আলোর উৎস। অন্নময় পুরুষেরও তেমনি একটা প্রবণতা আছে প্রাণলোক হতে আরও তাপ এবং মনোলোক হতে আরও আলো আহরণ করবার দিকে।

কিন্তু জড়ত্বের আবরণ সহজে ঘুচতে চায় না। অন্নময় পুরুষ প্রাণোচ্ছল এবং মনস্বী হয়েও বিশুদ্ধ প্রাণলোক ও মনোলোকের সন্ধান পায় না—বিনা যোগে। যোগ হচ্ছে চৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য উত্তরণ এবং সম্প্রসারণের স্বাভাবিক শক্তি। আমরা যতক্ষণ অযোগী, ততক্ষণ অপরা-প্রকৃতির বশ। তারও মধ্যে ঊর্ধ্বায়নের বেগ আছে, কিন্তু তা মন্থর—ঘাটে-ঘাটে থেমে-থেমে পাক দিয়ে দিয়ে সে উপরদিকে উঠে যায়।

এই বেগকে ক্ষিপ্র এবং ঋজু করা যায় যোগে। যোগের প্রথম সাধনা হ

অন্তরাবৃত্তি এবং বিবেক। দেহচেতনায় জড়িয়ে আছি, চিত্ত কেবল বাইরে ছুটছে। শক্তির ক্রিয়া হচ্ছে কেন্দ্রাতিগ। তার মোড় ফিরিয়ে দেহের মধ্যে কোনও একটা কেন্দ্রে—যেমন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কেন্দ্রানুগ শক্তি স্বভাবত তখন বহির্বৃত্তি হতে বিবিক্ত হয়ে পড়বে। তাকে ধরে রাখতে পারলে ক্রমে দেখা যাবে দেহচেতনার গভীরে আরেকটা চেতনা দেখা দিয়েছে, যাকে বলতে পারি শাঁস আর দেহটা তার খোসা। ওই শাঁসটি হল অন্নময় পুরুষের অন্তরে প্রাণময় পুরুষ, যিনি অন্নময় পুরুষের প্রশাস্তা বা নেতা। বিবেক থেকে শক্তি জাগে, প্রাণময় পুরুষের সাক্ষাৎ প্রশাসনে তখন অন্নময় কোশের ক্রিয়াকে পরিচালিত করা সম্ভব হয়। কায়সম্পৎ (sublimation of the physical being) এবং বিশুদ্ধ প্রাণলোকের সংস্পর্শ হেতু অন্যান্য সিদ্ধিরও আবির্ভাব হয় আধারে। চেতনার সম্প্রসারণে বিশ্বপ্রাণ এবং তার বিভূতির অপরোক্ষ অনুভবও যোগীর আয়ত্তে আসে।

এমনি করে আরও ভিতরে ঢুকে গিয়ে প্রাণময় পুরুষের অন্তরে আবিষ্কার করা যায় মনোময় পুরুষকে। উপনিষদে তাঁকে বলা হয়েছে 'প্রাণ-শরীর-নেতা'। এই পুরুষকে অধিগত করবার ফলশ্রুতিও পূর্বানুরূপ—মনোময় পুরুষ প্রথমত প্রাণময় আর অন্নময় পুরুষের উপদ্রষ্টা এবং অনুমন্তা, তারপর তার ভর্তা এবং ভোক্তা। দেহ আর প্রাণের ক্রিয়া তখন তাঁর স্ববশে; উপরন্তু তাঁর সমুদ্রচেতনায় জাগে বিশ্বমনের বিচিত্র তরঙ্গের আন্দোলন।

এমনি করে আধারে এই তিনটি পুরুষের প্রমুক্তিতে প্রজ্ঞা এবং শক্তির অধিকার ব্যাপ্ত হয় সপ্তলোকের অপরার্ধে বা ত্রৈলোক্যে। কিন্তু এইখানেই উত্তরায়ণের শেষ নয়।

২১

স্বোত্তরণের সোপান

অপরার্ধ হতে যেতে হবে পরার্ধে, অন্ন-প্রাণ-মনোময় প্রাকৃত পুরুষকে হতে হবে বিজ্ঞানানন্দ-চিন্ময় দিব্য পুরুষ। যেতে হবে অন্তরাবৃত্তি এবং বিবেকের পথ ধরে। তার পর ঊর্ধ্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আবার নেমে আসতে হবে অবরভূমিতে, ওখানকার আনন্দ জ্যোতি এবং শক্তিকে নামিয়ে আনতে হবে। অপরার্ধে এবং পরার্ধে অনুস্যূত আছে একই চৈতন্য, সুতরাং দুয়ের মাঝে স্বরূপের ভেদ নাই। তাইতে অপরার্ধে-পরার্ধে আনাগোনারও বস্তুত কোনও বাধা নাই। পরার্ধে যা এক এবং সমরস, অপরার্ধে তা-ই বহু এবং বিচিত্র। এই বৈচিত্র্য একেরই স্বগতভেদের উল্লাস—যেমন একই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, একই প্রাণ বা মনের মধ্যে বৃত্তির ভেদ। এখানকার ভেদ ওখানকার অভেদকে আরও উচ্ছল এবং নিবিড়ভাবে আস্বাদন করবার সাধনমাত্র।

পরার্ধের চেতনা অসীম, অপরার্ধের চেতনা আপাতত সসীম। কিন্তু এই সসীমের মধ্যে রয়েছে অসীমের আকৃতি। অনন্ত প্রজ্ঞা আনন্দ এবং শক্তির একটা আভাস এই প্রাকৃতচেতনাতেও ফোটে, যখন সে অন্তরাবৃত্ত হয়। অভ্যাস-যোগের দ্বারা সে-আভাসকে প্রভাসে রূপান্তরিত করাও যায়। পরার্ধ-চেতনায় অচল প্রতিষ্ঠাও সাধকের পক্ষে অসম্ভব নয়, যদিও তা আয়াসসাধ্য। কিন্তু দেহে প্রাণে মনে এবং ব্যবহারে সত্তা চৈতন্য এবং আনন্দকে উল্লসিত করা আরও আয়াসসাধ্য, যদিও তা-ই আমাদের পরম পুরুষার্থ। কি করে তা সিদ্ধ হতে পারে তা বোঝবার জন্য লোক বা ভূমির পরম্পরাকে ক্রিয়াযোগের দিক থেকে আরও তলিয়ে দেখা দরকার।

*

চৈতন্যই বিশ্বমূল তত্ত্ব—অধ্যাত্মসাধনার এই হল প্রথম স্বীকার্য। একই চৈতন্য, কিন্তু আয়তনভেদে তার প্রকাশ এবং প্রবৃত্তির ভঙ্গি হয় স্বতন্ত্র। চৈতন্য পুরুষ, যার আয়তন (medium) প্রকৃতি। সত্তার আদি হতে অন্ত

পর্ব পর্যন্ত পুরুষ আর প্রকৃতি যুগনদ্ধ হয়ে আছে, একথা আগেই বলেছি। একটি আয়তন হতে আরেকটি আয়তনে উত্তীর্ণ হতে হলে পুরুষকে প্রথম প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে তারপর আত্মস্বাতন্ত্র্যের সাবলীলতায় প্রকৃতিকে অধিকার করতে হয়—এই হল সাধনার মূলসূত্র।

চৈতন্যের প্রথম স্থিতি জড়ের আয়তনে। বিশ্বচৈতন্য বিশ্বজড়ে তখন নিগূহিত। অনুভব তমসাচ্ছন্ন, সর্বত্র এক নিবিড় অন্ধকার, কিন্তু তবুও তা নিস্পন্দ নয়। ব্যষ্টি আধারে এই তমসাচ্ছন্ন পুরুষ হন অন্নময় পুরুষ। তাঁর ভুবনে অন্ন বা জড় হল মূল তত্ত্ব। প্রাণ আর মনের উন্মেষ তার মধ্যে হয়েছে—একান্তই জড়ের বশীভূত হয়ে। জড় প্রাণ আর মন তিনের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশের তারতম্য আছে। জড়ে চৈতন্য সুষুপ্ত, প্রাণে স্বপ্নাবিষ্ট, মনে জাগ্রত। কিন্তু অন্নময় ভুবনে মনকে এবং প্রাণকে কাজ করতে হয় জড়নির্ভর হয়ে। তাইতে দেহাশ্রিত নাড়ীতন্ত্র (nervous system) এবং ইন্দ্রিয়সংবিৎ হয় মনের প্রবৃত্তির (function) সাধন। সুতরাং অন্নময় পুরুষের প্রকৃত পরিচয় পাই দেহাসক্ত ইন্দ্রিয়নির্ভর মানুষের জীবনে, যার মধ্যে অধ্যাত্মচেতনার প্রকাশ যদি-বা কখনও হয়, তা হয় মূঢ় ক্ষীণ এবং গতানুগতিক।

এই অন্নময় পুরুষেরও একটা জীবন-এবং জগৎ-দর্শন আছে। তাঁর কাছে, উপনিষদের ভাষায় 'অন্নই ব্রহ্ম' অর্থাৎ জড়ই বিশ্বমূল তত্ত্ব। সসীমের উৎস অসীমে—দর্শনের এই অভ্যুপগমকে (postulate) তিনিও মানেন; কিন্তু তাঁর কাছে অসীম চিন্ময় নয়, নিতান্তই মৃন্ময়। দেহের উপরে যখন প্রাণ আর মনের নির্ভর, তখন জীবন জন্ম আর মৃত্যুর বন্ধনীতেই সীমিত। যে নিশ্চেতন অব্যক্তের আনন্ত্য হতে জীব এখানে এসেছিল, মৃত্যুতে আবার সে তারই মধ্যে ফিরে যাবে।

কিন্তু এই অন্নময় পুরুষের মধ্যেও কখনও-কখনও স্বোত্তরণের (self-transcendence) পিপাসা জাগে। মূঢ় দেহচেতনার চাইতে জীবন্ত ও জাগ্রৎ মনশ্চেতনার উৎকর্ষ তিনি বুঝতে পারেন এবং যৌগিক উপায়ে তার আরও উৎকর্ষসাধনে তৎপর হন। ক্রমে তাঁর মনে লোকোত্তরের আলো এসে পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রেও জড়ত্বের প্রাক্তন সংস্কার তাঁকে ছেড়ে যায় না। একদিন চৈতন্যকে জড়ের উপসৃষ্টি (by-product) মনে করে তিনি দুয়ের মাঝে একটা বিভাজনের রেখা টেনেছিলেন। আজ চৈতন্যের উপর ঝোঁক পড়লেও সেই ভেদবুদ্ধি তাঁকে এখন বিপরীতমুখে ঠেলে দেয়: তিনি প্রাণকে আর

মনকে ভাবতে শুরু করেন জড়ের বিরোধী তত্ত্ব এবং জড়কে প্রত্যাখ্যান কর ওদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাই তাঁর ধারণা হয়, তাঁর সত্যকার স্বরূপ অপার্থিব এবং জড়োত্তর, বিশুদ্ধ প্রাণ বা মনের ভূমিতে স্থিতিই তাঁর পুরুষার্থ, পার্থিব জীবন দুঃখময় এবং অধ্যাত্মজীবনের পক্ষে একটা বাধা। ভাবনার এই ধা অনুসরণের চরম ফল হল প্রশমকেই (quiescence) অধ্যাত্মসিদ্ধির চরম ব মনে করা, যার আরেক নাম জড়সমাধি। অবশ্য স্বভাবের নিয়মে তাঁরও ম চিদ্‌বিভূতির স্ফূর্তি হয়; কিন্তু তিনি তাকে আমল দেন না। জড়াসক্তি তাঁ যেন নতুন করে পেয়ে বসে : শিব হতে গিয়ে শক্তির উল্লাস আর ভাল লা না, ভাল লাগে শব হয়ে যাওয়া।

*

জড়ের চাইতে উৎকৃষ্টতর তত্ত্ব হল প্রাণ—যেমন রাত্রির অন্ধকারে উৎকৃষ্টতর পরিণাম হল ঊষার অরুণিমা। প্রাণের মধ্যে চেতনার একটা সহজ স্ফূর্তি আছে, দুয়ের মাঝে একটা ওতপ্রোত নিবিড়তার সম্পর্ক। যেখানে চেতনা আছে সেখানেই প্রাণ আছে, যেখানে প্রাণ আছে সেখানেই চেতনা আছে—এটা আমরা ধরে নিতে পারি। বস্তুত জড় প্রাণ চেতনা তিনেরই সম্পর্ক ওতপ্রোত। চৈতন্যকে মূল তত্ত্ব মেনে আমরা জড়কে বলতে পারি তার প্রকাশের আধার, আর প্রাণকে তার শক্তি। সর্বত্র চৈতন্যের প্রকাশ হচ্ছে কোনও-একটি আধারে শক্তির স্বতঃস্ফূর্তিতে। জীবের মধ্যে এই ত্রয়ীর খেলার সুন্দর পরিচয় পাই : তার মধ্যে দেখতে পাই দেহ প্রাণ ও চেতনার অন্যোন্যনির্ভরতা অনুপ্রবেশ এবং সমন্বয়। চৈতন্য যত জড়ের দিকে যাচ্ছে, ততই আমাদের দৃষ্টিতে তার প্রকাশ স্তিমিত হয়ে আসছে, যার ফলে সত্তার অবম (lowest) পর্বে তাকে আর আমরা খুঁজে পাই না। বলতে পারি, সে তখন অসৎ (non-existent) নয়, কিন্তু অব্যক্ত। তেমনি সত্তার পরম পর্বেও চৈতন্য আমাদের কাছে অব্যক্ত। এই দুটি পর্বের মাঝে অভিব্যক্তির যে-মূর্ছনা, তাকে বলতে পারি প্রাণ বা চৈতন্যের শক্তিরূপ। মনে রাখতে হবে, শক্তির খেলায় চৈতন্য যেমন নিমিত্ত (efficient cause), জড় তেমনি উপাদান (material cause)। অতএব অভিব্যক্তির প্রত্যেক পর্বে জড়ও আছে প্রাণস্পন্দনের উপযুক্ত বাহন হয়ে স্থূল বা সূক্ষ্মরূপে। জড়ের সাবলীলতার এই কল্পনা ভারতীয় দর্শনের একটি

বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জড় প্রাণ আর চেতনার মাঝে মনঃকল্পিত কৃত্রিম ভেদের রেখা মুছে গিয়ে সবটাই একটা অভঙ্গ সত্তার বিভঙ্গরূপে প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টিই সম্যক্-জ্ঞানের অনুকূল।

সুতরাং যেমন আমাদের এই নিত্যদৃষ্ট জড়লোক, তেমনি ভূতসূক্ষ্মকে উপাদান করে আছে একটা অদৃষ্ট প্রাণলোক। আমরা যেমন এই জড়লোকের তেমনি প্রাণলোকেরও বাসিন্দা। উপনিষদের ভাষায়, পুরুষ তখন প্রাণময় পুরুষ। প্রাণময় পুরুষের দুটি রূপ আছে : একটি অপরার্ধে অবিশুদ্ধ, আরেকটি পরার্ধে বিশুদ্ধ। অপরার্ধের অবিশুদ্ধ রূপটি গুণময়, সুতরাং তার সাত্ত্বিক রাজসিক আর তামসিক এই তিনটি বিভাব। তামসিক ভাব যেখানে প্রবল, প্রাণময় পুরুষের প্রকৃতি সেখানে রাক্ষসী। প্রাণের একটা সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে বুভুক্ষা, অপরকে আত্মসাৎ করে নিজের উপচয় ঘটানো। রাক্ষসের মধ্যে এই বুভুক্ষা মূঢ়, সব-কিছু সে 'নিজের জন্য রাখে', দেবতাকে কিছুই দিতে চায় না। আবার রাজসিক ভাব যেখানে প্রবল, প্রাণময় পুরুষের প্রকৃতি সেখানে আসুরী। অসুরের মধ্যে যেমন বুভুক্ষা আছে, তেমনি আছে সিসৃক্ষাও—যা প্রাণের আরেকটি লক্ষণ। অসুর প্রবল প্রচণ্ড এবং উদ্দাম, অধিকন্তু সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী—বৈদিক ঋষির ভাষায় সে কখনও-কখনও দেবতার মুখোস-পরা 'শুভ্রবৃত্র'। আবার সাত্ত্বিক ভাব যেখানে প্রবল, প্রাণময় পুরুষের প্রকৃতি সেখানে দৈবী (godlike, কিন্তু দিব্য বা divine নয়)। পরার্ধের প্রাণের আলো-কে সে সহজভাবে স্বীকার করে, নিজের মধ্যে তাকে ফুটিয়েও তোলে; কিন্তু তবুও ছায়ার মায়া হতে সে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পায় না। হয় তখন সত্ত্বের মধ্যে রজস্তমের খাদ মেশানো থাকে, নয়তো শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হলেও তা স্থায়ী বা স্বভাবগত হয় না।

পরার্ধের প্রাণের স্বরূপ হল চিৎ-তপস্ বা ব্রহ্মের চিন্ময় তপঃশক্তি। পরার্ধ অপরার্ধকে আবিষ্ট করে রয়েছে, সুতরাং অপরার্ধেও এই তপঃশক্তি প্রাণের সকল লীলাতেই অল্পাধিক প্রকাশ পায়। তপস্যায় শক্তি সংহত হওয়ায় তার বেগ আর সামর্থ্য বাড়ে। প্রাণের প্রেরণায় রাক্ষস অসুর আর দেবমানব সবাই নিজের ইষ্টসিদ্ধির জন্য তপস্যায় লেগে যায়। যার-যার ইষ্ট নিরূপিত হয় তার প্রকৃতি অনুসারে। রাক্ষস আর অসুরের তপস্যার পরিণাম কি হয়, আমাদের পুরাণে তার বর্ণাঢ্য চিত্র আছে। মনে রাখতে হবে, এই রাক্ষস আর অসুর আমাদের মধ্যেও আছে এবং তারাও তপস্যা শুরু করে সময়-সময়।

দেবমানবের মধ্যে যে প্রাণের তপস্যা তা ব্রহ্মের চৈতন্য এবং আনন্দকে অধিগত করবার জন্য। প্রাণধর্মের প্রেরণায় স্বভাবত প্রশমের দিকে তাঁর ঝোঁক থাকে না—চিন্ময় সম্ভোগের বৈচিত্র্য এবং শক্তির উল্লাসই তাঁকে বিশেষ করে তৃপ্তি দেয়। কিন্তু অপরার্ধের ন্যূনতা তাঁর সাধনা এবং সিদ্ধিকে জড়িয়ে থাকে বলে বিশুদ্ধ মৃণ্ময় পুরুষের বৈভব পুরাপুরি তাঁর মধ্যে ফুটে উঠতে পারে না।

*

জড় আর প্রাণের চাইতে বৃহত্তর তত্ত্ব হল মন। তার মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য। সত্ত্বগুণের বিশিষ্ট ধর্ম হল প্রকাশ। এবার অন্ধকার গেল, উষার অরুণিমা ঝলমলিয়ে উঠল হিরণ্যদ্যুতিতে। চেতনায় যা অস্পষ্ট ছিল তা স্পষ্ট হল, যা দেখা যাচ্ছিল না তা দেখা গেল। সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হল দৃষ্টি। আগেও প্রবৃত্তির আবর্তন ছিল, কেননা প্রকৃতি কখনও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। কিন্তু সে-আবর্তনের লক্ষ্য সুগোচর ছিল না, এইবার হল। আর তাইতে প্রকাশ এসে প্রবৃত্তির রাস ধরল, তাকে নিয়ে চলল অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

এই হল মনোলোকের ছবি। মন দেখছে : যা আছে শুধু তাকেই নয়, যা এখনও হয়নি তাকেও দেখছে। এই হল মনের প্রাতিভশক্তি, যার জন্য উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে 'দৈবং চক্ষুঃ'। এই প্রাতিভশক্তির বলে মন ভূত-ভব্যের ঈশান। ব্যষ্টি আধারে মনকে আশ্রয় করে ফুটলেন মনোময় পুরুষ যিনি 'প্রাণ-শরীর-নেতা'। অন্নময় পুরুষের অন্তরে প্রাণময় পুরুষ, তারও অন্তরে এই মনোময় পুরুষ—দেহ আর প্রাণের অন্তর্যামী।

প্রাকৃতভূমিতে মনোময় পুরুষকে আমরা সাধারণত দেখি দেহের জড়ত্ব আর প্রাণের চাঞ্চল্যের অধীন। কিন্তু তার মধ্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য যে নানাভাবে ফুটে উঠতে চাইছে, আমরা তার আভাস পাই। বহির্মুখ মন ইন্দ্রিয়নির্ভর হলেও এই মনই আবার অন্তর্মুখ হয়ে ইন্দ্রিয়াতিগ হতে পারে। তখন তার মধ্যে ফোটে বিবেক সাক্ষিত্ব কল্পনা সামান্যজ্ঞান প্রাতিভসংবিৎ সহবেদন বোধি ভাবাবেগ ইত্যাদি অলৌকিক ধর্ম। এদের প্রত্যেকের ইশারা এই অন্নপ্রাণময় লোকের উজানে। যোগ বা অন্তরাবৃত্ত একাগ্রতার ফলে এদের শক্তি বাড়ে, মনের মধ্যে ক্রমে ফুটে ওঠে উত্তরমানস প্রভাসমানস বোধিমানস এবং অধিমানসের

উত্তরজ্যোতিঃ। মানুষ তখন সত্যি দেবমানব; আধারের আবেষ্টন থাকলেও তাঁর মধ্যে আর আবরণ নাই তখন। প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন তখন যেন কাচের ঘর, যার বাইরে-ভিতরে আলোর অব্যাহত সঞ্চরণ। অতীন্দ্রিয় সর্বাবগাহী ভাবনা ও বেদনায় (feeling) মনোময় পুরুষের চেতনা ভাস্বর তখন।

মনে হতে পারে, এই সিদ্ধিই বুঝি আমাদের পুরুষার্থের চরম। কিন্তু তা নয়। মন আমাদের অনেক উঁচুতে নিয়ে গেলেও তার নিজস্ব শক্তিতে সে কখনও পরম পরার্ধে পৌঁছে দিতে পারে না, পরার্ধের আভাস তার মধ্যে কখনও রূপকৃৎ প্রভাস হয়ে ওঠে না। উপনিষদের ভাষায় : সূর্যরশ্মিরা সাধককে তখন সূর্যমণ্ডলে নিয়ে যায়; সেখান থেকে তিনি আবার এখানে ফিরে আসেন, কিংবা সূর্যদ্বার ভেদ করে চলে গেলে আর ফিরে আসেন না। সুতরাং লোকোত্তরে পৌঁছে সেখানকার রূপকৃৎ জ্যোতিঃশক্তিকে আবার এখানে নামিয়ে আনা মনের সাধ্য নয়। সামর্থ্যের এই দৈন্য ছাড়া মনের মাঝে আছে তার স্বভাবগত ভেদভাবনার সংস্কার। মন যে-কোনও একটা ভাবকে একান্ত (exclusive) মেনে সাধনা শুরু করে। সে-ভাবকে আনন্ত্যে উত্তীর্ণ করে সে যা পায়, তা তার কাছে চরম পাওয়া হলেও সব পাওয়া কখনও নয়। এইজন্য দেখা যায়, সিদ্ধচেতনাও সবসময় একদেশদর্শিতা হতে মুক্ত নয়। দৃষ্টির এই দৈন্য থেকে আসে সৃষ্টিরও দৈন্য। তাই মনোনির্ভর সিদ্ধি কখনও রূপান্তরের সাধন হতে পারে না। অথচ পূর্ণযোগের লক্ষ্য তা-ই।

*

মন হল অপরার্ধের শেষ ধাপ। তারও ওপারে পরার্ধ। আগেই বলেছি, দুয়ের মাঝে সেতু হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মনের ঊর্ধ্বে। পরার্ধের তত্ত্বকে স্বভাবগত করতে হলে আশ্রয় করতে হবে বিজ্ঞানকে।

বিজ্ঞান মনের ঊর্ধ্বে থাকলেও মনকে সে জারিত করে রয়েছে। প্রত্যেক ঊর্ধ্বতত্ত্বই এমনি করে নিম্নতত্ত্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। ইন্দ্রিয়নির্ভর মনের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় সামান্যজ্ঞান (conceptual knowledge) আর প্রাতিসংবিৎ (Intuitive perceptions), তা-ই হল বিজ্ঞানের ছটা। এদের আশ্রয় করে যোগের পথ ধরে মন অধিমানস পর্যন্ত উঠতে পারে—এই

হল তার শেষ সীমা। তারপর অতিমানসের অধিকার, বিজ্ঞান যার অনবচ্ছিন্ন স্বরূপশক্তি।

মন যদি সত্ত্বপ্রধান, বিজ্ঞান তাহলে শুদ্ধসত্ত্ব। তার মধ্যে কোনও তামসিক আবরণ বা রাজসিক বিক্ষেপের খাদ নাই। অথচ আছে প্রাকৃতগুণের যোগযুক্ত রূপান্তর। তমঃ সেখানে স্থিতি এবং রজঃ বীর্য। দুইই সত্ত্বের প্রকাশধর্মের দ্বারা অনুবিদ্ধ। গুণে-গুণে সেখানে বিরোধ নাই প্রাকৃতভূমির মত—আছে সাম্য। কিন্তু সে-সাম্য প্রলয়ে পর্যবসান নয়, তা সৃষ্টির উৎস—যেমন স্থিত-প্রজ্ঞের মনে (গীতা)। সে-মন সাম্যে স্থিত, সৃষ্টির বীর্যে অধৃষ্য, প্রজ্ঞায় ভাস্বর।

বিজ্ঞানের পরিচয় আবার নেওয়া যেতে পারে দেহের দিক থেকে। পুরুষের স্বরূপ যেমন চৈতন্য, তেমনি দেহ প্রকৃতির স্বরূপ। পাঁচটি কোশ নিয়ে তিনটি দেহ। অন্নময় কোশ হল স্থূলদেহ, প্রাণময় আর মনোময় কোশ নিয়ে সূক্ষ্মদেহ, বিজ্ঞানময় আর আনন্দময় কোশ নিয়ে কারণদেহ। স্থূলে রূপ, সূক্ষ্মে ভাব, আর কারণে শক্তি। শক্তিই ভাব আর রূপের নিয়ামক। গাছের যেমন বীজ, বীজের যেমন উদ্গমশক্তি। আনন্দ আর বিজ্ঞান তেমনি সৃষ্টির মূলে, জীবনের মূলে। এরা ব্রহ্মের বা অতিমুক্ত বৃহৎ চৈতন্যের স্বরূপশক্তি।

এই আধারেরই গভীরে কারণশরীরে আছেন বিজ্ঞানময় পুরুষ। পরার্ধের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগ, অপরার্ধের বিভূতির দেহ-প্রাণ-মনের তিনি অন্তর্যামী এবং প্রশাস্তা। আছেন তিনি আড়াল হয়ে। তাঁকে প্রকট করাই হল যোগের তাৎপর্য। প্রকট করতে হবে এইখানে, দেহ-প্রাণ-মনের মধ্যে।

বিজ্ঞানের প্রকটতায় আনন্দের অভিব্যক্তি। বিজ্ঞান আর আনন্দ ওতপ্রোত। এইপর্যন্ত জীবের উত্তরায়ণের সীমা।

২২

বিজ্ঞান

দেহ প্রাণ মনের উজানে বিজ্ঞান—চৈতন্যের চতুর্থ ভূমি। এই ভূমিই যথার্থ যোগভূমি। বিজ্ঞানরূঢ় হওয়াই হল যোগারূঢ় হওয়া। অপরার্ধ আর পরার্ধের মাঝে সেতু এই বিজ্ঞান, যাকে বলতে পারি সৎ-চিৎ-আনন্দের স্বরূপ-শক্তি। এই শক্তির আবেশে ঘটে অপরা-প্রকৃতির রূপান্তর, জগদ্দৃষ্টির আমূল পরিবর্তন। অপরার্ধে প্রকৃতির যে-সঙ্কোচ তা এখানে অপসারিত হয়, মৃন্ময়ী প্রকৃতি হয় চিন্ময়ী, আনন্ত্যের স্বাতন্ত্র্যে মুক্তচ্ছন্দা। ইন্ধনে তখন আগুন ধরে তার অণু-পরমাণু হয়ে যায় সাগ্নিক, ইন্ধন আর আগুনের প্রকৃতি আর পুরুষের অন্যোন্যসঙ্গম তখন পূর্ণ।

দিব্যপুরুষের সাধর্ম্যের এই হল প্রথম ধাপ। মনের মায়া এখানে সম্পূর্ণ তিরোহিত, কেননা অধিমানস পর্যন্ত ছিল তার অধিকার। মানসোত্তর ভূমিগুলির কথা অন্যত্র বলেছি। তারা সবাই মহাভূমি, প্রাকৃত মনোভূমি হতে উৎকৃষ্ট; কিন্তু তবুও তারা অতিমানস নয়। অথচ অতিমানস বা বিজ্ঞান আর নিরোধযোগের অমনীভাব এক কথা নয়। অতিমানস মন এবং মানসোত্তর ভূমিসমূহের প্রসূতি। একের বহু হওয়ার তাগিদে অতিমানস হতে তারা বিসৃষ্ট হয়েছে। যেখানে বহুর বোধ, সেখানেই ভেদের বোধ; আর এই ভেদবুদ্ধি হল মানসপ্রকৃতির বিশিষ্ট লক্ষণ। প্রাকৃতমন হতে মানসোত্তর ভূমির দিকে যত আমরা উজিয়ে যাই, ভেদবুদ্ধি অভেদজ্ঞানের বশে আসে। কিন্তু তার সম্পূর্ণ বশীকার সম্ভব হয় একমাত্র অতিমানস বিজ্ঞানের ভূমিতেই। প্রকৃতি তখন পুরুষের স্বীয়া প্রকৃতি, তাঁর স্বরূপশক্তি। তাই পুরুষের দৃষ্টি আর প্রকৃতির সৃষ্টিতে তখন কোনও ব্যবধান থাকে না : তখন দৃষ্টিই সৃষ্টি। শক্তির ধারা তখন নামছে উজান থেকে ভাটার দিকে, তার শতমুখ নিঃস্রবণে তাই কোনও ব্যাঘাত নাই। কিন্তু প্রাকৃতভূমি হতে উজিয়ে যাবার সময় শক্তি বাধা পায়, তার বিকার ঘটে। চেতনা বিজ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলে পর আর এটি হয় না।

*

এই বিজ্ঞানের স্বরূপ কি? উপনিষদে কোথাও-কোথাও বিজ্ঞান আর বুদ্ধি সমপর্যায়ের শব্দ। তাই থেকে কেউ-কেউ বিজ্ঞান আর শুদ্ধবুদ্ধিকে এক ধরে নিয়েছেন। তাঁদের মতে প্রাকৃতবুদ্ধি গুণময়ী বলে অবিশুদ্ধ; আর শুদ্ধবুদ্ধি গুণাতীত বলে বিশুদ্ধ পৌরুষেয়প্রত্যয়ের ধারক। এই পুরুষের পরিচয় গুণাতীতত্বে, গুণাধীশত্বে নয়।...কিন্তু বস্তুত পুরুষ যেমন গুণাতীত, তেমনি গুণাধীশও। উভয়ত্র বিজ্ঞান তাঁর স্বরূপশক্তি। তাঁকে কেবল গুণাতীত বলে ধারণা করবার আগ্রহ হতে পারে মনের। তাই তার কাছে বিজ্ঞান শুধু সগুণ থেকে নির্গুণের দিকে উজিয়ে যাবার শক্তি। বিজ্ঞানের এ-পরিচয় যে সম্পূর্ণ নয়, তা বলাই বাহুল্য।

আবার উপনিষদের প্রমাণে কেউ-কেউ বিজ্ঞান আর চিদ্‌ঘনত্ব এক বলে মনে করেন। তাঁদের মতে বিজ্ঞান একপ্রত্যয়সার—আদিত্যমণ্ডলের মত যার মধ্যে রশ্মিজাল সংহত হয়েছে। এও বিজ্ঞানের প্রত্যয় নিশ্চয়; কিন্তু শুধু সংহনন নয়, বিকিরণও তার ধর্ম। যেমন প্রাকৃতভূমিতে চিত্তবৃত্তি, তেমনি বিজ্ঞানের চিদ্‌বৃত্তি। কিন্তু চিত্তবৃত্তি আর চিদ্‌বৃত্তির মৌলিক তফাত হচ্ছে, আগেরটি নির্ভর করে পরোক্ষ সন্নিকর্ষের (indirect contract) উপর, আর পরেরটি তাদাত্ম্যবোধের (knowledge by identy) উপর। কিছু-না-কিছু তাদাত্ম্যবোধ সব জ্ঞানের মধ্যেই আছে, কেননা বিষয়কে খানিকটা 'আত্মসাৎ' না করে বিষয়ী তাকে জানতে পারে না। প্রাকৃতচিত্তে আত্মসাৎ করবার প্রয়াস আছে, পূর্ণতা নাই : একটা-কিছুকে খুব নিবিড় করে জানলেও তাকে আমরা বাইরে রেখেই জানি, 'হয়ে' জানি না। অথচ এই 'হয়ে জানা'ই হল বিজ্ঞানের ধরন। বিজ্ঞান তার ফলে প্রত্যয়কে উৎসারিত করে, আর চিত্ত তাকে আহরণ করে। চিদ্‌বৃত্তির সঙ্গে চিত্তবৃত্তির এইখানে তফাত। প্রাকৃতচিত্তেও প্রত্যয়ের উৎসারণ আপনাথেকে হয়—আমাদের চিত্ত অহরহ ভাবনা-বেদনা-সঙ্কল্পের কত জাল বুনে চলে। কিন্তু এই প্রত্যয়-গুলি বিক্ষিপ্ত, বিসংবাদী (discrepant) এবং আসলে ইন্দ্রিয়সংবিৎ হতে উৎপন্ন। বিজ্ঞানের প্রত্যয় তার বিপরীত। আত্মবোধ থেকে সেখানে বস্তুবোধ উৎসারিত হয় বলে তা ঋতচ্ছন্দা এবং অবিসংবাদিত। আমাদের প্রাতিভসংবিতে কখনও-কখনও তার আভাস পাই।

প্রাকৃতবুদ্ধি যে বিজ্ঞান নয়, তা বলাই বাহুল্য। অথচ আরেকদিক দিয়ে তা বিজ্ঞানেরই বিভূতি। কথাটা এই। প্রাকৃতভূমিতে আমাদের প্রত্যয়ের ভিত্তি

হল ইন্দ্রিয়সংবিৎ (sensation)। ইন্দ্রিয় বিশেষকেই (particular) দেখে, সামান্যকে (universal) নয়। অথচ বিশেষপ্রত্যয়ের সমাহারেই আমাদের মধ্যে একটা সামান্যপ্রত্যয়ের উদ্ভব হয় : যেমন মনুষ্য দেখতে-দেখতে 'মনুষ্যত্বের' প্রত্যয় জন্মাল, যা একটা আন্তর অনুভব এবং বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়জ অনুভবের প্রতিভূ। এই সামান্যপ্রত্যয়কে আশ্রয় করে প্রবর্তিত হয় 'অনুমান', যা প্রাকৃতবুদ্ধির একটি বিশিষ্ট বৃত্তি। অনুমানে আমাদের জ্ঞানের প্রসার হচ্ছে—যেমন বিজ্ঞানে কিংবা দর্শনে। স্বরূপত সে-জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বলে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা তার মধ্যে নাই। এই অস্পষ্ট সামান্যপ্রত্যয় হল প্রাকৃতচেতনায় বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের ফল। ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যয়ে স্পষ্টতা আছে কিন্তু সামান্যতা নাই; আর বুদ্ধিজ-প্রত্যয়ে সামান্যতা আছে কিন্তু স্পষ্টতা নাই। সামান্যপ্রত্যয় যদি ইন্দ্রিয়ানুভবের মত স্পষ্ট হয়, তাহলে এই ন্যূনতার পূরণ হয়। আমরা তাকেই বলি বিজ্ঞান।

অনুমানের একটা অবরোহধারা আছে, আমরা সেখানে সামান্য হতে বিশেষে যাই : যেমন মানুষমাত্রেই মরণধর্মী এই সামান্যপ্রত্যয় হতে অনুমান করি, আমিও মরব। এই অনুমানের নৈশ্চিত্যকে মনে হয় সুদৃঢ়। কিন্তু এক্ষেত্রে যে-সামান্যপ্রত্যয়টি অনুমানের মূল, তা কখনও সম্পূর্ণভাবে আমার ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের গোচর হতে পারে না : সব মানুষকে আমি কোনদিন মরতে দেখিনি, দেখবও না। সুতরাং সামান্যপ্রত্যয়ের নৈশ্চিত্য সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়। কিন্তু আমি আমার মধ্যে ডুবে গিয়ে মরণধর্ম বা 'বিশরণ'কে (disintegration) যদি আমার শরীরের ধর্ম বলে প্রত্যক্ষ অনুভব করতে পারি, তাহলে ওই সংশয় দূর হওয়া সম্ভব। সামান্যপ্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ তাহলে হয় আত্মবোধের বেলায়। বিষয়বোধও আত্মবোধের অনুসারী হলে অর্থাৎ বাইরের বিষয়কে ভিতরে টেনে এনে তন্ময় হতে পারলে তার সম্পর্কে জ্ঞান অপরোক্ষ হয়—এই সূত্র ধরে সব সামান্যপ্রত্যয়কেই আমরা প্রত্যক্ষযোগ করে তুলতে পারি। বলা বাহুল্য, এধরনের প্রত্যক্ষ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিপরীত। চেতনা এখানে নি-বৃত্ত (inwardised), আর ওখানে প্র-বৃত্ত (externalised) হয়ে জানার মূল কথাও তা-ই : বিষয়কে আমার মধ্যে টেনে এনে তাতে তন্ময় হয়ে তাকে 'আমার' বা 'আমি' বলে জানা। যেমন আমরা জানতে পারি ভালবাসাতে—হৃদয় দিয়ে। এইধরনের জানাকে এদেশের দার্শনিকেরা বলেছেন 'যোগজসন্নিকর্ষ' (contact through yoga)

হতে জাত প্রত্যক্ষ।' এই প্রত্যক্ষই বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা সামান্যপ্রত্যয়ের অপরোক্ষ অনুভব।

*

তাহলে জ্ঞানের আরোহধারার এই পরিচয়। প্রথমত বাহ্যবিষয়ের ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ, তারপর আন্তরবিষয়ের মানস প্রত্যক্ষ। মানস প্রত্যক্ষের সঙ্গে সামান্য-জ্ঞান জড়িয়ে থাকতে পারে, তাহতে পাই বুদ্ধিজ প্রত্যক্ষের প্রাথমিক রূপ। এইপর্যন্ত হল প্রাকৃত বোধের সীমা। আন্তরপ্রত্যক্ষে চৈতন্য যদি নিবর্তিত হয়ে নিজেকে নিজের বিষয় করে, তাহলে পাই আত্মবোধ (self-consciousness)। এ-বোধ অপ্রাকৃত এবং বিজ্ঞানের ভিত্তি। আত্মবোধ যত সুস্পষ্ট হতে থাকে, ততই তার মধ্যে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হয়ে বিষয়কে জানবার সামর্থ্য দেখা দেয়। এই সামর্থ্যকে বলতে পারি বোধি (intuition)। বোধিজ প্রত্যক্ষ অপ্রাকৃত উপায়ে আমাদের জ্ঞানের প্রসার ঘটায়।

কিন্তু বোধি বিজ্ঞান নয়—বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ বিভূতি। মানুষের মধ্যে তা দেখা দেয় প্রাতিভসংবিতের আকারে, ইতরপ্রাণীর মধ্যে সহজাতসংস্কার (instinct) হয়ে। উভয় ক্ষেত্রে জ্ঞান ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু তার অধিকার সঙ্কীর্ণ, সবক্ষেত্রে তা প্রমাদশূন্যও নয়। মানুষের মধ্যে মানস-সংস্কারের ভেজাল থাকাতে অনেকসময় বোধির বিকারও ঘটে। এইসমস্ত কারণে তাকে বিজ্ঞান বলে মনে করা ঠিক হবে না, যদিও বিজ্ঞানের স্বভাব তার মধ্যে খানিকটা ফুটে ওঠে—স্বতঃস্ফূর্ততায়। বুদ্ধির মত সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হিসাব করে পা গুনে-গুনে চলে না, তীরের মত সোজাসুজি লক্ষ্যকে বিন্ধ করতে পারে।

অনুশীলনের দ্বারা এই বোধশক্তির সামর্থ্য বাড়ানো যায়। অনুশীলনের একটি ধারা হল চেতনাকে সবসময় অন্তরাবৃত্ত এবং প্রশান্তবাহী করে রাখা। প্রশান্তবাহিতায় আত্মবোধ স্ফুরিত হবে। অবশ্য এ-আত্মবোধ কাঁচা আমির বোধ নয়, পাকা আমির বোধ—যে-আমি আকাশের মত প্রশান্ত প্রদীপ্ত এবং প্রসন্ন অস্তিত্বের বোধ মাত্র। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, এটি একটি সামান্যপ্রত্যয়, এমন-কি একে সামান্যতম প্রত্যয়ও বলা চলে। এই প্রত্যয়ে বিশেষকে আহরণ করবার কোনও আগ্রহ থাকে না। অথচ আয়নায় ছবি পড়ার মত বিশেষের

প্রতিবিম্ব তার মধ্যে পড়তে থাকে। প্রতিবিম্বের অর্থ আবিষ্কার করা বুদ্ধির কাজ। সাধারণত বুদ্ধি এটি করে মনের নানা সংস্কার এবং আগ্রহের দ্বারা পরিচালিত হয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাসনার কোনও প্ররোচনা না থাকায় বুদ্ধির কাছে যে-অর্থ প্রতিভাত হয়, তা কল্পিত নয়, যথার্থ। এই যথার্থতা প্রতিবিম্বের গভীরে বিশ্বের সত্যকে চেতনায় স্পষ্ট করে তোলে। অভ্যাসের ফলে এই বিম্বগ্রাহিতা এত স্বচ্ছ হতে পারে যে অবশেষে চেতনায় কোনরকম বিকল্পের (mental construction) ছায়াপাত না হয়ে যা ভূত বা ভব্য কেবল তা-ই স্ফুরিত হয়।

কিন্তু এমনতর শুদ্ধ এবং সমর্থ বোধিও বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের পরিণাম মাত্র। বৈদিক ঋষিদের একটি উপমা ব্যবহার করে বলা যেতে পারে, বোধির এই ভূমি যেন সূর্যালোকে উদ্ভাসিত অন্তরিক্ষলোক, আর বিজ্ঞান স্বয়ং সেই সূর্যমণ্ডল। অন্তরিক্ষ সূর্যালোকের ধারক, কিন্তু তার উৎস নয়। এই বোধিও তেমনি বিজ্ঞানের দীপ্ত সাধন (instrument), কিন্তু বিজ্ঞান নয়। এখানেও বোধির ক্রিয়া আহরণমাত্র, উৎসারণ নয়। উৎসারণের স্বতঃস্ফূর্ততা বিজ্ঞানের স্বধর্ম।

*

বুদ্ধির সঙ্গে প্রতিতুলনা করে বিজ্ঞানের স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু খানিকটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে ব্যাপারটা বোঝা একটু কঠিন। প্রথমেই বলা যায়, বুদ্ধির ধারা হল আরোহের; সে বিশেষ থেকে সামান্যে রূপ থেকে ভাবে উঠে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিজ্ঞানের ধারা হল অবরোহের : সামান্যের নিশ্চিতপ্রত্যয়ের বিভঙ্গরূপে সে বিশেষকে দেখে, রূপের মধ্যে দেখে ভাবের প্রতিরূপ। বুদ্ধির কাছে তত্ত্ব অনুমেয়, অনুমানকে তার খাড়া রাখতে হয় নানা সংবাদী (coherent) প্রত্যক্ষের ঠেকনা দিয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে তত্ত্ব করামলকবৎ প্রত্যক্ষ, যা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মতই এমন-কি তার চাইতেও সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত। বুদ্ধি তত্ত্ব হাতড়ে বেড়ায়, ইন্দ্রিয়সংবিৎ তুলনা প্রতিতুলনা অনুমান উপমান স্মৃতি কল্পনা ইত্যাদি তার সাধন। কিন্তু বিজ্ঞানের মধ্যে এসবের বিড়ম্বনা নাই—সে কিছুর জন্য হাতড়ায় না, যা আছে তাকেই উৎসারিত করে। প্রাকৃতভূমির ইন্দ্রিয়সংবিৎ মন ও বুদ্ধির

উপর তার আলো এসে প'ড়ে তাদের রূপান্তরিত করে সত্যের বিশিষ্ট ভঙ্গির অবধারণের সার্থক সাধনরূপে। তাইতে বিশেষ হয় একান্তভাবে সামান্যের ব্যঞ্জনাবহ; সামান্যই সেখানে তত্ত্ব আর বিশেষ তার প্রতীক মাত্র। স্মৃতি অনুভব আর কল্পনার সহায়ে বুদ্ধি সত্যকে দেখে ঘটনার আকারে কালের প্রবাহে ভেসে যেতে : তার সবগুলি পর্ব তার কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে কালের শাশ্বত প্রবাহ একটি ক্ষণে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের যৌগপদ্যে সংহত। বুদ্ধি অখণ্ডের ধারণা করতে চায় খণ্ডকে জুড়ে-জুড়ে; আর বিজ্ঞান অখণ্ডকেই বিচ্ছুরিত দেখে খণ্ডের লীলায়। বুদ্ধি দেখে বস্তুর রূপ, রূপের বৈচিত্র্য; আর তার দ্বারা বারবার বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞান দেখে বস্তুর স্বরূপ, বহুর মূলে দেখে এককে, চক্রের অরসমূহকে (spokes) সমর্পিত করে নাভিতে। বুদ্ধি দেখে সীমিতকে, তাই ভেদের সংস্কার তার মজ্জাগত; আর বিজ্ঞান অসীমের অনুপ্রবেশে ভেদকে রূপান্তরিত করে অভেদের সাবলীল বিভঙ্গে, অবিরোধ বৈচিত্র্যে।

বিজ্ঞান যাঁর বিগ্রহ, সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ আধারে মনোময় পুরুষের অন্তরতর এবং প্রশাস্তা। তাঁর আবিষ্করণেই যোগসিদ্ধির সূচনা। কিন্তু আগেই বলেছি, বিজ্ঞান উত্তরায়ণের শেষ ধাপ নয়, অপরার্ধ এবং পরার্ধের মাঝে সে সেতুস্বরূপ। বিজ্ঞান সৎ-চিৎ-আনন্দের স্বরূপ-শক্তি। স্বরূপে সে উদ্ভাস, আর শক্তিতে সে প্রচোদনা। বেদে তাই তার একটি সংজ্ঞা হল সূর্য, আরেকটি সংজ্ঞা সবিতা—যিনি আধারে-আধারে ধীকে প্রচোদিত করছেন সৌর জ্যোতির দিকে। একে উপনিষদে বলা হয়েছে অতিসৃষ্টি, যা বিসৃষ্টির সহচরিত। বিসৃষ্টি বিচ্ছুরণ, আর অতিসৃষ্টি সংহরণ। শক্তির উজান-ভাটার দুটিই হল বিজ্ঞানের আনন্দলীলা। ব্রহ্মের প্রজ্ঞা আনন্দ এবং শক্তি বিজ্ঞানে সঞ্চিত এবং বিধৃত থেকে সৌর দীপ্তিতে এবং তেজে ঝরে পড়ছে আমাদের মধ্যে।

বিজ্ঞানের তিনটি শক্তি—গ্রহণ সংহনন এবং বিচ্ছুরণ; অথবা উপনিষদের ভাষায় ব্যূহন সমূহন দর্শন (ঈশ)। গ্রহণশক্তির দ্বারা বিজ্ঞান পরার্ধের সত্তা চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তিকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। সংহননশক্তিতে এই অনুভব বিজ্ঞানের মধ্যে দেখা দেয় আদিত্যপ্রভাস্বর চিদ্‌ঘন বিম্বরূপে, যার মধ্যে নিহিত থাকে বিশ্বরূপের চিদ্‌বীজ। পরার্থের শক্তিপাতকে উন্মুখ বিবশতার দ্বারা বারবার গ্রহণ করার ফলে এটি হয়, ভাবের প্লাবনে চেতনায়

পলি পড়তে-পড়তে ভাব যেন জমাট বেঁধে যায়। তারপর বিজ্ঞানের এই চিদ্‌ঘন প্রত্যয়ের মধ্যে শুরু হয় বিচ্ছুরণশক্তির খেলা, যার নাম দিতে পারি চিদ্‌বিলাস। এই বিলসনে পরমপুরুষের সত্তা চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তির ঘনভাবের যে-বিগ্রহবত্তা, উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে তাঁর 'কল্যাণতম রূপ'। বিজ্ঞানের তিনটি ক্রিয়াতে আকাশের পরিব্যাপ্তি যেন সৌরবিম্বে ঘনীভূত হয়ে তারও গভীরে রূপায়িত হল সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ হিরণ্ময় পুরুষে। মনোময় পুরুষ যখন বিজ্ঞানভূমিতে আরূঢ় হয়ে এই পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তাঁর সাযুজ্যে তাঁর চিত্তবৃত্তির রূপান্তর ঘটে চিদ্‌বৃত্তিতে। যোগের এই হল পরমফল।

২৩

বিজ্ঞানের সাধনা

বিজ্ঞানের স্বরূপের আলোচনা হতে মনে হতে পারে, প্রজ্ঞাই বিজ্ঞানের বিশিষ্ট লক্ষণ। অবশ্য জ্ঞানযোগের সাধনায় আমরা প্রজ্ঞার উপরে যে জোর দেব, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাবলে প্রজ্ঞাই বিজ্ঞানের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, তার মধ্যে তুল্যবল আরও ধর্ম যে আছে একথা মনে রাখা ভাল। এই সতর্কতাটুকুর পর, কি করে বিজ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় আমরা এখন তা-ই দেখব।

মনুষ্যত্বের পর্যায়ে না উঠলে জীবের মধ্যে সচেতন স্বোত্তরণের প্রেরণা দেখা দেয় না, সুতরাং তার সাধনাও শুরু হয় না। মনোময় পুরুষই হন প্রবর্ত সাধক। প্রাণ আর বুদ্ধির মাঝে মন হল একটা তটস্থ (intermediate) শক্তি; প্রাণের আবেগ এবং বুদ্ধির দীপ্তি দুইই তার মধ্যে সক্রিয়। তাছাড়া তার উপর আছে দেহের মূঢ় দাবি। দেহ আর প্রাণের মূঢ়তা এবং আবিলতা তার মধ্যে খানিকটা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে বুদ্ধির প্রসাদে। বুদ্ধি তাকে বস্তুর নাগপাশ হতে আচ্ছিন্ন করে মুক্তি দেয় ভাবের লোকে। তখন ভাবকে আশ্রয় করে সে পায় বস্তুকে প্রশাসন করবার অধিকার। মানুষ হয় বুদ্ধিনির্ভর। দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত সংবেদন ও ক্রিয়াকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করতে পারলে তবে সে তাদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

বুদ্ধি বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের উপচরমাত্র—একথা আগেই বলেছি। সুতরাং বুদ্ধির সিদ্ধি সাধারণত সম্ভব হয় অপরা-প্রকৃতির ক্ষেত্রে। বুদ্ধির সহায়ে মানুষ মনের উৎকর্ষসাধন করে—হয় মনস্বী বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ধার্মিক বা কবি। কিন্তু এতে তার অধ্যাত্মসিদ্ধির পরিচয় নাই। তার জন্য তার চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হয় প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্তির দিকে : উপনিষদের ভাষায় গ্রাহক বুদ্ধিকে রূপান্তরিত করতে হয় 'সূক্ষ্ম অগ্র্যা বুদ্ধিতে' (কঠ)। বুদ্ধির মধ্যে সামান্যপ্রত্যয়ের আভাস আছে, তা-ই তখন হয় বিজ্ঞানসিদ্ধির সাধন।

সামান্যপ্রত্যয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হল আনন্ত্যের বোধ। ইন্দ্রিয় দিয়ে বস্তুকে দেখি সান্তরূপে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বস্তুর পিছনে যে-ভাবকে আবিষ্কার করি, তার মধ্যে স্বভাবতই বিশিষ্ট দেশ-কালের অতীত একটা সত্তার ব্যঞ্জনা থাকে।

একটি মানুষ আমার কাছে বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বে যে-মানসপ্রত্যক্ষের গোচর, তার মধ্যে আছে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের ঠাঁই। এই মনুষ্যত্বের মানসপ্রত্যক্ষকে বলতে পারি আনন্ত্যের 'বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়' প্রত্যক্ষ। এখানে মনের মুক্তি ঘটেছে বুদ্ধির মধ্যে। আমরা এখন সৃষ্টির ধারাকে উলটে দিতে পারি : বস্তুকে মুখ্য এবং ভাবকে তার ব্যঞ্জনা বলে না দেখে ভাবকেই মুখ্য এবং বস্তুকে তার প্রতিরূপ বলে দেখতে পারি। যেমন বিচিত্র মানুষকে দেখতে পারি এক শাশ্বত অনন্ত মনুষ্যত্বেরই বিভঙ্গ। দৃষ্টির এই পরিবর্তন বিজ্ঞানসিদ্ধির প্রথম সোপান। এতে ক্রমে বহুর মূলে আমরা এককে দেখতে অভ্যস্ত হই। উপনিষদ বলছেন, একত্বের অনুদর্শনে শোক আর মোহ দূর হয়ে যায়। কথাটা অত্যন্ত গভীরভাবে সত্য। বহুর দর্শনে চিত্তবৃত্তির যে-বিক্ষেপ, তা-ই বিক্ষোভেরও কারণ। শোক আর মোহ ওই বিক্ষোভের প্রকারভেদ। বুদ্ধি বিক্ষেপ আর বিক্ষোভকে অহরহ দূর করবার চেষ্টা করছে বহুর মূলে একটা ঐক্যের সূত্রকে আবিষ্কার করে। বাইরের ঐক্যকে আবিষ্কার করা প্রাকৃতবুদ্ধির কাজ, আর অন্তরের বৃত্তির মাঝে ঐক্য স্থাপন করা শুদ্ধবুদ্ধি তথা বিজ্ঞানের কাজ। যোগে অর্থাৎ চেতনার অন্তরাবৃত্তিতে সাক্ষিত্বে এবং পরিব্যাপ্তিতে আন্তর ঐক্যের অবধারণ সহজ হয়। এই অবধারণের চরম পরিণাম অন্তরে এবং বাইরে এক অখণ্ড সত্তার অনুভব, যা সর্বত্র অনুস্যূত হয়েও সব-কিছুকে ছাপিয়ে আছে। আমি তখন আকাশবৎ : সবার মধ্যে আবিষ্ট এবং উল্লসিত হয়েও সবার অতীত। আমি জীব নই, শিব। আমার অহন্তা আধারে-আধারে বিলসিত হয়ে পূর্ণাহন্তা, আবার নিরাধার সর্বাতীত হয়ে পরাহন্তা। এই আত্মচৈতন্যের মহিমা ও স্বরূপের উপলব্ধিই বিজ্ঞান।

*

দেহ-প্রাণ-মনের ঊর্ধ্বে বিজ্ঞান। ঊর্ধ্বতত্ত্ব বলেই বিজ্ঞান তাদের নিয়ন্তা। বিজ্ঞানবাসিত হয়ে আধার যেন হয়ে যায় একটি কমলের ঘর (ছান্দোগ্য)। হৃদয়ে প্রাণের কমল, মূর্ধায় মনের কমল। কিন্তু কমল ফোটে যে-সূর্যের আলোকে, তার অধিষ্ঠান মূর্ধারও উপরে। সে সূর্য বিজ্ঞানের সূর্য। আধারের অতীত হয়ে সে আধারের প্রশাস্তা। তাই বিজ্ঞানের প্রত্যয় হল : আত্মার মধ্যেই দেহ—

আনন্ত্যের এই নিত্যজাগ্রত বোধ এবং আবেশ হল চেতনার অতিমানস রূপান্তরের ভিত্তি। মন আর অতিমানসের মাঝে মানসোত্তর কতকগুলি স্তর আছে, অন্যত্র যার আলোচনা করেছি। আলোর ছোঁয়ায় ফুল যেমন পাপড়ি মেলে, তেমনি বিজ্ঞানের আবেশে এই স্তরগুলিকে আপনাহতে উন্মীলিত হতে দিতে হবে। সেই উন্মীলনের সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দেবে বিজ্ঞানের নানা বিভূতি— আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানবৃত্তির অভূতপূর্ব রূপান্তর। ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও হৃদয়ের সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে তখন আসবে বিষয়ের মর্মসত্যে অনুবিদ্ধ হবার একটা শক্তি, যাতে আমাদের ভাবনা বেদনা ও সঙ্কল্পের পরিসর অসম্ভব বেড়ে যাবে। অথচ এটি হবে আয়াসের ফলে নয়, আবেশের ফলে। চিত্তের বৃত্তিনিরোধের ফলে যে-যোগ, তাতেও বিভূতির স্ফুরণ হয়; কিন্তু তার মধ্যে সংযমের (exclusive concentration) আয়াস আছে। তাতে প্রযত্নসহকারে চেতনাকে গুটিয়ে এনে ঘনীভূত করতে হয়, তবে তার মধ্যে বিভূতির বীর্য জাগে। কিন্তু এক্ষেত্রে চেতনা ঘনীভূত হয় প্রযত্নশৈথিল্যের (relaxation) দ্বারা। এ যেন আকাশানন্ত্যের মুহুর্মুহু প্লাবনের পলি পড়ে চেতনা বিজ্ঞানানন্ত্যে ঘনীভূত হয় এবং সেই উর্বরভূমিতে বিভূতি অনায়াসে অঙ্কুরিত হতে থাকে।

*

আগেও বলেছি, চৈতন্য শুধু প্রকাশক নয়, প্রবর্তকও। চৈতন্য এবং শক্তি অবিনাভূত। সঙ্কল্প হল চৈতন্যের সহজ শক্তি। কিন্তু আমাদের প্রাকৃত-চেতনায় জ্ঞান আর সঙ্কল্পের নিত্য বিরোধ। আমরা যা জানি অনেকসময় তা করতে পারি না, আবার যা করি অনেকসময় তা অজানতে করি : জ্ঞান আর শক্তি দুয়েরই দৈন্য আছে বলে কিছুতেই যেন দুয়ের বনিবনাও হতে চায় না। শক্তি পঙ্গু বলে সঙ্কল্পের অপঘাতে আমরা বিরক্ত সাক্ষীর আসন নিয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখে যাই শুধু। তাইতে অধ্যাত্মসাধকদের মধ্যে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে জ্ঞান শুধু প্রকাশই করে, প্রবর্তনা দেওয়া তার ধর্ম নয়। অবশ্য তটস্থতা জ্ঞানের একটা দিক, কিন্তু তা-ই তার সবটুকু নয়। আত্ম-সংহরণে জ্ঞানের যে নিশ্চল প্রতিষ্ঠা, তা-ই আবার আত্মবিচ্ছুরণের সাধন। বিজ্ঞানের সূর্য শুধু প্রকাশক নয়, সে 'সবিতা'। বাইরে সে প্রসবিতা, অন্তরে প্রচোদয়িতা। দুটিতেই তার সঙ্কল্পশক্তির পরিচয়। আর সে-শক্তি স্বরূপসত্যের সঙ্গে যুক্ত

বলে অবন্ধ্য : অন্তরে যা সিদ্ধ, বাইরে তাকেই সে রূপ দেয়। যেমন কবির কবিতা, গাছের ফুল : দুইই ভাবের স্ফুরণ, আলোর স্ফুরণ—অন্তর্গূঢ় চিৎশক্তির প্রবেগে। বিজ্ঞানসিদ্ধের মধ্যেও সিদ্ধসংকল্পের স্ফুরণ এইভাবে হয়। তাঁর মধ্যে বাসনা রূপান্তরিত হয়েছে সংকল্পে। বাসনা চায়, কিন্তু সবসময় পায় না; আর সংকল্প যা আছে সুনিশ্চিতে তাকেই ফুটিয়ে তোলে। বিশ্বের সঙ্গে যিনি যোগযুক্ত, তাঁর সংকল্পে এবং কর্মে বিশ্বেরই ঋতচ্ছন্দের প্রকাশ; তাঁর চলন-বলনের সামান্যতম খুঁটিনাটিতেও বিচ্ছুরিত হয় সেই পরমসত্যের সৌষম্য, তাই তার মধ্যে অপঘাত বা তালভঙ্গের দুর্দৈব কোথাও থাকে না। এইজন্য প্রাকৃতজীবনের পাপ-পুণ্যের মাপকাঠি দিয়ে তাঁর ব্যবহারকে কখনও মাপা যায় না।

যেখানে সৌষম্য, সেইখানে সাযুজ্য, সেইখানেই আনন্দ। জ্ঞান আর সংকল্প যেমন অবিনাভূত, বিজ্ঞান আর আনন্দও তেমনি। অশক্তি হতে বাসনার অপঘাত এবং তাহতে প্রতিকূলতার বেদনা—এই হল দুঃখের নিদান। কিন্তু সত্যে বিধৃত হয়ে শক্তি যেখানে অপরাজিতা এবং মুক্তচ্ছন্দা, সেখানে তো কোনও প্রতিকূলতাই থাকতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে যা প্রতিকূল, তা চরম সার্থকতার তির্যক বিলাস মাত্র। 'জটিলা-কুটিলা না হলে লীলার পোষ্টাই হয় না।' অজ্ঞানী তাতে বিমূঢ় এবং বিক্ষুব্ধ হয়, কেননা তার কাছে 'কাল নিরবধি নয়, পৃথ্বীও বিপুলা নয়।' কিন্তু দেশ আর কালের আনন্ত্যে যাঁর প্রমুক্ত চেতনা আকাশবৎ অচলপ্রতিষ্ঠ, তিনি ধৈর্য হারান না কিছুতেই। তিনি জানেন, নদীর চলনে যত বাঁকই থাকুক না কেন, সমুদ্রে এসে সে মিলবেই। সেই সমুদ্রের আনন্দ-আবেশ যেমন তার উৎসমুখে, তেমনি তার শেষ সঙ্গমে।

এমনি করে বিজ্ঞানের আবেশে প্রজ্ঞা আনন্দ এবং সংকল্পের মধ্যে ঘটে শক্তির অবাধ স্ফুরণ। অপরা-প্রকৃতির কুণ্ঠা তখন দূর হয়, জীব হয় পুরুষোত্তমের পরা-প্রকৃতি, তাঁর পরমা-প্রকৃতির বৈকুণ্ঠলোকের নিত্য অধিবাসী। পুরুষ আর প্রকৃতিতে বিরোধ অপরাপ্রকৃতির ভূমিতেই সম্ভব। কিন্তু নিত্য জীবের বৈকুণ্ঠ-হৃদয়ে পুরুষ-প্রকৃতি যুগনদ্ধ, তার জীবন তাঁদের নিত্য সামরস্যের আনন্দহিল্লোল।

২৪

বিজ্ঞান ও আনন্দ

দেখলাম, অধ্যাত্মসিদ্ধি সম্যক্ (integral) হয় একমাত্র বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে। মনকে সাধন (instrument) করেও অনেক উঁচুতে ওঠা যায় বটে, কিন্তু মানসী সিদ্ধিতে কখনও চেতনার পূর্ণ রূপান্তর হতে পারে না। ভেদ-ভাবনা মনের ধর্ম, সে একদেশদর্শী। একটা-কিছুকে একান্ত করে তুলে অনুভবের তুঙ্গতম শিখরে সে উঠতে পারে, কিন্তু তাতে অনুভব নিটোল এবং সম্পূর্ণ হয় না বলে তার সামর্থ্যও কুণ্ঠিত থাকে। তাছাড়া, অধ্যাত্মসাধনায় মনকে চলতে হয় উজান ঠেলে, কেননা সে হল অপরার্ধের তত্ত্ব। তাইতে পরার্ধের জ্যোতি শক্তি এবং আনন্দকে এখানে নামিয়ে আনা তার অধিকারের বাইরে। এইজন্য মানসী সিদ্ধিতে তুঙ্গতা যতই থাকুক, পরিব্যাপ্তি এবং স্ফুরত্তার (dynamism) দিক দিয়ে তা বিজ্ঞানসিদ্ধির চাইতে স্বভাবতই খাটো।

কিন্তু বিজ্ঞানেই পূর্ণযোগের শেষ নয়, বরং বলা যেতে পারে এইথেকে তার সত্যকার শুরু। বিজ্ঞান সৎ-চিৎ-আনন্দের স্বরূপশক্তি, আর সচ্চিদানন্দে প্রতিষ্ঠাই যোগের পরম লক্ষ্য। উপনিষদে তাই আরোহক্রমে বিজ্ঞানময় পুরুষের পরে আছে আনন্দময় পুরুষের কথা। এইখানেই স্বোত্তরণের শেষ সীমা—অন্তত আমাদের দিক থেকে। এবার এই শেষের খবর নেওয়ার পালা এসেছে।

আনন্দের স্বরূপ কি? বিজ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে গিয়ে যেমন তুলনার আশ্রয় নিয়েছিলাম, এখানেও আমাদের তা-ই করতে হবে। প্রথমেই বুঝতে হবে, আনন্দ সুখ নয়। সুখ বস্তুনির্ভর—সে-বস্তু বাইরের বা ভিতরের যা-ই হক না কেন। কিন্তু আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত, চেতনার তা স্বধর্ম। বাইরের ভিতরের সমস্ত আলম্বন একে-একে সরিয়ে দিলেও যদি চেতনা অব্যাহত থাকে, তাহলে জানতে হবে আনন্দও তার সঙ্গে অবিনাভূত হয়ে আছে। সুতরাং আনন্দের উপলব্ধি হয় চেতনার নিবৃত্তিমুখে বা যোগে। চরমে, আনন্দ তাই স্বরূপ-স্থিতির আনন্দ (bliss of self-existence)। এই আনন্দ স্ব-তন্ত্র অতি-মুক্ত এবং অভয়।

যদিও নিবৃত্তিমুখে আমরা আনন্দের স্বরূপের একটা আভাস পেতে পারি, তবুও বিজ্ঞানের মত তারও একটা স্ফুরত্তার প্রবেগ আছে যাতে সে প্রবৃত্তির সকল ভূমিতে অবাধে সঞ্চারিত হতে পারে। আনন্দকে তখন বলতে পারি রসচেতনা। এই চেতনা অপরার্ধের তিনটি ভূমিতে নিজেকে স্ফুরিত করছে জীবনের উল্লাসরূপে। এটি আনন্দের প্রাকৃত অবরোহের ধারা—যোগদৃষ্টিতে ব্রহ্মের বিসৃষ্টি বা প্রপঞ্চোল্লাস। এই ধারাকে যোগে উজিয়ে নেওয়া যায় তার উৎসে। তারপর তাকে আবার আকাশগঙ্গার দিব্যধারায় নামিয়ে আনা যায় পৃথিবীর 'পরে। সর্বপ্লাবন আনন্দের মুক্তধারাকে উজান-ভাটায় বওয়াতে পারাই যোগের সম্যক্‌সিদ্ধি।

স্বরূপস্থিতির যে-আনন্দ, তা একটা যোগশক্তি। অপরার্ধের বিভিন্ন ভূমিতেও তার প্রকাশ হতে পারে, এদেশের সাধনশাস্ত্রে তার বর্ণনা আছে। বলা হয়েছে, পরম উপলব্ধিতে সিদ্ধচেতনা 'জড়বালোন্মত্তপিশাচবৎ' হয়ে যায়। আগেই বলে রাখছি, সম্যক্-সিদ্ধি (integral perfection) বলতে আমরা যা বুঝি, এ-অবস্থাগুলির কোনটাই কিন্তু তা নয়। সাধারণত এদের প্রত্যেকটির মধ্যে প্রকৃতির অপরার্ধের একটা সঙ্কোচ আছে। অবশ্য এ-অবস্থাগুলি বিজ্ঞানশক্তির দ্বারা জারিত হলে তাদের চেহারা দাঁড়ায় আরেকরকম। কিন্তু সে পরের কথা।

উজান-ভাটার রহস্য না জেনেও অন্নময় পুরুষের মধ্যে সচ্চিদানন্দের আবেশ হতে পারে। জড়প্রকৃতির গভীরে বা সুষুপ্তির মধ্যে যে-আনন্দ সম্মূর্ছিত হয়ে আছে, এ হল তার আবেশ। তার সঙ্কর্ষণে (inward pull) অন্নময় পুরুষের চেতনা নিথর হয়ে যায়। ফলে সাধক হয় বল্মীকস্তূপের মত জড় হয়ে যান, অথবা তাঁর মধ্যে শক্তির স্পন্দন দেখা দিলেও তা তাঁকে নিয়ে ঝড়ের আগে ঝরাপাতার মত বা আঁটছাড়া শিশুর মত যেমন-খুশি খেলিয়ে বেড়ায়। শাস্ত্রে একেই বলা হয়েছে সিদ্ধের জড়বৎ বা বালবৎ হওয়া।

প্রাণময় পুরুষের মধ্যে যদি তেমনি করে সচ্চিদানন্দের আবেশ হয়, তাহলে চেতনার গভীরে এক নিস্তল স্তব্ধতা নেমে আসা সত্ত্বেও সাধকের প্রকৃতিতে দেখা দেয় বিশ্বপ্রাণের উন্মত্ত তাণ্ডব, তাঁর আচার-ব্যবহার হয় নিয়মহীন নিশ্ছন্দ বা বীভৎস। এরই নাম সিদ্ধের উন্মত্তবৎ বা পিশাচবৎ অবস্থা।

তেমনি মনোময় পুরুষের মধ্যে সচ্চিদানন্দের আবেশে বিশ্বমনের অনিবার

জ্যোতির ছটায় সাধকের মনঃপ্রকৃতি ধাঁধিয়ে যেতে পারে। তাঁর মন তখন হয় অমনীভাবে নিঃসুপ্ত, অথবা সাক্ষিভাবনায় তটস্থ। আবার মনের মধ্যে যদি রসাস্বাদের সংস্কার প্রবল থাকে, তাহলে সাধক ইষ্টের সামীপ্য বা সাযুজ্যের নিবিড়তায় বিভোর হয়ে যান। তখন তাঁর 'বহে বিশ্বে প্রেমনদী সুধাধারা অবিরাম'। মন জড় ও প্রাণের ঊর্ধ্বতন তত্ত্ব, তাই অবরভূমির সিদ্ধিকে নিজের ভূমিতে স্বচ্ছন্দে লীলায়িত করবার সামর্থ্য তার আছে। সুতরাং সিদ্ধ মনোময়পুরুষ তাঁর আত্মতৃপ্ত নিঃসঙ্গতা বা রসাস্বাদবিভোরতার উপর পূর্বোক্ত জড়বালোন্মত্তপিশাচবৎ অবস্থার রং চড়িয়ে দিতেও পারেন।

কিন্তু বিজ্ঞানের মধ্যে যে অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র আছে, রূপান্তরের যে-সামর্থ্য আছে, অপরার্ধের কোনও ভূমিতেই তার অবাধ স্ফুরণ সম্ভব নয়। তিনটি ভূমিতেই দেখা যায়, পুরুষ অন্তরে অপরা-কৃতির বন্ধন হতে মুক্ত হয়েও বাইরে তার প্রশাসনের কাছে নিজেকে ছেড়েই দেন। এইজন্য প্রায়ই দেখা যায়, তথাকথিত সিদ্ধের জীবনে বাইরে-ভিতরে সামঞ্জস্যের অভাব, একটা সৌষম্যের পূর্ণতায় তাঁর জীবন সুডোল নয়। জড়ের মধ্যে যে-স্থিতিধর্মিতা (inertia) আর প্রাণের মধ্যে যে-প্রবৃত্তিপরতা (effusion) আছে, যোগশক্তির দ্বারা তাদের চিন্ময় করে তুললে যে জ্ঞানসিদ্ধি আর ভাবসিদ্ধি পাওয়া যায়, তারই প্রকাশ ঐ জড়বালোন্মত্তপিশাচবৎ অবস্থায়। এখানেও পুরুষ গুণাধীন—গুণাধীশ নন, প্রকৃতি তাঁর স্বীয়া প্রকৃতি নয়। আর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে গুণও এখানে অবিশুদ্ধ। তমোগুণ স্থিতিধর্মী, আর রজোগুণ প্রবৃত্তিধর্মী; প্রকাশধর্মী সত্ত্বগুণের দ্বারা জারিত এবং রূপান্তরিত হলেই তারা শুদ্ধ হতে পারে। স্থিতি এবং প্রবৃত্তি তখন রূপান্তরিত হয় শান্তি ও বীর্যে—দুয়ের মধ্যে থাকে শৈবচেতনার আবেশ। এটি সম্ভব হয় বিজ্ঞানভূমিতে—মনোভূমিতেও নয়। মন বিজ্ঞানের উপচর বলে সত্ত্বগুণের প্রকাশধর্ম তার মধ্যে প্রবল, কিন্তু তবুও সে রজস্তমের বিক্ষেপশূন্য নয়। তাই মনোময় পুরুষের সিদ্ধিতে বিজ্ঞানের আভাস পেলেও তার প্রভাস আমরা পাই না। সাধারণত সাধকদের লক্ষ্য হয়, গুণের রূপান্তরের দিকে দৃষ্টি না রেখে গুণকে পেরিয়ে যাওয়া। তাতে অন্তরে গুণাতীত ভূমির নিথরতা আয়ত্ত হলেও বাইরের গুণলীলার উপর

প্রভুত্ব জন্মায় না। অপরার্ধের সকল ভূমিতেই সিদ্ধির ন্যূনতা এইখানে।

এই ন্যূনতার পূরণ হয় বিজ্ঞানভূমিতে। বিজ্ঞান শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ অপরা-প্রকৃতিতে সত্ত্বের মধ্যেও যে তামসিক আবরণ আর রাজসিক বিক্ষেপের মিশ্রণ থাকে, এখানে তা থাকে না; নিরঙ্কুশ প্রকাশধর্মের দ্বারা দুটি গুণেই শোধিত এবং রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানময় পুরুষের চেতনা তাই প্রমুক্ত প্রশান্ত জ্যোতির্ময় অথচ অকুণ্ঠ সামর্থ্যে ঈশান। এই সামর্থ্য প্রকাশ পায় অপরা-প্রকৃতির রূপান্তরে, যা অবরভূমিতে সম্ভব হয় না। রূপান্তরিতা প্রকৃতি পুরুষের স্বীয়া প্রকৃতি। তপঃশুদ্ধ গৌরীর সঙ্গে তখন হরের মিলন—অর্ধনারীশ্বরের নিত্যসামরস্যের আনন্দে।

বলেছি, অন্তরাবৃত্তিই যোগের মুখ্য লক্ষণ, কিন্তু তার পরিণাম শূন্যতা নাও হতে পারে। বৃত্তির নিরোধকে যদি যোগ বলি, তাহলে অবশ্য পুরুষের কৈবল্য শূন্যতার দিকে ঝুঁকবে। সাধারণত যোগীরা এই পথ ধরেন। পুরুষকে প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত করাই তাঁদের লক্ষ্য। অপরা-প্রকৃতি এবং পরা-প্রকৃতিতে তাঁরা ভেদ করেন না। অপরা-প্রকৃতির মধ্যে রাগ-দ্বেষ-মোহের বিকার আছে, চেতনাকে তাহতে মুক্ত করা অবশ্য সব যোগীর পুরুষার্থ। প্রকৃতির সমস্ত পরিণামকে স্তব্ধ করে দিয়ে এ-মুক্তি যেমন আসতে পারে, তেমনি আসতে পারে পরা বা দিব্যা প্রকৃতির ক্রিয়াকে চেতনায় স্বচ্ছন্দ হতে দিয়ে। এইটি সম্ভব হয়, যদি বৃত্তির প্রশাসনের সঙ্গে আবেশের ভাবনাকেও যুক্ত করে নিই। আবেশ সত্তা চৈতন্য এবং আনন্দের আনন্ত্যের। সমুদ্রের মধ্যে মীনের মত বৃহৎ-এর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছি, তাঁতেই সঞ্চরণ করছি, তাঁর আবেশ একটা নেশার মত আমায় পেয়ে আছে—এই ভাবনাও যোগ। নিরোধ এর সাধন নয়, এর সাধন হল আপ্যায়ন। সূর্যের শুভ্রজ্যোতির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে ফুল যেমন তার বর্ণসুষমাকে ফুটিয়ে তোলে, এও তেমনি। আপ্যায়নেই পরা-প্রকৃতির সামর্থ্য আবিষ্কৃত হয়ে অপরা-প্রকৃতির রূপান্তর সিদ্ধ হতে পারে। তখন কৈবল্যের সঙ্গে যুক্ত হয় বিভূতিও, বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ফোটে সৃষ্টির বীর্য।

আনন্ত্যের মধ্যে আত্মবিলোপ নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠাই হল বিজ্ঞানাশ্রিত পূর্ণযোগের লক্ষ্য। সমৃদ্ধ আত্মভাব বা পুরুষের সমর্থ পৌরুষ ব্যাপ্ত হবে প্রকৃতির সকল ভূমিতে, কোনও-কিছুকেই সে প্রত্যাখ্যান করবে না। আগুন যেমন নিজের বীর্যে ইন্ধনকে আত্মস্বরূপে রূপান্তরিত করে, বিজ্ঞানও তেমনি

মৃন্ময়ী প্রকৃতিকে করে তোলে চিন্ময়ী। অপরার্ধের তিনটি ভূমিতে যে-যোগসিদ্ধির কথা আগে বলেছি, বিজ্ঞান তার বৈকল্যকে শোধন করে দেয় নতুন রূপে। বিজ্ঞানীও বালবৎ; কিন্তু তখন তিনি রাজার ছেলে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে তাঁর সহজানন্দের খেলা। তিনি জড়বৎ: কিন্তু তাঁর জড়ত্ব উদাসীন জীবের নয়, সমর্থ শিবের—যার মধ্যে যুগনদ্ধ প্রকৃতি-পুরুষের সামরস্যের আনন্দ প্রপঞ্চোপশমে স্তব্ধ থেকেই প্রপঞ্চোল্লাসে ঠিকরে পড়েছে। তিনি উন্মত্তবৎ: কিন্তু তাঁর উন্মাদনা মহাশক্তির আবেশে বিবশ হয়ে খেই হারিয়ে ফেলা নয়; এ সেই নটরাজের বিশ্বনৃত্যের উন্মাদনা যার দুর্লক্ষ্য ছন্দে সপ্তভুবনের মর্মে-মর্মে লাগে অনির্বচনীয়ের দোলা। তিনি পিশাচবৎ: তাঁর শক্তির উল্লাস মনঃকল্পিত তুচ্ছ বিধি-নিষেধের বন্ধন মানে না, নিজের ঋতচ্ছন্দা দুর্ধর্ষ প্রবেগে প্রয়োজন হলে নিষ্ঠুর এবং ভয়ালও হতে জানে। সুতরাং জড়বালোন্মত্তপিশাচের অবস্থাতেও তিনি প্রকৃতির প্রশাস্তা, তার ভর্তা এবং ভোক্তা মহেশ্বর।

*

বিজ্ঞানের পর আনন্দ। প্রশ্ন হবে, বিজ্ঞানই শেষ নয় কেন? বিজ্ঞান আর আনন্দে তফাত কোথায়?

দুয়ের মধ্যে তত্ত্বত কোনও ভেদ নাই, তবুও বিভাবের (aspect) ভেদ আছে। আগেও বলেছি, বিজ্ঞান হল সৎ-চিৎ-আনন্দের শক্তি। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, আর বিজ্ঞান শক্তি। স্বরূপ আর শক্তিতে তত্ত্বের ভেদ না থাকলেও বিভাবের ভেদ থাকতে পারে। শক্তির একটা আশ্রয় চাই; সৎ-চিৎ-আনন্দ বিজ্ঞানের সেই আশ্রয়। আশ্রয় আশ্রয়ীকে ছাপিয়ে থাকে বলে তার মধ্যে রয়েছে অবরোহদৃষ্টি, আর আশ্রয়ীর মধ্যে আরোহদৃষ্টি। সৎ-চিৎ-আনন্দ হল অপরার্ধের পরম আশ্রয়। তাইতে অন্নময় হতে বিজ্ঞানময় পর্যন্ত সমস্ত ভূমিতেই চেতনার লক্ষ্য থাকে ঊর্ধ্বতর একটা ভূমি। কিন্তু সৎ-চিৎ-আনন্দের ঊর্ধ্বে আর-কিছু নাই বলে তার মধ্যে আছে কেবল স্বরূপস্থিতি আর অবতরণের প্রবেগ। আনন্দ আর বিজ্ঞানের তফাত এইখানে। বিজ্ঞানে উজান-ভাটা দুয়েরই টান আছে।

আনন্দ চেতনার সব ভূমিতেই আছে, কিন্তু তার স্বরূপের পূর্ণপ্রকাশ

হয় একমাত্র বিজ্ঞানভূমিতে। বিজ্ঞান চিদ্‌ঘন বলে আনন্দঘনও। বিজ্ঞান আনন্দে বিশ্রান্ত এবং বিগলিত হয়ে যায় বটে, কিন্তু তবুও তার স্বরূপশক্তির পরিণাম (change) সেখানে অক্ষুণ্ণ থাকে। সে-পরিণাম হল চেতনায় স্বাতন্ত্র্য এবং আনন্ত্যের উল্লাস। পরম আনন্ত্য বিজ্ঞানের যেমন প্রতিষ্ঠা, তেমনি তার পরিণামেরও প্রবর্তক। বৈদিক ঋষিরা উপমা দিয়েছেন আকাশ আর সূর্যের, তাঁদের ভাষায় বরুণ আর মিত্রের। বরুণ মায়ী, আর মিত্রজ্যোতি তাঁর মায়া। এ-মায়া কিন্তু আধুনিক বেদান্তের কুহকিনী নয়, এ হল পরমের 'প্রজ্ঞা পুরাণী', সচ্চিদানন্দের কবি-ক্রতু (seer-will)। বিজ্ঞান এই অর্থে দৈবী মায়া বা যোগমায়া। বিজ্ঞানে প্রজ্ঞানের যে ছন্দোময় বিচ্ছুরণ, আনন্দে তা সংহত স্বপ্রতিষ্ঠ এবং অতিস্থিত (transcendent)। এমনি করে বিজ্ঞান আনন্দের স্বরূপশক্তি।

অপরার্ধে যেখানে দেহ-প্রাণ-মনের খেলা, সেখানে দেখতে পাচ্ছি ভেদভাবনাই প্রবল, তার পিছনে অভেদের একটা আবছা অনুভব মাত্র আছে। তুমি-আমি সবাই আলাদা-আলাদা, তবুও কোথাও যেন আমরা সবাই এক। বিজ্ঞানে এই একত্বের অনুভব মুখ্য হয়ে দেখা দেয়, ভেদ সেখানে অভেদেরই বিভূতি। যিনি বিজ্ঞানী বা 'মহান্ আত্মা' তাঁর চৈতন্য সর্বব্যাপ্ত এবং সর্বানুস্যূত, তিনি সবার আত্মা, সবাই তাঁর আপন। প্রাকৃত অনুভব যেমন ভেদের, তেমনি আবার বিজ্ঞানের অনুভব হল ভেদাভেদের। অভেদের মধ্যে ভেদের লীলায় ঐশ্বর্য আর উল্লাসের পরিচয়। যেমন পদ্মের পাপড়িগুলি বিধৃত রয়েছে কর্ণিকায়; কিন্তু কর্ণিকা আর পাপড়ি দুটি মিলিয়েই পদ্ম। কেন্দ্রে অভেদ, পরিধিতে ভেদ; একটি জ্যোতির্বিন্দু হতে অজস্র কিরণের বিচ্ছুরণ। কিন্তু আনন্দভূমিতে ওই কেন্দ্রবিন্দুটিও নাই। সেখানে ভেদাভেদও নয়, শুধু অভেদ। ভেদ ভেদাভেদ আর অভেদ—চেতনার উত্তরণ বা অবতরণের তিনটি পর্ব : যথাক্রমে অপরার্ধে বিজ্ঞানে এবং পরার্ধে। যেমন আমাদের মন বুদ্ধি আর বোধ। মনে বৃত্তির ভেদ; বুদ্ধিতে ভেদজ্ঞান একটি অভেদভাবনায় বিধৃত; কিন্তু বোধ আমাদের স্বরূপের অনুভব বলে অভেদভাব তার স্বধর্ম। জ্ঞেয়-জ্ঞাতা স্বাদ্য-স্বাদক কার্য-কারক—এই ভেদগুলি অপরার্ধে সুস্পষ্ট, এরা যেন আলাদা-আলাদা জাতের। কিন্তু বিজ্ঞানে একই চৈতন্য জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় ইত্যাদিতে দ্বিদল। আর আনন্দে ওই ভেদটুকুও বিগলিত—সেখানে শুধু জ্ঞান, শুধু আনন্দ, শুধু শক্তি। উপনিষদের ঋষি এই অবস্থাগুলি বুঝিয়েছেন জাগ্রৎ

স্বপ্ন আর সুষুপ্তির প্রত্যয় দিয়ে। আমাদের জাগ্রতে বিষয় আর বিষয়ীর ভেদ স্পষ্ট; স্বপ্নে বিষয় বিষয়ীরই সৃষ্টি; আর সুষুপ্তিতে বিষয় বিষয়ী একাকার। অথচ তিনটি একই আত্মচৈতন্যের বিভিন্ন ভূমি মাত্র। তেমনি অপরার্ধ ব্রহ্মের জাগ্রৎ, বিজ্ঞান তাঁর স্বপ্ন, আনন্দ তাঁর সুষুপ্তি। কিন্তু প্রাকৃত-চেতনার মত তিনটি অবস্থার পর্যায়ভেদ নাই, তাঁর মধ্যে তিনটিই ওতপ্রোত।

আনন্দে আত্মচৈতন্য বিগলিত হয়ে যায়, জীব আত্মহারা হয়ে যায়—এটি ব্রহ্মোপলব্ধির প্রথম অবস্থা। কিন্তু বস্তুত আনন্দের তাৎপর্য প্রশমে নয়, উল্লাসে। যখন উজিয়ে যাই, তখন প্রশম; আবার ভাটিয়ে আসবার সময় উল্লাস। পূর্ণযোগে আমরা উজান-ভাটা দুটি দিকেই সমান দৃষ্টি দিই : ব্রহ্মের আনন্দে যেমন আমরা বিশ্রান্ত, তেমনি আবার উল্লসিত। সে-উল্লাস রূপ ধরে বিসৃষ্টিতে, কেননা আনন্দ 'সর্বেশ্বরঃ সর্বযোনিঃ'। ব্যাপারটা যেন যোগ-নিদ্রার মত। প্রাকৃত সুষুপ্তিতে চেতনার প্রলয়; কিন্তু যোগের সুষুপ্তিতে চেতনা জেগে ওঠে আনন্দভূমিতে ভাববিসৃষ্টির বীর্য নিয়ে। এইজন্য বেদের ঋষিরা ব্রহ্মের আনন্দকে বলেছেন 'জনলোক' কিনা বিশ্বভুবনের জন্ম বা বিসৃষ্টির ভূমি। 'আনন্দো ব্রহ্মযোনিঃ।'

বস্তুত আনন্দই সর্বমূল। অপরার্ধেও জীবনের সমস্ত ব্যাপারের মূলে রয়েছে আনন্দের প্রেষণা। আনন্দের অভাব থেকে দুঃখবোধ, মানুষ অহরহ তাথেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে অর্থাৎ খুঁজছে তার আনন্দস্বরূপকে। বাইরের উপকরণ যখন আর তাকে তৃপ্ত করতে পারে না, তখন সে ধরে অন্তরের পথ—বাইর থেকে সে একেবারেই ছুটি চায়। সাধকের জীবনে এর নাম মুমুক্ষুত্ব। মুমুক্ষুত্ব থেকে আসে বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের মধ্যে যে নেতির ঝোঁক, তা তাকে উজানপথে ঠেলতে-ঠেলতে অবশেষে পেঁাছে দেয় সর্বনাশা প্রলয়ের কূলে। নির্বাণসন্ধানী অনেক সাধক তখন আনন্দকেও হেয় বলে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু এটা তাঁদের বাড়াবাড়ি, গোড়াতে সুখতৃষ্ণাবর্জনের তীব্র আগ্রহের ফল। বস্তুত নির্বাণ প্রলয় নয়, তা হল রাগ-দ্বেষ-মোহের উপশম, চেতনার প্রশান্তবাহিতা। শান্তি আর আনন্দ শিবশক্তির মতই যুগনদ্ধ। আনন্দ শিবেরই অবন্ধন শক্তির উল্লাস। প্রশমের ফলে আনন্দকে যিনি পান, তিনি এক সর্বব্যাপ্ত সর্বানুস্যূত সত্তায় অবগাহন করে বন্ধন-মুক্তির সংস্কার হতেও মুক্ত হন। উপনিষদের ভাষায় এই হল তাঁর অতিমুক্তি। তাঁর কাছে ভব আর নির্বাণ এক। অপরার্ধ থেকে যখন দেখি, ভব তখনই বন্ধন; যদিও এই

ভবের মধ্যেই রয়েছে চিৎ-প্রকর্ষের প্রেরণা—আনন্দ যার প্রবর্তক। আর পরার্ধ থেকে যখন দেখি, তখন ভব আনন্দের উল্লাস। শক্তির উজান-ভাটা দুয়েতেই আনন্দ।

অপরার্ধে পুরুষ-প্রকৃতিতে যে-বিরোধ, আনন্দে তার সমাধান। বিরোধ দেখা দিয়েছিল চেতনার সঙ্কোচে। বিজ্ঞানে চেতনা যখন আনন্ত্যে বিস্ফারিত হল, তখন অপরা-প্রকৃতিও রূপান্তরিত হল পরমা-প্রকৃতিতে। এই প্রকৃতি পুরুষের আত্মচৈতন্যের অবন্ধন উল্লাস। প্রকৃতি-পুরুষ তখন নিত্যসামরস্যে যুগনদ্ধ। আর সেই যুগনদ্ধতাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের রাসচক্রে অনন্ত কায়ব্যূহের নিত্য আবর্তন।

বিশ্বের প্রতি এই দৃষ্টিই বিজ্ঞানীর সম্যক্-দৃষ্টি এবং এই দৃষ্টির আনন্দে সঞ্জীবিত বিস্ফারিত এবং সমর্থক্রিয়াবান্ জীবনই দিব্য-জীবন।

২৫

পরা ও অপরা বিদ্যা

এতদূর এসে জ্ঞানযোগের পরিচিতি শেষ হল। এখন তার লক্ষ্যের একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের আলোচনার পর এ-প্রসঙ্গে দাঁড়ি টানব।

জ্ঞানযোগের প্রথম লক্ষ্য ব্রহ্মোপলব্ধি। অখণ্ড অনন্ত সত্তা চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তি হল ব্রহ্মের স্বরূপ। উপলব্ধির স্বরূপ হল তাঁতে আবিষ্ট হওয়া এবং তাঁর দ্বারা আবিষ্ট হওয়া। উপলব্ধি শুধু লোকোত্তরে নয়, লোকেও। এইখানেই ব্রহ্মকে সম্ভোগ করতে হবে দেহ প্রাণ মন এবং অতিমানস বিজ্ঞান দিয়ে; বিশ্বের বহুর মেলায় অনুভব করতে হবে সেই এককে, অনুভব করতে হবে নিজেকে। অনুভব হবে অখণ্ড—সগুণে-নির্গুণে রূপে-অরূপে সান্তে-অনন্তে স্পন্দে-অস্পন্দে কোনও বিরোধ থাকবে না।

দ্বিতীয় লক্ষ্য হল, এই উপলব্ধির ফলে প্রকৃতির রূপান্তর। চাই শুধু সাযুজ্যমুক্তি নয়, সাধর্ম্যমুক্তি। ব্রহ্মকে পেয়ে সর্বতোভাবে ব্রহ্ম হতে চাই—এইখানে। দেহ-প্রাণ-মনোরূপ বিগ্রহকে করতে চাই সৎ-চিৎ- আনন্দঘন, ব্রহ্মের বিভূতি এবং বিলাস। রাজার ছেলে হয়ে সাতমহলা রাজবাড়ির সকল মহলে ওঠা-নামার নিরঙ্কুশ স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে চাই। এক কথায়, ব্রহ্মের অনুভবে এবং আবেশে চাই এই জীবনের দিব্য রূপান্তর।

এই হল আমাদের লক্ষ্য। লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় কি, তা নিয়ে সবিশেষ আলোচনাও করেছি। কিন্তু জ্ঞানযোগের একটা দিকের কথা এখনও বলা হয়নি, এইবার তা বলব।

*

উপনিষদে দুটি বিদ্যার কথা আছে—পরা এবং অপরা। অপরা বিদ্যায় জগৎকে জানা যায়—বাইরে রেখে, বুদ্ধি দিয়ে; আর পরা বিদ্যায় জগন্মূল পরমতত্ত্বকে জানা যায়—অন্তরে, বোধি দিয়ে। সাধারণত দুটি বিদ্যার মধ্যে

একটা বিরোধ কল্পনা করা হয় : বলা হয়, পরা বিদ্যার অনুশীলন আমাদের একমাত্র পুরুষার্থ, অপরা বিদ্যার চর্চা নিরর্থক। কিন্তু বস্তুত সব বিদ্যার লক্ষ্য সেই পরমতত্ত্বে পেঁাছনো। বিশ্বকে ধরে জ্ঞানের অনুশীলন করতে-করতেই মানুষ বুদ্ধির পরিপাকে ঝোঁকে বিশ্বাতীতের দিকে। বিজ্ঞানী অপরা বিদ্যাকেও জানবেন পরা বিদ্যার সোপান এবং বিভূতি বলে।

অপরা বিদ্যার মোটামুটি বিষয় হল ভূতবিদ্যা (জড়কে ভিত্তি করে প্রাণ ও মনের তত্ত্বানুসন্ধানও এর অন্তর্গত বলে ধরা যেতে পারে), ধর্মনীতি, দর্শন, কলাবিদ্যা, ইতিহাস এবং প্রয়োগবিজ্ঞান। প্রত্যেকটি বিদ্যার লক্ষ্য হল আমাদের বিক্ষিপ্ত অনুভবের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যসাধন, বহুর মধ্যে একটা ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করা এবং সেই সূত্রের সহায়ে অন্তরে-বাইরে প্রাকৃত শক্তিকে শাসনে আনা। মানুষ এইটি সম্পন্ন করে বুদ্ধির অভিনিবেশ দিয়ে। আগেই বলেছি, বুদ্ধির প্রধান সাধন হল সামান্যজ্ঞান। সামান্যজ্ঞান যেমন বহু বিশেষের আধাররূপে এককে আবিষ্কার করে, তেমনি আবার বিশেষের বিভিন্ন বর্গের (group) মধ্যে অন্যোন্যসম্বন্ধও স্থাপন করে। অধুনা প্রাকৃত বিজ্ঞান এই কাজ করছে: তার সাধনাও মুখ্যত অদ্বৈতের সাধনা। প্রাকৃত দর্শনও আজকাল এই বিজ্ঞানের অনুগামী। বিশ্বাতীতকে যদি পরব্রহ্ম বলি আর বিশ্বকে বলি অপরব্রহ্ম, তাহলে প্রাকৃত বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুশীলনকে বলতে পারি অপরব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন। পর এবং অপর উভয় ব্রহ্মকেই জানতে হবে। আমাদের প্রাকৃতজীবনে অপরব্রহ্মের প্রকাশ। প্রাকৃতজীবনকে আমরা যেমন আঁকড়ে থাকতে চাই না, তেমনি তাকে বাদ দিতেও চাই না—চাই তার দিব্য রূপান্তর। সুতরাং জ্ঞানযোগের মধ্যে অপরব্রহ্মবিদ্যা বা অপরা বিদ্যারও একটা স্থান আছে। জীবনে সে অভ্যুদয়ের সাধক। অভ্যুদয়কে যুক্ত করতে হবে নিঃশ্রেয়সের সঙ্গে, অপরা বিদ্যার ছন্দকে মেলাতে হবে পরা বিদ্যার ছন্দের সঙ্গে। বিদ্যা এবং জীবনের সাধনা তবেই পূর্ণ হবে।

*

পূর্ণতার সাধনায় অপরা বিদ্যা হবে পরা বিদ্যার অনুগামী। মুখ্যত চেতনার বহির্বৃত্তি হতে অপরা বিদ্যার উদ্ভব। তার একটা মূল্য আছে বই কি। কিন্তু চেতনার অন্তরাবৃত্তি হতে উদ্ভূত যে পরা বিদ্যা, তার মূল্য তার

চাইতেও বেশী। মানুষের সার্থক সাম্রাজ্য বাইরে নয়, অন্তরে। বাইরের ঐশ্বর্যে অন্তর যদি দেউলিয়া হয়ে যায়, তবেই সর্বনাশ। জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টাকে অন্তরের ছন্দে না গাঁথতে পারলে কল্যাণ নাই। অপরা বিদ্যার বহুল অনুশীলনে আমরা সমৃদ্ধ এবং মনস্বান্ সমাজ গড়ব, আমাদের লক্ষ্য শুধু এই নয়। আমরা গড়ব যোগীর সমাজ। জীবনে যোগের প্রয়োগ না হলে জীবন অপূর্ণ।

পরা বিদ্যা অর্জিত হয় যোগের পথে। তার সাধন আধারশুদ্ধি একাগ্রতা এবং সাযুজ্যবোধ। এদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আগেই করেছি। রাগ দ্বেষ আর মোহ হল চিত্তের মল। অনাসক্তি তিতিক্ষা ও নিত্যসমনস্কতার দ্বারা এই মল দূর করতে হবে। প্রভাস্বর নির্মল চিত্ত আপনাহতেই তখন অন্তরাবৃত্ত হয়ে চেতনার ঊর্ধ্বতন ভূমিতে সুস্থিত এবং সমাহিত হবে। সমাহিতি হতে আসবে চেতনার ঊর্ধ্বায়ন এবং পরমতত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্য। সাযুজ্যবোধের পরিপাকে প্রকৃতির রূপান্তর—যেমন আগুনের আবেশে ইন্ধনের আগুন হয়ে যাওয়া। এই হল পরা বিদ্যার সিদ্ধি। এই সিদ্ধি আমাদের পরমপুরুষার্থ। অন্যান্য সিদ্ধি এর অঙ্গীভূত হলেই আমাদের কল্যাণ। আমি ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সাহিত্যিক শিল্পী মানবদরদী সব-কিছুই হতে পারি। কিন্তু মানুষ যদি না হতে পারি, মানুষের সেরা মানুষ যোগী না হতে পারি, তাহলে সবই বৃথা।

অপরা বিদ্যার অনুশীলনকে তাই করতে হবে পরা বিদ্যার অনুগামী। সব বিদ্যাই পবিত্র, সবার মধ্যে খুঁজলে পরে চেতনার ঊর্ধ্বায়নের সঙ্কেত পাওয়া যায়। প্রাকৃত বিজ্ঞান আমাকে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু করতে পারে, দর্শন আনতে পারে চিত্তের উদারতা এবং স্থৈর্য, কলার অনুশীলনে সুন্দরের উপাসনায় চিত্ত নির্মল এবং তন্ময় হতে পারে, সেবায় ভাব ও সঙ্কল্পের শুদ্ধি ঘটতে পারে। এক কথায়, প্রাণ ও মনের যে-কোনও বৃত্তির অনুশীলনকে ঊর্ধ্বস্রোতা করে অধ্যাত্ম যোগসিদ্ধির অনুকূল করা যেতে পারে। তা তো আমরা করবই, অধিকন্তু অন্তরাবৃত্ত একাগ্রতার পথে আত্মানুসন্ধানেও তৎপর হব। জানব বিশ্বকে, জানব আত্মাকে, জানব বিশ্বাতীতকে। বিশ্বাতীত বিজ্ঞানে আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে জীবনকে অভ্যুদয়ে সমৃদ্ধ এবং নিঃশ্রেয়সে চিন্ময় করব।

কি সাধনায় কি সিদ্ধিতে, পূর্ণযোগ অপরা এবং পরা বিদ্যার মাঝে বিরোধের কোনও সম্ভাবনা দেখতে পায় না। পরা বিদ্যার একান্ত সাধক বলেন,

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। তেমনি অপরা বিদ্যার সাধকও বলেন, জগৎই সত্য, ব্রহ্ম একটা আলেয়া। দুইই একদেশদর্শীর কথা। বস্তুত জগৎও সত্য ব্রহ্মও সত্য, ব্রহ্মের সত্যতায় বিজ্ঞানীর কাছে জগৎ আরও গভীরভাবে সত্য। সুতরাং জগৎজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান দুইই আমাদের পুরুষার্থ। জগৎজ্ঞান হতেই আমরা ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছতে পারি যদি চিৎপ্রকর্ষকে তার লক্ষ্য করি। অপরা বিদ্যার চরম হল দর্শন—জগৎ-দর্শন এবং জীবন-দর্শন। বিদ্যার অনুশীলনে বুদ্ধির শুদ্ধি এবং দীপ্তিতে আমরা যদি এক সর্বসমঞ্জস অদ্বৈতভাবনায় পৌঁছতে পারি, তাহলে সেই দর্শনই আমাদের সামনে পরা বিদ্যার পথ উন্মুক্ত করে দেবে। তেমনি পরা বিদ্যায় সিদ্ধ দৃষ্টি যদি অপরা বিদ্যার সকল বিভাগে সংক্রামিত হয়, দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির ভাবনা যদি যোগচেতনা হতে উৎসারিত হয়, তাহলেই তারা মানুষের যথার্থ অভ্যুদয়ের সাধক হতে পারে। অভ্যুদয় তখন আর নিঃশ্রেয়সের বাধক নয়, তার সাধক এবং সিদ্ধ পরিণাম।

২৬

সমাধি

বিজ্ঞানভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জ্ঞানযোগের লক্ষ্য। বিজ্ঞান মনের ওপারে। সুতরাং এথেকে ধারণা হতে পারে, মনোলয় ছাড়া কেউ বিজ্ঞানে পৌঁছতে পারে না। মনোলয়ের আরেক নাম সমাধি। সাধারণত তাকে জ্ঞানযোগ রাজযোগ এবং হঠযোগের অপরিহার্য্য সাধন বলে ধরা হয়—যদিও সমাধি বস্তুত রাজ-যোগের একটি অঙ্গ। সমাধি ভক্তিযোগের সাক্ষাৎ লক্ষ্য না হলেও ভাবাবেশে আত্মহারা হওয়াকে ভক্তেরাও একটা বিশেষ মর্যাদা দেন। মোটের উপর এদেশের সমস্ত সাধকের কাছে সমাধি একটা মস্ত আকর্ষণ।

প্রশ্ন হবে, পূর্ণযোগে সমাধির স্থান কোথায়? আত্মহারা হয়ে জগৎ ভুলে যাওয়া যদি সমাধির একমাত্র লক্ষণ হয়, তাহলে দেখতেই পাচ্ছি, সমাধি কখনও পূর্ণযোগীর চরম লক্ষ্য হতে পারে না—যদিও তাকে ক্ষেত্রবিশেষে যোগাঙ্গ বলে মানতে তাঁর আপত্তি নাই। পূর্ণযোগী চান জীবনে এবং জগতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে। ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য চেতনাকে ঊর্ধ্বস্রোতা করা নিশ্চয় প্রয়োজন; কিন্তু আগেও বলেছি, উৎক্ষেপ ছাড়াও তার পথ আছে। আশয়ের (inner depth) কোনও সংস্কারকে উন্মূলিত করবার জন্য উৎক্ষেপের সাময়িক প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু একান্ত উৎক্ষেপের দ্বারা জগৎ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়া পূর্ণযোগের লক্ষ্য নয়। তাছাড়া একথা মনে রাখতে হবে, সমাধিরও প্রকারভেদ আছে, নিরোধসমাধিই একমাত্র সমাধি নয়।

*

বলেছি, চেতনার অন্তরাবৃত্তি বা প্রত্যাহার হতে যোগের শুরু। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রত্যাহারের ক্রিয়া হচ্ছে। আমরা যতক্ষণ জেগে থাকি, ততক্ষণ চেতনার বেশির ভাগ ছড়িয়ে থাকে—যদিও নিজেরই গরজে এর মধ্যে খানিকটা চেতনাকে আমরা ভিতরে গুটিয়ে আনি (যেমন ভাবনা স্মৃতি অভিনিবেশ ইত্যাদিতে)। কিন্তু আমরা সারাক্ষণ জেগে

থাকি না। জাগরণের পর আসে নিদ্রা। তার দুটি স্তর—প্রথমটি স্বপ্ন, দ্বিতীয়টি সুষুপ্তি। নিদ্রাতে চেতনা অন্তরাবৃত্ত হয়। সুষুপ্তিতেও একরকম অস্পষ্ট বোধ থাকে, জাগ্রতে আমরা তার নিশানা পাই দৈহ্যস্মৃতিতে (organic memory)। বিশুদ্ধ বোধকে ধরে তাহলে আমরা চেতনার চারটি স্তর পাই—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এবং তুরীয়। প্রাকৃতচেতনায় প্রথম তিনটির অনুভব সবাই পায়, শেষেরটির অনুভব স্পষ্ট হয় যোগচেতনায়।

নিদ্রা-জাগরণে চেতনার এই স্বাভাবিক অন্তরাবৃত্তি আর বহিরাবৃত্তিকে যোগের প্রয়োজনে লাগানো উপনিষদের ঋষিদের একটি অনন্য কীর্তি। তাঁদের দর্শনে নিদ্রা হল স্বাভাবিক সমাধিস্থিতি। জাগ্রতে আমাদের বিবিক্ত বোধ সুস্পষ্ট; তাকে যদি নিদ্রাতেও সংক্রামিত করা যায়, তাহলে তা-ই হবে যোগের সমাধি। জাগ্রতেও কোন একটা বিষয়ে তন্ময় হয়ে আমরা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারি; এ-অবস্থাটা স্বপ্নের মত। তন্ময়তা আরও গাঢ় হলে নিজেকেও যদি হারিয়ে ফেলি, তাহলে অবস্থাটা হবে সুষুপ্তির মত। তাহলে সমাধির পথ হল বস্তুত জেগে ঘুমানোর পথ। জাগ্রতে বোধ যখন স্পষ্ট থাকে, তখন অন্তরাবৃত্ত সাক্ষিভাবনার দ্বারা আত্মসচেতনতাকে খুব স্পষ্ট করে তুললে তাকে প্রাকৃত স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিতেও বজায় রাখা চলে। যোগের ভাষায় তাকেই বলে ত্রিষু চতুর্থম্' অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার মধ্যে তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থাকে 'আসিক্ত' বা অনুবৃত্ত রাখা।

এর আগে যে-কোশের কথা বলেছি, তাদের সঙ্গে এই অবস্থাগুলির সংগতি আছে। পুরুষ যখন অন্নময় কোশে, তখন তাঁর জাগ্রৎ অবস্থা। যখন তিনি প্রাণময় এবং মনোময় কোশে, তখন তাঁর স্বপ্নাবস্থা; আর বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোশে সুষুপ্ত্যবস্থা। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে স্বপ্নচেতনার দুটি ভাগ—একটি মনের অধিকারে, আরেকটি বিজ্ঞানের অধিকারে। আগেরটির সঙ্গে আমরা পরিচিত, এতে মামুলি স্বপ্নগুলি ফোটে। দ্বিতীয় ধরনের স্বপ্ন ফোটে অন্তরাবৃত্ত চেতনায়, যাতে কোনও তথ্য বা তত্ত্বের দর্শন হয়। পাঁচটি কোশের ঊর্ধ্বে উপনিষদে আছে হিরণ্ময় কোশের কথা, যাতে আত্মচৈতন্য বা ব্রহ্মচৈতন্য বা তুরীয়চৈতন্যের অধিষ্ঠান। গোঁড়া নেতিবাদী যাঁরা, তুরীয়চৈতন্য তাঁদের লক্ষ্য, সেখান থেকে তাঁরা আর ফিরে আসতে চান না। বেদান্তে একে বলে 'অনাবৃত্তি'। উপনিষদে কিন্তু চারটি অবস্থা নিয়েই আত্মাকে বলা হয়েছে চতুষ্পাৎ : জাগ্রতে তিনি বৈশ্বানর, স্বপ্নে তৈজস, সুষুপ্তিতে সর্বেশ্বর প্রাজ্ঞ

আর তুরীয়ে শিবস্বরূপ। চতুষ্পাৎ মানে 'চারপো' বা পূর্ণ। শিবের আত্মশক্তির তিনটি পরিণাম, শিব-শক্তি যুগনদ্ধ।

*

নিদ্রাতে আমরা তাহলে সমাধির আভাস পাই। কিন্তু নিদ্রা অবশ আর সমাধি স্ববশ, নিদ্রা অজ্ঞান আর সমাধি বিজ্ঞান, নিদ্রাতে চেতনার কোনও উৎকর্ষ ঘটে না কিন্তু সমাধিতে ঘটে—এইগুলি হল নিদ্রার সঙ্গে সমাধির পার্থক্য। যোগনিদ্রাতে দুরকমের সমাধি হতে পারে—স্বপ্নসমাধি আর সুষুপ্তিসমাধি। এ-দুটির পরিপাকে অবশেষে দেখা দেয় জাগ্রৎসমাধি বা সহজসমাধি। সংক্ষেপে এদের পরিচয় দিচ্ছি।

প্রাকৃত স্বপ্নে আর যৌগিক স্বপ্নে তফাত আছে। আগেরটির উৎস হল প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের নানা জটলা। একসময় এসব স্বপ্নকে অমূলক মনে করা হত, কিন্তু মনোবিদ্‌রা এখন তাদেরও মূল আবিষ্কার করেছেন আমাদের অবিদ্যাচ্ছন্ন আশয়ের মধ্যে। কিন্তু যৌগিক স্বপ্ন এধরনের নয় : স্বপ্ন তখন অজ্ঞানের খেয়ালখুশি নয়, বিজ্ঞানের স্ফূর্তি। চেতনার জাগ্রৎ ভূমিতে যেমন আমরা তথ্য এবং তত্ত্বকে জানি ও ব্যবহার করি সজ্ঞানে, স্বপ্নভূমিতেও তেমনি করা যায়। যৌগিক স্বপ্নচেতনায় বা স্বপ্নসমাধিতে প্রথমত বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও যোগ থাকে না, সাধকের মধ্যে ফুটে ওঠে নিজের অন্তশ্চেতনা অথবা ভাবলোক এবং তাদের তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে তার কারবার চলে। কিন্তু বিজ্ঞানের স্ফূর্তি অব্যাহত এবং সুস্থিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তিরও স্ফূর্তি হয়। তখন তা দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। ফলে সাধকের মধ্যে দূরদর্শন দূরশ্রবণ প্রদর্শন আবেশন ইত্যাদি নানাধরনের জ্ঞান ও ক্রিয়া-বিভূতির স্ফুরণ হয়। প্রাকৃতচেতনা ইন্দ্রিয়নির্ভর বলে অতীন্দ্রিয়ের প্রগাঢ় অপরোক্ষানুভব তার হয় না, সে এই লৌকিক ভূমি এবং তার আশেপাশেই বিচরণ করে। কিন্তু স্বপ্নসমাধিতে চেতনা মুক্তি পায় লোকোত্তরে, অতীন্দ্রিয় অধিচেতন (subliminal) এবং পরিচেতন (circumconscient) ভূমির দুয়ার তার কাছে খুলে যায়। এইসমস্ত ভূমি থেকে লৌকিক ভূমির প্রশাসনও তখন আর যোগীর পক্ষে অসাধ্য হয় না, কেননা বিজ্ঞান বস্তুত প্রজ্ঞা-বীর্য, জ্ঞানের সঙ্গে শক্তি সেখানে যুগনদ্ধ হয়ে

আছে। অতএব ইচ্ছা করলেই ঋতের ছন্দে তার প্রয়োগ করা চলে।

তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল। বিভূতির প্রয়োগ বস্তুত দোষের না হলেও ঐশ্বর্যের খেলায় মেতে যাওয়া কিন্তু যোগের লক্ষ্য নয়। যোগৈশ্বর্যের পিছনে ছোটা সূক্ষ্ম অহংএরই পরিতর্পণ; ওতে অন্তরের অসুরটাই প্রশ্রয় পায়, দিব্যভাবের উন্মেষ হয় না। শক্তি চাই বই কি—কিন্তু চাই শম্ভূ হয়ে, শুম্ভ হয়ে নয়। যোগের সাধনায় শক্তির অন্তরাবর্তনের ফলে ঐশ্বর্যের প্রকাশ হবেই, কিন্তু তাকে হজম করে আমাদের সহজ হতে হবে। চেতনার যে-কোনও ভূমিতে শক্তির বিক্ষেপ শেষপর্যন্ত অবসাদ অতএব পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই শক্তিসাধনায় চাই বিক্ষেপের প্রমত্ততা নয়, বিচ্ছুরণের সাবলীলতা। চেতনাকে যুগপৎ গভীর উত্তুঙ্গ এবং পরিব্যাপ্ত করতে না পারলে এটি সম্ভব হয় না। আকাশের মত সবার উপরে অথচ সবার গভীরে থেকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে হবে। এই প্রত্যয়ের মধ্যে স্বরূপবিশ্রান্তির যে-স্বাচ্ছন্দ্য আছে, স্বপ্নসমাধিতে তাকে আরও গভীর করতে হবে। আত্মচৈতন্যের স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করতে পারলে আত্মশক্তির বিকিরণ কখনও ঋতচ্ছন্দ হয় না।

যেমন প্রাকৃত স্বপ্ন আপনাহতেই স্বপ্নহীন সুষুপ্তিতে পর্যবসিত হয়, তেমনি স্বপ্নসমাধির গাঢ়তর পরিণাম হল সুষুপ্তিসমাধি। আত্মচৈতন্য তখন অনুবিষ্ট হয় সচ্চিদানন্দের মধ্যে। বিজ্ঞান আনন্দ শক্তি এবং অতিস্থিতি—এইগুলি হল এই সমাধির লক্ষণ। এদের মধ্যে গাঢ়তার তারতম্য আছে। প্রথমটায় চেতনা যখন উজান বইতে থাকে, তখন একটি ভূমির প্রলয় হলে তবে আরেকটি ভূমির উদয় হয়। দুটির সন্ধিস্থলে দেখা দেয় একটা সর্বগ্রাহী শূন্যতা, যা প্রথম-প্রথম সাধকের ভয়ের কারণ হয়। কিন্তু অনুভবের অভ্যাস বা পৌনঃপুনিকতার ফলে এই 'মোক্ষভীতি' সহজেই কেটে গিয়ে সাধক ক্রমে স্ব-স্থ হন। তখন তাঁর চেতনার মহাকাশে দেখা দেয় সর্বতোভাস্বর চিৎসূর্যের স্থিরদীপ্তি। স্বপ্নসমাধিতে যে-বিজ্ঞান বিদ্যুতের ঝলকে-ঝলকে প্রকাশ পেত, এখানে তা এক ঘনীভূত অথচ সমব্যাপ্ত প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয়। এই প্রত্যয়ের গাঢ়তা ক্রমে পর্যবসিত হয় বিশুদ্ধ আনন্দের বোধে। আনন্দের বিশ্রান্তি গাঢ়তর হলে জাগে অকুণ্ঠ অথচ নিস্পন্দ শক্তির অনুভব—হিমবাহের উৎসে তুষারস্তূপের নিশ্চল চাপের মত। তারও পরে থাকে অনির্বচনীয়ের (ineffable) অনিবাধ অতিশূন্যতা—বৈবস্বত মৃত্যুর মত।

উপনিষদে সমাধির এই প্রকারভেদকে বোঝানো হয়েছে স্বপ্ন আর সুষুপ্তির প্রতীক দিয়ে। বলা বাহুল্য, উপনিষদ সেখানে প্রাকৃত নিদ্রার কথা মোটেই বলছেন না। প্রাকৃত নিদ্রা যোগনিদ্রার সূচক মাত্র, দুয়ের মাঝে তফাত কোথায় তা আগেই বলেছি। আসলে সমাধি হল জেগে ঘুমানো বা ঘুমের মধ্যে জেগে ওঠা। আগেরটি হল নিরোধের পথ—জাগ্রৎ অবস্থাতেই চাঞ্চল্যকে একাগ্রতার দ্বারা নিবৃত্ত করে বাইরের সব আলো নিবিয়ে দেওয়া। পরেরটি হচ্ছে, ঘুমের সময় স্বভাবতই যে বৃত্তিনিরোধের প্রবণতা জাগে, তাকে আলম্বন করে বিবিক্ত চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। পরিণামে দুয়েরই লক্ষ্য হল চেতনাকে সব অবস্থাতে জাগিয়ে রাখা। নিরোধ দ্বারা অন্তশ্চেতনাকে জাগিয়ে তোলাকেই সাধারণত সমাধি বলা হয়, জাগ্রৎসমাধির কথাটা হিসাব থেকে তখন বাদ পড়ে যায়। নিরোধসমাধির একটা ত্রুটি হচ্ছে, তাকে বজায় রাখা কঠিন। তাইতে সমাধিতে আর ব্যুত্থানে অনেকসময় বেয়াড়ারকমের ফাঁক থেকে যায়। আবার একনাগাড়ে সমাধি বজায় রাখতে গিয়ে শেষে, পর্যবসিত হয় জড়সমাধিতে। এইধরনের সমাধিসাধনা হতেই জগদ্-বিমুখ নানা দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। এ যে অখন্ড দর্শন নয়, সেকথা আগেও বলেছি।

সহজসমাধির কৌশল কিন্তু অন্যরকমের। নিত্যজাগ্রত চৈতন্যকে লাভ করাই যখন সমাধির উদ্দেশ্য, তখন প্রকৃত জাগ্রৎভূমি থেকেই সমাধির সাধনা শুরু করা যাবে না কেন? সমাধিলভ্য তুরীয় চেতনা তো জাগ্রতেও আছে। আমার চেতনার একটা অংশ যেমন নিত্যপরিণামী (ever-changing), আরেকটা অংশ তেমনি 'উদাসীন' বা 'কূটস্থ'। বিবেকদ্বারা অন্তরে সাক্ষিভাবনা এবং বাইরে আকাশভাবনার দ্বারা আমি জাগ্রতের সকল অবস্থাতেই এই কূটস্থ চৈতন্যের সংস্কারকে পাকা করে নিতে পারি। তখন আমি অন্তরে আত্মসমাহিত যোগস্থ, অথচ বাইরে স্বাভাবিকভাবে কর্মরত। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধির দ্বারা এই অবস্থাকে লক্ষ্য করা হয়েছে : স্থিতপ্রজ্ঞ কুরুক্ষেত্রে সব্যসাচী হয়েও সমাধিস্থ, কেননা মহাযোগেশ্বর পুরুষোত্তম তাঁর জীবনরথের সারথি।

এমনিতর নিত্যজাগ্রত অভিনিবেশের ফলে ক্রিয়ারত অবস্থাতেও সাধকের মধ্যে ভাব আর শক্তির স্বচ্ছন্দ স্ফুরণ হয়। তিনি কাজ করেন অজ্ঞানে নয়, সজ্ঞানে—কর্মের মূলে যে দিব্যশক্তির প্রেরণা এবং দিব্যভাবনার দীপ্তি, তা তাঁর চেতনায় তখন সুপরিস্ফুট। তাঁর জাগ্রৎ তখন যুগপৎ তুরীয় প্রাজ্ঞ এবং তৈজসের চেতনার দ্বারা আবিষ্ট। এই আবেশ গাঢ় হলে জাগ্রৎ স্বপ্ন আর

সুষুপ্তির মাঝে কোনও আড়াল থাকে না। সাধক তখন ওই তিনটি ভূমির যে-কোনও ভূমিতে আর-দুটি ভূমির চিন্ময় স্ফূর্তিকে স্বচ্ছন্দে অনুভব করতে পারেন।

এই হল সহজসমাধির অবস্থা এবং পূর্ণযোগ-সিদ্ধির তা সম্পূর্ণ অনুকূল। তবে নিরোধসমাধির সাধনা এতে বাতিল হয়ে যায় না। প্রাকৃত-ভূমিতেও স্বচ্ছন্দচারী চেতনাকে যেমন প্রয়োজনবশে কোথাও-কোথাও নিরুদ্ধ করতে হয়, তেমনি ঊর্ধ্বচেতনার কোনও-কোনও ভূমিকে আয়ত্ত করবার জন্য পূর্ণযোগীকেও নিরোধসমাধির প্রয়োগ করতে হয়। তবুও নিরোধ তাঁর লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে আকাশের মত সর্বান্তর্যামী এবং সহজ হওয়া।

২৭

হঠযোগ

এতক্ষণ সমাধির যে-বিবরণ দিলাম, তার প্রধান অবলম্বন হল ঔপনিষদ-ভাবনা। এ-সাধনা সাধারণত সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগের অনুকূল। এছাড়া সমাধিসাধনার আরও দুটি বিশিষ্ট পথ আছে—হঠযোগ আর রাজযোগ। এদেশে যোগ বলতে প্রধানত আমরা এদেরই বুঝি। দুটিরই লক্ষ্য হল মনোলয় : যেখানে মন থাকে না, শুধু বোধ থাকে, সেইখানেই আমি আমাকে সত্য করে জানতে পারি। যোগের ভাষায় একে বলে পুরুষের স্বরূপস্থিতি বা কৈবল্য। পুরুষ তখন প্রকৃতির গুণপরিণামের বন্ধন হতে মুক্ত। তাঁর আত্মসমাহিতি বা আপনাতে আপনি থাকার যে প্রশান্ত বোধ, তা-ই প্রজ্ঞা।

প্রজ্ঞাস্থিতি পূর্ণযোগীরও কাম্য। কিন্তু এই স্থিতিকে ভিত্তি করে তিনি চান শক্তির বিচ্ছুরণ। তাই হঠযোগ বা রাজযোগের যা চরম লক্ষ্য, তা তাঁর কাছে প্রাথমিক সিদ্ধি। তাছাড়া এই সিদ্ধিকে আয়ত্ত করবার অন্য পথও থাকতে পারে, তার আভাস আগের অধ্যায়ে দিয়েছি। তবুও হঠযোগ আর রাজযোগের বিশিষ্ট পদ্ধতির সম্পর্কে পূর্ণযোগীরও মোটামুটি একটা জ্ঞান থাকা ভাল, কেননা আংশিকভাবে বা ক্ষেত্রবিশেষে এদের প্রয়োগ তাঁর সাধনাতেও প্রয়োজন হতে পারে।

গোড়াতেই বলে রাখি, যোগের যে-পথই ধরি না কেন, তিনটি যোগাঙ্গকে তার মুখ্য সাধন বলে আমাদের মেনে নিতে হবে—আধারশুদ্ধি, শক্তির একাগ্রতা, আর তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি আসক্তি বর্জনের দ্বারা চিত্তের বিস্ফারণ। এই তিনটিতে দেহ-চেতনা প্রাণ-চেতনা এবং মনশ্চেতনা পরিশুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ হবার সামর্থ্য লাভ করে। বিজ্ঞানভূমি থেকেই সব যোগের শুরু।

*

রাজযোগের সাধন যেমন মন, তেমনি হঠযোগের সাধন হল দেহ। এইজন্য হঠযোগের আরেক নাম 'কায়সাধন'। যোগীদের মধ্যে একটা কথা চলতি আছে, রাজযোগ করবার শক্তি যার নাই, হঠযোগে তারই অধিকার। মন সূক্ষ্ম, তাকে

বশে আনা কঠিন; কিন্তু দেহ স্থূল, তাকে নিয়ে কারবার করা কতকটা সহজ। কিন্তু স্থূল হলেও হঠযোগী দেহকে দেখেন যোগের দৃষ্টিতে। দেহের গভীরে যে-প্রাণশক্তি কুণ্ডলিত হয়ে আছে, তাকে মুক্ত করে এই দেহকেই পরম চিৎপ্রকাশের বাহন করে তোলা তাঁর লক্ষ্য। হঠযোগের ভাষায় একে বলে 'পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যসাধন'। প্রাচীন কোশবিজ্ঞানের সঙ্গে তার একটা গভীর যোগ আছে। তবে দেহচেতনার চাইতে দেহস্থ প্রাণবাহী নাড়ীতন্ত্রের (nervous system) উপর বেশী জোর দেওয়া হয় বলে হঠযোগের সাধনা স্থূল ও যান্ত্রিক হলেও বেশ কষ্টসাধ্য এবং অনেকসময় বিপজ্জনক।

রাজযোগের আটটি অঙ্গের মধ্যে হঠযোগ গ্রহণ করেছে প্রথম চারটি। তারও মধ্যে যম-নিয়ম বা চারিত্রিক বিশুদ্ধির দুটি অঙ্গের জায়গায় সে বসিয়েছে ষট্‌কর্ম বা নাড়ীশোধন। তাইতে হঠযোগের মুখ্য সাধন দাঁড়াচ্ছে নাড়ীশোধন আসন এবং প্রাণায়াম—এই তিনটি। রাজযোগের আর তিনটি অঙ্গ প্রত্যাহার ধারণ আর ধ্যান হল বিশেষ করে মনের সাধনা। তাই সাক্ষাৎভাবে হঠযোগে এদের স্থান নাই। হঠযোগীরা বলেন, আসন এবং নাড়ীশোধনের দ্বারা প্রাণের নিরোধ করতে পারলে মনের নিরোধ আপনা থেকে হয়ে যাবে এবং তার ফলে উৎপন্ন হবে নিরোধসমাধি—যা রাজযোগেরও অষ্টম অঙ্গ এবং লক্ষ্যস্থানীয়।

দেহ প্রাণ আর মন নিয়ে আমাদের প্রাকৃত আধার। এদের মধ্যে চেতনার উৎকর্ষ দেখা দিয়াছে মনে। সব যোগই আসলে মনের যোগ—উপনিষদের ভাষায় সাধনযজ্ঞে মনই হল যজমান। কিন্তু মনশ্চেতনার বিকাশের পক্ষে বাধা হল দেহের জড়ত্ব আর প্রাণের চাঞ্চল্য। এরা নানা অবিশুদ্ধি আর বিকারেরও কারণ। বস্তুত দেহ আর প্রাণের গভীরে প্রচণ্ড শক্তি স্তব্ধ হয়ে আছে, কিন্তু প্রাকৃত-জীবনে তারা মুক্তি পাচ্ছে না। হঠযোগের উদ্দেশ্য হল, কৌশলে এই শক্তিকে মুক্ত এবং ঊর্ধ্বস্রোতা করা।

দেহের জড়ত্বের অর্থ হল তার মধ্যে চিৎপ্রকাশের কুণ্ঠা। নইলে দেহ জড় হলেও কিন্তু নিস্পন্দ নয়। বিশ্বজোড়া প্রাণশক্তির স্পন্দনে দেহও নিত্যস্পন্দিত। এই স্পন্দনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে, যা দিয়ে প্রকৃতির একটা বিশেষ উদ্দেশ্য বেশ সহজেই সাধিত হয়। উদ্ভিদ বা ইতরপ্রাণীর জীবনে এই স্বাচ্ছন্দ্যকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। মনশ্চেতনা তাদের আচ্ছন্ন কিংবা অস্পষ্ট, কিন্তু দেহ আর প্রাণ বেশ সুস্থ। গোল বাধে মানুষকে নিয়ে। মানুষের মধ্যে মন আছে, কল্পনা আছে, স্বতন্ত্র ইচ্ছার তাগিদ আছে। এগুলি

যেমন একদিক দিয়ে তার মধ্যে চিৎপ্রকর্ষের হেতু, আরেকদিক দিয়ে এরাই আবার দেহ আর প্রাণের নানা বিকারেরও হেতু। মনঃশক্তি ঊর্ধ্বস্রোতা হতে গিয়ে প্রজ্ঞার অভাবে নানা বিক্ষেপে ছিটকে পড়েছে। তাকে গুটিয়ে না আনতে পারলে জীবনে পরা-প্রকৃতির ছন্দকে আবিষ্কার করা যায় না। তাইতে মনকে গুটিয়ে আনা, এমন-কি ইচ্ছামাত্র তাকে নিস্পন্দ করতে পারা সব যোগের প্রাথমিক সাধন। দেহ প্রাণ আর মনের মাঝে একটা ওতপ্রোত সম্বন্ধ রয়েছে। হঠযোগী দেখলেন, মনের চাঞ্চল্য দেহকেও চঞ্চল করে, আবার দেহকে স্থির করতে পারলে মনও সুস্থির হয়ে আসে। সুষুপ্তিতে মানুষের মধ্যে মনের ক্রিয়া থাকে না; তখন প্রাণের ছন্দোময় ক্রিয়া ছাড়া দেহের অযথা কোনও চাঞ্চল্যও থাকে না। সুতরাং জাগ্রতেও যদি দেহের মধ্যে সুষুপ্তি-সময়ের নিশ্চলতা নিয়ে আসা যায়, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে মনও শান্ত হয়ে আসবে। এই ভাবনা হল হঠযোগের আসনসাধনার ভিত্তি।

বস্তুত আসনসাধন হল দেহের স্থৈর্যের সাধনা। তার দুটি ফল : এক, আধারের গভীরে নিগূঢ় প্রশান্ত দৈহ্যচেতনাকে আবিষ্কার করে তার দ্বারা আবিষ্ট থাকা; দ্বিতীয়ত, এই উদ্‌বুদ্ধ চেতনার দ্বারা প্রাণের ক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছন্দ ও সতেজ করা। যৌগিক উপায়ে দেহ-সচেতন হতে গেলে কিন্তু শুধু আসনের কসরত করলেই হয় না, সঙ্গে-সঙ্গে ভাবনাও করতে হয়। হঠযোগে এই ভাবনার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু রাজযোগে আছে। ভাবনার সূত্র হল : প্রযত্নশৈথিল্য (complete relaxation) এবং অনন্তসমাপত্তির (expansion of the consciousness into infinite space) দ্বারা সুখময় স্থৈর্যের উপলব্ধিতেই আসনসিদ্ধি। এই সূত্রটিকে যোগবীজ বলা যেতে পারে।

হঠযোগে অনেকরকম আসনের কথা আছে। তার সবগুলি যে যোগাসন, তা নয়। অনেকগুলির উদ্দেশ্য, দেহের আড়ষ্টতা ভেঙে দিয়ে নাড়ীপথে প্রাণস্রোতকে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হতে দেওয়া। ভাবনাসহ অনুশীলন করলে পর আসনসিদ্ধির ফলে নানা কায়সম্পৎ—যেমন দৈহিক তিতিক্ষা আরোগ্য বল লাবণ্য বজ্রদৃঢ়তা তারুণ্য—সাধকের আয়ত্তে আসতে পারে। অবশ্য এগুলি কায়িক বিভূতি। পরমার্থসাধনার সঙ্গে যুক্ত না হলে এদের মূল্য খুব বেশী নয়, তা বলাই বাহুল্য। আর বিনা ভাবনায় অনুশীলন করলে আসন ও মুদ্রার সাধনা উন্নতধরণের শারীরিক ব্যায়ামে পর্যবসিত হয়। রাজযোগের সূত্র ধরে আসনের সাধনা করলে পর দৈহ্যচেতনার পরিপূর্ণ বিকাশের ফলে অণিমা-

গরিমা এবং মহিমা-লঘিমা নামে কায়িক সিদ্ধির আবির্ভাব হতে পারে। আগের দুটির মূলে আছে সংহনন ও স্থৈর্যের ভাবনা, আর পরের দুটির মূলে অনন্তসমাপত্তির ভাবনা।

*

হঠযোগের আরেকটি প্রধান অঙ্গ হল প্রাণায়াম। আসন যেমন স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহকে আশ্রয় করে স্থৈর্যের সাধনা, প্রাণায়াম তেমনি সূক্ষ্ম নাড়ীসঞ্চারী প্রাণের বশীকারের সাধনা। হঠযোগীরা দেহের স্থৈর্যকে যেমন মনঃস্থৈর্যের অনুকূল বলে মনে করেন, তেমনি আরও সূক্ষ্মভাবে প্রাণস্থৈর্যকেই মনঃস্থৈর্যের প্রকৃত সাধন বলে ধরে নেন। প্রাণ সর্বদেহব্যাপী এবং তার ক্রিয়া বিচিত্র; তার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে হঠযোগীরা সাধনার প্রধান আলম্বনরূপে গ্রহণ করেছেন। আসনের ফলে সমস্ত দেহ জুড়ে যে লঘুতা এবং স্থৈর্যের বোধ, একটু অভিনিবেশের ফলে তার মধ্যে শ্বাসের গতিকে যেন বহুশাখায় প্রবাহিত একটা শক্তিস্রোতের মত অনুভব করা যেতে পারে। এই শক্তির অনুভব যত স্পষ্ট হয়, স্থূলদেহের অন্তরালে অশ্বত্থপাতার শিরাজালের মত একটা সূক্ষ্ম নাড়ীময় দেহের অনুভব ততই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। যোগীর কারবার এই নাড়ীতন্ত্রসঞ্চারী প্রাণকে নিয়ে—শ্বাসের ক্রিয়া প্রাণকে ধরবার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। নাড়ীর ভিতর দিয়ে প্রাণের চলাচল স্বচ্ছন্দ ও সুষম হবে, কোথাও আবর্ত সৃষ্টি করবে না এবং তার গতি ক্রমে মন্দীভূত হয়ে এক অপূর্যমাণ মহাপ্রাণসমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে যাবে—এই হল সাধকের লক্ষ্য। প্রাণের গতিকে স্বচ্ছন্দ করবার জন্য হঠযোগী স্থূল ষট্‌কর্মের দ্বারা 'নাড়ীশোধনের' সাধনা করেন এবং প্রাণের গতিবিচ্ছেদের জন্য 'কুম্ভক অভ্যাস করেন। কুম্ভকে বায়ু স্থির হয়ে গেলে প্রাণের সকল ক্রিয়া বাহ্যদৃষ্টিতে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। আর প্রাণবৃত্তির নিরোধে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে জড়সমাধি উৎপন্ন হয়। দেহ এবং প্রাণকে ধরে হঠযোগী এমনি করে রাজযোগীর লক্ষ্য যে-কৈবল্য বা পুরুষের স্বরূপস্থিতি, তাতেই পৌঁছবার চেষ্টা করেন।

নাড়ীবিজ্ঞান হঠযোগীদের একটি বিশিষ্ট আবিষ্কার। বিজ্ঞানটি অতি-প্রাচীন, বেদেও তার উদ্দেশ পাওয়া যায়। হঠযোগীদের হাতে এর বিশেষ উন্নতি হয়, যার পরিণামে আমরা পেয়েছি কুণ্ডলিনীযোগের বিশিষ্ট পদ্ধতি। এইখানে হঠযোগ এসে মিলে গেছে রাজযোগের সঙ্গে।

২৮

রাজযোগ

দেহ আর প্রাণ যেমন হঠযোগের মুখ্য সাধন, তেমনি রাজযোগের মুখ্য সাধন হল মন। দেহ আর মনের মাঝে একটা ওতপ্রোততার সম্পর্ক আছে, একথা স্বীকার করে নিয়েও কিন্তু হঠযোগ আধুনিক জড়বিদ্যা বা মনোবিদ্যার মত মনোবৃত্তিকে দৈহ্যক্রিয়ার পরিণাম বলে মনে করে না। যোগের দৃষ্টিতে মন দেহের চাইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব, সুতরাং মনের শক্তিতে দেহের প্রশাসন যোগীর কাছে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কোনও ব্যাপার নয়। বস্তুত সব যোগই মনোনির্ভর, একথা আগেও বলেছি। সাধন হিসাবে হঠযোগে দেহ আর প্রাণের প্রাধান্য, আর রাজযোগে মনের—দুয়ের মাঝে প্রারম্ভের এই তফাত।

হঠযোগে প্রাণবৃত্তির নিরোধের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধের কথা আগের অধ্যায়ে বলেছি। এছাড়া হঠযোগে আরেকটি সাধনা আছে—কুণ্ডলিনীযোগ : তাকে বলা যেতে পারে প্রাণকে ঊর্ধ্বস্রোতা করে বিস্ফারিত করবার সাধনা। এও একটি খুব প্রাচীন সাধনা। যোগাসনে বসে চিত্তকে অন্তর্মুখ এবং একাগ্র করলে পর স্বভাবতই দেহে একটা তাপের অনুভব হয়। বেদে এই তাপকে দেহস্থিত প্রাণাগ্নির শিখা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অগ্নিশিখার মতই যে-কোনও উদ্দীপ্ত ভাবনায় এই তাপ (বা 'তপঃশক্তি') ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে মাথার দিকে চলে যায়—চলতি কথায় যাকে আমরা বলি 'বায়ু চড়া'। আধুনিককালে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, মেরুদণ্ড ঋজু করে স্থির হয়ে বসলে পরও একটা বিদ্যুৎস্রোত মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে মাথার দিকে উজিয়ে চলে। শারীরবিদ্যার এই তথ্যকে হঠযোগীরা প্রাণের ঊর্ধ্বায়নের কাজে লাগিয়েছেন। দেহের নাড়ী-তন্ত্রকে তাঁরা একটি ওলটানো গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন : মস্তিষ্ক হল তার মূল, সারাদেহব্যাপী নাড়ীজাল তার ডালপালা, আর মেরুদণ্ডটি কাণ্ড। কাণ্ডটির নাম 'সুষুম্ণকাণ্ড'। বৈদিক কল্পনা হল, চিৎসূর্যের একটি রশ্মি ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে সুষম্ণার খাত বেয়ে মানুষের মধ্যে অভিনিবিষ্ট হয়ে আছে। এই সুষুম্ণাই হল আগুনে-ছাওয়া দেবযান পথ। এই পথ ধরে দেবতা আধারে নেমে এসেছেন। সুতরাং তাকে ধরে মানুষ মৃত্যুতে যদি প্রাণস্রোতকে

উজিয়ে নিতে পারে, তাহলেই সে দেবতাকে পাবে। হঠযোগের সাধনা এই বৈদিক ভাবনারই প্রপঞ্চিত রূপ। তাঁরা বলেন, প্রাণের আগুন ছড়িয়ে আছে সমস্ত দেহে; ভাবনার দ্বারা তাকে 'চয়ন' করতে হবে ওই সুষুম্ণাকাণ্ডে। মেরুদণ্ডটি তখন হবে অগ্নিগর্ভ। মেরুদণ্ডের সবচাইতে নীচের প্রান্ত হল 'মূলাধার'। প্রাণশক্তি সেখানে যেন সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে বলে আমাদের আধারের যত যান্ত্রিক ক্রিয়ার 'আশয়' বা উৎস হল ওইখানে। ঘুমন্ত শক্তিকে ওখান থেকে জাগিয়ে সুষুম্ণকাণ্ডের ভিতর দিয়ে তুলে নিতে হবে মস্তিষ্কের নিত্যজাগ্রত বিস্ফারিত চৈতন্যের ভূমিতে। চৈতন্যের এই ভূমি যেন একটি 'সহস্রার' চক্র বা সহস্রদল পদ্ম। মূলাধারে প্রাণ-চেতনা যেমন স্তিমিত, সহস্রারে তেমনি বিস্ফারিত। মূলাধার ও সহস্রারের মধ্যে সুষুম্ণার ঘাটে-ঘাটে ক্রমস্ফুট চেতনার আরও পাঁচটি ভূমি বা চক্র বা পদ্ম আছে। নাভি লিঙ্গ গুহ্য এই তিনের সমান্তরাল তিনটি চক্র হল প্রাকৃত জৈবচেতনার ভূমি। আহার মৈথুন এবং নিদ্রাতে অন্ধ আসক্তি হল সে-চেতনার প্রকৃতি। নাভিতে একটি গ্রন্থি আছে, নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। তাকে ভেদ না করতে পারলে এই আসক্তি কাটিয়ে ওঠা যায় না, যোগীও হওয়া যায় না। আর তিনটি চক্র ক্রমোর্ধ্ব চেতনার ভূমি—হৃদয় কণ্ঠ ও ভ্রূমধ্যের সমান্তরালে। প্রাণস্রোতকে তাদের ভিতর দিয়ে উজিয়ে তুলতে হবে মূর্ধন্যচেতনার ভূমিতে —সহস্রারে। তন্ত্রের ভাষায় মূলাধারস্থ শক্তি তখন সহস্রারে শিবের সঙ্গে সঙ্গত হবেন এবং তাঁদের সামরস্যের আনন্দধারায় পিণ্ডরূপী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত হয়ে যাবে। বেদে একে অগ্নি-সোমের মিলন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

মূলাধারস্থ শক্তিকে হঠযোগী প্রথমত জাগাবার চেষ্টা করেন আসন বন্ধ মুদ্রা এবং প্রাণায়ামের দ্বারা। স্থূল অবলম্বনে সাধনা চলে এইপর্যন্ত। তারপর 'শক্তিচালনার' জন্য ভাবনার আশ্রয় নিতেই হয়। তখন সাধনা চলে মন দিয়ে —বিশেষত রাজযোগের পঞ্চম অঙ্গ 'ধারণার' প্রয়োগ এক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই এইখানে এসে হঠযোগ রাজযোগের সঙ্গে মিলে যায়। কুণ্ডলিনী-যোগের একটা বৈদিক ভিত্তি ছিল বলে তন্ত্রের মন্ত্রযোগের মধ্যে সহজেই এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। চক্রের ভাবনা তাতে আরও জটিল হয়েছে। তাছাড়া শক্তি-সাধনাতেও কুণ্ডলিনীযোগের প্রয়োগ দেখা যায়।

*

রাজযোগের আটটি অঙ্গ। প্রথম দুটি অঙ্গ হল 'যম' আর 'নিয়ম'। দুটিই চিত্তশুদ্ধির সাধনা। সুতরাং প্রথম থেকেই রাজযোগ জোর দিচ্ছে মনের উপর। অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি হল যম। এগুলির উদ্দেশ্য হল ব্যবহারশুদ্ধি। আন্তরশুদ্ধির জন্য পাঁচটি নিয়ম—শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান। সবই মনের সাধনা। মনের সাধনার উপর রাজযোগী এতই জোর দিয়েছেন যে তাঁর মতে অষ্টাঙ্গযোগের যে-ফল অবিদ্যাদি ক্লেশের ক্ষয় এবং সমাধিভাবনা, তা ক্রিয়াযোগের দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে; আর ক্রিয়াযোগ হল নিয়মের শেষ তিনটি—তপঃ, স্বাধ্যায় (জপ, মনন বা অনুস্মৃতি) আর ঈশ্বরপ্রণিধান (তদ্গত হয়ে ঈশ্বরের অনুধ্যান)। ক্রিয়াযোগ চলতে-ফিরতে যোগ, জীবনের সহজ যোগ।

অষ্টাঙ্গযোগের আর দুটি অঙ্গ হল আসন আর প্রাণায়াম। রাজযোগে এরা বহিরঙ্গ, সুতরাং হঠযোগের মত এদের নিয়ে রাজযোগে রকমারি কসরত করা হয় না। দুটি অঙ্গের সাধনাতেই ভাবনা হল প্রধান : ভাবনার দ্বারা সিদ্ধির মূলসূত্র আবিষ্কার করে তার স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ করতে হবে। আসন-সিদ্ধির মূল কথা হল স্থিরসুখময় দৈহ্যচেতনার আবির্ভাব ঘটানো। তার অনুকূল ভাবনার উল্লেখ আগেই করেছি। প্রাণায়ামের লক্ষ্য হল স্তম্ভবৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা চিত্তের সাত্ত্বিক প্রকাশের বাধাকে দূর করা—চিমনি পরিয়ে দিলে লণ্ঠনের শিখা যেমন স্থির হয়ে জ্বলতে থাকে, চিত্তের দীপ্তিকে তেমনি করা। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক ছন্দকে অনুসরণ করে অথবা বৃহতের ভাবনার আবেশেও স্তম্ভবৃত্তিকে সহজে প্রবর্তিত করা যেতে পারে। রাজযোগে তা-ই করা হয়।

যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম—এগুলি হল রাজযোগের বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ সাধন হল প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান এবং সমাধি—যদিও পতঞ্জলি প্রত্যাহারকেও বহিরঙ্গের মধ্যে ধরেছেন। প্রত্যাহারের কারবার হল মনকে নিয়ে, ওই থেকেই আসল যোগের শুরু। বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং ভাবনাকে অন্তর্মুখ করা হল প্রত্যাহার। চিত্তের দুটি ভাগ : একটি চিত্তসত্ত্ব (consciousness-stuff) —যেন ছায়াবাজির পরদার মত; আরেকটি চিত্তবৃত্তি—ওই পরদার উপরে সংবিতের নানা খেলা। সাধারণত আমরা ওই খেলা নিয়ে মেতে থাকি, পিছনের পরদার দিকে নজর দিই না। ফলে বৃত্তির গতি হয় বাইরের দিকে। অথচ বৃত্তির অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গে চিত্তসত্ত্বের অনুভব হামেশাই হয়। ওইটিকে

চেতনায় প্রস্ফুট করে তোলাই হল প্রত্যাহারের অর্থ। একটা ফুল দেখে ভাল লাগল; এখন ফুলের উপর থেকে নজরটা ঘুরিয়ে এনে ভাল-লাগার উপর নিবন্ধ করা হবে প্রত্যাহার। সর্ববিষয়ে এইধরনের অভ্যাস করলে পর যে-আত্মসচেতনতা এখন আমাদের মধ্যে আবছা হয়ে আছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাতে কোনও বিষয়ে চিত্তকে ধরে রাখবার ক্ষমতা বাড়বে। তার নাম ধৃতি বা ধারণা। যোগের ধারণার লক্ষ্য হচ্ছে আত্মসচেতনতাকে বাড়ানো। তার জন্য ধারণার অভ্যাস করতে হয় দেশের কোনও চক্রে চিত্তকে গুটিয়ে এনে অথবা দেহের বাইরে চেতনাকে স্বচ্ছন্দে ছড়িয়ে দিয়ে (বিদেহধারণা)। ধারণায় আত্মবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠলে আপনাহতেই তাকে অবলম্বন করে চেতনার একটানা একটা প্রবাহ ভিতরে-ভিতরে বইতে থাকে। তখনই ধ্যান হয়। ধ্যানের ফলে আত্মহারা হওয়াই সমাধি।

ধারণা ধ্যান সমাধি এই তিনটির একত্রভাবের পারিভাষিক নাম হল 'সংযম'। সাধকের প্রথম-প্রথম আত্মচেতনার উপর সংযম করা উচিত যাতে আত্মবোধ সুস্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। এমন-কি যাঁরা ইষ্টভাবনায় ডুবতে চান, তাঁদের পক্ষেও এই বিধি। নিজেকে না জানলে দেবতাকেও ঠিক-ঠিক জানা যায় না, কেননা বস্তুত দেবতা আত্মচৈতন্যের ঘনভাব বা বিগ্রহ। ইষ্টভাবনা যাঁদের সাধ্য, তাঁরা সংযমের ফলে আত্মবোধকে প্রথম জাগিয়ে তুলে সেই বোধের ক্ষেত্রে ইষ্টের ভাবনাকে প্রবর্তিত করবেন। সে-ভাবনার গতি হবে বাইরের থেকে ভিতরের দিকে—যোগের ভাষায় গ্রাহ্য হতে গ্রহণের ভিতর দিয়ে গ্রহীতার দিকে। প্রথমটায় জাগবে ইষ্টের স্থূলেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশিষ্ট বোধের তন্ময়তা, তারপর সূক্ষ্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামান্যবোধের তন্ময়তা, তারপর চিত্তসত্ত্বের স্ফুরণ-জনিত তন্ময়তা। যেমন কৃষ্ণবিগ্রহের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধে ডুবে গেলাম, তারপর হয়তো ডুবে গেলাম স্পর্শতন্মাত্রে; তারপর শ্রীকৃষ্ণ শুধু আনন্দ; অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ আর আমি একাকার। এই স্তরগুলিকে যোগের ভাষায় বলে 'সমাপত্তি'। চারটি সমাপত্তিতে সম্প্রজ্ঞাত যোগ, যার ফলে তাদাত্ম্যবোধের (knowledge by identity) দ্বারা বিষয়ের সম্যক্ প্রজ্ঞান হয়। আরও গভীরে গেলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। তখন আর সংজ্ঞা থাকে না। সে যেন না-জানা দিয়ে জানা।

রাজযোগের চরম লক্ষ্য হল এই অসম্প্রজ্ঞান বা চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিরোধ। তার ফল পুরুষের কৈবল্য। কেবল-পুরুষ শক্তিপরিণামের ঊর্ধ্বে। কিন্তু

অবলে তিনি নিঃশক্তিক নন। পুরুষ আর প্রকৃতিকে চৈতন্য আর শক্তিকে কোনও অবস্থাতেই আলাদা করা যায় না। একাগ্রতা এবং নিরোধের দ্বারা যোগী অবরভূমির প্রকৃতিপরিণাম হতে নিষ্কৃতি চান, কেননা সাধারণত ওগুলি মানুষের দুঃখের কারণ। কিন্তু ওই একাগ্রতা আর নিরোধের ফলে আবার চেতনার শক্তি বাড়ে। ফলে কৈবল্যসাধক যোগীর মধ্যে দেখা দেয় বিভূতি বা ঐশ্বর্য। যেমন তাঁর জ্ঞান বাড়ে, তেমনি ভোক্তৃত্ব এবং কর্তৃত্বের সামর্থ্যও বাড়ে। অনেকক্ষেত্রে এগুলি হয় প্রকৃতির নতুন প্রলোভন, যার মধ্যে আটকা পড়ে যোগীর চরম লক্ষ্য কৈবল্য হতে বিচ্যুত হবার আশঙ্কা থাকে। যোগশাস্ত্রে তাই বিভূতি বা সিদ্ধির সম্পর্কে সাধককে সাবধান হতে বলা হয়েছে। পূর্ণ-প্রজ্ঞ না হওয়া পর্যন্ত এ-সাবধানতার সার্থকতা আছে বই কি। কিন্তু ঋতমানসে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণপ্রজ্ঞ পুরুষের সিদ্ধি পরমাপ্রকৃতির কল্যাণী শক্তির বিভূতি। শিবম্মন্য অসুরের সিদ্ধিতে ভেজাল থাকতে পারে, কিন্তু শিবের সিদ্ধি নির্মলা এবং বিজয়া।

হঠযোগের এবং রাজযোগের আলোচনা হতে এইটুকু বোঝা গেল, পূর্ণ-যোগের সাধনায় ক্ষেত্রবিশেষে তাদের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হলেও কি লক্ষ্য কি সাধন-পদ্ধতিতে তার সঙ্গে এদের সর্বাংশে ঐক্য সম্ভবপর নয়।

॥ দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত ॥

২১

তৃতীয় পাদ

ভক্তিযোগ

১

যোগত্রয় ও ভক্তি

তিনটি যোগের কথা আমরা জানি—কর্মযোগ জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ। আমাদের চৈতন্যের অন্যোন্যসংগত তিনটি বৃত্তি—সংকল্প ভাবনা বেদনা (feeling), যথাক্রমে তারা হল ওই তিনটি যোগের সাধন। সংস্কার ও রুচির বশে একেকটি যোগের উপর আমরা জোর দিই, কিন্তু বস্তুত তারা অন্যোন্যাবিরোধী নয় কিংবা তাদের মধ্যে মুখ্য-গৌণের প্রশ্নও নাই। তিনটি যোগের অন্যোন্যসংগমে সিদ্ধির পূর্ণতা। কর্মযোগ আর জ্ঞানযোগের কথা বলা হয়েছে, এইবার ভক্তিযোগের কথা।

*

সাধনার দিক দিয়ে দেখতে গেলে কর্ম জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে স্বাভাবিক একটা পৌর্বাপর্য আছে। সবার জীবন শুরু হয় কর্ম দিয়ে। কর্মের ঝামেলা আছে; কিন্তু তাবলে তাকে এড়ানো যায় না, এড়ানোর চেষ্টা আন্তরিক স্বাস্থ্যের অনুকূলও নয়। অনাসক্ত হয়ে সমর্পণবুদ্ধিতে কর্ম করতে-করতে চিত্ত শান্ত শুদ্ধ এবং প্রসন্ন হয়। সেই চিত্তে জ্ঞানের স্ফুরণ হয় : আমরা জানি নিজেকে, জানি অন্তর্যামীকে, জানি বিশ্বকে। সর্বসমঞ্জস জ্ঞানের পরিপাকে চিত্ত নন্দিত হয়, রসায়িত হয়—জন্মে ভক্তি। জীবন তখন সহজ হয়, অখণ্ড পরিপূর্ণতায় গভীর হয়। আমার কর্মে তখন তাঁরই সত্যসংকল্পের রূপায়ণ, আমার বোধে তাঁরই সব-ছাওয়া সব-মেলানো সব-ছাপানো চৈতন্যের দীপ্তি, আমার হৃদয়ে তাঁর অকারণ অবারণ সহজানন্দের হিল্লোল।

যেমন কর্ম দিয়ে, তেমনি আবার জ্ঞান দিয়েও সাধনা শুরু করা যায়। ঈশ্বর তিনি প্রকাশ হয়েছেন বিচিত্ররূপে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করে তাঁকে জানতে হবে। এই জানা মনের জানা নয়, বিজ্ঞানের জানা—বাইরে-ভিতরে ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সব-কিছুকে অন্তঃসত্তায় রসিয়ে জানা। তখন জানা মানে হওয়া : সবাইকে ছাপিয়ে থেকে সবার সঙ্গে এক

হওয়া—ছন্দে, সৌষম্যে, অবিরোধে। এই এক হওয়া আনে শক্তির বোধ। জানি, তিনি শুধু প্রজ্ঞা নন, তিনি প্রাণও। তাঁর প্রজ্ঞা প্রাণে স্পন্দিত। সে-স্পন্দন তাঁর সঙ্কল্প, আমার কর্ম। এমনি করে প্রজ্ঞা উৎসারিত হয় সহজ ও সুন্দর কর্মে। তা-ই সৃষ্টির আনন্দ। আর সেই আনন্দ যুগল সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে ফোটে প্রেম হয়ে। সূর্যের প্রেম আনন্দে ঝরে পড়ে সূর্যমুখীর 'পর, সূর্যমুখীর মধুর আকৃতি উচ্ছলিত হয়ে ওঠে সূর্যের দিকে। প্রজ্ঞা প্রাণ আর প্রেমের ত্রিবেণীসঙ্গমে জীবন হয় পুণ্যতীর্থ।

আবার কখনও-কখনও সাধনার শুরু হয় প্রেম দিয়ে। আমার সমস্ত সত্তাকে তিনি আকর্ষণ করেন আচম্বিতে। আমার হৃদয় উথলে ওঠে, আমি গোপীর মত বিবশ হয়ে কূল ছেড়ে অকূলে ঝাঁপ দিই। তাঁকে পাই তিলে-তিলে, পাই ঝলকে-ঝলকে, পাই সাগর-জোয়ারের কূলছাপানো প্লাবনে। আর সে-পাওয়াও তো জানা। জানি সব দিয়ে, 'সর্বভাবেন', সব রসে রসায়িত হয়ে —শুধু তটস্থ বৃত্তি দিয়ে নয়। আবার জানি বিশালের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে বিশাল হয়ে, আলো যেমন আকাশকে জানে তেমনি করে—শুধু আত্মরতির সঙ্কীর্ণ পল্বলে তুফান তুলে নয়। হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে তাঁকে জানি বলেই নাড়ীতে-নাড়ীতে অনুভব করি তাঁর শক্তির স্রোত: তিনি সঙ্কল্প (will), আমি তাঁর সাধনা (execution); তিনি অধ্যক্ষ পুরুষ, আমি তাঁর সমর্থা প্রকৃতি। প্রেমের ভিতর দিয়েও আবার তেমনি পৌঁছই প্রেম প্রজ্ঞা আর প্রাণের ত্রিবেণীসঙ্গমে।

*

জ্ঞান কর্ম আর ভক্তিতে কোনও বিরোধ নাই, এই ধারণাকে পাকা করে নিয়েই পূর্ণযোগীকে ভক্তির পথে অগ্রসর হতে হবে। এদেশে জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে প্রায়ই দেখি অহি-নকুলের সম্পর্ক। জ্ঞানের উত্তুঙ্গতার গর্বে জ্ঞানপন্থীরা অনেকসময় ভক্তিপন্থীদের অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে দেখেন, যেন যারা মন্দবুদ্ধি এবং নিম্নাধিকারী, ভক্তির মাতলামি তাদেরই জন্যে। অপরিশুদ্ধ পাত্রে ভক্তিরস সহজেই গেঁজে উঠতে পারে এবং ওঠেও—একথা সত্য। কিন্তু মতুয়ারির (dogmatism) সঙ্কীর্ণতা কি জ্ঞানপন্থীদের মধ্যেও নাই? বুদ্ধির কাছে হৃদয়কে খাটো করে পরিপূর্ণ পাওয়ার একটা দিকের প্রতি তাঁরাও

কি অন্য নন? কাঁচা অবস্থায় সব সাধকের মধ্যে কিছু-না-কিছু ন্যূনতা থাকে। কিন্তু শেষ পরিণাম না দেখে কোনও পন্থার প্রতি কটাক্ষ করা তাবলে সংগত হয় না।

জ্ঞানপন্থীর গর্ব, তিনি অদ্বৈতবাদী—ভক্তের দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের চাইতে খাটো। কিন্তু পরমার্থতত্ত্ব যেমন এক, তেমনি আবার দুই ও বহু। উপাস্য-উপাসকের দ্বৈতকে ধরে ভক্ত পৌঁছন পরমমিলনের অদ্বৈতে, আবার সেই অদ্বৈতের মধ্যে তোলেন দ্বৈতলীলার তরঙ্গ। তত্ত্বত যা এক, লীলায় তা যুগল বা ব্যূহ—পরমার্থের এই তো স্বরূপ। এক্ষেত্রে এক আর দুয়ে বা বহুতে বিরোধের সৃষ্টি করা বস্তুত অজ্ঞানমানসের পরিচয়।

জ্ঞানের পথ সাধারণত বিচারের পথ, 'নেতি নেতি' বলে সব-কিছু ছেঁটে ফেলে এক বা শূন্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ। পথের শেষে জ্ঞানপন্থী যা পেলেন, তার তুলনায় যা-কিছু ছেড়ে এসেছেন তা তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে। কিন্তু তুচ্ছতাবোধও তাঁর মনের মায়া। জ্ঞানের পরিপাকে কোথাও তুচ্ছতাবোধ থাকে না, 'নেতি নেতি'র স্বাভাবিক পর্যবসান হয় 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই অনুভবে। পরমার্থকে তখন আর সবিশেষ-নির্বিশেষ সগুণ-নির্গুন বা ক্ষর-অক্ষরে ভাগাভাগি করতে পারি না। দেখি, তিনি ক্ষরও অক্ষরও, আবার ক্ষরকে ছাপিয়ে এবং অক্ষরকে রসিয়ে পুরুষোত্তমও। জ্ঞান আর ভক্তি দুয়েরই চরম এই পুরুষোত্তমকে পাওয়ায়।

জ্ঞানপন্থী যেমন ভক্তিপন্থীর উপর বিরূপ, তেমনি ভক্তিপন্থীও স্বচ্ছন্দে বলে বসেন, 'অভাগিয়া কাক মজে জ্ঞান-নিম্বফলে।' এও এক পাল্টা মতুয়ারি। জ্ঞানের বিচার যদি দুরাগ্রহবশত কেবল তর্কের প্যাঁচ-কসাকসি হয়, তাহলে তা যে নীরস এবং নিরর্থক তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্বোধির আকৃতিতে যে-জিজ্ঞাসার উদ্ভব, তার তর্পণেও চিত্ত আশ্বস্ত এবং রসায়িত হয়। তাছাড়া বিচার বিবেক বৈরাগ্য এগুলি ভক্তিপথেরও গোড়ার সাধন; হৃদয়ের রাস টানবার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। গীতাতেও আর্ত এবং অর্থার্থীর সঙ্গে জিজ্ঞাসু ভক্তকে উদার বলে জ্ঞানী ভক্তকে বলা হয়েছে পুরুষোত্তমের আত্মস্বরূপ। 'আমি অতশত বুঝি না, শুধু ভালবাসি'—ভক্তের এই উক্তি লোকোক্তি মাত্র, কেননা প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে পারাটাই যে হৃদয় দিয়ে বোঝা অতএব শুদ্ধবুদ্ধি দিয়ে বোঝা।

*

জ্ঞান ভক্তি আর কর্মে যে কোনও বিরোধ নাই, তা পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপ থেকেও বোঝা যায়। ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হল সৎ চিৎ আনন্দ এবং শক্তি। জ্ঞানযোগের আলোচনার সময় দেখেছি, এই ব্রহ্মকে যুগনদ্ধ পুরুষ-প্রকৃতির দ্বিদলরূপে আমরা দেখতে পারি এবং সে-দেখাতেই ব্রহ্মোপলব্ধির পূর্ণতা। তখন ব্রহ্মের সদ্ভাব এবং চিদ্ভাবকে বলতে পারি তাঁর পুরুষস্বভাব এবং আনন্দ ও শক্তির উল্লাসকে বলতে পারি তাঁর প্রকৃতিস্বভাব। আমরা জ্ঞানযোগের দ্বারা বিশেষ করে অনুসন্ধান করি ব্রহ্মের সদ্ভাব বা তাঁর প্রপঞ্চোপশম এবং প্রপঞ্চাধিষ্ঠান প্রশান্তিকে, আবার ব্রহ্মের চিদ্ভাব বা তাঁর সাক্ষিচৈতন্য এবং সৃষ্টির প্রয়োজক তপঃশক্তিকে। ব্রহ্ম বিশ্বের অতীত থেকেই বিশ্বের অধিষ্ঠান প্রকাশক এবং প্রয়োজক—যেমন আকাশ আর সূর্যের মত, এই হল জ্ঞানীর ব্রহ্মোপলব্ধির স্বরূপ। ব্রহ্ম সত্তায় আকাশের মত এবং চৈতন্যে সূর্যের মত—তাঁর পুরুষভাবের এই উপমা। কিন্তু আকাশ আর সূর্য যেমন তাঁর স্বরূপের সত্য, তেমনি ওই উপমার জের টেনে বলা যায়: পৃথিবীও তাঁর স্বরূপের সত্য। বৈদিক ঋষিদের ভাষায়, দ্যাবা-পৃথিবীর মিথুনে ব্রহ্মের অখণ্ড স্বরূপের পরিচয়। পৃথিবী হল সৃষ্টি বা প্রপঞ্চের উপলক্ষণ। সৃষ্টিতে ব্রহ্মই নিজেকে উৎসারিত করেছেন—আনন্দে; আর এই সৃষ্টির লীলায় তাঁর শক্তির প্রকাশ। শক্তির মূলে রয়েছে তাঁর কামনা বা সংকল্প। আমরা ভক্তিযোগে উপলব্ধি করতে চাই তাঁর আনন্দকে এবং কর্মযোগে তাঁর শক্তি ও সঙ্কল্পকে। তাঁর সত্তা আর চৈতন্যের সঙ্গে এই আনন্দ আর শক্তির কোনও বিরোধ থাকতে পারে না। আমাদের প্রাকৃতভূমিতে তাঁরই অখণ্ড স্বরূপের অনুস্যূতি: তাইতে দেখি, অত্যন্ত সহজভাবে আমাদের অস্তিত্ব বিচ্ছুরিত হচ্ছে দ্রষ্টৃত্বে ভোক্তৃত্বে এবং কর্তৃত্বে। চারটির সেখানে অন্যোন্যবিরোধ নাই, আছে সৌষম্য এবং সমন্বয়। তবে প্রাকৃতভূমিতে সীমার বেষ্টনে তাদের প্রবৃত্তি (functioning) কুণ্ঠিত, আর ব্রহ্মোপলব্ধির আনন্ত্যে তারা অকুণ্ঠিত। কিন্তু এখানে-ওখানে কোথাও তাদের মধ্যে বিরোধ নাই। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধি যদি অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য হয়, তাহলে জ্ঞান ভক্তি কর্মের মাঝেও কোনও বিরোধ থাকতে পারে না।

২

ভক্তির প্রয়োজন

মহাজনেরা বলেন, ভক্তির লক্ষ্য হল ভগবানকে পাওয়া। তাঁকে পেলে আমাদের মধ্যে তাঁর আনন্দস্বভাবের স্ফূর্তি হয়। আনন্দ সম্বন্ধে বিলসিত হয়ে হয় প্রেম—আমরা স্বভাবের প্রেরণায় তাঁকে ভালবাসি। যেখানে স্বভাবের স্ফূর্তি, সেখানে হেতুর কোনও প্রশ্ন ওঠে না : ভালবাসা আমাদের স্বভাব বলেই তাঁকে আমরা ভালবাসি। সুতরাং শেষপর্যন্ত এই অহৈতুক প্রেম আমাদের ভক্তির 'প্রয়োজন' বা প্রবর্তক (motive)।

কিন্তু অহৈতুক প্রেম হল শেষের কথা, যখন জীব তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনকার কথা। তার আগে তাকে সাধনার যে-ধাপগুলি পার হতে হয়, তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নিই।

*

চেতনার উন্মেষের একটা পর্বে জীব যখন আত্মসচেতন হয়, তখনই সে মানুষ। আত্মসচেতনতার সঙ্গে-সঙ্গে তার মধ্যে জাগে বৃহতের চেতনা। যে-প্রকৃতি তার অনুভব এবং ব্যবহারের ক্ষেত্র, তাথেকে আলাদা করে নিজের মধ্যে নিজেকে সে যেমন অনুভব করে, তেমনি অনুভব করে প্রকৃতিকে ছাপিয়ে একটা বৃহত্তর শক্তিকে। সে সসীম, আর এই শক্তি অসীম; সে নিয়ম্য, আর এই শক্তি তার নিয়ন্তা। এই শক্তির প্রতি তার যে নির্ভরের ভাব এবং তার ফলে তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার জন্য তার মধ্যে জাগে যে উপাসনার প্রবৃত্তি, তাইতে মানুষের অধ্যাত্মবোধের শুরু। এই বোধের আদিম পরিচয় ভক্তিতে, কেননা প্রপত্তি বা নির্ভরতা হল ভক্তির প্রাণ।

বৃহতের প্রতি নির্ভরতার প্রথম প্রেরণা যোগায় মানুষের কামনা এবং ভয়। জীবনের যা অনুকূল তা চাই, যা প্রতিকূল তা চাই না—এ-প্রবৃত্তি আমাদের সহজাত। অনুকূল আর প্রতিকূলের অর্জন-বর্জন যতক্ষণ আমার শক্তির আয়ত্ত, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমার শক্তি যখন পরাভূত হয়, তখন

বাধ্য হয়ে আমাকে বৃহত্তর শক্তির শরণ নিতে হয়। এ-শক্তিকে আমি যে ঠিক ভালবাসি তা নয় : আমার চাইতে বড় বলে তাকে জানি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার উপর নির্ভর করি, আবার তার খামখেয়ালিকে ভয়ও করি। নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা তাকে তুষ্ট করা বা তার রোষ এড়ানো—এই হয় তখন আমার উপাসনার চেহারা। এও ভক্তি, কিন্তু সাংখ্যের ভাষায় ভয়ে তামসিক আর কামনায় রাজসিক ভক্তি। এর মূলে আদিম জৈবধর্মের তাগিদ, যার মধ্যে চেতনার মোড় ফেরানো রয়েছে বাইরের দিকে।

কিন্তু চেতনার উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ যেমন বাইরের জগৎকে যুক্তির শাসনে গুছিয়ে আনবার চেষ্টা করে, তেমনি অন্তরেও আত্মবোধকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। বাইরে-ভিতরে সব-কিছু তখন তার কাছে মনে হয় কার্য-কারণের শৃঙ্খলে বাঁধা। সঙ্গে-সঙ্গে বৃহত্তর শক্তির সম্বন্ধেও তার ধারণার পরিবর্তন হয়। আগে যে ঈশ্বর ছিলেন খামখেয়ালী, তিনি এখন ন্যায়পরায়ণ, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, কর্মফলের বিধাতা। তাঁর অনুগ্রহের প্রত্যাশা এবং নিগ্রহের ভয় তখনও থাকে, তবুও তাঁর প্রসাদ আর করুণার মুখ চেয়ে তাঁর প্রতি নির্ভরের ভাব আরও স্বচ্ছ হয়। বলা বাহুল্য, এও শুদ্ধা ভক্তি নয়।

প্রপত্তি যেমন অধ্যাত্মবোধের একটা মৌললক্ষণ, তেমনি তার আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে মহিমবোধ (sense of the sublime)। আত্মবোধ খানিকটা সুস্থিত হলে আমাদের মধ্যে এই মহিমবোধ জাগতে পারে। তার গোড়ার কথা হল চেতনার বিস্ফারণ। বৃহৎকে তখন আমি ভয় করি না, তার আবেশে আমিও উদ্দীপ্ত এবং বৃহৎ হই। মহিমা যদি আমায় অভিভূত করে, তাহলে ভক্তির যে-রূপ দেখা দেয় তার ইংরেজী সংজ্ঞা হচ্ছে awe—যা ভয়-ভালবাসার একটা মিশ্রণ এবং যার প্রতিশব্দ আমাদের দেশের ভক্তিশাস্ত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। মহিমবোধে চেতনার যে-উদ্দীপনা, তাহতেই সত্যকার অধ্যাত্মভাবনার শুরু : তার একটি পরিণাম জ্ঞানীর সাযুজ্যবোধে, আর আরেকটি পরিণাম ভক্তের সম্বন্ধতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা বা অন্তরঙ্গতার বোধে। তাঁর হয়ে তাঁর মহিমায় আমার মহিমা—এই হতে ভক্তিযোগের শুরু।

*

কিন্তু ভক্তিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের আপত্তিও আছে। একটি আপত্তি প্রকাশ পায় জড়বাদীর নাস্তিক্যে। জড়বাদীর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহলোকই

সত্য, লোকোত্তর মিথ্যা, বৃহত্তর কোনও শক্তির উপাসনা নিরর্থক। জীবনে অভ্যুদয় (welfare) চাই। তা আছে জড়শক্তিকে বশে এনে। জড়বিজ্ঞান তা-ই করছে। তার জন্য কারও উপাসনার তো কোনও প্রয়োজন নাই।...উত্তরে বলা চলে, শুধু অভ্যুদয়ই নয়, নিঃশ্রেয়সও (summum bonum) জীবনের লক্ষ্য। আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ এবং উৎকর্ষণও চাই। শুধু ভোগে তা হয় না, হয় যোগে। যোগে যে বিবিক্ত আত্মচৈতন্যের অনুভব পাই, তাও সত্য, তাও আমাদের পুরুষার্থ। আত্মানুভবের স্পষ্টতা হতে আসে আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ, বৃহতের অনুভব। সান্ত চৈতন্যের উৎসরূপে আবিষ্কার করি অনন্ত চৈতন্যকে—যেমন সান্ত জড়শক্তির মূলে বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন অনন্ত জড়শক্তিকে। আনন্ত্যের বোধ উভয়ক্ষেত্রে সমান : তবে একক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষ এবং চিৎপ্রকর্ষের হেতু, আরেকক্ষেত্রে নিঃসাড় অনুমান মাত্র। নিজেকে মানি এবং জানি বলেই ভগবানকে মানি এবং তাঁর উপাসনা করি। না মানলে আপাত-দৃষ্টিতে বাইরের কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু তাতে অন্তরের কার্পণ্য। সে-কার্পণ্যে শেষপর্যন্ত বাইরেও ক্ষতি।

আরেকটা আপত্তি জ্ঞানপন্থী নেতিবাদীর। অন্তরাবৃত্তির পথে পরমার্থের (Supreme Being) স্বরূপ আবিষ্কার করতে গিয়ে 'নেতি নেতি' বলে তিনি সব-কিছু ছাপিয়ে পেঁছান এক প্রপঞ্চোপশম নির্বিশেষ অব্যবহার্য নৈঃশব্দ্যে। এই তো চেতনার তুঙ্গতম ভূমি, তার পরে আর কিছুই নাই। সুতরাং এ-ই পরম সত্য। কিন্তু এ-সত্যে অবগাহন করাই চলে, তার উপাসনা করা চলে না। নির্বিশেষ বলেই এ-সত্য জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। ভালবাসা জীবনের ধর্ম, সম্বন্ধতত্ত্বে তার উল্লাস। কিন্তু এখানে শুধু 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'। তারও একটা আকর্ষণ আছে, আবেশ আছে, অতএব সম্বন্ধের কিছুটা আভাস আছে সত্য; কিন্তু সে-সম্বন্ধ বিনাশের—সম্ভূতির নয়, উপশমের —উল্লাসের নয়।

জ্ঞানীর এই অবর্ণ অনুভব মিথ্যা নয়, কিন্তু অখণ্ড সত্যের সবখানিও নয়। অবর্ণ যেমন সত্য, তেমনি বহুধা বর্ণের বিকিরণও সত্য। যেমন আকাশ, তেমনি আবার দ্যুলোকে আদিত্যের প্রভা, অন্তরিক্ষে ইন্দ্রধনুচ্ছটা, পৃথিবীতে বর্ণের সমারোহ। সব নিয়েই সত্য অনির্বচনীয়। জ্ঞানীর যিনি অক্ষরব্রহ্ম, তিনিই ভক্তের পুরুষোত্তম। তাঁকে ভালবাসা যায়, সব দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়—যেমন সব হারিয়ে তাঁর মধ্যে নিঃশেষ হওয়াও যায়।

ভক্তিবাদ তাহলে এইকয়টি অভ্যুপগমের উপর প্রতিষ্ঠিত :

(১) পরমার্থ শুদ্ধ নির্বিশেষ সন্মাত্র নন, তিনি চিন্ময় পুরুষও; (২) যেমন তিনি বিশ্বাতীত, তেমনি আবার বিশ্বাত্মকও—তাঁকে ওখানে-এখানে দুখানেই পাওয়া যায়; (৩) যেমন তিনি অবিগ্রহ, তেমনি আবার সবিগ্রহও, সুতরাং তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করা চলে; (৪) তাঁকে ভালবাসলে পর তিনি সাড়া দেন। তাবলে তিনি মানুষের মত নন, যদিও ভক্তির প্রথম অবস্থায় তাঁকে আমরা আমাদের মত করে দেখি। অথচ মানুষের মধ্যে এ-জগতে তাঁর উৎকৃষ্ট প্রকাশ : সুতরাং বলতে পারি, এ-প্রকাশের চরম উৎকর্ষ যেখানে, সেখানে তিনি অমানব হয়েও পুরুষোত্তম। হৃদয় দিয়ে আমরা সেই পুরুষোত্তমকেই পেতে চাই। সে-চাওয়ায় তিনি সাড়া দেন, হৃদয়ে এসে আসন পাতেন।

আবার তিনি বিশ্বাত্মক বলে বিশ্বের সঙ্গে আমরা যে-যে সম্বন্ধ স্থাপন করি, তাঁর সঙ্গেও সেসব সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বস্তুত, বিশ্বের কোনও-কিছুকে চাওয়ার অর্থ তার ভিতর দিয়ে তাঁকেই চাওয়া। 'যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে', তার চরমে তাঁরই আনন্দস্বরূপের আস্বাদন। হৃদয়ের যে-কোনও তৃষ্ণার তৃপ্তি ভাবের উদ্‌বোধনে—বস্তু তার উপলক্ষ্য মাত্র। 'সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া, সেই তো দেখা সেই তো পাওয়া' : তাইতে রসিকের অনুভবে 'যাঁহা-যাঁহা দৃষ্টি পড়ে, তাঁহা-তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'।

সমস্ত জীবনই একটা যোগের সাধনা : সে-যোগ ভূমার সঙ্গে অল্পের, পূর্ণের সঙ্গে অপূর্ণের। 'সাগর যেমন সদা গো টানে নদীর পরাণ'—তেমনি অসীমের আকর্ষণ সীমার অন্তরে-অন্তরে। সে-আকর্ষণে সীমার মধ্যে যে 'হিয়াদগদগি পরাণপোড়নি', তারই নাম প্রেম। প্রেমই পরিপূর্ণ মিলনের দূতী। প্রত্যেক জীবের স্বভাবে তা নিহিত রয়েছে আত্মবিস্ফারণের আকূতিরূপে : নিজেকে পরিপূর্ণরূপে পাওয়ার অর্থই তো হল সেই পরমের মধ্যে অনিঃশেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলা। অন্তরাবৃত্ত চেতনায় এই আকূতি যখন জাগে, তখনই যোগের শুরু। মানুষ তখন আর-কিছু চায় না, চাইতে পারে না। অসীমকে সে তখন অসীমের জন্যই ভালবাসে, আর-কিছুর জন্য নয়। ভক্তি তখন অহৈতুকী, জীবের স্বভাবের সম্যক্ স্ফূর্তি। তখন তাঁরই জন্যে তাঁর আলোয় নিজেকে ফুটিয়ে তোলা ছাড়া তার আর কোন-কিছুর অপেক্ষা থাকে না। ভক্তিযোগের এই হল রহস্য।

ভক্তির পথে হৃদয় হল দিশারী, বুদ্ধি নয়। আগেই বলেছি, জ্ঞানের সঙ্গে

ভক্তির কোনও বিরোধ নাই; কিন্তু তবুও ভক্তি জানে হৃদয় দিয়ে, বুদ্ধির বিচার দিয়ে নয়। বিভজ্যদর্শী (analytic) বুদ্ধির অনেক বিরোধ অনেক সংশয়ের সমাধানকে পায় হৃদয়ের অখণ্ডগ্রাহিতা দিয়ে। এই অখণ্ডগ্রাহিতা বোধির ধর্ম; আর বোধি সম্যক্‌জ্ঞান এবং শুদ্ধা ভক্তি দুয়েরই সাধন। জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে কোন-কোনও বিষয়ে বিরোধের সৃষ্টি করে বুদ্ধির একদেশ-দর্শিতা; যেমন, পরমার্থ অরূপ না সরূপ, এক না দুই—এ নিয়ে জ্ঞানপন্থী আর ভক্তিপন্থীর যে-ঝগড়া আসলে তা বুদ্ধির দোষে। এ-বিরোধ অভ্যুপগমের (postulate); যা ধরে পথ চলতে শুরু করব, তা-ই নিয়ে মতান্তর। কিন্তু পথ চলতে-চলতে দৃষ্টি যত উদার হয়, বোধির যত উন্মেষ হয়, ততই এ-বিরোধ আর থাকে না। তখন দেখি, যিনি অরূপ তিনিই রূপে-রূপে প্রতিরূপ—যেমন বস্তুতে, তেমনি ভাবে; যিনি লীলায় বহু, বিলাসে দুই, তিনিই আবার সাযুজ্যের পরমতায় এক।

৩

ভাবের সাধনা

আত্মচৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্যে রূপান্তরিত করার সাধনাই হল যোগ। ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ এবং শক্তি -স্বরূপ। চৈতন্য আনন্দ এবং শক্তির ক্ষুণ্ণতায় সত্তার সঙ্কোচ ও দৈন্য হল আমার প্রাকৃত রূপ। তার রূপান্তর আমার পরম-পুরুষার্থ। এই রূপান্তর সিদ্ধ হবে ব্রহ্মচৈতন্যের সংস্পর্শে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় এবং অবশেষে সাযুজ্যে। ভক্তির পথে এই সাযুজ্য সিদ্ধ হয় ভাবের (emotion) দ্বারা। ব্রহ্মের চিৎস্বরূপের অভিব্যক্তি যেমন আমাদের জ্ঞানে, শক্তিস্বরূপের অভিব্যক্তি সঙ্কল্পে এবং কর্মে, তেমনি আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি ভাবে। নির্বিশেষ আনন্ত্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার দিকে যেমন জ্ঞানের ঝোঁক, তেমনি ভাবের ঝোঁক হল বিশেষকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে তারই মধ্যে আনন্ত্যের আস্বাদনের দিকে। একটি পুরুষের ধর্ম, আরেকটি প্রকৃতির। প্রকৃতির কাছে বস্তু রূপ গুণ ক্রিয়া সবই সত্য। তাই এই সব নিয়ে ভক্তির সাধনা—আনন্ত্যের প্রতি উন্মুখ ভাবকে আশ্রয় ক'রে।

আমাদের প্রাকৃতজীবন বুদ্ধির চাইতে ভাবের দ্বারা বেশী শাসিত, একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে। কিন্তু সচরাচর এই ভাব অবিশুদ্ধ অর্থাৎ এতে সঙ্কোচ চাঞ্চল্য এবং মূঢ়তার ভেজাল আছে। অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষের সময় মানুষ এই অবিশুদ্ধ ভাব নিয়ে বৃহতের উপাসনা করে। আগেই বলেছি, তার একটি বিশিষ্ট রূপ হল ভয়। ভয় অধ্যাত্মবোধের একমাত্র প্রযোজক না হলেও সর্ব-সাধারণের মনের অনেকখানি যে সে জুড়ে আছে, তা মিথ্যা নয়। কোন-কোনও ধর্মে ভয়কে শেষপর্যন্ত জিইয়ে রাখা হয়, ঈশ্বরভীরু মানুষ তাদের আদর্শ। মহিমবোধ সব ধর্মের মূলে। কিন্তু বৃহতের মহিমাকে বোধ ক'রে আমার চেতনা যদি উদ্দীপ্ত না হয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে, তাহলে ধর্মভাবের মধ্যে দেখা দেবে ভয় এবং তার অনুষঙ্গে আত্মদৈন্য এবং পাপবোধ। ভয় আর পাপবোধ যেসব ধর্মে প্রধান, তারা বৃহতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে নিরঙ্কুশ শক্তির রূপ। এই শক্তি যখন দুর্জ্ঞেয়, ভগবান তখন খামখেয়ালী। কিন্তু শক্তির মধ্যে মানুষ যখন কার্য-কারণের শৃঙ্খলা আবিষ্কার করে, ভগবান তখন বিধাতৃ

পুরুষ, বিশ্বের রাজা, মানুষের দণ্ড-পুরস্কারের দাতা। পাপবোধের অসহায়তা হতে আসে অপরাধক্ষমাপনের ভাব, তাহতে জাগে করুণার প্রত্যাশা; ভগবান তখন পতিতোদ্ধারণ ত্রাতা। তিনি তখন অগতির গতি, মানুষের জীবনের পরম নির্ভর। ভয়ের ভাব এমনি করে অবশেষে পর্যবসিত হয় শরণাগতিতে। কিন্তু যে-অজ্ঞান থেকে ভয়ের উৎপত্তি, তার একটা সূক্ষ্ম সংস্কার তখনও ভাবের মধ্যে থাকে বলে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের দূরত্ব কিছুতেই যেন ঘুচতে চায় না।

এদেশের ভক্তিসাধনা কিন্তু গোড়া হতেই আশ্রয় করেছে ভয়ের দূরত্বকে নয়, সম্বন্ধের অন্তরঙ্গতাকে। মানুষ 'পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ', আদিদুরিতের (original sin) অমোচন লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত—এই তামসিক ভাবনার স্থান আর্যদর্শনে নাই। তার কর্ম জ্ঞান ভক্তি সব সাধনারই মূলে এই প্রত্যয়—মানুষ অমৃতের পুত্র। তার কর্মবাদ ভগবানকে পাপ-পুণ্যের বিচারের ভার হতেও অব্যাহতি দিয়েছে। সুতরাং তার ভগবান্ অন্তর্যামী নিয়ন্তা এবং প্রভু হলেও ভক্তের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভয়ের নয়, দূরত্বের নয়—ভালবেসে কাছে পাবার। আমার কর্মের তিনি তটস্থ বিচারক নন, তার অধ্যক্ষ। আমার ধর্মাধর্মের প্রবৃত্তির মূলে তাঁরই প্রেরণা এবং তা প্রতিনিয়ত আমাকে প্রচোদিত করছে নিশ্চিত শ্রেয়ের দিকে।

সেমিটিক ধর্মভাবের সঙ্গে আর্য ধর্মভাবের শুরুতে এই তফাত। আগেও বলেছি, মহিমবোধ এবং আত্মবোধ হল অধ্যাত্মভাবনার মূলে। আর্যভাবনায় এই আত্মবোধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, বৃহতের সঙ্গে সাযুজ্যবোধের একটা অকুণ্ঠ প্রত্যয় তার মধ্যে দেখা দিয়েছে একেবারে প্রথম থেকে—আকাশভাবনা এবং আদিত্যোপাসনার ফলে। তাইতে তার ভক্তিবাদে সেমিটিক ঈশ্বরভীরু পুণ্যাত্মার আদর্শের চাইতে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ঈশ্বরপ্রেমিক অকুতোভয় সর্বভূত-হিতরত শুদ্ধাত্মার আদর্শ।

*

ভাব (emotion) আর সঙ্কল্প (will) দুইই প্রকৃতির ধর্ম এবং তারা অন্যোন্যসম্বন্ধ। অবিশুদ্ধ প্রকৃতিতে ভক্তির প্রয়োজকরূপে ভাবের দিক দিয়ে যেমন দেখা দেয় ভয়, তেমনি সঙ্কল্পের দিক দিয়ে দেখা দেয় কামনা

(desire)। ভয় অথবা কামনা নিয়ে ভগবানকে যারা ভক্তি করে, তাদের ভক্তি এখনও যোগ হয়ে ওঠেনি। গীতার আর্ত এবং অর্থার্থী ভক্ত যথাক্রমে এইশ্রেণীর।

কামনা আর সঙ্কল্পে তফাত আছে। যে অশক্ত, সে-ই কামনা করে; যে শক্ত এবং সমর্থ, সঙ্কল্প তার। মহত্তর শক্তির সঙ্গে যখন সাযুজ্য অনুভব করি, তখন কামনা রূপান্তরিত হয় সঙ্কল্পে। তখন আমার আর চাইবার কিছু থাকে না; অনুভব করি, আমার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছাতে লয় হয়ে গেছে, আমি তাঁর সত্যসঙ্কল্পের বাহন। ভক্তি তখন অহৈতুকী, কর্ম সেবা, কর্তা তাঁর নিমিত্তমাত্র।

কামনা জীবনের মূলে, তাকে ছাড়া যায় না; কিন্তু তাকে শোধিত এবং রূপান্তরিত করা যায়। মহাজনেরা দুরকম কামনার কথা বলেন—অসতী কামনা, আর সতী কামনা। অবিদ্যাচ্ছন্নের কামনা অসতী; আর বিদ্যার অভীপ্সা জেগেছে যার মধ্যে তার কামনা সতী। ভগবানের কাছে 'এটা চাই ওটা চাই' যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ চাওয়াটা অসত্য। যখন বলতে পারি 'শুধু তোমাকেই চাই', তখনই চাওয়া সত্য হয়ে ওঠে, কেননা এ-চাওয়া স্বরূপের চাওয়া, তার একটা নিশ্চিত সার্থকতা আছেই।

কিন্তু এটা-ওটাও তো চাই, নাহলে সংসার চলবে কি করে? ভক্ত বলেন, 'সে-ভাবনা আমার নয়, যাঁর সংসার তাঁর। তিনি যা দেন আমি তাতেই খুসী। সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে তাঁকে যেন না ভুলি, আমার চাওয়া শুধু এইটুকু—আর-সব দায় তাঁর। কিন্তু এও দেখি, যে খায় চিনি, তারে যোগান চিন্তামণি। গীতাতেও তিনি বলছেন, সমস্তক্ষণ আমার দিকে মনখানি যে ফেলে রেখেছে, তার যোগ-ক্ষেম আমিই বহন করি।'

এ হল ভাবের কথা। কিন্তু তার মূলে যুক্তিও আছে। চিৎপ্রকর্ষই একমাত্র পুরুষার্থ এই অন্তর্লক্ষ্য যার স্থির হয়ে গেছে, বাইরে-ভিতরে সব-কিছু তার গুছিয়ে আসে। সে তখন দেখে, সব ঘটনার এক অর্থ—শুধু ভিতরটাকে জাগিয়ে তোলা, ভরিয়ে তোলা, রসিয়ে তোলা। অনুকূল-প্রতিকূলে তখন ভেদ ঘুচে যায়, সব অবস্থাই হয় অনুকূল। তাইতে চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্ন আর তখন থাকে না। জ্ঞানীর নিঃস্পৃহতা, ভক্তের আত্মসমর্পণ, কর্মীর ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জন—সবার মূলে ওই কথা।

তবুও একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, উপাসনায় প্রার্থনার সার্থকতা কি?

প্রার্থনায় কি কেউ সাড়া দেয়? চাইলে কি পাওয়া যায়? প্রার্থনার কি কোনও শক্তি আছে?

উত্তরে বলব, প্রার্থনার শক্তি আছে বই কি। কিন্তু প্রার্থনা ঠিক মত হওয়া চাই, তার প্রকৃতি এবং পরিণাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। প্রথমেই বলা রাখতে পারে, অশান্ত চিত্তের প্রার্থনায় কোনও ফল হয় না—যদি বা ফল দেখা যায় তো প্রায়ই হয় কাকতালীয়বৎ। মনের মধ্যে নানারকমের চাওয়া আছে। কতকগুলি চাহিদা আমরা নিজের শক্তিতেই মিটিয়ে নিতে পারি। নিজের শক্তিতে যেখানে কুলয় না, সেইখানে ঊর্ধ্বশক্তির কাছে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই ঊর্ধ্বশক্তির স্বরূপ কি, আমাদের জীবনে তার কাজ হচ্ছে কিভাবে, আমরা তার কিছুই জানি না। এক্ষেত্রে প্রার্থনা শুধু অসহায় মনের একটা আকুলি-বিকুলিকে প্রকাশ করা মাত্র, তা বন্ধ দুয়ারের 'পরে মাথা ঠোকাও হতে পারে।

আসলে প্রার্থনার মূলে আছে একটা সংকল্পশক্তির প্রবেগ—'আমি চাইছি এই হ'ক।' কিন্তু বিশ্বের মূলে একটা বিরাট সংকল্প কাজ করছে, সমস্ত জগৎকে এক নিশ্চিত পরিণামের দিকে সে নিয়ে চলেছে। সেই সংকল্পের সঙ্গে আমার সংকল্পের সংগতি থাকে যদি, তাহলেই প্রার্থনা ফলবে।

বাইরের ঘটনা দেখে ঈশ্বরসংকল্পের রহস্য বোঝা কঠিন। জগতে কেন কি ঘটছে তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু তাঁর সংকল্প আমার জীবনে কি রূপ নিতে চাইছে, চেষ্টা করলে তা বোঝা যায়। এখানেও বাইরের ঘটনা মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে তার ধাক্কায় আমার অন্তরের কি পরিবর্তন হচ্ছে, তা-ই। পাথরে-পাথরে ঠুকলে যেমন আগুনের ফুলকি বেরয়, তেমনি বাইরের আঘাতে আমার মধ্যে আগুন ছুটুক, আমার জড়ত্ব আর চাঞ্চল্য চৈতন্যের স্থিরশিখা হয়ে জ্বলে উঠুক—বলা যেতে পারে, মানুষের জীবনে ঈশ্বরসংকল্পের এই হল সর্বজনীন রূপ। এটি যখন বুঝতে পারব, তখন আমাদের প্রার্থনার প্রকৃতি বদলে যাবে। তখন বলব, 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন করিতে পারি জয়।' কি দিয়ে জয় করব? স্থৈর্য দিয়ে তিতিক্ষা দিয়ে, তাঁরই শক্তি নিয়ে।

এই হতে প্রার্থনাযোগের শুরু। স্থৈর্যে চিত্ত অন্তর্মুখ হবে. ভিতরে আলো জ্বলবে। সেই আলোতে বুঝতে পারব, আমাকে আশ্রয় করে তাঁর সঙ্কল্প বাইরে-ভিতরে কি ঘটিয়ে চলেছে। যখন বুঝব, তখন বাইরের কাম্য সম্পর্কেও নিশ্চিত প্রার্থনা করতে পারব। সে-প্রার্থনা আর অজ্ঞানীর কামনা নয়, বিজ্ঞানীর

২২

সঙ্কল্প—যা ঈশ্বরসঙ্কল্পেরই প্রতিরূপ। বাইরে-ভিতরে আমার চাওয়া আর তাঁর চাওয়া তখন এক হয়ে যাবে। সে-চাওয়ায় থাকবে আলো আনন্দ আর শক্তি। তখনই প্রার্থনাযোগের সিদ্ধি।

*

গীতায় চার রকম ভক্তের কথা আছে। এতক্ষণ আর্ত আর অর্থার্থী ভক্তের কথা হল। আর দুরকম ভক্ত হলেন জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী। তাঁকে জানতে চাই, পেতে চাই, 'দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না'—এই জিজ্ঞাসা আর অভীপ্সা হতে ভক্তিযোগের শুরু। জানতে পাওয়াতে হওয়াতে তার সারা। গীতায় ভগবান বলছেন, আর্ত অর্থার্থী এবং জিজ্ঞাসু এই ভক্তেরাও উদার, তবে কিনা জ্ঞানী ভক্ত আমার আত্মস্বরূপ।

কিন্তু ভক্তির জানা আর পাওয়া হৃদয় দিয়ে। ভাব হল তার সাধন। মানুষের যতরকম ভাব আছে, সবারই ঊর্ধ্বায়নে (sublimation) তাঁকে পাওয়া যায়। ভালবেসে মানুষকে যেমন সহজে বুকের কাছে পাই, তেমনি করে তাঁকেও পেতে পারি।

অসংখ্য ভাব, বিচিত্র তাঁকে আস্বাদন করবার আনন্দ। তবুও তাদের কয়েকটি জাতিরূপে (type) ভাগ করা যায়। মহাজনেরা বলেন পাঁচটি ভাবের কথা—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর। চিৎপ্রকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে হ্লাদিনীবৃত্তির তারতম্য হয়, সেই অনুসারে এই ভাবগুলির একটা পর্যায় আছে। ভাব উত্তরোত্তর যত গাঢ় হয়, ততই তার মধ্যে দেখা দেয় বৈচিত্র্য, পরের ভাব আগের ভাবগুলিকে আত্মসাৎ করে নেয়। অবশেষে মধুর ভাবের মধ্যে জাগে সমস্ত ভাবের অসমোর্ধ্ব (unparalled and unsurpassed) উল্লাস।

মানুষের ভাবই ভগবানে আরোপ করা হচ্ছে, কিন্তু তবুও দুটি ভাবের জাত আলাদা। মানুষের বেলায় ভাবে-ভাবে বিরোধ থাকতে পারে—কেননা ভাব সেখানে ব্যবহারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর ব্যবহারের মূলে রয়েছে দৃষ্টির সঙ্কোচ। বাবাকে বন্ধু করা কি বোনকে মা করা আমাদের কাছে বিসদৃশ ঠেকে। তাই একেকজন মানুষের প্রতি আমাদের একেক ভাব। কিন্তু ভগবানকে ভক্ত যুগপৎ সব ভাবেই ভাবতে পারেন। ভাব সেখানে উৎসারিত হচ্ছে চিন্ময়

স্বতঃসত্তার গভীর হতে, জৈব বা মানসভাবনার সঙ্কোচ সেখানে নাই, ব্যবহার সেখানে চিদ্‌বিলাস। তাই আনন্দে গলে গিয়ে ভগবানকে বলতে পারি : 'ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুঃ...ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব,' অথবা 'জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে!' ভাবের এই স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ এবং সংক্রমণ যেন শুভ্র সূর্যরশ্মির ইন্দ্রধনুছটায় বিকিরণ। ভগবদ্‌ভাব রজস্তমোলেশশূন্য শুদ্ধসত্ত্বের বিলাস, প্রাকৃত ভাব তা নয়।

ভাবের স্বরূপ সম্পর্কে এই কথা কয়টি বলার পর তাদের প্রকার নিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

*

আগেই বলেছি, অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ হয় মহিমবোধ থেকে। সুতরাং মহিমবোধ জ্ঞান ও ভক্তি দুয়েরই বীজ। বৃহতের আবেশে বৃহৎ হওয়াই যদি অধ্যাত্মচেতনার সমগ্র পরিণাম হয়, তাহলে মহিমবোধ হতে সাধক কখনও চ্যুত হতে পারে না। মাধুর্যপিপাসু অনেক ভক্তের ঐশ্বর্যের প্রতি একটা বিরূপতা দেখা দেয়। সাধকের পক্ষে এবং জনসাধারণের পক্ষেও এই বিরূপতা স্বাস্থ্যকর নয়। এদেশের প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রেও তার সমর্থন নাই। নারদ স্পষ্টই বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীর ভালবাসার মূলে যদি মহিমবোধ না থাকত, তাহলে তা জারের প্রতি ভালবাসার ঊর্ধ্বে উঠত না। সব মা-ই সন্তানকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে; কিন্তু তারা সবাই যশোদা বা মেনকা তো নয়।

মহিমবোধ থেকে জাগে শান্তভাব। ভাগবতের ভাষায় তা নির্গ্রন্থ মুনির আত্মারামতা। একদিক দিয়ে এ যেমন জ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য, তেমনি ভক্তিরও ভিত্তি। মহাজনেরা বলেন, প্রশান্ত ও নির্মল চিত্ত দর্পণের মত মসৃণ হলে তবেই সে প্রেমসূর্যের অংশুকে ধারণা করতে পারে। ভাব প্রশমেরই উল্লাস, উন্মত্ততা নয়। সমুদ্রের উপরে যত তরঙ্গভঙ্গ, গভীরে ততই স্তব্ধতা। এককথায় প্রশান্ত ভাবই সমস্ত ভাবের অধিষ্ঠান। এই কথাটি বুঝতে পারলে জ্ঞান আর ভক্তির মাঝে বিরোধ কল্পনা করবার কোনও দরকারই হয় না।

শান্তের পর দাস্য। সম্বন্ধই (mutual relatedness) হল ভক্তির প্রাণ। দাস্যে সম্বন্ধ স্ফুটতর হয়, শান্তের প্রসন্নতায় লাগে মাধুর্যের রং। দাস্যের মধ্যে মহিমবোধ প্রকট : ভগবান বড় আমি ছোট; তিনি বিধাতা আমি

বিধেয়—এই হল দাস্যের মূল ভাব। এ-ভাবের তিনটি পর্যায় আছে—প্রবর্ত সাধক এবং সিদ্ধ। আর্ত এবং অর্থার্থী ভক্তের ভাব দাস্যের অন্তর্গত, কিন্তু ভক্ত সেখানে প্রবর্তমাত্র। ঈশ্বরভীরুর দাস্যভাবকে বলতে পারি সাধকভাব। আর সিদ্ধ দাস্যভাবে আমি ছোট হলেও ভগবান আমার বড় আপন, বড় কাছে। ভালবাসায় তাঁর পায়ে আমি বিকিয়ে গেছি, তিনি ছাড়া আমার কেউ নাই কিছুই নাই—এই একান্ত সমর্পণে দাস্যের মাধুরী।

অন্তরঙ্গতার নিবিড়তা অনুসারে এর মাঝে আবার তিনটি ভাবের স্ফূর্তি হতে পারে। প্রথম ভাবে ভগবান আমার অন্তর্যামী, আমার প্রভু, আমার গুরু। তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, আমার সমস্ত কর্মের তিনি প্রয়োজক এবং অধ্যক্ষ, তিনি শাস্তা আমি প্রপন্ন শিষ্য। আমার কর্ম তাঁরই অর্চনা। গীতায় এই ভাবটি সুন্দর ফুটে উঠেছে।

আরও অন্তরঙ্গ ভাব হল পিতার প্রতি। এখানে যেন নাড়ীর যোগ। হিব্রীয়ধর্মে এই ভাবটি পরিস্ফুট। বৈদিক ধর্মেও এর উদ্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু এদেশে ভগবানের প্রতি পিতৃভাবকে ছাপিয়ে উঠছে মাতৃভাব। পিতার চাইতে মাতা আরও কাছে। পিতা অধ্যক্ষ, কিন্তু মাতা প্রসূতি—দেহে প্রাণে মনে চেতনায় আমি একান্তভাবেই মায়ের। আশ্রয়-আশ্রয়িভাব যেখানে মুখ্য, সেখানে মায়ের অতল অপার স্নেহে আর শিশুর সহজ অনিঃশেষ আত্মসমর্পণে যে-মাধুরী ফুটে ওঠে, তার তুলনা নাই। অন্তরাবৃত্তি যদি অধ্যাত্মচেতনার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হয়, তাহলে আমাদের প্রমত্ত অহংকে আবার শৈশবের সারল্যে ফিরিয়ে নিতে পারাকে একদিক দিয়ে অধ্যাত্মসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা বলা যেতে পারে।

দাস্যভাবের পর সখ্যভাব। এখানে আর 'তুমি বড় আমি ছোট' নয়, তুমি আর আমি সমানে-সমান। বৈদিক ভাবনায় এ-বোধ খুব স্পষ্ট ছিল, দেবতা সেখানে সাধকের 'সযুক্ সখা'। এই বোধই অবশেষে পর্যবসিত হয় অদ্বৈতবোধে : 'ওই আদিত্যে যে-পুরুষ আর এই হৃদয়ে যে-পুরুষ দুই-ই এক'। এ হল স্বরূপোপলব্ধির দিক, জ্ঞানের দিক। এই সাযুজ্যবোধ আবার বিলসিত হয় কর্মে এবং ভাবে। তখন সখ্যের আরও দুটি প্রকার দেখা দেয় —যেমন কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের প্রতি অর্জুন আর কৃষ্ণার সখ্য, আবার বৃন্দাবনের চিরকিশোরের প্রতি কিশোর গোপ আর কিশোরী গোপীর সখ্য। প্রথমটিতে মহিমবোধ কিছুটা উদ্রিক্ত, কিন্তু শেষেরটিতে তা সম্পূর্ণ বিগলিত। একটিতে

র ভগবানের কর্মসচিব, আরেকটিতে নর্মসচিব। তাঁর নিমিত্ত হয়ে একটিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করি, আরেকটিতে অনন্তকাল ধরে তাঁর সঙ্গে খেলা করি। একটিতে দেখি তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তির রূপ, আরেকটিতে তাঁর সুন্দররূপ।

সখ্যের পর বাৎসল্য। এখানে আবার বৈষম্য দেখা দিল—কিন্তু দাস্যের বিপরীতক্রমে। এবার তুমি ছোট, আমি বড়। তোমার মহিমা বিগলিত হয়ে গেছে, তুমি এখন ছোট্ট শিশুটি। ভোরের কাঁচ আলোর মত, ফোটো-ফোটো ফুলের কুঁড়ির মত। আছ বুক জুড়ে, লাবণ্যের জ্যোছনা হয়ে। যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা—আমার মমতায় তিলে-তিলে বেড়ে উঠবে। তোমার জন্য আমার ভাবনার অন্ত নাই। আমি না দেখলে তোমায় দেখবে কে! ঐ কপালে মুক্তার একটি বিন্দু, তা-ই যে সপ্তসিন্ধুর জোয়ার কি করে উথলে তোলে হৃদয়ের কানায়-কানায় বুঝতে পারি না।

'ঘরের ছেলের চক্ষেতে হেরি যে বিশ্বভূপের ছায়া'—এই ভাবটি এদেশের হৃদয়কে আবিষ্ট করে রেখেছে। এখানে শাক্ত-বৈষ্ণবের রাখিবন্ধন হয়েছে ঘরে-ঘরে উমাকুমারী আর বালগোপালের মেলায়।

সমস্ত ভাবের শ্রেষ্ঠ হল কিন্তু মধুরভাব—কান্ত আর কান্তার ভালবাসা। এই রসই আদিরস—যে-রসে এক দুয়ে বিলসিত, আবার দুই একে বিগলিত। যেমন শান্তভাব সব ভাবের আদি, তেমনি মধুরভাব সব ভাবের অবসান। দুটি মিলে একটি সম্পুট, তার মাঝে হিল্লোলিত হচ্ছে আর তিনটি ভাব মহিমবোধের তারতম্য নিয়ে। শান্তভাবের লোকাতিগতাই মধুর ভাবের লোকোত্তরতার প্রতিষ্ঠা। অখণ্ড সন্মাত্রে যেমন পুরুষ-প্রকৃতির দ্বিদল, তেমনি এই শান্ত আর মধুরের রস আর রতির দ্বিদল। আত্মারামের আনন্দ লীলাকৈবল্যে উৎসারিত হল রূপে। মিলন-বিরহের জোয়ার-ভাটায় সেই রূপের যে অন্তহীন প্রসার, তা-ই সত্তার পরম মাধুরী। তারই নাম কান্তপ্রেম, যার মধ্যে ভাবের সার্বসিদ্ধি।

৪

ভক্তিমার্গ

ভক্তি হৃদয়ের সহজ এবং একান্ত আকৃতি। তাই অন্যান্য যোগের মত তার সাধনার কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই: 'ওরে মন ভজ তারে ইচ্ছা হয় যে-আচারে'—এই তার রীতি। মহাজনেরা বিধিমার্গ আর রাগমার্গের কথা বললেও চিত্তের অকৈতব স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া বৈধী ভক্তিরও স্ফুরণ হয় না। কথায় বলে, 'ঘষে-মেজে রূপ আর ধরে-বেঁধে পিরীত হয় না।' এও তা-ই। সুতরাং ভক্তিসাধনার কোনও ছক না কেটে আমরা ভাবের বিবর্তনের একটা সাধারণ আলোচনাই এখানে করব।

অলোচনার সুবিধার জন্য ভক্তির ক্রমপরিণামকে দুই পর্বে ভাগ করা যেতে পারে—সাধনভক্তি আর ভাবভক্তি। আগেরটিতে যেন উৎসমুখের পাথর হটানো, আর পরেরটিতে তার স্বচ্ছন্দ প্রবহণ। সমস্ত প্রবাহটি চার পর্বে ভাগ করা যেতে পারে—পূর্বরাগ, বিরহ, সম্ভোগ আর ভাব-সম্মেলন।

সাধনভক্তির কথাই আগে বলি।

*

'আদৌ শ্রদ্ধা ততো রতিঃ'—সব যোগের এই মূল কথা। শ্রদ্ধা হল যেন ঊষার অরুণিমা, অনির্বচনীয়ভাবে তাঁর আভাস পাওয়া। অন্তরে তখন নিশ্চিত আশ্বাস জাগে, তবে আর আলো ফোটবার দেরি নাই। তখনই প্রাণে জাগে রতি বা ভালবাসার ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা রূপ নেয় উপাসনায়। তার আসল অর্থ হল ইষ্টের কাছে বসা, তাঁর নিত্যসামীপ্যের অনুভব। অনুভবকে জাগিয়ে রাখার জন্য প্রথম অবস্থায় কিছু বাহ্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হতে পারে, কেননা তাতে কর্মের প্রেরণায় ভাব অন্তরে দৃঢ়মূল হবার সুযোগ পায়। কিন্তু অনুষ্ঠান আন্তরিক না হলে সকলই বৃথা: ভক্তিপথে ভাবের ঘরে চুরির মত বিড়ম্বনা আর নাই। আবার বাহ্য অনুষ্ঠানকে চিরকাল আঁকড়ে থাকাও একটা ব্যসন। বাহ্য উপাসনা ক্রমে রূপান্তরিত হবে আন্তর উপাসনায়: হৃদয়মন্দিরে তাঁর যে নিত্য আসন পাতা সেইখানে চলবে তাঁর নিরন্তর

আরাধনা—উন্মুখ ব্যাকুলতা দিয়ে। অনুষ্ঠান যদি তখনও থাকে, তা হচ্ছে স্বচ্ছন্দ সাবলীল এবং একান্তভাবে ভাবের অনুগামী। আগে ছিল কর্মকে ধরে হয়ে যাওয়া, এখন হবে ভাবকে ছন্দোময় কর্মের রূপ দেওয়া।

উপাসনার সার্থক পরিণাম হল আত্মোৎসর্গে। তাঁকে সব দিতে হবে, নিজেকে দিতে হবে নির্মল নৈবেদ্যের রূপে। তাঁতে আর আমাতে যা-কিছু আড়াল, নির্মম আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা তা দূর করে তিলে-তিলে তাঁর হয়ে উঠতে হবে। আত্মরতির লাঞ্ছন হতে মুক্ত হৃদয় হবে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তার মধ্যে এসে পড়বে তাঁরই আলো—বিচ্ছুরিত হবে সকল ভাবে বাক্যে এবং কর্মে। দেহগত জীবনের অন্তর-বাইর হবে তাঁরই প্রতিমা।

উৎসর্গের দুটি ধারা—একটি কর্মের, আরেকটি ভাবনার। কর্মের উৎসর্গ ভক্তের মধ্যে হৃদয়ের আবেগে কখনও ধরে কর্মসন্ন্যাসের রূপ : সংসারবিরক্ত হয়ে অধরার সন্ধানে তিনি বেরিয়ে পড়েন দেওয়ানার মত, ভজন আর ইষ্টগোষ্ঠী ছাড়া তাঁর আর কোনও কাজই থাকে না—হয়তো ক্বচিৎ এই আত্যন্তিক বৈরাগ্য শিথিল হয় আর্তের সেবায়। কিন্তু কর্মের যথার্থ উৎসর্গ কর্মসন্ন্যাসে নয়,—কর্মের সমর্পণে, সংসারকে সহজভাবে গ্রহণ করে সব কর্মকেই তাঁর অর্চনায় রূপান্তরিত করাতে (গীতা)। তখন আর আমার কাজ নয়, তাঁর কাজ : হৃষীকেশ হৃদয়ে থেকে যে-কাজে লাগিয়ে দেন তা-ই করি—'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'।

তেমনি ভাবনার উৎসর্গ। তারও ঐকান্তিক (exclusive) এবং সম্যক্ (integral) দুটি রূপ আছে। কর্মসন্ন্যাসেরই মত ঐকান্তিক ভাবনা হল একাগ্রচিত্তে তাঁরই নাম-রূপের তৈলধারাবৎ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন। অবশ্য বৃত্তির নিরোধ তার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল বৃত্তির উল্লাস—নুনের পুতুলের সমুদ্রে গলে যাওয়া নয়, তার পাথর হয়ে জমে গিয়ে সমুদ্রের আনন্দদোলায় দোল খাওয়া। কিন্তু সম্যক্ উৎসর্গ আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। তার মধ্যে সমাধিতে আর ব্যুত্থানে ভাবনার ভেদ থাকে না। তখন চোখ বুজে যেমন ইষ্টকে হৃদয়ে পাই, তেমনি পাই চোখ মেলে। রূপে-রূপে দেখি তাঁরই প্রতিরূপ, ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বৃত্তি হৃদয়ের সমস্ত দোলন চিত্তের সমস্ত বিভঙ্গ দিয়ে আস্বাদন করি তাঁরই উন্মথন মহিমার মাধুরী। জীবন তখন সহজানন্দে চিন্ময়—অন্তরে-বাইরে সব-কিছুই 'হৃদি সন্নিবিষ্ট' সেই পরম পুরুষের তনুভা।

এইপর্যন্ত আমার চাওয়া পাওয়া। তারও পরে আছে তাঁর চাওয়া এবং তাঁর পাওয়া। আমি তাঁকে বরণ করি, তাতে আমার গোত্রান্তর। কিন্তু তিনি আমাকে যখন গ্রহণ করেন, আমার তখন রূপান্তর। সে-উল্লাস বিগলিতবেদ্যান্তর, অনির্বচনীয়। কলসীকে সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম—তার বাইরে সমুদ্র, অন্তরে সমুদ্র। অন্তর দিয়েই সে তার মত করে সমুদ্রের আস্বাদন পায়, বাইরের সমুদ্রের আভাসও কিছুটা পায়। কিন্তু এমন অসম্ভবও যদি সম্ভব হয়, অখিল সমুদ্র যদি অনিঃশেষে আবিষ্ট হয় ওই কলসীর মধ্যে : আর কলসী যদি কলসীই থাকে—না ভাঙে না গলে, অথচ তার অণুতে-অণুতে জাগে অসীমের উচ্চণ্ড বিস্ফোরণ। তখন কি হয়, তা মুখ ফুটে বলা যায় না। অতনু তনুর মর্মে-মর্মে তীক্ষ্ণতম সূচীভেদের দুঃখের মত সুখ, মিলনরভসের অসহন আনন্দের অতলে প্রেমবৈচিত্ত্যের অরুন্তুদ বেদনা। আর তারই মধ্যে রসের সায়রে রতির পরিমলে উতলা রূপের কমল।

এ হতে পারে, এ হয়। কখনও ভাবের আবেশ ঘটে সাধনার শেষে—প্রসাদরূপে, কখনও বা অসাধনে। কদম্বের বন হতে আচম্বিতে ভেসে আসে মনভোলানো কুলমজানো বাঁশির সুর, বয়ঃসন্ধির নিশ্চিন্ততায় শুরু হয় বিষের জ্বলুনি। রূপের পাথারে নয়ন ডুবে যায়, মন হারিয়ে যায় যৌবনের গহন বনে। পূর্বরাগ উৎকণ্ঠা অভিসার মিলন প্রতীক্ষা মান বিরহ প্রেমবৈচিত্ত্য দিব্যোন্মাদ—সহজভাবের অকূল সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গের যেন আর শেষ নাই। আসন্নজনহৃদ্‌বিলোড়ন ব্রহ্মাণ্ডবিঘূর্ণন সে-উল্লাস অসীমের রাসচক্রের কেন্দ্র হতে ঝলকে-ঝলকে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের প্রত্যন্তে।

৫

দিব্য পুরুষ

একথা না হয় বুঝলাম, ভগবানকে বিচিত্রভাবে ভালবেসে আমার হৃদয়ের তৃপ্তি। তবুও প্রশ্ন হয়, যাঁকে আমি ভালবাসছি তাঁর স্বরূপ কি? আমার ভাবে সাড়া দেবার জন্য পরমার্থত কেউ কি আছেন, না ভগবানের বিগ্রহ আমারই মনের মায়া?

আধুনিক যুগ বুদ্ধিবাদী, হৃদয়কে সে বড় একটা আমল দিতে চায় না। বুদ্ধির ঝোঁক সামান্যের দিকে, বিশিষ্ট রূপ গুণ ক্রিয়ার পিছনে নির্বিশেষ শক্তিকে আবিষ্কার করার দিকে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নৈর্ব্যক্তিক, ব্যক্তির ভাবনা বেদনা সংস্কারকে তত্ত্বেষণার বেলায় যথাসম্ভব বাদ দিয়ে তিনি চলতে চান। এদেশের একশ্রেণীর দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গিও বৈজ্ঞানিকের অনুরূপ। পরমার্থ তাঁদের কাছে নির্বিশেষ সত্তা চৈতন্য এবং আনন্দ অথবা তাও নয়—সে শুধু অনুপাখ্য শূন্যতা; নাম-রূপ মায়া। তা-ই যদি তত্ত্বের স্বরূপ হয়, তাহলে শক্তি ও ভক্তি দুয়েরই সাধনা অবাস্তবের সাধনা অতএব নিছক আত্মবঞ্চনা হয়ে পড়ে, কেননা শক্তি আর ভক্তি দুইই নাম-রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ। আমি যখন কাজ করি বা ভালবাসি, তখন আমি নিঃসঙ্গ নই : এই নাম-রূপের জগৎকে আশ্রয় করেই আমি আমার শক্তি ও আনন্দকে তখন মুক্তি দিই। এও কি আমার স্বভাব নয়? এরও কি শাশ্বত একটা মূল্য নাই? জ্ঞানের নিরুচ্ছ্বাস তটস্থতার সঙ্গে শক্তির এই লীলায়নের যদি একটা সমন্বয় আমরা করতে না পারি, তাহলে কি করে বলব সত্যের অখণ্ড স্বরূপকে আমরা উপলব্ধি করেছি?

বুদ্ধির কাছেই নির্বিশেষ আর সবিশেষের নির্গুণ আর সগুণের অরূপ আর রূপের দ্বন্দ্ব একটা সমস্যা। আর এ-সমস্যার সৃষ্টি হয় চেতনার উত্তারের পথে, তার একটা সাময়িক সার্থকতাও আছে। কিন্তু সহজ সর্বগত বোধের কাছে এ-দ্বন্দ্ব নাই। দেহপ্রাণ-মনের ন্যূনতায় উৎপীড়িত হয় আমাকে একসময় জোরের সঙ্গেই বলতে হয়, 'আমি দেহ নই প্রাণ নই মন নই, আমি চিদানন্দ শিবস্বরূপ'। কিন্তু সেই শিবের প্রশান্তি চৈতন্য এবং আনন্দ যদি এই দেহ-প্রাণ-মনকে বৃহৎ উদ্ভাস্বর এবং অমৃতময় করে তোলে, তাহলে অনুভবের সে সর্বগত নিটোল

স্বাচ্ছন্দ্যকে হেয় মনে করবার আর-কি কারণ থাকতে পারে—ঐকান্তিক দুরাগ্রহ ছাড়া?

বৈদিক ভাবনায় পরম তত্ত্বের সংজ্ঞা হল 'পুরুষ'—যার মধ্যে দেহ-প্রাণ-মন-বোধি সব নিয়ে পুরাপুরি একটা মানুষের ব্যঞ্জনা আছে। বিভজ্যবাদী (analytic) সাংখ্যভাবনায় এই পুরুষ হয়ে দাঁড়ালেন প্রকৃতি হতে বিবিক্ত এক নির্বিশেষ চৈতন্যমাত্র। সাংখ্যের ভাবনা স্পষ্টত এখানে উজানপন্থী মুমুক্ষু সাধকের ভাবনা, অতএব তার দর্শন সত্যের একদেশদর্শন শুধু। অখন্ডদর্শনে পুরুষের মুক্তি শুধু দৃষ্টিতে নয়, ভুক্তিতে এবং শক্তিতেও। ভুক্তি এবং শক্তি, আনন্দ এবং কর্ম, প্রেম ও সেবা তখন প্রমুক্ত চৈতন্যেরই উল্লাস। পুরুষ আর তখন প্রকৃতি হতে বিবিক্ত নন, প্রকৃতি তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত এবং অবিনাভূত।

*

বুদ্ধি যখন পরমকে খোঁজে, তখন এষণার চরমে সে পায় নির্বিশেষকে। খুঁজতে গিয়ে তাকে আত্মহারা হতে হয়, প্রাকৃতপুরুষের অপরা-প্রকৃতির সমস্ত বিকারকে পিছনে ফেলে যেতে হয়। এই বিকারগুলি এতদিন ছিল তার ব্যক্তিত্বের নির্ভর। এগুলিকে বাদ দিয়ে তার চেতনা হয়ে যায় নৈর্ব্যক্তিক। এই নৈর্ব্যক্তিক বিন্দুচেতনা পরিব্যাপ্ত হয় নৈর্ব্যক্তিক সিন্ধুচেতনায়। উপনিষদের ভাষায় এই আত্মাই হয় ব্রহ্ম, জ্ঞান-আত্মা হয় মহান্ আত্মা এবং শান্ত আত্মা, হয় 'একাত্ম-প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্'।

আবার হৃদয় যখন পরমকে খোঁজে, সেও আত্মহারা হয়েই তাঁকে পায়। কিন্তু তখন তার মধ্যে ঘটে প্রাকৃত গুণের অপ্রাকৃত যোগগুণে রূপান্তর, অপরা-প্রকৃতির স্থান গ্রহণ করে পরা-প্রকৃতি। প্রাকৃত গুণের পরিহারে সে গুণাতীত না হয়ে হয় শুদ্ধসত্ত্ব এবং তাইতে পরমকে পায় সত্ত্বতনুরূপে। এই সত্ত্বতনু শুধু সচ্চিদানন্দময় নয়, সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ।

'যেমন ভাব, তেমন লাভ।' অথচ সমস্ত লাভই অফুরান। বুদ্ধি দিয়ে হ'ক আর হৃদয় দিয়েই হ'ক, কিছুতেই কেউ বলতে পারবে না, পরমকে অনিঃশেষে পেয়েছে, এর পর আর তার পাওয়ার কিছু বাকী নাই। সমুদ্রে ডুবে গিয়ে ঘট গলে যেতে পারে, ভরে উঠতে পারে। কিন্তু গলা ঘট আর ভরা ঘট কোনটা দিয়েই সমুদ্রের ইয়ত্তা মেলে না।

বুদ্ধির পাওয়া পুরুষের, আর হৃদয়ের পাওয়া প্রকৃতির। দুয়েরই মূলে আছে বৈরাগ্য। কিন্তু দুটি বৈরাগ্যের জাত আলাদা। পুরুষের বৈরাগ্য বিরূপে, আর প্রকৃতির বৈরাগ্য স্বরূপে। যেমন দিগম্বর শিবে দেখি জ্ঞানের বৈরাগ্য, আর তাঁরই কোলে সর্বালঙ্কারভূষিতা গৌরীর বৈরাগ্য হল প্রেমের বৈরাগ্য। 'আমি সাজি না'—এও যেমন বৈরাগ্য, তেমনি 'আমি সাজি তোমারই জন্যে'—এও বৈরাগ্য। সাংখ্যের ভাষায় এটি প্রকৃতির পারার্থ্যের বৈরাগ্য—প্রকৃতি কিছুই নিজের জন্য করে না, সব করে পুরুষের জন্য। আর তাতেই তার মধ্যে প্রকাশ পায় ঐশ্বর্য আর মাধুর্য, শক্তি আর প্রেম। কিন্তু তার জন্য প্রকৃতিকে বিরূপ হতে হয় না।

ভক্তির সাধনা প্রকৃতির স্বরূপে থেকেই পুরুষের সাধনা। সে-পুরুষ অবশ্য নির্বিশেষ, পরঃকৃষ্ণ; কিন্তু প্রকৃতির প্রেম তারই মধ্যে আবিষ্কার করে ষোড়শকল সৌম্য পুরুষকে, মহাভাব দিয়ে আবিষ্কার করে চিরকিশোর রসঘনবিগ্রহকে।

*

জ্ঞানের সত্য আর প্রেমের সত্য—একই সত্যের এপিঠ আর ওপিঠ। দুটি মিলিয়ে জীবনসত্য—কর্মের সত্য অর্থাৎ সেবার আর সৃষ্টির সত্য। জ্ঞান প্রেম আর কর্ম—তিনটি অতি সহজে আমার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে। অখণ্ডের আলোকে তিনটিকেই একসঙ্গে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলি না কেন? পরমকে সর্বাতীত অবিগ্রহ, আবার আমারই হৃদয়ারাম সবিগ্রহ, আবার রূপে-রূপে প্রতিরূপ—যুগপৎ এই তিন ভাবেই ভাবি না কেন?

অবশ্য আমরা যে-অর্থে 'পুরুষ' (Person), ভগবান্ সে-অর্থে পুরুষ নন, যদিও বিগ্রহভাবনার গোড়াতে আমরা মানুষের মত করে তাঁর কল্পনা করি। সাধনার প্রথম অবস্থাতে এমনতর কল্পনা চিত্তের একটা সহজ এবং স্বাভাবিক অবলম্বন হতে পারে, কিন্তু ভাবের উন্মেষ এবং বিশুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কল্পনারও রূপ বদলে যেতে থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মধ্যে সীমার যে-সঙ্কোচ, তা দূর হয়ে যায় বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় ভাবনার প্রভাবে। বাইরের রূপ তখন ব্যঞ্জনাবহ। আমার গোপালের প্রতিমার ভিতর দিয়ে তখন উঁকি দেয় বিশ্বজনীন বাৎসল্যের ঘন-বিগ্রহ। তখনকার অনুভব অরূপ আর রূপের মাঝে আশ্রয় করে ভাবকে। প্রতিমা তখন ভাব-উদ্‌বোধনের উপলক্ষ্য মাত্র। সেই ভাবের প্রতিরূপ

দেখি রূপে-রূপে—জগতের সকল শিশুর মুখেই আমার গোপালের প্রতিচ্ছায়া। রূপ তখন আর বন্ধন নয়, অরূপেরই বিচিত্র এবং বহুলীকৃত ভাবনার উল্লাস। রামকৃষ্ণের ভবতারিণী আদিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মৃন্ময়ী। তাকে ধরে চিদাকাশে ফুটল অপ্রাতিম অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্ময়ী। অবশেষে সেই চিন্ময়ীর সত্য আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে বিচ্ছুরিত হল সতীতে বেশ্যাতে বৃদ্ধায় তরুণীতে বালিকায়, মানুষে পশুতে পক্ষীতে তরু-লতায়—স্থাবরে জঙ্গমে সর্বত্র। উপনিষদের দুটি ভাবনার সমন্বয় হল এই বিশ্বতোমুখ অনুভবে : 'ন চ সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপম্ অস্য'—তাঁর রূপ চোখের সামনে দেখা যায় না; আবার 'রূপং-রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ'—রূপে-রূপে তিনি প্রতিরূপ হয়েও আবার সবার বাইরে। ঋগ্বেদের ঋষি তাইতে বললেন, 'তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়'—তাঁর সে-রূপ চোখ মেলে চেয়ে দেখবার মতই বটে।

*

আমার যা সত্য, তা-ই বৃহৎ হয়ে হল আমার ভগবান। অথবা আমার সত্য এক বৃহৎ সত্যের বিভূতি। আমার ব্যক্তিত্বের একটা সত্য আছে, আমার নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে আমি তীক্ষ্ণভাবে তা অনুভব করি। আবার আমি যখন ভালবাসি, বহুর মধ্যে আমাকে তখন আমি ফিরে পাই—বিচিত্র রূপে। আবার কখনও অনুভব করি আমি নীরূপ নৈর্ব্যক্তিক সর্বাতীত আকাশবৎ। আমার আকাশবৎ ভাবনায় চেতনার যে-ব্যাপ্তি, আর আমার ব্যক্তিভাবনার চরম তীক্ষ্ণতায় চেতনার যে-ঘনীভাব, দুয়ের মাঝে ওই রূপোল্লাসের জগৎ—যেখানে আমি সবার রঙে রঙ্ মিশিয়ে চলেছি। আত্মায় বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে আমার এই অনুভবের যে-সমন্বয়, তা-ই আমার ভগবান্। তিনি অবিগ্রহ বিশ্ববিগ্রহ এবং সবিগ্রহ—একাধারে। তিনি পরম 'পুরুষ' বা পুরুষোত্তম। সেখানে চোখ যায় না মন যায় না—এও যেমন সত্য; তেমনি এই দুচোখ ভরে তাঁকে দেখে-দেখে, একই মনের বিচিত্র বৃত্তির উল্লাসে তাঁকে পেয়ে-পেয়েও ফুরাতে পারি না—এও সত্য। আবার সত্য তাঁকে এই দেহ-প্রাণ-মন দিয়েও 'মনের মানুষ'রূপে পাওয়া—পাওয়া সর্বেন্দ্রিয়ের উন্মাদন এবং বিমোহন চিন্ময় রূপে, এই তনুরই অণুতে-অণুতে বিদ্যুচ্চকিত জ্যোৎস্নাতরলিত আনন্দের মূর্ছনায়। অরূপ বিশ্বরূপ আর ইষ্টরূপ—সব মিলিয়ে তাঁর স্বরূপ। ইষ্টরূপে অনুভবের

-পূর্ণিমা, তার বিচ্ছুরণ বিশ্বরূপে, তারই আনন্ত্যে 'বিনশন' (fading away) অরূপে। সব অনুভবই সত্য এবং যুগপৎ সত্য।

সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনাতে রূপ সত্য। ভক্ত ভাবের চোখে যে-রূপ দেখেন, তা এই অর্থে সত্য। চোখ মেলে ইষ্টের যে-রূপ দেখছি, চোখ বুজেও যদি তা দেখতে পারি, তাহলেই ইষ্টদর্শন হয় না : দেখতে হবে ভাবের চোখে, রূপকে অরূপে মুক্তি দিয়ে আবার তাকে ঘনীভূত করতে হবে চিন্ময়রূপে। তখন ইষ্টরূপ আর আমার কল্পনা নয়, সেই পরমেরই 'আবিঃ' তর্থাৎ আবির্ভাব বা প্রকাশ। এইভাব নিয়ে যদি পূজা করতে পারি, তাহলেই প্রতিমাপূজা দেবপূজা হয়ে ওঠে, নইলে তা হয় শুধু পুতুলখেলা। কি জ্ঞানে কি ভক্তিতে কি কর্মে চাই চেতনার মুক্তি এবং স্বচ্ছন্দচারিতা। রূপকে আঁকড়ে থাকলে চলবে না, ভাবের উল্লাসে অরূপে তাকে মুক্তি দিতে হবে। আবার অরূপের প্রতি অত্যাগ্রহে রূপকে প্রত্যাখ্যান করলেও চলবে না, অরূপকে তেজস্ক্রিয় করতে হবে রূপের উৎসারণে। এবং সবার শেষে অরূপের অন্তশ্চিন্তিত-অভীষ্টরূপকে ছড়িয়ে দিতে হবে রূপের মেলায়, বিশ্বরূপের দর্শন জীবনেও সত্য করতে হবে।

*

দিব্যপুরুষ যেমন অবিগ্রহ, তেমনি আবার সবিগ্রহও। তিনি 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'—এই তাঁর স্বরূপের একদিক; তখন তিনি অবিগ্রহ। আবার আরেকদিকে তিনি ঈশ্বর, তিনি হিরণ্যগর্ভ, তিনি বিরাট্; তখন তিনি সবিগ্রহ। ঈশ্বরে তাঁর শক্তিরূপ হিরণ্যগর্ভে ভাবরূপ, আর বিরাটে বস্তুরূপ। বিরাটে তিনি বহুরূপ—অনন্ত গুণ ও ক্রিয়ার লীলায় বিচিত্র। আমরা তাঁর এই বিশ্বরূপের অন্তর্গত। এখানে কালের প্রবাহে গুণ ও ক্রিয়ার মাধ্যমে রূপের বিবর্তন চলছে। যে সহস্রদল পদ্মে সে-রূপবিবর্তনের চরম সার্থকতা, তা-ই হিরণ্যগর্ভের স্বপ্ন বা ভাবরূপ। আমাদের ইষ্টের মধ্যে এই ভাবরূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করি 'একং সৎ'কে অনুভব করি বিচিত্র পূর্ণতায়—বিষ্ণু কালী কৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্টের রূপে। পদ্মের দলে-দলে রূপের বৈচিত্র্য, কিঞ্জল্কে রূপের সমাহার। পদ্মটি ভাসছে ঈশ্বররূপী কারণসমুদ্রে; এ-ই দিব্যপুরুষের শক্তিরূপ। সবাইকে আবৃত করে আছে অরূপ আকাশ।

অরূপে-রূপে চতুষ্পাৎ দিব্যপুরুষের এই অনির্বচনীয় মহিমা।

৬

রসো বৈ সঃ

ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার মিলন হল যোগ। মিলনের ফল হতে পারে সাযুজ্য—জলে জল মিশে যাওয়ার মত; অথবা হতে পারে সামরস্য—যেন আলোর মধ্যে আলোর খেলা, চেতনায়-চেতনায় বিদ্যুদ্‌বিনিময়; অথবা সাধর্ম্য—আবিষ্ট চেতনা হতে সাবিত্রদীপ্তির বিচ্ছুরণ। তিনটি অনুভব পৃথক বা যুগপৎ দুইই হতে পারে। যুগপৎ হওয়াটাই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। সাযুজ্যের বোধ তখন অদ্বৈত-চেতনারূপে জীবনের অধিষ্ঠান; সে-অধিষ্ঠানে সামরস্যের বোধে দ্বৈতের অদ্বৈতসম্পুটিত বিলাস; আবার সাধর্ম্যে বহুর মেলায় দিব্যজীবনের লীলায়ন, তার সামর্থ্যের বিকিরণ।

জীব আর ব্রহ্মের সম্পর্ককে যদি প্রকৃতি আর পুরুষের সম্পর্ক বলে ধরি, তাহলে সাযুজ্যে প্রকৃতি পুরুষে অভিনিবিষ্ট বা তন্ময়, সামরস্যে অন্তরঙ্গ হয়ে পুরুষে বিলসিত, আর সাধর্ম্যে পুরুষ হতে বহুধা বিচ্ছুরিত। পুরুষ আর প্রকৃতির অন্যোন্যসঙ্গম যদি অনুভবের মধ্যপর্ব হয়, তাহলে তার উত্তরপর্বে অদ্বৈত, আর অবরপর্বে সৃষ্টি। আবার উপর থেকে নীচের দিকে দেখতে গেলে এ যেন একের মিথুনাকারে দুই হওয়া, আবার সেই মিথুন হতে বহু মিথুনে বিচ্ছুরিত হওয়া। বৈষ্ণব কল্পনা করলেন, বিশ্বের রাসচক্রের কেন্দ্রে একটি নিত্যমিথুন, যাঁরা 'একাত্মনাবপি দেহভেদং গতৌ'—এক আত্মা হয়েও দুটি দেহে ভিন্ন হয়েছেন; আর চক্রের পরিধিতে সেই মিথুনেরই অনন্ত কায়ব্যূহ। এটি অপ্রাকৃত ভাবলোকের ছবি; প্রাকৃতলোকের অসমতল দর্পণে তারই আঁকাবাঁকা প্রতিচ্ছবি। সব মিলে এক অদ্বয়তত্ত্বেরই একবচন দ্বিবচন আর বহুবচন। জ্ঞান প্রেম আর শক্তির লীলায়ন। অবিরোধে তিনটিকে একসঙ্গে পেলেই যোগের পূর্ণতা।

তিনটি অনুভবের মূলে নিবিড় হয়ে আছে একটি তত্ত্ব—রস বা আস্বাদনের অনির্বচনীয়তা। রস জ্ঞানে, রস প্রেমে, রস শক্তির উল্লাসে বা কর্মে। তবুও মনে হয়, রস যেন প্রেমেরই স্বধর্ম। জ্ঞানে আমরা তটস্থ থাকতে পারি, অকর্তার ভাব নিয়ে নির্বিকার হয়ে কর্মও করতে পারি; কিন্তু তটস্থ বা নির্বিকার হয়ে

ভালবাসছি, একথা বলা চলে না। উল্লাস অথবা আস্বাদনের রমণীয়তাই ভালবাসার প্রাণ।

কিন্তু এই রসচেতনা জ্ঞানে এবং কর্মেও আছে। প্রাকৃত জগতে রস অতি-সহজে গেঁজে ওঠে বলে অপ্রাকৃতের সাধনায় আমরা রসকে বর্জন করে চলি। তাইতে জ্ঞানীর প্রতি অনুশাসন, ব্রহ্মোপলব্ধির পথে রসাস্বাদকে সযত্নে পরিহার করতে হবে। কেউ-কেউ এমনও বলেছেন, সত্তা এবং চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ-লক্ষণ—আনন্দ নয়। কর্মযোগে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার অর্থ দাঁড়িয়েছে আবেগশূন্য হয়ে কঠোর চিত্তে কর্তব্য সম্পাদন করে যাওয়া।

রসের প্রতি এই বিতৃষ্ণা দুঃখবাদী দর্শনের দান—যে-দর্শন গোড়াতেই রসকে প্রাকৃত সুখের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলেছে। বস্তুত রস সুখ-দুঃখের অতীত, অথচ সুখ-দুঃখের মর্মমূলে। দুঃখেও যে রস আছে, তা সাক্ষাৎভাবে অনুভব করি ভালবাসায়। সুখ-দুঃখের ছোঁয়াচ বাঁচাতে গিয়ে জ্ঞানকে বা কর্মকে যেখানে রসাস্বাদবর্জিত করবার সাধনা করি, সেখানে কিন্তু তাদের পরিপক্ক রূপটি পাই না। স্বভাবের গভীরে ডুবলে দেখি, জ্ঞানের প্রপঞ্চোপশম প্রশান্তির মূলে আছে আত্মারামতা, অনাসক্ত কর্মের মূলে আছে সেবার বা সৃষ্টির উল্লাস। রস সব অনুভবের মূলে, কেননা আনন্দ সত্তার স্বধর্ম। ভক্তির কারবার সোজাসুজি এই রসকে নিয়ে; জ্ঞান আর কর্মকে কখনও-কখনও একটুখানি ঘুরপথে তার কাছে পৌঁছতে হয়।

*

শুধু তাঁর জন্যই তাঁকে চাইতে গিয়ে তাঁর রসস্বরূপকে আবিষ্কার করি। সে-চাওয়ার মধ্যে আমার আত্মরতির স্থান নাই। তাঁকে বিশ্বাতীতরূপে চাই বিশ্বের অতীত হয়ে নিজের মুক্তিবাসনাকে চরিতার্থ করব বলে নয়, আমার চেতনায় বিশ্বাতীতরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন বলেই। গোলোকের মাধুরীতে ডুবতে চাই আমার রসতৃষ্ণাকে তৃপ্ত করব বলে নয়, অখিলরসামৃতমূর্তিতে তিনি আমার হৃদয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন বলেই। যতক্ষণ একলা আমার চাওয়া, ততক্ষণ সবই বিরস, পাওয়ার মধ্যেও তখন একটা আড়াল থেকেই যায়। রসের ফোয়ারা তখনই উছলে ওঠে, যখন তাঁর চাওয়াতেই আমার চাওয়া—মহাজনেরা যাকে বলেন সমর্থা রতি। তখন তিনি যে-রূপেই আসুন না কেন, সবই তাঁর রসরূপ :

রস বিশ্বাতীতে, রস বিশ্বরূপে, রস হৃদয়নিকুঞ্জে আনন্দঘনবিগ্রহরূপে—সুখে-দুঃখে জয়ে-পরাজয়ে সিদ্ধিতে-অসিদ্ধিতে লাভে-অলাভে সব-কিছুতেই রস। যতক্ষণ কামনা আছে—সে-কামনা যত উচ্চকোটিরই হ'ক না কেন—ততক্ষণ রস বিশুদ্ধ হয় না। আত্মপ্রীতির ইচ্ছা যখন সম্পূর্ণ পর্যবসিত হয় কৃষ্ণপ্রীতিইচ্ছার মাধুরীতে, তখনই প্রেম, তখনই রস।

রসযোগে সব যোগের পূর্ণতা। চক্রের নাভিতে শলাকার মত সব যোগ এসে তখন সমর্পিত হয় ভালবাসায়। তাঁকে ভালবাসি বলেই তাঁকে বিচিত্ররূপে জেনে আমার আনন্দ—বিশ্বাতীতে বিশ্বে ব্যক্তিতে অরূপে-রূপে নির্গুণে-সগুণে অবিগ্রহে-সবিগ্রহে মুক্তচ্ছন্দ আস্বাদনের আনন্দ। তাঁকে ভালবাসি বলেই তাঁর কর্মে আমার আনন্দ—তাঁর অনিবাধ শক্তির প্রবাহে ভেসে যাওয়ার, তাঁর আলোকে তাঁরই স্বপ্নের ফুল হয়ে ফুটে ওঠার, তাঁর দুর্ধর্ষ বীর্যের শরিক হয়ে তাঁর সৃষ্টির উল্লাসকে সার্থক করবার আনন্দ।

এমনি করে কামগন্ধহীন রসের অভিষেকে জীবনের পর্বে-পর্বে ফোটে সহস্রদল সৌষম্যের পূর্ণতা। অন্তরে জাগে সামরস্যের সুধায় উচ্ছল প্রেম, চোখে লাগে অরূপের রূপমাধুরীর মায়াঞ্জন।

৭

আনন্দ-ব্রহ্ম

সৎ চিৎ আর আনন্দ—তিনটি ওতপ্রোত। তবুও যেন সত্তা আর চৈতন্যের পুষ্টি এবং পূর্ণতা আনন্দে। ভালবেসে এই আনন্দকে আবিষ্কার করি—বাইরে রূপে, আর অন্তরে রসে। এই আবিষ্করণে আর আস্বাদনে জানার অন্তরঙ্গতা আর নিবিড়তা। আনন্দরূপে যাঁকে জানি, তাঁকে দেহ প্রাণ মন হৃদয় বোধি সব দিয়ে জানি। জানার উল্লাস রূপ পায় সেবায় আর সৃষ্টিতে। জীবনে তখন জ্ঞান ভক্তি আর কর্মের ত্রিবেণীসঙ্গম। আনন্দ তার রসায়ন।

একটি কথা গোড়াতেই জেনে রাখা ভাল, আমরা যাকে সুখ বলি, আনন্দ তা নয়। সুখ বস্তুনির্ভর, আর আনন্দ স্বনির্ভর, সত্তার গভীর হতে আপনি সে উছলে পড়ে। শৈব দার্শনিক তাই আনন্দের একটি সুন্দর লক্ষণ দিলেন 'আনন্দো বিশ্রান্তিঃ'। যোগী তার ইশারা করলেন—সমস্ত প্রযত্ন শিথিল করে চেতনাকে অনন্তে ছড়িয়ে দিয়ে আধারব্যাপী যে স্থিরসুখের অনুভব হয়, তা-ই আনন্দ। উপনিষদের ঋষি তার সংজ্ঞা দিলেন 'ভূমা', তার উপমা দিলেন আকাশ। বললেন এই আকাশ যদি আনন্দ হয়ে আবিষ্ট করে না রাখত, তাহলে কে শ্বাস ফেলত, কেই-বা বাঁচত? এই আকাশ হৃদয়ে এসে বেঁধেছে ছোট্ট একটি কমলের ঘর, আর সেখান থেকে দ্যুলোক-ভূলোককে ছাপিয়ে গেছে।

আনন্দের এই নির্বিশেষ স্বরূপকে অনুভব করতে হবে—জানতে হবে আকাশকে, আনন্দব্রহ্মকে। তবে রতি স্থির হবে। মহাজনেরা তাই বলেন, সব ভাবের মূলে শান্তভাব। 'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া'—নির্বিকারাত্মক চিত্তে প্রথম যে-বিকার, তা-ই ভাব। কিন্তু অলৌকিক ভাবে বিকার সত্ত্বেও তার নির্বিকার স্বভাব ক্ষুণ্ণ হয় না। ভাবের গতি তখন 'অগাধজলসঞ্চারী রোহিতের মত', অথবা আকাশে উপচে-পড়া আলোর তরঙ্গায়ণের মত। গতি আছে, তার অনিবার্য সংবেগ আছে; কিন্তু সে-গতি অন্তরাবৃত্ত। তৃষ্ণা আছে—রূপের তৃষ্ণা, রসের তৃষ্ণা; কিন্তু পুটপাকের মত তার পরিপাক চলছে অন্তরের গভীরে। ভাগবতী রতির স্বরূপ লোকোত্তর। তার মধ্যে স্থিতি আর গতিতে সমান অনুপাত—পরমাণুগর্ভস্থ বিষম বৈদ্যুতের সৌষম্যের মত। অমেয় গতিতে

আর অটল স্থিতিতে গাঁটছড়া বাঁধা। যেন আকাশের বুকে সবিতার কৌস্তুভদ্যুতি।

*

ঋষিরা বলেন, অপক্ক পাত্রে সোমরস ঢাললে পাত্রকে তা বিদীর্ণ করে দেয়। তেমনি অবিশুদ্ধ দেহ-প্রাণ-মন এই আনন্দব্রহ্মের আবেশকে স্বচ্ছন্দে ধারণা করিতে পারে না। অবিশুদ্ধির কারণ হল মূঢ়তা, চাঞ্চল্য, বস্তুনির্ভরতা। ব্রহ্মের আনন্দ বিচিত্ররূপে আমাদের স্পর্শ করছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু আমরা সে-স্পর্শে হয় সাড়া দিতে পারি না, অথবা রাস-না-মানা মনের আবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠি, যে-বস্তুকে উপলক্ষ্য করে আনন্দের প্রকাশ তাকেই লক্ষ্য করে তার পিছনে-পিছনে ছুটি।

প্রাকৃত আস্বাদনের এই ধারাকে বদলে ফেলতে হবে। চিত্তকে করতে হবে অত্যন্ত স্পর্শসচেতন অথচ প্রশান্ত। বাসকসজ্জিতার বিনিদ্র প্রতীক্ষা থাকবে, কিন্তু তার মধ্যে উন্মথন ব্যাকুলতা থাকবে না। অকৃপণ তাঁর স্পর্শ, অজস্র তার উপলক্ষ্য। কিন্তু উপলক্ষ্য হতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করে নিবিষ্ট করতে হবে তার উৎসে : বস্তু হতে যেতে হবে ভাবে, ভাব হতে সংবেদনে। উপনিষদের ঋষির ভাষায় শরীর হবে আকাশ, প্রাণ হবে আরাম, তবেই মন হবে আনন্দ, আর চেতনা পাবে শক্তিসমৃদ্ধ অমৃতের আস্বাদন।

একদিনে তা হবে না, হবে ধীরে ধীরে—অবিচ্ছেদ অথচ অনুচ্ছলিত অভ্যাসের ফলে। ভাবের সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা খেলবে। জোয়ারের প্রতি লোলুপতা আর ভাটায় বিমর্ষতা প্রথমটায় স্বাভাবিক। কিন্তু সাধককে এই দুটি অন্তই পরিহার করতে হবে। ভাব স্বভাবের স্ফূর্তিরূপে দেখা দিলেই তা ক্ষেমঙ্কর হয়। চিত্তের প্রশান্তি আর পরিব্যাপ্তি এবং নিত্যসমনস্কতা তার সাধন। আনন্দব্রহ্মের আবেশে, আলোর ছোঁয়ায় ফুল ফোটার মত চৈতন্য বিকসিত হবে সহজের দীপ্তিতে ঐশ্বর্যে এবং মাধুরীতে।

*

ব্রহ্মোপলব্ধির তিনটি রীতি—অন্তরে, বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে। আনন্দ-

ব্রহ্মও আমাদের কাছে ধরা দেন এই তিন রীতিতে। অন্তরে তাঁর আসন হৃদয়ে, অথবা 'শিরসি সহস্রারে'। হৃদয় জীবচৈতন্যের ধাম, চেতনার ধারা সেখানে ঊর্ধ্ব-স্রোতা; আর সহস্রার শিবচৈতন্যের ধাম, সেখান হতে ভ্রূমধ্যবিন্দুকে উন্মীলিত করে ঝলকে-ঝলকে নেমে আসে আলো আর শক্তির বৈদ্যুতী। হৃদয়ের কমল যখন দল মেলে, তখন কিশোরী ভালবাসার মধুচ্ছন্দা আকূতি আলো আর আনন্দের অভিষেকে আধারকে করে চিন্ময়, ঊর্ধ্বস্রোতা প্রবেগে উধাও হয় মূর্ধন্যচেতনার শূন্যতায়, উতল সৌরভের স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে যেন জড়িয়ে ধরে বিশ্বচরাচর। আবার ঊর্ধ্বে সহস্রদল কমল বিকসিত হয় যখন, চেতনা সংপ্লুত হয় দিব্য জ্যোতি আনন্দ আর শক্তিতে, শিব-শক্তির সামরস্যের অমৃত পর্জন্যের ধারাসারে ঝরে পড়ে আধারের সর্বত্র, উচ্ছল প্রবাহে বয়ে চলে বিশ্বের দিগ্‌দিগন্তে।

আধারে ব্যক্তিচৈতন্যের গহনে আনন্দব্রহ্মকে যেমন পাই, তেমনি আবার পেতে পারি বিশ্বচৈতন্যের পরিব্যাপ্তিতে। এ-জগৎ 'আনন্দরূপং ব্রহ্মণো যদ্ বিভাতি'—ব্রহ্মেরই আনন্দরূপ, ঝলমল করছে দিকে-দিকে। তিনিই হয়েছেন এই যা-কিছু, হওয়ার আনন্দে উছলে চলেছেন শাশ্বতকাল ধরে। বর্ষার জলের মত তাঁর সত্তা জারিত করে রয়েছে সবকিছু, তাঁরই আনন্দ সর্বত্র উদ্ভিন্ন হয়ে উঠছে বিচিত্র পত্র-পুষ্পের মেলায়। রূপে-রূপে তিনি চিদানন্দঘনবিগ্রহ, রূপান্তরিত চেতনায় দিব্য ইন্দ্রিয়ের গোচর। যেন তাঁরই চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা, তত্তনুতে রমিত হওয়া তাঁরই অতনুর আলিঙ্গনে।

আবার তাঁর আনন্দকে অনুভব করি বিশ্বাতীতে, তাঁর আত্মারামতার অনুপাখ্য নৈঃশব্দের গভীরে। চিন্ময় সুষুপ্তিতে বিশ্ব আর ব্যক্তি দুইই তখন অবলুপ্ত, জীবন-মৃত্যুর আন্দোলন অপ্রকেত অমৃতসমুদ্রের গহনে নিস্তব্ধ। সুষুপ্তির আনন্দের মত আনন্দ তখন প্রবিবিক্ত বোধের অতীত হয়েও 'সর্বেশ্বরঃ সর্বযোনিঃ'।

এমনি করে অন্তরে বাইরে এবং সমূর্ধ্বে তাঁকে আস্বাদন করা এক সর্বতুল প্রত্যয়ে—প্রথম হয়তো বিদ্যুদ্দামের চকিতচমকে, তারপর স্থিরা সৌদামিনীর প্রচ্ছটায়, অবশেষে রূপান্তরিত দিব্যচেতনার আনন্দঘনতায়—এই তো ভক্তিযোগের পরমা সিদ্ধি। ব্রহ্ম তখন পুরুষোত্তম, আত্মানন্দ—অক্ষরের আত্মারামতা হতে আত্মমিথুন আত্মক্রীড়ের চিন্ময় ক্ষরলীলায় মধুষ্যন্দী।

৮

প্রেমের লীলা

জ্ঞানবাদীরা বলেন, অক্ষর ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব, তাতে মিশে এক হয়ে যাওয়াই জীবের পরমপুরুষার্থ; তার মধ্যে উপাসনার স্থান কোথায়? ভক্তিবাদী আবার অক্ষরে লীন হতে চান না, তাঁর পরমপুরুষার্থ হল পুরুষোত্তমের উপাসনার প্রেমসেবোত্তরা গতি। জ্ঞানপন্থীর প্রতি কটাক্ষ করে তিনি এমনও বলেন, অক্ষর পুরুষোত্তমেরই তনুভা বা অঙ্গচ্ছটা মাত্র—যেমন সূর্যালোক মণ্ডল-মধ্যবর্তী হিরণ্ময় পুরুষের তনুভা।

কিন্তু এসব কথা একদেশদর্শনের, সম্যক্-দর্শনের নয়। সম্যক্-দৃষ্টিতে পরম তত্ত্ব একাধারে ক্ষরপুরুষ অক্ষরপুরুষ এবং পুরুষোত্তম। অরূপে, নির্গুণে-সগুণে, নিত্যে-লীলায় কোনও বিরোধ নাই। নিত্যই স্বরূপে অটল থেকে লীলায় টলমল করছেন; আবার লীলার মধ্যেই দেখছি প্রবাহের নিত্যতা, ব্যঞ্জনার অসীমতা। জ্ঞানী খুঁজছেন সীমার পিছনের অসীমকে; আর ভক্ত খুঁজছেন সীমার মধ্যেই অসীমকে। উভয়ত্র অসীমেরই উপাসনা।

সীমা অসীমকে চাইছে, অল্প চাইছে ভূমাকে, ক্ষুদ্র বৃহৎকে—অধ্যাত্মসাধনার এই তো সার কথা। অসীমের স্পর্শ যেভাবে পাই না কেন, প্রথম তাকে পাই সীমার মধ্যে থেকেই : চেতনা আপ্লুত হয় বিস্ময়ে, আনন্দে। দুয়েরই মধ্যে আছে মহিমবোধ। তার পরিণাম অহংগ্রন্থির শিথিলতা, ভক্তি, উপাসনা। অসীমের আবেশে অহং বিলুপ্ত হতে পারে, আবার রূপান্তরিতও হতে পারে। ভোরের পাতলা সাদা কুয়াসা কখনও সূর্যের আলোয় গলে যায়, কখনও-বা সূর্যের মতন জ্বলে ওঠে। তার চরম পরিণাম হয়তো গলে যাওয়া, কিন্তু জ্বলে ওঠাটা মিথ্যা নয়। বরং এই রূপান্তরে তার সত্তার পূর্ণতা, কুয়াসারূপে থেকেই সূর্য হয়ে ওঠা তার জীবনের পরম চমৎকার।

অসীমকেই চাই। হয়তো তাঁর মধ্যে হারিয়ে যেতে চাই, চাই মহানির্বাণের পরমা প্রশান্তি। হয়তো চাই তাঁর মধ্যে উল্লসিত হয়ে উঠতে, চাই আমার ব্যক্তিসত্তার চরম ঐশ্বর্যের বিস্ফোরণ, তার পরম মাধুর্যের উচ্ছলন। কিন্তু এসবই আমার চাওয়া; তিনি কি চান, তা এখনও জানি না। আমার চাওয়া

বলেই চাওয়াতে-চাওয়াতে এত বিরোধ, মত আর পথের এত হানাহানি। কিন্তু অসীমের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আমার চাওয়া-পাওয়া আর থৈ পায় না যখন, তখন রূপ-অরূপের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে হয় অপরূপের আবির্ভাব। নির্গ্রন্থ আত্মারাম মুনির হৃদয়ে অহৈতুক রসের উল্লাস, রসিকের অন্তর্দশায় পরঃকৃষ্ণ শূন্যতার নিঃসংজ্ঞ অবতরণ—দুই-ই শুধু সম্ভব নয়, সুনিশ্চিত।

*

'সর্বভাবেন' তাঁকে পাওয়া হল পাওয়ার চরম। কিন্তু কোনও পূর্বসংস্কারের বশবর্তী না হয়ে নিজেকে অসঙ্কোচে তাঁর কাছে মেলে না ধরলে তা সম্ভবপর হয় না। তার জন্য চাই বুদ্ধির ঔদার্য, ভাবের বিশুদ্ধি এবং কর্মে তন্নিষ্ঠতা। কিন্তু সাধারণত মানুষ রুচি এবং সংস্কারের দাস। অসীমকে মনোগত সীমার মধ্যে বন্দী করে তবে সে তাঁর ধারণা করতে পারে। তিনিও যে যেভাবে চায়, সেইভাবেই তার কাছে ধরা দেন। ভক্তির সাধনা তাই প্রবর্তিত হয় বিশিষ্ট নাম-রূপের মাধ্যমে ইষ্টের উপাসনা দিয়ে। কারও ইষ্ট কোনও দেবতা, কারও কোনও মহামানব। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা যে করে, তারও ঈশ্বর তার কল্পনারই অনুযায়ী—সেও সূক্ষ্ম নাম-রূপেরই উপাসনা করে। সর্বত্র নাম-রূপ উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য সেই অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দ।

পূর্ণযোগে ভক্তির সাধনায় সৎ-চিৎ-আনন্দের ভাবনাই মুখ্য, নাম-রূপ গৌণ। পূর্ণযোগীর ইষ্ট প্রথম হতেই 'বিশ্বরূপ' বা 'জগন্মূর্তি'—বিশ্বচরাচরে সর্বজীবে লোকে লোকান্তরে যা-কিছু তাঁর অনুভবের গোচর, তা-ই তাঁর ইষ্টের আনন্দরূপ, সেই সচ্চিদানন্দের বিগ্রহ। সবার ইষ্টের মধ্যে তাঁরই ইষ্টের স্ফূর্তি। নিঃশেষে নিবেদিত অন্তরের নিরন্ত মননে ভাবৈকরস চিত্তের মাধুরী তাঁর চোখে পরিয়ে দেবে এক দিব্য অঞ্জন : তখন তাঁর 'যাঁহা-যাঁহা দৃষ্টি পড়ে, তাঁহা-তাঁহা ইষ্ট স্ফুরে'। ইন্দ্রিয়পথে বিশ্বের নামে আর রূপে তখন তাঁর ইষ্টের সঙ্গে সাযুজ্য।

এমনি করে ব্যাপ্তিচৈতন্যের ভূমিকায় বাইরে সর্বত্র ইষ্টদর্শনের অভ্যাস হল সাধনার একদিক। আরেকদিক হল চেতনার সংহননে (convergence) অন্তরে ইষ্টের চিন্ময় বিগ্রহের অনুধ্যান। বিগ্রহ দুরকমের—তত্ত্ববিগ্রহ আর ভাববিগ্রহ। তত্ত্ববিগ্রহে পরমতত্ত্বের বিভাবকে প্রতীকের আকারে প্রকাশ করা হয়।

অধিকাংশ শাস্ত্রীয় বিগ্রহ এইধরনের। ভাববিগ্রহ হল আমার মনের মত,, আকৃতির অস্পষ্ট নীহারিকা সেখানে জমাট বেঁধে বিগ্রহের রূপ ধরে। বলা বাহুল্য, এই বিগ্রহই সাধকের 'সত্যাত্ম প্রাণারাম মনআনন্দ', তাঁর রসচেতনার সান্দ্র প্রতিরূপ। আধারের ফানুসের মধ্যে প্রদীপের মত এই চিন্ময় প্রতিরূপকে নিরন্তর বহন করে চলতে হবে—শুধু নির্জনে নয়, সজনে। জীবনের ভাবনা বেদনা সংকল্প কর্ম সব-কিছুর ঐকান্তিক নিবেদনে তাঁর সাযুজ্যবোধকে হৃদয়ে গভীর করতে হবে। অবশেষে জীবন হয়ে উঠবে তদ্‌গত, তাঁর চিন্ময় স্পর্শে চিন্ময়—এমন-কি দুঃখ-শোকের প্রতিকূল বেদনাও রূপান্তরিত হবে শান্তিসমৃদ্ধ আনন্দের অমৃতে।

তাঁর দ্বারা এমনি করে অধিকৃত আবিষ্ট গ্রস্ত এবং রূপান্তরিত হওয়ার পরিণাম হল ভাবোল্লাস। ভাবের কথা আগেই বলেছি : ভক্তিযোগের সাধনাই হল ভাব দিয়ে পরমকে পাওয়া আস্বাদন করা আস্বাদিত হওয়া। দাস্য হতে মধুর পর্যন্ত ভাবের বিচিত্র পরম্পরা—যে-ভাবে হৃদয় তাঁকে চায় সেইভাবেই পাওয়া যায়। তিনি প্রভু শাস্তা ত্রাতা দিশারী পিতা মাতা সখা পুত্র কন্যা—সব। শুধু তা-ই নয় : কখনও তিনি হৃদয়ে আসেন প্রতিকূল হয়ে—শত্রুর রূপে। আমার অজানতে জীবনে তাঁর ছোঁয়া লাগে, আমার সুখের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তিনি আমায় বুকে টানেন : আমি তাঁকে চাই না, কিন্তু ভুলতেও পারি না। সে এক বিষম জ্বালা।

কিন্তু তাঁকে সবচাইতে নিবিড় করে পাওয়া হল মধুরভাবে—গোপীর মত প্রিয়তমরূপে। আগেও বলেছি, যেমন শান্তভাব সমস্ত ভাবোল্লাসের অধিষ্ঠান, তেমনি মধুরভাবের মধ্যে সব ভাবের অন্তর্ভাব। মধুরভাবে পাওয়ার অর্থ হল পরমা-প্রকৃতি হয়ে সামরস্যের আনন্দে পরমপুরুষকে পাওয়া। বিশ্বের সমস্ত আনন্দ এই আনন্দেরই বিভূতি এবং উল্লাস।

মহাজনেরা মধুরভাবের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন—বাম্য বা বক্রতা। সাপ যেমন সোজা চলে না, এই ভালবাসাতেও চিত্তের বৃত্তি তেমনি সবসময় সোজা পথে চলে না। তার ফলে দেখা দেয় প্রিয়তমের অনাদরের কল্পনায় অভিমান। অভিমান যেন প্রিয়তমকে প্রত্যাখ্যান করে দূরে সরিয়ে দেয়, কিন্তু তার পরমুহূর্তে বিরহের দুঃসহ সন্তাপে প্রাণ জ্বলে-পুড়ে যায়, বিচ্ছেদের অশ্রুজলে আবার নতুন করে প্রেমের অভিষেক হয়।

এমনি করে মিলনে-বিরহে আনন্দে-বেদনায় 'বিষামৃতে একত্র করিয়া' চলে

প্রেমের লীলোচ্ছলতা, এক অনির্বচনীয় রসায়নে রসায়িত হয় ইন্দ্রিয় প্রাণ আর মন—এমন-কি দেহ পর্যন্ত হয় সাত্ত্বিক বিকারের রঙ্গপীঠ। অনন্তের মধ্যে সান্তের প্রলয় নয়, সান্তের মধ্যে অনন্তের আবেশ ও বিলাস—তার গাঢ়তা আর রঙ্গের যেন শেষ নাই।

এই যে ভুক্ততা এবং ভুক্তি—এও মুক্তি। উপশমে পুরুষের যে-মুক্তি, তারই পাশাপাশি উল্লাসে প্রকৃতির মুক্তি। আত্মারামের হ্লাদিনী স্বরূপশক্তির বিচিত্র বিলাসের বিবর্ত—সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য মুক্তি তার তরঙ্গভঙ্গ।

মধুরভাবের আকর্ষণ উন্মাদন। কিন্তু তাকে একান্ত করে তোলা পূর্ণ-যোগের লক্ষ্য নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। পূর্ণযোগী পরমকে আস্বাদন করতে চান 'সর্বভাবেন'। তাছাড়া রসাস্বাদনের সঙ্গে জ্ঞান ও কর্মেরও তিনি কোনও বিরোধ দেখেননি। ভাবনা বেদনা (feeling) এবং সঙ্কল্প তিনটিই মানুষের মধ্যে ওতপ্রোত এবং সহচরিত বৃত্তি, তিনের সুসমন্বিত দিব্য রূপান্তরই পূর্ণযোগের আদর্শ—ভক্তিযোগের সাধনায় একথা ভুললে চলবে না।

[তৃতীয় পাদ সমাপ্ত]

চতুর্থ পাদ

পূর্ণযোগ

১

পূর্ণযোগের মূলতত্ত্ব

চিৎশক্তিকে অন্তরাবৃত্ত এবং ঊর্ধ্বস্রোতা করে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করাই যোগ। শক্তি একরকমের নয়। প্রচলিত যোগবিধিগুলিতে আছে এক বা একাধিক শক্তির সাধনা। আর পূর্ণযোগের সাধনা সব শক্তির সমাহারে এবং সমন্বয়ে। প্রাচীনে-নবীনে গোড়াতেই এই একটা বড়রকমের তফাত।

এদেশের যোগপন্থাগুলিকে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করা যেতে পারে—হঠযোগ রাজযোগ কর্মযোগ জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ। পূর্ণযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এতক্ষণ ধরে আমরা এদের নিয়ে আলোচনা করে এসেছি। দেখেছি, হঠযোগ আশ্রয় করে মুখ্যত দেহ আর প্রাণের শক্তিকে, রাজযোগ মনের শক্তিকে; আর এ-দুটি যোগই নিরোধপ্রধান। বাকী তিনটি যোগের সাধন হল আত্মশক্তি, তারা মুখ্যত ভাবনাপ্রধান। সংকল্প (will) ভাবনা (thought) এবং বেদনা (feeling)—আত্মশক্তির এই তিনটি বিভাব যথাক্রমে তাদের অবলম্বন।

কিন্তু যে-শক্তিকে আশ্রয় করে আমরা যোগ করি না কেন, মূলত সব শক্তি আত্মার শক্তি। যোগপথের গোড়াতে রুচি ও সংস্কার অনুসারে আমরা এককেটি শক্তিকে বেছে নিই বটে, কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে গেলে দেখি, শক্তির ধারাগুলি বাইরে থেকে যেমন আলাদা-আলাদা বলে মনে হয়েছিল, আসলে তারা তা নয়। নিজের মত বা পথকে গোঁড়ার মত আঁকড়ে না থাকি যদি, তাহলে একসময় দেখতে পাই, সব যোগের মধ্যে অন্যোন্যপ্রবেশের একটা সম্ভাবনা আছে, এমন-কি এক যোগের সাধনায় আরেক যোগের ফল পাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। কারণ সুস্পষ্ট। চিৎ-শক্তিকে বিভিন্ন বৃত্তিতে আমরা ভাগ করি আমাদের গরজে। আসলে সে আগাগোড়া আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছে একটা সংহত (organised) এবং সুসমন্বিত রীতিতে। বৃত্তিগুলি অনোন্যনির্ভর এবং এক অখণ্ড শক্তির বিভাব মাত্র। গোড়াতে তাদের মধ্যে সমন্বয় আছে বলে যোগের পথেও তাদের সমন্বয় সম্ভব।

এদেশের সাধনপন্থাগুলির মধ্যে একমাত্র তন্ত্রই সমন্বয়ের পথে অনেকদূর

এগিয়ে গেছে। তন্ত্রের মধ্যে একটা সার্বভৌম উদার দৃষ্টি আছে, সাধনা ও সিদ্ধির পথে জীবনের কোনকিছুকে বাদ দিতে সে রাজী নয়। 'যে-মাটিতে পড়ে লোক, ওঠে তা-ই ধরে'—এই হল তন্ত্রসাধনার একটা মূল নীতি। তাই সে দুঃসাহসিকের মত জীবনের অনেক অন্ধশক্তিকেও যোগের শাসনে এনে ভাস্বর করে তোলবার চেষ্টা করেছে। সব যোগেরই লক্ষ্য মুক্তি, তন্ত্রেরও তা-ই। তবুও সে জোরের সঙ্গেই ভুক্তিকেও মুক্তির অনুগামী করেছে। সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক প্রায় সব যোগকে গভীরভাবে প্রভাবিত করায় এদেশের সাধনায় বৈরাগ্যবাদ প্রবল হয়েছে। একমাত্র তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকের উপর নয়—যুগনদ্ধতার উপরে, এমন-কি কখনও-কখনও শক্তিকে সে শিবের চাইতে বেশী মর্যাদা দিতে চেয়েছে।

*

পূর্ণযোগও সমন্বয়ের পথে তন্ত্রের সহচারী, যদিও তন্ত্রের সঙ্গে তার তফাতও আছে। শিব-শক্তির যুগনদ্ধতা পূর্ণযোগেও অঙ্গীকৃত। কিন্তু তন্ত্র সাধনা শুরু করে শক্তিকে নিয়ে, আর পূর্ণযোগ করে শিবকে নিয়ে। তন্ত্র ক্রিয়াপ্রধান, আর বেদান্তের মতই পূর্ণযোগ ভাবনাপ্রধান। তাইতে পূর্ণযোগের মধ্যে গীতোক্ত ভাবনাপ্রধান যোগত্রয়ের অর্থাৎ কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমাবেশ অতিসহজেই হয়েছে। পূর্ণযোগে এদের সাধনাই মুখ্য, রাজযোগ প্রাসঙ্গিক, হঠযোগ না করলেও চলে। তন্ত্রের সাধনার সঙ্গে মিল না থাকলেও তার দর্শন আর লক্ষ্যের সঙ্গে পূর্ণযোগের অনেকাংশে ঐক্য আছে।

পূর্ণযোগেরও লক্ষ্য মুক্তি—অবিদ্যার অন্ধতা হতে অপরা-প্রকৃতির বশ্যতা হতে চেতনার ও শক্তির মুক্তি। সব যোগের তা-ই লক্ষ্য। কিন্তু পূর্ণযোগে এ-লক্ষ্য প্রাথমিক মাত্র। তাছাড়া পূর্ণযোগের মুক্তি চেতনার নির্বাণে নয় শুধু—চেতনার বিস্ফারণে। বলতে গেলে নির্বাণে যেখানে মুমুক্ষুর সাধনার শেষ, পূর্ণযোগের প্রকৃত সাধনার শুরু সেইখান থেকে। ভুক্তি এবং শক্তি তার মুক্তির সহচারী। মুক্তি যদি পুরুষের স্বরূপ হয়ে থাকে, তাহলে ভুক্তি আর শক্তি হল প্রকৃতির স্বধর্ম। পূর্ণযোগে পুরুষ আর প্রকৃতি যুগনদ্ধ। তাইতে পুরুষের মুক্তি (liberation) সেখানে বস্তুত স্বাতন্ত্র্য (freedom)। আর এই স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ প্রকৃতির উল্লাসে—ভুক্তিতে ও শক্তিতে, আনন্দে ও বীর্যে।

পূর্ণযোগীর চেতনা বিস্ফারণকে মুখ্য সাধনারূপে গ্রহণ করে বলে বিশ্বাত্মভাব তার সহজ ধর্ম। আমার চেতনা যেখানে বিশ্বের সঙ্গে এক, সেখানে

আমার শক্তিও বিশ্বশক্তির ম্ল প্রবর্তনার সঙ্গে এক। সে-শক্তির প্রবর্তনা জড়ের চিন্ময় র্পান্তরে। আমারও শক্তিযোগের তা-ই তাৎপর্য। একার ম্ক্তি আমার মুখ্য নয়, আমার ব্রত সমষ্টির র্পান্তর। এই সচেতন ব্রতদীক্ষাও প্ণর্যোগের একটি বৈশিষ্ট্য।

বিশ্বোত্তীর্ণের তুঙ্গতায় প্রতিষ্ঠিত থেকে বিশ্বর্পা প্রকৃতিকে আনন্দে প্রেমে জড়িয়ে ধরা, তার স্র্যম্খী আক্তিকে উদ্‌ভাস্বর মহিমায় সার্থক করা অমোঘ চিদ্‌বীর্যের নিরন্তর অভিষেকে—এই হল ব্রহ্মের ঐশ্বরযোগ। প্ণর্যোগ এই ব্রহ্মযোগের অন্গামী। তাই তার সত্যকার সাধক প্রাকৃত কামপ্র্ষ নয়—অন্তর্যামী চিৎপ্র্ষ। সাধনা আমি করছি না, করছেন তিনিই। আমি তাঁকে ফ্টিয়ে তুলছি—এ-অহঙ্কার নয়; মহাবৈপ্ল্যের সহজ আনন্দে তিনিই আমার মধ্যে ফ্টে উঠছেন—এই প্রসাদ। যোগের সিদ্ধি তাঁর দায়; আমার দায় শ্ধ্ আত্মসমর্পণের, সমস্ত প্রযত্ন শিথিল করে নিঃশেষে সেই আনন্ত্যের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার, মিলিয়ে দেবার। এই অকিঞ্চন আত্মসমর্পণকে বলতে পারি প্ণর্যোগের ম্ল স্ত্র। অথচ এ কিন্তু তামসিক আত্মসমর্পণ নয়। এ যেন র্দ্ধ ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা খ্লে দিয়ে আলোর স্বতঃপ্রবেশকে অব্যাহত করা এবং প্রতিনিয়ত তার স্পর্শে রোমাঞ্চিত এবং শক্তিতে উদ্দীপিত থাকা।

আত্মসমর্পণের ফলে এই আত্মোন্মীলন এবং আবেশের ম্খ্যত দ্টি পরিণাম : এক, বিবিক্ত অহংএর সঙ্কীর্ণতা হতে সর্বাবগাহী অদ্বৈতচেতনার প্রম্ক্তিতে উত্তরণ; আর, ঊর্ধ্বশক্তির জারণায় আধারের অপরা-প্রকৃতির দিব্য পরা-প্রকৃতিতে র্পান্তর। যোগের প্ণর্তা যেমন আধারের সমস্ত শক্তির সমাহারে এবং সমন্বয়ে, তেমনি অদিব্য প্রকৃতির দিব্য র্পান্তরে। সাধনার প্রথমে যে-কোনও শক্তিকে সাধনর্পে অবলম্বন করা যেতে পারে—নিজের রুচি ও সংস্কার অন্সারে; কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, একদেশদর্শিতায় কোথাও অখণ্ড সত্যকে যেন খণ্ডিত না করা হয়। মনকে ম্ক্ত রেখে সাধনার পথে অগ্রসর হলে ক্রমে দেখতে পাব, ব্দ্ধির শ্দ্ধিতে আমার পথ এসে পেঁছেছে সেই পরম বিন্দ্তে যেখানে মিলেছে আর-সব পথ, আর সেখান হতে বোধির আলোতে চলেছে সর্বসমঞ্জস সত্যের পথে অসঙ্কোচ অভিযান। উদার ব্দ্ধিতে গোড়া হতেই সমন্বয়ের পথ অবশ্য ধরা যেতে পারে; সে হবে 'সহজ সাধনার' কঠিন পথ। তার কথা পরে।

২

পূর্ণ সিদ্ধি

সব মানুষই অল্প-বিস্তর একটা আদর্শের প্রেরণায় চলে। সে যা আছে তাতে তৃপ্ত হতে পারে না, চায় আরও কিছু হতে। এই হওয়া তার সিদ্ধি। কিন্তু সিদ্ধির কল্পনা সবার বেলায় এক নয়। সাধারণত দুরকম সিদ্ধির কথা আমরা জানি—ঐহিক আর পারত্রিক। পূর্ণযোগের সিদ্ধি কিন্তু এ-দুয়ের কোনটাই নয়, যদিও পূর্ণযোগ ইহলোক বা পরলোক কোনটাকেই অস্বীকার করে না।

ঐহিক সিদ্ধির একটা প্রাচীন সংজ্ঞা হচ্ছে 'অভ্যুদয়।' চেতনার উন্মেষের স্তরভেদে তার নানা রূপ। অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টি দেহ-প্রাণের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায় না; তাদের কাছে অভ্যুদয়ের চরম হল যাকে বলে 'দুধে-ভাতে থাকা।'। কিন্তু মানুষ প্রকৃতিতে এবং প্রয়োজনে যূথচর জীব। সুতরাং এই দুধে-ভাতে থাকাকে সর্বজনীন করবার একটা দায় তার আছে। তা-ই থেকে এসেছে সামাজিক রাষ্ট্রিক এমন-কি আন্তর্জাতিক অভ্যুদয়ের কল্পনা। কিন্তু যাঁদের মধ্যে মন জেগেছে, তাঁরা বাইরের চাইতে ভিতরকে দাম দেন বেশী। তাঁরা চান নানাভাবে মন ও বুদ্ধির উৎকর্ষ—সাহিত্যে বিজ্ঞানে দর্শনে শিল্পে নীতিতে এবং রীতিতে। সব মিলিয়ে অভ্যুদয়ের একটি পূর্ণ আদর্শ কল্পনা করা যায়—যার সাধনা হবে মানুষের দেহ প্রাণ মনের উৎকর্ষের অনুকূলে তার পারিপার্শ্বিককে গড়ে তোলা।

কিন্তু মনের চাওয়ার পরেও মানুষের চাওয়া আছে। ভোগের প্রতুলতার মধ্যে থেকেও তার চিত্ত অধরার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, প্রবৃত্তি ছেড়ে সে ধরে নিবৃত্তির পথ, শুরু হয় অন্তরের নিঃসঙ্গ অভিযান। ইহ সে কোনও তৃপ্তিই খুঁজে পায় না, তার আত্মার সকল তৃপ্তি পরত্র। সাধারণ সমাজের সে কেউ নয়, তার সমাজ আলাদা—সাধুর সমাজ, বৈরাগীর সংঘ। মানুষের মধ্যে যখন এই দেওয়ানার ভাব জেগে ওঠে, তখন সে হয় পারত্রিক সিদ্ধির সাধক—যার প্রাচীন সংজ্ঞা হল 'নিঃশ্রেয়স'।

অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স দুয়েরই প্রেরণা আসে মানুষের স্বভাব থেকে। সুতরাং

পূর্ণযোগ দুয়েরই সত্যতাকে স্বীকার করে। তবে দুয়ের মাঝে স্পষ্টত যে-বিরোধ আছে, সে চায় তার সমন্বয় এবং উত্তরণ। অভ্যুদয় খোঁজে ভুক্তি, মুক্তির প্রতি সে অন্ধ; আবার নিঃশ্রেয়স খোঁজে মুক্তি, ভুক্তির প্রতি সে বিতৃষ্ণ এবং বিরক্ত। কিন্তু আগেই বলেছি, পূর্ণযোগ ভুক্তিতে-মুক্তিতে কোনও বিরোধ দেখে না। তবে একথাও সে জানে, ভুক্তিবাসনা এবং মুক্তিবাসনা দুয়ের ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে দুয়ের মাঝে সমন্বয়সাধন সম্ভব নয়।

সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে জীবনের মধ্যে অলক্ষ্যে চলছে চেতনার উত্তরায়ণের কাজ—তারই নাম যোগ। মানুষ যে দেহ-প্রাণ-মনের উৎকর্ষ চাইছে অভ্যুদয়ের পথে, তাও সেই যোগশক্তির কাজ। কিন্তু উৎকর্ষ সম্যক্ সিদ্ধ হয় না, যদি ঊর্ধ্বতন শক্তির আবেশ না ঘটে। দেহের চাইতে প্রাণ ঊর্ধ্বতন, প্রাণের চাইতে মন। মানুষ মনের সহায়ে সচেতনভাবে দেহ-প্রাণ-মনের উৎকর্ষ চাইছে। কিন্তু মনই তো চিৎশক্তির শেষ নয়। মনের ঊর্ধ্বতন শক্তি হচ্ছে বিজ্ঞান। মানুষ যদি দেহ-প্রাণ-মনকে বিজ্ঞানের অধীন করতে পারত, তাহলে তাদের উৎকর্ষ পূর্ণতর হত। এই বিজ্ঞানশক্তিও মানুষের মধ্যে কাজ করছে। তারই প্রেষণায় সে হয় অধরার সন্ধানী। হতে গিয়ে দেহ-প্রাণ-মনকে সে ছেড়ে যেতে চায়—এইখানে তার ন্যূনতা। পূর্ণযোগ চায় এই ন্যূনতার আপূরণ। ইহ এবং পরত্রকে সে মিলিয়ে দিতে চায় ঐশ্বরযোগের মধ্যে।

*

দেহ প্রাণ আর মন এই নিয়েই মানুষ, এর ওপারে যদি তার মধ্যে কিছু থেকে থাকে তাহলে সে কেবল ধোঁয়া—মানুষের স্বরূপসম্বন্ধে এই হল ঐহিক দৃষ্টি। পারত্রিক দৃষ্টিতে মানুষ চিন্ময়, দেহ-প্রাণ-মন একটা বিভ্রম। পূর্ণযোগের দৃষ্টিতে মানুষ এই দেহ-প্রাণ-মনের মধ্যে থেকেই চিন্ময়। দেহ-প্রাণ-মন চৈতন্যের প্রকাশের আধার। চৈতন্য পুরুষ, দেহ-প্রাণ-মন প্রকৃতি। পুরুষেরই আত্মপ্রকৃতি, সুতরাং মূলত তাদের মাঝে কোনও বিরোধ নাই। নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতরে প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের প্রকাশের একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে—যেমন দেখি প্রাণের অবরভূমিতে, মানুষের শৈশবে বা কৈশোরে। এইপর্যন্ত বলা যেতে পারে প্রকৃতির সিদ্ধ পরিণাম। ততক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের কোনও বিরোধ নাই। কিন্তু পরিণামের আরেক পর্ব এগিয়ে যেতে হলেই বিরোধ

শুরু হয়। পুরুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে-সংবেগ আছে, তা বাধা পায় প্রকৃতির জড়ত্ব অর্থাৎ নিয়তিকৃতনিয়মের অনুবর্তিতার কাছে। বাধার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সৃষ্টি হয় বিক্ষেপের, পুরানো নিয়ম ছেড়ে নতুন নিয়মে চলতে গিয়ে প্রকৃতি যেন বানচাল হয়ে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষের দৃষ্টিও হয় আচ্ছন্ন। এই বিক্ষেপ ও আচ্ছন্নতার পর্ব হল চিৎপরিণামের সন্ধিপর্ব। তার একদিকে আছে মূঢ়তায় প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা, আরেকদিকে প্রকাশে উত্তরণের। যেমন অগ্নিগর্ভ ইন্ধনের ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে জ্বলা। এইটাই সঙ্কটকাল, সাধনজীবনে একটা নিদারুণ অস্বস্তির সময়। অথচ এই সন্ধিপর্বকে ডিঙিয়ে যাবার কোনও উপায় নাই।

বাধাটা অপরা-প্রকৃতির। কিন্তু প্রকৃতির সবখানিই তো অপরা নয়। ওই অপরা-প্রকৃতির অন্তরালেই কাজ করছে পরা-প্রকৃতি—অভীপ্সা শ্রদ্ধা উৎসাহ বীর্যের আকারে। ভিজা কাঠে আগুন ধরাতে গেলে ধোঁয়া হয়। দোষ কাঠের নয়, ভিজা হওয়াটাই দোষের। শূন্যে-শূন্যে আগুন জ্বলে না। প্রকৃতিকে নিয়েই পুরুষের সাধনা, তাকে বাদ দিয়ে নয়। যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণই সাধনা: সে-সাধনা যদি মরণের হয়, তবুও জীবন দিয়েই তার সাধনা।

প্রকৃতির সঙ্গে অবিবেককে বজায় রেখে যে ঐহিক সিদ্ধি তা যেমন একটি অন্ত, তেমনি প্রকৃতি থেকে ছিটকে পড়ে পারত্রিক সিদ্ধি খোঁজা—এও আরেকটি অন্ত। পূর্ণযোগীকে এ-দুটি অন্তই পরিহার করতে হবে। অপরা-প্রকৃতির সঙ্গে যেমন জড়িয়ে থাকতে চাই না, তেমনি প্রকৃতির সঙ্গে ঐকান্তিক ছাড়াছাড়িই পুরুষার্থ একথাও বলতে চাই না। একটা মধ্যপথ আছে—প্রকৃতির রূপান্তর। আগুন ভিজা কাঠকে শুকিয়ে তাকে পুরাপুরি আগুন করে তুলতে পারে; তখন কাঠ আগুনেরই ঘনবিগ্রহ।

রূপান্তরই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। তার আদিপর্ব হল তপস্যা। তপস্যা অপরা-প্রকৃতির শুদ্ধির জন্য—ভিজা কাঠে আগুন ধরাবার জন্য তাতে তাপসঞ্চার করা, তাকে আগুনের সংস্পর্শে আনা। এইখানে আত্মপ্রচেষ্টার দরকার। সাধনায় উৎসাহ থাকা চাই, আত্মশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করা চাই। যে-'আমি' অপরা-প্রকৃতির গোলাম ছিল এতদিন, তাকেই এখন করতে হবে তার প্রভু। সমর্পণের নামে হাত-পা ছেড়ে বসে থাকলে তার চলবে না, তাকে লড়তে হবে। কিন্তু লড়বে সে খুঁটির জোরে। আমি তাঁরই 'অংশঃ সনাতনঃ', আমার শক্তি তাঁরই শক্তি, আমার সিদ্ধি সুনিশ্চিত কেননা আমার সাধনার মূলে তাঁরই

বীসংকল্পের প্রেরণা—এই দৃঢ়মূল শ্রদ্ধাই সাধককে বীর্য দেবে। শক্তির যোগান আসবে উপর থেকে।

বৃহতের সঙ্গে অহংকে এমনি করে নিত্যযুক্ত রাখতে-রাখতে তার রং বদলে যায়, সে আতপ্ত হয়ে ওঠে। এই হতে রূপান্তরের শুরু : তা অহংএর বিলোপ নয়—কাঁচা আমির পাকা হওয়া। কাঁচা আমিতে চেতনার সঙ্কোচ আছে, তা-ই হল সবরকম যোগবিঘ্নের মূল। পাকা আমিতে এই সঙ্কোচ নাই, তার চেতনা আকাশের মত উদার স্বচ্ছ এবং প্রসন্ন। এই ব্যাপ্তিচৈতন্য হতে আধারে নিগূঢ় চিৎশক্তির স্ফুরণ হয়—ভোরের আকাশে আলো ফোটার মত। সে-আলো সবার উপর নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ে। কাউকে সে প্রত্যাখ্যান করে না, নিজের শুভ্র ঔজ্জ্বল্যে সবাইকে সে বর্ণাঢ্য করে তোলে। তপঃপ্রবুদ্ধ চৈতন্য অভ্যুদয়ের থেকে নয়, সাধক।

আলোতে থাকতে হবে—স্বচ্ছ লঘু শুভ্র পরিব্যাপ্ত আলোতে। সে-আলোর বিতানে আকাশ, আর তার আলিঙ্গনে পৃথিবী। তার স্পর্শে আবেশে জারণায় পৃথিবী অপরূপা। অন্তরিক্ষের ওপারে মেঘলোককে ছাপিয়ে সে-আলো—তাই সে অকুণ্ঠ, অম্লান। সে আকাশের আলো। সেই আকাশ—যা অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অসম্ভূতির মহাশূন্যতা। অথচ তারই পরঃকৃষ্ণতা হতে উৎসারিত এই 'ভুং ভাঃ'। আকাশ আলো আর পৃথিবী—তিন নিয়ে অখণ্ডমণ্ডলাকার এক পূর্ণতা। মনের উজানের আলো—বোধির আলো; আবার অগম শূন্যতা চুঁইয়ে-পড়া আলো। অতিমানসের আলো, বিজ্ঞানের আলো। রূপান্তরের তপস্যা সিদ্ধ হয় নিরন্তর অভিষেকে সে-আলো যখন হয় স্বভাবগত।

*

এপার-ওপার উজলে-তোলা উছলে-তোলা এই আলোতে নিরন্তর বাস করাতেই সিদ্ধির পূর্ণতা। এ-আলো সর্বত্র : অন্তরের গহনে অন্তর্যামী, বিশ্বের পরিব্যাপ্তিতে বিশ্বরূপ, আকাশের অগমে লোকোত্তর। অস্তিত্বের তিনটি মান (dimension)—অন্তরে বাইরে ঊর্ধ্বে, ব্যক্তিতে বিশ্বে এবং বিশ্বাতীতে : তিনটিই এই আলোতে পূর্ণ। একই বিজ্ঞান আত্মচৈতন্যে আবির্ভূত হয়েছে দৈবী সম্পদ্‌রূপে—বুদ্ধিকে করেছে প্রজ্ঞায় ভাস্বর, ধর্মকে স্বচ্ছন্দা, হৃদয়কে মিলনের মাধুরীতে লাবণ্যময় রসচেতনাকে দিব্যশ্রীর

২৪

সম্ভোগে তৃপ্ত ও সিসৃক্ষায় উচ্ছল, দেহ-প্রাণকে সৌম্যসুধার নির্ঝর। সে-বিজ্ঞানই এই দিব্যবিভূতির উচ্চাবচতায় বিশ্বে পরিকীর্ণ অথচ নিগূঢ় উৎসবনে (upsurge) ঊর্ধ্বস্রোতা, বিশ্বোত্তীর্ণে অমেয় অনির্বচনীয়ের অনিবার বিচ্ছুরণ।

সত্তার এই তিনটি মানে পরমকে পাওয়া, তাঁর দ্বারা আবিষ্ট এবং রূপান্তরিত হওয়া, ব্যষ্টি আধারকে তাঁর অমোঘ বীর্যের তেজস্ক্রিয়তার বাহন করা—এই হল পূর্ণসিদ্ধির স্বরূপ।

৩

গোড়ার কথা

পূর্ণ সিদ্ধিই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। আর পূর্ণসিদ্ধির স্বরূপ হল সাদৃশ্যমুক্তি বা গীতার ভাষায় সাধর্ম্যপ্রাপ্তি—মৃন্ময়ের চিন্ময়ে রূপান্তর। মৃৎ হতে চিৎ পর্যন্ত প্রকৃতিপরিণামের অনেকগুলি পর্ব। তাদের স্বরূপ না জানালে এই দুস্তর পথ অতিবাহন করা সম্ভব হবে না। মাটির মানুষকে খাঁটি হতে হবে; কিন্তু তার জন্য মাটি আর খাঁটি দুয়েরই তত্ত্ব জানা চাই। চাই মানুষের সমগ্র পরিচয়।

মানুষ মনোময় জীব। কিন্তু চলতি বা বৈজ্ঞানিক কোনও মনোবিদ্যাতেই তার সমগ্র পরিচয় আমরা পাব না, কেননা এসব বিদ্যার কারবার গড়পড়তা মানুষকে নিয়ে। যে-ঐহিক সিদ্ধির কথা আগে বলেছি, গড়পড়তা মানুষ তার বেশী কিছু চায় না। জড় ফুঁড়ে প্রাণের বেগে সে মন পর্যন্ত উঠেছে, মনকেও যে সে ছাড়িয়ে যেতে পারে, এটা তার ধারণায় আসে না, তার প্রয়োজনও সে অনুভব করে না। কিন্তু মনই যে মানুষের চৈতন্যের সবখানি নয়, একথা কেউ-কেউ বোঝে। তারা মৃৎকে জীবনের নিয়ামিকা শক্তি মনে করে না, করে চিৎকে। অর্থাৎ পশুর মত পিছনের ঠেলায় তারা চলতে চায় না, সত্যকার মানুষের মতই চলতে চায় সামনের আকর্ষণে। এই আকর্ষক শক্তি হল বিজ্ঞান—স্বনিষ্ঠ সামান্যপ্রত্যয় অন্তরাবৃত্তি আর আত্মসচেতনতা যার বৈশিষ্ট্য। এইগুলির আবির্ভাবে মানুষ দ্বিজ হয়—ধরে যোগের পথ, চিন্ময় আত্মোৎকর্ষণের পথ। সে-পথ গড়পড়তা মানুষের নাগালের বাইরে। বিজ্ঞান তার দিশারী। কিন্তু বিজ্ঞানভূমির খবর মনোবিদ্যাতে পাওয়া যাবে না, যাবে অধ্যাত্মবিদ্যায়।

উপনিষদে আছে, 'ইন্দ্রিয়ের মুখ বাইরের দিকে, তাই মানুষ বাইরটাই দেখে, ভিতরটা নয়। কদাচিৎ কোনও ধীর দৃষ্টির মোড় ফিরিয়ে আত্মাকে মুখামুখি দেখতে পায়—অমৃতের পিপাসায়।' এই দেখাতে উপলব্ধ হয় আত্মার মহিমা। মানুষ অনুভব করে, আপাতত সে যা হয়ে আছে তা-ই তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। তার গভীরে নিগূঢ় হয়ে আছে এক অনন্ত সত্তার শান্তি, চৈতন্যের দীপ্তি, শক্তির উদ্যতি, আনন্দের আন্দোলন। সে সৎ-চিৎ-আনন্দ—এই তার

নিত্য স্বরূপ; তার প্রাকৃতজীবন এই নিত্যের লীলা। এই নিত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে তার আলোতে আর শক্তিতে লীলার স্ফুরত্তাকে (dynamism) সার্থক করা তার জীবনের দিব্য নিয়তি। এই অনুভবই অধ্যাত্মসিদ্ধির প্রবর্তক।

*

সিদ্ধির চারটি সাধন—দেহ প্রাণ মন আর অতিমানস। এদের কথা বিস্তারিতভাবে অন্যত্র বলেছি এবং বলবও, এখানে একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে যাই শুধু।

মনকে দিয়ে শুরু করি, কেননা চেতনার স্বরূপ ও শক্তির প্রাথমিক পরিচয় আমরা পাই আমাদের মনেই। মনের মুখ্য শক্তি হল জানবার শক্তি। সে অনেক-কিছু জানে এবং জানতে পারে, কিন্তু সব জানে না। তার জানার সীমা আছে, তার মধ্যে নৈশ্চিত্যের অভাবও আছে। বাইরের জানার পরিধি সে প্রসারিত করে অনুমান দিয়ে। অনুমানের নির্ভর হল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ। তার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। মনের পরাক্-বৃত্ত (objective) অনুভব সে-সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। তাই জ্ঞানের পরিধি চেতনার একটা তলেই প্রসারিত হতে পারে, উপরে উঠতে পারে না। মনের প্রত্যক্-বৃত্ত (subjective) অনুভব অতীন্দ্রিয় হতে পারে, এবং এই পথে জ্ঞান চেতনার আরেকটা তলে উঠতে পারে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যে কত সংকীর্ণ তা আমরা সবাই জানি। হয়ে জানা হল জানার চরম, জ্ঞানের এটি একটি বিশিষ্ট প্রকার (mode)। কিন্তু মন এটিকে বাইরের বস্তুর বেলায় অতিসামান্যই প্রয়োগ করতে পারে।

অথচ এইধরনের জানার একটা প্রবণতা মনের মধ্যেও আছে। মন 'ন চিকেত' অর্থাৎ এখনও জানেনি, কিন্তু বিদ্যার অভীপ্সা তার মধ্যে আছে। সে-অভীপ্সা কখনও- কখনও তাকে হয়ে জানার পথে ছোটায়—দৃষ্টিকে অন্তরাবৃত্ত করে। তখন সে চেতনার আরেকটি বৃত্তির সন্ধান পায়—যার নাম ব্যক্তিতে 'বিজ্ঞান', আর বিশ্বে 'অতিমানস'। অতিমানস জ্ঞান অপরোক্ষ অতএব নিশ্চিত এবং বাইরে-ভিতরে সর্বত্র নিঃসীম। যোগে তার নাম 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা'। এই প্রজ্ঞার আভাস মনশ্চেতনায় ফুটে ওঠে প্রাতিভসংবিৎ (intuitional flashes) এবং বোধির আকারে, প্রাণের ক্রিয়ায় সহজাতবৃত্তি (instinct) হয়ে, জড়ের মধ্যে নিয়তিকৃতনিয়মের প্রবর্তনায়।

তারপর প্রাণ, যা চৈতন্যের রূপকৃৎ শক্তি। দেহ আর মনের মাঝে সে সেতুর মত। চৈতন্যের প্রকাশ প্রবৃত্তি (function) এবং উল্লাসের জন্য সে জড়কে উপাদান করে রূপ গড়ে চলেছে। জড়ের মধ্যে যে রূপের আবর্তন এবং উদ্‌বর্তন (emergence), তাও প্রাণের অর্থাৎ নিগূঢ় চিৎশক্তির ক্রিয়া। প্রাকৃতভূমিতে প্রাণের ক্রিয়া ব্যামিশ্র এবং কুণ্ঠিত। কিন্তু এর ঊর্ধ্বে তারও একটা স্বধাম আছে, যেখানে সে বিশুদ্ধ এবং স্বচ্ছন্দ

তারপর জড়, যা আমাদের দেহের মুখ্য উপাদান। প্রাণ যেমন রূপকৃৎ, জড়ও তেমনি রূপধাতু বা রূপায়ণের বস্তুভিত্তি। মন প্রাণ এবং জড়—এ-তিনের ওতপ্রোত সম্পর্ক। সাংখ্যের ভাষায় মন সত্ত্বপ্রধান, প্রকাশ তার সহজ ধর্ম; প্রাণ রজঃপ্রধান, তার সহজধর্ম হল প্রবৃত্তি; আর জড় তমঃপ্রধান, তার ধর্ম স্থিতি (inertia), যার দরুন সে প্রাণের সাবলীল ক্রিয়ার আধার হতে পারে। তিনটির মাঝে প্রকৃতির পরিণাম চলছে যেন রাতের অন্ধকার (তমঃ) হতে পুবের আকাশ লাল (রজঃ) হয়ে আলো (সত্ত্ব) ফোটার মত। আপাতদৃষ্টিতে অন্ধকার আলোর একেবারে বিপরীত; কিন্তু বস্তুত আলো তার মধ্যে রয়েছে নিগূহিত (involved) হয়ে। সূর্যাস্তের সময় পশ্চিমের আকাশ আবার লাল করে আলো মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের গভীরে। এমনি করে প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে চলছে ত্রিগুণের লীলা।

আরেক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, চৈতন্য হল ভাব আর জড় হল রূপ —দুয়ের মাঝে 'অবিরাম যাওয়া-আসার খেলাই হল প্রাণ। রূপ ছাড়া ভাবের প্রকাশ হবে কি করে? তাই যেখানে ভাব, সেখানেই রূপ আছে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর অনুভবের অনুকূল দেহ আছে। কয়লা না হলে আগুন ধরত কিসে? আগাগোড়া আগুন ধরে উঠল যখন, তখন তাকে কি বলব—কয়লা, না আগুন?

*

অধ্যাত্মসিদ্ধির এই চারটি সাধন। এদের সহায়ে কি করে চিৎশক্তির উদ্‌বর্তন সম্ভব তা বুঝতে গেলে চিৎপ্রকাশের আরেকটি ধারা নিয়ে কিছু আলোচনা দরকার।

একই চৈতন্যের দুটি দল : পুরুষ তার স্বরূপ, আর প্রকৃতি তার শক্তি।

পুরুষ প্রকৃতির দ্রষ্টা ভর্তা এবং ভোক্তা। প্রকৃতির সমস্ত পরিণাম 'পরার্থে' কি না পুরুষের জন্যে। অর্থাৎ চৈতন্য আছে বলেই ক্রিয়ার সার্থকতা, নইলে ক্রিয়া থাকলেই-বা কি না থাকলেই-বা কি। পুরুষের দৃষ্টির সামনে প্রকৃতির রূপ খুলছে। স্বরূপের উন্মোচনে পুরুষকে নন্দিত করে ক্রমেই প্রকৃতি তার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথম দৃষ্টিতে প্রকৃতি শুধুই 'প্রকৃতি'—'সর্বং প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ'। প্রকৃতির ক্রিয়া বিশ্ব জুড়ে, পুরুষ তার উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। প্রকৃতির করারও কোনও উদ্দেশ্য নাই, পুরুষের দেখারও কোনও আনন্দ নাই। ছবির পর ছবি ভেসে চলেছে আয়নার বুকে, আয়না নির্বিকার। এই দৃষ্টি মনের। পুরুষ এখানে প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত। সাধনার গোড়ায় এরও একটা সার্থকতা আছে। বিবেক অপরাপ্রকৃতির আবর্তন থেকে মুক্ত করে পুরুষকে স্বপ্রতিষ্ঠ করে।

কিন্তু চেতনার গাঢ়তায় পুরুষ যখন স্বচ্ছন্দ, তখন প্রকৃতির প্রতি তাঁর এই ঔদাসীন্য আর থাকে না। প্রকৃতি তখন পুরুষের আরও কাছে এগিয়ে আসে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষ দেখেন, বাইরের প্রকৃতি তাঁর অন্তঃপ্রজ্ঞার প্রতিচ্ছবি, তাঁর চেতনার বিবর্ত। আয়নার বুকে ছায়া পড়ছে না, তার ভিতর থেকে যেন ছবি ফুটছে। যেমনটা হয় স্বপ্নে—ভাবই বস্তুরূপে বিবিক্ত হয়ে দেখা দেয়। প্রকৃতি তখন পুরুষের ভাবাভাবলীলাপটীয়সী আত্মমায়া—বৈদিক অর্থে। পুরুষ তার ভর্তা।

আরও কাছে এলে প্রকৃতি পুরুষের আত্মশক্তি—স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে মহাকারণে, জাগ্রতে স্বপ্নে সুষুপ্তিতে তুরীয়ে, বহিঃপ্রজ্ঞায় অন্তঃপ্রজ্ঞায় প্রজ্ঞানঘনতায় প্রপঞ্চোপশমে বিলাসিতা ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়ারূপিণী চিন্ময়ী মহাশক্তি, পুরুষ ভোক্তা মহেশ্বর।

এমনি করে চেতনার গাঢ়তার তারতম্যে পুরুষের মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকৃতির স্ফুরত্তার বৈচিত্র্য। পুরুষ সে-বৈচিত্র্যের স্ব-তন্ত্র ঈশ্বর। পুরুষ যুগপৎ আত্মারাম হয়ে প্রকৃতিকে আত্মচৈতন্যে নিগূহিত করে রয়েছেন, বিশ্বরূপ হয়ে উন্মেষের উচ্চাবচতায় তাকে স্ফুরিত করছেন, আবার ব্যক্তিরূপে অভিনিবিষ্ট হয়ে তার ক্রিয়াকে একেকটা বিশিষ্ট খাতে বইয়ে দিচ্ছেন। এই নিয়ে তাঁর প্রকট-অপ্রকটের লীলা। সবসময় তাঁর সবটুকু প্রকট নয়। যেটুকু প্রকট, তার পিছনে রয়েছে অপ্রকটের আবেশ এবং প্রেষা (pressure)। আমাদের মধ্যে তা-ই ধরে অভীপ্সার রূপ।

অভীপ্সাই আমাদের মধ্যে যোগশক্তি, প্রকৃতির অব্যক্ত বীর্যকে ব্যক্ত করবার জন্য সামর্থ্য। আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চেতন প্রকৃতির মধ্যেও চিদভিব্যক্তির কাজ চলছে—কিন্তু অত্যন্ত মন্থর গতিতে। এই মন্থরতা দূর হয়, পুরুষ যখন প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে আত্মসচেতন হয়, তার স্বাতন্ত্র্যকে আবিষ্কার করে। তখন হতেই যোগের শুরু। যোগের লক্ষ্য প্রকৃতির বশীকার। বশীকার সিদ্ধ হয়, যোগী যখন যোগেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর ঐশ্বরযোগের সামর্থ্যকে সংসারে প্রবর্তিত হতে দেন।

*

অন্যত্র বলেছি, সত্তার সাতটি তন্ত্র (principle)—বিশুদ্ধ সত্তা চিৎ-তপঃ আনন্দ অতিমানস মন প্রাণ এবং জড়। প্রথম তিনটিতে পুরুষের পরার্ধ, পুরুষকে তখন বলি ব্রহ্ম। শেষের তিনটিতে পুরুষের অপরার্ধ, তাঁকে তখন বলি জীব। দুয়ের মাঝে অতিমানস—ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি, জীবের জননী। পর শক্তি এবং অবর—সব নিয়ে পুরুষ অখণ্ড। পুরুষের অবরভাগে অর্থাৎ দেহ-প্রাণ-মনে তাঁর পরভাগ এবং স্বরূপশক্তি অপ্রকট, কিন্তু গুহাহিত। বীজের মধ্যে বনস্পতি যেমন ঘুমিয়ে থাকে, তেমনি শিব-শক্তি জীবের মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন যেন। একেবারে ঘুমিয়ে নাই। তাহলে জাগা সম্ভব হত না। অবরভাগের মধ্যে পরভাগের আবেশ গভীর গহনে অর্ধমাত্রারূপী চিদ্‌বিন্দু হয়ে জেগে আছে। জীবনে চেতনার উত্তরায়ণের মূলে এই বিন্দুর বিস্ফারণ।

অবরভাগের বিস্ফারণ হচ্ছে ধীরে-ধীরে। তার গতিবেগ বাড়ে যখন ঊর্ধ্ব-শক্তির সঙ্গে তার যোগ হয়। তারও আবার একটা কাল আছে। সে-কাল যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ অবরভাগের মধ্যে চলে একটা দোটানা; দেহ-প্রাণ-মন একবার ঝোঁকে আলোর দিকে—একত্ব আনন্ত্য ও বিশ্বাত্মভাবনার দিকে, আবার ঝোঁকে আলো-আঁধারির দিকে—ভেদবুদ্ধি চেতনার সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণ অহন্তার দিকে। দীর্ঘকাল ধরে দোটানা, আগুন জ্বলবার আগে ধোঁয়ার অত্যাচার। সাধকের পক্ষে মর্মান্তিক।

কিন্তু উপায় নাই। এই আলো-আঁধারির রাজ্য হতেই শুরু করতে হবে আলোর অভিযান—শ্রদ্ধা নিয়ে, বীর্য নিয়ে।

৪

মনোময় পুরুষের সাধনা

মানুষ এখন দেহ প্রাণ আর অহংএর একটা সমবায়। অহং পুরুষ নয়। পুরুষ স্বরাট্, প্রকৃতির ঈশ্বর; কিন্তু অহং প্রকৃতির সৃষ্ট, বিবিক্ত এবং সংকীর্ণ ব্যক্তিচেতনার আধার। পুরুষের অভিমান তার আছে, কিন্তু সামর্থ্য নাই। আসলে সে প্রকৃতির যান্ত্রিক আবর্তনের দাস। মনে হয় দেহ-প্রাণ-মনের সে নিয়ন্তা; কিন্তু বস্তুত তার নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতির হুকুমে বাঁধাধরা কতকগুলি নিয়মের অনুবর্তন মাত্র। ব্যক্তিচৈতন্যকে এই যন্ত্রাচার হতে মুক্ত করে স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা, তাকে দেহ-প্রাণ-মনের সত্যকার ঈশ্বর করা আত্মসিদ্ধিযোগের লক্ষ্য।

*

এই যোগের প্রথম সাধন হল প্রত্যাহার (withdrawal)—অহন্তার বহির্মুখ প্রেরণায় দেহ-প্রাণ-মনের ক্রিয়ার সংগে জড়িয়ে না গিয়ে অন্তরের গভীরে আত্মবোধে বেঁচে থাকা অর্থাৎ বাইরে প্রকৃতির ক্রিয়া চলতে থাকলেও আপনাতে আপনি থাকা। অভ্যাসে আত্মবোধ একটু সুস্থিত হলে নিজের মধ্যে নিজেকে তখন আবিষ্কার করি মনরূপে নয়, অহংরূপে নয়—তাকেও ছাপিয়ে মনোময় পুরুষরূপে। মনোময় পুরুষ মন নন, মনের তিনি অধিষ্ঠান-চৈতন্য, প্রাণ ও শরীরের ঊর্ধ্বে। প্রাণ ও শরীর তাঁর উপাধি মাত্র, তাদের সত্তা না থাকলেও তাঁর সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকবে—এই বোধ অন্তরে তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পুরুষরূপে মনশ্চেতনার এই যে বিবিক্ত এবং স্ব-তন্ত্র বোধ, তার তিনটি প্রকার আছে। একটি হল সাক্ষিত্বের বোধ। প্রাকৃতমনের মধ্যে যে বৃত্তির খেলা চলছে, মনোময় পুরুষ তার সাক্ষী। শুধু উদাসীন সাক্ষীই নন, তিনি তাদের নিয়ন্তাও। মনের বীণায় তিনি খুশিমত সুরের আলাপ করতে পারেন, আর তাঁর সে-সুরের যোগান আসে বিশুদ্ধ মনোলোকের উৎস থেকে—যা প্রাকৃত

মনের অগোচর। এই থেকে তাঁর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অধিচেতন (subliminal) লোকের বোধ—যা এই পার্থিব লোকের চাইতে বৃহৎ ভাস্বর এবং সমর্থ, এ-লোক যার উপসৃষ্টি মাত্র। এইহতেই জাগে আরেকটি বোধ —বিশুদ্ধ মনশ্চেতনারও ঊর্ধ্বে বিজ্ঞানচেতনার বা অতিমানস চিন্ময় স্থিতির বোধ।

এই মনোময় পুরুষের বোধ চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লাগে। ততক্ষণ পর্যন্ত সাধকের মধ্যে ওঠা-নামার খেলা চলে, কিন্তু প্রাকৃতমনের মধ্যে নেমে এলেও ঊর্ধ্বস্থিতির স্মৃতি ও সংস্কার তাঁর লোপ পায় না। এখানে তিনি তখন প্রবাসী মাত্র, তাঁর স্বধাম হল ওইখানে। অভ্যাসের ফলে বোধ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সহজ হয় যখন, তখন জাগে আবেশের সামর্থ্য : মনোময় পুরুষ হন 'প্রাণ-শরীর-নেতা'। যেমন প্রাকৃতমনের পিছনে আছেন মনোময় পুরুষ, তেমনি প্রাকৃত শরীর ও প্রাণের পিছনে আছেন অন্নময় এবং প্রাণময় পুরুষ। অন্নময় পুরুষের অধিকার ব্যাপ্ত রয়েছে জড়লোকে। ওইটি তাঁর আধার, যদিও প্রাণ তাঁর প্রবৃত্তির এবং মন তাঁর প্রকাশের বিভূতি। তেমনি প্রাণময় পুরুষের অধিকার ব্যাপ্ত কালিক সম্ভূতির (becoming in time) লোকে—দেহ তাঁর রূপায়ণের আধার, আর মন তাঁর আত্মস্পন্দের সংবিৎ। তিনটি পুরুষ চিৎপুরুষেরই স্বগত বিভূতি, যাদের আশ্রয় করে তিনি হয়েছেন বিশ্বরূপ। দেহ-প্রাণ-মনের মধ্যে শুধু একটা উপরভাসা অহংএর বোধে নয়, তাদের গভীরে বিশ্বাত্মক এক পুরুষের বোধে উদ্দীপ্ত হতে পারলেই মুক্তির শক্তি হাতে আসে। মনের পিছনে মনোময় পুরুষকে আবিষ্কার করা—এইহতে এই বোধের শুরু। তারপর সেই পুরুষের শক্তিতে প্রাণ ও মনের প্রণয়নে বা প্রসাধনে তার সার্থকতা।

*

মানুষ বিশেষ করে মনোময়। তাই অধ্যাত্মসিদ্ধিতে মন হল তার প্রকৃষ্ট সাধন। মনকে তার মুক্ত করতে হবে—সাক্ষিচেতনা অধিচেতনা ও বিজ্ঞানচেতনার বোধকে উদ্দীপ্ত করে। দেহ আর প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকলে তার চলবে না —এমন-কি অন্নময় ও প্রাণময় পুরুষের সঙ্গেও নয়। বোধির সহায়ে মনকে ধরেই যেতে হবে মনের উজানে।

কিন্তু এই উজান-বওয়ার দুটি রীতি আছে। একটির লক্ষ্য হল অনাবৃত্তি অথবা উৎক্রান্তি—মনের বেগেই মনকে ছাড়িয়ে যাওয়া, আর এখানে ফিরে না আসা। এটি হল অমনীভাবের সাধনা বা নিরোধযোগ। বলা বাহুল্য, পূর্ণ-যোগের লক্ষ্য তা নয়। মুক্তির পরিণামে সে চায় শক্তির স্বাতন্ত্র্য, যাথেকে সে মুক্ত হল তার রূপান্তরের সামর্থ্য।

মুক্তির সাধনা শুরু হয় প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে সাক্ষিচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে। সাক্ষী অনাসক্ত, প্রকৃতিপরিণামের লক্ষ্যের প্রতি তাঁর কোনও ঔৎসুক্য নাই। তাঁর কাছে ভালও নাই মন্দও নাই। প্রকৃতির ক্রিয়া চলছে যেন এক যান্ত্রিক ব্যবস্থায়। চাকা ঘুরছেই। তার সংগে জড়িয়ে গেলে ঝাঁকুনি খেতে হবে, এই ভয় থেকে সাক্ষী সরে এসেছেন। এসে ভালই আছেন একথাও এখন তিনি আর বলতে চান না। আছেন শান্ত হয়ে। সে-শান্তি কৈবল্যের গহনতায়, ভাল-মন্দের অতীতে।

সাক্ষী হলেও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির কাজ কিন্তু চলতেই থাকে। কিন্তু চলে কার প্রেষণায় (urge)? একটা জবাব হচ্ছে, কারও প্রেষণায় নয়—প্রকৃতির নিজের খেয়ালখুশিতে। চলা তার স্বভাব বলেই সে চলে; প্রকৃতি পরিণাম-ধর্মিণী। কিন্তু এই প্রকৃতির মধ্যেই একসময় দেখা দিয়েছিল প্রাকৃতপুরুষের অহংএর প্রশাসন। অহং মনে করত সে স্ব-তন্ত্র, প্রকৃতির সে শাস্তা। মনে করাটা একেবারে মিথ্যা নয়, সম্পূর্ণ সত্যও নয়। পুরুষের সংস্পর্শে না এলে প্রকৃতির ক্রিয়ার কোনও অর্থ থাকে না। চৈতন্য পুরাপুরি কর্তা না হক, দ্রষ্টা এবং ভোক্তা তো বটেই। পুরুষ দেখছে অর্থাৎ প্রকৃতির ক্রিয়াকে অনুভব করছে এবং তার ফলে সুখ-দুঃখে আন্দোলিত হচ্ছে; তাতেই প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ এবং সার্থকতা। নিজের ইচ্ছাতে প্রকৃতিকে চালাবার খানিকটা ক্ষমতাও তার আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষমতা নাই বলে তার ভোগ আর ইচ্ছা ব্যাহত বলে মনের দুঃখে সে প্রকৃতির অসহযোগ করে বিবেকী হয়েছে, সাক্ষী হয়েছে।

এই সাক্ষিত্বের মধ্যে পুরুষ খুঁজে পেলেন আরেকধরনের স্বাতন্ত্র্য—নিজের ইচ্ছামত প্রকৃতিকে চালাবার স্বাতন্ত্র্য নয়, কিন্তু নিজের মধ্যে নিজে অচল থাকবার স্বাতন্ত্র্য। বলা বাহুল্য, এই রাসটানাতেও কিন্তু পুরুষের শক্তিরই পরিচয় মেলে। আর এই শক্তিও তো পুরুষের আত্মপ্রকৃতি।

প্রকৃতির সংগে তাহলে পুরুষের দুরকম সম্পর্ক দাঁড়াল। একদিক দিয়ে পুরুষ প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত এবং স্বতন্ত্র, প্রকৃতির ক্রিয়া এবং তজ্জনিত ভোগ

তিনি স্বীকার করতে বাধ্য নন। এমন-কি চেতনার দীপ নিবিয়ে দিয়ে প্রকৃতিকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতেও তিনি পারেন—যদিও কতকালের জন্য সেসম্বন্ধে সংশয় করবার কারণ আছে। আরেকদিক দিয়ে স্বচ্ছন্দচারিণী প্রকৃতির তিনি ভর্তা, অনুমন্তা এবং আংশিক শাস্তাও বটে। তাঁকে না হলেও প্রকৃতির চলে না। চৈতন্য বা অনুভব না থাকলে প্রকৃতির খেলার সার্থকতা কোথায়?

প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃতি-পুরুষের মাঝে এই-যে সম্পর্কের দ্বৈধ, এর কি কোনও সমাধান নাই? প্রকৃতি হতে বিবিক্ত হয়ে, তার অভোক্তা অকর্তা দ্রষ্টা হয়ে তিনি আত্মস্বাতন্ত্র্যের এবং আত্মশক্তির পরিচয় দিলেন। সেও জীবনের একটা সিদ্ধি। কিন্তু দ্রষ্টা থেকেও তিনি কি তার 'ভোক্তা মহেশ্বর' হতে পারেন না? প্রাকৃতপুরুষের অহন্তায় ভোগৈশ্বর্যের যে আংশিক প্রকাশ দেখা দিয়েছিল, তার পূর্ণতা কি সম্ভব নয়?

সম্ভব। কিন্তু মনের ভূমিতে নয়—তার ঊর্ধ্বে বিজ্ঞান এবং আনন্দের ভূমিতে। সাক্ষীর যে বিবিক্ত তটস্থতা, এমন-কি চেতনার যে-দীপনির্বাণ, অকম্পনীয় শক্তির পরিচয় হলেও তা মনোবাসিত। যে-দ্বৈত মনের স্বধর্ম, এখানেও দেখছি তারই সংস্কার অখণ্ড সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, তাইতে পুরুষ প্রকৃতির বাইরে পড়ে আছে। সাক্ষী-পুরুষের প্রকৃতি সম্পর্কে যে-চেতনা, সে হল মানস চেতনা। তাকে জ্ঞান বলতে পারি, কিন্তু বিজ্ঞান বলব না; কেননা তার মধ্যে উপশমের সামর্থ্য থাকলেও উল্লাসের সামর্থ্য নাই। তিনি খেলা দেখছেন—তাও নিরুৎসুক ঔদাসীন্য নিয়ে; কিন্তু খেলার পাণ্ডা হয়ে তাকে চালিয়ে নিচ্ছেন না। এইখানে তাঁর শক্তির দৈন্য। প্রকৃতিকে জানছেন তিনি শুধু মনের স্তরে—যেখানে সুখ-দুঃখের আন্দোলন। ওখান থেকে তো প্রকৃতির ঈশ্বর হওয়া যায় না। তাকে জানতে হবে আরও গভীরে—বিজ্ঞান দিয়ে। আর সে-বিজ্ঞান উৎসারিত হয় পুরুষের স্বরূপের আনন্দ হতে। মনোময় পুরুষ হয়ে নয়, বিজ্ঞানময় আনন্দময় পুরুষ হয়েই প্রকৃতির ঈশ্বর হওয়া যায়।

*

এই পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি হল পুরুষের স্বারাজ্যসিদ্ধি। অনেক দূরের পথ, আর পথের গোড়াতেই অনেক বাধা। প্রথম বাধা হচ্ছে অবিদ্যার মূঢ়তা।

লক্ষ্যের সম্পর্কে যদি মানুষের চেতনা না থাকে, তাহলে সে পথ চলবে কিসের গরজে? বেশীর ভাগ মানুষেরই মনের ভাব, যেমন আছি বেশ আছি। কিন্তু সংসার যখন বেশ থাকতে দেয় না, তখন সে আপদের প্রতিকার খোঁজে বাইরে, ভিতরে নয়। মনে পড়ে উপনিষদের সেই কথা—সবাই দেখে বাইরটাকে, ক্বচিৎ কারও দৃষ্টির মোড় ফেরে ভিতরের দিকে।

যার ফেরে, মূঢ়তার বাধা কেটে গিয়ে তার সামনে দেখা দেয় বিক্ষেপের বাধা। প্রাকৃত সংস্কারের অভ্যস্ত ধারার বিপরীতে জীবনকে চালাতে গেলেই আধারের শক্তিগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে—দেহ-প্রাণ-মনের মাঝে আনুকূল্য আর প্রাতিকূল্যে সংঘর্ষ বাধে। চেতনা তাতে আবিল হয়ে পড়ে। আবিলতা দূর হয় আধারের শুদ্ধিতে—অনেক-কিছু অবাঞ্ছিতের বর্জনে এবং সংযমে, আর প্রতিপক্ষভাবনায়। প্রতিপক্ষভাবনা হল—যেমন আঁধার দূর করতে আলোর ভাবনা : আঁধারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে তাকে দূর করা যায় না। অবিশুদ্ধি অপরাপ্রকৃতির ধর্ম; তাকে দূর করবার জন্য বিবেকের সাধনা চাই। বিবেক আনবে মুক্তি, স্বরূপস্থিতির প্রশান্তি। প্রশান্তিতে ঊর্ধ্বশক্তির আবেশ হলে ঘটবে প্রকৃতির রূপান্তর এবং তাহতে ঋতচ্ছন্দ আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি। মোটামুটি এই হল পথের ছক।

কিন্তু সিদ্ধির পক্ষে সবচাইতে বড় বাধা হল অহন্তার সঙ্কোচ। প্রকৃতির অব্যাকৃতির (indeterminateness) মধ্যে ব্যাকৃতির প্রথম নিশানা হল অহন্তা। তাকে চৈতন্যের সূচীমুখ বলতে পারি, অন্ধকারের মধ্যে সে যেন একটি নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। সে বিবিক্ত, গোড়া হতেই আত্মা এবং অনাত্মা এই দুভাগে বিশ্বকে সে ভাগ করে নিয়েছে। তার বাইরে যা-কিছু সবই তার অনাত্মীয়। এইহতে তার মধ্যে দেখা দিয়েছে ভেদ ও বিদ্বেষের বুদ্ধি, বিশ্বের প্রতি একটি যুযুৎসার ভাব। কিন্তু বস্তুত সে বিশ্বের অঙ্গীভূত, তার সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু সংঘর্ষের নয়, সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষণেরও। আলোর মতই চৈতন্য ব্যাপ্তিধর্মা। অহংচেতনাও নিজেকে ব্যাপ্ত করতে চায়। পরকে আত্মসাৎ করে নিজেকে সে পুষ্ট করতে চায়—এই যেমন তার প্রাণের ধর্ম, তেমনি সমবেদনায় অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেকে সে বৃহৎ করে পায়—এই তার প্রেমেরও ধর্ম।

প্রেম হৃদয়কে বিস্ফারিত করে, অহংচেতনাকে মুক্ত শুদ্ধ এবং আনন্দময় করে। তার পরিণাম সর্বাত্মভাবে : 'আমার আত্মা সবার আত্মা',—এই অনুভবে।

তখন আর আমি অহং নই, আমি আত্মা। নক্ষত্রচেতনা তখন সৌরদ্যুতিতে প্রভাস্বর। দেহে প্রাণে মনে তখন আমি সবার সঙ্গে এক। আত্মা ব্রহ্ম সর্বভূত—তিনে এক, একে তিন।

এই হল পরমা সিদ্ধি। একদিকে পুরুষের পরিপূর্ণ সংবিৎএ স্বারাজ্যসিদ্ধি, আরেকদিকে আত্মভূত প্রকৃতির ঈশনায় সাম্রাজ্যসিদ্ধি। পুরুষ তখন আদিত্য-স্বরূপ : সূর্যরূপে সবার উদ্ভাসক, সবিতারূপে সবার প্রচোদয়িতা, ভগরূপে সবার হৃদয়ে-হৃদয়ে আবিষ্ট।

চিন্ময় মনে এই সিদ্ধির আভাস ফোটে বিদ্যুৎঝলকের মত। কিন্তু তার সত্যকার প্রতিষ্ঠা অতিমানসে।

৫

অন্তঃকরণ

সিদ্ধির পথে মনোময় পুরুষের অভিযানের মোটামুটি একটা ছক পেলাম। এখন তার পর্বগুলি খুঁটিয়ে দেখা যাক।

সিদ্ধির জন্য প্রথমেই দরকার অন্তঃকরণের শুদ্ধি। প্রশ্ন হবে, শুদ্ধির স্বরূপ কি? অন্তঃকরণই-বা কাকে বলব?

শুদ্ধতার একটি প্রতীক হল অবর্ণ নিস্তরঙ্গ আকাশ। শুদ্ধ চৈতন্য আকাশবৎ। তা-ই পুরুষের স্বরূপ। এই পুরুষকে কল্পনা করা হয় প্রকৃতি হতে বিবিক্ত, অসঙ্গ, নিস্পন্দ।

কিন্তু পুরুষ যদি প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হন, তাহলে কি তিনি শুদ্ধ থাকতে পারেন না? পৃথিবী অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোককে ছাপিয়ে যে-আকাশ, তা নিশ্চয় শুদ্ধ। কিন্তু এদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট যে-আকাশ, তা-ও কি শুদ্ধ নয়? আরও গভীরের কথা, এরাও কি শুদ্ধ হতে পারে না? পুরুষ গুণাতীত বলে শুদ্ধ, আর প্রকৃতি গুণময়ী বলে অশুদ্ধ—এই ভাবতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ভুলে যাই গুণাতীততা আর গুণময়তার মাঝে আরেকটা অবস্থা আছে—শুদ্ধসত্ত্বতা। তা-ই পরা বা পরমা প্রকৃতির স্বরূপ। অপরা এবং পরা দুই পুরুষের প্রকৃতি—একটি অশুদ্ধা, আরেকটি শুদ্ধা। পুরুষের ঈক্ষণে এবং প্রচোদনায় অশুদ্ধা প্রকৃতি রূপান্তরিত হচ্ছে শুদ্ধা প্রকৃতিতে—এই দৃষ্টিই সম্যক্ দৃষ্টি, কেননা এতে পুরুষ আর প্রকৃতির যুগনদ্ধতা ব্যাহত হয় না, সমগ্রভাবে সাধনার একটা তাৎপর্য এবং জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। আকাশের অবর্ণতা শুদ্ধির এক রূপ, আবার দ্যুলোকের আলোয় তার ভাস্বরতাও শুদ্ধির আরেক রূপ। অবর্ণতা আর শুভ্রতায় প্রতিষ্ঠিত হলে দেখি শবলতা বা বর্ণবৈচিত্র্যও তারই বিচ্ছুরণ, সুতরাং সেও শুদ্ধ।

দেহ প্রাণ হৃদয় আর মন—এই নিয়ে আমাদের অপরা প্রকৃতি। এর মধ্যে ভেজাল আছে, যার জন্য আমরা দুঃখ পাই, স্বচ্ছন্দ হতে পারি না। অপরা-প্রকৃতির শুদ্ধির একটি আদর্শ হল চারিত্রিক বিশুদ্ধি অর্জন করা বা পুণ্যাত্মা হওয়া। তার বাঁধা-ধরা কতকগুলি নিয়ম আছে, সমাজস্থিতির জন্য তা

আবশ্যকও। কিন্তু পূর্ণযোগের শুদ্ধির আদর্শ তাকেও ছাপিয়ে গেছে। তার শুদ্ধতা দ্বন্দ্বাতীততায়, 'ন পুণ্যং ন পাপম্' বেদান্তের এই মন্ত্রে।

'ন পুণ্যং ন পাপম্।' তার অর্থ এ নয় যে পূর্ণযোগী পাপ আর পুণ্যের মাঝে কোনও তফাত করবেন না; অথবা এও নয় যে, সংসারে পাপ-পুণ্য যখন সুখ-দুঃখেরই মত ওতপ্রোত, তখন যোগী অন্তরে বিবিক্ত থেকে বাইরে প্রকৃতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবেন। চারিত্রিক বিশুদ্ধি বা সদাচার যোগের প্রাথমিক অঙ্গ হিসাবে অপরিহার্য। তাকে ধরে কিছুদূর পর্যন্ত এগনো যায় এবং এগতেও হয়; কিন্তু চরম লক্ষ্যে সে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। সদাচারের ছক কাটা হয় দেশ কাল বা সংস্কার অনুসারে; গোড়াতে চিত্তশুদ্ধির সহায়ক হলেও শেষপর্যন্ত সে যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হতে পারে। মন শুদ্ধির যে-আদর্শ কল্পনা করে, তা সাত্ত্বিক হতে পারে; কিন্তু গুণাতীত ভূমি হতে হয়তো দেখা যাবে, সে-সাত্ত্বিকতার মধ্যে মোহের ভেজাল রয়েছে—যেমন কুরু-ক্ষেত্রে প্রথমটায় অর্জুনের ছিল। বস্তুত সাত্ত্বিকতা আর শুদ্ধসত্ত্বতা এক কথা নয়। সাত্ত্বিকতা মনের সম্পদ, আর শুদ্ধসত্ত্বতা হল অতিমানসের স্বগুণ। পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব মনের; অতিমানসে আছে সত্যে জ্ঞানে আনন্দে প্রেমে ও শক্তিতে আনন্ত্যের সহজ প্রকাশ। তাই মনঃকল্পিত পাপপুণ্যের মাপে তাকে মাপা যায় না, তার পাপ-পুণ্যের ধারণা প্রচলিত সংস্কারের অতীত।

অশুদ্ধতার মূলে কি আছে বুঝতে পারলে শুদ্ধির স্বরূপ বোঝা যাবে। অশুদ্ধতার প্রথম হেতু হল অবিদ্যা এবং তজ্জনিত দৃষ্টির বিপর্যয়। অবিদ্যা বলতে বুঝি চেতনার সঙ্কোচ। আমরা সবটুকু জানি না বা বুঝি না। যেটুকু জানি বা বুঝি, তাকেই একান্ত করে আঁকড়ে ধরে পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খাই। চিত্ত তাতে আবিল হয়ে ওঠে। অশুদ্ধতার আরেকটি হেতু হল আধার-শক্তিগুলির মধ্যে ক্রিয়ার ব্যমিশ্রতা। আমাদের মধ্যে চিৎশক্তির একটা ঊর্ধ্বপরিণাম ঘটছে—যেমন দেহের মধ্যে ফুটছে প্রাণ, প্রাণের মধ্যে মন ইত্যাদি। কিন্তু কেউ তারা স্ব-তন্ত্র হয়ে ফুটছে না, ঊর্ধ্বতত্ত্বকে নির্ভর করতে হচ্ছে তার নীচের তত্ত্বের উপর এবং তাইতে তার ক্রিয়ার মধ্যে দেখা দিচ্ছে একটা কুণ্ঠা এবং ব্যামিশ্রতা। চিত্তের আবিলতার এই আরেকটি কারণ।

একটা উদাহরণ দিলে এই অবিশুদ্ধির ধরন বোঝা যাবে। প্রাণের ধর্ম হচ্ছে আত্তীকরণ (assimilation) এবং সম্ভোগ। তার শুদ্ধ রূপ হল আবেশ এবং আনন্দ—যেমন এক বহুতে আবিষ্ট হয়ে তাদের সম্ভোগ করে

নন্দিত হচ্ছেন। এটি একটি পরিব্যাপ্ত এবং নির্লিপ্ত চেতনার আত্মারামতার বৈভব। কিন্তু সঙ্কীর্ণ জীবচেতনায় ওই আবেশ আর আনন্দ ধরল বাসনা আর বুভুক্ষার রূপ। প্রাণ মন-বুদ্ধিকে নিয়োজিত করল এদের দাবি মেটাতে। দৃষ্টির বিপর্যয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দিল ক্রিয়ার ব্যামিশ্রতা। চিত্ত আবিল হয়ে উঠল।

এই আবিলতা হতে মুক্তি হল যোগের প্রথম সাধ্য।

*

একদিকে আমাদের রয়েছে দেহ যাকে বলতে পারি চিদাবিষ্ট জড়, আরেকদিকে মন যা হল জড়াশ্রিত চিৎ। দুয়ের মাঝে চলছে প্রাণের খেলা বা চিৎশক্তির উল্লাস। দেহ প্রাণ মন সব চিৎশক্তির ক্রমসূক্ষ্ম বিভূতি। প্রাচীনেরা আধারকে শরীর নাম দিয়ে আত্মার তিনটি শরীরের কথা বলেছেন—স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর আর কারণশরীর। প্রাকৃতচেতনায় স্থূলশরীরের অনুভব প্রধান হয় জাগ্রতে, সূক্ষ্মশরীরের স্বপ্নে, আর কারণশরীরের সুষুপ্তিতে। যোগচেতনায় এই অনুভব বিস্ফারিত হলে আত্মা যথাক্রমে হন বৈশ্বানর বা বিরাট, তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ, এবং প্রাজ্ঞ বা ঈশ্বর। স্থূলশরীর স্থূলপ্রাণ দ্বারা বিধৃত, স্থূল করণ (instruments) বা ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিতে তার প্রকাশ। তেমনি সূক্ষ্মশরীর বিধৃত সূক্ষ্মপ্রাণ (psychic prana) দ্বারা, আর কারণশরীর চিন্ময় মহাপ্রাণ দ্বারা। সূক্ষ্মপ্রাণের বৃত্তি হল অন্তঃকরণ। প্রাচীন মতে তার চারটি বিভাগ—চিত্ত মন বুদ্ধি এবং অহংকার। সূক্ষ্মের সঙ্গে স্থূল মিশ্রিত হয়ে আছে। এই ব্যামিশ্রতার বাহন হল আমাদের নাড়ীতন্ত্র (nervous system)। নাড়ীসঞ্চারী প্রাণ অশুদ্ধির হেতু বলে প্রাচীন যোগে নানা উপায়ে নাড়ীশোধনের ব্যবস্থা আছে। অশুদ্ধি বিশেষ করে প্রকট হয় বাসনাতে (desire)।

তাহলে দেহ আর তার মধ্যে নাড়ীতন্ত্র, প্রাণ আর তার বৃত্তিরূপী বাসনা এবং ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবার বিশেষ করে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ যার বিভাগ হল চিত্ত মন বুদ্ধি এবং অহংকার—এইগুলি নিয়ে আমাদের আধার। তার ঊর্ধ্বে অথচ তাতে নিগূঢ় হয়ে আছে ঈশ্বরশক্তি বা অতিমানস। সিদ্ধির সে-ই প্রয়োজক।

এখন অন্তঃকরণের একেকটি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথম ধরা যাক চিত্তের কথা। আধারের মধ্যে যে-আলয় (basic)-চৈতন্য, তার নাম চিত্ত। আধারের সমস্ত অনুভব আর ক্রিয়ার উৎস হল সে-ই : ওগুলিকে বলা যায় চিত্তবৃত্তি। জড় আর প্রাণের মত চিত্তও বিশ্বব্যাপী একটা তত্ত্ব, জড়ে তার ক্রিয়া অবচেতন এবং যান্ত্রিক। আমাদের আধারে চিত্তের দুরকম ক্রিয়া—গ্রাহক আর কারক। গ্রাহকচিত্ত বাইর থেকে অনুভবের উপাদান গ্রহণ করে, আর কারকচিত্ত তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বৃত্তিকে বাইরে প্রতিক্ষিপ্ত করে। চিত্তের অধিকার মনের চাইতে অনেক বিস্তৃত। মনের অজানতে চিত্ত অনেক-কিছু গ্রহণ ক'রে নিজের ভান্ডারে জমা রাখে এবং মাঝে-মাঝে মনের তলা থেকে উপরে তাদের ফুটিয়ে তোলে—নানা অপ্রাকৃত বা অধিচেতন (subliminal) অনুভবের আকারে। চিত্তের পুরাপুরি খবর মন রাখে না বলে তার অনেক-কিছুই তার কাছে ঠেকে অবচেতন।

প্রাচীনেরা স্মৃতিকে চিত্তের একটা বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতেন। স্মৃতির উৎপত্তি অনুভবের সংস্কার (impression) থেকে। সব অনুভব মনের গোচর নয়, কিন্তু অবচেতন বা অধিচেতনরূপে চিত্তের গোচর। তাই মনের স্মৃতির বাইরেও স্মৃতি আছে—যেমন দেহের বা প্রাণের স্মৃতি। প্রকৃতিপরিণামের ভিতর দিয়ে এগুলি নানা সংস্কার বা অভ্যাসের আকারে আমাদের আধারে সঞ্চিত হতে থাকে—অনেকক্ষেত্রেই মনের অগোচরে। তাইতে তাদের ক্রিয়া অনেকসময় হয় দুর্বোধ এবং দুর্বশ। কিন্তু উদ্দীপ্ত চেতনাকে চিত্তের গভীরে তলিয়ে দিয়ে তাদের বশে আনা বা ইচ্ছামত পরিচালিত করা যোগীর অসাধ্য নয়।

চিত্তের আরেকটি বিসৃষ্টি হল ভাবমানস (emotional mind), মনের নানা প্রক্ষোভে বা আবেগে যা প্রকাশ পায়। ভাব হল জ্ঞান আর সঙ্কল্পের মাঝামাঝি। জ্ঞান হল গ্রাহক, আর সঙ্কল্প কারক। গ্রাহকচিত্তে বাইরের বা ভিতরের ছাপ পড়ল, কারকচিত্তে দেখা দিল তার প্রতিক্রিয়া। গ্রাহকচিত্তের যে-জ্ঞান, তাকে রঞ্জিত এবং স্বদনীয় করে তুলল ভাব—কারকচিত্তের সঙ্কল্পকে জোরালো করবার জন্য। জ্ঞান তটস্থ, সে হল চেতনায় পুরুষের অংশ; আর ভাব এবং সঙ্কল্পে আছে একটা ক্ষোভ ও প্রবেগ, তারা হল প্রকৃতির অংশ। চেতনা যখন প্রাকৃত, তখন প্রকৃতির দিকটাই তার মধ্যে জোর ধরবে। তাই অধিকাংশক্ষেত্রে ভাব আমাদের কাছে অসংবর হয়ে পড়ে। কিন্তু তাকেও বশে আনা যায়। ভাবের মধ্যে যে-স্বদনীয়তা, তার শুদ্ধরূপ হল রসচেতনায়। ওটি

চৈত্যসত্তার (psyche) ধর্ম। তার মধ্যে বাসনার বিকার এবং উচ্ছলতা নাই, আছে প্রসন্নতা বা আনন্দের প্রশান্তি। সে-ই ভাবের প্রশাস্তা।

এইপ্রসঙ্গে নাড়ীতন্ত্রের কথা তোলা যেতে পারে। প্রাণ যেমন দেহ আর মনের মাঝে সেতু, তার বাহন হিসাবে নাড়ীতন্ত্রও তা-ই। নাড়ীতন্ত্রের মধ্যে দেহের উপাদান প্রসাদযুক্ত হয়ে চেতনার অনেকখানি কাছে পৌঁছেছে। তাই নাড়ীতন্ত্রকে ধরে চেতনাকে উদ্দীপ্ত করা কোন-কোনও যোগের বিশিষ্ট সাধনাঙ্গ। প্রাকৃতচেতনায় নাড়ীতন্ত্রের সঙ্গে ইন্দ্রিয়নির্ভর মনের খুব নিকট সম্পর্ক। মনের নিচুতলার অনেক-কিছু এই সম্পর্কের আওতায় এসে পড়ে। কাম ক্রোধ ভয় ইত্যাদি ভাবময় চিত্তবৃত্তির অনেকখানি নাড়ীতন্ত্রিত, তাদের মধ্যে ভাবের চাইতে ইন্দ্রিয়সংবিৎএর প্রাধান্য, তাই তাদের প্রবেগও বাইরের দিকে। কাম আর প্রেমের তফাতও এইখানে। কাম বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য, নাড়ীবিক্ষোভজনিত প্রাণের বিকার, তাকে ভাবের পর্যায়ে ফেলতে বাধে। কিন্তু প্রেম একটি শুদ্ধভাব, অন্তর্মুখ আসঙ্গের প্রশান্ত নিবিড়তায় রমণীয়। নাড়ীতন্ত্র সেখানে ঊর্ধ্বস্রোতা বিশুদ্ধ প্রাণের বাহন।

*

তারপর মন। মন চিত্তেরই বিসৃষ্টি। আগেই বলেছি, চিত্তের চাইতে তার অধিকার সঙ্কীর্ণ। আমাদের প্রাকৃত মন ইন্দ্রিয়নির্ভর। জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে সে বাইরের জগৎকে জানে, আবার কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে তার উপর ক্রিয়া করে। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যান্ত্রিক এবং নাড়ীতন্ত্রিত। কিন্তু এ হল তাদের ক্রিয়ার দিক; স্বভাবের দিক দিয়ে তারা কিন্তু চেতনা বা চিত্তের সাধন। মন ইন্দ্রিয়ের সহায়ে বিশ্বের স্পন্দনকে গ্রহণ ক'রে তাদের রূপান্তরিত করে সংবিৎএ এবং তা-ই দিয়ে গড়ে তোলে একটা অন্তর্জগৎ বা অনুভবের জগৎ।

ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেমন স্থূল হতে পারে, তেমনি সূক্ষ্মও হতে পারে। সূক্ষ্ম বিষয়ের জন্য দরকার হয় সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের। সে-ইন্দ্রিয় চেতন মনের নয়, অধিচেতন মনের। দূরদর্শন দূরশ্রবণ চিন্তাসংক্রামণ সম্মোহন ইত্যাদি সম্ভব হয় এই মনের ইন্দ্রিয় দিয়ে। আমরা সাধারণত এসব অনুভবকে অতীন্দ্রিয় বলে রহস্যের কোঠায় ফেলি, ইন্দ্রিয়মানসের যে বিশিষ্ট শক্তি 'অনুমান' তারই সাহায্যে এদের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি। কিন্তু অনুমানের জ্ঞান পরোক্ষ, আর

ইন্দ্রিয়সংবিৎ অপরোক্ষ। অধিচেতন মনের ওই অনুভবগুলিও অপরোক্ষ। তাই তাদের অতীন্দ্রিয় না বলে সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের গোচর বলাই ভাল।

*

তারপর বুদ্ধি। এও চিত্তেরই বিসৃষ্টি, কিন্তু মনের ওপারে। মন ইন্দ্রিয়-নির্ভর বলে সবসময় বিশেষপ্রত্যয়ের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু বুদ্ধির কারবার সামান্যপ্রত্যয় নিয়ে। তাইতে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবনা তার দ্বারা সম্ভব হয়। তাছাড়া ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে তার মধ্যে আছে সংকল্পবৃত্তি, যা দিয়ে সে হয় আমাদের জীবন-মনের দিশারী।

বুদ্ধির তিনটি স্তর। প্রথমটি মনের কাছাকাছি। একে আমরা খাটাই প্রাকৃত-জীবনের প্রয়োজনে। মনের এনে-দেওয়া উপাদানগুলি দিয়ে সে ইন্দ্রিয়নির্ভর এবং প্রায়শই গতানুগতিক একটা জীবনাদর্শ গড়ে তুলে তার সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। এই আটপৌরে বুদ্ধি হল সাধারণ মানুষের।

এর চাইতে উঁচু স্তরের বুদ্ধি প্রকাশ পায় চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে, যারা নতুন করে ভাবে, জীবনকে বাইরে-ভিতরে গুছিয়ে নিয়ে একটা মহত্তর আদর্শের দিকে এগিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখে।

তারও উপরের স্তরের বুদ্ধি হল জ্ঞানতপস্বী এবং সত্যজিজ্ঞাসুদের। কোনও ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তাগিদে নয়, সত্যকে তার স্বরূপে জানবার প্রেরণাতেই বুদ্ধিকে তাঁরা নিয়োজিত করেন লোকোত্তরের গবেষণায়। বলা বাহুল্য খুব কম লোকই এই আকাশচারী বুদ্ধির অধিকারী।

বুদ্ধির উল্টো পিঠ হল বিজ্ঞান, যা অতিমানসের বৃত্তি। তাইতে সে লোক আর লোকোত্তরের মাঝে সেতুর কাজ করে। বুদ্ধির একটা দিক ফেরানো আছে মনের দিকে, আরেকদিক অতিমানসের দিকে। উপনিষদে এই বুদ্ধিকেই বলা হয়েছে সূক্ষ্মা অগ্র্যা বুদ্ধি, যা পরমার্থদর্শনের সাধন।

*

আত্মবোধের যে-চিদ্‌বিন্দুকে কেন্দ্র করে বুদ্ধি কাজ করছে, তার নাম হল অহংকার। গোড়াতে অহন্তা নিজের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, কিন্তু

তবুও তার মধ্যে একটা বিস্ফারণের প্রেরণা আছে। কুণ্ডলিত অহং ইন্দ্রিয়নির্ভর, দেহ-প্রাণ-মনের প্রাকৃত ছাঁচের বাইরে সে যেতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধির উদ্দীপনায় তার মধ্যে ভাবের ছোঁয়া লাগে যখন, তখন সে নিজেকে প্রসারিত করতে পারে অপরের মধ্যেও। এই আত্মপ্রসারণের চরম পরিণাম হল সর্বাত্ম-ভাবনায়—অহন্তা তখন পূর্ণাহন্তা বা পরাহন্তা। অহং বস্তুত আত্মারই প্রতিবিম্ব। অহং—আত্মা—ব্রহ্ম : চৈতন্যের বিস্ফারণের এই পর্যায়।

৬

প্রাকৃতমনের শুদ্ধি

অন্তঃকরণের পরিচয় পেলাম। তার শুদ্ধি ছাড়া সিদ্ধি সম্ভব নয়। কিন্তু অন্তঃকরণের অনেক বৃত্তি, আর তারা ওতপ্রোত এবং অনোন্যনির্ভর। তাইতে প্রশ্ন হয়, শুদ্ধির কাজ কাকে দিয়ে শুরু করা যেতে পারে? কোন্ বৃত্তি শুদ্ধ হলে পর অন্যান্য বৃত্তির শুদ্ধি সহজ হবে?

উপনিষদে আছে 'মনো বৈ যজমানঃ'—সাধনযজ্ঞের যজমান হল মন। মানুষ বিশেষ করে মনোময় জীব। সুতরাং সাধনা শুরু করতে হবে মন দিয়ে। তাই সবার আগে চাই মনের শুদ্ধি।

মনের নীচে প্রাণ, উপরে বুদ্ধি। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, মনের অশুদ্ধির একটা মূল কারণ হবে প্রাণের বিকার; আর তার শোধনের জন্য দরকার হবে বুদ্ধির সজাগ সহায়তা। প্রাণ এসে মনকে কাবু করে ফেললে তার কবল হতে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে উপরওয়ালার শরণ নিয়েই। চৈতন্য জড়ে নিমূঢ়, প্রাণে আচ্ছন্ন, মনে অনতিস্পষ্ট, আর বুদ্ধিতে স্পষ্ট। সুতরাং মনের মধ্যে প্রাণের বাধাকে কাটিয়ে উঠতে হলে বুদ্ধিরই সাহায্য নিতে হবে।

*

প্রাণচেতনাই (psychic prana) যদি মনের অশুদ্ধির কারণ হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিকারের জন্য প্রথমত তার স্বরূপটি চিনে নেওয়া দরকার। প্রত্যেকটি করণের (instrument) একটি শুদ্ধধর্ম আছে, আবার তার বিকারও আছে। প্রাণচেতনার শুদ্ধধর্ম হচ্ছে সম্ভোগ। স্বরূপত সম্ভোগ দোষের নয়। জীবনটা পেয়েছে সব-কিছু ভাল লাগবার জন্যই, শুকিয়ে মরবার জন্য নয়। সাংখ্যবাদীরা বলেন, যখনই তোমার কিছু ভাল লাগল, বুঝতে হবে প্রকৃতির সত্ত্বগুণ তোমার মধ্যে উদ্রিক্ত হল। সত্ত্বগুণের লক্ষণ হচ্ছে লঘুত্ব আর প্রকাশ : ভাল লাগায় তোমার চেতনা হালকা হল, স্বচ্ছ হল, উদ্দীপ্ত হল। সব সম্ভোগে প্রথমটা তাই হয়। আরও গভীরের দিকে দৃষ্টি রেখে বলা যায়, সব সম্ভোগে প্রথমে

প্রকাশ পায় ব্রহ্মের আনন্দরূপ, বিষয়ানন্দে ব্রহ্মানন্দ। সম্ভোগের ভিতর দিয়ে রসরাজ বিদ্যুতের ঝলকে একবার উঁকি দিয়ে যান, কিন্তু থাকেন না। প্রাণ-চেতনা স্বচ্ছ সুন্দর ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেই আবার মলিন ও শ্রীহীন হয়ে যায়। তাকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত আধারকে তখন সম্ভোগের মাশুল দিতে হয়। কেন?

রসগ্রহণ যেমন প্রাণচেতনার শুদ্ধধর্ম, তেমনি তার বিকার হল বিশুদ্ধ সম্ভোগকে আবিলকরা বাসনার তাড়না। সাংখ্যের ভাষায় বলতে পারি, বাসনার মধ্যে আছে দুটি অবগুণ—রাজসিক চাঞ্চল্য আর তামসিক মূঢ়তা। এর মধ্যে মূঢ়তাই হল আসল দোষ। আগেও বলেছি, অশুদ্ধির একটি কারণ হল দৃষ্টির বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের আরেক নাম হল মূঢ়তা। আসল সুখ মনে; কিন্তু আমরা ভাবলাম, সুখ বিষয়ে। তাইতে বিষয়ের পিছনে ছুটতে শুরু করলাম। তা-ই থেকে চাঞ্চল্য—বিদ্বেষ ভয় রেষারেষি হানাহানি, জীবনের সহস্র ঝামেলা। প্রত্যাহারদ্বারা অন্তরের সুখকে অন্তরে ধরে রেখে প্রত্যয়ের একতানতায় চেতনাকে যদি উজান বইয়ে দিতে পারতাম, তাহলে সুখের যে-কোনও উপলক্ষ্যকে ধরে আমরা পৌঁছতে পারতাম চরম লক্ষ্য আনন্দে।

মূঢ় প্রাণবাসনার এই ক্ষোভ সংক্রামিত হয় মনে—তার ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প সব-কিছুকে আবিল করে তোলে। বুদ্ধির উপর ছায়া ফেলে তাকেও সে বিভ্রান্ত করে। মন-বুদ্ধি হয় তার তাঁবেদার : অন্ধ প্রাণের চাওয়াকে মনে হয় বেশ দেখে-শুনে ভেবে-চিন্তে চাওয়া বলে। এই হল ব্যামিশ্রতা—অশুদ্ধির দ্বিতীয় কারণ। চেতনার বহুদূর পর্যন্ত এর অধিকার বিস্তৃত।

প্রাণবাসনার এই উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল অশান্তি আর অবসাদ। মন তাথেকে মুক্তি চায়, কিন্তু পথ খুঁজে পায় না। অধিকাংশ মানুষের জীবনের এই করুণ ছবি।

*

প্রাণচেতনার বিকারের মূল রয়েছে দেহের মধ্যে। দেহ চেতনার প্রকাশের বাহন বটে, কিন্তু তার জড়ত্বই আবার চিৎপ্রকাশের একটা বাধা। প্রকাশ আনন্দ এবং শক্তির যে অসীম সম্ভাবনা চৈতন্যে নিহিত রয়েছে, তা সীমিত ও পঙ্গু হয়ে আছে দেহের মধ্যে। প্রাণ তাকে মুক্তি দিতে চায়,, কিন্তু পারে না; বাসনা

হয় সেই ব্যর্থতার রূপ। সর্বত্র যা হয়ে থাকে, এখানেও হয়েছে তা-ই : দেহ একটা অবরতত্ত্ব হয়ে পরতত্ত্বের উপর ছায়া ফেলেছে, দেহের জড়ত্ব এবং পঙ্গুতা প্রাণ ও মনের স্বাচ্ছন্দ্যকেও করেছে কুণ্ঠিত। জড়দেহের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই প্রাণের ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি খোঁজে জড়ের মধ্যে, দেহাত্মবাদ হয়ে ওঠে মানুষের জীবনদর্শন। কিন্তু তার সার্থকতা আপাতত মাত্র : এ যেন পথের সন্ধানে কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়া। দেহ জরামৃত্যুর অধীন, অথচ প্রাণ আর মনের মধ্যে রয়েছে অজর অমৃতের পিপাসা—এও একটা ঝামেলা। তাছাড়া যত অভাবের মূলও এই দেহের মধ্যে। এক অখণ্ড চৈতন্য দৃশ্যত এই দেহকে অবলম্বন করেই বহু হয়েছেন, অতএব খণ্ডিত এবং সঙ্কুচিতও হয়েছেন। বহুভাবনার মধ্যে বৈচিত্র্যের যে-উল্লাস আছে, তাকে ছাপিয়ে অনেকসময় ভেদ বিরোধ আর সংঘর্ষই প্রবল হয়ে ওঠে দেহকে আশ্রয় ক'রে।

তবুও মনে রাখতে হবে, দেহ চিৎপ্রকাশের বাহন। দেহকে ছেড়ে প্রকাশের সাধনা চলতে পারে না, ইন্ধন ছাড়া শূন্যে-শূন্যে আগুন জ্বলে না। সমস্যার সমাধান হচ্ছে দেহকে উপেক্ষা বা পীড়ন করায় নয়, বুদ্ধির সহায়ে মনকে দেহ ও প্রাণের বশ্যতা হতে মুক্ত করায়। চেতনার প্রত্যাহার এবং অন্তর্মুখীনতার দ্বারা মনকে দেহ-প্রাণ হতে ঊর্ধ্বতন পৃথক শক্তি বলে ধারণ করা যায়। তখন দেহের ভাবনা রূপান্তরিত হয় দেহবোধের ভাবনায়; অর্থাৎ দেহ আর তখন বস্তুপিণ্ড নয়, কিন্তু বোধেরই একটা প্রকার মাত্র। কয়লায় তখন আগুন ধরে যায়; আমরা কয়লাকে আর বড় দেখি না, দেখি আগুনকে। শরীর যখন যোগাগ্নিময় হয়, তখন সে চিৎপ্রকাশের বাধক না হয়ে হয় সাধক।

সাধারণত আমরা মনে করি, কামনা আছে বলেই জীবনে রস আছে, কামনা না থাকলে তো জীবন শুকিয়ে গেল। তাই বেশীর ভাগ মানুষ কামনার স্রোতে জীবন ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু কামনার নিরঙ্কুশ তৃপ্তি সুসাধ্য নয়, সুমঙ্গলও নয়। এখানেও এক সমস্যা। কামনা নির্মূল করে দিয়ে বৈরাগ্যের মধ্যে কেউ তার সমাধান খোঁজে। কিন্তু এ যেন মাথা কেটে ফেলে মাথাব্যথার চিকিৎসা করা। বৈরাগ্যে বীর্য আছে, আবার একদেশদর্শিতাও আছে। আরেকটা সমাধান হচ্ছে ভোগ ও বাসনার সংযমে। অধিকাংশ লোকের পক্ষে সংযম আন্তরিক নয়, ভোগ আর ত্যাগের মাঝে একটা রফা। তাও লোকাপেক্ষায় বা সমাজের শাসনে। সংযম যাদের কাছে আন্তরিক, তারাও সুস্থ জীবনাদর্শের নামে রফার পথই

ধরে। তাতে স্বোত্তরণ (self-exceeding) বা চেতনার উত্তরায়ণের সাধনার কোনও ইশারা থাকে না।

সমস্যার সমাধান করতে হলে কামনা (desire) আর সঙ্কল্পে (will) তফাত করতে শিখতে হবে। কামনা আসে অভাববোধ থেকে; আর সঙ্কল্প হল স্বভাবের স্ফূর্তি। আমার যা নাই, তা-ই আমি কামনা করি, এবং তাকে খুঁজি বাইরে। আর আমার যা আছে, তাকে ফুটিয়ে তুলি সঙ্কল্পে। কামনা অশক্তের, আর সঙ্কল্প শক্তিমানের। কামনায় চিত্তের বহির্বৃত্তি, আর সঙ্কল্পে তার নিথরতা। সমস্ত তর্পণই অন্তশ্চেতনার প্রশান্ত প্রসন্ন উদার তর্পণ—ইন্দ্রিয় প্রাণ মন তার বাইরের নিমিত্ত মাত্র। উপনিষদে কথাটা এই সূত্রে প্রকাশ করা হয়েছে : যে আত্মারাম, সে-ই আপ্তকাম। আত্মস্থিতিতে জাগে স্বরূপের আনন্দ এবং তাহতে হয় শক্তির স্বচ্ছন্দ বিকিরণ। এই বিকিরণের মূলে রয়েছে যে-প্রবেগ, তা সত্যসঙ্কল্প যা কামনার দিব্যরূপ। সত্যসঙ্কল্পবান্ পুরুষের কাছে ভোগে বৈরাগ্যে কোনও বিরোধ নাই, দুয়ের মাঝে রফারও কোনও প্রয়োজন নাই; সংযম তাঁর কাছে কৃচ্ছ্রতা নয়, নিজেকে বঞ্চিত করা নয়, স্বভাবের তা সুশ্রী ও ক্ষেমঙ্কর প্রকাশ।

প্রাণকে বাসনার বিকার এবং উত্তালতা হতে মুক্ত করে আকাশবৎ অনাসক্ত প্রশান্ত ও প্রসন্ন চেতনার স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই ভূমিতে থেকেই মনঃশুদ্ধির সাধনা সহজ হবে।

একই মনের তিন রূপ—ভাবমানস (emotional mind), ইন্দ্রিয়মানস (sensational mind), আর সংবেগমানস (mind of impulse)। প্রাকৃতভূমিতে ভাব ইন্দ্রিয় আর সংবেগ সবারই ক্রিয়া যান্ত্রিক। মন যন্ত্রের যন্ত্রী বটে, কিন্তু তার দৃষ্টি ক্ষীণ এবং অপরিশুদ্ধ। দৃষ্টির সঙ্কোচে ক্রিয়ার পরিণাম হয় বিকৃত, সে-বিকারের জ্বালা আবার মনকেই ভুগতে হয়। মন যন্ত্রী হয়েও যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে তার এই দুর্ভোগ। মন হতে বিবিক্ত বুদ্ধির আছে স্বচ্ছন্দ এবং উদার দৃষ্টি, পরম লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মনের বৃত্তিকে শুদ্ধ করতে পারে সে-ই।

প্রাকৃতভূমিতে আমাদের মধ্যে চেতনার ক্রিয়া চলছে এইভাবে। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগে চেতনায় যে-সাড়া জাগল, তাতে চেতনা নড়ে উঠল—ক্রিয়ার বদলে দেখা দিল প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া হল চিত্তের সংবেগপ্রসূত। ইন্দ্রিয়সংবিৎ বা সাড়ার কোনও রং নাই, কিন্তু সংবেগের রং আছে : কোনও

কোনটাকে সে মনে করে অনুকূল, কোনটাকে প্রতিকূল। অনুকূলটা তার ভাল লাগে, তাকে সে আঁকড়ে থাকতে চায়, প্রতিকূলকে চায় বর্জন করতে। এমনি করে সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে দেখা দেয় ইচ্ছা-দ্বেষ। সুখ-দুঃখ পড়ে ভাবের এলাকায়, ইচ্ছা-দ্বেষ সংবেগের এলাকায়। সাংখ্যের ভাষায় বলা যেতে পারে, সংবিৎ পুরুষের ধর্ম, তাই তটস্থ; আর ভাব এবং সংবেগ প্রকৃতির ধর্ম, তাই দ্বন্দ্বে আন্দোলিত। কি ভাল লাগবে আর কি লাগবে না, কি চাই আর কি চাই না, তার অনেকটাই নির্ভর করে সংস্কারের উপর। এই বাছাইএর একটা হেতু নিশ্চয় আছে, এবং মোটামুটি বলা চলে হেতুটা হচ্ছে চিৎপ্রকর্ষ; কিন্তু তার স্বরূপ প্রাকৃতচেতনার কাছে স্পষ্ট নয়। মানুষ বাস্তবিক 'যাহা চায় তাহা ভুল করে চায়।' এই ভুলের দার্শনিক নাম হল 'অবিদ্যা'। ভুল করি বলেই দুঃখ পাই, কেউ যেন কাঁটার চাবুক মেরে বলে 'এ-পথে নয়'। কিন্তু তবুও আবার ভুল করি। ফলে জীবন সুখ-দুঃখ রাগ-দ্বেষ শুভাশুভের দ্বন্দ্বে সঙ্কুল হয়ে ওঠে। সঙ্কুল মনকে বলি অবিশুদ্ধ। আর এই অবিশুদ্ধি মুখ্যত ভাবমানসের।

ভাবমানসকে শুদ্ধ করতে হলে সুখ-দুঃখ আর ইচ্ছা-দ্বেষের ঊর্ধ্বে যেতে হবে। দুঃখের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক বিরাগ আছে, সুতরাং তার ঊর্ধ্বে যাওয়ার প্রেরণা সহজেই পাই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সুখকে নিয়ে। সুখের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক বলে তাকে আঁকড়ে থাকতে চাই এবং ঠিক সেইজন্যে আবার দুঃখ পাই! দুঃখকে চিনতে আমাদের ভুল হয় না, কিন্তু সুখকে চিনতে ভুল হয়। সুখকে মনে করি বস্তুনির্ভর—ভুল এইখানে। ভুল শোধরাতে দুঃখের সঙ্গে-সঙ্গে সুখকেও জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে চাই সর্বনাশা বৈরাগ্যের তাগিদে, এও কিন্তু আরেকটা ভুল। সুখ বস্তুনির্ভর নয়—ভাবনির্ভর, আত্ম-চৈতন্যের প্রশান্তিই তার উৎস, এইটুকু যদি বুঝতে পারি, তাহলে আর কোথাও ভুলের মাশুল গুনতে হয় না। আত্মচৈতন্যের প্রশান্তিতে যে-সুখ, সেই সুখ দিয়ে তখন দেহের প্রাণের ইন্দ্রিয়ের মনের সুখকে জারিত করি। আমি তখন আত্মারাম, আমার সব-কিছুতেই সুখ—তথাকথিত সুখ-দুঃখেও সুখ। তাকে আর সুখ না বলে বলতে পারি আনন্দ।

আনন্দ আমার স্বরূপ। আনন্দে আমি আত্মারাম বলেই বিশ্ব আমার কাছে রমণীয়। আমি তাকে ভালবাসি, তার আলো-ছায়া ভালো-মন্দ সব নিয়ে তাকে ভালবাসি। দেখি, সে বিষ্ণুর রমা, তাঁর শ্রী, তাঁর কমলা—তাঁর হিরণ্যগর্ভ

আকৃতির প্রচ্ছটা।

এই আনন্দ-প্রতিষ্ঠাতেই ভাবমানস শুদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয় সংবেগের গভীরে নিষিক্ত হয়ে তাদের অভ্যস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপান্তর ঘটিয়ে ইন্দ্রিয়মানস আর সংবেগমানসকেও সে শুদ্ধ করে।

৭

বুদ্ধির শুদ্ধি

প্রথমে বুঝতে হবে বুদ্ধি কি এবং তার জন্য মন আর বুদ্ধির তফাতটা বুঝে নিতে হবে। একেবারে গোড়া ধরে আলোচনা শুরু করা যাক।

প্রথমটায় দেখছি, প্রকৃতি জড়। তার মধ্যে ক্রমে-ক্রমে চেতনাকে উন্মেষিত করছে প্রাণ। চেতনার উন্মেষের যে-আয়তন বা আধার, তা-ই হল দেহ। বৈদিক ঋষির ভাষায়, দেহ গড়তে গিয়ে প্রাণ হল অন্নাদ আর জড় তার অন্ন। অন্ন আহরণের চেষ্টা থেকে প্রাণের বৃত্তি দেহের মধ্যে ধরল ইন্দ্রিয়ের রূপ। দুপ্রস্থ ইন্দ্রিয়—বাইরকে জানবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর তার উপর ক্রিয়া করবার জন্য কর্মেন্দ্রিয়। গোড়ায় তারা প্রাণধারণের জন্য অন্ন আহরণ আত্মরক্ষা প্রজনন ইত্যাদি জীবনযোনি-প্রযত্নেরই সাধন। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে সুচল করবার জন্য দেহের সূক্ষ্মভাগ দিয়ে দুপ্রস্থ নাড়ীরও সৃষ্টি হল—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জন্য সংজ্ঞাবহা আর কর্মেন্দ্রিয়ের জন্য আজ্ঞাবহা নাড়ী।

ইন্দ্রিয় আর নাড়ীতন্ত্র নিয়ে প্রাণের কাজ প্রথমটায় চলতে লাগল যন্ত্রের মত। চৈতন্য জড়িয়ে আছে সবার সঙ্গে, কিন্তু খুব স্পষ্ট হয়ে নয়। কাজ চলছে অবচেতন সংস্কারের বশে, অথচ অনেকসময় এমন আশ্চর্য নিখুঁতভাবে যে মানুষের বুদ্ধিও তার কাছে হার মানে। কিন্তু বস্তুত তখন পর্যন্ত চেতনা আচ্ছন্ন, তার মধ্যে মনেরই উন্মেষ হয়নি।

বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে-বোধ জন্মে, সে যদি বিষয়নিরপেক্ষ একটা স্বতন্ত্র সত্তা পায়, তাহলে তাকে চেতনার স্পষ্টতা বলে ধরতে পারি। এইখানে মনের সৃষ্টি হয়। একটা ফুলের সঙ্গে চোখের যোগ হল, ফুলের বোধ জন্মাল। ফুলটা না থাকলেও যে-চেতনায় ফুলের রূপটা থেকে যাবে, তাকে বলতে পারি মন। চোখ যেমন বহিরিন্দ্রিয়, মন তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়। বোধের ছবিগুলি মনের মধ্যে প্রথমটায় স্পষ্ট হয় না, কিন্তু মন যতই জোর ধরতে থাকে ততই তারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বোধের স্পষ্টতার সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দেয় তার বৈচিত্র্য। তখন তাদের মধ্যে প্রয়োজনমত ছাঁটাই-বাছাই করবার দরকার হয়। আবার একজাতীয় অনেক

বোধের সমাহার থেকে সাধারণ একটা বোধের উন্মেষ হয়, যার সংজ্ঞা সামান্যপ্রত্যয় (knowledge of the universal concept)। নির্বাচন আর সামান্যপ্রত্যয়ের সাহায্যে ভিতরে-ভিতরে একটা আলাদা বোধের জগৎ যেন গড়ে ওঠে। সাংখ্যের ভাষায় তখন পুরুষ যেন প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হয়ে তাকে চালিয়ে নেবার যোগ্যতা অর্জন করে। এমনি করে বুদ্ধির উন্মেষ হয়।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, ইন্দ্রিয় যতটা অবশ, মন ততটা অবশ এবং যান্ত্রিক নয়, যদিও তার ক্রিয়ার মালমসলা সব সংগ্রহ করতে হয় ইন্দ্রিয়বোধ থেকে। বুদ্ধিতে এসে চেতনা ইন্দ্রিয়বশ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। বুদ্ধি বিবিক্ত, সামান্যগ্রাহী, নির্বাচক এবং মনের শাস্তা। কিন্তু প্রথমটায় যেমন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের, তেমনি মনের সঙ্গে বুদ্ধির মাখামাখি থেকেই যায়। শুদ্ধির একটা ধারা হল এই ব্যামিশ্রতা দূর করা, একথা আগেই বলেছি।

*

পশুর মন আছে কিন্তু বুদ্ধি নাই। বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে মানুষের মধ্যে। এই উন্মেষের মূলে আছে বিবেক। মানুষের চেতনা ইন্দ্রিয়বোধ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে পারে, স্মৃতি কল্পনা আর সামান্যপ্রত্যয়ের সহায়ে অন্তরে একটা আলাদা বোধের জগৎ গড়ে তুলতে পারে—এই তার বৈশিষ্ট্য। আর এইজন্য মানুষ বুদ্ধিমান জীব। আবছা একটা বুদ্ধি পশুর মধ্যেও আছে, কেননা চেতনার বৃত্তিগুলিকে কোনও অবস্থাতেই পায়রাখুপী করে রাখা যায় না। কিন্তু তবুও পশুতে বুদ্ধি সংস্কারযুক্ত (instinctive) অতএব অবশ, আর মানুষের মধ্যে ভাবনাযুক্ত (reflective) অতএব স্ববশ।

বুদ্ধির আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে, তার মধ্যে চেতনার পরাবর্তন (turning upon itself) সম্ভব। মানুষ যেমন বাইরকে জানে তেমনি আবার নিজেকেও জানে; পশু নিজেকে জানে না। এই আত্মসচেতনতা আসে অবশ্য বিবেক থেকে, আর এটি মানুষেরই বিশিষ্ট ধর্ম। মানুষ যখন আত্মসচেতন হয়, তখন তার মধ্যে দেখা দেয় আত্মনিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য—ইচ্ছা করলে প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তিকে সে সংযত করতে পারে। মানুষ একাদশীর উপবাস করে স্বেচ্ছায়; কিন্তু একটা গরুকে বেঁধে রেখে খেতে না দিলেই তবে তার একাদশী। নিরোধ (repression) আর সংযমের (control) তফাত এইখানে। সংযমও মানুষের

একটি বিশিষ্ট ধর্ম। বিবেক হতে জাত আত্মসচেতনতা এবং আত্মসংযম মানুষের জীবনে বুদ্ধির বিশিষ্ট পরিণাম।

এই বিবেক হতে বুদ্ধির পিছনে আমরা আবিষ্কার করি স্ব-তন্ত্র পুরুষকে। প্রকৃতিকে গুছিয়ে নেবার বশে আনবার চালনা করবার জন্য পুরুষের প্রধান সাধন তাহলে এই বুদ্ধি। কিন্তু প্রাকৃতচেতনায় বুদ্ধি জড়িয়ে আছে মনের সঙ্গে, মন চলছে অপরা-প্রকৃতির শাসনে। বুদ্ধির কাজ সেখানে মনের হুকুম তালিম করা, তার গোছানো বাগানো চালানোর সামর্থ্যকে নিযুক্ত করা প্রকৃতির প্ররোচনাকে সার্থক করবার কাজে।

*

মন দিয়ে আমরা যেমন বহিঃপ্রকৃতিকে জানি এবং বুদ্ধির সহায়ে তাকে শাসন করি বশে আনি, তেমনি বুদ্ধি দিয়ে আমরা জানি নিজেকে অর্থাৎ আমাদের অন্তর্যামী পুরুষকে। পুরুষকে জানার একটি তাৎপর্য হল অন্তঃপ্রকৃতিকে শাসনে আনা। প্রকৃতির বশীকারের আবার দুটি লক্ষ্য হতে পারে, এক তার অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তির নিরোধ, আর তার শুদ্ধ প্রবৃত্তির স্ফুরণ। প্রকৃতির যেসমস্ত প্রবৃত্তি আমাদের অবাঞ্ছিত—যেমন আমাদের সাধারণ জীবনের নানা ঝমেলা—সেগুলিকে আমরা ফেলতে পারি অপরা-প্রকৃতির এলাকায়। এগুলিকে দূর করতে পারলে আমাদের মধ্যে স্বভাবতই শুদ্ধ বা পরা প্রকৃতির উন্মেষ হবে, যার বৃত্তি হল প্রশান্তি প্রকাশ প্রসন্নতা বীর্য ইত্যাদি। এই যে অপরা-প্রকৃতি হতে পরা-প্রকৃতিকে বিবিক্ত করা এবং তার স্ফুরণের বাধাকে অপসারিত করা—এই হল অধ্যাত্মসাধনায় বুদ্ধির বিশেষ কাজ।

প্রকৃতিবশীকারের দুটি ধারার কথা আমরা জানি। একটি হল, পুরুষকে প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত ক'রে কৈবল্যে প্রতিষ্ঠিত করা। অগ্র্যা বুদ্ধিকে তখন আমরা বিবেকসাধনের কাজে লাগাই, একে-একে প্রকৃতির সমস্ত পর্ব পার হয়ে অবশেষে তাকে দাঁড় করিয়ে দিই অসঙ্গ পুরুষের মুখামুখি। বুদ্ধির ভাস্বরতায় তখন পুরুষের যে-উপলব্ধি হয়, যোগের ভাষায় তাকে বলে সম্প্রজ্ঞান। আরেক ধাপ এগিয়ে গেলে আর বুদ্ধিও থাকে না, কি থাকে তা বলা যায় না; তাকে বলে অসম্প্রজ্ঞান। এই হল নিরোধযোগের পথে বুদ্ধির প্রয়োগ।

কিন্তু প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হওয়া যেমন তার বশীকার, তেমনি তার ঈশ্বর হওয়াও বশীকার। পুরুষ 'কেবল' এই যেমন তাঁর স্বরূপের একদিক, তেমনি তিনি 'ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ' এও তাঁর স্বরূপের আরেকদিক। বস্তুত নিরোধযোগে প্রকৃতির রাস টানতে গিয়ে পুরুষের মধ্যে যে-শক্তি জাগে, তার এক অংশ আপনাহতেই বিভূতিতে উছলে পড়তে পারে। বৈরাগ্যের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, কৈবল্যের সঙ্গে বিভূতির, শিবের সঙ্গে শক্তির তাই যুগনদ্ধতার সম্পর্ক। অসঙ্গ কৈবল্যে প্রকৃতিকে আত্মসাৎ করে দিব্যবিভূতিতে তাকে উল্লসিত করাতেই পুরুষের স্বরূপশক্তির পূর্ণ পরিচয়। আমরা শুদ্ধবুদ্ধিকে এইদিকেও প্রয়োগ করতে পারি।

বুদ্ধিও দুরকমের—প্রাকৃতবুদ্ধি আর শুদ্ধবুদ্ধি। প্রাকৃতবুদ্ধিকে গীতায় বলা হয়েছে গুণময়ী বুদ্ধি; তামসী রাজসী আর সাত্ত্বিকী—তার এই তিন ভেদ। এ-বুদ্ধিও জীবনের দিশারী, কিন্তু তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, সে মনের তাঁবেদার। আমাদের প্রাকৃত জীবন চলছে তার নির্দেশে। তার গতি বহিরাবৃত্ত। আর শুদ্ধবুদ্ধির গতি অন্তরাবৃত্ত। এ-বুদ্ধি আবিষ্কার করতে চায় পুরুষের স্বারাজ্যের মহিমাকে। প্রাকৃতবুদ্ধিকে সে নিরস্ত করে না, কিন্তু তার বৃত্তিকে পরিশোধিত করে তাকে সেই মহিমার অনুগত করতে চায়। অপরা-প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে-কামপুরুষ (desire-soul), তার চেতনা সঙ্কীর্ণ, তার ভাবনা-বেদনা-সঙ্কল্প ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। জগতের অধিকাংশ মানুষ এই স্তরের। কিন্তু যাঁরা বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কবি শিল্পী ধর্মবুদ্ধি এবং পরার্থপর, তাঁরা এর চাইতে উপরের স্তরের। তাঁদের চেতনা উদার, ইন্দ্রিয়পরতা হতে মুক্ত; বস্তুর চাইতে ভাবকে তাঁরা বড় বলে জেনেছেন, একটা মহত্তর আদর্শের প্রেরণা তাঁদের মধ্যে আছে, একটা ঊর্ধ্বশক্তির আলো তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে। তাঁদের এই মহিমা শুভবুদ্ধিরই প্রসাদ।

কিন্তু এও শুদ্ধবুদ্ধির সূচনা মাত্র। সিদ্ধির পথে একে বলতে পারি প্রথম পদক্ষেপ, লক্ষ্য এখনও বহু দূরে। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য দুটি সাধনা অপরিহার্য: এক, অপরা-প্রকৃতির সংস্কারাচ্ছন্ন যান্ত্রিক মূঢ়তা হতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা; আর, অন্তরাবৃত্ত আত্মচৈতন্যের গভীরে এক লোকোত্তর স্বয়ম্ভূ পুরুষকে আবিষ্কার করা যিনি আমাদের সমস্ত শুভপ্রবৃত্তির উৎস। এর ফলে আমাদের ভাবনায় জ্বলে উঠবে সমস্ত সংস্কার হতে মুক্ত বোধির ঋতম্ভরা দীপ্তি, ভাবমানস আপ্লুত হবে হর্ষ-শোকের দ্বন্দ্ব হতে নির্মুক্ত মধুর রস-

চেতনার প্রসন্ন আস্রবে, ধর্মবুদ্ধিতে জাগবে লোকাপেক্ষহীন ঋতানুবর্তনের সুকল্যাণ অকুণ্ঠতা, কর্মের মূলে থাকবে গতানুগতিকতার মূঢ়তা হতে মুক্ত হয়ে সৃষ্টির উল্লাসে ফুল ফুটিয়ে চলার প্রেরণা। বুদ্ধিতে আত্মমহিমার অবারিত দীপ্তিতেই তার শুদ্ধি এবং সিদ্ধি।

*

শুদ্ধবুদ্ধির এই স্বরূপ। এখন বলি তার অশুদ্ধির কথা। বুদ্ধিকে কলুষিত করে বাসনা ভাবপ্রবণতা আর ইন্দ্রিয়পরতা। তিনটিই অপরা-প্রকৃতির বৃত্তি, গড়পড়তা মানুষের স্বভাবধর্ম। তাদের মূলে রয়েছে চেতনার সঙ্কোচ আর বস্তুনির্ভরতা। উপনিষদের সেই কথা : ইন্দ্রিয়ের দুয়ার খোলা বাইরের দিকে, মানুষ তাই কেবল বাইরটাই দেখে, ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখে না। নইতে পশু যেমন সহজসংস্কারের বশে চলে, মানুষও তেমনি চলে গতানুগতিকতার আবর্তনে আবর্তিত হতে-হতে। অথচ এমন করে চলতে সে বাধ্য নয়। তারও মধ্যে আছে স্বোত্তরণের (self-exceeding) প্রবেগ, অন্তরাবৃত্তির অভীপ্সা। তাই প্রকৃতির এই আবর্তন থেকে একসময় সরে দাঁড়াবার ইচ্ছা তার প্রবল হয়ে উঠে। সবার হয় না, কিন্তু কারও-কারও হয়। যার হয়, উপনিষদে তার সংজ্ঞা 'ধী-র' কি না বুদ্ধিযুক্ত। অপরা-প্রকৃতির আবর্তন হতে সে বিবিক্ত। চাকা ঘুরছেই, কিন্তু চাকার সঙ্গে আর সে বাঁধা নয়—সে চক্রবর্তী। বাইরে আবর্তন, কিন্তু অন্তরে গভীর শান্তি—অন্তরাবৃত্তি হতে, প্রাকৃতক্রিয়ায় বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হওয়ার ফলে। এই হল ধীরের পরিচয়।

বুদ্ধির অবিশুদ্ধির তিনটি স্তর আছে। একটির কথা এইমাত্র বললাম—অপরা-প্রকৃতির যান্ত্রিকতার অনুবর্তন, সংস্কারান্ধ হয়ে চলা, নিজের কথা নিজে না ভেবে অন্ধের চালনায় অন্ধের মত চলা। সংসারের বেশীর ভাগ মানুষের এই দস্তুর। তাদের বুদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে ইন্দ্রিয়পরতার উপর।

এর চাইতে উঁচু স্তরের বুদ্ধি হল অভ্যুদয়বাদী বা প্রগতিসাধকদের। প্রাকৃতজনের মত তাঁরা এক জায়গায় থেকে কেবল কলুর বলদের মত পাক খেয়ে মরেন না, তাঁরা চান এগিয়ে যেতে। বুদ্ধিকে তাঁরা প্রয়োগ করেন জীবনের অভ্যুদয়সাধনার কাজে। কিন্তু তাঁরাও ওই চাকাতেই বাঁধা; শুধু তফাত এই, তাঁদের বেলায় চাকাটা এক জায়গায় থেকে ঘোরে না, ঘুরতে-ঘুরতে এগিয়ে

চলে, কিন্তু চলে একই সমতলের উপরে। তাঁদের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়শাসিত না হলেও মনঃশাসিত। তাঁদের পুরুষার্থের আদর্শ মনের রচিত, এবং শেষপর্যন্ত তার ভিত্তি ওই ইন্দ্রিয়সংবিৎ। এ-বুদ্ধি প্রজ্ঞাবাদী, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ নয়। সত্যের ব্যবহারিক দিকটাই সে দেখে, পারমার্থিক দিকটা নয়। জীবনসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গেই তার উল্লাস, তার অতলের প্রশান্তি তার অগোচর। আধুনিক সভ্যতায় এই বুদ্ধির জয়-জয়কার। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ-বুদ্ধিও অবিশুদ্ধ। উপনিষদের ভাষায় এ মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ নয়, তাই শোকোত্তীর্ণও নয়। অভ্যুদয় ইন্দ্রিয়ারাম মানুষকে অনেক-কিছুই দিয়েছে, কেবল দিতে পারেনি প্রশান্তির প্রসন্নতা।

এরও চাইতে উঁচুস্তরের বুদ্ধি হল সত্যানুসন্ধিৎসু দার্শনিকের। সমগ্র সত্যকে জেনে মানুষের জীবনে তাকে প্রতিফলিত করবার আদর্শদ্বারা এই বুদ্ধি অনুপ্রাণিত। আদর্শ মহান, কিন্তু আদর্শে আর বাস্তবে তবুও দুস্তর ফাঁক থেকে যায়। বুদ্ধির লক্ষণ করতে গিয়ে গোড়াতেই বলেছি, তার মধ্যে জ্ঞান আর সঙ্কল্পের সমন্বয় হওয়া চাই, পুরুষের প্রজ্ঞার মধ্যে প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করবার সামর্থ্য থাকা চাই। দার্শনিক বুদ্ধির প্রথম ত্রুটি সঙ্কল্পের ন্যূনতায়। অধিকাংশক্ষেত্রে দেখা যায়, দার্শনিক দর্শনের একটা বিরাট ইমারত গড়েছেন—কিন্তু তার ভিত্তি বালির উপরে। জগতের সব তিনি জেনেছেন, কেবল জানেননি নিজেকে। লোকোত্তর সত্যের পরিচয় তাঁর হাতের মুঠোয়, কিন্তু জীবনসত্য যে কখন আঙগুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়েছে টেরও পাননি। দার্শনিক বুদ্ধির দ্বিতীয় ত্রুটি, অনেক দর্শনেই দৃষ্টির ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু গভীরতা নাই। এ-যুগের অনেক ঐহিক দর্শনের এই ত্রুটি। তার মধ্যে বুদ্ধির চমৎকার আছে, অনুসন্ধিৎসার আন্তরিকতা আছে; কিন্তু গোড়াতেই জীবনকে সে হয়তো দেখেছে কেবল প্রবৃত্তির দিক থেকে, তার যে নিবৃত্তিমুখী একটা গতি আছে তা সে আমলেই আনেনি। তেমনি আবার নিবৃত্তিপর দর্শন প্রবৃত্তির দিকটাকে চেয়েছে চেপে যেতে বা ছেঁটে ফেলতে। এইথেকে দেখা দিয়েছে দার্শনিক বুদ্ধির আরেক ত্রুটি—তার একদেশদর্শিতা। অর্থাৎ অধিকাংশ দর্শনই সম্যক্ (integral) দর্শন নয়, কিংবা ফলিত দর্শন নয়—যদিও দর্শনেই মানুষের বুদ্ধির উৎকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ করে। এককথায় অধিকাংশ দার্শনিকই যোগী নন, কিংবা যোগী হলেও যোগের পূর্ণতা সম্বন্ধে অবহিত নন। এই হল তৃতীয়স্তরের বুদ্ধির অবিশুদ্ধি।

বুদ্ধির সব অবিশুদ্ধির হেতু হল তার ব্যামিশ্রতা। আসলে আমাদের বুদ্ধি যত উঁচুতেই উঠুক না কেন, সে একান্তভাবে জড়িয়ে আছে মনের সঙ্গে। তাই তার সব প্রত্যয়ের উপর পড়ে মনের ছায়া। মন স্বভাবত বিভজ্যদর্শী, অখণ্ড সত্যকে সে দেখে খণ্ড-খণ্ড করে। অখণ্ডদর্শনের অধিকার আছে বুদ্ধিরই, কেননা সামান্যপ্রত্যয় তার স্বধর্ম। কিন্তু মনের আওতায় পড়ে বুদ্ধিও অখণ্ডের একেক দিককে একেক সময় একান্ত করে তোলে। সব দিককে ধরতে পারলেও তার মধ্যে একটা পর্যায়বোধ থেকে যায়, অখণ্ডের সামরস্যে সবাইকে জারিত করে নিতে সে পারে না। বুদ্ধি হয়তো বোঝে, শূন্যও সত্য, পূর্ণও সত্য। কিন্তু বোঝে পর্যায়ক্রমে। দুটা একসঙ্গে কি করে সত্য হয় তা সে বোঝে না, কেননা মনও তা বুঝতে পারে না। তাইতে অখণ্ড সত্যকে জীবনে রূপ দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার নিজের শূন্যতার আপূরণ করতে বুদ্ধি পরমসত্যের সন্ধানে কখনও নিজেকেও ছাপিয়ে যায়। তখন আর তার বোঝবার কিছু থাকে না, এক সর্বনাশা নাস্তিত্বের মধ্যে অস্তিত্বের সকল উল্লাস তলিয়ে যায়। এও বুদ্ধির পরাভব, অতএব একটা ন্যূনতা।

*

তাহলে বুদ্ধিকে শুদ্ধ করতে হলে তাকে মনের ছায়াপাত হতে মুক্ত করতে হবে। অথচ তার জন্য নিজেকে ছাপিয়ে যাবার চেষ্টায় তাকে শূন্যে লীন হলেও চলবে না। সমস্যার সমাধান হবে বুদ্ধির বিজ্ঞানে রূপান্তরে। মন বুদ্ধি আর বিজ্ঞান—চৈতন্যের এই তিনটি শক্তিকে পর-পর স্থাপনা করা যেতে পারে। জানার রীতি দিয়ে তাদের স্বরূপ বোঝানো যায়। মন জানে সব-কিছুকে তার বাইরে রেখে, জানে টুকরা-টুকরা করে; কেননা তার জানার সাধন হল ইন্দ্রিয়, যারা স্বভাবতই বিশেষদর্শী। মনের বিশেষদর্শনকে সামান্য-প্রত্যয়ে রূপান্তরিত করে বুদ্ধি। কিন্তু তার সামান্যপ্রত্যয় আবছা: একটা মানুষকে আমি স্পষ্ট করে দেখতে পারি, স্পষ্ট করে ভাবতেও পারি; কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রত্যয় আমার কাছে নিশ্চিত এবং ব্যবহার্য (pragmatic) হলেও আবছা। তাছাড়া বুদ্ধির এ-জানাও জ্ঞেয়কে বাইরে রেখে জানা। কিন্তু জানার আরেকটা ধরন আছে—হয়ে জানা। তার সূচনা নিজেকে জানাতে। নিজের

২৬

দেহ-প্রাণ-মনকে আমরা অপরোক্ষভাবে জানি। এ-জানা হয়ে জানা এবং বিশেষকে জানা, তার স্পষ্টতা এবং তীক্ষ্মতা আছে। কিন্তু এ-জানার মধ্যে ব্যাপ্তি নাই বলে তার পীড়াও আছে। আমরা জানি আমাদের সুখ-দুঃখে ইচ্ছা-দ্বেষে আন্দোলিত বিকৃত আমিটাকেই। বিকারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি চেতনার ব্যাপ্তিতে, নিজের সম্পর্কে সামান্যপ্রত্যয়ে। আগেই দেখেছি, এই সামান্যপ্রত্যয় বুদ্ধির আছে—বিষয়সম্পর্কে; কিন্তু বিষয় সেখানে বোদ্ধার বাইরে। এখন, এমন-এক জ্ঞান আমরা যদি পাই যা আত্ম-পর এবং সামান্য-বিশেষের ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দিয়েছে, তা-হলে তা-ই হবে বিজ্ঞান (gnosis)। উপনিষদে বিজ্ঞানের একটি সূত্র 'যস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ'—তিনিই বিজ্ঞানী যাঁর আত্মাই হয়েছে এই সব-কিছু। এই হল যথার্থ হয়ে জানা। আর এই জানার মধ্যে আছে হওয়ার সংবেগ, তাই প্রজ্ঞা আর সঙ্কল্প এখানে এক হয়ে আছে। ঋষিরা উপমা দিয়েছেন সবিতার—যিনি জগৎ প্রসব করছেন, প্রচোদিত করছেন, হয়ে আছেন। তিনি প্রজ্ঞা, তিনি আনন্দ, তিনি বীর্য।

বুদ্ধির স্বনিষ্ঠ সামান্যপ্রত্যয়কে অন্তরাবৃত্ত এবং আত্মনিষ্ঠ করে অন্তরাকাশে চিৎসূর্যকে আবিষ্কার করতে হবে এবং প্রাণিত হতে হবে তাঁরই সাবিত্রী শক্তিতে। এই হল বুদ্ধির শুদ্ধি এবং সিদ্ধির স্বরূপ।

৮

পুরুষের মুক্তি

শুদ্ধির পরিণাম মুক্তি। অশুদ্ধির হেতু হল দৃষ্টির বিপর্যয়, চেতনার সংকোচ আর বৃত্তির বিকার। পুরুষের দৃষ্টি যদি নির্মোহ হয়, চেতনা হয় আকাশের মত উদার, আর চিদ্‌বৃত্তি স্বচ্ছন্দ ও সুষম, তাহলে তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ এবং মুক্ত।

কিন্তু মুক্তির দুটি আদর্শ আছে। একটি প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত হয়ে মুক্তি—নির্গুণ-ব্রহ্মোপলব্ধি নির্বাণ বিদেহমুক্তি অনাবৃত্তি ইত্যাদি সংজ্ঞায় তার পরিচয়; আরেকটি প্রকৃতিসহ মুক্তি—ঈশ্বরোপলব্ধি সাযুজ্য জীবন্মুক্তি অবতার ইত্যাদি সংজ্ঞায় তার পরিচয়। দুটিতে সাধারণত একটা বিরোধ কল্পনা করে উৎকর্ষ-অপকর্ষের কথা তোলা হয়। বলা বাহুল্য, পূর্ণযোগ দুয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখে না, দ্বিতীয়টিতে মনে করে প্রথমটির পূর্ণতা। মুক্তির সার্থকতা স্বাতন্ত্র্যে। আধারশুদ্ধিতে এই স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ বৃত্তির সুষম স্বাচ্ছন্দ্য আসে প্রাণে মনে বুদ্ধিতে এবং দেহেও (তার কথা পরে)। সে-স্বাচ্ছন্দ্য বিজ্ঞানের। শুদ্ধির কথা আলোচিত হয়েছে, এইবার মুক্তির প্রসঙ্গ।

উপনিষদে মুক্তির একটি পরিচিতি হচ্ছে 'গুহাগ্রন্থির বিকিরণ'। এটি মুক্তির নেতির দিক। গ্রন্থিগুলি এলিয়ে পড়লে শক্তি ছাড়া পাবে; তখন স্বভাবতই দেখা দেবে তার উল্লাস। এইটি মুক্তির ইতির দিক। ইতিকে লক্ষ্য করেই নেতির বিচার করা যাক; দেখা যাক, গ্রন্থিগুলি কি।

গীতায় চারটি গ্রন্থির কথা বলা হয়েছে—বাসনা বা কাম, অহঙ্কার, ত্রৈগুণ্য এবং দ্বন্দ্বভাব। আগের দুটি গ্রন্থি আছে পুরুষে, আর পরের দুটি প্রকৃতিতে। পুরুষ আর প্রকৃতি দুয়েরই মুক্তি চাই। এ-অধ্যায়ে পুরুষের কথা বলে পরের অধ্যায়ে প্রকৃতির কথা তুলব।

*

আদিম গ্রন্থি হল বাসনা। মনঃশুদ্ধির প্রসঙ্গে প্রাণবাসনার কথা আলোচনা করেছি। গীতার ভাষায় এ-বাসনা বা কামের অধিষ্ঠান হচ্ছে ইন্দ্রিয় এবং মন;

কিন্তু তার চাইতে গভীরে রয়েছে বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত কাম। এ-কাম অহংবুদ্ধি বা আদিম ভেদভাবের সঙ্গে জড়িত। ঋগ্‌বেদের ঋষি বলেন, 'মনসঃ প্রথমং রেতঃ'রূপে এ-কাম ছিল সৃষ্টির আদিতে। পরমপুরুষ কামনা করলেন, 'আমি বহু হব, প্রজাত হব'। তাঁর সেই বহু হওয়ার কামনায় যে-প্রবেগ, তা-ই আমাদের ব্যক্তিভাবনার জননী এবং ধাত্রী।

এইদিক দিয়ে দেখতে গেলে কামনার দুটি রূপ। আমাদের মধ্যে কামনা একটা অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়না। সে কি চাইছে, তা ভাল করে বোঝে না। তাই তার ভুল হয়, ফলে সে দুঃখ পায়। অথচ কিছু না চাইলেও যে তার জীবন অচল হয়ে যায়। কিন্তু উপর থেকে যখন দেখি, তখন আবার এই কামনারই দেখি দিব্য রূপ। সে তখন আর জীবের আতুর প্রমত্ত পরাহত সঙ্কীর্ণ কামনা নয়; সে ব্রহ্মের দিব্যকাম, তাঁর সত্যসঙ্কল্প, তাঁর 'জ্ঞানময়ং তপঃ', তাঁর সিসৃক্ষার সদস্রদলকমলে আসীনা কমলা। এ তাঁর উল্লাসের চিন্ময় ছন্দ : যেমন উল্লাস তাঁর চিৎ হতে জড়ে গুটিয়ে আসাতে, তেমনি উল্লাস জড় হতে প্রাণ মন বুদ্ধির ভিতর দিয়ে পুরাণী প্রজ্ঞায় বিকসিত হওয়াতে। আমাদের জীবনের মূলে তারই আবেগ, তারই আকূতি।

উজান-ভাটার ছন্দে এই-যে স্ফুরত্তার উল্লাস, এ এসে কুণ্ঠিত হল আমাদের অহন্তার মধ্যে। অহন্তার অর্থই হল চেতনার সঙ্কোচ। বৃহতের মধ্যে যা ছিল সহজ ও সুষম, অল্পের মধ্যে এসে সে হল কৃচ্ছ্র এবং সঙ্কুল; শক্তিমত্তার পরিণাম হল অপঘাত আর অবসাদ। এই হল কামনার অভিশাপ। আর এর সংস্কার আধারের গভীরে এমনই মজ্জাগত হয়ে আছে যে অন্তঃকরণের বিশিষ্ট বৃত্তির শুদ্ধিতেও তার জড় মরতে চায় না, পাতাল থেকে অসুরদের মত আশয়ের অতল থেকে বারবার সে এসে হানা দিতে থাকে।

আশয় হল অন্ধপ্রকৃতির গুহাশয়ন, আমাদের মূঢ় সংস্কারের সমস্ত বীজ সেখানে সঞ্চিত রয়েছে। আশয়ে নিহিত বাসনাকে নির্বীজ করতে হলে নিরোধ ছাড়া উপায় নাই, সাধককে যেতে হবে নিঃস্পন্দ শূন্যতার অসম্প্রজ্ঞানে। সেখান থেকে যে ফিরে আসা যায় না, তা নয়। শিব-শক্তির সামরস্যই যদি পূর্ণতার সত্য হয়, তাহলে ফিরে আসাটাই স্বাভাবিক। নিরোধ-সংস্কার যদি প্রবল হয়, তাহলে ফিরে এসে সাধক হন নিশ্চেষ্ট অনীহ নিরপেক্ষ নিবৃত্ত অকর্তা: 'ঝড়ের মুখে এঁটো পাতার মত' তিনি উড়ে চলেন। কিন্তু ঐশ্বরযোগের আবেশে তাঁর ফিরে আসাটা দিব্যশক্তির স্ফুরণে সার্থকও হতে পারে। তখন হয় তিনি

সর্বারম্ভপরিত্যাগী' নিমিত্ত-কর্তা, চিন্ময় মনস্বান্; অথবা সেই পরমেরই স্বপ্রোল্লাসের শরিক দিব্য-কর্তা, বিজ্ঞানময় বিবস্বান্। এই শেষের অবস্থাতেই পুরুষ-প্রকৃতির মাঝে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে; প্রকৃতি তখন পুরুষের আত্মশক্তি, স্বেচ্ছাশুদ্ধা পার্বতী পরমেশ্বরে নিত্যসংগতা। বাসনা তখন রূপান্তরিত হয় স্বরূপানন্দের উল্লাসে।

*

পুরুষের দ্বিতীয় গ্রন্থি হল অহং। জীবের কামনা যেমন শিবের সিসৃক্ষার আনন্দের কুণ্ঠিত এবং বিকৃত রূপ, তার অহংও তেমনি তাঁরই স্বরাট আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংকীর্ণ প্রতিচ্ছায়া। বস্তুত সর্বব্যাপী এক অহংই আছেন, সেই এক অহংই হয়েছেন বহু অহং। যেখানে বহুত্ব সেইখানেই ভেদ এবং অন্যোন্যব্যাবর্তকতা (mutual exclusiveness)। তার চরম রূপ দেখি জড় পরমাণুতে। কিন্তু একের বহুতে পরিকীর্ণ হওয়া যেমন শক্তির একটি ছন্দ, তেমনি বহুর একে সংহত হওয়াও আরেকটি ছন্দ। ভেদের মধ্যে তাইতে দেখা দেয় অভেদের আভাস, বিরোধ দূর হয়ে বৈচিত্র্য। আবার যা অভেদ তা মহৎ, যা ভিন্ন তা অণু। অণু 'মহতো মহীয়ান্' হতে চাইছে এই তার শক্তিরূপ। অহং অল্প, কিন্তু হতে চাইছে ভূমা; এই তার জীবনসত্য।

বিরাট জড়ের বুকে অহং যেন চৈতন্যের একটি স্ফুলিংগ। তার সত্তার একটি অপরিহার্যতা আছে, সে নইলে জড়ের মধ্যে চিৎএর উন্মেষ হত না। প্রত্যেক উন্মেষের গোড়ায় থাকে একটা সঙ্কোচ একটা কুণ্ঠা। অথচ তাকে কাটিয়ে ওঠবারও একটা গূঢ় প্রবেগ তার মধ্যে থাকে। জীবন জটিল হয়ে ওঠে এইজন্য।

অহন্তার মধ্যে জটিলতার দুটি রূপ—একটি বিরোধ, আরেকটি সঙ্কোচ। অহংএর সঙ্গে অহংএর বিরোধ দিয়ে জীবনের শুরু। চারদিককার শক্তির হানাহানির মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, পুষ্ট করতে হবে; তাই নিজের চারদিকে একটা শক্ত বেড়া দিতে হয়। নিজের স্বার্থ না দেখলে নিজেকে বাঁচানো যায় না। তাইতে অপরের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি হয়। আবার বিরোধ শুধু জগৎকে নিয়ে নয়, নিজের মধ্যেও এক বৃত্তির সঙ্গে আরেকবৃত্তির বিরোধ —কেননা প্রত্যেক বৃত্তির একটি নিজস্ব অহং আছে।

এই এক পাপ। আরেক পাপ সঙ্কোচ। অহং সঙ্কুচিত, ছোট হয়েই তার জীবনের শুরু। তার জ্ঞান সীমিত, সে দেখে শুধু ইন্দ্রিয়মনের ঠুলির ভিতর

দিয়ে। সবটা দেখে না বলেই তার ভুল হয়। আবার তার শক্তি সীমিত। শক্তির কুণ্ঠার সঙ্গে দৃষ্টির ভুল মিলে তাই তার কর্মকে করে তোলে বিকর্ম। তার পরিণাম কাজেই ঝামেলা ব্যর্থতা দুর্ভোগ—এক কথায় আনন্দের সঙ্কোচ। জীব অজ্ঞান অশক্ত দুঃখী—অহন্তার সঙ্কোচ তাকে ঘিরে আছে বলে।

অথচ সে অসীম হতে চায়, এই তার বাঁচোয়া। কিন্তু এখানেও একটা সমস্যা আছে। অসীমতা দুরকমের—শক্তির অসীমতা, আর চৈতন্যের অসীমতা। শক্তির অসীমতা ভোগে আর ঐশ্বর্যে। এই ভোগ আর ঐশ্বর্যের সাধন কি? —দেহ প্রাণ মন আর বুদ্ধি। কিন্তু স্বভাবতই তারা সীমিত। সীমিত সাধন দিয়ে অসীমকে তো ভোগ করা যায় না বা তার উপর অবাধ কর্তৃত্ব খাটানো যায় না। অতএব অহংএর কাছে শক্তিসাম্যের পথ রুদ্ধ। সান্ত হয়ে অনন্ত প্রকৃতিকে স্থূলে ভোগ করা যায় না বা বশে আনা যায় না।

কিন্তু অহংএর পক্ষে অসীমতার আরেকটা পথ খোলা আছে—চিৎসাম্যের পথ। অহং চেতনায় অসীম হতে পারে। অহংচেতনার বিস্ফারণেরও দুটি পথ। এক, প্রকৃতির স্পর্শ হতে নিজেকে বিবিক্ত করে শান্ত হওয়া : শান্ত চৈতন্য বিক্ষোভ ও দুরাগ্রহের ঘাত-প্রতিঘাত হতে মুক্ত বলে আপনি ছড়িয়ে পড়ে, এনে দেয় আনন্ত্যের বোধ। আর, ইন্দ্রিয়পথেই আকাশ হতে বাতাস হতে আলো হতে সমুদ্রমেখলা পৃথিবীর বিস্তার হতে অসীমকে নিজের মধ্যে আবাহন করে তার দ্বারা আবিষ্ট হওয়া, অল্প অহংকে অনুভব করা ভূমার বিভূতিরূপে। তখন আর 'আমার' শক্তি 'আমার' আনন্দ নয়—অসীমেরই শক্তি আর আনন্দ। আর তার নিরঙ্কুশতার অনুভবে আমার স্বরাজ্য আর সাম্রাজ্যের মহিমার অনুভব। সে-আমি আর ক্ষুদ্র অহন্তা নয়, বিশ্বব্যাপ্ত পূর্ণাহন্তা, বিশ্বাতীত অথচ সর্বাবগাহী পরাহন্তা—আকাশের মত, আকাশজোড়া প্রাণ-স্পন্দ আর আলোর হিল্লোলের মত।

এই ব্যাপ্তিচৈতন্যেই অহংএর মধ্যে যে ভেদ বা বিরোধের ভাব ছিল, তার অবসান ঘটে। তখন সব আমিতেই সেই আমি, অথবা এই আমি। সে-আমি বিশ্বাতীত, সেই আমিই বিশ্বরূপ, সেই আমিই জীবভূত। বাসনা তখন সেই পরম আমির প্রপঞ্চোল্লাস।

এই হল পুরুষের মুক্তি অথবা অতিমুক্তি, কেননা নির্বাণ সাযুজ্য সার্ষ্টিত্ব সামীপ্য সালোক্য তার অন্তর্ভুক্ত। এ-মুক্তি সাধর্ম্যমুক্তি, সর্বতোভাবে পুরুষ হওয়ার মুক্তি, শিব-শক্তির সামরস্যের মুক্তি।

৯

প্রকৃতির মুক্তি

আর দুটি গ্রন্থির কথা বলতে বাকী—একটি ত্রৈগুণ্য, আরেকটি দ্বন্দ্ব। গ্রন্থিগুলি চেতনার আবর্ত, আর চেতনা স্বরূপত একরস। সুতরাং সম্যক-বিজ্ঞান নিয়ে একটি গ্রন্থিমোচন করলে আরগুলিও শিথিল হয়ে যায়। ব্রহ্মত্ব আপ্তকামতা নৈস্ত্রিগুণ্য নির্দ্বন্দ্বতা সবই এক পরমচৈতন্যের বিভিন্ন পরিচয়। বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনাটা তাই প্রবর্তসাধকের বোঝবার সুবিধার জন্য।

আমাদের সত্তার দুটি দল—একটি পুরুষ আরেকটি প্রকৃতি, একটি চৈতন্য আরেকটি শক্তি। শক্তির ক্রিয়া চলছে, চৈতন্য তাকে অনুভব করছে আস্বাদন করছে নিয়ন্ত্রণও করছে। চৈতন্যের দিক থেকে সমস্তটা ব্যাপারের কেন্দ্র হল অহং বা আত্মবোধ, তার কামনা বা সংকল্প বা তপঃ শক্তিকে সক্রিয় করছে। আর শক্তির দিক থেকে দেখতে গেলে সে গুণপরিণামে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে, বিচিত্র দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ হচ্ছে—পুরুষেরই জন্য; অর্থাৎ প্রকৃতির এই গুণপরিণাম আর দ্বন্দ্বের সার্থকতা চৈতন্যের কাছেই। অহন্তা আর কামনার যে বন্ধ আর মুক্ত দুটি ছন্দ আছে, তা দেখেছি। তেমনি আছে ত্রিগুণের আর দ্বন্দ্বেরও। বন্ধন হতে মুক্তিতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যই সাধনা। দেখেছি মুক্তির দুটি রূপ—বন্ধনকে ছাপিয়ে মুক্তি, আবার বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি। দুটিই সত্য। একই শিব নৃত্যপরা কালীর পদতলে শববৎ—তখন পুরুষ আর প্রকৃতিতে বিবেক; আবার তিনিই নটরাজ—একাধারে পুরুষ আর প্রকৃতি দুইই। এই যুগনদ্ধতাই অখণ্ড এবং পরম সত্য।

*

প্রকৃতিতে যে ত্রিগুণের গ্রন্থি আছে, তার কথাই আগে বলি। সংক্ষেপেই বলব, কেননা বিষয়টি এর আগেও আলোচিত হয়েছে।

গুণবাদ সাংখ্যদর্শনের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি গুণময়ী, তার মধ্যে অনন্তগুণের খেলা। পুরুষের দিক থেকে এইটি হল বোধের বৈচিত্র্য। বোধ না থাকলে গুণ

থাকা না থাকা সমান। বোধের মধ্যে প্রকর্ষের তারতম্য আছে। আদিতে চেতনার আচ্ছন্নতা, তারপর ওই মূঢ়ভাবকে কাটিয়ে উঠতে গিয়ে একটা ধস্তাধস্তি বিক্ষেপ বিকার বৈচিত্র্য ইত্যাদির খেলা এবং অবশেষে সুস্পষ্ট বোধ। ব্যাপারটা যেন রাত্রির অন্ধকারকে তরল করে সূর্য ওঠার মত : প্রথমটায় অন্ধকার (তমঃ), তারপর আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বে আকাশের লাল হয়ে ওঠা (রজঃ), এবং অবশেষে উজ্জ্বল সূর্যোদয় (সত্ত্ব)। আরেকটা উপমা হচ্ছে, কাঠে আগুন ধরার : প্রথমে কাঠে আগুন থাকলেও তার প্রকাশ নাই, তারপর তার ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে জ্বলা এবং অবশেষে সমস্তটা কাঠেরই আগুন হয়ে ওঠা। পুরুষের অনুভবের সমস্ত বৈচিত্র্যকে সাংখ্যকার এই চিৎপ্রকর্ষের তারতম্যের থাকে-থাকে সাজিয়েছেন : একদিকে নিশ্চেতনতা বা মূঢ়তা, আরেকদিকে চেতনার পূর্ণতা, মাঝখানে চেতনার বিক্ষেপ। ব্যাপারটা অনবরত চলছে—রাতের পর দিন, দিনের পর দুপুর, তারপর আবার সন্ধ্যা, আবার রাত, আবার ভোর; প্রকৃতির পরিণাম চলছেই।

জড়প্রকৃতিতে ব্যাপারটা তবুও সোজা, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিতে এসে সেটা খুব জটিল হয়ে গেছে। জটিলতার আসল কারণ হচ্ছে গুণের মিশ্রণ। কোনও গুণই একলা কাজ করে না, করে একসঙ্গে। একসময় এককেটি গুণ প্রধান হয়, আর দুটি আড়ালে থেকে তাকে স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা করে। যেমন তমোগুণের ধর্ম চেতনার আচ্ছন্নতা, মূঢ়তা; কিন্তু তারই আড়ালে রয়েছে চেতনার স্বরূপে ফুটে ওঠবার একটা আকূতি অর্থাৎ সত্ত্বের চাপ, আর তাইতে যে-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে তা-ই দেখা দিচ্ছে চেতনার নানা বিক্ষেপে এবং বিকারে—যার নাম হল রজের চাঞ্চল্য। সত্ত্বে চেতনার পূর্ণ প্রকাশ; কিন্তু আড়াল থেকে রজঃ তার মধ্যে বিক্ষেপের সৃষ্টি করছে যাতে মুনিদেরও মতিভ্রম হচ্ছে; আর তমঃ চেষ্টা করছে চেতনাকে স্তিমিত করতে এবং ক্রমে তা স্তিমিত হয়ে পড়ছেও—চেতনার উদ্দীপনাকে বারবার জাগিয়ে রাখতে ক'জন মানুষ পারে? রাজসিক উত্তেজনার মধ্যে থাকে প্রশান্ত উজ্জ্বলতার আকূতি—যা সত্ত্বের ধর্ম, থাকে অপরিহার্য অবসাদের পিছুটান—যা তমের ধর্ম। আমাদের দেহের বনিয়াদ হল তমঃ, প্রাণের রজঃ, আর সত্ত্বের মন। তিনটিকে আলাদা করা যায় না, একের উপর অন্যের প্রভাবও সুস্পষ্ট।

এমনি করে তিনগুণের তিনমিশালিতে দেখা দিচ্ছে অগুনতি বৈচিত্র্যের মানুষ। শুধু মানুষই-বা কেন—বিচিত্র জীব, প্রকৃতির বিচিত্র লীলা। সাংখ্যকার

বলেছেন, তমোগুণের ধর্ম হল স্থিতি (inertia), রজোগুণের প্রবৃত্তি (dynamis) আর সত্ত্বগুণের প্রকাশ (illumination)। সহজেই মনে পড়ে জড় প্রাণ আর চৈতন্যের কথা। দেখতে পাই, জড়ের অব্যক্ত হতে চৈতন্যের সুব্যক্তির দিকে প্রকৃতির অভিব্যক্তি—এই তার সৃষ্টির ছন্দ; আবার বিপরীত-ক্রমে চৈতন্যের সঙ্কোচে জড়ত্বের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া এই তার প্রলয়ের ছন্দ। সৃষ্টি-প্রলয়ের অবিরাম আবর্তন চলছে গুণলীলাকে আশ্রয় করে।

অগুনতি বৈচিত্র্যসত্ত্বেও মানুষের মধ্যে তিনটি মূল চরিত্র (type): তামসিক মানুষ—মূঢ় দেহসর্বস্ব অসাড় দুরাগ্রহী পরিবর্তনবিমুখ; রাজসিক মানুষ—চঞ্চল প্রাণের উত্তেজনায় অধীর ভোগলোলুপ নিত্যনতুনের সন্ধানী; আবার সাত্ত্বিক মানুষ—প্রশান্ত মনস্বী বিবেচক সংযত দূরদর্শী প্রতিভাবান রসিক। প্রথম চরিত্রের মানুষ সবচাইতে বেশী, আর তৃতীয় চরিত্রের সবচাইতে কম—যদিও এরাই সমাজের আদর্শ এবং নেতা। বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কবি শিল্পী সাধু-সন্ত প্রভৃতি এই চরিত্রের। তবে এও একটা গড়পড়তা হিসাব; আসলে মানুষের মধ্যে চরিত্রের মিশাল অফুরন্ত।

*

প্রকৃতির গুণলীলা হতে চেতনায় দেখা দেয় দ্বন্দ্বের খেলা। দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় চেতনার সঙ্কোচ হতে; আর ওইটি হল তমোগুণের ক্রিয়া। তার পিছনে রয়েছে রজোগুণের প্রবেগ। তমসাচ্ছন্ন চেতনা সর্বপ্রকাশক বা সর্বগ্রাহী নয়। ফলে অনেক-কিছুই তার নজরের বা আগ্রহের বাইরে পড়ে থাকে, ওগুলি তার কাছে হেয়। কিন্তু জীবনে উপাদেয়ের সঙ্গে হেয়েরও মোকাবিলা করতে হয় মানুষকে। তাইতে তার চেতনায় ওঠে সুখ-দুঃখের এবং তাহতে রাগ-দ্বেষের আর ভাল-মন্দের তরঙ্গ। তরঙ্গের অর্থই হল চাঞ্চল্য, ওটা রজোগুণের ধর্ম। ওর উত্তেজনা আছে, আবার অবসাদও আছে। শেষপর্যন্ত আর এমন করে জীবনদোলায় দুলতে মানুষের ভাল লাগে না।

মানুষ আপাতত যে-গুণের বশ হক না কেন, চেতনার গভীরে সে কিন্তু চায় সত্ত্বগুণকে—চায় প্রশান্ত প্রোজ্জ্বল প্রসন্নতাকে, চিৎপ্রকর্ষ তার জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু সত্ত্বগুণেরও দুটি রূপ—মিশ্রসত্ত্ব বা মলিনসত্ত্ব আর শুদ্ধ-সত্ত্ব। মলিনসত্ত্বে রাজসিক চাঞ্চল্য আর তামসিক মূঢ়তার খাদ আছে। ফলে

তার দৃষ্টি যত স্বচ্ছ হক না কেন, খানিকটা রঙের ঘোর তার মধ্যে থাকেই। যেমন, দেশের হিত করতে চাই, পরার্থপর হতে চাই—খুব ভাল কথা; প্রেরণাটা সত্যি সাত্ত্বিক। কিন্তু হিতৈষণার মধ্যে অদূরদর্শিতা গোঁড়ামি যশোলিপ্সা অহঙ্কার কত-কিছুরই ভেজাল থাকতে পারে। তখন অতি বড় বিশ্বহিতৈষণাও হয় শুম্ভ-নিশুম্ভের দেবব্রতপালনের মত : শুম্ভ তো আর শম্ভু নয়।

আসলে মলিনসত্ত্ব হল মনের ধর্ম, আবরণ আর বিক্ষেপের ক্রিয়া তার মধ্যে থাকবেই থাকবে এবং পরিণামে সাধকের সমস্ত প্রয়াসকে রজস্তমের ভূমিতে নামিয়ে আনবেই, বিকার আর অবসাদ থেকে কিছুতেই তাকে বাঁচানো যাবে না। বাঁচতে হলে যেতে হবে মনের ওপারে, তিনমিশালি গুণলীলার ওপারে।

*

এইখানেই আমরা পাই সাংখ্যের নৈস্ত্রিগুণ্যের বা কৈবল্যের আদর্শ। প্রকৃতির মধ্যে গুণপরিণাম আছেই, তার ঝামেলাও আছে; অতএব পুরুষকে তার ঊর্ধ্বে উঠতেই হবে। তমোগুণের ধর্ম মূঢ়তা; তা কে চায়? রজোগুণের ধর্ম চাঞ্চল্য; তারও দুঃখ আছে। সত্ত্বগুণ ভাল বটে; কিন্তু তারও মধ্যে দেখি ভেজাল আছে—সে বিকৃত হয়ে যায়, নেতিয়ে পড়ে, অনেকদূর দেখলেও সবটা দেখে না। গীতায় আছে, সত্ত্বগুণও বাঁধে—সুখের আসক্তি দিয়ে, জ্ঞানের আসক্তি দিয়ে। ওই আসক্তি কথাটাই ভয়ানক। তার মূলে আছে মোহ, অভিনিবেশ—অতএব না পেলেই দুঃখ। সুখ আর জ্ঞানের মত অত ভাল জিনিসেও সেই রজ-স্তমের ভেজাল। অতএব সত্ত্বগুণেরও ওপারে চলে যাও, কোনও গুণকেই আমল দিও না। রাগ দ্বেষ মোহ—ওই তো চেতনায় গুণের ছায়া, যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ তমের ছায়া। তোমার অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই, মোহও নাই—চেতনায় কোনও রং নাই, কোনও তরঙ্গ নাই। অতএব সুখ-দুঃখ ইচ্ছা-দ্বেষ শুভাশুভ পুণ্য-পাপ কোনও-কিছুরই দ্বন্দ্ব নাই। এমন কি তোমার কোনও কর্মও নাই—কেননা কর্ম করতে গেলেই চেতনায় তরঙ্গ উঠবে আর অমনি প্রকৃতির খপ্পরে পড়তে হবে। তুমি অকর্তা, তুমি অভোক্তা—প্রকৃতির গুণলীলার বৈরাগী উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। এমন-কি লীলা দেখবারও দরকার কি? তোমার চেতনার দর্পণে কোনও কিছুরই ছায়া পড়ে না—দিনেরও না রাতেরও না, সৎএর না অসতেরও না। তুমি ত্রিগুণাতীত, 'শিব এব কেবলঃ'।

*

কিন্তু গুণাতীত হওয়াই সাধনার শেষ কথা নয়, তারও পরে আছে গুণাধীশতা। আগেও বলেছি, ত্রিগুণ আর গুণাতীতের মাঝে আরেকটা ভূমি আছে শুদ্ধসত্ত্বের। বাস্তবিক, প্রথমে সাধনা শুরু হয়েছিল কিন্তু সত্ত্বগুণকেই লক্ষ্য করে। কিন্তু যখন দেখা গেল, মনের ভূমিতে থাকতে সত্ত্বগুণকে বিশুদ্ধ রাখা যায় না, তখন তাকেও ছাড়িয়ে যাবার কথা উঠল। মনের ওপারে আছে বিজ্ঞান, সত্ত্ব আর সেখানে মলিনসত্ত্ব নয়, শুদ্ধসত্ত্ব বা গীতার ভাষায় নিত্য-সত্ত্ব। বেদে পুরাণে তন্ত্রে এর কথা নানাভাবে বলা হয়েছে—উদয়াস্তহীন নিত্যসূর্যের বা চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধিহীন নিত্যষোড়শী কলার উপমা দিয়ে। এখানে প্রকৃতি অপরা নন, পরা বা পরমা—পরমপুরুষের স্বীয় প্রকৃতি বা তাঁর স্বরূপশক্তি। গুণের ক্রিয়া এখানে ব্যামিশ্র বা অন্যোন্যবিরুদ্ধ নয়—শুদ্ধ এবং সুষম। অপরা-প্রকৃতিতে যে-তমঃ অন্ধ অসাড়তা, এখানে তা রূপান্তরিত চিদ্‌ঘন প্রশান্তিতে; রাজসিক চাঞ্চল্য এখানে সিদ্ধবীর্যের স্ফুরত্তা, সত্ত্ব সর্বতো-ভাস্বর আত্মজ্যোতির প্রকাশ। আমাদের প্রাকৃত জীবনের বনিয়াদ গুণবৈষম্যের ওপর, গুণসাম্য হলেই প্রকৃতি হয়ে যায় অব্যক্ত—যেমন নিদ্রায় বা প্রলয়ে; ও হল অব্যক্তের অন্ধতমঃ। আর পুরুষের স্বরূপপ্রকৃতিতেও গুণসাম্য আছে, আমাদের প্রাকৃতচেতনায় তাও অব্যক্ত; কিন্তু সে হল জ্যোতির্ময় অব্যক্ত। তাকে বলতে পারি গুণাতীতের মধ্যে শুদ্ধগুণের স্ফূর্তি—যেন অবর্ণ আকাশে চিৎসূর্যের দীপ্তি, বিষ্ণুর বক্ষে কৌস্তুভদ্যুতি, প্রলয়সমুদ্রে বিশ্বের লীলা-কমল, বৈরাগী মহেশ্বরের কোল জুড়ে সর্বৈশ্বর্যভূষিতা উমার হিরণ্যপ্রতিমা। ত্রিগুণে আর গুণাতীতে বিরোধ আমাদের ব্যষ্টিচেতনায়—আমাদের মোক্ষসাধনের ক্ষেত্রে; কিন্তু নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের মধ্যে তো এ-বিরোধ নাই।

আর তাঁর সাধর্ম্য লাভ করাই আমদের সিদ্ধির চরম। শুদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের অবিনাভূতা শুদ্ধা ও মুক্তা প্রকৃতি: দুয়ের সামরস্যেই সত্তার সার্থকতা।

১০

সিদ্ধির ষড়ঙ্গ

পরমপুরুষের সাধর্ম্যলাভ করাই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। তার জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন আধারের শুদ্ধি। শুদ্ধি হতে আসে মুক্তি—পুরুষ এবং প্রকৃতি দুয়েরই মুক্তি। মুক্তি বলতে বুঝি স্বভাবের পূর্ণতা এবং শক্তির স্বাতন্ত্র্য। এই মুক্তি হতেই সিদ্ধি।

সাধর্ম্যলাভের নানা আদর্শ আছে। মায়াবাদীর কাছে পুরুষ শুদ্ধসন্মাত্র, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, বিশ্বাতীত; তাঁর কাছে সাধর্ম্যলাভের অর্থ এই বিশ্বাতীতের মধ্যে অবগাহন ও নিমজ্জন। বৌদ্ধের কাছে পরমার্থ কোনও পুরুষ নয়, সমস্ত ভাবের প্রতিষেধরূপী শূন্যতা মাত্র; তার মধ্যে অহংএর পরিনির্বাণই তাঁর কাছে সিদ্ধির চরম। এঁরা কেউই নাম-রূপের ধার ধারেন না। যাঁরা নাম-রূপকেও সত্য বলে স্বীকার করেন, তাঁদের দর্শন এমন সর্বনাশা না হলেও তাঁরাও সিদ্ধির সন্ধান করেন লোকোত্তরে। কিন্তু পূর্ণযোগীর সিদ্ধি শুধু লোকোত্তরে নয়, ইহলোকে এবং ইহজীবনেও। তাঁর মুক্তির সাধনা শুধু নিষ্কৃতি এবং নিষ্ক্রান্তির জন্য নয়, রূপান্তরের জন্য। সব-কিছুকে নিয়েই তাঁর সাধনা, কাটছাঁট করে নয়। তাই তাঁকে নজর রাখতে হয় সর্বদিকে। তাইতে একটা ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে তাঁর সাধনাকে ফেলা যায় না বলে বিচিত্র পথে তার গতি, বহুমুখী তার ব্যঞ্জনা।

তবুও বলা যেতে পারে, তার দুটি অঙ্গ বা ধারাবাহিকতার দুটি ধারা আছে। এখানে সংক্ষেপে তাদের কথা বলে পরের অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

*

সিদ্ধির প্রথম অঙ্গ হল সমত্ব। গীতাতে সমত্বের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'; এমনও বলা হয়েছে সমত্বই যোগের লক্ষণ—'সমত্বং যোগ উচ্যতে'। সমতার বোধ আসে পরম প্রশান্তি থেকে; আর বৈষম্যের হেতু হল অহং-চেতনার সঙ্কীর্ণতা, গুণের বিক্ষোভ

স্বচ্ছতা। আকাশের আনন্ত্যে যে-চেতনা ছড়িয়ে পড়েছে, সে শুধু সম নয়, সূক্ষ্ম : সে অবিচল সর্বাধার, সর্বাবগাহী, সর্বপ্রচোদক। তার প্রশান্তিই শক্তির স্ফুরত্তার (dynamism) উৎস। সে শুধু নিষ্পক্ষ গ্রহীতাই নয়, স্বচ্ছন্দ কর্তাও। পুরুষের সাম্য ছন্দিত হয় প্রকৃতির সৌষম্যে—বুদ্ধি মন হৃদয় প্রাণ এমন-কি দেহ পর্যন্ত সর্বত্র সর্বকালে একের সুরে বেজে ওঠে। সমত্ব শান্তি, স্বচ্ছ ছন্দ।

সিদ্ধির দ্বিতীয় অঙ্গ হল শক্তি। সমত্ব যেমন দিব্যপুরুষের স্বভাব, তেমনি দিব্য-প্রকৃতির স্বভাব হল শক্তি। সমত্ব আর শক্তি অবিনাভূত, চেতনা শান্ত হলেই আমাদের মাঝেকার সুপ্ত শক্তি জেগে ওঠে। শক্তির চারটি উপাঙ্গ। প্রথম, করণের (instruments) সামর্থ্য। চারটি করণকে মুখ্য বলে ধরে নিতে পারি—বুদ্ধি হৃদয় প্রাণ আর দেহ। কৃচ্ছ্রতার দ্বারা এদের নিগ্রহ (repression) যোগের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য সংযম (control) এবং ঊর্ধ্বশক্তির প্রসাদের দ্বারা এদের আপ্যায়ন যাতে এদের সামর্থ্যের পূর্ণপ্রকাশ ঘটতে পারে। দ্বিতীয় উপাঙ্গ বীর্য। বীর্য পুরুষের স্বভাব। সে হল বৃহৎ চেতনার আবেশ হতে জাত ইচ্ছার অনমনীয়তা এবং শক্তিপ্রয়োগের অকুণ্ঠ সামর্থ্য। তৃতীয় উপাঙ্গ সমর্পণ। করণের আপ্যায়ন এবং আধারে বীর্যের স্ফুরণ সম্ভব হয় ভাগবতী শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর দেশনা (guidance) এবং স্ফুরত্তার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারলে। সাধনা আমি করছি না, করছেন তিনিই—এই ভাবটি চেতনায় প্রবল হওয়া চাই। তার জন্য প্রয়োজন হল শ্রদ্ধা, যা শক্তির চতুর্থ উপাঙ্গ। শ্রদ্ধা হল আস্তিক্যবুদ্ধি, যা খুজছি হৃদয়ে তার আভাস পেয়ে তার সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রত্যয় এবং আশ্বাস। অরুণোদয়ের সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে—যখন মনে হয় আলো ফুটতে আর দেরি নাই।

*

সব সাধনারই শুরু হয় মন দিয়ে। সমত্ব ও শক্তির সাধনাও বহুদূর চলতে পারে মনের সহায়ে। কিন্তু যোগের সম্যক্‌সিদ্ধি তাতে আয়ত্ত হয় না। সাধনার উচ্চস্তরে ঊর্ধ্বশক্তির আবেশ মনের মধ্যেও হয়, মনের সমত্ব এবং শক্তি হল তারই ফল। কিন্তু মন গুণের অধীন বলে মানসী সিদ্ধির মধ্যে তখনও জোয়ার-ভাটা খেলতে থাকে। প্রকৃতির রূপান্তর না ঘটিয়ে চেতনাকে সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বস্রোতা এবং প্রকৃতির মহেশ্বর করে তোলা যায় না। তীব্র সংবেগের ফলে অমনীভাবের

শূন্যতায় মনের প্রলয় হলেও সমস্যার সমাধান হয় না। মনের প্রলয় নয়, চাই তার রূপান্তর। মনের ওপারেই রয়েছে বিজ্ঞান, রূপান্তর সিদ্ধ হতে পারে তারই আবেশে। বিজ্ঞান আবিষ্ট করবে বুদ্ধি মন হৃদয় প্রাণ ইন্দ্রিয়সংবিৎ সব-কিছু, সমস্ত আধারকে সে হিরণ্যজ্যোতিতে ভাস্বর করে তুলবে, অতিচিতি (Superconscience) হতে অচিতি পর্যন্ত তার সব মহলে বইয়ে দেবে পুরুষোত্তমের দিব্য জ্যোতি আনন্দ ও শক্তির মুক্তধারা। এমনি করে মনকে বিজ্ঞানের ভূমিতে তুলে নেওয়া এবং তার দ্বারা তাকে জারিত করা হল সিদ্ধির তৃতীয় অঙ্গ।

চতুর্থ অঙ্গ হল কায়সিদ্ধি। মানুষের অন্নময় স্থূলশরীরের পিছনে আছে প্রাণমনোময় সূক্ষ্মশরীর, তারও পিছনে আছে বিজ্ঞান-আনন্দময় কারণশরীর। তাদের বীর্যকে উন্মীলিত করে এই দেহকেও চিন্ময় করে তোলা হল কায়িক সিদ্ধি। হঠযোগের চক্রভেদে, রাজযোগের ভূতজয়ে, তন্ত্রের ভূতশুদ্ধিতে তার ইঙ্গিত আছে। পূর্ণযোগী ইচ্ছা করলে তাদের কাজে লাগাতে পারেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে তারা অপরিহার্য নয়। নীচের শক্তিকে উজানের দিকে ঠেলে দেওয়া নয়, উপরের শক্তিকে নীচে নামিয়ে আনা হল তাঁর যোগের বিশিষ্ট কৌশল। সুতরাং তাঁর কায়সিদ্ধি হবে বিজ্ঞানসিদ্ধিরই পরিণাম।

তারপর পঞ্চম অঙ্গ হল বিজ্ঞানঘন পুরুষের চিন্ময় ভোগৈশ্বর্যের সিদ্ধি। পরমপুরুষ প্রকৃতির শুধু দ্রষ্টা নন, তিনি তার ভোক্তা এবং মহেশ্বর। বিশ্বরূপা প্রকৃতি তাঁর আত্মমায়া—তাঁর আনন্দের বিভা এবং শক্তির উল্লাস। তাঁর ঐশ্বর্য আত্মরূপায়ণের অনন্ত বৈচিত্র্য, তাঁর ভোগ সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেরই আনন্দস্বরূপের আস্বাদনে। বিজ্ঞানঘন পুরুষও এইখানে তাঁর সমধর্মা—এই তাঁর সিদ্ধি। তিনি অকামহত, অথচ আত্মপ্রকৃতির পরম চরিতার্থতায় আপ্তকাম, সান্তের মধ্যেও আনন্ত্যের ক্রমোর্ধ্ব উল্লাসে উচ্ছলিত।

শেষ অঙ্গ হল আনন্দসিদ্ধি। বিজ্ঞানের পর্যবসান ব্রহ্মের আনন্দে। ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ—যেমন বিশ্বাতীতে, তেমনি বিশ্বে। তিনিই বিশ্ব : 'পুরুষ এব ইদং সর্বম্', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' এই অনুভব বিজ্ঞানঘন পুরুষের : শুধু আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণেই নয়, তার বিস্ফোরণেও। তাইতে দেহ প্রাণ মনের অনন্ত উল্লাস—ভূতগ্রামের বিচিত্র পরম্পরায়। সবই তিনি : রূপে-রূপে প্রতিরূপ, আবার লোকোত্তরে নির্ণাম নীরূপ। এই দ্বিকোটিক অনুভবেই অভয় আনন্দের পরম প্রতিষ্ঠা, অধ্যাত্মসিদ্ধির চরম।

১১

সমত্বসিদ্ধি

'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি'। ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্ম হতে হবে—এই হল জ্ঞানের সিদ্ধি। 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি'। তিনি রস, তিনি আনন্দ; তাঁকে লাভ করে ও আস্বাদন করে আনন্দ হতে হবে—এই হল প্রেমের সিদ্ধি। শুধু সাযুজ্য নয়, সাধর্ম্যও; অদিব্যের দিব্যে রূপান্তর—পুরুষের মহিমায় এবং প্রকৃতির উল্লাসে। এ-ই সিদ্ধি।

সমত্বসিদ্ধি তার প্রথম সোপান। 'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'—সমত্ব ব্রহ্মের স্বভাব। আকাশের সমত্ব : তার প্রসন্ন দ্যুলোক, ক্ষুব্ধ অন্তরিক্ষ, মূঢ় পৃথিবী; কারও প্রতি সে উদাসীন নয়, সবাইকে সে জড়িয়ে আছে। অথচ সবাইকে ছাপিয়ে তার আত্মরতির আনন্দে প্রশান্ত হয়ে আছে। এ-ই সমত্ব। এ-ই ব্রহ্ম, এ-ই আত্মা। চৈতন্যের এ-ই নিরূঢ় স্বভাব।

অথচ 'আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা'। এ-আকাশ যেমন উদাসীন নয়, তেমনি আসক্তও নয়—নাম আর রূপের নির্বাহ হচ্ছে এই আকাশ হতেই। সে-নির্বাহ আকাশে প্রাণের স্পন্দন : আকাশ আর প্রাণ অবিনাভূত। আকাশ পুরুষ, প্রাণ প্রকৃতি। কর্ম প্রকৃতির, পুরুষ তার অধ্যক্ষ—দুয়ের মাঝে আনন্দের গ্রন্থি। ব্রহ্ম কর্মাধ্যক্ষ।

যিনি অধ্যক্ষ, তিনি ঈশান (Master)। তাঁর ঈশনা কর্মের সমস্ত পরিস্পন্দে সমস্ত বিকারে অনুস্যূত হয়েও অবিকল্পিত। এইখানে তাঁর সমত্ব। কর্মের আদিতে নিশ্চেষ্টতা, অন্তে চরিতার্থতার প্রশান্তি—মাঝখানটাতে যত বিক্ষোভ। আদি মধ্য অন্ত সবার যিনি উপদ্রষ্টা অনুমন্তা এবং ভর্তা, তিনি মধ্যপর্বের বিক্ষোভে ক্ষুব্ধ হন না, কেননা এ-বিক্ষোভ বিধৃত রয়েছে তাঁরই প্রশাসনে। আমরা প্রশাস্তা নই আদি-অন্ত দেখতে পাই না, তাই ক্ষোভ আমাদের কাছে পীড়া। কিন্তু দৃষ্টি যদি উদার হয়, গভীরে যায়, যে-সত্তার বৃন্তে সব-কিছু বিধৃত তার মর্মে নিখাত হয়, তাহলে ক্ষোভকে দেখি ব্রহ্মক্ষোভের আকারে—যেন আদিত্যের বুকে আলো টলমল করছে পারার মত। যেন বাদী-বিবাদী সব সুরের পরম সংগতি এক বৃহৎসামে। যেন নটরাজের নৃত্য।

এক পরমসাম্য ছাড়া ক্ষোভকে ধারণা করা যায় না, ছন্দের সুষমা আনা যায় না তার মধ্যে। প্রাকৃতজীবনেও তা-ই দেখি। চাকার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে, সেও এগোয়—কিন্তু কী তার জ্বালা। আর, যে চক্রবর্তী, সে নিশ্চল থেকে নিজে চলে পরকে চালায়। সমত্ব ওই নিশ্চলতায়, আর ওইথেকেই আসে অধিষ্ঠানের আর প্রশাসনের সামর্থ্য।

অধ্যক্ষ হতে হলেই সবার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। তার নাম বিবেক, তার ফল কৈবল্য। কিন্তু নিরীহ কৈবল্য নয়, প্রবর্তক কৈবল্য। আর চেতনাকে প্রসারিত করতে হবে—আকাশের মত। সাংখ্যের আত্মা বিবিক্ত, বেদান্তের ব্রহ্ম বৃহৎ। দুটি ভাবনাকে মিলিয়ে নিতে হবে : 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মাই ব্রহ্ম। প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হয়ে মহান্ হয়ে শান্ত হয়ে আবার প্রকৃতিকে জড়িয়ে ধরতে হবে, অক্ষুব্ধ প্রশান্তির মহিমা থেকেই তার ক্ষোভে আনতে হবে ছন্দ, তার বৈষম্যে সৌষম্য। তার মর্মের গভীরে নিহিত পুরুষের সত্যসঙ্কল্পকে উদ্ভাসিত করতে হবে তার আচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে।

*

সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সব-কিছুকে অক্ষুব্ধ হয়ে গ্রহণ করতে হবে—এই হল সমত্বের একটি লক্ষণ। ক্ষোভ আসে নিজের মতলব থাকে বলে। ক্ষুদ্র বাসনার ক্ষুদ্র তৃপ্তি ব্যাহত হলেই দুঃখ। অথচ চাওয়া প্রাণের ধর্ম, তার টুঁটি চেপে ধরাটাই মুশকিলের আসান নয়। কিন্তু প্রাণকে যদি বৃহৎ করি, তাহলে চাওয়ারও রূপ বদলে যায়। প্রাণ বৃহৎ হয় চেতনা বৃহৎ হলে। তার চাওয়া যেন আকাশের চাওয়া—যার পাওয়া বাইরে নয়, অন্তরে। বাইরটা তখন উপলক্ষ্য মাত্র; সান্ত যেন অনন্তের ইশারা। সব স্পর্শই তখন ব্রহ্মের সংস্পর্শ—সুখ তো বটেই, দুঃখও তা-ই। অন্তরে কোথায় যেন একটা ফোয়ারা খুলে যায়, তাইতে সব-কিছুতেই আনন্দ ছলকে ওঠে। কোন-কিছুর বিরুদ্ধেই আর তখন নালিশ নাই। দেখছি, আঁকা-বাঁকা বিচিত্র গতিতে সব নদীই চলছে সমুদ্রসঙ্গমে। আর সে-সমুদ্র এই অনুভবে, আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ এই চেতনায়। আকাশের সমুদ্র : অক্ষুব্ধ বলেই সব ক্ষোভের আশ্রয়, ভূমা বলেই সব অল্পের নিধান, আনন্দ বলেই সব দুঃখের নির্বেদন।

মানুষী সিদ্ধিও যদি চাই, তাহলেও তার পথ হচ্ছে এই সমত্ব। মানুষ

...শক্তিকে বশে আনতে। শক্তি আছে তার অন্তরে—আত্মশক্তি; আছে বাইরে—...শক্তি আর সমাজশক্তি। কিন্তু বাইরে শক্তিকে সে বশে আনতে পারে ...শক্তির দ্বারাই। বহিঃ-প্রকৃতিকে বশে আনছে বিজ্ঞান, সেও আত্মচৈতন্যেরই ...তি, বুদ্ধির দান; তারও সাধনা একধরনের যোগসাধনা বই কি। বিজ্ঞানের ...র উপকরণ সঞ্চিত হল প্রচুর; কিন্তু গোল বাধল তার ভাগবাঁটোয়ারা ...। ভূতশক্তিকে কিছুটা বশে আনতে পারলেও মানুষ সমাজশক্তিকে এখনও ...আনতে পারেনি, তাই সারা দুনিয়া জুড়ে আজ কেবল হানাহানি। সুখ ...শান্তি চায় সবাই; কিন্তু এত দুঃখ এত অশান্তি বুঝি আর কোনদিন ...তে দেখা দেয়নি। আসল কথা, মানুষ সম্রাট্ হয়েছে, কিন্তু স্বরাট্ হয়নি। ...শক্তিকে বশে আনতে পারেনি বলেই সমাজশক্তিকে সে বশে আনতে পারছে ...। স্বারাজ্যের অভাবে তার সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা বারবার বানচাল হয়ে যাচ্ছে। ...র স্বারাজ্যের ভিত্তিই হল সমত্ব—দৃষ্টির সমত্ব, ভাবের সমত্ব, কর্মের সমত্ব। ...কথায় যোগের সমত্ব। মনস্বীর সমাজ গড়াই আদর্শ নয়, আদর্শ হল ...গীর সমাজ গড়া। তার সূত্র হল আত্মাতে সর্বভূতকে দেখা, সর্বভূতে ...কে দেখা : অক্ষুব্ধ আত্মচৈতন্যের ভূমিতে থেকে সবাইকে দেখা, সবার ...র আত্মমহিমার সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ এবং উদ্দীপ্ত করা। কিন্তু তার গোড়ার ...ই হচ্ছে, যিনি নায়ক তাঁর চেতনার আকাশবৎ ব্যাপ্তি, অর্থাৎ সমত্ব।

*

সমত্বসিদ্ধি শুধু পুরুষের মধ্যেই নয়, চাই প্রকৃতির মধ্যেও। বিবিক্ত ...ষের সমত্ব তো থাকবেই, সে-সমত্ব আবার সঞ্চারিত হওয়া চাই ব্যবহারেও। ...ই প্রাণে হৃদয়ে সঙ্কল্পে ভাবনায় সর্বত্র সমত্ব।

প্রাণে সমত্বের কথাই আগে বলি। বাসনা হল প্রাণের ধর্ম, শুদ্ধির দ্বারা ...র মুক্তির কথা আগেই বলেছি। মুক্তির পরিণামে আসে সমত্ব। সমত্ব ...কাশবৎ চেতনা—একথা আবার স্মরণ করিয়ে দিই। প্রাণবাসনা বাইরে ছোটে, ...র ছোটে অল্পকে পেতে। এই প্রবেগ আর মোহ হতে তাকে মুক্ত করতে ...। চাওয়ার কিছুই নাই, তবুও কত-কিছুরই স্পর্শ আমরা পাচ্ছি। আকাশ ...ও চায় না রৌদ্রও চায় না, তবুও তার বুকে মেঘ-রৌদ্রের খেলা চলছে। ...ক, আকাশ তাতে নির্বিকার, তাদের প্রতি তার অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই

২৭

নাই। দ্বন্দ্বাতীত চেতনা আত্মস্থ আত্মরত, এক পরিব্যাপ্ত নিত্যবর্তমানের সামনে বা পিছনে কোনদিকেই তার দৃষ্টি যায় না। সংসারের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ অনুরাগ-বিরাগ শুভ-অশুভ সব-কিছু তলিয়ে যায় সেই আকাশের অতলে।

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া নয়, 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম' সব-কিছুকে শুষে নেওয়া নিজের অতলে—এই হল আরেকটি সঙ্কেত। তার মূলে রয়েছে চেতনার প্রত্যাহার (withdrawal) বা অন্তরাবৃত্তি (inwardisation)। গীতায় আছে, কাছিম যেমন হাত-পা-মুখ সব নিজের মাঝে গুটিয়ে নেয় বাইরের সাড়া থেকে, তেমনি।

এমনি করে বারবার তলিয়ে যেতে-যেতে অন্তশ্চেতনার গভীরে খুঁজে পাই আত্মসত্তার অক্ষীয়মাণ জ্যোতির্লিঙ্গকে। সে-পাওয়াকে জড়িয়ে আছে সত্তার আনন্দ (delight of existence)—শুধু 'আছি' এই বোধের প্রশান্ত গভীর আনন্দ। দেখি, প্রাণের বাসনায় সেই আনন্দেরই ঝিলিমিলি। যা চেয়েছিলাম, তা পেয়েই রয়েছি। এখানকার প্রতিচ্ছায়া ওইখানে। এখানে আনন্দের বৃন্ত, আর ওইখানে তার সহস্রদল।

এককে পেয়ে তখন বহুর সম্ভোগ, প্রাণবাসনার দিব্য পরিতর্পণ। পরিগ্রহের (egoistic possession) উপভোগ নয়, ত্যাগের সম্ভোগ, বৈরাগীর অনুরাগ। যেমন মহেশ্বরের অনুরাগ উমার প্রতি, স্বরূপানন্দের লাবণ্যপ্রতিমার প্রতি। এই হল আকাশ আর প্রাণের সামরস্য।

*

তারপর হৃদয়ের সমত্ব। প্রাণ আর হৃদয় কাছাকাছি। একটি ক্রিয়া, আরেকটি ভাব। একটি প্রবেগ সৃষ্টি করে, আরেকটি করে আস্বাদন। উপনিষদে হৃৎপুরুষকে বলা হয়েছে 'মধ্বদ' বা মধুভোজী; কিন্তু প্রাকৃত হৃদয়ের আস্বাদন তিক্ত-মধুর, মধুরের চাইতে বরং তিক্তের ভাগটাই বেশী। রস বিরস হয়ে ওঠে অহন্তায়, চেতনার সঙ্কোচে। এককেটি অহংএর এককেটি জগৎ, কারও সঙ্গে কারও মিল নাই, সবার দাবিই সমান উগ্র—তাই জগৎ জুড়ে কেবল রেষারেষি আর হানাহানি। কোথায় সুষমা, কোথায় আনন্দ?

সমস্যার একই সমাধান : ডুবতে হবে সেই গভীরে, 'যত্র বিশ্বং

ভবত্যেকনীড়ম্'—সব-কিছু এসে মিলিত হয়েছে একটি নীড়ে। সব অহংএর সবার এক পরম অহং—তাঁর অহং। আমার অহন্তা তলিয়ে যাক সেই পরাহন্তায়, বাসনার উত্তালতা শিথিল হক শান্ত হক। কোন-কিছুর প্রত্যাশা আর নয়, শুধু অকামহত বিস্ফারিত হৃদয় নিয়ে চেয়ে থাকা। সে-হৃদয় তাঁরই আনন্দের সুধাপাত্র—গভীরের রসে আপনা হতে যেমন উপচে উঠছে, তেমনি বিশ্বের সমস্ত সংবেদনকে রসায়িত করে তুলছে অনির্বচনীয় সোম্য মধু-র রসায়নে।

জীবন তখন আনন্দের প্রস্রবণ। বিরসতার ভয়ে জীবনকে নীরস করা নয় শুষ্কতার দ্বারা, কিন্তু রসচেতনার রূপান্তর ঘটানো অস্তিত্বের আদিম মাধুর্যের ছোঁয়ায়—জীবনে সেই রসকে ফিরিয়ে আনা যা আছে শিশুর কল্পনায়।

অক্লিষ্ট মুক্ত হৃদয়ের সমতায় তখন সব ভাবের রূপান্তর ঘটবে। বুভুক্ষু ক্ষুব্ধ আর্ত জর্জর কাম রূপান্তরিত হবে প্রশান্ত প্রসন্ন স্নিগ্ধ আত্মারাম অতএব আপ্তকাম প্রেমে। অক্ষম শোকের বিধুরতা রূপান্তরিত হবে স্বপ্রতিষ্ঠ অতএব সক্ষম সমবেদনার বীর্যে, রোষ ক্ষেমঙ্কর রুদ্রের অশিবনাশন দাক্ষিণ্যে।

*

তারপর সঙ্কল্পের সমত্ব। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে প্রকাশ পায় পুরুষের দুটি বৃত্তি—ভোক্তৃত্ব এবং কর্তৃত্ব। কর্তৃত্বের প্রেরণা আসে কামনা অথবা সঙ্কল্প হতে। কামনার শুদ্ধ রূপ হল সঙ্কল্প, একথা আগে বলেছি। কিন্তু অবিদ্যার ভূমিতে সঙ্কল্প শুদ্ধ থাকে না, 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা' কর্তার কামনার সঙ্গে জড়িয়ে যায়—গীতায় তার নাম 'কাম-সঙ্কল্প'। তার প্ররোচনায় আমাদের যে-কর্ম, তা ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য শুভাশুভের দ্বন্দ্বে জড়িত। একটা আদর্শবাদের প্রেরণা তার মূলে নিশ্চয় আছে, নইলে সমাজস্থিতি অসম্ভব হত। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই সে-আদর্শ মনঃকল্পিত সুতরাং একদেশদর্শী। সব না দেখে না বুঝে সাধারণ ব্যাপারেও ভাল-মন্দের সম্পর্কে রায় দেওয়া কঠিন—আর বিশ্বব্যাপারে তো আরও কঠিন। যেমন ভোক্তৃত্বের বেলায় সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে গেলে আমরা বিশ্বমূল আনন্দের সন্ধান পাই, তেমনি কর্তৃত্বের বেলাতেও ভাল-মন্দের ঊর্ধ্বে গিয়ে বিশ্বমূল সত্যসঙ্কল্পের অনুভব পেতে হবে। সে-অনুভবের প্রথম শর্তই হবে চিরাচরিত ভাল-মন্দ বা ধর্মাধর্মের

মনগড়া আদর্শের প্রতি সাধকের সমদৃষ্টি। কারও ভাল-মন্দের বিচার না করা সমদর্শনের প্রথম অঙ্গ; দেখছি মানুষ নিজের ইচ্ছায় চলছে না, চলছে তাঁর ইচ্ছায়—'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায়'; সুতরাং আমি তার বিচার করবার কে। সে-ইচ্ছাকে যখন নিজেরও ইচ্ছার মূলে প্রত্যক্ষ করি, তখন রামপ্রসাদের মতই বলি, 'ধর্মাধর্ম দুটো অজা তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি, যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি।' সমদর্শনের এইটি দ্বিতীয় অঙ্গ। বাসনার কথা নয়, মতলববাজির কথা নয়, তদ্‌গত চিত্তের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা; 'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ, ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি কথা করোমি।' গীতায়ও শুনি তাঁর বাণী: 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' তদ্‌গতচিত্তের দ্বারা অধর্মাচরণ হয় না, হতে পারে না—একথা ধ্রুব সত্য; কিন্তু একথাও সত্য, মানুষের মনগড়া মাপকাঠিতে তাঁর আচরণকে মাপাও যায় না। 'তাঁর ক্রিয়া মুদ্রা যত বিজ্ঞে না বুঝয়।'

*

প্রাণ হৃদয় আর বাসনার সমত্ব হল প্রকৃতির দিক ঘেঁষা। আর পুরুষের দিকে ঘেঁষা সমত্ব হল মন এবং বুদ্ধির।

মন ভাবে। তার ভাবনার মধ্যে আছে স্মৃতি কল্পনা সংস্কার অভ্যাস আর পৌনঃপুনিকতার জটলায় গড়া তার নানা মত—যাদের প্রতি তার মোহ অপরিসীম। প্রথমেই এই মোহ হতে মনকে মুক্ত করতে হবে। মন জানে না, জানতে চায়—এই তার সত্য ধর্ম। অবিদ্যা হতে সে চলছে বিদ্যার দিকে. ধীরে-ধীরে তার পথ আলোকিত হয়ে উঠছে। কিন্তু আলোকের পরমতীর্থে সে পৌঁছবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। বাধা রয়েছে তার স্বভাবের মধ্যে—সে একদেশদর্শী। যেটুকু সে জানে সেইটুকুকে একান্ত করে তুলে অখণ্ড অনির্বচনীয় সত্যের মধ্যে সে বিদ্যা আর অবিদ্যার সত্য আর মিথ্যার বিরোধ সৃষ্টি করে। আর তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী : অনুভূতির তুঙ্গশিখরেও মনের এই দ্বৈধবৃত্তির সংস্কার সত্যের মুখকে আবৃত করে হিরণ্ময়পাত্রের আড়ালে; আর অবরভূমিতে মনের সত্য সম্পর্কে নানা মতুয়ারির (dogmatism) তো কথাই নাই। সন্ধানী মনকে সবরকম পক্ষপাত বাঁচিয়ে চলতে হবে— এই তার

[illegible]। সে যেন হবে ভোরের শুকতারা, সবিতার দিগ্‌ব্যাপ্ত জ্যোতিরাবির্ভাবের অগ্রদূতী; তাঁর আলোর মধ্যে তার প্রদ্যোতিত পরিনির্বাণেই তার সার্থকতা।

তারপর বুদ্ধির সমত্ব। মনের সঙ্গে জড়ানো বুদ্ধির কথা বলছি না, সে ব্যাবহারিক বুদ্ধি। আর এ-বুদ্ধি বোধিচালিত, তত্ত্বদর্শী। তটস্থ পরিব্যাপ্তি তার সহজ ধর্ম—যেমন আকাশজোড়া আলোর মত, যার মধ্যে অবাধে সবই ভাসছে। সমত্ব এ-বুদ্ধির পক্ষে স্বাভাবিক।

ব্রহ্মে রয়েছে প্রকৃতি-পুরুষের দ্বিদল। দুটি দলেরই সমত্বের কথা বললাম। এই সমত্বই সাধককে পৌঁছে দেয় 'সমং ব্রহ্ম'তে—অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের সমত্বে। তার মধ্যে একরস হয়ে আছে স্বয়ম্ভূ অনন্ত সত্তার সমত্ব, যার প্রশান্ত নিবিড়তা দেহ প্রাণ হৃদয় সঙ্কল্প আর মনকে করবে চিদ্‌ঘন; আছে অনন্ত চৈতন্যের সমত্ব যার মধ্যে বইছে আনন্দ-চিন্ময় 'পুরাণী প্রজ্ঞার' মুক্তধারা; আছে [illegible]হত তপঃশক্তির সমত্ব যাহতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রভাস্বর সত্যসঙ্কল্পের দীপ্তিদ্যুতি; আছে পরমানন্দের সমত্ব যা অনির্বচনীয় রস রতি আর কান্তির ত্রিবেণীসংগম। এই সেই 'নিরঞ্জন পরমসাম্য' যা আকাশের নিথরতায় আর আদিত্যের আভাস্বরতায় নিত্য যুগনদ্ধ হয়ে আছে বিশ্বের আদিতে মধ্যে এবং অন্তে, জীবচেতনার গহনে তুঙ্গতায় এবং ব্যাপ্তিতে।

১২

সমত্বের সাধনা

সমত্বের দুটি প্রকার আছে—নিষ্ক্রিয় আর সক্রিয়। নিষ্ক্রিয় সমত্ব হল অপরা-প্রকৃতির বিকার হতে নিজেকে বিবিক্ত করে আত্মার কৈবল্যে বা ব্রহ্মের সদ্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আর সক্রিয় সমত্ব হল সেই প্রতিষ্ঠার ফলে পরা-প্রকৃতির ঋতম্ভরা শক্তির মুক্তিতে ব্রহ্মের আনন্দে বিলসিত হওয়া। একটির লক্ষ্য মুক্তি, আরেকটির লক্ষ্য মুক্তি ভুক্তি এবং শক্তি। জীবনে যোগস্থ হয়ে কর্ম করা তাঁর দিব্য নিমিত্ত হয়ে—এই হল সক্রিয় সমত্বের সহজ রূপ। নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় দুটি সমত্বেরই সাধনার সমাহার এবং সমন্বয়ের উপর পূর্ণযোগের প্রতিষ্ঠা।

*

প্রথমে নিষ্ক্রিয় সমত্বের কথা বলি। তার সাধনাঙ্গ হল তিনটি—তিতিক্ষা (endurance), উপেক্ষা (indifference) এবং বিধেয়তা বা প্রপত্তি (submission)। সঙ্কল্প (will), ভাবনা (thought) এবং বেদনা (feeling)—চিত্তের এই তিনটি মৌলিক বৃত্তির উপরে যথাক্রমে তাদের নির্ভর।

তিতিক্ষায় আমরা দিই অদম্য সঙ্কল্পশক্তির এবং আত্মবলের পরিচয়। অবশ্য সঙ্কল্প এখানে প্রবৃত্তিমুখী নয়; নিবৃত্তিমুখী : 'ব্যাঘাত আসুক নব-নব, আঘাত খেয়ে অচল রব'—এই তার রূপ। এতে যে-বলের পরিচয় পাই, সাধারণত প্রাকৃতমনে সে-বল থাকে না। বাইরের ধাক্কা অনবরত এসে মনের উপর পড়ছে। তাদের কতকগুলি তার সীমিত চেতনার অনুকূল, সেগুলিকে সে গ্রহণ ক'রে আত্মসাৎ ক'রে সুখ পায়। মানুষের দেহ প্রাণ হৃদয় মন বুদ্ধি তাতে নন্দিত হয়। আবার তেমনি কতকগুলি ধাক্কা একান্ত প্রতিকূল, চেতনাকে তারা মথিত করে তোলে। মন তাতে দুঃখ পায়, দুঃখের সঙ্গে সে লড়াইও করে, কিন্তু সবসময় জিততে পারে না। যখন পারে, তখন সে তিতিক্ষার পরিচয় দেয়। আবার কতকগুলি ধাক্কার সম্পর্কে মন অসাড়, ওগুলি তার সীমিত চেতনার বাইরে। সুখ দুঃখ মোহ অথবা রাগ দ্বেষ অসাড়তা—এইগুলি হল

…র নিত্য অভিঘাতের বিরুদ্ধে প্রাকৃত মনের প্রতিক্রিয়া। সাধারণত …ক্রিয়ার একটা বাঁধা ধরন থাকে; কিন্তু সেটা অবশ্যম্ভাবী নয়। একই ব্যাপার …সময় হয়তো সুখের, আবার আরেকসময় দুঃখের; ইচ্ছা করলে দুঃখকেও …খ রূপান্তরিত করা যায়, অসাড়তার ঘোর ভাঙা যায়। তাতে তিতিক্ষা বা …বলের বিশেষ পরিচয় মেলে।

আত্মা আনন্দস্বরূপ; অর্থাৎ আমাদের চৈতন্যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দানুভবের …র্থ্য আছে। সে-সামর্থ্য এখন কুণ্ঠিত। তাকে অকুণ্ঠিত করবার একটা …বিরাম প্রয়াস আমাদের মধ্যে চলছে। এটা প্রাণের ধর্ম। আনন্দ অসাড়তা …র দুঃখ তো নয়ই—এমন-কি সুখও নয়; কেননা সুখ আসে-যায়, তার জোয়ার-ভাটা আছে, বস্তুনির্ভর বলে তার ঝামেলাও আছে। তবে আনন্দের …গ স্বভাবত সবচাইতে বেশী বিরোধ দুঃখের। তিতিক্ষা প্রধানত এই দুঃখের …গ লড়াই। দুঃখেও চিত্তকে অনুদ্বিগ্ন অনবসন্ন ও শান্ত রাখতে পারা তিতিক্ষাজনিত সাম্যের একটি পরিচয়।

তিতিক্ষাসাধনার তিনটি পর্ব আছে। প্রথম পর্ব শক্তিবৃদ্ধির। অভ্যাসে …রোধের শক্তি বাড়ে; আগে যে-দুঃখ দুঃসহ ছিল, ক্রমে তা সহ্যের সীমায় এসে …র। তখন চিত্ত যদি সজাগ এবং অন্তর্মুখ থাকে, তাহলে দেখা দেয় বিবেক—…ই তিতিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব। আত্মচৈতন্য তখন স্পষ্টত দুভাগ হয়ে পড়ে; একভাগ প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে সুখ-দুঃখ ভোগ ক'রে চঞ্চল হয়, আরেক ভাগ নির্বিকার হয়ে দেখে যায় শুধু। দ্রষ্টৃত্বের ফলে অপরা-প্রকৃতির উত্তালতার জোর কমে যায়, ক্রমে দেহ প্রাণ হৃদয় ও মনে ছড়িয়ে পড়ে এক নিবিড় শান্তি। তৃতীয় পর্বে দ্রষ্টৃত্ব আরও সুস্থিত হলে জন্মে প্রকৃতির উপর বশীকার অর্থাৎ প্রকৃতির যে-কোনও পরিণামকে স্তব্ধ করবার অথবা তাকে ইচ্ছামত রূপ দেবার সামর্থ্য। তখন চিত্ত যে কেবল দুঃখেই অনুদ্বিগ্ন থাকে তা নয়, সুখেও তার স্পৃহা থাকে না, সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে আপনাতে আপনি থাকার এক গভীর প্রসন্নতায় সে নিমজ্জিত হয়ে যায়। গীতায় এই অবস্থাকে স্থিতপ্রজ্ঞতার একটি লক্ষণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একে ভাবনার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা …র। তখন জিজ্ঞাসার মধ্যে দেখা দেয় একটা প্রশান্ত গ্রহিষ্ণুতা যা সত্যকে …র আলোর মত ভিতরে ফুটতে দেয়, মহাকলরবে তাকে বানিয়ে তুলতে …র না।

*

সমত্বের দ্বিতীয় অঙ্গ হল উপেক্ষা, সব-কিছুর প্রতি অপক্ষপাত বা সমদৃষ্টির ভাব। উপেক্ষা আসে বিচারের ফলে। নিজেকে নিয়ে বিচার করলে সাধক দেখতে পায়, সুখ-দুঃখ অনুরাগ-বিরাগে যে সে আন্দোলিত হয়, তার মূলে রয়েছে অবিদ্যা অহন্তা আর বাসনা। নিজেকে সে বড় বলে জানে না, জানে ছোট বলে—কেননা নিজের মহিমার সে পরিমাপ করে তার বাইরকে দিয়ে। বাসনার উত্তালতা এই ছোট আমিরই। বাসনার প্ররোচনায় সে-ই সুখ-দুঃখের ইচ্ছা-দ্বেষের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। বাইরকে নিয়ে এতটা মাতামাতি স্থিরবুদ্ধি বিচারের দৃষ্টিতে মনে হয় মূঢ়তা। জগতে আন্দোলন আছে, থাক; কিন্তু তা নিয়ে মেতে বা তেতে ওঠা আত্মাবমাননার শামিল। সব-কিছুর ঊর্ধ্বে শান্ত থাকতে হবে প্রজ্ঞানের বীর্যে। উপেক্ষাসাধকের এই ভাব।

তিতিক্ষার চাইতে উপেক্ষা আরও গভীর, কেননা তার উপর এসে পড়েছে প্রজ্ঞার আলো। তিতিক্ষা হল আত্মশক্তিতে প্রবৃত্তির রাস টানা, তার মধ্যে খানিকটা আয়াস থাকে। কিন্তু কিসে কি হচ্ছে তা যদি তলিয়ে বুঝতে পারি, তাহলে আর আয়াস থাকে না, সংযম সহজ হয়।

উপেক্ষাসাধনারও তিন পর্ব। প্রথম পর্ব প্রত্যাহার—ইচ্ছামাত্র চেতনাকে বাইরের স্পর্শ হতে আলাদা করে দেওয়া। তুচ্ছতার বোধ দিয়ে আলাদা করা, জোর করে নয়। একট বড়-কিছুকে ভিতরে পেলে ছোটর প্রতি আকর্ষণ থাকে না, তাথেকে মন ঘুরিয়ে নেওয়া তখন আর কঠিন হয় না। প্রত্যাহারের পরের পর্ব হল কূটস্থতা। এও বিবেক; কিন্তু গাঢ়তর। নিজের গভীরে পেয়েছি আত্মস্থিতির একটা গম্ভীর বোধ, আর সেখান থেকে দেখছি অবর মনের মধ্যে অভ্যস্ত সংস্কারের ছেলেখেলা। বাইরের জগতের অতি প্রচণ্ড আলোড়ন—সেও ছেলেখেলা, তাতে বিচলিত হবার তো কিছু নাই। আত্মমহিমার বোধ আরও গভীর হলে উপেক্ষার তৃতীয় পর্ব—ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যন্তসুখ বা আত্মরতি। এর মধ্যে নেতিভাবনার কিছু নাই—'এ নয় এ নয়' এ-দ্বিধা আর নাই। অন্তরে তখন একটা রসের ফোয়ারা খুলে গেছে, তাই বাইরের মাত্রাস্পর্শ (limited contacts) রূপান্তরিত হচ্ছে বৃহতের স্পর্শে। স্পর্শ চাই না, আপনাহতেই পাই—তীরে বসে সমুদ্রের হাওয়ায় অমনিতে গা জুড়িয়ে যায়। পৃথিবীর কাছে চাইবার কিছুই নাই, তাই তার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখে যাচ্ছি শুধু ঋতুচক্রের আবর্তন।

*

সমত্বের তৃতীয় অঙ্গ হল বিধেয়তা বা প্রপত্তি। এটি আসে ভক্তিভাব থেকে। ভক্তি যেন আত্মরতির লাবণ্য। নিজেকে গভীর ক'রে সুন্দর ক'রে পেলেই তার পিছনে দেখি অসীমের স্পর্শ নুয়ে পড়েছে আমার 'পরে। আমি একা নই, আমি তাঁর। আমার মহিমা তাঁরই মহিমার প্রচ্ছটা। যেমন আমি তাঁর, তেমনি এই বিশ্বও তাঁর—তাঁর নিরন্ত আনন্দের উদ্‌বেলন। তাঁর বিশ্বে আমি তাঁর নিমিত্ত, তাঁর সত্যসঙ্কল্পের বাহন : 'মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধ'রে যে তাঁর ইচ্ছা তরঙ্গিছে।' সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সমস্তই সেই তরঙ্গের দোলা। আমার কোনও ক্ষোভ নাই, চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নাই। তিনি বিধাতা, আমি বিধেয়, আমি প্রপন্ন; আমার সব-কিছু তাঁকে সঁপে দিয়ে আমি মুক্ত, শান্ত, স্বচ্ছন্দ।

প্রপত্তিরও তিন পর্ব। প্রথম পর্ব অহন্তার নিরসন। তখন তাঁকে ভালবেসে তাঁর হতে চাই শুধু। তাই আমার আর কোনও দাবিদাওয়া নাই, তাঁর দেওয়া সব-কিছু আমি মাথা পেতে নিই এই জেনে যে এমনি করেই আমায় তিনি কাছে টানছেন। এমনি করে সংসারের ভালমন্দ সব ছাপিয়ে তাঁর আকর্ষণকে যত নিবিড় করে অনুভব করি, দেখি আমার আত্মচৈতন্য দু'ভাগ হয়ে পড়ছে : পুরানো 'আমার' আমি মরে গিয়ে জন্মাচ্ছে 'তাঁর' আমি—সে তাঁকে ছাড়া আর কিছুই চায় না। এই হল বিবেক বা গোত্রান্তর—প্রপত্তির দ্বিতীয় পর্ব। তৃতীয় পর্ব, তাঁর মধ্যে ডুবে গিয়ে এক হয়ে যাওয়া তাঁর সঙ্গে। তখন শুধু নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি, সুষম আনন্দ।

তিতিক্ষা উপেক্ষা আর প্রপত্তি তিনের আরম্ভ চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তি থেকে হলেও তাদের সাধনায় মিল আছে দুটি জায়গায়—প্রথমত সংযমে, দ্বিতীয়ত বিবেকে। সংযম হল, বুঝে-সুঝে অপরা-প্রকৃতির রাস টানা; আর তারই ফলে বিবেক হল প্রকৃতির ঊর্ধ্বে পুরুষকে আবিষ্কার করা। এদুটিকে সমস্ত অধ্যাত্মসাধনারই মূলসূত্র বলা যেতে পারে।

*

নিষ্ক্রিয় সমত্বের কথা বললাম। এ হল সক্রিয় সমত্বির ভূমিকা। সমত্ব আমাদের শেখায় যোগস্থ হতে, প্রকৃতির গুণপরিণামের ঊর্ধ্বে চেতনাকে নিয়ে যেতে। সাধনার এই এক দিক। আরেক দিক হচ্ছে সমত্বের বীর্যকে জীবনে প্রয়োগ করা, গীতার ভাষায় যোগস্থ থেকে কর্ম করা। জীবনকে জগৎকে আমরা

বর্জন করব না, যোগশক্তির দ্বারা তাদের রূপান্তরিত করব। এখানে যত ঝামেলা, তাই ওখানে পালিয়ে গেলে শান্তি—এ-ধারণায় বীর্যের পরিচয় নাই। এখানে-ওখানে একই তত্ত্বের প্রকাশ। ওখানে গিয়ে যে-শান্তি যে-আলো যে-আনন্দের সাক্ষাৎ পাই, তার বীজ এখানেও আছে। আমার মধ্যে যেমন ছিল এবং ছিল বলেই যেমন তাকে আমি অঙ্কুরিত করতে পেরেছি, তেমনি তা সবারই মধ্যে আছে। এ-বিশ্বাস যদি করি, তাহলে জগৎ থেকে পালিয়ে যাবার কথাই ওঠে না। নিজের মুক্তির পরও তখন দায় থাকে সেই মুক্তির বীর্য সবার মধ্যে সঞ্চারিত করবার। এ একটা তপস্যা, আমার মধ্যে তাঁরই সৃষ্টির তপস্যা—জগৎকে শান্তিতে প্রজ্ঞায় আনন্দে বীর্যে সুন্দর ক'রে তোলবার তপস্যা। যেন সবিতার 'গিরিষ্ঠ' আত্মবিকিরণে পৃথিবীর মালঞ্চে ফুল ফুটিয়ে চলবার তপস্যা। উপনিষদের ভাষায় এ হল আত্মারাম এবং আত্মক্রীড় হওয়ার পর আবার ক্রিয়াবান্ হওয়া। সে-ক্রিয়া সুষম আত্মরতির ক্রিয়া।

ক্রিয়ার মূলে সম্যক্-দৃষ্টি থাকা চাই, নইলে ক্রিয়া বানচাল হয়ে যায়। সম্যক্-দৃষ্টির তিনটি বিভঙ্গ—একত্বের প্রত্যয়, অন্তর্যামিত্বের প্রত্যয়, আর সর্বাত্মভাব। দেখছি বিচিত্র জগৎ, কিন্তু জানছি তার মূলে সেই এক। সেই একের প্রত্যয় আমারই আত্মচৈতন্যে—যে-চৈতন্য আকাশের মত শান্ত ব্যাপ্ত দীপ্ত প্রসন্ন এবং নিগূঢ় প্রাণলীলায় স্পন্দিত। এই হল অধিষ্ঠানের প্রত্যয়। এই সর্বাধার অধিষ্ঠানের ভূমিকায় চলছে শক্তির লীলা, একের বহুতে পরিকীর্ণ হওয়ার আনন্দ। আবার বহুকে দেখছি, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের গভীরে দেখছি সেই একই সত্তা চৈতন্য আনন্দ ও শক্তির আপনাকে বিকসিত করবার প্রবেগ। মালঞ্চে লক্ষ ফুলের মেলা : দেখছি ফুল ফুটছে, আফোটা কুঁড়ির মধ্যেও দেখছি ফোটাফুলের সম্ভাবনা—দেখছি নৈশ্চিত্যের অবিচল প্রত্যয় নিয়ে। এই হল অন্তর্যামিত্বের প্রত্যয়—একের মধ্যে সবাইকে দেখার পর আবার সবার মধ্যে এককে দেখা। এই দেখা আরও গভীর হয় সর্বাত্মভাবে, যখন অনুভব করি 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা', এক আমিই সবার আমি। কাঁচা আমি নিশ্চয় নয়, কেননা সে-আমির ধর্ম সবাইকে দূরে ঠেকিয়ে রাখা। এ সেই এক আমি—যা যুগপৎ বিশ্বোত্তীর্ণতায় রিক্ত, বিশ্বাত্মকতায় পূর্ণ, আবার সিদ্ধ ব্যক্তিভাবনায় চিদ্ঘন পাকা আমি।

এমনি করে তিনটি প্রত্যয়ের সমন্বয়ে সম্যক্-দৃষ্টির পূর্ণতা, এখানে এই জাগ্রত ব্যবহারের ভূমিতেই সমত্বের প্রতিষ্ঠা।

এ-প্রতিষ্ঠার তিনটি ধাপের কথা বলতে পারি। প্রথমত এই ব্যাবহারিক সমত্বের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করি চেতনার গভীরে—নিষ্ক্রিয় সমত্বের কৌশলগুলি তখন খুব কাজে লাগে। নিষ্ক্রিয় সমত্বের মধ্যে যে নিবৃত্তির (withdrawal) প্রবেগ আছে, তা-ই দিয়ে বিবিক্ত আত্মপ্রত্যয়কে দৃঢ় করি; কিন্তু তাকে সেখানেই গুটিয়ে রাখি না, ব্যবহারের মধ্যেও নামিয়ে এনে অটুট রাখবার চেষ্টা করি। অবশ্য কাজটা খুব সহজ হয় না, স্বভাবতই ঊর্ধ্ব-চেতনা আর নিম্নচেতনার মধ্যে তখন একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। নিম্নচেতনা চলতে চায় তার প্রাক্তন সংস্কারের বশে, ঊর্ধ্বচেতনার স্থিরদীপ্তিকে বারবার সে ম্লান করে দেয়। এ যেন ভোরের কুয়াসার সঙ্গে সূর্যের লড়াই, ঘোর কাটতে একটু সময় লাগে। আর এই সময়টাই হয় সাধকের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু কিছুতেই ধৈর্য হারাতে নাই, রোখ ছাড়তে নাই। আর সবচাইতে বড় কথা, প্রয়াসের কৃচ্ছ্রতাকে বারবার শিথিল করে দিতে হয় অনন্তের মধ্যে। ভাবনা করতে হয়, আমার প্রয়াসের চাইতে তাঁর আবেশ সত্য এবং বীর্যবত্তর; তাঁর ধারা নামছে, তার কাছে নিজেকে আমি মেলে ধরছি মাত্র। আগেও বলেছি, পূর্ণযোগের এই হল মূলসূত্র।

তার পরের ধারা হচ্ছে বিবেক—আত্মবোধকে অপরা-প্রকৃতির ক্রিয়া হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা। অপরা-প্রকৃতির মধ্যে প্রাক্তন সংস্কারের বেগ তখনও নিবৃত্ত হয় না, বরং পূর্ণযোগের সাধকের কাছে আরেকটা নতুন বাধা উপস্থিত হয়। গোড়া হতেই পূর্ণযোগের সাধনার একটা অঙ্গ হল নিজেকে সবার সঙ্গে যুক্ত রেখে চলা—জগৎ ছেড়ে নয় জগতের হয়ে সাধনা করা। বিবেকের ফলে আত্মবোধ যখন তীক্ষ্ন হয়, চেতনা আরও স্পর্শকাতর হয়, তখন নিজের সমস্যা ছাড়াও সারা দুনিয়ার যত সমস্যা এসে যোগীকে যেন উদ্‌ব্যস্ত করে তোলে। বাধা আসে শুধু নিজের ভিতর থেকে নয়, অতর্কিতে বাইরের জগৎ থেকেও—আসে যেমন স্থূলে, তেমনি সূক্ষ্মেও। বিশ্বের তাবৎ অশুভ শক্তির সঙ্গে যোগীকে তখন লড়তে হয়। তাঁর আত্মচেতনার সঙ্গে-সঙ্গে জগৎ-চেতনাও তীব্র হয়ে ওঠে বলে তার দায়কেও তাঁকে বহন করতে হয়।

কিন্তু প্রসন্ন চিত্তের বীর্য এবং অধ্যবসায়ের কাছে শেষপর্যন্ত কোনও বাধাই টেকে না। আলো আর শক্তির যোগান আসে উপর হতে। নিজের মাঝেকার সকল দ্বন্দ্ব তাতে ঘুচে তো যায়ই, তারও পর তাঁর হাতে থেকে নিজের শুভ্র শাণিত সত্তার তীক্ষ্ন ফলক বিদ্ধ হয় বিশ্বের আসুরী শক্তির মর্মমূলে। আরম্ভ

হয় অনিঃশেষ আরেক তপস্যা—ইন্ধনকে আগুন করে তোলবার প্রশান্ত প্রসন্ন অমোঘবীর্য তপস্যা।

*

এখন দেখা যাক, সক্রিয় সমত্বের তত্ত্বকে আমাদের ভাবনায় ভাবে (emotion) এবং সংকল্পে কি করে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রথম ভাবের কথা তোলা যাক। প্রাকৃতচেতনায় আমরা মূল তিনটি ভাবের সন্ধান পাই—সুখ দুঃখ আর অসাড়তা। অবশ্য অসাড়তা রংছুট, নেতিবাচক; তবুও তাকে ভাবের মধ্যে ধরছি এইজন্য যে প্রশান্তিতে যখন তার ঊর্ধ্বায়ন ঘটে, তখন স্পষ্টই তার মধ্যে একটা স্বাদ দেখা দেয়। তাছাড়া ভাবগুলি গুণের বিকার। তিনটি গুণের অনুরূপ তিনটি ভাবের অস্তিত্বও তাই মেনে নিতে হয়। প্রাকৃতচেতনার গুণগুলি যখন ব্যামিশ্র হয়ে কাজ করে, তখন সুখ বা দুঃখেরই একটা ঝোঁক থাকে শ্রান্তি বা অবসাদের ভিতর দিয়ে অসাড়তার দিকে গড়িয়ে যাবার এবং তার একটা স্পষ্ট অনুভবও হয়। তাই অসাড়তাকেও ভাবের অঙ্গীভূত করে নেওয়া উচিত।

প্রাকৃতচেতনায় তিনটি ভাবের ক্রিয়াই ব্যামিশ্র অতএব বি-ষম। এই বৈষম্যের একটা সূক্ষ্ম পীড়া আছে, যা সুখের মধ্যেও সংবেদী চিত্তে দুঃখের ছায়া ফেলে। যোগীরা তাই বলেন, 'সর্বং দুঃখং বিবেকিনঃ'—যে বিবেকী, তার সবই দুঃখ। 'সবই দুঃখ' এই ভাবনা হল নিষ্ক্রিয় সমত্বের অনুকূল। কিন্তু আরেক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এও বলা চলে, দুঃখের মধ্যেও জীব একটা রস পায়—তিতিক্ষার বীর্যের আত্মত্যাগের রস। সুতরাং 'সবই দুঃখের' মত এও বলতে পারা যায় 'সবই আনন্দ'। এই ভাবনা সক্রিয় সমত্বের অনুকূল। সঙ্কুচিত চেতনায় যে প্রতিকূল বেদনা, তা-ই হল দুঃখ। চেতনার প্রসারে তার বেগ স্বভাবতই মন্দীভূত হয়ে যায়। আর দৃষ্টি যদি অন্তরাবৃত্ত হয়, তাহলে আধারের গভীরে আমরা আবিষ্কার করি 'মধুদ' চৈত্য পুরুষকে, যিনি 'স্বাদু পিপ্পলম্ অত্তি'—পিপুলের বিস্বাদকে সুস্বাদে রূপান্তরিত করবার সামর্থ্য যাঁর আছে বলেই বেদে যাঁর সংজ্ঞা 'পিপ্পলাদ'। আরও গভীরে আছেন সেই, যিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ', 'আকাশ আনন্দঃ', 'প্রাণারামং মনআনন্দং শান্তিসমৃদ্ধম্ অমৃতম্।' সে-চেতনায় সমস্তই আনন্দে সুষম, সুখ-

দুঃখ-মোহের বিপরিণামে বিধুর এ-জগৎ 'আনন্দরূপং ব্রহ্মণো যদ্ বিভাতি', অতএব যোগী 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।'

*

ভাবনার বেলায় মানসিক ক্রিয়ার তিনরকম পরিণাম হতে পারে—অবিদ্যা বিদ্যা আর প্রজ্ঞান। সক্রিয় সমত্বের সাধক তিনটির মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা দেখতে পান বলে গোড়াতে তিনটিকেই শান্ত ভাবে মেনে নেন। সব-কিছু বুঝতে পারা হল প্রজ্ঞান, তা-ই যোগীর লক্ষ্য। কিন্তু তার অভিযান চলছে ভুল-বোঝা আর ভুল বোঝার ভিতর দিয়ে। এ যেন আঁধারকে ক্রমে তরল করে করে আলোর উন্মীলন। আঁধার আর আলো অবিদ্যা আর বিদ্যা একান্ত-বিরোধী দুটি তত্ত্ব নয়, অবিদ্যার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বিদ্যার প্রবেগ—ব্যাপারটিকে এই ভাবে দেখলেই সমদৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হয়। মনের মধ্যে বুদ্ধি আর বোধির যতটুকু স্ফুরণ হয়েছে তা-ই দিয়ে সাধক অবিদ্যার আঁধার ঘোচাতে চান, কিন্তু কখনই কোনও গোঁড়ামিকে তিনি আমল দেন না। সত্য-সন্ধানীরও ভুল হতে পারে, একদেশদর্শিতা থাকতে পারে—একথা তিনি শান্তচিত্তে মেনে নেন। তাই তিনি কোনও মতবাদকে যেমন একান্ত করে তোলেন না, তেমনি সবার গভীরে খোঁজেন সেই মৌলসত্যকে—নানামতের ভিতর দিয়ে যার বিচিত্র প্রকাশ। তাঁর জিজ্ঞাসাকে সর্বদা তিনি উদ্যত রাখেন; কেননা তিনি জানেন, জানার কোথাও শেষ নাই, কিন্তু তার পূর্ণতা আছে মন-বুদ্ধির অতীত প্রজ্ঞানের মধ্যে। প্রজ্ঞান সূর্যের মত সহস্ররশ্মি, বিচিত্র বর্ণের সমাহারে শুভ্র, সর্বদর্শী, সর্বসমন্বয়ী—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সাযুজ্যে 'জানা' সেখানে 'হয়ে জানা'।

*

তারপর সঙ্কল্পে সমত্বের প্রয়োগ। সঙ্কল্প হল জীবনের মূলে অগ্রাভিসারের প্রবেগ, আমাদের ভাবনা বেদনা বাসনা কর্ম সব-কিছুর মধ্যেই তাকে আমরা অনুভব করি। স্বভাবতই তার ক্রিয়া প্রথম দেখা দেয় এলোমেলো হয়ে—অশান্তি মূঢ়তা আদর্শের সংঘাত ব্যর্থতা ইত্যাদি হাজার ঝামেলা নিয়ে। সমত্বের

সাধক তাতে উদ্‌ভ্রান্ত হন না, অপক্ষপাতে সবকিছুকে মেনে নিয়ে তাদের গভীরে তিনি আবিষ্কার করতে চান দিব্যসঙ্কল্পের ঋতসুষমাময় ছন্দ। প্রকৃতি-পরিণামের প্রথম পর্বে অহন্তা যতক্ষণ না জোর ধরে, ততক্ষণ স্বভাবের স্ফুরণে কিছুটা ছন্দ থাকে—যেমন শৈশবে আর কৈশোরে। তারপরেই জাগে অহং জাগে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, আর সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয় বিক্ষেপ সংঘর্ষ ব্যর্থতা তালভঙ্গ। এগুলি আসবেই, এদের ভয় করা বা এ নিয়ে বিলাপ করা শুধু ক্লৈব্যের পরিচয়। কবি বলেছিলেন, 'পুষ্পের পুষ্পত্ব সহজ, কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব সহজ নয়'। চলতে গিয়ে বারবার তাকে হোঁচট খেতে হবে, কিন্তু কোনও বাধার কাছেই সে হার মানবে না—এমনি তীব্র হওয়া চাই তার সঙ্কল্পের সংবেগ। সংবেগের সঙ্গে যুক্ত থাকা চাই প্রশান্তি। প্রশান্তিতে চেতনা বিস্ফারিত হয়; তাতে বিক্ষোভের উত্তালতা যেমন স্তিমিত হয়ে আসে, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং গভীর হয়। তখন ছন্দঃপতনের কারণটা সহজে বোঝা যায় এবং তার প্রতিকারে আর ততটা আয়াস লাগে না। সাধক তখন দেখতে পান আপাতবৈষম্যের গভীরেও একটা সৌষম্যের ছন্দ, একটা দিব্যসঙ্কল্পের দেশনা (guidance) যা চড়াই-উতরাইয়ের সর্পিল পথে তাঁকে নিশ্চিত নিয়ে চলেছে চরম লক্ষ্যের উত্তুঙ্গতায়। অনুভব হয়, ব্যর্থতার ঝামেলা সাময়িক, সিদ্ধির ওটা মধ্যপর্ব। সমত্বের প্রশান্তি যতই গভীর হয়, ভিতরটা ততই গুছিয়ে আসে—সঙ্গে-সঙ্গে বাইরটাও। সেইসঙ্গে আসে শক্তি—শুধু বাধা ঠেলবার শক্তি নয়, বিশ্বের পরম ছন্দকে জীবনে রূপ দেবার অনায়াস শক্তিও।

*

এইগুলি সক্রিয় সমত্বের সাধন। পূর্ণযোগী নিষ্ক্রিয় সক্রিয় দুটি সমত্বকেই কাজে লাগাবেন। নিষ্ক্রিয় সমত্বের মূলতত্ত্ব হল চেতনার প্রত্যাহার এবং অন্তরাবৃত্তি, বাইরে থেকে নিজেকে ভিতরে গুটিয়ে এনে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া। এ হল মুক্তি, এবং এর সাধনা অপরিহার্য। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, তারও পরে আছে স্বাতন্ত্র্য (freedom) এবং ঈশনা (mastery)। স্ব-তন্ত্র পুরুষ প্রকৃতি হতে শুধু মুক্ত নন, তিনি তার ঈশ্বর, তার রূপান্তরের কর্তা এবং ভর্তা। তাই তাঁর মধ্যে আর তিতিক্ষার আয়াস নাই, আছে অটল থেকেই

আত্মশক্তিকে বিচ্ছুরিত করবার আনন্দময় স্বাচ্ছন্দ্য। তাঁর উপেক্ষা ঔদাসীন্য নয়, স্থিতপ্রজ্ঞতার বীর্যে অদিব্যকে দিব্যে রূপান্তরিত করবার সামর্থ্য। তাঁর প্রশান্তিতে নিজেকে শুধু রিক্ত করে দেওয়ার অনপেক্ষ নিষ্কিঞ্চনতাই নয়, আছে তাঁর আনন্দে সৌষম্যে এবং সাধর্ম্যের বীর্যে নিজেকে ভরে তোলবার মহনীয়তা। সব ছাপিয়ে তাঁর মধ্যে আছে সর্বাত্মভাবের ঔদার্যে নিজের সাধনাকে সবার সিদ্ধির প্রতিভূ করে তোলবার অশ্রান্ত তপস্যা।

১৩

সমত্বের পরিণাম

এইটুকু তাহলে বোঝা গেল, সমত্ব শুধু সমস্ত বৃত্তির প্রশম (quiescence) বা প্রত্যাহার নয়, কিংবা ঔদাসীন্যও নয়। সমত্বের এ-আদর্শ হল মনের কল্পিত, কেননা সমত্ব বলতে সে বোঝে কর্মবিরতি। কর্ম করতে গিয়েই তো যত ঝামেলা আর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়; সুতরাং বাইরের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্তরের মধ্যে ডুবে গিয়ে ক্রমে সেখানকার বৃত্তির স্পন্দনকে নিরুদ্ধ করতে পারলেই সমত্ব সিদ্ধ হতে পারে—এই তার ধারণা।

এ হল সমাধির সমত্ব। কিন্তু আমরা বলি, এ-সমত্বকে কি ব্যুত্থানেও নামিয়ে আনা যায় না? যোগস্থ হয়ে কি কর্ম করা যায় না? গীতা বলেন, যায় এবং তা-ই জীবনের আদর্শ। সে-যোগ কিন্তু চিত্তবৃত্তির নিরোধ নয়, গীতার ভাষাতেই তা সমত্ব। সে-সমত্বের মূলে আছে স্থিতপ্রজ্ঞতা। স্থিতপ্রজ্ঞতার সাধন হল ইন্দ্রিয়সংযম, বাসনাবর্জন, অন্তরাবৃত্তি, সমস্ত দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে থাকা। তার ফল চিত্তের প্রশান্তি, সমুদ্রবৎ পরিব্যাপ্তি, নিত্যসচেতনতা এবং প্রসন্নতা। যেমন জাগ্রতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুষুপ্তি, জীবনের সঙ্গে মরণ, তেমনি এই ব্রাহ্মী স্থিতির সঙ্গে আছে ব্রহ্মনির্বাণ—আছে ব্যুত্থানেরই গভীরে। তাইতে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগস্থ থেকে অনায়াসে কুরুক্ষেত্রও ঘটাতে পারেন, কেননা অস্তিত্বের মধ্যে নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির দুটি ধারাকেই তিনি যুগপৎ সমানভাবে ধারণা করতে পারেন। তাইতে, গীতার ভাষায় তিনি কাজ করেও কাজ করেন না, আবার কাজ না করেও কাজ করেন। কি করে তা সম্ভব হয়, তা মনের অগোচর, কিন্তু বোধির বা বিজ্ঞানের গোচর।

সমত্বের আদর্শ এবং সাধনা সম্পর্কে বলেছি, এখন তার ফলশ্রুতি দিয়ে এ-প্রসঙ্গ শেষ করি।

সমত্বের ফলে সাধকের চারটি দৈবী সম্পদ অধিগত হবে—অনাসক্তি এবং নির্দ্বন্দ্বতা, শান্তি, সুখ বা অধ্যাত্মপ্রসাদ এবং আনন্দ ও জীবনরসিকতা। একটা কথা মনে রাখতে হবে, দেহ-প্রাণ-মনের ছোট-ছোট দাবি কাটিয়ে চেতনাকে

আকাশের মত বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে না পারলে সমত্ব সিদ্ধ হয় না। ক্ষুদ্রের মোহ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, সংস্কার একদিনে যায় না। কিন্তু তাবলে হাল ছেড়ে দেওয়াও কোনও কাজের কথা নয়।

*

সাধকের প্রথমেই দরকার নিত্যসমনস্কতা, সবসময় হুঁশে থাকা। তাঁর চিত্ত হবে প্রশান্ত নির্মেঘ আকাশের মত; তার মধ্যে এতটুকু ছায়াও যদি কখনও পড়ে, চিত্ত যেন সেই মুহূর্তে সজাগ হয়ে নিজের গভীরে তলিয়ে দেখে এ কিসের ছায়া, কোথায় তার মূল। হয়তো তা মূঢ় প্রাণবাসনার কোনও সংস্কার, হৃদয়ের কোনও অন্ধ আকূতি : তাহলে তার উচ্ছেদ করতে হবে প্রসন্ন বুদ্ধির উজ্জ্বল আলো ঢেলে দিয়ে। বাসনার উৎপত্তি হয় চেতনার সঙ্কোচ হতে; ব্যাপ্তির ভাবনায় অনেক বাসনাই আপনাহতে মরে যায়। তাছাড়া মনের সব আবদার যে রাখতে হবে, তারই-বা কি কথা আছে। বরং তার প্রত্যেকটি চাওয়াকে অপরিগ্রহের ভাবনা দিয়ে যাচাই করে নেওয়া উচিত : যা সে চাইছে তা না হলেও তার চলে, এই ভাবটিকে পাকা করে নিয়ে তবে চাওয়াকে আমল দেওয়া।

বুদ্ধির প্রশাসন দিয়ে হৃদয়-প্রাণের বিকারকে শুদ্ধ করা যায়; কিন্তু বিকার যদি বুদ্ধিরই বিকার হয়, তবে? যিনি বুদ্ধিরও প্রচোদয়িতা, তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর পথ নাই। বস্তুত প্রাণ মন হৃদয় বুদ্ধির সমস্ত অস্বস্তির একমাত্র প্রতিকার হল পরমপুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ। সমর্পণের অর্থই হল তাঁর সঙ্গে নিত্যযোগ, সব অবস্থাতে এবং সব-কিছুতেই অনিঃশেষে তাঁর হয়ে থাকা। বুদ্ধি দিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে লড়াই করছি, কিছুতেই হার মানছি না, তিলে-তিলে তাকে নির্জীব করে আনছি : কিন্তু এ-সমস্তই করছি তাঁর শক্তিতে। অসীমের সঙ্গে আমি নিত্যযুক্ত, তাঁর আলোর ধারাসারে আমি নিত্য অভিষিক্ত, আমার নয়—তাঁর সঙ্কল্পই আমার জীবনে রূপ ধরছে, এই শ্রদ্ধার বীর্য নিয়ে লড়তে হবে। আমার বুদ্ধি তখন অধিকৃত হবে তাঁর প্রজ্ঞার দ্বারা; তখন দেখব, কি করে যেন সহজের শক্তির ফোয়ারা খুলে গেছে অন্তরে।

*

২৮

সমত্বের আরেকটি পরিণাম হল শান্তি। শান্তির পরম অনুভব বিশুদ্ধ অস্তিত্বের বোধে। সব-কিছু আমায় ছেড়ে গেছে অথবা সব-কিছুই আমার মধ্যে তলিয়ে গেছে, শুধু আমিই আছি 'আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রের মত—এই অনুভবই শান্তি। এ হল চেতনার নিবৃত্তিধারার শেষে—যেমন বিশ্রামে নিদ্রায় সমাধিতে মৃত্যুতে প্রলয়ে, আকাশের পরম রিক্ততায়।

কিন্তু এই নিবৃত্তি আবার প্রবৃত্তির উৎস। অবর্ণ আকাশ থেকে ঠিকরে পড়ছে আলোর বর্ণালী। পুরুষের দৃষ্টিতে শান্তি, আর তারই ভূমিকায় প্রকৃতির ভোগ এবং ক্রিয়ার পরিণাম।

অচলপ্রতিষ্ঠ শান্তির বোধ ভোগ এবং ক্রিয়াকে শুদ্ধ করে। শুদ্ধ ভোগ রাগ এবং দ্বেষ হতে বিযুক্ত—সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সিদ্ধি-অসিদ্ধি মান-অপমান শত্রু-মিত্র সব-কিছুকে সে সমানভাবে গ্রহণ করে, সবার মধ্যে পায় একেরই বিচিত্র নর্মলীলার আস্বাদন। তেমনি সংকল্প ও ক্রিয়াও শুদ্ধ হয়, যখন তাদের মূলে অহংএর প্ররোচনা থাকে না। প্রাক্তন সংস্কারের বশে প্রাণ-মনের অভ্যস্ত কাজ তখনও হয়তো চলতে থাকে, কিন্তু কর্তা আর তার সঙ্গে জড়িয়ে যান না; তাই তাঁর 'নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা' বাইরের কোনও-কিছুর উপরেই আর মতলবের রং চড়ায় না। সাধক তখন দেখেন, তাঁর মধ্যে প্রকৃতিই কর্ত্রী, আর পুরুষ অকর্তা উপদ্রষ্টা মাত্র। এই অকর্তা পুরুষ তাঁরই প্রাক্তন আত্মাভিমানী বিমূঢ় অহন্তার রূপান্তর। উপদ্রষ্টার প্রশান্তি যখন আরও গভীর হয়, তখন তার মধ্যে ফুটে ওঠেন কর্মাধ্যক্ষ অন্তর্যামী পরমপুরুষ, প্রকৃতির যিনি ভর্তা এবং মহেশ্বর। সাধক তখন অনুভব করেন, কর্মের তিনি যন্ত্রমাত্র, যন্ত্রী সেই অন্তর্যামী, তাঁর দ্বারাই তিনি 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। মনঃকল্পিত ধর্মাধর্মের বিরোধ আর তাঁর থাকে না তখন, বিশ্বের কুরুক্ষেত্রে তিনি তখন সেই পরমের নিমিত্তমাত্র সব্যসাচী। তাঁর প্রাণ হৃদয় মন তখন বিশ্বভাবনের সত্যসঙ্কল্পে প্রভাস্বর। যুগপৎ তিনি সব-কিছুর উপদ্রষ্টা প্রশান্ত পুরুষ, আবার পুরুষোত্তমেরই পরাপ্রকৃতি : এই তাঁর ব্যক্তিরূপ, যা পরমপুরুষ আর পরমা-প্রকৃতির নিত্যযুগনদ্ধতার প্রতিরূপ।

*

সমত্বের শান্তি হতে আসে সুখ, গীতায় যাকে কোথাও বলা হয়েছে প্রসাদ (প্রসন্নতা), কোথাও অন্তরারাম। প্রাকৃত সুখ এ নিশ্চয় নয়, কেননা এ প্রবৃত্তির

নয়, কিংবা বাইরের কোনও-কিছুর উপরও এর নির্ভর নয়। এ-সুখ নিবৃত্তির, বিশ্রান্তির, প্রযত্নশৈথিল্যের, আপনাতে আপনি থাকার সুখ— উপনিষদের ঋষিরা যাকে বলেছেন আকাশের আনন্দ। অথবা এ যেন চেতনার প্রশান্ত প্রসন্ন পরিব্যাপ্তি—ভোরের আলো ফুটে ওঠার মত। অহংএর মধ্যে সূক্ষ্ম একটা তাড়না আছে, তা-ই আমাদের অস্বস্তির কারণ। সেটুকু যদি চলে যায়, তাহলে অধ্যাত্মপ্রসাদের এই বিস্তৃত আরাম দেহ-মন-প্রাণ সব-কিছুকে নিঃশব্দে ছেয়ে ফেলে। কর্ম তখন থেমে যায় না, কিন্তু অন্তরের রসে বিশ্বের আলোর প্রসাদে ফুল হয়ে ফুটতে থাকে।

এই অন্তঃসুখ ঘনীভূত হয় আনন্দে। আনন্দ পরমপুরুষের স্বরূপশক্তি; তিনি আনন্দঘনবিগ্রহ। ঘনীভাব কিন্তু চেতনার নিবৃত্তি বা প্রশমের পরিণাম। এইভাবে শক্তি সংহত হয় এবং সেই সংহতি হতে দেখা দেয় তার তেজস্ক্রিয়া। আনন্দ তখন অনুভূত হয় সিসৃক্ষার বীর্যরূপে। শিবের প্রপঞ্চোপশম প্রশান্তি হতেই আনন্দময়ী মহাশক্তির প্রপঞ্চোল্লাস। সে-উল্লাসে যেমন আছে লীলার স্বাতন্ত্র্য, তেমনি আছে দিব্য নিয়তির ঋতচ্ছন্দ। সেই নিয়তির নিয়ন্ত্রণে সবই এক চরম সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলেছে. এই অনুভব তখন সাধকের মধ্যে সুনিশ্চিত হয়। তখনই বলা চলে, ‘সব-কিছুই মঙ্গলের জন্য’। অহমিকার চরিতার্থতা দিয়ে সে-মঙ্গলকে মাপা যায় না। প্রয়াসের আপাতব্যর্থতায় রুদ্রের তাণ্ডবলীলার ভিতর দিয়েও সমত্বে প্রতিষ্ঠিত ক্রান্তদর্শী সাধকের হৃদয়ে ফুটে ওঠে তাঁর অবশ্যম্ভাবী কল্যাণতম রূপ, রুদ্রের দক্ষিণমুখের প্রসন্ন হাসিতে সব-কিছুরই অভয়ঙ্কর সার্থকতা।

এই আনন্দসিদ্ধিই সমত্বের চরম পরিণাম।

১৪

করণে বীর্যাধান

চিত্তের বিক্ষেপে শক্তি ছড়িয়ে পড়ে, সমত্বে সংহত হয়। সংহত শক্তি হতে আধারে বীর্যের আবির্ভাব হয়। বীর্যের সাধনা হল পূর্ণযোগের দ্বিতীয় অঙ্গ। তার লক্ষ্য, অপরা-প্রকৃতির বাধা সঙ্কোচ ও পঙ্গুতা দূর করে চেতনাকে বৃহৎ ঊর্ধ্বায়িত এবং সমর্থ করা, তার রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে দিব্যকর্মের সাধন করে তোলা।

বীর্যাধান করতে হবে করণে (instruments)। চিৎশক্তি আধারে কাজ করছে মুখ্যত চারটি করণের ভিতর দিয়ে—বুদ্ধি হৃদয় প্রাণময় মন আর দেহ। দেহের কথাই আগে বলি।

অধ্যাত্মসাধনায় দেহকে সাধারণত উপেক্ষা বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়। দেহচেতনা মূঢ় ও জড়নির্ভর, তার কতকগুলি ক্রিয়া চিৎপ্রকাশের বাধা, তার নিচুতলায় অবাঞ্ছনীয় যত অভ্যস্ত সংস্কারের বাসা : কথাগুলি ঠিক। কিন্তু এও সত্য যে দেহ ছাড়া সাধনা চলে না। সাধনার চরম ফল অনুভূত হয় দেহেই, তাকে বাদ দিয়ে নয়। দেহকে আশ্রয় করেই প্রাণ ও চেতনার প্রকাশ, জগতের সঙ্গে জীবনের যোগ এই দেহেরই মাধ্যমে। সুতরাং তার বর্জন নয়, মার্জনই হবে সুস্থ অধ্যাত্মসাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ইন্ধনকে আগুন করে তুলতে হবে; অবশেষে একসময় ইন্ধনে আর আগুনে তফাত থাকবে না, একের অর্থ অপরের অর্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যাবে—এই হল লক্ষ্য।

সাধকের পক্ষে প্রথমেই দরকার আরও দেহসচেতন হওয়া। এখন আমাদের দেহ অনেকটা অসাড়, অভ্যস্ত কতকগুলি সাড়া ছাড়া কোনও সূক্ষ্মভাবের তরঙ্গ প্রায়শ তার মধ্যে ঝঙ্কার তোলে না। আমরাও সে চেষ্টা করি না, দেহকে বাদ দিয়ে ভাবের আকাশে পাখা মেলে দেওয়াকেই অনেকে মনে করি একটা বাহাদুরি। তেমনি এই ভুলের খেসারতও দিতে হয়, যখন মাধ্যাকর্ষণের অতর্কিত টানে আবার মুখ থুবড়ে পড়তে হয় এই পৃথিবীরই বুকে। আকাশের ভাবনার সঙ্গে পৃথিবীর ভাবনাকেও জড়িয়ে নিলে এ-বিপত্তি ঘটে না। দেহ-চেতনার একটা প্রগাঢ় অনুভবকে সঁপে দিতে হবে ঊর্ধ্বচেতনার কাছে,

এবার ঊর্ধ্বচেতনাকেও নিত্য জাগ্রত অনুভবের মাধ্যমে নামিয়ে আনতে হবে দেহচেতনার মধ্যে। ঘুমন্ত পৃথিবী জেগে উঠবে দ্যুলোকের আলোর ছোঁয়ায়। তার হৃদয়ে সমুদ্র দুলবে, সারা অঙ্গে ফুল ফুটবে, তার গভীরে সুপ্ত শক্তির কুণ্ডলী ছাড়া পেয়ে মণিদ্যুতিতে ঝলসে উঠবে।

দেহচেতনাকে জাগ্রত এবং সমৃদ্ধ করা যেমন দরকার, তেমনি দরকার তার ধারণাশক্তিকে বাড়ানো। অবশ্য একটা থেকেই আরেকটা এসে যায়। তবে ধারণার জন্য বিশেষ করে অনুশীলন করতে হয় মহাবিদেহভাবনার—উপনিষদের 'আকাশশরীরং ব্রহ্ম' মন্ত্রে যা সূচিত হয়েছে সূত্রাকারে। দেহচেতনা লঘু এবং সর্বব্যাপ্ত না হলে আধার ঊর্ধ্বের শক্তিপাতকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারে না এবং তার ফলে 'কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকার মত' একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার ঘটতে পারে সাধকের হঠকারিতায়।

আসল লক্ষ্য হচ্ছে, দেহকে পরিপূর্ণ চিৎপ্রকাশের বাহন করা, উপনিষদের ভাষায় ভূতশুদ্ধির ফলে শরীরকে যোগাগ্নিময় করা। দেহের মধ্যে যে তামসিক জড়ত্ব অবসাদ বা স্তিমিতি আছে, যে রাজসিক চাঞ্চল্য বিকার বা উত্তেজনা আছে, তাকে সম্পূর্ণ দূর করে তার মধ্যে মহত্ব বল লঘুতা ধারণসামর্থ্য প্রভৃতি যৌগিক কায়সম্পদের আবির্ভাব ঘটাতে হবে।

*

একটা কথা মনে রাখতে হবে, কায়সম্পদ এক্ষেত্রে বাহ্যিক ততটা নয়, যতটা আন্তরিক। ঊর্ধ্বশক্তি দিয়ে নিম্নশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা পূর্ণযোগের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, একথা আগেও বলেছি। এখানে দেহ হল নিম্নশক্তি, আর ঊর্ধ্বশক্তি হল প্রাণ এবং মন। দেহকে একটা জড়পিণ্ড বলে না ভেবে তাকে ভাবনা করতে হবে চিৎশক্তির আধার এবং বাহন বলে, তাকে আশ্রয় করে যে একটা বোধের প্রকাশ হচ্ছে তার উপরেই দৃষ্টি দিতে হবে। বোধ মনে স্পষ্ট, দেহে স্তিমিত; প্রাণের বোধ শক্তিরূপে দুয়ের মাঝে সেতু। অর্থাৎ এখানেও ত্রিগুণা প্রকৃতির খেলা। প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ভর্তা এবং ঈশান হলেন পুরুষ। দেহবোধের মধ্যে প্রাণের মুক্তচ্ছন্দকে লীলায়িত করতে হবে পুরুষেরই সংকল্পশক্তির দ্বারা। হঠযোগী স্থূল আসন ও প্রাণায়াম দিয়ে এটি করতে চান। কিন্তু পূর্ণযোগে তার উপযোগিতা সীমিত, যদিও দেহবোধের আড়ষ্টতা

দূর করবার জন্য প্রথমটায় তার কিছুটা দরকার হতে পারে। কিন্তু বস্তুত দেহবোধকে লঘু পরিব্যাপ্ত উজ্জ্বল এবং প্রসন্ন করতে হবে ঊর্ধ্বের জ্যোতির্ময় শক্তিপাতের দ্বারা। বিশ্বপ্রাণের বিশাল প্লাবনকে প্রথম আধারে আবাহন করে আনতে হবে মনের সংকল্প দিয়ে : দেহ প্রাণ মন তখন অন্যোন্যসক্ত এক বিপুল বোধের দ্বারা আপ্লুত হবে। তারপর মনের প্রযত্নকেও শিথিল করে দিয়ে তাকে উন্মীলিত এবং যুক্ত করতে হবে মানসোত্তর শক্তির সঙ্গে যাতে বিশ্বপ্রাণের সৌরদ্যুতিতে সমস্ত আধার ভাস্বর হয়ে ওঠে। এই 'অন্তরারাম অন্তর্জ্যোতি' লঘুতা ও স্বাচ্ছন্দ্য তখন অতিমানসের শক্তিপাতকে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। প্রাকৃতভূমিতে অবচেতনার অনেক ক্রিয়া যেমন আধারে সাবলীলভাবে নিষ্পন্ন হয়, অতিচেতনার ক্রিয়াও তেমনি তখন সহজ লীলায় সমর্থ হয়।

এই ভাবনার মূল উপাদান হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার গোড়ার কথা হল উত্তরশক্তির আবেশ। কিছু-না-কিছু শ্রদ্ধার পুঁজি আমাদের প্রাকৃতজীবনেও আছে: কোনও বিচার না করে কতকগুলি ধারণাকে আমরা আমাদের ভাবনা আর ব্যবহারের ভিত্তিরূপে স্বচ্ছন্দে মেনে নিই। গীতার ভাষায় এসব শ্রদ্ধা হল তামসিক এবং রাজসিক, তাদের কারবার অল্পকে নিয়ে। সত্যকার শ্রদ্ধা হল বৃহতের আবেশের অনুভব : আমার জড়দেহ বিশ্বজড়ের একটি অংশ, আমার প্রাণ বিশ্বপ্রাণের একটি তরঙ্গ, আমার মন বিশ্বমনের একটি ছটা—এমনি করে জীবনবোধকে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করা হল শ্রদ্ধার সত্য পরিচয়। এতে অভ্যস্ত সংস্কারের বিপর্যয় এবং চেতনার প্রসার ঘটে এবং ঊর্ধ্বের শক্তিপাত আধারে অনায়াস হয়। আবারও বলি, পূর্ণযোগের এইটি একটি বিশিষ্ট কৌশল।

প্রাকৃতভূমিতে প্রাণকে জড় আর চৈতন্যের মাঝে সেতু বলে বর্ণনা করা যেতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুত প্রাণের অধিকার আরও ব্যাপক। প্রাণ চৈতন্যের শক্তি; আর যোগদৃষ্টিতে চৈতন্য সর্বব্যাপ্ত, সর্বত্র সম্ভাবিত। প্রাণও তেমনি সর্বব্যাপ্ত। জড় প্রাণ আর চৈতন্যকে আমরা খোপে-খোপে ভাগ করি ব্যাবহারিক বুদ্ধির গরজে। আসলে এ-তিনটি এক অখণ্ড তত্ত্বেরই বিভাব (aspect)। প্রকৃতির ত্রিগুণ যেমন একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, এরাও তেমনি। চৈতন্য কখনও নিঃশক্তিক নয়, তার স্পন্দ আছে পরিণাম আছে। একটি পরিণাম যেন বাইরের দিকে নীচের দিকে—তারই শেষ প্রান্তে হল জড়ত্ব।

ধারার আরেকটি পরিণাম উজিয়ে চলেছে চৈতন্যের নিজের দিকে, আর তার স্পর্শে জড় ক্রমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে উঠছে। চিৎস্পন্দনের এই ঊর্ধ্ব ধারা বা পরিণামই হল প্রাণের স্বরূপ। ঊর্ধ্বপরিণামের বেলায় জড়ের ক্রমিক সূক্ষ্মতা বা চিন্ময়তা, তা-ই হল বেদ যোগ এবং তন্ত্রের ভূতশুদ্ধির তত্ত্ব। অন্যান্য যোগে এটি করা হয় শক্তির উৎক্ষেপের দ্বারা, আর পূর্ণযোগে মুখ্যত আবেশ ও শক্তিপাতের ভাবনার দ্বারা। সর্বব্যাপী চিন্ময় মহাপ্রাণের সুষ্ঠু ধারণা তার জন্য অপরিহার্য।

প্রাণের একটি বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটে বাসনার ভিতর দিয়ে। এই কামময় প্রাণকে আমরা স্থাপন করতে পারি জড়ময় আর চিন্ময় প্রাণের মাঝামাঝি। এটি কামপুরুষের (desire-soul) শক্তি। আমাদের প্রাকৃতজীবনে তার প্রবেগ প্রচুর। অথচ বাসনার দৃষ্টি আচ্ছন্ন। তা-ই আমাদের জীবনের সমস্ত বিপর্যয় আর বিকারের মূলে। কিন্তু এই দুর্ভোগ হতে বাঁচবার জন্য কামময় প্রাণকে নির্মূল করা কখনও পূর্ণযোগের লক্ষ্য হতে পারে না। প্রাণের নিরোধ নয়, চাই তার সংযম। লণ্ঠনের শিখা ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে জ্বলছে, ফুঁ দিয়ে তাকে নিবিয়ে দিলে ধোঁয়া আর থাকে না বটে; কিন্তু একটা চিমনি পরিয়ে দিলেই সেই ধোঁয়ার শক্তি ফোটে তেজ আর আলো হয়ে।

বাসনার শুদ্ধির কথা আগে বলেছি। দৃষ্টির বিপর্যয় দূর করে তাকে রূপান্তরিত করতে হবে চিন্ময় আকূতিতে অভীপ্সায় এবং সঙ্কল্পে। শুদ্ধ বাসনা বা সত্যসঙ্কল্প প্রাণ আর তার বৃত্তিসমূহকে আপ্যায়িত ক'রে পূর্ণ করে। আপ্যায়নে প্রাণ প্রসন্ন হয়। প্রসন্নতা আনে নির্দ্বন্দ্বতা এবং সমত্ব। সমত্বের গাঢ়তায় ফোটে অন্তরাত্মার আনন্দ। চিন্ময় প্রাণের ভোগসামর্থ্য তখনই জয়যুক্ত হয়।

*

দেহ আর প্রাণের পর চিত্তে বীর্যাধানের কথা তোলা যেতে পারে। চিত্ত সংজ্ঞাটি এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ ক'রে হৃদয় আর চৈত্যসত্তাকেও (psychical being) তার মধ্যে ধরে নিতে পারি। হৃদয়ের দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে চৈত্যসত্ত্বের আচ্ছন্নতা চিত্তের সামর্থ্যকে পঙ্গু করে ফেলে—একটা ঋজু, উদার দৃষ্টি, প্রশান্ত প্রসন্নতা এবং ঋতচ্ছন্দা সঙ্কল্প নিয়ে জীবনের

পথে মানুষ আর যেন এগিয়ে যেতে পারে না। এ-সমস্তই বস্তুত কৈশোরের ধর্ম, যখন অজানতে হলেও চিত্ত প্রথম আলোর ছোঁয়ায় যেন পদ্মের মত দল মেলে। কিন্তু নানা কারণে—বিশেষ করে বুড়িয়ে যাওয়া মনের আক্রমণে—সে-আলো কুয়াসায় ঢেকে যায়, সৃষ্টি হয় নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের। তবুও 'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্'—কৈশোরের অনুধ্যান দ্বারা চিত্তকে এ-ঘোর হতে মুক্ত করতে হবে। ভাব শুদ্ধ হয় দেহবোধের স্বচ্ছতায়, প্রাণের প্রসন্নতায়, মনের প্রভাতরল ঔজ্জ্বল্যে, সঙ্কল্পের সৌষম্যে।

'শুদ্ধভাবপ্রসাদিত' কৈশোরকে ভিত্তি করে ফোটে চিত্তের তারুণ্য। কৈশোরের মধ্যে আছে যেমন সৌম্য মাধুরী, তেমনি তারুণ্যে আছে রৌদ্র তেজ। চেতনার ব্যাপ্তি এবং সমত্ব যুগপৎ মাধুর্যের এবং বীর্যের আশ্রয় হবে। এ-দুটিই পরমা-প্রকৃতির বিশিষ্ট স্বভাব—আনন্দ এবং শক্তি। এদেশের ভাস্কর্যে অতি নিপুণভাবে দেবীপ্রতিমায় এ-দুটির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে : অসুরদলনে যিনি সমরনিষ্ঠুরা রুদ্রাণী, তিনিই আবার প্রসাদসুমুখী সুস্মিতা।

এই মাধুর্য আর বীর্যের সঙ্গে চিত্তে আরেকটি সম্পদের আবির্ভাব ঘটানো চাই, যার নাম দিতে পারি কল্যাণশ্রদ্ধা। জীবনসমুদ্র মন্থনে বিষ উঠছে দেখতেই পাচ্ছি; তবুও অন্তরের গভীরে নিশ্চিত প্রত্যয় বহন করে চলব, এ-বিষ অমৃতে রূপান্তরিত হবে, তা-ই বিশ্বের দিব্য নিয়তি। এ-শ্রদ্ধা নিষ্ক্রিয় প্রত্যয়ই নয়, সক্রিয় তপস্যা। বিষপানে নীলকণ্ঠ হয়ে আছি, এতে সমত্বের পরিচয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এই সমত্বের ভিত্তিতেই চিত্তে জাগবে দেববীর্য, অশিবকে শিবে অসুরকে দেবতায় রূপান্তরিত করবার অধৃষ্য সামর্থ্য। আমার মধ্যে সে-সামর্থ্য যদি সার্থক হয়ে থাকে, তাহলে বিশ্বেই-বা হবে না কেন?

আবার এই শ্রদ্ধার বীর্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই প্রেম। প্রেম চৈত্যসত্ত্বের স্বরূপশক্তি, হৃদয়ের স্বভাবধর্ম। তার উৎস ব্রহ্মের আনন্দে। ব্রহ্ম আত্মারাম, অতএব আনন্দময়। বিশ্ব তাঁর আত্মবিসৃষ্টি, তাঁর আনন্দের বিভাতি। আত্মরত একের আনন্দ ভেঙে হল দুই বা বহু। যেখানে সম্বন্ধ ছিল না, সেখানে সম্বন্ধের সৃষ্টি হল। প্রেম এই সম্বন্ধের উল্লাস—একের দুই বা বহু হওয়া, আবার দুই বা বহুর এক হওয়ার আনন্দ। শুধু অধিষ্ঠানের একত্ব নয়, পরিণামেরও একত্ব। এক যেমন মূলে, তেমনি এক স্থূলেও : সর্বত্র সেই একেরই বিভঙ্গ। সবার মধ্যে সেই এককে বা আমাকে দেখছি বলে সবাইকে

ভালবাসছি। আবার ভালবাসছি বলেই বিশ্বের কল্যাণতম পরিণামের সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা অবিচল। সেই শ্রদ্ধা চিত্তে স্ফুরিত করছে অশিবনাশন রুদ্রের বীর্য। কিন্তু বিক্ষুব্ধ নয়, অনায়াস সৌম্য বীর্য—কেননা তার ভিত্তি সমত্ব, আর তার গভীরে ওই একাত্মতানুভবজনিত প্রেম। যেমন কল্যাণী জননীর সৌম্য এবং সমর্থ ভালবাসা।

চিত্তে বীর্যাধান হবে, যখন এমনি করে সৌম্যত্ব তেজ এবং কল্যাণশ্রদ্ধা এসে সঙ্গত হবে প্রেমসামর্থ্যে।

*

সবার শেষে বুদ্ধিতে বীর্যাধান। তার জন্য প্রথমে চাই বুদ্ধির স্বচ্ছতা এবং বিশুদ্ধি। প্রাণবাসনা তার নিজের স্বার্থে বুদ্ধিকে নিয়োজিত ক'রে তাকে আবিল করে। বুদ্ধি অনেক সময় বুঝতে পেরেও তার প্ররোচনা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে না। বাঁচবার পথ হচ্ছে বুদ্ধির স্বচ্ছতা। সত্যকে যদি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করি, তাকে অনুসরণ না করে আমরা পারি না। সে-সত্যানুভবের মধ্যে স্বার্থৈষণা আত্মবঞ্চনা সংস্কারমূঢ়তা বা একদেশদর্শিতা নাই, তার আকর্ষণ দুর্নিবার—মানুষ তার জন্য সব বিসর্জন দিতে পারে। অনুভবের এই বীর্য আসে বুদ্ধির স্বচ্ছতা হতে। স্বচ্ছ বুদ্ধি যেন মসৃণ নির্মল অন্তর্দর্শী দর্পণের মত—সত্যের সে স্বরূপগ্রাহী। অথচ সত্যের আদিত্যদ্যুতির শুভ্রতাকেই সে গ্রহণ করে না, সমভাবে গ্রহণ করে তার বর্ণ-বৈচিত্র্যকেও। তার অদ্বৈতোপলব্ধি সর্বাবগাহী এবং নিঃসীম। একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান—এতেই তার জানার বৈভব।

এমনি করে বুদ্ধিতে বীর্যাধানের ফল হবে তার বিশুদ্ধি প্রকাশ বিচিত্রবোধ এবং সর্বজ্ঞানসামর্থ্য।

*

দেহ প্রাণ হৃদয় (চিত্ত) এবং বুদ্ধি—চিৎশক্তির এই চারিটি মুখ্য করণকে (instruments) বিশুদ্ধির দ্বারা পূর্ণসামর্থ্যযুক্ত করতে হবে—এই হল পূর্ণযোগের দ্বিতীয় অঙ্গ। ঊর্ধ্বের শক্তিপাতে যদি এই সামর্থ্য স্ফুরিত হয়,

তাহলে এদের মধ্যে কোথাও কোনও বৈষম্য বা বিরোধ দেখা দেবে না, পুরুষের আত্মপ্রকৃতিরূপে তাঁর জাগ্রতদৃষ্টির আবেশে তারা স্বচ্ছন্দে কাজ করে যাবে। আর সে-কাজের লক্ষ্য হল তাদের স্বরূপশক্তির বা অতিমানস সামর্থ্যের আবিষ্কার। অবশ্য একদিনে তা সিদ্ধ হয় না। তার জন্য চাই দীর্ঘদিনের নিরন্তর তপস্যা, সঙ্কল্পের তীব্র সংবেগ, অক্লান্ত ধৈর্য, প্রতি খুঁটিনাটিতে আত্মনিরীক্ষা আর পুনঃপুনঃ অভ্যাসের দ্বারা প্রাকৃত সংস্কারকে পালটে দেওয়ার প্রয়াস।

১৫

জীবশক্তি : চাতুর্বর্ণ্য

করণে বীর্যাধানের কথা বলা হল। কিন্তু পূর্ণযোগের দ্বিতীয় অঙ্গের সম্বন্ধে আরও অনেককিছু বলবার আছে। এতক্ষণ ব্যাপারটা আলোচনা করেছি সাধকের আত্মপ্রচেষ্টার দিক থেকে। কিন্তু তার পিছনে রয়েছে পরমপুরুষের প্রসাদ এবং মহাশক্তির দেশনা। এখন পরের কয়েকটি অধ্যায়ে তারই কথা বলব, কেননা বৃহতের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিসত্তার যে গভীর যোগ, তার রহস্য না বুঝতে পারলে শুধু নিজের চেষ্টায় সাধনা সিদ্ধির পথে বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারে না।

আগেও বলেছি, আমাদের জীবন জুড়ে চলছে যুগনদ্ধ পরম-পুরুষ আর পরমা-প্রকৃতির লীলা। পুরুষোত্তমই আমাদের মধ্যে জীব হয়েছেন—আমরা তাঁর 'অংশঃ সনাতনঃ'। আমাদের দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধিতে এই অন্তর্গূঢ় জীবাত্মশক্তির খেলা। সাধারণ মানুষের মধ্যে জীবচৈতন্য প্রকৃতির গুণলীলার অধীন। প্রকৃতির ক্রিয়াও তার মধ্যে চলছে যন্ত্রবৎ। গুণের প্রাধান্য অনুসারে মানুষকে আমরা সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক বলে চিহ্নিত করতে পারি—যদিও সর্বত্রই সে মিশ্র-প্রকৃতির এবং কোথাও জীবাত্মশক্তির স্বাতন্ত্র্য তার মধ্যে পরিস্ফুট নয়। তবুও এরই মধ্যে কখনও-কখনও এমন জীব দেখা দেয়, গীতার ভাষায় যারা 'বিভূতিমান্ শ্রীমান্ এবং ঊর্জিত' অর্থাৎ যাদের মধ্যে জীবাত্মশক্তির বিশেষ প্রকাশ ঘটে। সংসারে ব্যক্তিত্বের প্রাধান্যে তারাই হয় লোকমান্য। তারাও ত্রিগুণের বিনিয়মের অধীন, অনেক সময় অহন্তায় স্পর্ধিত; কিন্তু তবুও সব ছাপিয়ে তাদের মধ্যে থাকে একটা লোকোত্তর দিব্যশক্তির প্রেরণা, কোনও মহত্তর সত্যের দিকে তার ইঙ্গিত। জীবাত্মশক্তির আরও নির্মুক্ত স্ফুরণে দেখা দেন সেইসব মহামানব যাঁরা জগতে পরমপুরুষের প্রতিভূ, প্রাকৃত গুণকে স্বীকার করেও যাঁদের চরিত্রে প্রকাশ পায় গুণোত্তর মহিমার ব্যঞ্জনা। আমাদের করণে বীর্যাধানের সাধনাকে এখন থেকে বিচার করতে হবে জীবাত্মশক্তির এই নির্মুক্ত স্ফুরণের দিক থেকে।

*

পরমপুরুষের পরমা-প্রকৃতি অনন্তগুণা। কিন্তু অপরার্ধে, আমাদের মধ্যে তাঁর প্রথম প্রকাশ ত্রিগুণের লীলায়। এই ত্রিগুণ আবার মানুষের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে চারটি বিশিষ্ট চরিত্রের ভিতর দিয়ে—প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় যাদের বলা হত চাতুর্বর্ণ্য। ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের বল, বৈশ্যের বিত্ত এবং শূদ্রের শ্রম—এই চতুঃশক্তির উপর সমাজের প্রতিষ্ঠা। গীতার মতে মানুষের গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চাতুর্বর্ণ্যের ব্যবস্থা, অর্থাৎ মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে হবে সে কোন্ বর্ণের। সত্যকার বর্ণব্যবস্থা এইভাবেই হওয়া উচিত। কিন্তু বংশধারা ও নির্দিষ্ট বৃত্তির অনুশীলনের ভিতর দিয়ে গুণসংক্রমণ হওয়া স্বাভাবিক এই ধরে নিয়ে এদেশে বর্ণব্যবস্থাকে ক্রমে জাতি-গত করে তোলা হল। এ-বিধান যে নিতান্তই স্থূল এবং যান্ত্রিক সেকথা বলাই বাহুল্য। এদেশের সমাজের অনেক বিশৃঙ্খলা, সাঙ্কর্য এবং বৈষম্যের কারণ বর্ণব্যবস্থার অধ্যাত্মসত্যকে এমনি করে ভুল বোঝা। বস্তুত জন্মই বর্ণের নিশ্চিত নিয়ামক নয়, কিংবা একথাও সত্য নয় যে একজনের মধ্যে শুধু তার কুলনির্দিষ্ট গুণ কর্মেরই সমাবেশ ঘটেছে। বস্তুত অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আমরা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যেমন ত্রিগুণের সম্মিশ্রণকে স্বীকার করে নিই, তেমনি তার মধ্যে চাতুর্বর্ণ্যের সব গুণ-কর্মের সমাবেশকেও স্বীকার করা উচিত।

এখন একেকটি বর্ণের মধ্যে জীবাত্মশক্তির যে-বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ হয়, তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক।

প্রথম ব্রাহ্মণের কথা। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ প্রধান। সত্ত্বগুণের লক্ষণ হচ্ছে চেতনার স্বচ্ছতা সৌষম্য স্থৈর্য এবং দীপ্তি। এগুলি মানুষের মধ্যে আনে চারিত্রের সংযম জ্ঞানের প্রতি প্রবণতা এবং অন্তর্মুখীনতা। ব্রাহ্মণ্যের ফলে মানুষ হয় ধার্মিক জ্ঞানতপস্বী এবং অধ্যাত্মচেতা। প্রাচীনকালে বলা হত, ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন তিনি ব্রাহ্মণ; আর ব্রহ্মের মৌলিক অর্থ হল চেতনার বৃহত্ত্ব—যার পর্যবসান আত্মাকে বিশ্বকে এবং ঈশ্বরকে এক বলে জানায়।

প্রজ্ঞা যেমন ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য, তেমনি ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য হল বীর্য। ক্ষত্রিয় সত্ত্বরজঃ প্রধান। রজোগুণের মধ্যে যে শক্তির প্রবেগ, ক্ষত্রিয়ে তা সত্ত্ব-গুণের দ্বারা প্রশাসিত। তাই ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিশেষ করে ফুটে ওঠে রাজধর্ম। রাজা ধর্মের রক্ষক, সমাজের ব্যবস্থাপক, প্রজার পালক। যা-কিছু অশিব তার সঙ্গে লড়াই করা ক্ষত্রিয়ের বিশিষ্ট ধর্ম। বৈদিক যুগ হতেই ব্রহ্ম এবং ক্ষত্র দুটিকে পরস্পরের অনুপূরক অধ্যাত্মসম্পদ বলে গণ্য করা হয়েছে। যোগের

গ্রন্থেও শ্রদ্ধা বীর্য এবং প্রজ্ঞা আত্মোপলব্ধির বিশিষ্ট উপায়রূপে বর্ণিত হয়েছে। শ্রদ্ধায় চিত্তে তত্ত্বের আভাস ফোটে অরুণোদয়ের মত। তখনও আঁধার থাকে। তার বাধাকে অপসারিত করবার জন্য চাই ক্ষাত্রবীর্য। ব্রাহ্মণ্য বা প্রজ্ঞার দীপ্তিকে চেতনায় সে-ই প্রতিষ্ঠিত করে।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সহযোগিতায় সমাজ নিঃশ্রেয়সের (summum bonum) এবং অভ্যুদয়ের (welfare) দিকে এগিয়ে চলে। এই অভ্যুদয়ের সাধক হল বৈশ্য, তার সাধন হল বিত্ত। সত্য বটে, 'ন হি বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ' তবুও বিত্ত ছাড়া ঋদ্ধি ছাড়া সমাজ দাঁড়াবে কিসের উপর? আকাশের ঝংকায় আলোর ছোঁয়ায় ফুল ফোটে, কিন্তু তাকে রস আহরণ করতে হয় মাটির বুক থেকেই। বৈশ্য সমাজের যোগ-ক্ষেমের বাহক। বিত্তের অর্জন রক্ষণ এবং কল্যাণধর্মে ব্যয় এবং ভোগ—এই তার ধর্ম। গুণের দিক দিয়ে স্বভাবতই সে রজস্তমঃপ্রধান—যে দুটি গুণ সাধারণত বিক্ষেপ এবং মূঢ়তার হেতু। কিন্তু তবুও সুব্যবস্থিত সমাজে বৈশ্য ধর্মবুদ্ধি, তার গুণবৈকল্যের সম্ভাবনা সত্ত্বগুণ দ্বারা শাসিত। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বৈশ্য আলোর রাজ্যে সদ্য-'প্রবিষ্ট', সেও দ্বি-জ বা দেবজন্মের অধিকারী।

ব্রাহ্মণ যেমন সমাজসৌধের চূড়া, শূদ্র তেমনি তার ভিত্তি। সমাজের অভ্যুদয়ের পিছনে যেমন আছে ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞা, ক্ষত্রিয়ের বীর্য, বৈশ্যের কুশলতা, তেমনি আছে শূদ্রের শ্রম। শ্রম যদি দাসত্ব হয়, তাহলে তা হেয় এবং অধর্ম; কিন্তু তা যদি মুক্তচিত্তের সেবাবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়, তাহলে তা পরমধর্ম। গুণের দিক দিয়ে শূদ্র তমঃপ্রধান, কুশলী যন্ত্রীর সে যন্ত্রমাত্র। যন্ত্র হওয়ার দোষ-গুণ দুই-ই আছে এবং তা নির্ভর করে যন্ত্রীর পরিচালনা শক্তির উপর। যে-শক্তি প্রজ্ঞার দ্বারা বিধৃত, তার চালনায় গুণ বন্ধন না হয়ে হয় মুক্তিরই সাধন।

*

চাতুর্বর্ণ্যকে গুণের দিক থেকেই বিচার করা সমীচীন। প্রাচীনেরা বলতেন, 'সবাই জন্মায় শূদ্র হয়ে, সংস্কারের ফলেই সে দ্বিজ হয়। দ্বিজের লক্ষ্য হল ব্রহ্মবিদ বা ব্রাহ্মণ হওয়া।' কথাটা খুবই সত্য। জন্মের চাইতে মানুষের সংস্কার (culture) বড়। মানুষ জন্মায় একটা অব্যক্ত প্রবণতা নিয়ে; ওই তার স্বভাবের

পুঁজি বা প্রকৃতি। কিন্তু ওই পুঁজিকে কল্যাণের কারবারে খাটানোর একটা সূক্ষ্ম প্রবণতাও তার পিছনে কাজ করছে; তার স্বভাবের মধ্যে ওই হল পৌরুষের দিক। পুরুষকে প্রকৃতির মহেশ্বর হতে হবে। এটা জীবনের সর্বজনীন এবং সার্বভৌম লক্ষ্য। মানুষের জন্মগত শূদ্রত্বকে সংস্কৃত করে রূপান্তরিত করতে হবে : এই উদার এবং বলিষ্ঠ আদর্শবাদই হবে ভবিষ্যতের দিব্যসমাজের জনক।

যদি চরম লক্ষ্যের অনুকূল প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে চাতুর্বর্ণ্যকে দেখি তাহলে বর্ণের মধ্যে ছোট-বড়র কথাটা মনে জাগে না। পরিবারের ছোট ছেলে বয়সে ছোট হলেও মর্যাদায় ছোট নয় : সে পরিবারের কর্তা হবার জন্যই জন্মেছে এবং তাকে আমরা সেভাবেই সংস্কৃত করে তুলি। স্বধর্মের অনুশীলনের দ্বারা প্রত্যেকের মধ্যে স্বভাবের চরম বিকাশ ঘটানোতে সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য এবং এক্ষেত্রে জন্মান্তরের উপর চরম বিকাশের বরাত দিয়ে রাখাটা বুদ্ধির জড়ত্বেরই পরিচায়ক। তাছাড়াও একটা কথা আছে। চাতুর্বর্ণ্য আন্তর গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে কোনও বর্ণই অন্যনিরপেক্ষ নয়—এক বর্ণের মধ্যে অন্য বর্ণের গুণের অনুপ্রবেশ না ঘটলে তারা কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞার মধ্যে যদি বীর্য না থাকে, তাকে বাস্তব জীবনে ফলিত করবার কুশলতা না থাকে, সর্বোপরি তার মধ্যে সেবাবুদ্ধি না থাকে, তাহলে তার সার্থকতা কোথায় ? তেমনি সব বর্ণের বেলায়। বস্তুত প্রজ্ঞা বীর্য অভ্যুদয় সেবা—প্রত্যেকটিই মনুষ্যচরিত্রের মৌল দিব্যগুণ এবং তাদের সমাহারেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা। যেখানে এই সমাহার নাই সেখানেই দেখি ব্রাহ্মণ সংকীর্ণ-চেতা এবং প্রজ্ঞাবাদরত, ক্ষত্রিয় অসুরভাবাপন্ন এবং শক্তিমদমত্ত, বৈশ্য বিত্তলোভী এবং স্বার্থপর আর শূদ্র জড়বুদ্ধি ক্রীতদাস।

*

চাতুর্বর্ণ্যের এই হল মৌলিক পরিচয়। কিন্তু তার একটা অলৌকিক দিব্যসামর্থ্যও আছে। তাকে আবিষ্কার করতে হবে প্রকৃতির গুণ ও ক্রিয়ার গভীরে লোকোত্তর পুরুষের চিন্ময় প্রবর্তনাকে অনুভব করে। সে-প্রবর্তনা প্রতি আধারে জীবাত্মশক্তিতে রূপ ধরছে। আধারভেদে তার প্রকাশের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, কিন্তু সর্বত্র তার ব্যঞ্জনা একটা বর্তুল সর্বতোভদ্র পূর্ণতার

রকে। তাকে জীবনে ফুটিয়ে তোলাই পূর্ণযোগের লক্ষ্য। বৈদিক ঋষি তুর্বর্ণকে কল্পনা করেছেন বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অবয়বরূপে। অবয়বীতে সেখানে সমস্ত অবয়বের সুষম সমাহার। পূর্ণযোগীও তেমনি চাতুর্বর্ণ্যে জীবাত্মশক্তির যে বিচিত্র বিভূতির প্রকাশ তাকে নিজের মধ্যে সৌষম্যে সমাহৃত রূপে অনুভব করবেন। অধ্যাত্মপ্রসাদে ব্রহ্মতেজে প্রশান্তবাহিতায় এবং প্রজ্ঞায় তিনি হবেন ব্রাহ্মণ; সত্যসঙ্কল্পের তীব্র সংবেগে যুযুৎসুর নির্ভীক দুর্ধর্ষতায় সত্ত্বের ক্ষেমঙ্কর ঔদার্যে কর্তব্যসাধনের অবিচল নিষ্ঠায় তিনি হবেন ক্ষত্রিয়; যা-কিছু নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়ের অনুকূল তার অর্জনে রক্ষণে এবং বিতরণে, দেবে এবং মানুষ বিত্তের অন্যোন্যবিনিময়ে এবং সম্ভোগে তিনি হবেন বৈশ্য; এবং সর্বশেষে সর্বজীবের প্রতি প্রেমে, অকাম ও অকুণ্ঠ আত্মদানে, নিরলস সেবার মাধুরীতে তিনি হবেন শূদ্র। তাঁর জীবন হবে প্রজ্ঞা বীর্য অভ্যুদয় ও সেবার সঙ্গমতীর্থ, জীবাত্মশক্তির চতুর্ব্যূহ দিব্যবিভূতির ঘনবিগ্রহ।

১৬

মহাশক্তি

বীর্যের সাধনায় শক্তির স্বরূপটি খুঁটিয়ে বোঝা দরকার। এতক্ষণ জীবাত্ম-শক্তির কথা বলেছি,এইবার বলব সে-শক্তি যাঁর আশ্রিত সেই মহাশক্তির কথা।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, শক্তি জড় না চেতন? বাহ্য দৃষ্টিতে দেখি, বিশ্ব জুড়ে জড়শক্তিরই খেলা, প্রাণ ও চেতনা তার মধ্যে যেন খদ্যোতের বিন্দু। বৈজ্ঞানিকের জড়বাদ তখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে : বিশ্ব শাসিত হচ্ছে জড়ের আইনে, প্রাণ আর চেতনা জড়ের উপসৃষ্টি মাত্র, আত্মা আর আলেয়ার পিছনে ছোটা একই কথা।

কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষ্য আরেকরকম। সেখানে চৈতন্যের সব ক্রিয়ার পিছনে জড়ের নিয়মকে আবিষ্কার করতে পারলেও অহংবোধকে কিছুতেই প্রকৃতির সঙ্গে এক করে ফেলতে পারি না। অহং প্রকৃতি থেকে আলাদা, তার সাক্ষী এবং ভোক্তা, এবং পুরাপুরি না হলেও তার শাস্তা। একদিকে আমার মধ্যে প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়া চলছে—একেবারে বুদ্ধির এলাকা পর্যন্ত : সেখানে আমি নিশ্চেতন নিত্যচল বিশ্বকেন্দ্রের অঙ্গমাত্র। কিন্তু তারই মধ্যে আছে আমার বোধ—সে বিশ্বকে দেখে চাখে বাছাই করে। এই বিশুদ্ধ বোধটুকুকে কিন্তু জড়ের আইন দিয়ে কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারি না। 'কেমন করে' বোধ হয় তা না হয় বোঝাতে পারি—বোধের আশ্রয় জড়যন্ত্রের কৌশল ব্যাখ্যা করে; কিন্তু 'কেন' বোধ হয়, তার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারি না। অথচ আমার জীবনে গরজ বলে কোন বালাই যদি থেকে থাকে, তা আছে কিন্তু এই বোধের জন্যই।

বিশ্বসত্তাকে তখন বাধ্য হয়ে দুভাগ করতে হয় : একভাগ চৈতন্য বা পুরুষ, আরেকভাগ শক্তি বা প্রকৃতি। জীবনটা দুয়ের গৃহস্থালি। কিন্তু খুব আরামের গৃহস্থালি নয়; দেখতেও পাচ্ছি, 'কেবল দুয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ'। তার একটা মীমাংসা চাই। তাই একটু তলিয়ে বুঝতে হবে, দুয়ের মধ্যে আসল সম্পর্কটা কি।

এবিষয়ে সাংখ্যের সিদ্ধান্ত আমাদের জানা আছে। বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি,

পুরুষ আর প্রকৃতির সম্পর্কটা দুঃখের; অর্থাৎ কি বাইরে কি ভিতরে, বিষয়ের সম্পর্কে এলেই বোধ আবিল হয়ে যায়। আবিলতা অস্বস্তির কারণ। সুতরাং পুরুষকে স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ রাখতে হলে তাকে সমস্ত বিষয় সংস্পর্শ হতে বিবিক্ত হতে হবে। পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক বা বিচ্ছেদই হল সমস্যার সমাধান।

আরেকটা সিদ্ধান্ত হচ্ছে, অপরাপ্রকৃতির মধ্যেই যত ঝামেলা, পুরুষকে তার ঊর্ধ্বে চলে যেতে হবে। পুরাপুরি না হলেও এও সমস্যার সমাধান খোঁজে নিষ্ক্রমণের পথেই।

সম্যক্-দর্শনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, পুরুষ আর প্রকৃতির মধ্যে যে-বিরোধ তা আপাতদৃষ্ট মাত্র। প্রকৃতি পুরুষোত্তমেরই আত্মশক্তি। স্বরূপত সে-শক্তি জড় নয়, চিন্ময়ী—জড়ত্ব তারই বিভূতি। জড় হতে চৈতন্যের উন্মেষ হচ্ছে অহংবোধকে আশ্রয় করে। স্বভাবতই এ-বোধ সঙ্কুচিত। তাই তার মধ্যে দুঃখ আর অশক্তির ছায়া পড়ে। সঙ্কীর্ণ অহংকে যদি বৃহতের চেতনায় বিস্ফারিত করা যায়, তাহলে আর এ-ছায়া থাকে না, বোধ জ্যোতিঃশক্তিতে ঝলমলিয়ে ওঠে—এইখানেই। তখন আত্মবোধের মধ্যেই যুগনদ্ধ পুরুষোত্তম ও পরমাপ্রকৃতির মহিমাকে অনুভব করি। প্রকৃতি তখন যান্ত্রিক জড়ক্রিয়ামাত্র নয়—পরন্তু চিন্ময়ী মহাশক্তি। এই মহাশক্তিকে পরাক্-দৃষ্টিতে (objectively) অনুভব করি বিশ্বে, প্রত্যক্-দৃষ্টিতে (subjectively) আমার মধ্যে অন্তর্যামিনী চিৎশক্তি-রূপে। প্রত্যক্ অনুভবই মুখ্য, পরাক্ অনুভবের মূল্যায়ন নির্ভর করে তারই উপর। আত্মানুভব যখন সঙ্কুচিত, জগৎ তখন আমার কাছে জড়ময়। বিস্ফারিত আত্মানুভবে সেই জগৎই চিন্ময়; অর্থাৎ বিষয়ী আর বিষয়ের মধ্যে আত্মা আর অনাত্মার ভেদ তখন ঘুচে যায়, চেতনা সবার মধ্যে আবিষ্ট হয়ে সবাইকে অনুভব করে আত্মরূপে : যেমন করেন কবি, প্রেমিক ঋষি—যাঁরা মরমীয়া।

*

প্রবুদ্ধ আত্মচৈতন্যে মহাশক্তিকে প্রথম অনুভব করি প্রাণরূপে যে-প্রাণ প্রকৃত, জড়ের বিধাতা। এই প্রাণ অন্তরে বাইরে সর্বত্র। এক অতল অপার প্রাণসমুদ্রে আমরা ডুবে আছি সঞ্চরণ করছি—মীনের মত। প্রাণায়ামের দ্বারা এই প্রাণকে আমরা আহরণ করতে পারি দেহের আরোগ্য ও বল এবং মনের স্বাচ্ছন্দ্য ও দীপ্তির জন্য। হঠযোগের বাহ্য ক্রিয়ানির্ভর প্রাণায়ামের কথা বলছি

২৯

না, বলছি চিন্ময় ভাবনানির্ভর বৈদিক প্রাণোপাসনার কথা। অধিভূত দৃষ্টিতে নয়, অধিদৈবত দৃষ্টিতে সে-প্রাণ মাতরিশ্বা, সে-প্রাণ আদিত্য—মহাশক্তিরই হৃৎস্পন্দ। বলছি তারই সঙ্গে এক হওয়ার কথা। ভাবনার দ্বারা এই দিব্যপ্রাণকে আমরা অধিগত এবং প্রয়োজিত করতে পারি স্বার্থে এবং পরার্থে—উভয়ত।

কিন্তু প্রাণই মহাশক্তির শেষ সীমা নয়। প্রাণের ঊর্ধ্বে, তাকে ব্যাপ্ত এবং অনুবিদ্ধ করে রয়েছে মন। 'মনোময়ঃ প্রাণ-শরীর নেতা' পুরুষের কথা আগে বলেছি। চৈতন্যকে তুলে নিতে হবে সেই পুরুষের ভূমিতে, অনুভব করতে হবে আমাদের অন্তরে বাইরে ঊর্ধ্বে এক বিশ্বমনের বিপুল পারাবার—ব্যক্তিমন তার তরঙ্গভঙ্গ মাত্র। সে-মনের প্রতিমা আদিত্যের চিন্ময় প্রভাস্বরতায় আকাশের প্রশান্ত পরিব্যাপ্তিতে। একটিতে মনের প্রাণস্পন্দ, আরেকটিতে তার স্বরূপস্থিতি। প্রাকৃত ভূমিতে মন আর প্রাণ আমাদের মধ্যে একসঙ্গে জড়িয়ে আছে, মন সেখানে সম্পূর্ণ স্ববশ নয়। কিন্তু এই যোগভূমিতে আমরা দুটিকে পৃথক করে নিতে পারি, মন তখন স্বরাট্, প্রাণ শরীর-নেতা। তবুও মনে রাখতে হবে, মনের এই স্বারাজ্য তার মধ্যে আগন্তুক ধর্ম তা মানসোত্তরেরই প্রচ্ছটা। মনকে ছাপিয়ে সেইখানে আমাদের উঠতে হবে, তবেই মহাশক্তির স্বরূপকে চিনতে পারব।

*

প্রাকৃত মনের ভূমিতে পুরুষ আর প্রকৃতি পরস্পর জড়িয়ে আছে—কিন্তু বিষম ছন্দে। সাংখ্যের ভাষায় তাকে বলে অবিবেক : এই জোড় না ভাঙতে পারলে দুয়ের মাঝে সৌষম্য আনা যায় না, কেন না তা নির্ভর করছে পুরুষের উদার দৃষ্টি এবং স্বচ্ছন্দ স্বাতন্ত্র্যের 'পরে। তাই অধ্যাত্মযোগে বিবেকসাধনার দরকার হয় সবার আগে। প্রকৃতির ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে না গিয়ে পুরুষকে আলাদা থাকতে হবে—তারই নাম বিবেক। বিবেকের প্রথম ফল হল শান্তি—প্রকৃতির বিক্ষেপজনিত যে-অস্বস্তি, তা দুঃখেরই হ'ক বা সুখেরই হ'ক, তা হতে পুরুষের মুক্তি। প্রকৃতির কাজ তখনও চলতে থাকে, কিন্তু পুরুষ তার উপদ্রষ্টা মাত্র, অথবা অধ্যক্ষরূপে তার অনুমন্তা। পুরুষ আর প্রকৃতির অধীন নন, তিনি স্বতন্ত্র।

কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যকে পুরুষ কিভাবে ব্যবহার করবেন, তা নির্ভর করছে

পুরুষপুরুষার্থ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উপরে। মনোভূমিতে থেকে পুরুষ এই স্বাতন্ত্র্যকে প্রাকৃত হৃদয়-মন-বুদ্ধির শাসনে ও শোধনে নিয়োজিত করতে পারেন, তাদের মূঢ়তা ও চাঞ্চল্যকে দূর করে সাত্ত্বিক প্রকাশ প্রসন্নতা ও সর্ববত্তায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। অথবা আরও উর্ধ্বে উঠে ব্যক্তি চৈতন্যে বিশ্বচৈতন্যে প্রসারিত করে চিন্ময় মনের প্রশান্তি ও পূর্ণতায় স্থির হতে পারেন। অথবা আরও ঊর্ধ্বে চেতনার আদিত্যদ্যুতিকে ছাপিয়ে নিলীন হয়ে যেতে পারেন আকাশের অবর্ণ শূন্যতায়—মন তখন নিরুদ্ধ, প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া প্রশান্ত। উত্তরণের এই শেষ সীমা এবং অনেকের কাছে এই নিরোধ বা নির্বাণই পরম পুরুষার্থ।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। যা পরমা প্রশান্তি, তা শক্তিগর্ভ। আর সে-শক্তি শুধু উপশমনেরই নয়, তাকে বজায় রেখেও উল্লাসে বিচ্ছুরিত করবার শক্তি। উপশমে আরোহ, আর উল্লাসে অবরোহ। কিন্তু এই অবরোহণ প্রাকৃত চেতনায় ব্যবধান নাও হতে পারে। মনকে হারিয়ে যেমন অমনীভাবে পেঁছন যায়, তেমনি পৌঁছন যায় অতিমানসেও—যা লোকোত্তর মনেরও উৎস। অতিমানসের শক্তিকে তখন লাগানো যায় মন এবং তার নীচের প্রাকৃত শক্তির রূপান্তরে। কিন্তু অতিমানস পরমা-প্রকৃতি, চিন্ময়ী মহাশক্তি—জীবপুরুষের তিনি ধাত্রী এবং ঈশানী। সুতরাং মনোময় পুরুষের স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের তিনি বাইরে। তাঁর প্রসাদ লাভ করতে হয় আত্মসমর্পণের দ্বারা। আত্মসমর্পণ পুরুষোত্তম বা পরমা প্রকৃতির কাছে—দুয়ে কোনও ভেদ নাই।

মনের শুদ্ধতা প্রশান্তি ও স্বাতন্ত্র্য যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, ততই তার সামনে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে চেতনার মানসোত্তর ভূমিসমূহ তার মধ্যে নেমে আসে ব্রহ্মের অনুভব—অনন্ত সত্তা চৈতন্য আনন্দ আর শক্তির রূপে। ভেদের সূক্ষ্ম সংস্কার মনের মধ্যে নিহিত থাকায় কখনও ব্রহ্মের এককেটি বিভাবের অনুভব হয় তার পৃথক রূপে, আবার কখনও বা অদ্বৈত সুনিবিড় প্রত্যয়ে তার সমস্ত ভেদভাব বিগলিত হয়ে যায়। এক ব্রহ্ম, কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতিতে দ্বিদল। মন পর্যায়ক্রমে বা যুগপৎ দুটি দলের অনুভব পেতে পারে : পুরুষের অনুভবে সে পায় অনন্ত সত্তা ও চৈতন্যের বোধ—সামীপ্য বা সাযুজ্যের দ্বারা অনুবিদ্ধ অচল প্রতিষ্ঠার আকাশবৎ প্রশান্তি; আবার প্রকৃতির অনুভবে পায় অনন্ত আনন্দ ও শক্তির বোধ—আকাশের হৃদয়ে অন্তহীন বিসৃষ্টির আদিত্য প্রভাস্বর উল্লাস। তার মধ্যে মন পায় চিন্ময়ী

মহাশক্তির প্রজ্বলন্ত অনুভব : লোকোত্তর হতে সম্পাতিত তাঁর অনন্তবীর্যের অভিষেক, অন্তরে-বাইরে তাঁর যোগিনী হৃদয়ের পরিস্পন্দ, লোকোত্তরের পানে তাঁর মহাসঙ্কর্ষণ, তাঁর অনুপাখ্য আনন্ত্যের মাঝে সত্তার মহাপরিনির্বাণ পূর্ণযোগের সাধক এ সবই চায়—কিন্তু চায় শুধু ওখানে নয়, এখানেও। অসীমা এখানে সীমার মধ্যে নিগূহিতা হয়ে আছেন : তাঁকে প্রকট করতে হবে—সীমাকে ভেঙে দিয়ে নয়, তাঁর আবেশে তদ্ভাবভাবিত এবং রূপান্তরিত করে। আদিত্য রশ্মির স্পর্শে শিশির বিন্দু উবে যাবে না, প্রভাস্বর হয়ে উঠবে। এই দিব্য রূপান্তরের জন্যই মহাশক্তিকে আবাহন করে আনতে হবে এই আধারে, আমার বলে যা-কিছু সমস্তই নিঃশেষে তাঁর করে সঁপে দিতে হবে। তারপর থেকে সাধনা আর আমার নয়, তাঁর। অদিব্যকে তিনিই দিব্য করে তুলবেন, বিরোধের মধ্যে আনবেন সমন্বয়, অনুভবের বৈচিত্র্যকে সংহত করবেন পরম সৌষম্যের সূত্রে, অতিমানসের জ্যোতিঃ সম্পাতে মনোধাতুর ঘটাবেন বিজ্ঞানঘন পরিণাম, চেতনায় নিজের স্বরূপকে অপাবৃত করবেন মহাযোগেশ্বর পুরুষোত্তমের যোগমায়ারূপিনী পরমা-প্রকৃতির মহিমায়।

১৭

মহাশক্তির ক্রিয়া

অহরহ আমাদের মধ্যে প্রকৃতির পরিণাম বা শক্তির ক্রিয়া চলছে। তার কেন্দ্রে রয়েছে আমাদের অহংচেতনা। আমরা মনে করছি, যা-কিছু করবার আমিই করছি। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। সর্বময় কর্তৃত্ব যে আমার না, তার প্রমাণ পাই পদেপদে। আমার কর্তৃত্ব ব্যাহত হয়, আমি তাতে দুঃখ পাই। কর্তৃত্বের অভিমান পুষে রেখে আরও ঝামেলা বাড়িয়ে তুলি। সোয়াস্তি পাই, যদি অভিমান ছাড়তে পারি, ভাবতে পারি—আমি কর্তা নই, প্রকৃতি বা শক্তিই কর্ত্রী। বাইরে-ভিতরে সবার মধ্যে সব ক্রিয়ার পিছনে এক মহাশক্তির প্রেরণা। অহং আছে, কিন্তু আছে মহাশক্তির নিমিত্ত হয়ে।

জীবশক্তির পিছনে মহাশক্তির অনুভব—অহংবিমুক্তির এই হল প্রথম ধাপ। আমি কর্তা নই, প্রকৃতি কর্ত্রী; আমার মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়া চলছে—যেমন সবার মধ্যে চলছে, আমি তার তটস্থ দ্রষ্টা মাত্র : এই অনুভবে স্বাচ্ছন্দ্য আছে। কিন্তু সাধককে এখানেই থামলে চলবে না, কেননা এ-অনুভবে প্রকৃতির ক্রিয়াকে মনে হয় অর্থহীন যান্ত্রিক ক্রিয়া বলে—যেমন হয় সাংখ্যবাদীর। প্রকৃতির পরিণাম হতে বিবিক্ত থাকার একটা আরাম আছে, কিন্তু তার অর্থ আবিষ্কার করতে পারলে আছে আনন্দ। তাই সাধককে আরেক ধাপ এগিয়ে প্রশ্ন করতে হয়, প্রকৃতি-পরিণামের পিছনে রয়েছে কিসের প্রৈতি (urge), তার লক্ষ্য কি। প্রকৃতির পিছনে তখন আবিষ্কার করি পরমপুরুষকে, শক্তির পিছনে ঈশ্বরকে; দেখি প্রকৃতি পরিণামের লক্ষ্য অহন্তার বিস্ফারণ, চেতনার প্রকর্ষণ। অনন্ত গুটিয়ে এসেছেন সান্তের মধ্যে, আবার বিস্ফারিত হচ্ছেন আনন্ত্যে—এই তাঁর শক্তির লীলা। আর এই দর্শনই শক্তির সম্যক্ দর্শন।

ফিরে যেতে হবে সৎ-চিৎ-আনন্দের আনন্ত্যে, সর্বতোভাবে তাকে অধিকার করতে হবে—এই হল পুরুষার্থ। তাকে সিদ্ধ করবার জন্যই শক্তির সাধনা। জীব আর ব্রহ্মের মাঝে শক্তি সেতু। স্বরূপত শক্তি হল একটা যোগ্যতা (potentiality) একটা-কিছু হওয়ার সম্ভাবনা। তার মধ্যে যেমন একটা আবেগ আছে, তেমনি আছে জোয়ার-ভাটার খেলা। শক্তির নিমেষ (self-

gathering) আর উন্মেষের মাঝে তার এই জোয়ার ভাটা। এই মধ্য পর্বটিকে মেনে নিতেই হবে, যদিও সাধকের পক্ষে এইটিই হল সঙ্কটকাল। এই অন্তরিক্ষেই যত লড়াই আর তাইতে শক্তিরও বীর্য এবং বৈচিত্র্যের প্রকাশ। আলো একবার ফোটে, আবার স্তিমিত হয়ে যায়, আবার হয়তো দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে। কিন্তু এইটুকু আশ্বাসের কথা, এই দোটানার মধ্যেও তার লক্ষ্য কিন্তু অনির্বাণ হয়ে জ্বলা। আত্মশক্তিতে বাধার সঙ্গে লড়াই করতে-করতে একটা সময় আসে, যখন ঐ চিরদ্যুতির আভাস চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন আসে নিজের প্রযত্নকে শিথিল করে অথচ সমনস্ক থেকে আত্মোন্মীলন এবং আত্ম-সমর্পণের পালা। জীবশক্তিতে তখন আর কিছুই হয় না, হয় মহাশক্তিতে। মনের আয়াসের জায়গা নেয় অতিমানসের আবেশ। শুরু হয়ে যায় আধারশক্তির রূপান্তর।

মহাশক্তির আবেশ আধারের কোথায় প্রথম সক্রিয় হবে তার কোনও ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। তবে সাধারণত তার ক্রিয়া শুরু হয় মনে, কেননা আমাদের অধ্যাত্মযজ্ঞের মনই হল মুখ্য যজমান। আবেশের সূচনা হয় বিশ্বমানসতায় মনের বিস্ফারণে, ক্রমে তা ঘনীভূত হয় বিশ্বপ্রাণতায়, এমন-কি চিন্ময় বিশ্বকায়তায়। আবার কখনও আধারের ঊর্ধ্বপর্বে মূর্ধন্যচেতনায় অতর্কিতে মহাশক্তির আদিত্যপ্রভাস্বর আবির্ভাবও ঘটতে পারে। তার বেগকে ধারণ করা আধারের পক্ষে তখন কঠিন হয়। একটি কথা তখন মনে রাখতে হবে, আকাশ-গঙ্গার প্রপাতকে স্বচ্ছন্দে ধারণ করেছিল ব্যোমকেশের জটাজাল, কিন্তু ঐরাবত তার তরঙ্গাঘাতে ভেসে গিয়েছিল। অর্থাৎ চাই সর্বাবস্থায় সমতা অহংশূন্যতা আর চেতনার বিস্তৃতি, তবেই শক্তিকে আপন করে পাওয়া যায়।

*

অধ্যাত্মসাধনা চলছে তিনটি তত্ত্বকে আশ্রয় করে জীব শক্তি এবং ঈশ্বর। জীব সাধক, শক্তি সাধন, আর ঈশ্বর সাধ্য। শক্তি ঈশ্বরেরই স্বরূপশক্তি। আর জীব ঈশ্বরেরই 'অংশঃ সনাতনঃ'—স্বরূপে দুয়ে কোনও ভেদ নাই; অথবা জীব ঈশ্বরের 'পরা প্রকৃতির্জীবভূতা', কিন্তু এখানে আমরা জীবকে পাচ্ছি প্রকৃতিরূপে নয়—বিকৃতিরূপে। তার আত্মবোধ সঙ্কুচিত এবং আবিল হয়েছে অহংচেতনায়, শক্তি বন্দী হয়েছে বাসনায়। ঈশ্বরের সাধনায় তাই প্রথমত

অহংএর দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের কাছে মানুষ ঈশ্বরকে চায় না, চায় কেবল অহংবাসনার পরিতৃপ্তি। সে চাওয়া বাইরের চাওয়া; আর ঈশ্বরকে চাওয়া হল অন্তরের চাওয়া—নিজেকে জানতে পেতে আস্বাদন করতে চাওয়া। অন্তর এই চাওয়াই সত্যকার চাওয়া—কেননা এর পরিণাম সুনিশ্চিত, আর বাইরের চাওয়ার পরিণাম অনিশ্চিত। অন্তরের চাওয়া যত প্রবল হবে, বাইরের চাওয়ার জোর ততই কমে আসবে। অবশেষে একদিন সমস্ত প্রাণ লুটিয়ে দিয়ে বলতে পারব, আমি তোমাকেই চাই, আর কিছুকে নয়। বাইরের ভার তখন তাঁর উপর : তিনি যা করেন। এমন-কি অন্তরের ভারও তাঁর উপর : তিনি যখন যেভাবে আসেন। এই হল আত্মসমর্পণ। আমি নাই, আমার কোন দাবিও নাই—না বাইরে, না ভিতরে। আমি শূন্য, আমি সত্তা, আমি বোধমাত্র। সেই বোধে ছেয়ে আছে এক অনির্বচনীয় প্রসন্নতার পদ্মরাগ।

এই আকাশে তিনি ফোটেন, ফোটে তাঁর শক্তি। বাসনার শক্তি নয়—দেবতার শক্তি, যেন তারায় তারায় তাঁরই আনন্দের ফুলঝুরি। 'সব ছোড়ে সব পাওয়ে।' এ-আইন সর্বত্র। তাই দেখি, সাধনার প্রথমপর্বেই একটুখানি অন্তর্মুখীনতায় একটুখানি সমাহিতিতে শক্তির জোয়ার নেমে আসে। কিন্তু অহংও বুঝি তখন ওৎ পেতে থাকে; শিবের শক্তিকে সে বাগিয়ে নিতে চায় নিজের জন্য। অসুর রাক্ষস এরাও তপস্যা করে, এরাও শক্তিকে পায়; কিন্তু তার পরিণাম 'মহতী বিনষ্টিঃ'। সাধককে তাই সাবধান হতে হয়। অহং আর বাসনা যেন কোথাও প্রশ্রয় না পায়। অবিদ্যার আঁধারের চাইতে বিদ্যার আঁধার আরও মারাত্মক। তামসিক আর রাজসিক অহং যে মন্দ, সে তো জানা কথা—তাদের চিনতেও দেরি হয় না। কিন্তু সাত্ত্বিক অহং বর্ণচোরা, তার ফাঁকি ধরা বড় কঠিন। ঈশ্বরকেও সে বলবে 'তুমি আমার', বলবে না 'আমি তোমার'। অহংকারের এই চরম বঞ্চনা।

সাধনায় শক্তি আসবেই। তাকে প্রত্যাখ্যান করার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু জানতে হবে, এ আমার শক্তি নয়, তাঁর শক্তি, তাঁরই প্রয়োজনে আমার মধ্যে তার আবির্ভাব। অপরা-প্রকৃতির শক্তিকে একদিন বশ করবার দরকার হয়েছিল, তার জন্য সেদিন সাত্ত্বিক অহংকেও আমল দিয়েছি, কিন্তু এ-শক্তি পরমা প্রকৃতির, এ তাঁর স্বরূপশক্তি। তাকে অধিকার করা নয়, তার দ্বারা অধিকৃত হওয়াই এখন পুরুষার্থ।

একই শক্তি—অহংএর সঙ্গে জড়িয়ে গেলে অপরা আর অহংএর ছোঁয়াচ

কাটিয়ে উঠলেই তা পরা। শক্তির সার্থকতা চৈতন্যের যোগে : যেমন চৈতন্য তেমনি শক্তি, যে-পুরুষের যে-প্রকৃতি। শক্তির শোধন অর্থে চৈতন্যেরই শোধন —অহং-চেতনার রূপান্তরণ আত্মচৈতন্যে। অহং বুভুক্ষ, অহং কর্তৃত্বাভিমানী। এই বুভুক্ষা আর অভিমান হল প্রকৃতির বিকার। ভোগে যে আনন্দ, আর অভিমানে যে শক্তির প্রকাশ, স্বরূপত তারা দোষের নয়। দোষের হল, অহং চেতনার সংকীর্ণ পরিসরে তারা যে-বিক্ষোভ তুলেছে, তা-ই। এই বিক্ষোভকে দূর করতে হবে চেতনার প্রসার দ্বারা, তা-ই তার শুদ্ধি। তার মুখ্য উপায় হল প্রত্যাহার, তটস্থতা, সাক্ষিভাবনা—ভোগে বা ঐশ্বর্যে প্রমত্ত না হয়ে প্রকৃতি-পরিণামের দ্রষ্টা হওয়া। শুদ্ধ দ্রষ্টৃত্বে অহং বিলুপ্ত হয়ে যায়, জাগে আত্মবোধ। শক্তির ক্রিয়া তখনও চলতে থাকে। কিন্তু সে-শক্তি আর অপরা নয়, পরা—আমার শক্তি নয়, তাঁর শক্তি, জীব তখন নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু অপরা-প্রকৃতি হতে বিবিক্ত তটস্থ নিমিত্ত নয়, পুরুষোত্তমের দিব্য কর্মের শরীক তাঁর চিন্ময় নিমিত্ত; কেননা তার প্রকৃতি তখন পরা-প্রকৃতি, যা পুরুষোত্তম ও পরমা প্রকৃতির সঙ্গম ক্ষেত্র, তাঁদের যুগল বিলাসের আধার।

*

আগেই বলেছি, যোগের দুটি ধারা—একটি নিরোধ যোগ, আরেকটি আবেশ যোগ। নিরোধ যোগে মন নিষ্ক্রিয় হয়ে তত্ত্বে অবগাহন করে, আর আবেশ যোগে তার সক্রিয় অবস্থাতেই তত্ত্ব তার মধ্যে অবগাহন করে। আবেশই পূর্ণ যোগের অনুকূল; তবে প্রয়োজন বোধে নিরোধেরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আবেশের ফলেও নিরোধ আপনা থেকে এসে যায়; পূর্ণসত্যের অনুভূতিতে নিরোধ আর আবেশ শিব-শক্তির মত যুগনদ্ধ হয়ে থাকে। আকাশবৎ নিস্তরঙ্গ শৈবচেতনার ভূমিকায় তখন মহাশক্তির সাবিত্রী দীপ্তির প্রকাশ। একটির সাধন হল সমতা, আরেকটির বীর্য।

সমত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকে বীর্যের উদ্‌বোধন করতে হবে আধারে মহাশক্তির আবাহন দ্বারা—সংক্ষেপে এই হল সাধনার সূত্র। তার তিনটি ধাপ। প্রথম ধাপে অনুভব করতে হবে, জীবনের সমস্ত কর্মে মহাশক্তিই প্রয়োজিকা, কাজ হচ্ছে তাঁরই প্রেরণায় এবং কর্মাধ্যক্ষ পুরুষোত্তমের নির্দেশে—জীব সেই ঈশ্বর-শক্তির নিমিত্তকর্তা মাত্র। তার ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প সবই যেন আকাশে

সাবিত্রী দীপ্তির উচ্ছলনে আপ্লুত। কর্মের দায় তার আছে, কিন্তু সে-দায় আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মাত্র।

এই ভাবনায় কর্তৃত্বাভিমানী অহং ক্ষীণ হয়ে যায়। অবশেষে অনুভব হয়, জীব আর কর্তা নয়, শক্তিই কর্ত্রী। চলছেন বলছেন ভাবছেন মা-ই, সাধক নয়। এই হল দ্বিতীয় ধাপ। জীব তখন তটস্থ দ্রষ্টা মাত্র। তার তটস্থতাকে আশ্রয় করেই আধারে চলে মহাশক্তির লীলা—জীব তার ভোক্তা এবং ঈশ্বর তার প্রশাস্তা। কখনও-কখনও জীব লীন হয়ে যায় মহাশক্তির মধ্যে। তখন আর একের মধ্যে তিনের নয়—দুয়ের খেলা, শিব-শক্তির অন্যোন্যবিলসনের সংস্কার।

শেষ ধাপে আবেশের চরমে পরম অদ্বৈত সিদ্ধি—ঈশ্বর আর শক্তি তখন একাকার। নির্বিশেষ অদ্বৈত নয়, পূর্ণাদ্বৈত : ঈশ্বর স্বরূপে, ঈশ্বর শক্তিতে, ঈশ্বর অংশকলায়—সবই ঈশ্বর। এদিক থেকে ওদিককে জানা নয়, ওদিক থেকে এদিক হওয়া। আবেশের মধ্যে তখন যুগপৎ ফোটে স্বরূপস্থিতি ও বিসৃষ্টির বীর্য। আকাশের আদিত্যহৃদয় ভুবনে-ভুবনে ফুটিয়ে চলেছে লীলার কমল। আকাশের চিন্ময় উল্লাসেরই প্রতিমা এই কমল—কার অনুভবে তা বলবার উপায় নাই। কেননা তখন অনুভবই অনুভবিতা—যেমন সুষুপ্তির সর্বযোনি প্রজ্ঞানঘনতায়।

অবরোহক্রমে এই হল পরম অদ্বৈত—সাধ্যের অবধি। তার গভীরে আছে শুধু অবতারের দুর্গম রহস্য, অবিগ্রহের বিগ্রহবত্তার চরম চমৎকার।

১৮

শ্রদ্ধা ও শক্তি

বীর্যসিদ্ধির তিনটি উপাঙ্গের কথা এপর্যন্ত আলোচিত হল—করণশক্তির পূর্ণতা, জীবাত্মশক্তির পূর্ণতা আর মহাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণের পূর্ণতা। আরেকটি উপাঙ্গ হল শ্রদ্ধা, যাকে বলতে পারি সমস্ত সাধনার মূল।

শ্রদ্ধার আরেক সংজ্ঞা হল আস্তিক্যবুদ্ধি, যা কিছু দেখছি তার মর্মমূলে এবং তাকে ছাপিয়ে একটা-কিছু আছে—এই অবিচলিত প্রত্যয়। অধ্যাত্মযোগের আদিতে হল শ্রদ্ধা আর অন্তে প্রজ্ঞা বা উপলব্ধি। যা উপলব্ধব্য তাকে স্পষ্ট করে জানি না, কিন্তু হৃদয়ে তার সুনিশ্চিত আভাস পেয়েছি, কবির ভাষায় 'তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলে জানে'—এর নাম শ্রদ্ধা। মরমীয়ারা উপমা দেন অরুণোদয়ের, যখন নিশ্চয় জানি আলো ফুটতে আর দেরি নাই। শ্রদ্ধার অরুণিমাই প্রজ্ঞার মধ্যাহ্নদ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। তাই সাধনার গোড়া হতে শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধাই বলতে গেলে দিশারী। পূর্ণযোগীর শ্রদ্ধা রয়েছে ঈশ্বরে এবং শক্তিতে, রয়েছে তাঁদেরই দেওয়া আত্মবীর্যে, রয়েছে সহস্র বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়ে হলেও সিদ্ধির চরমে পৌঁছবার ধ্রুবতায়।

শ্রদ্ধার বিপরীত বৃত্তি হল সংশয়। গীতায় আছে, 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।' কিন্তু যোগের পথে সংশয়েরও একটা উপযোগিতা আছে। সংশয় দুরকমের: এক হচ্ছে নাস্তিক্যের সংশয়—যা সত্যের লৌকিক রূপ ছাড়া আর কিছুই মানবে না, লোকোত্তরের দিকে যা একেবারে মুখ ফিরিয়ে আছে; আরেক রূপ হচ্ছে সবকিছুকে যাচাই করে নেবার বুদ্ধি হতে উৎপন্ন সংশয়। পরমসত্যের অভিযানে এ-সংশয় শ্রদ্ধার দোসর। শ্রদ্ধার একটা নকল হলে শ্রদ্ধালুতা—মোহের প্রাণবাসনার বা অপ্রবুদ্ধ হৃদয়ের প্ররোচনায় চট্ করে একটা-কিছুকে মেনে বসা এবং তার ফলে শেষপর্যন্ত ঠকা। সংশয় এই ধরনের বোকামিকে আঘাত করে বন্ধুর কাজ করে। তাছাড়া সত্যৈষণার দীর্ঘ পথ জুড়ে রয়েছে সত্যের মুখোস পরা মিথ্যার আবেদন। সাধককে তার হাত হতেও বাঁচায় সংশয়। এ-সংশয়ের একটা ভদ্র নাম হচ্ছে তর্কবুদ্ধি—অবশ্য প্রতিকূল তর্কের নয়, অনুকূল তর্কেরই বুদ্ধি, পূর্ণ সত্যকে সম্যকরূপে জানবার আগ্রহ হতে

যার জন্ম। 'অচিন্ত্য যে সব ভাব তাদের সঙ্গে তর্ককে জুড়ে দেবে না'— মহাজনের একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য একথাও, 'তর্ক নিয়ে সত্যকে যে খোঁজে সেই তাকে জানে, অপরে নয়।'

তবুও সত্যের পথে আসল পাথেয় হল শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা একটা অধ্যাত্মবীর্য, যার উৎসারণ হয় অন্তরের গভীর হতে এবং একটা দিব্য নিয়তির দিকে অনিবার্য বেগে মানুষকে তা প্রচোদিত করে। শ্রদ্ধা শুধু পোষমানা চিত্ত দিয়ে মেনে নেওয়া নয়, তা একটা অনপলাপ্য তীক্ষ্ণ প্রত্যয়—আত্মানুভবের বেগে যা প্রতিমুহূর্তে তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে। যেমন বাইরের ব্যাপারে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সত্যতা, তেমনি অন্তরের ব্যাপারে শ্রদ্ধাপ্রত্যক্ষের সত্যতা। সে যে শ্রদ্ধালুতা বা কুতর্ক নয়, তা বলাই বাহুল্য। সাধককে এ দুটি সযত্নে পরিহার করতে হবে—বিশেষত পূর্ণ যোগের সাধককে; কেননা তার লক্ষ্য এত অভূতপূর্ব আর এত বিরাট যে তা নিয়ে কিছুই না বুঝে মেতে ওঠাও যত সহজ, বিজ্ঞ সেজে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসাও তত সহজ।

*

শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধি আর সে-বুদ্ধি একটা দিব্য আবেশের ফল। শ্রদ্ধা আধারে অতিমানস জ্যোতিঃশক্তির একটা সম্পাত, যা প্রাণ মন বুদ্ধির আবরণকে ভেদ করে স্পর্শ করে চৈত্যসত্ত্বকে, আর সেই স্পর্শে সে সুপ্তোত্থিতের মত জেগে ওঠে। এ যেন অলখের বাঁশির সুরে বয়ঃসন্ধিগতা কিশোরীর জেগে ওঠা। তার পর শুরু হয় তার 'নিশিতা দুরত্যয়া ক্ষুরধারা'-মাড়ানো দুর্বার অভিসার: কিছুতেই তার পথ আটকাতে পারে না—না বুদ্ধির জটিলতা, না প্রাণের কুটিলতা, না ক্লীব আত্মাভিমানের দুরাগ্রহ। দুর্দিনে অন্ধকারে কতবার পথ ছেয়ে যায়; তবুও সে হাতের পরে পায় অদৃশ্য দিশারীর স্পর্শ, হৃদয়ে বিশ্রব্ধ ভালবাসার আশ্বাস। শ্রদ্ধা জানিয়ে দেয়, সে মনোনীতা, সে গোত্রান্তরিতা। তার চাওয়া তাঁরই চাওয়া; পাওয়ায় তাই সংশয় নাই।

যেমন লক্ষ্যের প্রতি শ্রদ্ধা চাই তেমনি আত্মশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা। আমাদের প্রথম পথচলা আলো-আঁধারির মাঝ দিয়ে। চলতে গিয়ে প্রাতিভসংবিতের ঝলকে যেমন অধ্যাত্মসম্পদের অতর্কিত বিস্ময়ের দেখা পাব, তেমনি আবার দেখব আধারের গহন হতে পাক দিয়ে-দিয়ে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তাকে

ভয় করলে চলবে না, আঁধারের পর আলোর জয় হবেই হবে—এই শ্রদ্ধাকে অটুট রাখতে হবে। আবার আলোরও সম্মোহন আছে, আছে 'হিরন্ময় পাত্রের' আবরণ। একটু-কিছু পেয়েই কতবার মনে হবে, বুঝি সব পাওয়া হয়ে গেল : রসাস্বাদলুব্ধ মন চাইবে পথের ধারে বাসা বাঁধতে—নবজাগ্রত-শক্তির বিচিত্র বিভূতির অপ্সরোবিভ্রমকেই পরম লাভ মনে করে। এইখানে সাধককে হুঁশিয়ার হতে হবে। কোথাও থামলে তার চলবে না। সে অল্পের ভিখারী নয়, ভূমার রসিক, সমুদ্রের জলে ঘট ভরেই তার তৃপ্তি নাই। সে চায় সমুদ্র হতে। তাই তাকে কেবলই ছাড়তে-ছাড়তে, অহন্তার কুণ্ডলী মোচন করতে-করতে চলতে হয়—যেপর্যন্ত না পরম রিক্ততায় তার সত্তা আকাশের মত বিস্ফারিত হয়, আর তার মধ্যে ফুটে ওঠে বহু শোভমানা মহাশক্তির সাবিত্রী দীপ্তি। তখন চাওয়া-পাওয়ার দোলা রূপান্তরিত হয় অসীমের হওয়ার ছন্দে। এই হওয়ার মধ্যে পুরুষোত্তম আর পরমা প্রকৃতির আত্মবিভাবনার যে-উল্লাস, সাধকের আত্মসামর্থ্যের উপযোগের যে নিশ্চিত পরিণাম, সাধনার গোড়া হতেই তার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ও তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই।

তেমনি চাই সাধনায় করণশক্তির আনুকূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা—পরমসত্যের প্রতি বুদ্ধি প্রাণ ও হৃদয়ের নিগূঢ় অভীপ্সার প্রতি শ্রদ্ধা। অধ্যাত্মসাধনায় মানুষের বুদ্ধি দেবযানের পথিক, আলোক হতে আলোকে তার উত্তরণ। তবুও প্রমাদ স্খলন বা দিগ্‌ভ্রান্তি ঘটা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু উদ্‌বিগ্ন নিরুৎসাহ বা সন্ত্রস্ত হলে সাধকের চলবে না। ভুল করার মধ্যে গ্লানি বা লজ্জার কিছুই নাই, যদি জানা মাত্র তাকে সংশোধন করবার স্বচ্ছন্দ বীর্য চিত্তের থাকে। ঠেকে শেখারও একটা দাম আছে, তাতে অভিজ্ঞতা চৌকশ এবং পোক্ত হয়। তবে অধ্যাত্মসাধনায় বুদ্ধির চাইতে বোধির উপযোগিতা অনেক বেশী। বুদ্ধি পথের জঞ্জাল সাফ করে দেয় কিন্তু সাধককে এগিয়ে নিয়ে চলে বোধি। বোধি হল চেতনার 'পরে উত্তর শক্তির সেই জ্যোতিঃপ্রপাত যা বুদ্ধিকে উদার জিজ্ঞাসায় সজাগ রাখে, অবিমিশ্র সত্যনিষ্ঠায় তাকে করে নিষ্পক্ষ, তত্ত্বের এষণায় চেতনার ক্রমপ্রসারে আস্থাবান। অধ্যাত্মসাধনায় বোধি-প্রদীপ্ত এই সত্যাগ্রহী বুদ্ধিই শ্রদ্ধেয়।

তেমনি প্রাণ ও হৃদয়কেও শ্রদ্ধার দীক্ষা নিতে হবে নতুন করে। তাদের শ্রদ্ধা থাকবে আত্মস্বরূপে নিগূঢ় আনন্দস্বভাবের প্রতি। আনন্দ সৌরালোকের মত উজ্জ্বল প্রমুক্ত এবং উদার, বাসনার খাদ তার মধ্যে নাই। ব্যাবহারিক

জীবনে সে ফোটে প্রসন্নতার রূপে—যার মাঝে দুরাগ্রহ নাই উদ্‌বেগ নাই, আছে সব কিছুকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করবার কুশলতা। অথচ এটা স্থাণুত্বও নয়। প্রসন্নতা যেন ভোরের আলোর মত, অন্তর্মুখ সমনস্ক চিত্তে তার দীপ্তি উজ্জ্বলতর হয়ে ক্রমে পরিণত হয় প্রগাঢ় আনন্দের বীর্যে যার মধ্যে থাকে আলোক হতে আলোকে উত্তরণের অনিরুদ্ধ সংবেগ।

যে-শ্রদ্ধা পূর্ণযোগের অপরিহার্য সাধন, তার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে ঔদার্য, একদেশদর্শিতার একান্ত অভাব। মন খণ্ডদর্শী, সত্যের একটা দিককে রুচি বা সংস্কারের বশে একান্ত করে তুলে তাকেই সে দেয় পরমের মর্যাদা; আর বিজ্ঞান অখণ্ডদর্শী, অনুভবের সমস্ত বৈচিত্র্যকেই অপক্ষপাতে স্বীকার করে নিয়ে চেতনার বৃহৎ ক্ষেত্রে তাদের সৌষম্য সাধনেই তার তৎপরতা। সত্য যেন আদিত্য দ্যুতির মত, সহস্ররশ্মির সে একটি পুঞ্জ। বিজ্ঞান এই সর্ব-সমাহারী সর্বসমন্বয়ী এককেই চায়। কোনও কিছুকে বাদ না দেওয়া আর কোথাও থেমে না যাওয়া—তার সাধনার এই রীতি। পূর্ণযোগীর শ্রদ্ধা এই বিজ্ঞানের অনুগামী।

*

শ্রদ্ধার শেষ পরিণাম পুরুষোত্তম ও পরমা প্রকৃতির পরিপূর্ণ স্বীকৃতি —আধারের সবখানি দিয়ে। মহাশক্তিতে শ্রদ্ধা অপরিহার্য। আর সে-শ্রদ্ধার মূল হচ্ছে আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধা। কার্পণ্য এবং দৈন্য নিয়ে যোগে প্রবৃত্ত হবার কোনও মানে হয় না। উপনিষদ বলছেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'; গীতায় আছে, অনির্বিণ্ন চিত্ত নিয়ে দৃঢ় নিশ্চয় নিয়ে যোগে প্রবৃত্ত হতে হবে। কিছু হল না, কিছু হবে না—এ-ভাব যোগের পথে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এ-পথে যে এসেছে, বুঝতে হবে সে অনন্য, হাজারের একজন। তার ডাক পড়েছে বলেই সে আসতে পেরেছে। সুতরাং তার 'হবেই হবে'। সমস্ত দুর্যোগের মধ্যে এই অটল প্রত্যয় হল আত্মশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা। কিন্তু শক্তি আমার নয়, তাঁর; ইচ্ছা আমার নয়, তাঁর; সাধনা আমার নয়, তাঁর : এই প্রত্যয় হল মহাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা। চিৎ-প্রকর্ষ যদি প্রকৃতিপরিণামের আইন হয়, একথা যদি সত্য হয় যে উত্তরায়ণের পথে চলাই আমাদের দিব্য নিয়তি, তাহলে যোগের শেষ পরিণাম সম্পর্কে অনিশ্চয়তার আশঙ্কা একেবারেই অযৌক্তিক। সময়ের

ক্ষিপ্রতায় তারতম্য অবশ্যই থাকতে পারে। কালসংক্ষেপ নির্ভর করছে সংবেগের তীব্রতার উপর, তার নির্ভর শ্রদ্ধা ও বীর্যের উপর, তার নির্ভর মহাশক্তির কৃপার উপর। কিন্তু 'তাঁর কৃপা তো সবসময়ই বইছে, তুই পাল তুলে দে না।' পাল তুলে দেওয়ার ভার তিনি দিয়ে রেখেছেন আমার উপর। এইখানে আমার তৎপরতা শ্রদ্ধানির্ভর। শ্রদ্ধার এই মন্ত্র : 'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে।'

হবেই হবে, কেননা আমি আমাকে শ্রদ্ধা করি তাঁকে শ্রদ্ধা করি বলে—যিনি পরম প্রজ্ঞায় মহেশ্বরী, পরমবীর্যে মহাকালী, পরমানন্দের মহালক্ষ্মী, পরম উপায়কৌশল্যে মহাসরস্বতী। তিনি আমার অন্তর্যামিনী, তাঁর চতুর্ব্যূহে বিভূতির বীজ আমার মধ্যে, তাকে অঙ্কুরিত করবার অতন্দ্র তপস্যা তাঁরই। আজ তপঃসিদ্ধির পরম লগ্ন এসে গেছে, তাই আমার মধ্যে অভীপ্সার এই ব্যাকুলতা। অতএব, হবেই হবে।

হবেই হবে, কেননা মহাশক্তি পুরুষোত্তমেরই প্রজ্ঞা বীর্য আনন্দ ও সঙ্কল্পের অবন্ধ সামর্থ্য। আমার আধারে, বিশ্বের পরিবেশে তারা যুগনদ্ধ। আমার মধ্যে বিশ্বের মধ্যে তাঁদের সহস্রদল রূপায়ণই প্রকৃতি-পরিণামের ধ্রুব নিয়তি। আমার শ্রদ্ধায় তারই সূচনা।

১৯

অতিমানসের স্বরূপ

যোগের লক্ষ্য হল পুরুষকে প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের বশ্যতা হতে অকুণ্ঠ প্রজ্ঞা বীর্য ও আনন্দের স্বাতন্ত্র্যে উত্তীর্ণ করে আত্মপ্রকৃতির ঈশ্বর করা। চাই প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর। এতক্ষণ যা বললাম, তা সে-মহাসিদ্ধির ভূমিকামাত্র। তার সার কথা হল আধারের শুদ্ধি, অপরা-প্রকৃতির গ্রন্থিমোচন, বাসনাজর্জর অহংএর ক্ষুব্ধতার জায়গায় বিপুল ও প্রোজ্জ্বল সমত্বের প্রতিষ্ঠা, আর ঈশ্বর-শক্তির আবেশের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ।

এখন প্রশ্ন হবে, মহাশক্তি আধারে কাজ করবেন কোন্ করণকে আশ্রয় করে? মানুষ যখন মনঃপ্রধান, তখন মনকে নিয়েই প্রথম কাজের শুরু হবে, একথা না হয় মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঊর্ধ্বশক্তির আবেশে এবং জারণায় মনকে চিন্ময় করে তুললেও পূর্ণসত্যের সম্যক ধারণা এবং ব্যবহার তার দ্বারা সম্ভব হয় না—তার সামর্থ্যের একটা সীমা আছে বলেই। যেমন সামান্যপ্রত্যয় এবং আত্মসচেতনতার অভাবে পশুর মন কিছুতেই মানুষের মনের ভূমিতে উঠতে পারে না, এক্ষেত্রেও তেমনি একটা দুস্তর বাধা আছে। মন লোকোত্তরের আভাস পেতে পারে, কিন্তু তাকে ধরতে গেলে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। আনন্ত্যের অনুভব তাকে শান্ত সমাহিতিতে স্তব্ধ করে দেয়; কিন্তু সে-অনুভবকে ক্রিয়ায় রূপ দিতে গেলেই তাকে তার নিজের ছাঁচে ঢালতে হয়। তাতে মনের স্বভাবে যে খণ্ডদর্শিতার সংস্কার আছে, তার বৈকল্য তার মধ্যে ফুটে ওঠে। তাই অধরাকে ধরবার জন্য মনের উপর নির্ভর করলে চলে না। মন সিদ্ধির প্রাথমিক প্রস্তুতিটুকুই করে দিতে পারে। কিন্তু তার পরে সাধনার ধারাকে সম্পূর্ণ উলটে দিতে হবে, মনকে সরিয়ে দিয়ে মানসোত্তর শক্তির স্বতঃক্রিয়ার কাছে নিজেকে মেলে ধরতে হবে। সাধনা তখন আর জীবশক্তির নয়, মহাশক্তির।

এই মহাশক্তি অতিমানসী। অতিমানস মনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু তাবলে তো অবাস্তব নয়, কিংবা বোধেরও অতীত নয়। মন অতিমানসেরই বিভূতি; তাই জন্য (derivative) হয়ে জনককে বোঝা তার পক্ষে সম্ভব

নয়। অথচ জনক হতে সে বিযুক্ত নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে অতিমানসের স্বরূপ বুঝতে গেলে মনের সঙ্গে প্রতিতুলনায় বোঝবার চেষ্টা ছাড়া আর-কোনও উপায় নাই। অভিধা (direct affirmation) যেখানে অসমর্থ, সেখানে ব্যঞ্জনার (suggestion) সাহায্য নিতে হয়। তাইতে ভাষার প্রকাশদৈন্যের ন্যূনতা ঘোচে। এদিক দিয়ে মনের একটা বাতায়ন খোলা আছে, এই আমাদের যা ভরসা।

*

অতিমানসের প্রথম লক্ষণ, তার যে-জ্ঞান তা তাদাত্ম্য-বিজ্ঞান। সে যা জানে, তা হয়ে জানে। আর মন যাকে জানে, তাকে তার বাইরে রেখে জানে। মনের জানার মধ্যে তাই আয়াস আছে, অপূর্ণতা আছে, ভুল জানবার সম্ভাবনা আছে। মনের মধ্যে চেতনার দুটি ধারা দেখতে পাই—একটি ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে বইছে বিষয়ের দিকে, আরেকটি ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহৃত করে বইছে ভিতরের দিকে। এই অন্তরাবৃত্ত জ্ঞানের নাম আত্মজ্ঞান, নিজেকে নিজে জানা। এও একধরনের হয়ে জানা, কিন্তু প্রাকৃত মনে এ-জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়— এমনি করে নিজেকে আমরা কতটুকুই-বা জানি। তবুও এই অন্তরাবৃত্ত জ্ঞানের ধারা নিয়ে মন একাগ্র এবং তন্ময় হতে পারে। তখন তার বাইরের জ্ঞান থাকে না, থাকে একটা বিশুদ্ধ বোধমাত্র। মন তাকে পরমার্থ বলে জানে এবং তার তুলনায় বাইরের জ্ঞানকে বলে মিথ্যা। ওই পরমার্থজ্ঞান তাদাত্ম্যজ্ঞানের একটা দিক, কিন্তু অতিমানস জ্ঞানের মত তা সর্বাবগাহী নয়। অতিমানস জ্ঞানে মিথ্যার স্থান নাই। তার মধ্যে অধিষ্ঠানজ্ঞান যেমন সত্য, বিভূতিজ্ঞানও তেমনি সত্য। বিভূতি হল একের বহু হওয়া। হওয়াটা মিথ্যা নয়। মন তাকে মিথ্যা বলে নিজের গরজে—প্রাকৃত দশায় এই বহুর ঝামেলায় সে উদ্‌ব্যস্ত হয়েছিল বলে। তাই সে অধিষ্ঠানকে আঁকড়ে ধ'রে বিভূতিকে প্রত্যাখ্যান করে। অধিষ্ঠানতত্ত্বে পৌঁছেও মনের দ্বৈতসংস্কার যায় না। তাইতে বহুকে বাদ দিয়ে যে নির্বিশেষ অদ্বৈতজ্ঞান, তা একদেশী। তাকে চিন্ময় মনের জ্ঞান বলতে পারি, কিন্তু অতিমানস জ্ঞান বলব না। এ-জ্ঞানে তাদাত্ম্যবোধ বা হয়ে জানা কেবল উজানের দিকেই, ভাটার দিকে নয়—তাই তা সর্বাবগাহী নয়।

অতিমানস জ্ঞান সমগ্র (total)। তত্ত্বের তিনটি বিভাব—ব্যক্তি বিশ্ব এবং

বিশ্বাতীত। আমি আছি এটা খুব স্পষ্ট, আমার মত আরও অনেকে বা অনেক-কিছু আছে, এটাও একরকম স্পষ্ট। কিন্তু আমাকে আর বিশ্বকে ছাপিয়ে অথচ তাকে আবিষ্ট করে আছে এক আনন্ত্য, এটা প্রাকৃত মনের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। অতিমানস জ্ঞানে এই তিনটিই সমান স্পষ্ট এবং তিনটির মাঝে এক অবিনাভূত (inseparable) ওতপ্রোততার সম্পর্ক। বিশ্বাতীত আনন্ত্য অধিষ্ঠানরূপে তার কাছে যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি তার অনন্ত বিভূতি-বিস্তরের বীর্য এবং উল্লাসও প্রত্যক্ষ, আবার ব্যক্তিতে দুয়ের ঘনীভাবও সমান প্রত্যক্ষ। যদি ব্যক্তির দিক থেকে এই জ্ঞানের বিবৃতি দিতে যাই, তাহলে বলতে পারি, তার মধ্যে আত্মবোধ তীক্ষ্ণতম ইন্দ্রিয়বোধের চাইতেও সুস্পষ্ট; আবার আত্মবোধেরই মত সুস্পষ্ট বিশ্বের ভূতে-ভূতে বিভাবিত আত্মভাবের বোধ; তেমনি সুস্পষ্ট আনন্ত্যে নিথর বিশ্বাতীততার অন্তর্গূঢ় সামর্থ্যের বোধ। এমনি করে যেদিক দিয়েই ধরি না কেন, পাই একটি অখণ্ড বোধের অন্যোন্য-সঙ্গত ত্রিপুটী। কিন্তু প্রাকৃত মনের ইন্দ্রিয়বোধ সুস্পষ্ট হলেও অন্তরাবৃত্তির অভাবে আত্মবোধ অত্যন্ত আবছা। অপরকে আপন বলে জানার মধ্যে কখনও-কখনও একটা উত্তলতা দেখা দিলেও তার ব্যাপ্তি নাই, স্থায়িত্বও নাই। আর বিশ্বাতীতের সম্পর্কে তার তো কোন মাথাব্যথাই নাই। এই মন যখন যোগের পথ ধরে, তখন গোড়াতে বাধ্য হয়ে তাকে প্রাকৃত ভাবনা হতে বিবিক্ত হতে হয়। বিবেক আর তীব্রসংবেগ নিয়ে সে ঝাঁপ দেয় বিশ্বাতীতের মধ্যে, আর নিজেকে সেখানে হারিয়ে ফেলে। মন যখন থাকে না, তখন মনোময় বিশ্বও থাকে না—আর এ-বিশ্ব ছাড়া অন্য-কোনও বিশ্বের খবরও তার জানা নাই। কাজেই তখনকার অনুভব : ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ও জীব দুইই মিথ্যা। খণ্ডদর্শী মন প্রাকৃত ভূমিতে বিশ্বের বা ব্যক্তির অনুভবকে খাড়া করেছে টুকরা-টুকরা অনুভব জোড়া দিয়ে। সে-অনুভবের মধ্যে যেমন সংহতি নাই, তেমনি স্পষ্টতাও নাই। ব্রহ্মানুভূতির 'পরেও জগৎ আর জীব সম্পর্কে এই আবছা অনুভব তার থেকে যেতে পারে। তখন বলতে হয়, তার পরমার্থের জ্ঞান তাকে সর্বশূন্য বিনাশের চেহারাটাই দেখিয়েছে, সর্বসম্ভূতির বীর্য এবং উল্লাস তাথেকে বাদ পড়ে গেছে।

অতিমানস জ্ঞানের তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে তার ঋতচেতনার (truth-consciousness) অপরোক্ষতা। এটি হয়ে জানার অঙ্গীভূত ব্যাপার। ধরা যাক, একটা গাছ বীজ হতে অঙ্কুরিত হয়ে ডাল-পাতা মেলে ফুল ফুটিয়ে ফল ফলিয়ে ফুরিয়ে গেল। তার এই হওয়ার আদি-অন্ত ইতিহাসটা আমরা

দেখতে পাই, তেমনি করে হওয়ার প্রতিমুহূর্তে সেও যদি তাকে জানতে পারত, বীজের মধ্যেই যদি সে ফলের পরিণামকে প্রত্যক্ষ করতে পারত! অতিমানস জ্ঞানের হচ্ছে এই ধরন, সে একটা সিদ্ধভাবের নিত্যচেতন রূপায়ণ। জ্ঞান সেখানে আহরণ করতে হয় না বাইরে থেকে, ভিতর থেকে তা স্ফুরিত হয়। এমন-কি আমাদের দৃষ্টিতে যা অবিদ্যা, তাও তার মধ্যে বিদ্যার স্বেচ্ছাকৃত সঙ্কোচ, অতএব তা বিদ্যারই বিলাস—যেমন বিভিন্ন ভূমিকায় নটের আত্ম-রূপায়ণ। মনের জ্ঞানের ধারা তার বিপরীত। সে অবিদ্যা হতে বিদ্যার দিকে চলছে হাতড়ে-হাতড়ে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান তার কাছে প্রত্যক্ষ, কিন্তু তাও তো বস্তুর মর্মসত্যের জ্ঞান নয়। তাছাড়া বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগের কারচুপিতে সে-প্রত্যক্ষও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে পারে। তেমনি তার আন্তরজ্ঞানের প্রত্যক্ষতাও অপূর্ণ : নিজের মনকেও যে আমরা কত সময় ভুল বুঝি তার ঠিক নাই। ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশেষের প্রত্যক্ষ হতে পারে, কিন্তু সামান্যকে জানতে গেলেই মনকে অনুমান আশ্রয় করতে হয়, যার মধ্যে প্রত্যক্ষের নিশ্চয়তা অবশ্যম্ভাবী নয়। বিশেষে সামান্যে আত্মায়-অনাত্মায় জ্ঞানের যে-প্রকারভেদ, তা মনেই আছে—অতিমানসে নাই। সেখানে সব বোধই আত্মবোধ, অনাত্মবোধ তার বিভূতি; সামান্যের প্রত্যক্ষ হতে সেখানে বিশেষের প্রত্যক্ষের উৎসারণ।

অতিমানসের চতুর্থ লক্ষণ হল, তার মধ্যে জ্ঞান আর সঙ্কল্পের কোনও বিরোধ বা ব্যবধান নাই। বেদের ভাষায় সে 'কবি-ক্রতু (Sree-Will), উপনিষদের ভাষায় 'জ্ঞানময়ং তপঃ।' যেমন কবির কাব্যসৃষ্টি—যা তাঁর আত্ম-চেতনারই উল্লাস। এখানে অবশ্য সৃষ্টি ভাবের; কিন্তু অতিমানসের মধ্যে বস্তুসৃষ্টিও হচ্ছে এই ভাবেরই উল্লাসে—বস্তু সেখানে স্বরূপত চিদ্ঘনবিগ্রহ। এও সেই হওয়ারই ধর্ম। ব্রহ্ম সব-কিছু হচ্ছেন, তাঁর এই হওয়ার উল্লাসে জানা আর হওয়ার মাঝে কোনও বিরোধ বা ব্যবধান নাই—বিশ্বাতীত হতে বিশ্ব-ভূত পর্যন্ত। এরই প্রাচীন নাম বিসৃষ্টি বা আত্মোৎসারণ। মনের মধ্যে এই সামর্থ্য সঙ্কুচিত। আমরা যা ভাবি, তা ঘটাতে পারি না সবসময়—যদিও তার জন্য তোড়জোড় আর চেষ্টার আমাদের অন্ত নাই। তার চাইতেও বড় কথা, আমরা যা ভাবি, তা হতেও পারি না। কি হতে হবে তা জানা আছে, কিন্তু সঙ্কল্পের হয়তো জোর নাই, অথবা সঙ্কল্পে-সঙ্কল্পে দেহে-প্রাণে-মনে রয়েছে নানা টানাহ্যাঁচড়া। জ্ঞান এখানে সত্য এবং পূর্ণ নয় বলে সঙ্কল্পও পঙ্গু।

*

অতিমানস পরমপুরুষের প্রজ্ঞাবীর্য, তাঁর 'জ্ঞানময়ং তপঃ'। এই চিন্ময় তপঃশক্তিতে তাঁর ধাপে-ধাপে নেমে আসা নিজেকে নিগূহিত করতে-করতে। তা-ই তাঁর আত্মবিসৃষ্টি। স্বধামে তাঁর অতিমানস স্বরূপশক্তির হিরণ্যচ্ছটা, অখণ্ড সৎ-চিৎ-আনন্দের অকুণ্ঠ বিলসন। তারপর সেই শক্তিই মানসোত্তর নানা ভূমির ভিতর দিয়ে নেমে এসেছে আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় প্রাণ ও দেহের আকারে—অবশেষে জড়ত্বের অমানিশায় তার চেতনা যেন মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। অথচ এই অবরোহের প্রতি পর্বে সে-শক্তি চিদ্‌বীর্যের স্বরূপযোগ্যতা (potentiality)-রূপে অক্ষুণ্নই রয়েছে, আর তাইতে অবরোহের সঙ্গে-সঙ্গে রয়েছে আরোহের একটা নিগূঢ় প্রবেগ, যা আমাদের মনে ধরেছে অভীপ্সার রূপ। অবরোহে স্ব-রূপ বি-রূপ হয়েছে দুই অর্থে : যখন অবিদ্যামানসের ভিতর দিয়ে দেখি, তখন বি-রূপ বিকৃতি; আবার বিদ্যামানসের ভিতর দিয়ে তার মধ্যে দেখি বৈচিত্র্য। যে-সৌরালোক কয়লার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, অকল্পনীয় চাপের ফলে সে-ই আবার হীরা হয়ে ঝলসে ওঠে। বিদ্যার দৃষ্টিতে জড়ও চিদ্‌বিলাস।

ব্রহ্মই যদি সব হয়ে থাকেন, আর অতিমানস যদি হয় ব্রহ্মশক্তি, তাহলে স্বীকার করতে হয়, অতিমানসের ক্রিয়া সর্বত্রই চলছে। বিশ্বে শক্তির ক্রিয়ার আমরা দুটি রূপ দেখতে পাই—একটি অব্যবস্থিত, আরেকটি ব্যবস্থিত। ক্রিয়া যেখানে অব্যবস্থিত, সেখানে অন্যোন্যসংঘর্ষ আর জবরদস্তির ভাব প্রবল—একটা-কিছু ঘটাতে হলে সেখানে জোর করে ঘটাতে হয়। আমাদের মন-বুদ্ধি অনেকজায়গায় এমনি করে অব্যবস্থারও মধ্যে ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। আবার বহুজায়গায় দেখি ব্যবস্থিত ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত—যেমন ইতরপ্রাণীর সহজাত-প্রবৃত্তিতে, প্রাণ-মনের প্রকৃতিতে, এমন-কি জড়জগতের নিয়মে। ব্যবস্থায় বুদ্ধির পরিচয়। যেমন ব্যক্তির জীবনব্যবস্থার মূলে ব্যক্তির বুদ্ধি, তেমনি বিশ্বব্যবস্থার মূলে বিশ্ববুদ্ধি—অথবা অতিমানসের নিগূঢ় ক্রিয়া। ব্যক্তির বুদ্ধির পিছনে রয়েছে সঙ্কীর্ণ ইষ্টসিদ্ধির প্ররোচনা। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের পিছনে যে-বুদ্ধি—অথবা বুদ্ধি না বলে তাকে সম্বোধি বলাই ভাল, কেননা তার জাত আলাদা—তার আত্মস্ফূর্তির উল্লাস ছাড়া আর-কোনও ইষ্ট থাকতে পারে না। আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টিতে অব্যবস্থা আর ব্যবস্থাতে যে-দ্বন্দ্ব, এখানে তার সমাধান হয়েছে : অব্যবস্থাও এখানে উল্লাসের অঙ্গীভূত। শক্তির মধ্যে ক্ষোভ না জাগলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য ফুটতে পারে

না। অব্যবস্থা সেই ক্ষোভের ফল। কিন্তু তাকে ঋতচ্ছন্দে ফিরিয়ে আনবার তপস্যা ভিতরে-ভিতরে চলছেই। তা-ই সর্বব্যাপ্ত সর্বানুস্যূত ব্রহ্মের 'জ্ঞানময়ং তপঃ,' কেননা ছন্দ আনতে পারে জ্ঞানই। মন-বুদ্ধি দিয়ে এ-তপস্যার হিসাব কষা যায় না, তাই এ অতিমানস।

মন-বুদ্ধির জ্ঞানে ও কর্মে আয়াস আছে; কিন্তু অতিমানসে আয়াস নাই, তার জ্ঞান ও কর্ম স্বতঃস্ফূর্ত। আমাদের অবরপ্রকৃতিতেও এমনিতর স্বতঃস্ফূর্ততা আছে, তা অতিমানসের অব্যক্ত ক্রিয়া—একথা বলেছি। কিন্তু আমাদের ব্যক্তচেতনাতেও জ্ঞান আর কর্মের একধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা মাঝে-মাঝে দেখা দেয়, যাকে আমরা নাম দিই বোধি (intuition) এবং প্রেরণা (inspiration)। এগুলিকে ইতরপ্রাণীর সহজাত জ্ঞান ও প্রবৃত্তির কোঠায় ফেলা যায় না দুই কারণে : প্রথমত এরা আত্মসচেতন, ইতরপ্রাণীর সহজসংস্কার তা নয়। দ্বিতীয়ত, ইতরপ্রাণীর সহজসংস্কার নৈশ্চিত্যে এবং নৈপুণ্যে অনেকসময় মানুষের মন-বুদ্ধিকে হার মানালেও তার পরিধি সঙ্কীর্ণ, নতুন পরিবেশে তা একেবারেই অকর্মণ্য। কিন্তু মানুষের বোধি নিয়ে আসে চিৎ-শক্তির স্বচ্ছন্দ প্রসারের ইশারা। আত্মসচেতনতা ও চিৎপ্রকর্ষ এই দুই দিক দিয়ে মানুষ এগিয়ে যাবে বলেই পশুর সহজসংস্কারের ঋদ্ধিকে তার ছেড়ে আসতে হয়েছে।

প্রাকৃত মন-বুদ্ধি আর অতিমানসের মাঝে আমরা তাহলে সেতুস্বরূপে পেলাম বোধিকে। তাকে ধরেই আমরা অতিমানসে পৌঁছতে পারব; তাই এখন তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। বোধির প্রসঙ্গ তোলবার আগে একটি কথা বলে রাখি, যে-অতিমানস পুরুষোত্তমের স্বরূপশক্তি আর পূর্ণযোগের সাধনায় যে-অতিমানস জীবের মধ্যে স্ফূর্ত হবে, তত্ত্বত দুটি এক হলেও সামর্থ্যে কিন্তু তারা এক হবে না; কেননা নিত্যজীবের জীবত্বকে আশ্রয় করে তার মধ্যে পুরুষোত্তমের স্বরূপশক্তির উন্মেষ হবে, সুতরাং তার একটা স্বারসিক বৈশিষ্ট্য থাকবেই।

২০

বোধি-মানস

অতিমানস পুরুষোত্তমের স্বরূপশক্তি, বিশ্ব সেই শক্তির বিসৃষ্টি। সুতরাং অতিমানস সর্বত্র অনুস্যূত, আমাদের মধ্যেও তার ক্রিয়া চলছে আড়াল থেকে। তার অস্ফুট প্রেরণাকে প্রস্ফুট প্রজ্ঞাবীর্যে রূপান্তরিত করাই হল পূর্ণযোগের লক্ষ্য। আমাদের প্রাকৃত চেতনার দৌড় মন পর্যন্ত। কিন্তু মন দিয়ে অতিমানসের নাগাল কখনও পাওয়া যায় না। বাঁচোয়া এই, মনের মধ্যে যেমন রয়েছে নিজেকে ছাপিয়ে যাবার একটা তাগিদ, তেমনি আধারের উপরে রয়েছে নিরন্তর ঊর্ধ্বশক্তির একটা চাপ। অভীপ্সা আর শক্তিপাত দুয়ের সমবায়ে আমাদের সাধনা।

প্রথম মনের সহায়েই সাধনা করে যেতে হবে যতদূর সম্ভব। সমত্ব আর বীর্য সে-সাধনার লক্ষ্য, তাদের কথা সবিস্তারে আগেই বলেছি। এ হল পূর্ণযোগের প্রস্তুতির পর্ব এবং এ অপরিহার্য। তারপর তার তৃতীয় অঙ্গ চেতনার উত্তরণ। মনকে ছাপিয়ে পৌঁছতে হবে অতিমানসে এবং তার দ্বারা ঘটাতে হবে আধারের রূপান্তর। মন আর অতিমানসের মাঝে সেতু হল বোধি। এখন তার কথাই বলব।

বোধির প্রধান লক্ষণ হল জ্ঞান ও ক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ততা। এটি মনের মধ্যে সহজ নয়। যা অতীন্দ্রিয়, মন তার সম্বন্ধে অনুমান করে। সে-অনুমানে প্রত্যয়ের নিশ্চয়তা সবসময় থাকে না। বুদ্ধির সামান্যপ্রত্যয়ে একটা নিশ্চয়তা আছে; কিন্তু তা আবছা। ইন্দ্রিয়সংবিতের তীক্ষ্ণতা তার মধ্যে নাই। মন এবং বুদ্ধির এই ন্যূনতা বোধির মধ্যে নাই। অতীন্দ্রিয় বিশেষ ও সামান্যকে ইন্দ্রিয়সংবিতের মতই সে প্রত্যক্ষ করতে পারে। যোগের ভাষায় এ-সংবিৎকে বলে প্রাতিভ-সংবিৎ—'প্রাতিভ' কি না যা অনায়াসে প্রতিভাত হয় বিদ্যুৎঝলকের মত।

আমাদের প্রাকৃত মনশ্চেতনার উপর এই বোধি মাঝে-মাঝে ঝলক হানে। আমরা চলতি কথায় বলি, 'মন ডাকছে'। এটা ইন্দ্রিয়জ্ঞান এবং অনুমানের বাইরে একটা অলৌকিক আভাস। মনের মেঘ চিৎসূর্যকে যেন আড়াল করে রেখেছে। সেই মেঘ চুঁইয়ে ওপারের আলো এপারে পড়ছে, কখনও-কখনও

মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে ঝলসে উঠছে। এই হল বোধির ক্রিয়া—চেতনার একটা নতুন শক্তির উন্মেষের উদ্যত সম্ভাবনা।

কিন্তু মনের ভূমিতে এসে বোধি বিকৃত হয়ে যায়। সত্যের যে শুভ্র আভাস সে মনের কাছে নিয়ে আসে, মন তার উপরে আপন রং চড়ায়—কখনও গাঢ় কখনও বা ফিকা ক'রে। যোগের সমস্যা হল, কি করে বোধির উদ্ভাসকে বিশুদ্ধ রাখা যেতে পারে, কি করে মনকেই বোধিধর্মা করে তোলা যায়। তার চারটি উপায় আছে। একে-একে তাদের কথা বলছি।

*

একটি উপায় হচ্ছে নিরোধ—প্রাকৃত চিত্তের সমস্ত বৃত্তিকে খুশিমত স্তব্ধ করে দেওয়া। এটি দুউপায়ে করা যেতে পারে : একটি হল চিত্তের জোরেই চিত্তের মধ্যে কোনও বৃত্তি উঠতে না দেওয়া, যেমন কোনও বিষয়ে নিবিষ্ট হবার সময় আমরা করে থাকি; আরেকটি হল কোনও নিস্তরঙ্গ ভাবনার আবেশকে ধারাসারে চিত্তের উপর ঝরতে দেওয়া। বিশ্বের সর্বত্র সত্তার দুটি বিভাব যুগনদ্ধ হয়ে আছে—একটি শান্ত, আরেকটি উল্লসিত। আমাদের চিত্তেরও এক ভাগ স্বভাবত নিস্তরঙ্গ, আরেক ভাগে কেবল তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠছে। এই দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় বেশী ঘনিষ্ঠ, কেননা এইটি আমাদের জাগ্রতের কর্ম এবং ভাবনার জগৎ। কিন্তু জাগ্রতের পিছনেই আছে সুপ্তির উদ্যতি, কর্মের পিছনেই বিশ্রামের। তারা পর্যায়ক্রমে আছে—এ হল মনের খণ্ডদৃষ্টি; আছে যুগপৎ, জাগ্রতের স্পন্দকে ধারণ করেই তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে নিথরতা—এই হল বোধির অখণ্ড দৃষ্টি। এই জাগ্রতের মধ্যেই ক্বচিৎ-কখনও মন ফাঁকা হয়ে যায়; বিশ্রান্তির একটা অতল আকর্ষণে প্রযত্ন শিথিল হয়ে আসে; জ্যোতির্ময় প্রাণতরঙ্গের পিছনে দৃষ্টির সামনে সহসা জেগে ওঠে আকাশের নিস্তব্ধ প্রশান্তি। নিবৃত্তির এই স্বর্ণ-মুহূর্তগুলিকে তিলে-তিলে সক্রিয় করে নিরোধের একটা সংস্কার গড়ে তুলতে হয় চেতনায়। প্রত্যাহার (withdrawal) বা আবেশ দুটি উপায়কে পর্যায়-ক্রমে বা যুগপৎ ব্যবহার করা যেতে পারে। সবচাইতে ভাল হল কোন-একটা উপায়কে একান্তভাবে আঁকড়ে না ধরে মহাশক্তির দেশনার কাছে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া—তিনি যখন যে-উপায়ে সাধ্যবস্তুকে চেতনার গোচর করে তোলেন। আমার

শুধু আকাশে হৃদয় মেলে দিয়ে প্রতিমুহূর্তে স্বচ্ছন্দ প্রতীক্ষায় সজাগ থাকা।

স্তব্ধতায় অহং-এর প্ররোচনা শান্ত হয়ে যায়, অনন্তের সঙ্গে আমরা যোগযুক্ত হই। স্বরূপকে বিরূপ, প্রকৃতিকে বিকৃত, ঋতকে অনৃত করে এই অহং। তার কর্তৃত্ব লোপ পেলে আমার মধ্যে নিঃশব্দে স্ফুরিত হয় তাঁর হওয়া। তখন আর বুদ্ধির বিক্ষেপে হাবুডুবু খাওয়া নয়, বোধের স্রোতে ভেসে চলা। কাজটা যে সহজ তা নয়; অহং কিছুতেই তার দখল ছাড়তে চায় না। কিন্তু তাকে মোটেই আমল দিতে নাই—এই হল সাধনার নেতির দিক। আর ইতির দিক হল, সান্তের যত বুদ্‌বুদ্‌ তাদের অনন্তের সমুদ্রে মিলিয়ে দেওয়া সবসময়।

দ্বিতীয় উপায় হল, অন্তর্যামীর কাছে আত্মসমর্পণ। তিনি বোধস্বরূপ, তাঁর বোধেই আমার বোধ। তিনি আছেন হৃদয়ে, ভাবের রাজা হয়ে। আমার সব ভাব ধাবিত হবে তাঁর প্রতি, তাঁকে ছুঁয়ে সোনা হয়ে তারা আবার ফিরে আসবে আমার জগতে। জীবন হবে যেন তাঁরই নিঃশ্বাসে লহরিত বাঁশির সুর। তখন অহং কার?—না, তাঁর। বুদ্ধি তখন বোধির যন্ত্র, বোধিতে তাঁরই বোধের স্ফুরণ।

বোধিকে জাগাবার তৃতীয় উপায় হল মূর্ধন্যভূমিতে, যোগের ভাষায় 'শিরসি সহস্রারে' চেতনাকে সবসময় তুলে রাখা। মাথার উপরে আকাশ, সেই আকাশে জ্বলছে চিৎসূর্য। তারই প্রতিরূপ আমার মূর্ধন্যচেতনা। ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প আসছে আমার অহন্তার কেন্দ্র হতে নয়, আমার সঙ্কুচিত চেতনাকে নিঙ্‌ড়ে নয়; আসছে মহাশূন্য হতে সহস্ররশ্মি আদিত্যদ্যুতির বিচ্ছুরণ হয়ে। বুদ্ধি মন মস্তিষ্ক সে-বিচ্ছুরণকে ধারণ করবার যন্ত্র মাত্র। এই স্থূল আধারের গভীরে আছে এক সূক্ষ্ম আধার—জ্যোতির্বাষ্পময় এক শক্তিস্পন্দনের ক্ষেত্র। চেতনার তরঙ্গ উঠছে তারই মধ্যে, আর ওই আদিত্যলোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যোগ। শক্তি ধারাসারে নামছে সেইখান থেকে, আর আধার তাতে প্লাবিত হচ্ছে। তখন আর অহংএর কর্তৃত্ব নয়, মহাশক্তির দেশনা।

চতুর্থ উপায় হচ্ছে বুদ্ধিকে স্তব্ধ না করে তাকে আরও উদ্দীপ্ত এবং সমর্থ করে তোলা। তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন বুদ্ধির শুদ্ধি, তার কথা আগেই বলেছি। প্রাকৃত বুদ্ধি গুণময়, সে মনের তাঁবেদার। মন ইন্দ্রিয়নির্ভর, জীবনের বাইরের দিকটা নিয়ে সে মেতে আছে। বুদ্ধিকে সে খাটায় সেই প্রয়োজনে। বুদ্ধিমান মানুষ বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কবি শিল্পী মনস্বী কর্মী কত-কিছুই হয়, কিন্তু যোগী হতে পারে না। যোগী হতে হলে অন্তরাবৃত্ত হতে হয়, বুদ্ধির প্রধান সম্বল যে-সামান্যপ্রত্যয়, তা দিয়ে আত্মার ধারণাকে

শুদ্ধ করতে হয়। জ্ঞানযোগীরা সাধারণত এই পথ ধরেন। আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির উদার ভাস্বরতা তখন বোধিকে চেতনায় উদ্দীপ্ত করে তোলে।

চারটি উপায়কে স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে সাধনা করা যেতে পারে এবং তা-ই করা উচিত, কেননা অখণ্ড প্রকৃতির একেকটি প্রবৃত্তির উপর একেকটি উপায়ের নির্ভর বলে তারা স্বভাবতই পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। উপায়গুলির মধ্যে যে ধরা-বাঁধা কোনও ক্রম আছে তাও নয়। যে-কোনও উপায় আমরা অবলম্বন করি না কেন, বোধির প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকের বেলায় অতিমানসের শক্তিপাত একান্ত আবশ্যক। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন বোধিকে আমরা বিশুদ্ধরূপে পাব না, প্রাকৃত মনের কিছু-না-কিছু ভেজাল তার মধ্যে থাকবেই।

*

বোধির প্রতিষ্ঠা অতিমানস স্ফুরণের ভূমিকা মাত্র। তার মুখ্য পরিণাম হল চিত্তের ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প ও যুক্তির সকল ব্যাপ্রিয়ার (function) মধ্যে একটা জ্যোতির্ময় স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রসন্ন সামর্থ্যের আবেশ—যা নাকি বোধি-চেতনার বৈশিষ্ট্য। কোথাও তখন কুণ্ঠা প্রমাদ অনিশ্চয়তা আবিলতা বা নিরানন্দের কিছুই থাকবে না। এমন-কি বোধির জ্যোতির্ঘন প্রমুক্ত উল্লাস সঞ্চারিত হবে প্রাণে ইন্দ্রিয়ে এবং দেহেও। কখনও কখনও অপ্রত্যাশিতপূর্ব প্রাতিভ সংবিৎ ও শক্তির স্ফুরণ হবে আধারে।

অতিমানস হল সত্য ও ঋতের স্বয়ংজ্যোতিঃ, তার সামর্থ্য সর্বত্র অকুণ্ঠ। কিন্তু বোধিমানস তার বিভূতি ও প্রতিবিম্ব মাত্র, তাই তার সামর্থ্যের একটা সীমা আছে। অতিমানসের সাক্ষাৎ করণরূপে সেও অবশ্যই অকুণ্ঠ, কিন্তু মানসচেতনার উপর যখন সে কাজ করে তখন অতিমানসের শক্তিপাত না হওয়া পর্যন্ত তারও ব্যাপ্রিয়ার মধ্যে কুণ্ঠা দেখা দিতে পারে। তার তিনটি পরিচয়: বোধি এবং প্রাকৃত মনের ব্যামিশ্রতা, বোধির অলব্ধভূমিকত্ব (unstability) এবং তার ফলে প্রাক্তন সংস্কারের পুনরাবির্ভাব এবং বোধির আবেশে চেতনার প্রসারহেতু ব্যক্তিমনের বাইরে বিশ্বমন হতে নানা অবাঞ্ছিত উপাদানের অনুপ্রবেশ। সাধককে এর প্রত্যেকের সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। শক্তির অচল প্রতিষ্ঠা এবং আধারের সম্পূর্ণ রূপান্তর না হওয়া পর্যন্ত যোগসম্পদ ভোগের জন্য কোথাও আরামশয়ন পাতলে তার চলবে না।

২১

অতিমানসের সোপানাবলী

বোধিতে থাকার অর্থ হল এক আনন্দচিন্ময় অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা নিরন্তর আবিষ্ট থাকা এবং তার প্রেষণায় প্রাকৃত সত্ত্বের তিলে-তিলে রূপান্তরকে প্রতিনিয়ত অনুভব করা। এ-আবেশ আত্মবিস্মরণ নয়, আত্মবিস্ফোরণ। মনের মেঘের উপর এসে পড়েছে সূর্যের আলো, কালো মেঘ আলো হয়ে উঠেছে। এই যেন বোধিমানসের ছবি। আলো যদি সরে যায়, মেঘ আবার কালো হয়ে যাবে। আলো পেলে আবার আলো হয়ে উঠবে। কিন্তু এরই মধ্যে আলোর ছোঁয়ার মেঘ গলতে আরম্ভ করেছে। গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে কি? না, রূপান্তরিত হচ্ছে আলোতে। মেঘ বলে কিছু থাকছে না, সবই আলো। ফাঁকার আলো নয়, চাপ বাঁধা জমাট আলো—সূর্যের মত। এই যেন অতিমানসের ছবি। উপমায় খুঁত থেকে গেল। কিন্তু অনুপমকে উপমার খাপে পোরা যায় কখনও? উপমা এখানে একটা ইশারা মাত্র।

সর্বব্যাপী সর্বাবগাহী সর্বাতীত এক পরম সত্তা চৈতন্য এবং আনন্দ। অথবা তারই ঘনবিগ্রহ এক পুরুষ। মন তার খানিকটা আভাস পেয়েছিল। যেন অনেক দূরের এক নীহারিকা—বৃহৎ নিশ্চয়, কিন্তু আবছা। তারই মধ্যে মন ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে ওঠে। ঘুমের মধ্যে একটা-কিছু যেন পেয়েছিল—খুবই কাছে, খুবই গভীর করে। জেগে উঠে দেখে, তার ছাপ রয়ে গেছে। কি তা, বোঝাতে পারে না। কিন্তু বোধের অতীত বোধ দিয়ে বোঝে, তার মত সত্য আর কিছুই নাই। বারবার ছাপ পড়ে। আভাস ক্রমে সুভাস হয়ে ওঠে। যা ছিল প্রতীক, তা হয় প্রতিমা। ক্রমে সুভাস জ্বলে ওঠে প্রভাসে, প্রতিমা প্রাণ পেয়ে দেবতা হয়ে ওঠে। তখন সবই দেবময়, মনও দেবতা। অতিমানস, বোধিমানস আর মন। মনকে নিয়ে তখন বোধিমানসের খেলা। তাতে তার পুষ্টি, মনের রূপান্তর।

প্রাকৃত মনের উজানে ছিল বুদ্ধি, যার মধ্যে মনের মুক্তি। মনের কারবার ছিল বিশেষকে নিয়ে, আর বুদ্ধির কারবার সামান্যকে নিয়ে। সামান্যপ্রত্যয়ের উদার ব্যাপ্তি আছে, স্বাতন্ত্র্যের সাবলীলতা আছে; বিশেষকে তা শাসন করে

—এইখানে বুদ্ধির সার্থকতা। বোধির আবেশে মনের রূপান্তর ঘটতে থাকে যখন, তখন তারও মধ্যে থেকে উন্মেষিত হয় এক দিব্য বুদ্ধি—অতিমানসের এক সার্থক কারণ। তার কথা পরে বলছি।

উত্তরায়ণের পথে এমনি ধাপের পর ধাপ রয়েছে। তাদের খবর রাখা দরকার, তাদের মধ্যে তফাত করতেও শিখতে হয়। তাতে প্রাপ্তি সম্পূর্ণ এবং সুস্থির হয়। নইলে অনভিজ্ঞ মন নিজের নাগালের বাইরের একটা-কিছুকে পেয়েই ভাবতে পারে, সব পেয়েছি।

*

বোধিমানসের চারটি বৃত্তি—আভাসন (suggestion), বিবেচন (discrimination), প্রস্ফুরণ বা উদ্দীপন (inspiration) এবং রূপায়ণ বা প্রকাশন (revelation)। প্রথম দুটি বৃত্তি অপরা (lower), পরের দুটি পরা (higher)। তারা জোড়ায়-জোড়ায় কাজ করে। সব জুড়ে রয়েছে আভাসের প্রভাস হওয়ার ব্যাপার। অনুরূপ ব্যাপ্রিয়া বুদ্ধিরও আছে : বুদ্ধিও মনের ভাবনার মধ্যে একটা অভাবনীয় অর্থ আবিষ্কার ক'রে ক্ষিপ্রগতিতে তাকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত কল্পরূপ দিয়ে আন্তর প্রত্যক্ষের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে এবং দানাবাঁধা সেই ভাবনাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মত ক'রে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির এই ব্যাপ্রিয়ার সঙ্গে বোধিমানসের ব্যাপ্রিয়ার আকাশ-পাতাল তফাত। বুদ্ধি তার ভাবনার উপাদান আহরণ করে মন থেকে, মন করে ইন্দ্রিয়সংবিৎ থেকে। ইন্দ্রিয়সংবিতের স্পষ্টতা থাকলেও তা উপরভাসা এবং একদেশদর্শী, বস্তুর মর্মসত্যকে প্রত্যক্ষ করবার সাধ্য তার নাই। সবচাইতে বড় কথা, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন-বুদ্ধি বিষয়কে বাইরে রেখেই জানে, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে নয়। তাদের জ্ঞান আহরণমাত্র, উৎসারণ নয়। তাই তার মধ্যে নিশ্চয়তার অভাব থেকেই যায়। বোধির ক্রিয়া এর সম্পূর্ণ বিপরীত! বস্তুর তত্ত্বকে জানবার জন্য আলো-আঁধারির মধ্যে তাকে বাইরে-বাইরে হাতড়াতে হয় না, বিদ্যুৎঝলকের মত তা আপনি তার অন্তর হতে উৎসারিত হয়। সে-উৎসারণ মন-বুদ্ধির কাছে একটা উদ্ভাস, তাদের প্রত্যক্ষের মধ্যে যেন একটা নতুন ব্যঞ্জনার ঝলক। কিন্তু এখানেও মন-বুদ্ধির গতি হল আরোহধারায় —বস্তু থেকে ভাবের দিকে তারা হাত বাড়ায়, তাকে যেন ছুঁই-ছুঁই করে।

কিন্তু বোধির গতি অবরোহধারায়—বস্তু তার মধ্যে ভাবেরই প্রতিবিম্ব, ভাবের অবিসংবাদিত প্রত্যক্ষের একটা নিদর্শন হল বস্তু। ভাবের সঙ্গে একাত্মতা আছে বলে বস্তুর ব্যঞ্জনা-বৈচিত্র্যে সে অনুভব করে আত্মবিভূতিরই উল্লাস, মন-বুদ্ধির মত তাইতে তার মধ্যে সে দিশাহারা হয়ে যায় না।

বোধির আভাসন হল আত্মগত কোন-একটা সত্যের প্রত্যভিজ্ঞা (recognition), নিগূঢ় কোনও ধ্রুবা স্মৃতির একটা উদ্ভাস। একাধারে তা ভাব এবং বস্তু। তারপর আসে বিবেচন, যা সত্যের এই নীহারিকাকে একটা নিরূপিত আকার দিয়ে অপরের সঙ্গে সুসম্বন্ধ করে এবং তাকে পরিস্রুত করে মনের মালিন্য হতে নির্মুক্ত করে। তারপর উদ্দীপন তাকে দিব্যশ্রুতির সহায়ে অন্তরাকাশে বাঙ্ময় করে তোলে এবং অবশেষে রূপায়ণ তাকে চিন্ময় প্রত্যক্ষ-দৃষ্টির গোচর করে। বোধির বিবৃতি দিতে গিয়ে বাধ্য হয়ে ইন্দ্রিয়মানসের ভাষায় কথা কইতে হল, কিন্তু তাছাড়া উপায়ও নাই। মনের কাছে ভাব আবছা আর বস্তু স্পষ্ট, কিন্তু বোধিতে ভাব বস্তুর মতই স্পষ্ট—অনুভবের চিদ্ঘনতার এই সূত্রটি হয়তো বোধির স্বরূপ বুঝতে কিছুটা সাহায্য করবে।

আভাসন আর বিবেচন পরস্পরের আপূরক হলেই তবে বোধিমানসের ক্রিয়া সুষ্ঠু হতে পারে। শুধু আভাসনের ভিতর দিয়ে সত্যের অনুভব ঝলকে-ঝলকে নেমে আসতে পারে, কিন্তু বিবেচনের অভাবে তারা একটা বিশুদ্ধ এবং সুসঙ্গত রূপ ধরতে পারে না। সাধনার গোড়ার দিকে অতীন্দ্রিয় অনুভবের মেছোহাটা অনেককেই উদ্ভ্রান্ত এবং বিমূঢ় করে রাখে। তেমনি শুধু বিবেচন আসল-নকলের তফাত করতে শেখালেও চেতনার সাবলীলতার অভাবে সত্যের অভিজ্ঞানের সীমাকে প্রসারিত করতে পারে না, ফলে বোধির মধ্যেও একদেশ-দর্শিতার ছাপ থেকে যায়। দুটি বৃত্তি একসঙ্গে কাজ করতে পারলেই দেখা দেয় অনুভবের পূর্ণতা।

দুটি পরা-বৃত্তির মাঝেও তেমনি সহযোগিতা থাকা চাই। রূপায়ণ পূর্ণসত্যের প্রত্যক্ষ অনুভব এনে দিতে পারে, কিন্তু উদ্বোধিনী বাণীর অভাবে তার মধ্যে শক্তিসঞ্চারণের ক্ষমতা দেখা দেয় না। তেমনি বোধির উদ্দীপনায় সত্যের মন্ত্র চেতনায় স্ফুরিত হতে পারে, কিন্তু মন্ত্রও মূর্ত হওয়া চাই, নইলে তার সামর্থ্য নিটোল হয় না। আবার পরা-বৃত্তি আপনধামে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকলেও অপরা-বৃত্তির সহযোগিতা ছাড়া বিশ্বে ক্রিয়াপর হতে পারে না। প্রতিলোমক্রমে বোধি যেমন আভাসন থেকে উঠে যায় রূপায়ণের

দিকে, অনুলোমক্রমে তেমনি সে নেমে আসে সত্যের চিদ্‌ঘন প্রত্যক্ষ থেকে তার সমর্থ মন্ত্রবর্ণে, তাথেকে তার কোন-এক বিভূতির বিবিক্ততায় এবং অবশেষে মানসচেতনার উপর জ্যোতির্ময় বিচ্ছুরণে। চারটি বৃত্তির সমন্বয়ে তবে ফোটে বোধিজবিজ্ঞানের (intuitive gnosis) সর্বাঙ্গীণ সামর্থ্য।

চারটি বৃত্তি ওতপ্রোত বলে মানসচেতনার উপর তাদের ক্রিয়া একসঙ্গে শুরু হয়ে যায়, যদিও তার মধ্যে স্বভাবতই সামর্থ্যের একটা তারতম্য থাকে। মনের প্রযত্নকে যথাসম্ভব শিথিল করে দিয়ে প্রথম তাকে আভাসগ্রহণে অভ্যস্ত করতে হয়। মনের পিছনে তখন যেন একটা জ্যোৎস্নার পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে, যা হয় মনের 'যথাযথ' ভাবনার আশ্রয়। অযথা ভাবনার ভেজাল তখনও থাকে। কিন্তু জ্যোতির্ময় পরিবেষটি অভ্যাসে আরও গাঢ় হলে বিবেচনশক্তির উদ্ভব হয়, যা মিথ্যার ভেজাল থেকে সত্যকে মুক্ত ক'রে তার প্রত্যয়কে মানসচেতনায় সুস্পষ্ট করে তোলে। তারপর মন সত্যভাবনায় এমনি অভ্যস্ত হয়ে যায় যে মিথ্যা কল্পনার আভাসমাত্রও তার মধ্যে জাগে না। প্রাকৃত মনের ব্যক্তিগত জল্পনা-কল্পনা, যা এতদিন তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছিল, তা একেবারে শান্ত হয়ে যায়। এই সত্যসন্ধ প্রশান্ত মনের মধ্যে জাগে বোধিচেতনার মন্ত্রবীর্য, ঋতম্ভরা ভাবনা যেন আদেশের আকারে স্ফুরিত হতে থাকে। এইটিই বাক্‌-সিদ্ধির বিভূতি : সিদ্ধ যা বলেন তা-ই হয়, কেননা তাঁর বোধিচেতনা যা হবে তাঁকে তা-ই বলায়, তাঁর পিছনে প্রাকৃত মনের কোনও মতলববাজি থাকে না। অবশেষে চেতনা শক্তির এই বৈদ্যুতীর ঊর্ধ্বে উঠে যায় সত্যপ্রত্যক্ষের আদিত্যভাস্বর মণ্ডলে। এইখানে মনের শেষ এবং ঋতম্ভরা বুদ্ধির শুরু।

*

এই ঋতম্ভরা অতিমানসী বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে দেখা দেয় চেতনার দুটি পরিণাম। প্রথম পরিণাম হল তার ক্রিয়ার আমূল বিপর্যয়। মানুষের মন এখন আছে পশুমন আর দিব্যমনের মাঝামাঝি। পশুমনের সে সাক্ষী, কিন্তু তবুও তার প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। দিব্যমনের সে প্রত্যাশী, কিন্তু তার ক্রিয়া তার মধ্যে অস্পষ্ট, ব্যামিশ্র। এইবার অতিমানসের ক্রিয়া তার মধ্যে হয় অপরোক্ষ—আবেশ ও উদ্দীপনা সুস্পষ্ট হয়ে মনকে এখন নিয়ন্ত্রিত করে। অবশ্য মনের প্রাকৃত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর হতে সময় লাগে; কিন্তু তবুও

মন এখন স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার ভাবনা বেদনা ও সঙ্কল্প তার নিজের সৃষ্টি নয়, তাদের উৎস তার ঊর্ধ্বে—সে শুদ্ধ ঊর্ধ্বশক্তির একটা প্রণালিকা।

দ্বিতীয় পরিণাম হল, ক্রিয়ার বিপর্যয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার সার্থক সামর্থ্যের বৃদ্ধি। অতিমানস ভূমিতে সমস্তই সিদ্ধ, সেখানে সাধ্য বলে কিছুই নাই। সাধ্যের জগৎ হল আমাদের এই ত্রিকালের জগৎ। এখানে হওয়া, না-হওয়া, এখন না হয়ে অন্য-কখনও হওয়া—এইসব বিকল্পের অনিশ্চয়তা আছে। অতিমানসে এ-অনিশ্চয়তা থাকতে পারে না। অতিমানসী বুদ্ধি অতিমানসের আদি বিভূতি বলে তারও মধ্যে সঙ্কল্পের অতএব ঘটনার এই নৈশ্চিত্য ক্রমেই প্রস্ফুট হয়ে ওঠে। জ্ঞান ও সংকল্পের ঐক্য অতিমানসের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, একথা আগেই বলেছি। এই নৈশ্চিত্য এবং সামর্থ্য তারই ফল। অবশ্য এক্ষেত্রেও পূর্ণ সামর্থ্য একদিনে আসে না। সিদ্ধ শক্তিকে অসিদ্ধের মধ্যে কাজ করতে গেলে কাল-পরিণামকে মেনে চলতেই হয়। তাই অপরা-প্রকৃতির রূপান্তর হঠাৎ হয় না। ভোরের আকাশ ধীরে-ধীরে আলো হয়ে ওঠে। আধার যদি শুদ্ধ থাকে, রূপান্তর তাহলে ক্ষিপ্র হয়। আধারশুদ্ধির কথা সবিস্তারে আগেই বলেছি।

*

অতিমানসী বুদ্ধি বিজ্ঞানময়ী। বোধিমানসের মত তারও চারটি বৃত্তি, কিন্তু তাদের ক্রিয়া আরও স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবিমিশ্র। তার মধ্যে বিবেচনী-বৃত্তিকে এখানে আর পৃথক লক্ষ্য করা যায় না, কেননা ওটি হল বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম—এমন-কি মানসবুদ্ধির বেলাতেও। বোধিমানসের সঙ্গে অতিমানসী বুদ্ধির তফাত এই। বোধিমানসকে বলতে পারি অতিমানসের বিভাব, আর এটি যেন তার স্বভাব। এই বুদ্ধির মধ্যে সত্যজ্ঞান আর সত্যসঙ্কল্প জ্যোতির্ঘন হয়ে ওঠে তিনটি ধাপে : প্রথম দেখা দেয় এক অতিমানস বোধির ক্রিয়া যার ফলে সত্যের সামান্যপ্রত্যয় আভাসিত হয়ে ওঠে; তারপর এক অতিমানস স্ফুরত্তায় তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় এক দিব্য সামর্থ্য; এবং অবশেষে এক অতিমানস রূপায়ণী-শক্তিতে তা হয় আকারিত।

বিজ্ঞানবুদ্ধির (spiritual reason) ক্রিয়া মানসবুদ্ধিকেও ছাপিয়ে যায়। কিন্তু তার ধারা মানসবুদ্ধির ঠিক বিপরীত। মানসবুদ্ধি চলে স্থূল থেকে সূক্ষ্মের দিকে, ইন্দ্রিয়সংবিৎ থেকে অতীন্দ্রিয় প্রত্যয়ের দিকে—কিন্তু

সে-প্রত্যয় তার কাছে অস্পষ্ট সামান্যপ্রত্যয়। বিজ্ঞানবুদ্ধির গতি সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের দিকে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় প্রত্যয় তার কাছে ইন্দ্রিয়সংবিতের মতই স্পষ্ট; আর সামান্যপ্রত্যয় যেমন চিদ্‌ঘনতায় বাস্তব, তেমনি বিশেষপ্রত্যয়ও ব্যঞ্জনার আনন্ত্যে অসীমে প্রসারিত। প্রাকৃত চেতনায় ভাব আর বস্তু তেল আর জলের মত কখনও মিশে যায় না; তাই ভাব আভাসে মাত্র বস্তুকে জানে। শুধু আমার নিজের কাছেই আমার ভাব বাস্তব হয়ে উঠতে পারে; বহির্জগৎ তার বাইরেই পড়ে থাকে। কিন্তু ভাবই যদি বস্তুর প্রসূতি হয়, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্যরকম : তখন আত্মা অনাত্মার ভেদ ঘুচে যায়। এর একটুখানি আভাস আমরা পেতে পারি, যদি কখনও স্বপ্নের মধ্যে জেগে উঠি এবং স্বপ্নগোচর বস্তুকে জাগ্রতের মতই তীক্ষ্নরূপে অনুভব করতে পারি। বিজ্ঞানবুদ্ধির ধারাও কতকটা এইরকম, যদিও ওইধরণের স্বপ্ন-জাগ্রতের অনুভবটা আসলেরই নকলমাত্র।

মানসবুদ্ধির মধ্যে ভাবনা ও ক্রিয়ার সমন্বয় এবং সমাহারের সামর্থ্য আছে, বিজ্ঞানবুদ্ধিরও তা আছে। কিন্তু মানসবুদ্ধিতে উপাদানের মধ্যে যেমন সজাতীয় ভেদের সম্বন্ধ (যেমন একটা গাছের সঙ্গে আরেকটা গাছের), বিজ্ঞানবুদ্ধিতে কিন্তু তেমনি স্বগতভেদের সম্বন্ধ (যেমন একই গাছের বিভিন্ন ভাগের মাঝে); কেননা বিজ্ঞানবুদ্ধিতে তা হল সত্যের নিজেরই রূপ—নিজের বাইরে একটা-কিছুর প্রকল্পনা নয়। বিজ্ঞানবুদ্ধিও ইন্দ্রিয়সংবিৎ নিয়ে কাজ করে, কিন্তু মানসবুদ্ধিগোচর ইন্দ্রিয় ছাড়া তার আছে নিজস্ব চিন্ময় ইন্দ্রিয় এবং তারই অনুবর্তী অন্তর্মনের ইন্দ্রিয়—যাকে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলা চলে।

বিজ্ঞানবুদ্ধির ক্রিয়া যেমন ভাবনা ও সঙ্কল্পকে দিব্য করে তোলে, তেমনি হৃদয়ের ভাব, প্রাতিভসংবিৎ (psychic sensations) এবং প্রাণসংবিৎকেও দিব্য আনন্দ এবং তপঃশক্তির আবেশে রূপান্তরিত করে নেয়। এমন-কি শারীর-চেতনাকেও সে মুক্তি দেয় প্রজ্ঞানঘন আনন্দের মণিদ্যুতিতে। এই রূপান্তরের সামর্থ্য মন-বুদ্ধির নাই, এমন-কি শুদ্ধমনেরও নাই—কেননা তারা কারক নয়, গ্রাহক মাত্র, আর গ্রাহ্যবিষয় হতেও তারা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বিজ্ঞানবুদ্ধিতে গ্রাহক আর গ্রাহ্যে কোনও ভেদ নাই, গ্রহণ (experiencing) সেখানে অনুসরণ করে আত্মবিভাবনা বা হওয়ার ধারাকে।

তবুও বিজ্ঞানবুদ্ধি পরমপুরুষের আত্মশক্তি নয়, তাঁর সূর্যশক্তি মাত্র অর্থাৎ তা অতিমানসের অন্তরঙ্গ বিভূতি শুধু।

*

অতিমানসসম্পর্কিত কোনও ভাবনাকেই আভাসে ছাড়া মানসবুদ্ধির গোচরে আনা যায় না। এই আভাস খানিকটা স্পষ্ট হতে পারে যদি মনে রাখি, এখানে আনন্ত্যকে নিয়েই কারবার, অথচ তাবলে সান্তে-অনন্তে কোনও বিরোধ নাই। সান্ত অনন্তেরই ঘনবিগ্রহ এবং ব্যঞ্জনায় অনন্ত। এই আনন্ত্য সত্তা চৈতন্য এবং শক্তির আনন্ত্য, যাকে প্রাকৃত ভূমিতে থেকে আমরা একমাত্র চেতনার অন্তরাবৃত্তির দ্বারাই স্পর্শ করতে পারি। আনন্ত্যের ভাবনায় আবিষ্ট থাকতে-থাকতে একসময় চেতনা আকাশের প্রশান্তিতে নিবিড় এবং প্রকাশে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাকে জড়িয়ে থাকে যেন এক প্রসন্নতার ইন্দ্রধনুচ্ছটা, যার গভীরে প্রভাতরল হয়ে ঝলমল করে শক্তির বৈদ্যুতী। সেই বৈদ্যুতীতেই বুদ্ধির প্রভাস, সঙ্কল্পের প্রবেগ, প্রাণের তরঙ্গায়ণ, বিগ্রহের মৌক্তিকদ্যুতি। এটি ভাব আর ওটি বস্তু এ-ভেদ নাই, সবই ভাব-বস্তু। সবই সৎ-চিৎ-আনন্দে শক্তির হিল্লোল, সবই অনন্ত।

এই অতিমানসী ক্রিয়ারও তিনটি পর্যায় আছে। এক পর্যায়ে, বোধে ফোটে সিদ্ধ সত্যের প্রতিরূপ, আরেক পর্যায়ে অকল্পনীয় সাধ্যের আভাস। সবার শেষে পরম তাদাত্ম্য-বিজ্ঞান—ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা এবং সর্বশক্তিমত্তার নিরতিশয় অনুভবের দিকে যার ইশারা।

২২

অতিমানস ভাবনা ও জ্ঞান

মনোময় নয়, অতিমানসের আবেশে মনের রূপান্তর—এই হল পূর্ণযোগের লক্ষ্য। রূপান্তরের জন্য অতিমানসের শক্তিপাত যেমন অপরিহার্য, তেমনি প্রয়োজন মনেরও উত্তরায়ণ। মন শুদ্ধ না হলে তার গতি ঊর্ধ্বমুখী হয় না। শুদ্ধি ছাড়া সিদ্ধি অসম্ভব একথা গোড়াতেই বলেছি। উত্তরায়ণের পথিক মনের মধ্যে রূপান্তরের ক্রিয়া যখন শুরু হয়, তখন প্রথম তার মধ্যে দেখা দেয় ঐশ্বর্য। কিন্তু মন শুদ্ধ না থাকলে এই ঐশ্বর্য বিকার ঘটায়। তার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারলে লক্ষ্য হয়, মনের ঊর্ধ্বে বোধির জ্যোতি ঘনীভূত হয়ে উঠছে। বোধি অতিমানসেরই করণ, তার উন্মেষে অতিমানসের বীর্য চেতনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু বোধিমানসের পরিপূর্ণ স্ফুরণেও অতিমানসের প্রকাশের একটা বাধা দূর হয় না—শক্তির অবতরণে দেহচেতনার স্থূলত্বের বাধা। এ-বাধা দূর হতে পারে একমাত্র অতিমানসের অপরক্ষো প্রভাবে। মানব তখন হয় অতিমানব।

মনের সঙ্গে অতিমানসের কোথায় তফাত, সেকথা আগে বলেছি। মন অতিমানসেরই বিভূতি, কিন্তু তার কারবার খণ্ডকে নিয়ে। খণ্ডের জ্ঞানও যে তার সম্পূর্ণ, তা নয়। পুরাপুরি কিছুই সে জানে না, কিন্তু জানবার চেষ্টা করে এইমাত্র। অখণ্ডের জ্ঞান তার কাছে আবছা, একটা জোড়াতাড়ার ব্যাপার। কিন্তু অতিমানসে অখণ্ড এবং খণ্ড দুয়েরই জ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ। খণ্ড অখণ্ডেরই স্বগত বিভূতি, অখণ্ড খণ্ডের স্বরূপসত্য। মনেরই মত অতিমানস খণ্ডকে নিয়েও কারবার করে, কিন্তু সেখানে তার জ্ঞান ও ক্রিয়ার ধরন আলাদা। মনের খণ্ডজ্ঞানে অবিদ্যার সংকীর্ণতা আছে, কিন্তু অতিমানসের তা থাকতেই পারে না—খণ্ডের সত্য সেখানে অখণ্ডের আলোকে উদ্ভাসিত। মন বস্তুর ভাবরূপ (representation) কল্পনা করতে পারে, কিন্তু তা তার কাছে আবছা বলে কখনও তাকে সে বাস্তবের মর্যাদা দেয় না। অতিমানসও ভাবরূপের কল্পনা করে, কিন্তু 'কল্পনা' সেখানে প্রাচীন অর্থে কৃতি বা অরূপ হতে রূপের উৎসারণ। মনের কাছে তা আভাস, কিন্তু অতিমানসের কাছে প্রভাস।

আগে যে-বিজ্ঞানবুদ্ধির কথা বলেছি, এই ভাবরূপের উৎসারণ তারই বৃত্তি, বস্তুর মর্মসত্যকে অনন্ত্যের সঙ্গে সুসঙ্গত রেখে আস্বাদন এবং ব্যবহার করবার একটা সাধন। তাইতে বাউলের ভাষায়, এই চোখে-দেখা আর গায়ে-মাখা ধুলা আর মাটির মধ্যেই প্রাণবাসনা খাঁটি রসের সাঁইএর সন্ধান পায়।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মত। সমস্ত বিশ্বের মধ্যে একটা অখন্ড সৌষম্য আছে, আমরা আভাসে তা বুঝতে পারি। কেননা সৌষম্যের সাধনাই বলতে গেলে আমাদের জীবনব্রত, বিশ্বে তা না থাকলে আমরাই-বা তাকে খুঁজতে যাব কেন। দেখি, বৈষম্য আর বিরোধের অস্বস্তি কেবল আমারই মনশ্চেতনায়। বৈদিক ঋষিদের একটা উপমা ব্যবহার করে বলতে পারি, আমার পায়ের তলায় যে জীবধাত্রী বসুন্ধরা আর মাথার উপরে যে চিন্ময় আকাশ—দুইই বৃহৎ প্রশান্ত এবং সুষম; দুয়ের মাঝে আমারই মনের অন্তরিক্ষে কেবল যত ঝড়-বৃষ্টির মাতামাতি। অথচ এই মাতামাতিতেই পাই শক্তির পরিচয়। কিন্তু সে-শক্তি ছন্দোহীন। জীবনের লক্ষ্য হল শক্তিকে ছন্দোময় করে তোলা। শক্তিকে নিজের মধ্যে লীন করে দিলে সব ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু তা-ই কি পূর্ণতা? চাই শিবের মধ্যে পূর্ণ শক্তির ছন্দোময় প্রকাশ। এইটি অতিমানসের সাধ্য। মন অজানতে আঁকুপাঁকু করছে তারই জন্য।

কিন্তু একত্বের অনুভব গাঢ় না হলে সৌষম্য আসে না। একটা কাজ-চলাগোছের আবছা একত্বের অনুভব মনের আছে; অথচ তাকে স্পষ্ট করতে গেলেই মন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মনই তো আমাদের চেতনার সবখানি নয়, তার পিছনে রয়েছে বোধি—যেন দ্যুলোকের জ্যোতির্ময় পরি-মন্ডলের মত। তার গভীর শান্তিকে মনের উপর ঝরতে দিতে হবে। মন কাজ করছে করুক, কিন্তু করুক ওই আলোর নিঝরে অভিষিক্ত হয়ে। আলো তার সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জারিত হয়ে তাকে বুঝিয়ে দিক, তার যে-স্পন্দ, তা ওই একেরই হৃৎস্পন্দন। সব এক, তাই সব সুষম। অতিমানসে এইটি সহজ।

*

অতিমানসের আবেশে মনের রূপান্তর যে খুব অনায়াসে হয়, তা নয়। বাধা আসে অবশ্য মনের দিক থেকেই, রাতারাতি সে তার স্বভাব বদলাতে পারে না। যে-সৌষম্য আবেশের লক্ষ্য, শক্তিপাতের ফলে তা-ই বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। বৃহৎ শক্তির অবতরণকে ক্ষুদ্র আধার ধারণা না করতে পেরে

হয়তো বানচাল হয়ে যায়, কিংবা ঐশ্বর্যের প্রমত্ততায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, একটু-কিছু পেয়েই সব পেয়েছি মনে করে নিশ্চিন্ত আরামে গা ঢেলে দেয়। দীর্ঘদিন ধরে আধারশুদ্ধি, চেতনার আকাশবৎ প্রশান্তি ও ব্যাপ্তি, হঠাৎ-সিদ্ধির চমকের প্রতি নিঃস্পৃহতা—এই হল তার প্রতিষেধক। সব-কিছুকে ধীরে-ধীরে ভিতর হতে ফুটে উঠতে দিতে হবে—স্বচ্ছন্দ আলো-বাতাসের উদার পরিবেশে গাছ যেমন বেড়ে ওঠে তেমনি করে।

আরেকটা বাধা আসে মনের একদেশদর্শিতা থেকে। আধারের কোনও-একটা শক্তির স্ফূর্তির দিকে হয়তো কারও বিশেষ ঝোঁক আছে। কেউ চায় জ্ঞান, কেউ আনন্দ, কেউ শক্তি, কেউ শান্তি। এর প্রত্যেকটিই চৈতন্যের একটি মৌল বিভাব, সুতরাং প্রত্যেকটিরই একটি পরমতা আছে। সাধক তার যে-কোনও একটিতে সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু বলা বাহুল্য, তা পূর্ণ সিদ্ধি নয়। প্রাণশক্তি যেমন ভ্রূণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে গোড়া হতেই সুসমঞ্জসভাবে গড়ে তোলে, সাধককেও তেমনি আধারের সমস্ত শক্তিগুলিকে সৌষম্যের ছন্দে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কোনও-একটি অঙ্গের অতিকৃতিতে অঙ্গবৈকল্যেরই পরিচয়। চিৎশক্তির সমস্ত বৃত্তি ওতপ্রোত, করাও সঙ্গে কারও বিরোধ থাকতেই পারে না। কিন্তু বিরোধ সৃষ্টি করে মন—তার স্বভাবসিদ্ধ একদেশদর্শিতার ফলে। তার সংস্কার সূক্ষ্মভাবে সাধককে অনুসরণ করে একেবারে শেষ পর্যন্ত, তাই অধ্যাত্মজগতে হামেশাই দেখতে পাই এক সিদ্ধের সঙ্গে আরেক সিদ্ধের বিরোধ। গোড়া হতেই চেতনার পিছনে অখণ্ডের বোধকে জাগিয়ে রেখে মনকে তার দ্বারা অভিষিক্ত করে তার পক্ষপাতী সংস্কারগুলিকে নির্মূল করে ফেলা উচিত। পক্ষপাত থাকবে না, কিন্তু বৈচিত্র্য থাকবে—সৌষম্য আর একত্বের এই লক্ষ্য। একই আলো গাছের পাতায় সবুজ, কাণ্ডে পাঁশুটে আর ফুলে রংবাহারি—বিরোধ তো কোথাও নাই। তেমনি ব্রহ্মের শান্তি চৈতন্য আনন্দ শক্তি সমস্তই অবিরোধে অখণ্ড চেতনায় বিচিত্র হয়ে ফুটবে, তবেই না সিদ্ধির পূর্ণতা।

*

মন জানে ভাবনা বা মনন (thought) দিয়ে—এইটি তার বিশেষ বৃত্তি। ভাবনার মূলে থাকে ইন্দ্রিয়সংবিৎ বা প্রাণসংবিৎ। তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করা এবং তাদের বিচ্ছিন্ন বিশেষপ্রত্যয়কে সামান্যপ্রত্যয়ের

আওতায় এনে বিষয়ানুভবের একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য কাঠামো তৈরি করা হল মননের কাজ। এমনি করে বাইরের বিষয়কে ভিতরে এনে সেই আন্তর প্রত্যয় নিয়ে মন ভাবনার জাল বুনে চলে। তাতে বিশেষভাবে তাকে সাহায্য করে ভাষা। আর করে ন্যায় বা যুক্তি (logic), যা অবরোহ এবং আরোহধারায় বিশেষ আর সামান্যের মাঝে সম্বন্ধ স্থাপন করে। যে-ভাবনার মোটামুটি যুক্তির একটা বাঁধুনি আছে এবং ভাষায় যাকে স্পষ্ট রূপ দেওয়া হয়েছে, মন সেই ভাবনাকেই সত্যবাহ জেনে তৃপ্ত হয়। এই হল তার জানার ধরন। যুক্তির বন্ধন ছাপিয়ে ভাবে ও ভাষায় কখনও-কখনও অতিরেকী একটা-কিছুর ব্যঞ্জনাও প্রকাশ পায়—তবে কিনা সেটা মন-বুদ্ধির এলাকা ছাড়িয়ে পড়ে বোধির এলাকায়।

কিন্তু অতিমানস বিষয়কে এমনি করে মননের দ্বারা জানে না, জানে তাদাত্ম্যবোধের দ্বারা। এ-জানা হচ্ছে 'আত্মনি আত্মানম্ আত্মনা'—আত্মাতেই (বিষয়ী) আত্মাকে (বিষয়) আত্মা (করণ) দিয়ে জানা। এ-জানা হচ্ছে হয়ে জানা—তার মাঝে জ্ঞাতা জ্ঞান আর জ্ঞেয়ের কোনও ভেদ নাই। স্বরূপত সমস্ত জ্ঞানের মূলে রয়েছে এই তাদাত্ম্যবৃত্তি। গ্রাহক-চৈতন্য গ্রহণশক্তি আর গ্রাহ্যবস্তুর মাঝে স্বভাবের একটা মৌল ঐক্য না থাকলে জ্ঞান সম্ভবই হত না। দৃশ্য দর্শনশক্তি আর দ্রষ্টা তিনের অন্বয়ে যে দর্শনব্যাপার, তাকে বলতে পারি এক অখণ্ড প্রকৃতির গুণবিভঙ্গ—তা নইলে দ্রষ্টা আদপেই দেখে কেন তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বিষয়কে 'আত্মসাৎ' করেই বিষয়ীর বোধ। কথাটা স্পষ্ট বোঝা যায়, যখন জ্ঞাতা আগ্রহ (interest) নিয়ে জ্ঞেয়কে জানে। আগ্রহ চরমে ওঠে সমধর্মাকে যখন ভালোবাসা যায়। ভালবেসে কাউকে জানা —আমরা যাকে বলি হৃদয় দিয়ে পাওয়া—এই হল প্রাকৃতভূমিতে তাদাত্ম্য-বিজ্ঞানের একটা সুস্পষ্ট আভাস। এ-বিজ্ঞানে তন্ময়তা আছে, কিন্তু কোনও ভাবনা নাই। তন্ময়তা হতে ভাবনা জাগতে পারে, কিন্তু জাগে একধাপ নীচে। তন্ময়তায় যা একরসপ্রত্যয়ে নিবিড় হয়ে ছিল, ভাবনা যেন তাকে আশ্রয় করে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে। অতিমানসের জানা এমনি করে বিশ্বাতীতের মধ্যে বিশ্বকে বিচিত্র সৌষম্যে হৃদয় মন প্রাণ দেহ দিয়ে আত্মসাৎ করে জানা। অবশ্য হৃদয় মন প্রাণ দেহ বলতে এখানে চিদ্‌ঘন বিগ্রহকেই লক্ষ্য করছি, প্রাকৃত বিগ্রহকে নয়।

অতিমানস তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের আরেকটি মুখ্য বৃত্তি হল দর্শন (vision)।

মরমীয়ারা এই সংজ্ঞাটি খুব ব্যবহার করেন। চোখের দর্শন—সে বাইরের চোখই হ'ক বা ভিতরের চোখই হ'ক—যে তা নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। আমাদের ইন্দ্রিয়সংবিতের মধ্যে চোখের দেখাটা পরিধিতে বৈচিত্র্যে এবং অর্থবহ স্পষ্টতায় মুখ্য বলে অতিমানস অনুভবের বিবৃতিতে তার কথাই সহজে মনে আসে। আসলে এ-দর্শন যেন 'যেন চক্ষুংষি পশ্যতি'—চোখ দিয়ে চোখকে দেখার মতন। সুষুপ্তির গভীরে দ্রষ্টা আর দৃশ্য এক হয়ে আছে। স্বপ্নের মধ্যে এই একরসপ্রত্যয় দুভাগ হয়ে যায়, দ্রষ্টাই নিজেকে রূপায়িত করে দৃশ্যে। উপনিষদ এইজন্য স্বপ্নকে বলেছেন আত্মার সৃষ্টি। অতিমানস দর্শনেরও এই রীতি। সে দর্শনে অনাত্মবস্তু দৃগ্‌গোচর হচ্ছে না, আত্মবস্তুই আত্মার কাছে প্রভাসিত হচ্ছে। কাব্যের সঙ্গে কবির যেমন তাদাত্ম্য, এখানে দর্শনের সঙ্গে দ্রষ্টার তেমনি তাদাত্ম্য। সৃষ্টির মত এও একটা অবরোহধারা—যা ভিতরে আছে তাকেই বাইরে এনে দেখা। মরমীয়া তাই এ-দর্শনের কথায় বলেন, 'হিয়ার মধ্য হইতে কে কৈল বাহির'।

তাদাত্ম্যের বিসৃষ্টিই দর্শন—এই হল সিদ্ধের অনুভব। কিন্তু সাধকের বেলায় অনেকসময় দর্শন আগে আসে—মহাশূন্যে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত এবং তা-ই হয় তাদাত্ম্যানুভবের সাধন : ব্রহ্মকে দেখে সাধক 'বিশতে তদনন্তরম্'—তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেন, করে ব্রহ্ম হয়ে যান। তাদাত্ম্যের প্রাগ্‌ভাবী এই ধরনের দর্শন অবরোহ আর আরোহধারার মাঝামাঝি। এখানেও আবেশ ছাড়া দর্শন হয় না—এই হল ধারার অবরোহ। কিন্তু দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের বিবেককে আশ্রয় করে প্রবর্তিত হয় বলে এর সঙ্গে প্রাকৃত দর্শনের সাদৃশ্য আছে—এই হল ধারার আরোহ। সাধনার প্রথম-প্রথম সাধকের অনেক অতীন্দ্রিয় দর্শন এই শ্রেণীর। তাইতে তাদাত্ম্যবোধ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এর মধ্যে মানস সংস্কারের ভেজাল থাকতে পারে। মরমীয়াদের পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায়, বাহ্যদশা হতে অর্ধবাহ্য দশার দিকে উজিয়ে যাওয়ার সময় দর্শনের এক প্রকৃতি, আবার আন্তর দশা হতে অর্ধবাহ্য দশার দিকে ভাটিয়ে আসবার সময় তার আরেক প্রকৃতি। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় শেষের দশাতেই।

যেমন অতিমানস দর্শন, তেমনি আছে অতিমানস শ্রুতি, অতিমানস স্পর্শ। পাঁচটি ইন্দ্রিয়সংবিতের মধ্যে অধ্যাত্মসাধনায় শ্রবণ স্পর্শন আর দর্শন এই তিনটিকেই মুখ্য সাধন বলে উপনিষদে গ্রহণ করা হয়েছে। সব ইন্দ্রিয়েরই

অতিমানস রূপান্তর সম্ভব। পরের এক অধ্যায়ে তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

*

অতিমানস দর্শনে তাদাত্ম্যবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্বিত হয়ে সত্যের যে-স্বরূপ প্রকাশ পায়, অতিমানস ভাবনা তাকে সমর্থ ভাব ও ক্রিয়ার রূপ দেয়। ভাবনা সেখানে প্রাকৃত মনের ভাবনার মত আহরণের নয়, বিচ্ছুরণের সাধন। এইটি হল সিদ্ধের বেলায়। সাধকের বেলায় নেপথ্যে সক্রিয় অতিমানসের প্রেষণায় ভাবনা কখনও বিদ্যুতের মত আগে ঝলকে ওঠে এবং তাই হয় দর্শন ও তাদাত্ম্যবোধের প্রয়োজক। ভাবনা তখন ধরে প্রত্যভিজ্ঞার রূপ, উপনিষদে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ধ্রুবা স্মৃতি'। বলা বাহুল্য, এ-স্মৃতি কালের অতীত, চেতনায় নিত্যের উদ্‌বোধন। 'এই সেই' বলে যাকে অনুভব করা হয়, তা নিত্যসিদ্ধ এবং নিত্যবর্তমান এক সর্বাধার আনন্ত্য। তার মধ্যে সৌররশ্মির মত আত্মবিচ্ছুরণের যে-বীর্য রয়েছে, ভাবনা তার বাহন হয়—এই তার আরেক কাজ।

তখন এই ভাবনা হতেই স্ফুরিত হয় সত্যের মন্ত্র, যা অবরোহক্রমে আধারে শক্তিপ্রতিষ্ঠার বা অপরের মধ্যে শক্তিসঞ্চারের হেতু হয়। বেদের মরমীয়া ভাষায় এই মন্ত্রকে বলা হয়েছে 'মাধ্যমিকা বাক্'। দর্শনের সঙ্গে অন্বিত ভাবনা 'পশ্যন্তী'। তারও ঊর্ধ্বে তাদাত্ম্য-বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্বিত 'পরা'। আমরা প্রাকৃত-ভূমিতে বাক্‌কে (বাক্ তখন 'বৈখরী') ব্যবহার করি চিন্তা-সংক্রমণের উপায়রূপে; তাছাড়া বাক্ চিন্তাকে ব্যাকৃত (formulated) করতেও সাহায্য করে। কিন্তু অতিমানস ভূমিতে বাকের মুখ্য শক্তি হল 'আদেশ'—যা হল অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করবার দিব্য সামর্থ্য। বাক্ রূপায়ণী শক্তি, আকাশের চিৎস্পন্দ। এই স্পন্দ একদিকে দিব্যশ্রুতির, আরেকদিকে দিব্যদর্শনের নিমিত্তরূপে হয় সৃষ্টির প্রবর্তক। উপমা দেওয়া যেতে পারে কবির কাব্যসৃষ্টির : 'আপন মনের গহন মাঝে কান পেতে' যা শুনলাম তা-ই উদ্ভাসিত করলাম চিত্তাকাশে বিদ্যুতের দীপালিতে। তারপরে এল মন, তারও পরে কথা; বাহ্যশ্রুতিগ্রাহ্য কবিতার জন্ম হল। কবিতার কথা যদি বস্তু হত, মরমীয়ার ভাষায় বাক্ যদি হত সুতনুকা (if the Word were made Flesh), তাহলে উপমার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হত। অতিমানসী বাণীর রহস্য কিছুটা তখন বোঝা যেত।

প্রাকৃত ভাবনার সঙ্গে অতিমানস ভাবনার একটা বড় তফাত এই, প্রাকৃত ভাবনা ভাব আর বস্তুর মাঝে তফাত করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু তার কাছে স্পষ্ট, কিন্তু অতীন্দ্রিয় ভাব আবছা। ভাবনার প্রবৃত্তি এখানে বাইরের দিকে বলেই এমনটা হয়—ভাব আত্মবোধের আশ্রিত হয়েও হয় অস্পষ্ট, আর বস্তু অনাত্মীয় হয়েও হয় সুস্পষ্ট। কিন্তু ভাবনার অন্তরাবৃত্তিতে ঠিক তার বিপরীত হবে, আত্মবোধ যতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে বাইরের জগৎটা ততই আবছা হয়ে যাবে। তারই চরম পরিণামে জগৎ হয়ে যায় স্বপ্নবৎ, যা থেকে দার্শনিক মায়াবাদের উৎপত্তি। কিন্তু এও মনের মায়া। বস্তু প্রবল হয়ে ভাবকে নস্যাৎ করে দেবে, অথবা ভাব প্রবল হয়ে বস্তুকে নস্যাৎ করবে—দুটাই একঝোঁকামির ফল। অতি-মানসে কিন্তু এই অসঙ্গতি নাই। সেখানে ভাব আপন সামর্থ্যে বস্তুর মতই স্পষ্ট এবং বস্তুও ভাবের ঘনবিগ্রহরূপে স্পষ্ট। ভাব আর বস্তু সেখানে যুগনদ্ধ—প্রাকৃত ভূমিতে যেমন দেহ আর মন। তা-ই তত্ত্বদর্শীর ভাব-সং (Real-Idea)।

প্রাকৃত মনের মধ্যে ভাবনার তিনটি বৃত্তি আছে—আভাসন (এবং বিবেচনও), উদ্দীপন আর প্রকাশন। ইন্দ্রিয়ের সহায়ে জগৎ থেকে উপাদান আহরণ করে আমরা প্রথমে ভাবনার একটা আদরা গড়ি এবং প্রধানত মনের প্রাক্তন সংস্কার দিয়ে তাকে আরও স্পষ্ট করি, তারপর ভাবনার সঙ্গে ভাব জুড়ে তাকে পুষ্ট এবং সমর্থ করি; অবশেষে তার সুনিরূপিত কল্পরূপকেই দিই যেন বস্তুর মর্যাদা—ভাবনাকে তখন যুক্তির ছকে বস্তুর ঘুঁটির মত ব্যবহার করি। অনুরূপ বৃত্তি অতিমানস ভাবনারও আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অতিমানস ভাবনায় প্রথম ফোটে সত্যের জীবন্ত আভাস, তাতে তন্ময়তার ফলে সত্যের জ্যোতির্ময় মন্ত্রবীর্য এবং অবশেষে তার দিব্যমূর্তি। এটি হল সাধকের আরোহক্রম। সিদ্ধের অবরোহক্রম তার বিপরীত, আভাস তখন দিব্যভাবনার জ্যোতির্বাষ্প হয়ে জগৎকে আচ্ছন্ন এবং আবিষ্ট করে রাখে।

অতিমানস ভাবনার পরিণাম যে অতিমানস জ্ঞান, তার অধিকার সর্বব্যাপী। প্রাকৃত মনের কেন্দ্র হল অহং, তার পরিধি সঙ্কীর্ণ; তাই তার জ্ঞানও সীমিত। অতিমানসের অহন্তা পূর্ণাহন্তা—সবাইকে নিয়ে, সব-কিছু নিয়ে; এবং তা পরাহন্তা—সব-কিছু ছাপিয়ে। জানা তার মধ্যে হয়ে জানা। সুতরাং অতি-মানস 'সর্বো ভূত্বা সর্বমাবিশতি'—সব হয়ে আবিষ্ট হয় সব-কিছুর মধ্যে। এই আবেশের অগোচরে বা তার বাইরে কিছুই থাকতে পারে না। সত্যকে

সে জানে অসীম দেশের ব্যাপ্তিতে এবং অনন্ত কালের অনুবেধে (penetration)। তাই তার মধ্যে ভূত (actual) আর ভব্যের (potential) কোনও বিবিক্ততা বা পর্যায় নাই। প্রাকৃত মন ভূত হতে ভব্যের দিকে চলে হাতড়ে-হাতড়ে; ভূতের মধ্যে ভব্যের যে-সামর্থ্য নিহিত রয়েছে তাকে বর্তমানে সে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তার জন্য একটা আবছা ভবিষ্যতের উপর তাকে বরাত দিতে হয়: বীজ গাছ হবে একদিন, কিন্তু এখনই তো সে গাছ হয়ে নাই; আর যখন হবে তখন সে যে কি হবে ঠিক বলা শক্ত। বীজকে যে বাইরে থেকে দেখছে, এ-উক্তি তার। কিন্তু বীজশক্তির সঙ্গে কেউ যদি এক হয়ে যায়, তাহলে তার পরিণামের আদি আর অন্ত হাঙগরমুখো বালার মত নিত্যবর্তমানের একটি বিন্দুতে এসে তার চেতনায় সংহত হবে। তখন আত্মবিচ্ছুরণের বা হওয়ার উল্লাসে সে ভূতার্থের প্রতিপর্বে অনুভব করবে ভব্যার্থের উল্লাস। ভূত আর ভব্যের মাঝে তখন কোনও তফাত থাকবে না, একটি জানা আরেকটি অজানা—এ-প্রত্যয় তখন অসম্ভব।

অতিমানস জ্ঞানের সৃষ্টি তাই অবরোহধারায় নেমে আসে স্বরূপ (essence) হতে ভব্যার্থে এবং ভব্যার্থ হতে ভূতার্থে। আবার সেই কবির উপমাটি এখানে টেনে আনতে পারি। কাব্য রয়েছে কবির স্বভাবে; সেই স্বভাব স্ফুরিত হল ভাবে, ভাব রূপায়িত হল বাণীতে। এর কোনও পর্বেই কাব্য কবির অজানা নয়। আমরা যারা শ্রোতা, তারা বাণী হতে উজিয়ে চলি ভাবের ভিতর দিয়ে কবির স্বভাবের দিকে। যদি কবির সমধর্মা না হই, তাহলে তাঁকে বোঝার যে কী বিড়ম্বনা, তা সবাই জানি। অতিমানসের প্রবৃত্তি আর মনের প্রবৃত্তিতেও এই তফাত।

ভাব আর বস্তু, ভব্য আর ভূত যেখানে এক, সেখানে জ্ঞান আর শক্তিও যুগনদ্ধ। ভাবের বাস্তবতা আর বস্তুর ভাবগাঢ়তা যাতে বিধৃত আছে, তা-ই শক্তি। একটি ক্ষণের মধ্যে শক্তি দুটিকে গুটিয়ে রাখছে, আবার সেইক্ষণেই কালপরিণামে তাকে প্রসারিত করছে। সত্যের স্বভাবের মধ্যে আত্মপরিণামের একটা অবশ্যম্ভাবিতা আছে, বেদের ভাষায় শক্তি সেখানে ঋতায়িনী। আর এই ঋতচ্ছন্দেই জ্ঞান আর শক্তি এক। তাইতে অতিমানসে সর্বজ্ঞতা আর সর্বশক্তিমত্তা একই অনুভবের এপিঠ-ওপিঠ।

২৩

অতিমানসের করণ

অতিমানস মনের অগোচর বটে, কিন্তু মন আবার অতিমানসের বিভূতি। তাই মন তার অনাত্মীয় নয়—অতিমানস প্রকৃতি, আর মন তার বিকৃতি। মন যখন অতিমানসে উঠে যায়, তখন তার লয় না হয়ে ঘটে রূপান্তর, সে হয় অতিমানসেরই দিব্য করণ। শুধু তা-ই নয়, তার মধ্যে অভাবিত নানা ঐশ্বর্যেরও স্ফুরণ হয়—আর সব-কিছু হয় অত্যন্ত সহজভাবে, এক দিব্য স্বধর্মের বশে।

আগেই বলেছি, মন চলে আরোহধারায়, আর অতিমানস অবরোহ ধারায়। মনের কাছে যা সাধ্য, অতিমানসে তা সিদ্ধ। মন বোধির সহায়ে সিদ্ধসত্যের যে-আভাস পায়, তা-ই ধরে উজিয়ে চলে। চলতে গিয়ে ইন্দ্রিয়জ বিশেষ-প্রত্যয়ের সঙ্কোচ হতে সে মুক্তি পায়, তার মধ্যে আবির্ভাব ঘটে সামান্য-প্রত্যয়ের। এইটিকে সে জানে বুদ্ধির বৃত্তি বলে। সামান্যপ্রত্যয়ের আশ্রিত বিশুদ্ধ ভাবময় জ্ঞান (pure ideative knowledge) হল প্রাকৃত মনোবৃত্তির চরম উৎকর্ষের ফল। কিন্তু মনে এ-জ্ঞান আবছা, আর অতিমানসে ইন্দ্রিয়সংবিতের মতই স্পষ্ট। মানসজ্ঞানের অস্পষ্টতাকে দূর করা যেতে পারে আত্মপ্রত্যয়কে সুস্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ ক'রে। অতিমানসে আরোহণের এই হল সোপান। তার সঙ্গে থাকা চাই আবেশের ভাবনা, যা আমরা পেতে পারি বোধির অনুশীলন হতে। পরমের আবেশে আত্মসচেতনতার অকুণ্ঠ সন্দীপন—সৌরকিরণে শিশিরবিন্দুর জ্বলে ওঠার মত, এই হল সাধনার মূলসূত্র।

মনের কাজ চেতনার জাগ্রৎ-ভূমিকে নিয়ে। জাগ্রতের চেতনা ইন্দ্রিয়নির্ভর বলে তার গতি বাইরের দিকে। এরই মধ্যে মন যতটুকু সম্ভব অন্তরাবৃত্ত হয়ে একটা ভাবের জগৎ গড়ে তোলে। এ-জগৎ মনের উজান পথে। আরও উজিয়ে যেতে হলে তাকে আরও গভীরে ডুবতে হয়, তাতে বাইরের জগৎ তার কাছে লুপ্ত হয়ে যায়—অবশেষে নিজেকেও সে হারিয়ে ফেলে। আরোহধারায় মনোলয়ের এই যে প্রশান্তি—যেন সুপ্তির মত, মন তাকেই মনে করে পরম-পুরুষার্থ। তাতে জাগ্রতের সঙ্গে সমাধির একটা বিরোধ সৃষ্টি হয়। স্বভাবতই

জাগ্রৎ-চেতনাকে অতএব জগৎকে এবং জীবনকে সে ভাবে হেয়। মনের এই দর্শন একদেশী, অখণ্ডদর্শনের বীর্য এবং আনন্দ এতে নাই।

অতিমানসের কাজ যুগপৎ চেতনার তুরীয় সুষুপ্তি স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ চারটি ভূমিকে নিয়ে। মনের কাছে যে-জাগ্রৎ এত স্পষ্ট, তারই গভীরে সে আবিষ্কার করে স্বপ্নের হিরণ্যদ্যুতি, সুষুপ্তির ঈশনা এবং তুরীয়ের লোকোত্তর অনির্বচনীয়তা। তিনটি উত্তর-ভূমির আবেশে জাগ্রতের প্রতি-মুহূর্তের প্রত্যক্ষ ভাব শক্তি এবং আনন্ত্যচেতনার প্রগাঢ়তায় বিবস্বান হয়ে ওঠে, অথবা যে-কোনও ভূমিতে অন্যান্য ভূমির অনুপ্রবেশে অনুভবের প্রত্যেকটি মুহূর্ত পরিপূর্ণ মহিমায় নিটোল হয়। প্রাকৃত মনের মধ্যেও বস্তু ভাব শক্তি এবং অধিষ্ঠানের প্রত্যয় সমাবিষ্ট হয়ে আছে, কেননা এই মনও অতিমানসেরই ধাতু দিয়ে গড়া। কিন্তু বস্তুপ্রত্যয়ের ঐকান্তিকতা এখানে অন্যান্য প্রত্যয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই আচ্ছাদনের উন্মোচনে মনকে স্বমহিমায় সমর্থ করে তোলাই যোগের উদ্দেশ্য—জাগ্রৎ থেকে উৎক্ষিপ্ত মনকে তুরীয়ে লয় করে দেওয়াই নয় শুধু।

ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, প্রাকৃতমনের তিনটি স্তর। প্রথম স্তরে মন ইন্দ্রিয়নির্ভর, সংস্কারাচ্ছন্ন, চিন্তার পৌনঃপুনিকতায় অভ্যস্ত। এ-মন তামসিক এবং গতানুগতিক, নতুন-কিছু সৃষ্টি করবার সামর্থ্য এর নাই। দ্বিতীয় স্তরে মন অর্থক্রিয়াকারী (pragmatic)—একটা নতুন-কিছুকে লক্ষ্য করে সে কাজ করে যায়, যেমন বাইরে তেমনি ভিতরে। এ-মনের মধ্যে সৃষ্টির চাঞ্চল্য আছে, কিন্তু লক্ষ্যের স্বচ্ছতা নাই। জীবনের পরিধিকে এ বাড়ায়, কিন্তু চেতনার মানকে উন্নত করে না। এ-মন রাজসিক। তৃতীয় স্তরে মন বিশুদ্ধ ভাবনার কারবারী। বুদ্ধি তার দোসর, তাই বস্তু থেকে ভাবকে আচ্ছিন্ন করে নিয়ে সে একটা জিজ্ঞাসার জগৎ গড়ে তোলে। এ-মন সাত্ত্বিক।

তিনটি স্তরে মনের তিন ধরনের প্রবৃত্তি—বস্তু নিয়ে, প্রাণ নিয়ে আর ভাবনা নিয়ে। অখণ্ড জীবনায়নে তিনের সার্থকতা আছে। কিন্তু তিনের মাঝে একটা সৌষম্য আনা প্রাকৃতমনের পক্ষে সহজ হয় না—একদেশদর্শিতা এবং প্রবৃত্তির ঐকান্তিকতা (exclusiveness) তার স্বভাব বলে। তাছাড়া মন বস্তু থেকে ভাবের দিকে হাতড়ে-হাতড়ে চলে বলে বস্তুজগৎকেও গুছিয়ে আনতে তার বেগ পেতে হয়। চাকার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে, সেও চলে—কিন্তু চালক হয়ে নয়। চালক হতে হলে চক্রবর্তী হতে হয়।

অতিমানস ভাবনার প্রবৃত্তি মনের প্রবৃত্তির ঠিক বিপরীত। অতিমানসের গতি ভাব হতে বস্তুর দিকে। আর ভাব তার কাছে বস্তুর আচ্ছিন্ন প্রত্যয় নয়, তার ভাবেই বস্তুর বাস্তবতা। মনের বস্তুপ্রত্যয়ে বোধের যে-ঘনতা, তা তার ভাবের সহজ ধর্ম; তাই তার দৃষ্টিতে বস্তু ভাবের প্রতিবিম্ব, স্বভাবের (essence) বিভাব (phenomenon)। স্বভাবের বোধ আসে আত্মভাবনার স্পষ্টতা থেকে। অন্তরাবৃত্তির ফলে আত্মভাবনা গভীর হলে দৃক্‌শক্তির আমূল রূপান্তর ঘটে : তখন বস্তুর বিভাবের মূলে তার স্বভাবকে প্রত্যক্ষ করা সহজ হয়। আপনাকে জানলেই জগৎকে জানা যায়। আত্মাকে জানি ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়, বোধ দিয়ে। এখন জগৎকে জানছি মুখ্যত ইন্দ্রিয় দিয়ে; এ-জানা তাই বাইরে-বাইরে জানা। কিন্তু আত্মবোধ দিয়ে যদি তাকে জানি, অর্থাৎ গভীর আত্মবোধ হতে যদি তাকে উৎসারিত হতে দেখি, তাহলে তাকে জানব আত্মাতে, তার মধ্যে জানব আত্মাকে, তাকে জানব আত্মা বলে। এই হল অতিমানস জ্ঞানের ত্রিপুটী, যার মধ্যে বস্তুর স্বভাব আর বিভাব দুয়েরই জ্ঞান সম্পুটিত।

অতিমানসের ভাবনায় আছে পরিচ্ছেদহীন আনন্ত্যের স্বতঃস্ফূর্ত বিলাস। মনের কাছে আনন্ত্য একটা বিকল্প (verbal construction) বা কথার কথা মাত্র। তার সব বোধের সীমা আছে, তার মধ্যে তারা স্পষ্ট; তারও বাইরে একটা কিছু আছে—এই অস্পষ্ট বোধের উপর তার আনন্ত্য-কল্পনার নির্ভর। সীমাকে ছাড়াতে গিয়ে নিজেকে তাই সে হারিয়ে ফেলে, আনন্ত্য কিছুতেই তার কাছে একটা ইতি-প্রত্যয় হয়ে ওঠে না। মনের কাছে পরমের বিবৃতি তাই দিতে হয় 'নেতি-নেতি' দিয়ে। সমস্ত নেতির শেষটায় শূন্য, তা-ই মনের কাছে পরমার্থ। কিন্তু এই শূন্যেরও একটা শক্তির দিক আছে, অব্যক্তই সেখানে ব্যক্তের উৎস। শূন্যের এই স্ফুরত্তা (dynamism) মন দিয়ে ধরা যায় না, যায় অতিমানস দিয়ে—কেননা আনন্ত্য তার কাছে অভাব-প্রত্যয় নয়, স্বভাব-প্রত্যয়। বোধির মধ্যে যে অপরিচ্ছিন্ন ব্যঞ্জনাশক্তির একটা উল্লাস আছে, যাতে সীমার মাঝেই অসীমের ইশারা মেলে, তা এই প্রত্যয়ের সূচক। কিন্তু প্রত্যয়ের ধারা এখানে মানসপ্রত্যয়ের বিপরীত। মন চলছে সান্ত হতে অনন্তের দিকে, চলতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে; আর অতিমানস আনন্ত্যের ঋতচ্ছন্দ বৃহৎ সত্য হতে অবলীলায় বিচ্ছুরিত করছে সান্তের স্ফুলিঙ্গ।

এই আত্মবিচ্ছুরণ বা বিসৃষ্টিই (creativity) অতিমানসের শক্তিরূপ, তার ঋতম্ভরা অর্থক্রিয়াকারিতা (pragmaticism)। তার এক মেরুতে সব-

কিছুকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে এনে আপনাতে আপনি থাকার চিদ্‌ঘনতা—আদিত্যমণ্ডলের মত, আরেক মেরুতে সেই পুঞ্জিত তেজেরই অনন্ত বৈচিত্র্যে বিচ্ছুরণ—আদিত্যরশ্মির বর্ণবিভঙ্গের মত। সেই সহস্ররশ্মিই পৃথিবী হয়ে তার বুকে ভাবের প্রাণের রূপের ঢেউ খেলিয়ে চলেছে। মনের কাছে এখানে পুরুবর্ণ বিরূপ, আর ওখানে অবর্ণ স্বরূপ। অতিমানসে সবই স্বরূপের উল্লাস, ব্রহ্মের 'জ্ঞানময়ং তপঃ', নির্বিশেষ আনন্ত্যের অনন্ত বিশেষণ—খেয়াল-খুশির ফুল ফোটানো সত্যের প্রেষণায়, ঋতের ছন্দে, বৃহতের অনিবাধতায়।

অর্থক্রিয়াকারিতায় অতিমানসের মধ্যে খণ্ডের লীলা। কিন্তু খণ্ডতা এখানে অখণ্ডে বিধৃত, কালের কলনা (dynamis) কালাতীতেরই তরঙ্গভঙ্গ। খণ্ডতা মনের চোখে ঠুলি পরিয়ে দেয়; তার বাইরে আর-কিছুই সে দেখতে পায় না। এরই নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা নিষ্প্রয়োজন নয়, একান্ত অভিনিবেশের (exclusive concentration) জন্য বিদ্যার তাকে দরকার হয়। অভিনিবেশের ফলেই অখণ্ড খণ্ডিত হয়, একের মধ্যে দেখা দেয় বহুর মেলা। মন বহুর মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ে এককে হারিয়ে ফেলে। অতিমানস হারায় না। তাই তার অর্থক্রিয়াকারিতায় একের রসে বহুর মধ্যে আসে সংহননের ঐক্য (organic unity)। যেমন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ : তাদের প্রত্যেকের আকৃতি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রাণ তাদের সংহত করেছে অন্যোন্যসম্বন্ধ সামগ্রিক একটি অর্থে। অতিমানসের এই রীতি।

এই সংহতি আবার একদিক দিয়ে প্রাণের বেগে চরিষ্ণু। যেমন বীজের অঙ্কুরণ। ব্রহ্মবীজ ব্রহ্মবৃক্ষে—'সনাতন অশ্বত্থে'—অঙ্কুরিত হচ্ছে। তার প্রত্যেকটি পর্বই সংহত—এক সংহতি হতে অভিযান চলছে আরেক সংহতিতে। অভিযানের রেখাচিত্র আঁকছে কাল। মনের কাছে কালের একটি অংশই ব্যক্ত, তার নাম বর্তমান। তার সামনে-পিছনে ভবিষ্যৎ আর অতীতের অব্যক্ত। এই অব্যক্তের একটা আকর্ষণ আর চাপ আছে ব্যক্তের উপর। কিন্তু তা মনের কাছে আবছা। আর অতিমানসে একটি ক্ষণে তিনটি পর্বই স্পষ্ট। তার ক্ষণ শাশ্বতের বাহন—শুধু ব্যঞ্জনায় নয়, আনন্ত্যের প্রকট সামর্থ্যে।

মনের একটা দিক ঝুঁকে আছে জড়ের দিকে, তাই অতিসহজেই জড়ের ধর্ম তার মধ্যে সংক্রামিত হয়। একটা কেন্দ্রকের চারদিকে কুণ্ডলী পাকানো আর এমনি করে বহু কুণ্ডলীতে পরিকীর্ণ হয়ে পড়া—এই হল জড়ের দুটি বিশিষ্ট লক্ষণ। জড়ের এই দুটি ধর্ম মনের মধ্যে যথাক্রমে দেখা দেয় অভিনিবেশ

আর বিক্ষেপের আকারে। অভিনিবেশের ফলে মন বিষয়ের সমগ্রতাকে একসঙ্গে ধারণা করতে পারে না, তার একটা অংশকেই আপাতত একান্ত করে তোলে। কিন্তু অংশের এই ঐকান্তিক (exclusive) জ্ঞানও তার স্থায়ী হয় না, পরমুহূর্তেই মন তাহতে ছিটকে আরেকটা-কিছুতে অভিনিবিষ্ট হয়। তারা-ছিটানো আকাশের মত মন অসংখ্য এলোমেলো চিন্তায় সবসময় বিক্ষিপ্ত। তারার বিন্দুগুলি তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট, কিন্তু বিন্যাসে কোনও শৃঙ্খলা নাই বলে তাদের দিয়ে একটা অর্থবহ রূপ ফুটিয়ে তোলা যায় না। আমাদের প্রাকৃত মনেরও এই চেহারা। তার মধ্যে বিক্ষিপ্ত অনুভবের তীক্ষ্ণতা হয়তো থাকে, কিন্তু জীবন বা জগতের অর্থ সম্পর্কে প্রত্যয়ের কোনও স্পষ্টতা ব্যাপ্তি এবং গভীরতা থাকে না। তাইতে অনেক-কিছুই না জেনে না বুঝে সে একটা মুহূর্ত হতে আরেকটা মুহূর্তে ছিটকে-ছিটকে চলে—কোথায় যে চলছে তাও তার অজানা। তার অস্তিত্বের প্রতিটি ক্ষণের পিছনে যে এক শাশ্বত সত্যের অর্থ-ক্রিয়াকারিতার আবেশ রয়েছে, তা তার কল্পনারও অগোচর।

কিন্তু চেতনার এই সঙ্কোচ এবং অনিশ্চয়তা অতিমানসের মধ্যে একেবারেই নাই। তারার একটি বিন্দুকে দেখতে গিয়ে তার পিছনে সে প্রত্যক্ষ করে এক অনন্ত অবর্ণ আকাশকে, যাহতে ওই তারার বিসৃষ্টি। একটি তারার সঙ্গে ঋতের ছন্দে সে গাঁথা দেখে সব তারাকে—যারা ফুটেছে এবং এখনও যারা ফোটেনি সবাইকে। এই নিগূঢ় আনন্দে রোমাঞ্চিত অবর্ণ আকাশই যে তারার বর্ণালিতে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে—এই প্রত্যক্ষে সে পায় তারার জীবনায়নের পূর্ণ পরিচয়। জড় প্রাণ মন বা অতিমানসের ভূমিতে যেখানে যা-কিছু বিসৃষ্টি, তাকে সে জানে এক অনন্ত শাশ্বত সত্যেরই আত্মরূপায়ণ বা কায়ব্যূহনরূপে (incarnation)। যা আছে তা-ই হয়ে চলেছে—এই তার ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার মৌল প্রত্যয়। অতিমানসের এ-দৃষ্টি সৃষ্টির সমধর্মা। তখন সত্যকে দেখাই মানে সত্য হওয়া এবং তারই প্রবেগে সত্যকে হওয়ানো। সত্যের দৃষ্টি তখন চিন্ময়—আনন্ত্যের উৎস হতে সত্যের ঋতচ্ছন্দা সৃষ্টিও।

এই সৃষ্টির মধ্যে আছে প্রমুক্ত চেতনার এমন-একটা স্বাচ্ছন্দ্য যা সীমার মধ্যে সবসময় অসীমের ব্যঞ্জনাকেই ফুটিয়ে চলে। মন খণ্ডকেই একান্ত করে দেখে—অখণ্ডকে নয়; আর অতিমানস অখণ্ডের আবেশেই খণ্ডকে দেখে। দুয়ের মধ্যে তফাত এইখানে। তাইতে অতিমানস ভাবনা ব্যবহারিক জগতে যখন বিপ্লব আনতে চায়, তখন প্রাক্তনকে সে ধ্বংস করে না, কিন্তু নূতনের

বীর্যে রূপান্তর ঘটিয়ে তার অন্তর্গূঢ় স্বরূপসত্যকেই মুক্তি দেয়। ঐকান্তিকতার (exclusiveness) দুরাগ্রহ তার মধ্যে নাই, আছে এক পরম সত্যের মধ্যে সব সত্যের সমাহার ঘটানোর সাবলীলতা। তার সমস্ত ভাবনা সঙ্কল্প এবং কর্ম এক সর্বসমঞ্জস সর্বতোভদ্র আনন্দ-চিন্ময় সত্যের উদ্দীপনায় নিত্যপ্রভাস্বর।

অতিমানস ভাবনা এবং চেতনা যখন ব্যাবহারিক জগতে একটা-কিছু সৃষ্টি করতে চায়, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তার চলন যেন প্রাকৃত মনের চলনেরই মত। কিন্তু বস্তুত তা নয়, দুটি চলনের মধ্যে আকাশ-পাতালের তফাত। সব সৃষ্টির মূলেই আছে সৌষম্যের (harmony) প্রেরণা। সৌষম্য বৈচিত্র্যকে একটা বিশিষ্ট অর্থে সংহত করে; তাছাড়া তার মধ্যে থাকে একটা ছন্দোময় আবর্তনের দোলা। মনের কাছে এই অর্থ কোন-এক ব্যাবহারিক স্থূল প্রয়োজনের দ্বারা শাসিত, কেননা স্বভাবতই মনের দৃষ্টি সীমিত; আর আবর্তন তার কাছে চিরাভ্যস্তের পৌনঃপুনিকতা মাত্র। চিরকাল সে যা ভেবে এসেছে, তাকে সে ছাপিয়ে উঠতে পারে না; অথবা জীবনের পরিচিত অর্থের গভীরে কোন পরমার্থের ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করাও তার অসাধ্য। কিন্তু অতিমানসের ভাবনা ও সঙ্কল্প আনন্ত্যের সঙ্গে নিত্যযুক্ত বলে তার মধ্যে আছে একটা সর্বগ্রাহী এবং সর্বাবগাহী ব্যাপ্তি, একটা অসঙ্কোচ সাবলীলতা। সব অর্থকেই এক পরমার্থের বিসৃষ্টি বলে সে জানে, তাই তার গতির মধ্যে থাকে সব-কিছুকে আপন করে নেওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য। অধিষ্ঠান-চৈতন্যের আবেশ তার সামর্থ্যের উৎস; তার মধ্যে শক্তির আর জ্যোতির অফুরন্ত যোগান আসে সেইখান থেকেই। তার গতিতে যে-ছন্দের আবর্তন, তাতে পৌনঃপুনিকতার একঘেয়েমি নাই, আছে প্রতি পর্বে অভিনবের ব্যঞ্জনা, চিন্ময় প্রাণের অজর রসোচ্ছলতা। অথচ তার পরিণামের ধারার মধ্যে এমন একটা অনতিবর্তনীয়তা আছে, যা নিজেকে বাঁধে উল্লাসকে ঋতচ্ছন্দে মুক্তি দেবার জন্য; যেমন দেখি, নৃত্যের ছন্দোবন্ধে শিল্পীর স্বরূপানন্দের মুক্তি।

বৃহতের সঙ্গে নিত্যযুক্ত বলে বৈচিত্র্যের মধ্যে সৌষম্য আনা অতিমানসের পক্ষে সহজ। মন এমন করে সহজ হতে পারে না, চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা হল তার স্বভাব। আর অতিমানস যেন মহাসমুদ্র, অতিবড় বিক্ষোভকেও সে তার ছন্দের সঙ্গে সহজে মিলিয়ে নিতে পারে। সাধনজীবনে এটি বেশ নজরে পড়ে। যতক্ষণ আমরা মন নিয়ে সাধন করি, ততক্ষণ আমাদের ঝামেলার আর অন্ত থাকে না—অবিদ্যার দুরাগ্রহ কেবলই আমাদের পথ ভোলায়। আর

বৃহতের কাছে আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে মন যতই অতিমানসের দিকে এগিয়ে যায়, ততই পথের জটিলতা দূর হয়, কঠিন দিন-দিন সহজ হয়ে আসে। তখন করবার পালা ঘুচে গিয়ে দেখা দেয় হবার পালা; মনের প্ররোচনায় আমরা করি, আর অতিমানসের আবেশে হয়ে উঠি। সে-হওয়া অসীমের আলোয় ফুলের মত ফুটে ওঠা। বর্ণের বৈচিত্র্য তখন এক শুভ্র জ্যোতিরই সহজ বিচ্ছুরণ—তার মধ্যে বিরোধ নাই, আয়াস নাই, সঙ্কল্পের অপঘাত নাই।

*

এখন দেখা যাক, অতিমানসের আবেশে প্রাকৃতমনের কি রূপান্তর ঘটে। তার জন্য প্রথমে প্রাকৃতমনের একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রাকৃতমনের প্রধান নির্ভর হচ্ছে যুক্তি-বুদ্ধি (reasoning intelligence)। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর দুটি বৃত্তি—বোধি (intuition) এবং প্রাণ-মানস (life-mind)। বোধি বস্তুত বুদ্ধির ওপারের একটি বৃত্তি, বুদ্ধির মধ্যে তার ক্রিয়া সাধারণত কতকটা ব্যামিশ্র হয়ে দেখা দেয়। প্রাণ-মানসের মধ্যেও একধরনের আচ্ছন্ন বোধির ক্রিয়া আছে, তা নীচে থেকে বুদ্ধিকে তার মালমসলা যুগিয়ে দেয়। এ-দুটিই স্বরূপত চিদ্‌বৃত্তি এবং তাদের নিজস্ব প্রকাশের একটা স্বাচ্ছন্দ্যও আছে যা সাধারণত বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু মানুষের মনোজীবনকে গড়ে তোলবার পক্ষে এ-দুটি বৃত্তিই পর্যাপ্ত নয়।

ইন্দ্রিয়সংবিৎ, সহজ-সংস্কার, প্রবৃত্তির প্রবেগ—এইগুলি হল প্রাণ-মানসের প্রধান উপাদান। ইতরপ্রাণীর মধ্যে প্রাণ-মানস যেমন অন্ধ অথচ নিশ্চিতভাবে কাজ করে যায়, মানুষের মধ্যে বুদ্ধির সংস্পর্শে এসে সে আর তা পারে না। বুদ্ধি তার মধ্যে খানিকটা দ্বিধার সৃষ্টি করে, তাইতে প্রাণ-মানসের ক্রিয়া কিছুটা বিকল হয়ে পড়ে। কিন্তু তাবলে সচেতন বুদ্ধি অবচেতন প্রাণ-মানসের এলাকায় আবার ফিরে যেতে পারে না। প্রাণের কাছে বুদ্ধির পরাভবে তাহলে মানুষের চেতনার প্রগতি অবরুদ্ধ হয়ে যাবে।

বোধির উৎস হল অতিমানস। কিন্তু বুদ্ধিতে তার ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত নয়। প্রজ্ঞানকে সে বুদ্ধির সামনে ইন্দ্রিয়সংবিতের মতই স্পষ্ট করে ধরতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না—কতকটা বোধির দুর্বলতায় এবং কতকটা বুদ্ধির দুর্বলতায়। বিদ্যুৎঝলকের মত কত-কিছুই আমাদের মনে 'ভাসে', কিন্তু বুদ্ধিমান বলেই আমরা তাদের উপর নির্ভর করতে পারি না,

কিংবা এই প্রাতিভসংবিতের অনুশীলনের দ্বারা তাকে জোরালো করে তুলতে ভরসা পাই না।

বুদ্ধি আছে বোধি আর প্রাণ-মানসের মাঝামাঝি যেন একটা অন্তরিক্ষ-লোকে। প্রাণ-মানস অবচেতন, আর বোধি অতিচেতন। দুয়ের মধ্যে রয়েছে সচেতন বুদ্ধি। তার একটি কাজ হচ্ছে প্রাণ-মানসের উপর আলো ফেলে তার ঘোর কাটিয়ে তাকে স্বচ্ছ করে তোলা : পশু যা বেহুঁশ হয়ে করে, মানুষ তা করতে চায় হুঁশে থেকে, কেননা তাইতে সে প্রকৃতির বশ্যতা হতে মুক্ত হয়ে স্বরাট্ হতে পারে। তেমনি বুদ্ধির আরেকটি কাজ হচ্ছে উপর থেকে ঝিলিক-হানা, বোধির আলো-কে মনের মধ্যে একটা নিষ্কম্প শিখায় ফুটিয়ে তোলা। অবশ্য এ-কাজটি ঠিকমত করতে পারে পরা-বুদ্ধিই—যুক্তি-বুদ্ধি নয়। তবুও যুক্তি-বুদ্ধির মধ্যে খানিকটা গ্রহিষ্ণুতা এসে গেলে কাজটা সহজ হয়।

মুশকিল হচ্ছে, মানুষ বুদ্ধিকে যন্ত্র না ভেবে মনে করে সে-ই বুঝি যন্ত্রী। নানাক্ষেত্রে বুদ্ধির আপাতসাফল্যে উত্তেজিত হয়ে সে ভাবে, দুনিয়ার সব-কিছু বুদ্ধি দিয়েই বোঝা যাবে; যা যাবে না, তা বাতিল। বুদ্ধির এই গোঁড়ামি হল আধুনিক মনের একটা ব্যাধি। বুদ্ধির যান্ত্রিকতা আরও মারাত্মক এইজন্য যে, যে জেগে ঘুমায় তাকে জাগানো সহজ নয়। যে সত্যানুসন্ধিৎসু, তার বুদ্ধি হবে মুক্ত, চেতনার দিগন্ত প্রসারিত, কোনও-কিছু নিয়েই তার গোঁড়ামি থাকবে না। বোধির বৈদ্যুতীকে বুদ্ধি যদি তার প্রাপ্য মর্যাদা দেয়, প্রজ্ঞার অভিযান তবেই সার্থক হতে পারে।

বুদ্ধির কর্মধারা হল এই। সত্যের আবিষ্কারের জন্য প্রথমত সে যথা-সম্ভব কতকগুলি প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে, তার পর সেগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে অনুমননের সাহায্যে একটা প্রকল্প (hypothesis) খাড়া করে, এবং অবশেষে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে প্রকল্পটি তার দ্বারা সমর্থিত হল কিনা। মানুষের কাছে তথ্যসংগ্রহের দুটি ক্ষেত্র রয়েছে—একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ, আরেকটি বুদ্ধিগ্রাহ্য অন্তর্জগৎ। নিজের অন্তর্জগৎকে মানুষ সাক্ষাৎভাবে জানতে পারলেও অপরেরটা সে জানে অনুমান এবং উপমানের (analogy) সাহায্যে। অতীন্দ্রিয় জগতের সাক্ষাৎ জ্ঞান বুদ্ধির এলাকার বাইরে, তার সম্পর্কে তার আগ্রহও নাই। আর জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মার জ্ঞান সে আহরণ করে দেহ প্রাণ ও মনের ক্রিয়ার পর্যালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পের সহায়ে। সব ক্ষেত্রেই বুদ্ধির বিচারধারা একই রকম—তথ্যাহরণ, অনুমনন,

প্রকল্প, পরীক্ষণ। প্রকৃতিপরিণামের সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধির এই বৃত্তিগুলি আরও মার্জিত এবং তীক্ষ্ণ হয়, তার গবেষণার ক্ষেত্রের প্রসার ঘটে, কিন্তু তার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির কোনও রূপান্তর হয় না। মানুষের যুক্তি-বুদ্ধির বর্তমান উৎকর্ষ প্রকৃতিপরিণামের একটি বিশিষ্ট কীর্তি।

মনের আরেকটি সপ্রয়োজন করণ হল স্মৃতি। স্মৃতি তিন রকমের : এক হল ব্যক্তিমানসের স্মৃতি, যার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত, আরেক হল জাতি-মানসের স্মৃতি যা আমাদের মধ্যে নিহিত থাকে সহজাত সংস্কারের আকারে। এছাড়াও একধরনের অব্যক্ত স্মৃতি আছে, একটুখানি চাপ দিলে যা ভিতর থেকে ফুটে বেরতে পারে। স্মৃতিতে অতীত অভিজ্ঞতার সমাহার ঘটে। যুক্তি-বুদ্ধি তাকে যথাসম্ভব তার গবেষণার কাজেও লাগায়। কিন্তু লৌকিক স্মৃতির উদ্ভাসের মত একধরনের অলৌকিক স্মৃতির উদ্ভাসও সে সম্ভব, সে তার খবর রাখে না; কেননা দেহ প্রাণ মনকে ছাপিয়ে আর-কোনও তত্ত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে সে নিরুৎসুক।

স্মৃতি আর যুক্তি-বুদ্ধির আরেকটি সহায়ক হল কল্পনা। কল্পনার কারবার ভূতার্থকে (actualities) নিয়ে নয়, ভব্যার্থকে (possibilities) নিয়ে। কল্পনা অজানা সত্যের আভাস নিয়ে আসে। কিন্তু জানা তথ্যের যে-নৈশ্চিত্য তা কল্পনার না থাকতে পারে, যুক্তি-বুদ্ধির এই একটা ভয়। তবুও প্রকল্প (hypothesis) গড়বার সময় তাকে কল্পনার শরণ নিতেই হয়, নইলে তার সত্যানুসন্ধিৎসার অভিযান অচল হয়ে পড়ে। উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনায় নৈশ্চিত্যের অভাব থাকতে পারে বটে, কিন্তু তবুও কল্পনাতেই মানুষের মনের মুক্তি। বস্তুত কল্পনা একেবারে অবাস্তব একটা মনোবৃত্তি নয়, তার গভীরে রয়েছে বোধির একটা চাপ। আপাতত-অজ্ঞাত একটা-কিছুর অস্পষ্ট বোধ থেকেই মনে কল্পনা জাগে। মনের তটস্থ অন্তর্মুখীনতার দ্বারা বোধে এই স্ফুরত্তাকে যদি সক্রিয় করে তোলা যায়, তাহলে কল্পনা উত্তীর্ণ হতে পারে প্রাতিভসংবিতের পর্যায়ে—যা নাকি অতীন্দ্রিয় সত্যের অনুভাবক বোধিরই সগোত্র।

যুক্তি-বুদ্ধি যেভাবে সত্যকে যতটুকু জানে, তা-ই যদি জ্ঞানের পর্যাপ্ত সাধন হত, তাহলে কথা ছিল না। আধুনিক জগতে বুদ্ধির জয়জয়কার। কিন্তু তাতে মানুষের বহির্জগতের জ্ঞান যত বাড়ছে অন্তর্জগতের জ্ঞান—বিশেষত অধ্যাত্মজ্ঞান—সেই অনুপাতে বাড়ছে কই? এবং তার অভাবে সভ্যতার সঙ্কটও কি দিনের পর দিন নিদারুণ হয়ে উঠছে না? আর এই জন্যই মনে হয়, মন

একদিন বুদ্ধির এই দৈন্য ঘোচাবার জন্য বোধির শরণ নেবেই এবং চেতনার অতিমানসী শক্তির দ্বারা মানসী বৃত্তির সার্থক রূপান্তর ঘটাবেই।

*

মন আর অতিমানসের মধ্যে বোধি হল সেতু। ইন্দ্রিয় বস্তুকে যেমন সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারে, বোধিও তেমনি বস্তুর অন্তর্গূঢ় ভাবকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে। চেতনার অন্তরাবৃত্তিতে ভাবের প্রত্যয় প্রগাঢ় হয়, বিষয়ের বস্তুসত্তাকে ছাপিয়ে ওঠে তার ভাবসত্তা। এইটি বোধির ব্যাপার। বোধিকে আশ্রয় করে অতিমানস আরোহক্রমে প্রথম বুদ্ধির রূপান্তর ঘটায় বিজ্ঞানে। বিজ্ঞান কিন্তু যুক্তি-বুদ্ধির উন্নত সংস্করণ নয়, তার জাতই আলাদা। বিজ্ঞানে বিষয় আর বিষয়ীর মধ্যে ব্যবধান এত কমে যায় যে দুটিকে অনুভব হয় একই চিৎসত্ত্বের (Consciousness-Stuff) এপিঠ আর ওপিঠ বলে। বিষয়ের বোধ তখন আত্মবোধেরই একটি বৃত্তি। জানা তখন বিষয়কে বাইরে রেখে নয়, তাকে 'হৃদয়ঙ্গম' করে জানা একান্ত আত্মীয়রূপে। এই হল বিজ্ঞানের ধরন, আর এই বিজ্ঞানই অতিমানস যুক্তি-বুদ্ধির স্বধর্ম।

অতিমানস যুক্তি-বুদ্ধি বা বিজ্ঞান যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বোধ বা মননকে বাতিল করে দেয়, তা নয়। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বোধে রয়েছে জ্ঞাতা জ্ঞান আর জ্ঞেয়ের ত্রিপুটী। তার মধ্যে জ্ঞাতা যেন নেপথ্যে, জ্ঞান ব্যাপারটা অস্পষ্ট, চেতনায় স্পষ্ট শুধু বিষয়। অতিমানস ইন্দ্রিয়বোধেও এই ত্রিপুটীই আছে, কিন্তু সেখানে তিনটি পুটই চিন্ময়—চিন্ময় জ্ঞাতার চিন্ময় বৃত্তি দিয়ে চিন্ময় বিষয়ের বোধ। তেমনি অতিমানস মননেরও মধ্যে রয়েছে সত্তা মনন আর মন্তব্যের চিন্ময় সাযুজ্য। উভয় ক্ষেত্রেই বোধ আর মননের ব্যাপারটা হল এক পরিব্যাপ্ত অথচ চিদ্‌ঘন আত্মবোধেরই স্বগতভেদের উল্লাস—গ্রহীতৃ-গ্রহণ এবং গ্রাহ্য-চৈতন্যরূপে। এই রীতি অতিমানস বোধের সর্বত্র। প্রাকৃত বোধের ঠাটটা এখানে বজায় থাকতে পারে, কিন্তু তার তাৎপর্যের এমন আমূল রূপান্তর ঘটে যে আমাদের আটপৌরে ভাষা দিয়ে তাকে বোঝানো শক্ত।

প্রাকৃত বুদ্ধি যা দেখে, অতিমানস বুদ্ধি তা তো দেখেই, তাছাড়া আরও কিছু দেখে। প্রাকৃত বুদ্ধি বোদ্ধা আর বোদ্ধব্যের মধ্যে একটা কৃত্রিম ভেদের সৃষ্টি করে। 'আমি যা বুঝতে চাইছি, তা আমার বাইরে থাকবে এবং আমার ব্যক্তিগত কোনও সংস্কারের অনুপ্রবেশ তার মধ্যে ঘটবে না'—এই হল তার

বোঝবার রীতি। প্রাকৃত বুদ্ধি মনোবাসিত, আর মন অবিদ্যাকবলিত এবং খণ্ডদর্শী; সুতরাং বুদ্ধির এই সতর্কতা দোষের নয়। কিন্তু অতিমানস বুদ্ধিতে বিষয় আর বিষয়ীতে এমন বিজাতীয় ভেদ নাই, সেখানে দর্শন 'আত্মানম্ আত্মনি আত্মনা'—আত্মাকেই আত্মাতে আত্মা দিয়ে দেখা। অথচ প্রাকৃতমন যেভাবে তার নিজের বৃত্তিকে দেখে, এ তাও নয়। সে-দেখা হল সবার থেকে আলাদা হয়ে নিজের সংকীর্ণ রূপকে দেখা; আর এ-দেখা সব-কিছুকে নিয়ে নিজের বৃহৎ স্বরূপকে দেখা। একটির দ্রষ্টা অহং, আরেকটির দ্রষ্টা আত্মা। অতিমানস চেতনা স্বরূপতই বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ; তাই তার মধ্যে বৈয়ক্তিক (individual) অনুভবের ঘনতা শিশিরবিন্দুতে সূর্যবিম্বের মত বিশ্ব এবং বিশ্বাতীতকেই বিচ্ছুরিত করে।

দ্রষ্টা দৃশ্যকে নিজের থেকে তফাত রেখে দেখছে—এই হল প্রাকৃত দর্শনের রীতি। কিন্তু তারও বেলায় যেখানে সহমর্মিতা এবং সহৃদয়তা থাকে, সেখানে দৃশ্য দ্রষ্টার আত্মীয় হয়ে ওঠে—যেমন দেখি রসবোধ অথবা ভালবাসার ক্ষেত্রে। অতিমানসে এই তাদাত্ম্যবোধের চরম স্ফূর্তি। তাই বিষয়ের দর্শন সেখানে 'হিয়ার মধ্য হইতে করিয়া বাহির' যেন নিজেকেই দেখা। সংকীর্ণ অহংচেতনা যদি বিশ্বে বিস্ফারিত এবং বিশ্বাতীতে শূন্যবৎ তটস্থ না হয়, আবার বোধের গভীরে নির্বিশেষ ব্যক্তিত্বের চিদ্‌ঘনতায় সংহত না হয়, তাহলে দৃক্-দৃশ্যের এই আত্মীয়তা সম্ভবপর হয় না। অতিমানস দর্শনে তাই বিষয়দর্শন আত্মদর্শনেরই প্রকারান্তর।

অতিমানস দর্শনকে সক্রিয় করতে প্রথমেই তাহলে চাই বিশ্বের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধ। এই তাদাত্ম্যবোধ গভীর হয় কিন্তু আত্মবোধেরই গভীরতা হতে। চেতনার বৃত্তি তখন অন্তর্মুখ। আমার নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে যেখানে সত্তার গভীরে বিষয় আর আমি এক হয়ে আছি, সেইখান থেকে আমাকে বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করতে হবে। যোগীরা এই প্রক্রিয়াকে বলেন 'সংযম' কিনা ধারণা ধ্যান ও সমাধির একত্র সমাবেশ। এর ধারা প্রাকৃত জানার ধরনের একেবারে বিপরীত। প্রাকৃত চেতনা বহির্মুখ হয়ে বিষয়ের চারদিকে ঘুরতে থাকে আর নানাভাবে ঢুঁ মেরে দেখে ভিতরে ঢোকা যায় কিনা। আর সংযমে যোগীর চেতনা বিষয়কে একবার ছুঁয়েই অন্তরাবৃত্ত হয়ে তলিয়ে যায় নিজের মধ্যে এবং আত্মবোধের গভীরে তটস্থ থেকে জ্ঞাতব্য বিষয়কে স্বচ্ছন্দে ভেসে উঠতে দেয়। বিষয়ের জ্ঞান তখন আয়াসে আহৃত হয় না, অনায়াসে প্রতিভাত

হয়। সাধারণ প্রাতিভসংবিতের ক্রিয়ারও এই রীতি। সংযমের ক্ষিপ্রতা এবং সুকরতা নির্ভর করে আত্মবোধের গভীরতার উপর। আত্মবোধ যখন বাইরে-ভিতরে সমরস হয়, সমাধি আর ব্যুত্থানে যখন ভেদ ঘুচে যায়, তখন বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য আর সংযমের আয়াসটুকুরও দরকার হয় না। তখন 'যা জানবার মা-ই তা জানিয়ে দেন'।

সংযমের এইটি হল মুখ্য রীতি। তাছাড়া প্রাকৃত জ্ঞানের ধারা অনুযায়ী তার দুটি গৌণ রীতিও আছে। সংযম বিষয়েও প্রবর্তিত হতে পারে অর্থাৎ বিষয়কে আলম্বন করেই প্রত্যয়ের একতানতায় তার মধ্যে আত্মহারা হয়ে তলিয়ে যাওয়া যায়। অথবা বিষয়ের আভাসিত স্বরূপকে তার মধ্যে অনুপ্রবেশের দ্বারা খানিকটা স্পষ্ট করে তুলে তাকে আবার বিলোমক্রমে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে এনে আত্মবোধের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তোলা যায়। সংযমের যে-রীতিই অবলম্বন করা যাক না কেন, অতিমানস জ্ঞানের জন্য বিষয়ের ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ (sense-contact) অপরিহার্য নয়—বিষয়ের মানস রূপ এমন কি তার সম্পৃক্ত যে-কোনও ভাবনাও সংযমের আলম্বন হতে পারে।

প্রাকৃত বুদ্ধির তত্ত্বজ্ঞানের ধারা হল বিশেষদর্শন হতে সামান্যজ্ঞানে পৌঁছন: বিষয়কে বোঝবার জন্য আগে তার রূপ গুণ ক্রিয়া ইত্যাদির বিশ্লেষণ, তারপর সেই বিশ্লিষ্ট ধর্মগুলির সংশ্লেষণে তার একটা তাত্ত্বিক রূপ খাড়া করা। কিন্তু অতিমানস বুদ্ধির রীতি হল অবরোহক্রমে সামান্য হতে বিশেষে আসা। বিষয়ের সামান্যতত্ত্ব নিহিত আছে তার স্বভাবে। অতিমানস ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মতই বোধজপ্রত্যক্ষের দ্বারা সোজাসুজি দেখতে পায় প্রথমেই বস্তুর অন্তর্গূঢ় স্বভাব, তারপর সেই স্বভাব হতে উৎসারিত তার ভাব এবং রূপ। অতিমানস সৃষ্টিতে বিষয় যখন বিষয়ীরই আত্মবিভাবন (self-formulation), তখন স্বভাবকে প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে সে আত্মাকেই প্রত্যক্ষ করে। অতিমানস জ্ঞানে দৃষ্টির প্রত্যক্ (subjective) এবং পরাক্ (objective) বিভঙ্গ থাকতে পারে, কিন্তু আত্মা এবং অনাত্মার ভেদ সেখানে নাই। 'যস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ'—যার কাছে সবই আত্মা: এই হল অতিমানস দর্শন ও জ্ঞানের প্রকার। এখানে 'আত্মা' পুরুষ এবং 'সর্ব' সেই পুরুষেরই আত্ম-প্রকৃতি। স্বভাব আর রূপ আত্মপ্রকৃতিরই বিবর্তন—কারণে সূক্ষ্মে এবং স্থূলে। অতিমানস আত্মা থেকে রূপের দিকে অনায়াসে নেমে আসে এবং অবরোহক্রমে (by deduction) তার বোধ হয় বলে তার মধ্যে নৈশ্চিত্যের

অভাব থাকতে পারে না। অথচ প্রত্যয়ের নবীনত্ব তাতে ব্যাহত হয় না। কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধি রূপ থেকে ভাবের দিকে উজিয়ে গিয়েই খেই হারিয়ে ফেলে, আর তার ভাবসামান্যের জ্ঞানও হয় গড়পড়তা জ্ঞান (approximate generalisation), যার নৈশ্চিত্য নিঃসংশয় নয়।

বিশ্বের সব-কিছুই অতিমানস দর্শনের বিষয় হতে পারে। সে যখন জড়কে দেখে, তখন বাইরে থেকে তাকে কেবল উপরভাসা দেখে না, তার মর্মে অবগাহন করে দেখে রূপায়ণের প্রবর্তক গুণ শক্তি এবং চৈতন্যকে। এমনি করে পরচৈতন্যের প্রত্যক্ষও তার সম্ভব হয়। সেটা বাইরের অনুভাব (expression) থেকে ভিতরের ভাবের একটা আন্দাজ শুধু নয়—যেমন প্রাকৃত বুদ্ধির সচরাচর হয়ে থাকে; কিন্তু অনুভাবকে উপলক্ষ্য করে চৈতন্যের সঙ্গে চৈতন্যের সাযুজ্যে আত্মভাব হতে ভাবের আবিষ্করণ। এই মর্মাবগাহিতার দরুন যা লৌকিক প্রত্যক্ষের বাইরে, তাও অতিমানসের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে।

অতিমানস স্মৃতি প্রাকৃত স্মৃতির মত অতীত বাস্তবের পুনরুজ্জীবন মাত্র নয়। তার একটা বিশিষ্ট রূপ হচ্ছে নিত্য-সত্যের প্রত্যভিজ্ঞা (recognition), যা এক শাশ্বত ধ্রুব স্মৃতিরই যেন ঢাকনা খুলে দেওয়া। এই স্মৃতির সঙ্গে কল্পনা জড়িয়ে থাকে রূপকৃৎ সামর্থ্য নিয়ে। স্মৃতির 'ভূত' এবং কল্পনার 'ভব্য' সেখানে একই 'সম্ভূতির' এপিঠ-ওপিঠ। 'ধাতা যথা-পূর্বমকল্পয়ৎ'। এমনি করে বীজ হতে বনস্পতিকে ঋতচ্ছন্দে বিস্ফারিত করাই অতিমানস স্মৃতি এবং কল্পনার বিশিষ্ট ধর্ম।

অতিমানস বিচার তর্ক এবং মনন সবারই এক রীতি: তারা প্রাকৃত বুদ্ধির মত জানা থেকে অজানার দিকে হাতড়ে-হাতড়ে চলে না, এক বৃহৎ এবং গভীর জ্ঞান থেকেই অল্পের জ্ঞানকে স্বচ্ছন্দে অভিব্যক্ত করে চলে। এই জ্ঞান অবশ্যই আত্মজ্ঞান—যা ব্যক্তিত্বে বিন্দুঘন, বিশ্বাত্মবোধে পরিব্যাপ্ত এবং বিশ্বাতীতে অনির্বচনীয়। বোধি তার সহজ বৃত্তি। বোধির ক্রিয়া প্রাকৃত মনেও দুর্লক্ষ্য নয় এবং তার প্রাথমিক অনুশীলন মনোভূমিতেই করতে হয়। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে, মানসবৃত্তির ভেজাল সম্পূর্ণ দূর হয়ে বোধির শুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অতিমানসের সামর্থ্য পূর্ণভাবে প্রকট হয় না এবং তার জন্য একসময় মনোলয়ের দ্বারা নিরোধের সংস্কারকেও চেতনায় পাকা করে নিতে হয়।

২৪

অতিমানস সংজ্ঞান

মনের যত বৃত্তি সব অতিমানসেও আছে, কিন্তু সেখানে তাদের রূপ আর ক্রম আলাদা। অভিমানস মননের মত অতিমানস ইন্দ্রিয়সংবিৎও (sense) আছে। তবে তাকে ইন্দ্রিয়সংবিৎ না বলে একটি বৈদিক পরিভাষা অনুসারে বলব 'সংজ্ঞান'।

এই সংজ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে হলে যেতে হবে মনের উজানে—অন্তরাবৃত্ত চেতনার পরম গঙ্গোত্রীতে। চেতনার এমন-একটা ভূমি আছে, যেখানে সে গুহাহিত, আত্মনিবিষ্ট, আত্মারাম এবং নির্মেষিত শক্তির উপগূহনে নিস্পন্দ। এই আত্মসমাহিতির একদেশে একটা দিব্যক্ষোভ আছে, তাহতেই অতিমানসের পরাঙ্মুখী (objectivised) বৃত্তির সৃষ্টি হয়। এই বৃত্তির চারটি পর্যায় —তাদাত্ম্যজ্ঞান বিজ্ঞান প্রজ্ঞান এবং সবার শেষে সংজ্ঞান।

আত্মসমাহিতিতে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ থাকে না, ভেদ দেখা দেয় বৃত্তিতে। তাদাত্ম্যজ্ঞান হতে সংজ্ঞান পর্যন্ত বৃত্তির যেন অবরোহক্রম। সেই অনুসারে তাদের মধ্যে বিষয় আর বিষয়ীর ভেদের তারতম্য আছে। অতিমানস চেতনা যতই সংজ্ঞানের দিকে নেমে যায়, ততই বিষয়ের স্বরূপ তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু মানস জ্ঞানের মত বিষয় বিষয়ী হতে বিবিক্ত হয়ে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে নিজেকে স্পষ্ট করে না, বিষয়ীর আত্মপ্রত্যয়ের তীক্ষ্ণতাকে বজায় রেখেই সে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়সংবিতের সঙ্গে সংজ্ঞানের এইখানে তফাত।

তাদাত্ম্যজ্ঞানে বিষয় আর বিষয়ীর ভেদ যেন থেকেও নাই। বিষয় সেখানে বিষয়ীর আত্মবিভূতি। আমি যা জানি, তা 'হয়ে' জানি। সে-জানা 'আত্মনি আত্মানম্ আত্মনা'—আত্মাতে আত্মাকে আত্মা দিয়ে জানা। ভালোবাসার পরম রসায়নে দুয়ের এক হয়ে যাওয়ার মধ্যে এমনিতর জানার বিলাস আছে। এই জ্ঞানই আদিম জ্ঞান, আত্মমন্থনের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞানকে নিজের মধ্য থেকে উৎসারিত করা—বাইরে থেকে তাকে আহরণ করা নয়।

তার পরের ধাপ হল বিজ্ঞান, অতিমানসের যা একটি বিশিষ্ট বৃত্তি। বিজ্ঞান বিষয়কে বিষয়ীর সামনে এনে ধরে, কিন্তু বিষয়ীর সঙ্গে তার তাদাত্ম্যবোধকে

মোটেই লুপ্ত করে না। বিষয় বিষয়ীর সামনে উপস্থাপিত হয় বলে এখানে স্বরূপের সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞান হয় তার বৈভবেরও। বৈভবে ধর্মের বৈচিত্র্য থাকলেও তারা এমনই অন্যোন্যসংহত যে সব মিলিয়ে সেখানে দেখা দেয় জ্ঞানের একটি অখণ্ড সমাহরণ (integration)। অতিমানসের এই বৃত্তিকে অন্যত্র বলেছি সম্ভূতি-সংবিৎ (comprehensive knowledge)। সম্ভূতি হল বিভূতির সমাহার—যেমন শতদলের সবগুলি দলকে যুগপৎ বুদ্ধিস্থ ক'রে একটি অখণ্ড কমলের প্রত্যয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান এই অবস্থাতেও আত্মসমাহিতি ও তাদাত্ম্যজ্ঞান হতে স্খলিত হয়নি।

অতিমানস বিজ্ঞান থেকে আরেক ধাপ নেমে এলে অতিমানস প্রজ্ঞান। প্রজ্ঞানে পরাক্ (objective) দৃষ্টি আরও স্পষ্ট। সম্ভূতি-সংবিৎ এখানে রূপান্তরিত হয় বিভূতি-সংবিৎএ (apprehensive knowledge) : শতদলের প্রত্যেকটি দলকে তখন খুঁটিয়ে জানি, চাইকি তার কোনও-একটি দলের প্রতি বিশেষ নজর দিই। এতক্ষণ জ্ঞান ছিল যেন অব্যবহার্য, এইবার তা দর্শনে মননে বচনে স্ফুরিত হয়ে ব্যবহার্য হল। তবুও এ-প্রজ্ঞান অতিমানস চেতনারই একটি বৃত্তি, সুতরাং তার মধ্যে তার প্রাক্তন এবং ঊর্ধ্বতন বৃহত্তর সমাবেশ অক্ষুণ্ণই থাকে। সুতরাং অতিমানস প্রজ্ঞানে বিষয়ের আস্বাদনের কোনও ন্যূনতা ঘটে না, বরং ফোটে একটা সমৃদ্ধিমান্ চিদ্‌বিলাসের চমৎকারিতা।

তারপর আরেক ধাপ নেমে এলে বিষয়ের স্পষ্টতা যখন আত্মচৈতন্যের তীক্ষ্ণতা নিয়ে বিষয়ীর সামনে আবির্ভূত হয়, তখনই আমরা পাই অতিমানস বৃত্তির চতুর্থ পর্যায় বা সংজ্ঞান। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সংবিতের (sensation) মত সংজ্ঞানেও বিষয়ী আর বিষয়ের মধ্যে সন্নিকর্ষের (contact) একটা সেতু থাকে; তাতে প্রত্যয়টি বিষয়ী করণ (instrument) আর বিষয়ের ত্রিপুটীতে ভাগ হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনটির মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে থাকে তাদাত্ম্যবোধের এক অখণ্ডতা, তিনটিই এক সুদীপ্ত আত্মচৈতন্যের বিচ্ছুরণ। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষকে (sense-contact) আশ্রয় করেও এই সংজ্ঞান প্রবর্তিত হতে পারে এবং সিদ্ধদশায় তা হয়ও। তখন এই সাধারণ ইন্দ্রিয় নিয়েও বস্তুর মর্মমূলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তার অতিমানস সত্তা এবং শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তার ফলে উপনিষদ্‌বর্ণিত 'গূঢ়োত্মাকে' কেবল সূক্ষ্মদর্শীর অগ্র্যাবুদ্ধি দিয়েই নয়, এই স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়েও দেখা যায়।

*

প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে সংজ্ঞানের স্বরূপকে স্পষ্ট করে তোলা একটু কঠিন, কেননা আত্মচৈতন্যের যে-সন্দীপনায় এই বৃত্তির স্ফুরণ হয় তা প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর। প্রাকৃত অনুভবে বিষয় আর ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষই প্রধান, মনকে তারা যা দেখায় মন নিরুপায় হয়ে তা-ই দেখে। কিন্তু মনের এই ইন্দ্রিয়বশ্যতা তার স্বরূপ নয়। এই প্রাকৃত মনের মধ্যেও এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ততা আছে, যা নিজের ভিতর থেকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর এমন-কি অভাবিত বিষয়েরও রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে। সাধারণত আমরা একে বলি 'কল্পনা' এবং বাস্তবের তুলনায় তাকে খাটো করে দেখি। কিন্তু বস্তুত এই কল্পনাতেই মনের মুক্তি এবং তার স্ব-তন্ত্র সামর্থ্যের পরিচয়। অবিদ্যা-বাসনার সংস্কার থেকে মুক্ত হলে কল্পনা পরিশুদ্ধ হয়; তখন সে যোগিচিত্তের একটি বৃত্তি, যার পারিভাষিক নাম হল 'প্রতিভান' বা 'প্রাতিভ-সংবিৎ'। প্রতিভান ইন্দ্রিয়সংবিতেরই মত এক অলৌকিক প্রত্যক্ষের হেতু। তার স্থিতি মনের ওপারে—বোধির এলাকায়। সে সংজ্ঞানেরই একটি বৃত্তি এবং তাকে আশ্রয় করে অতিমানস ভূমিতে সংজ্ঞান বোধিকে বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানে ব্যাপারিত করে। তাহলে, ইন্দ্রিয়ের উজানে যেমন মন (অথচ সাধারণত যে ইন্দ্রিয়নির্ভর), তেমনি মনের উজানে বোধির এলাকায় সংজ্ঞান এবং তার অলৌকিক প্রত্যক্ষের বৃত্তি। এই প্রত্যক্ষ চিন্ময়।

প্রাকৃত ভূমিতে যেমন দেখি, ভাব বস্তুতে রূপ ধরে, মানসপ্রত্যক্ষ ঘনীভূত হয় ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে, তেমনি অতিমানসভূমিতে তাদাত্ম্যজ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান ঘনীভূত ও সাকার হয় এই সংজ্ঞানে। ওই তিনটিতে যা চিৎস্বরূপ চিন্ময় বা চিদ্‌ঘন, সংজ্ঞানে তা চিদ্‌ঘনবিগ্রহ। উপনিষদে আছে ব্রহ্মগন্ধ ব্রহ্মরস ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মস্পর্শের কথা। এগুলি রূপক নয়, সংজ্ঞানের চিন্ময় বৃত্তির দ্বারা চিন্ময় প্রত্যক্ষ। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও এ-প্রত্যক্ষ সম্ভব—ইন্দ্রিয় দিয়েই ব্রহ্মকে দেখা শোনা ছোঁয়া চাখা যায়। সে-অনুভবে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের পরম উল্লাস, প্রাণের নিঃসান্দ্র আরাম, মনের অনুত্তম রসায়ন। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই ব্রহ্মঘোষ তখনই সত্য হয়—যেমন অন্তরে, তেমনি বাইরে।

অতিমানস সংজ্ঞান সব-কিছুকে অনুভব করে ব্রহ্মরূপে, অনুভব করে ব্রহ্মের মধ্যে। সে দেখে, এক ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা সব-কিছু আবিষ্ট অনুবিদ্ধ এবং জারিত। কিন্তু এই একের অনুভবে বহুর জ্ঞান আড়াল হয়ে যায় না, একের মধ্যেই বহুর চিদ্‌ঘন বিন্দু হীরকদ্যুতিতে ঝিকিয়ে ওঠে। তখন দুইই অনন্ত—

যেমন একও অনন্ত, তেমনি বহুও অনন্ত। সীমার বেষ্টনীতে থেকেও বহুর আনন্ত্য স্ফুরিত হয় তার অর্থের আর শক্তির সীমাহীন ব্যঞ্জনায়। এ যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর উল্লাস, আত্মচৈতন্যের প্রজ্ঞানঘন নিবিড়তায় ব্রহ্মচৈতন্যের বিস্ফারণ। ইন্দ্রিয় দেখে রূপের খণ্ডতা; কিন্তু তাকে স্বীকার করে নিয়েই সংজ্ঞান দেখে তার অন্তর্গূঢ় শক্তি ও বৈভবের অনন্তে উধাও হয়ে যাওয়া। প্রত্যেকটি খণ্ড অনুভব তখন অখণ্ডের প্রত্যক্ষ দ্যোতনায় উদ্ভাস্বর। উপনিষদ যাকে বলেছেন 'আকাশ আনন্দ', সেই আনন্ত্যচেতনার মহাসমুদ্রে ইন্দ্রিয়ের অনুভব চিন্ময় বীচিভঙ্গের বিদ্যুৎ-বিসর্প। সামান্য চোখের দেখাও তখন সীমার গভীরে উন্মোচিত করে অসীমের আলেখ্য, রূপের আড়ালে ভাবের অফুরন্ত প্রচ্ছটা, সান্নিকর্ষকে উপলক্ষ্য করে সাযুজ্যের সান্দ্রতা। আর তাইতে অসাড়ের গভীরেও সাড়া জাগে, পাষাণী প্রকৃতির অহল্যা প্রতিমাও আনন্দ-কৈশোরের চিন্ময় স্পর্শে চিন্ময়ী হয়ে ওঠে, এই দৃষ্টিই অবন্ধ্য ক্রতুতে হয় নবসৃষ্টির প্রবর্তক। আর সে-সৃষ্টির আদ্যন্ত এক চিদ্‌বিলসিত আনন্দের মূর্ছনা।

এই অতিমানস সংজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় মহাবিদেহ-ধারণায়। দেহের মধ্যে তার প্রকাশ সম্ভব হলেও স্বরূপত সে দেহ-মনের ব্যাপার হতে স্ব-তন্ত্র, অন্তর্মনেরও নাগালের বাইরে। এই সংজ্ঞান সর্ববিৎ : সমাধির গাঢ়তায় নিবিষ্ট থেকেও যেমন অন্তঃপ্রজ্ঞ, তেমনি ঠিক সেইসময়েই বহিঃপ্রজ্ঞও; অর্থাৎ প্রজ্ঞান-ঘন সুষুপ্তির গভীর হতে সে অবাধে বিচ্ছুরিত হয় বিজ্ঞানময় স্বপ্ন ও জাগ্রতের ভূমিতেও। আবার তেমনি জাগ্রৎভূমি থেকেও বিলোমক্রমে অবগাহন করতে পারে স্বপ্ন- ও সুষুপ্তি-সংবিতের গভীরে—লোক হতে লোকান্তরে, ভূতভব্যের যবনিকার অন্তরালে, বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়ের অগম-রহস্যে। প্রাকৃত প্রত্যক্ষের নৈশ্চিত্য আছে, কিন্তু বিষয়ের মর্মে অবাধে অনুপ্রবেশের সামর্থ্য নাই। অতিমানস সংজ্ঞানের তাও আছে—যেন বৈজ্ঞানিকের রঞ্জনরশ্মির মত।

*

মনের অতিমানস রূপান্তর সিদ্ধ হয় তার মধ্যে অতিমানসেরই সক্রিয় আবেশে, যার অবন্ধ্য বীর্য তার সমস্ত করণকে এক সন্দীপন প্রতিভায় নতুন করে সঞ্জীবিত করে তোলে। ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃত শক্তি তখন ব্যাহত বা নিরুদ্ধ

হয় না। বরং তার মধ্যে এযাবৎ অপ্রকটিত এক দিব্য অনুভবের ঢল নামে, যাতে প্রমেয়ের (the thing to be known) আত্মা বিবৃত হয় প্রমাতার আত্মার কাছে, দৃক্ আর দৃশ্যের মধ্যে আত্মা-অনাত্মার ভেদ ঘুচে গিয়ে সমস্ত দর্শনটাই হয়ে ওঠে আত্মা দিয়ে আত্মার দর্শন—শুধু বিজ্ঞানে বা প্রজ্ঞানেই নয়, সংজ্ঞানেও। আর তাইতে দ্রষ্টা পুরুষের কাছে দৃশ্য প্রকৃতির সমস্ত বিভূতি এবং ঐশ্বর্য এক মুহূর্তে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

চোখ বিচিত্রকে দেখে। কিন্তু সে শুধু ক্যামেরার চোখ দিয়ে দেখার মত একটা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। মন সেই দৃশ্যের মধ্যে একটা অর্থের আরোপ করে, তখন দৃশ্যের অর্থের আবিষ্কারে দেখাটি সম্পূর্ণ হয়। সাধারণত এই অর্থের আরোপ হয় ব্যবহারের প্রয়োজনে, তাতে দৃশ্যের সমগ্র অর্থটি দ্রষ্টার কাছে প্রতিভাত হয় না। একজন কাঠুরের কাছে একটা গাছের যে-অর্থ, একজন বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী বা কবির কাছে তার অর্থ তার চাইতে অনেক বেশী। এবং প্রাকৃত জীবনের সীমিত প্রয়োজনের নিরপেক্ষ বলে তত্ত্ব ও রসের বিচারে সে-অর্থের মূল্যও বেশী।

এই সূত্র ধরে অতিমানস সংজ্ঞানের স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি। সে-সংজ্ঞানের দেখা এই সাদা চোখেই দেখা, কিন্তু অনন্তের মধ্যে রেখে সান্তকে দেখা। আনন্ত্যের অবিকল্প (devoid of mental construction) প্রত্যয়ের দ্বারা আবিষ্ট দ্রষ্টার চৈতন্য প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই বিচ্ছুরিত হয়ে সংজ্ঞানকে এক ক্রান্তদর্শী দিব্য সামর্থ্যে ভাস্বর করে তোলে। তাতে সান্তের মর্মচর অনন্তের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় তত্ত্বের ঐশ্বর্যে এবং রসের মাধুর্যে অনির্বচনীয় হয়ে এবং তার প্রয়োজন নিরূপিত হয় বিশ্বের ঋতচ্ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। একটি ঘাসফুলের মধ্যেও সংজ্ঞানী দেখেন ব্রহ্মের অপ্রমেয় সত্য আনন্দ আর শক্তির স্বচ্ছন্দ ঋতায়ন।

একটি ঘাসফুলের মধ্যে অনন্তের বিচিত্র সত্য আনন্দ ও ঋতচ্ছন্দই যে শুধু সংহত হয়ে আছে তা নয়, ওটি যেন বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের চিদ্‌ঘন বিন্দু, ওর মৌক্তিকচ্ছটায় অসীমের অনন্ত বিভাবনার কলাপী উচ্ছ্বাস যেন। ও সবার সঙ্গে এক, ওর অর্থে সবার অর্থ। যেমনি ও, তেমনি এই একটি, ওই একটি আরও একটি—অসীমের ফুলঝুরি অবিরাম ঝরছেই ঝরছেই। রূপে-রূপে একই অখণ্ড আনন্দকে পালটে-পালটে দেখা যেন একটি ওপালের (opal) বর্ণবিভঙ্গের লাস্যের লীলায়। সংজ্ঞানের এই লোকাত্মক অথচ

লোকোত্তর তুরীয় দর্শন।

যেমন দেখা, তেমনি শোনা আর ছোঁয়া—সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে মাত্রাস্পর্শের গহন হতে ব্রহ্মসংস্পর্শের অমৃত আনন্দের আহরণ এবং আস্বাদন। অনুভবের বিদ্যুৎসূচীতে আনন্ত্যের আভাস্বর চেতনায় এক অনির্বচনীয় ইন্দ্রধনুচ্ছটার বিচ্ছুরণ ও প্রবিলয় শূন্যতার অগম সান্দ্রতায়—যেখানে 'কিছুই-নাই' এর মধ্যেই 'সব-আছে'র অশব্দ অস্পর্শ অরূপ মূর্ছনা।

অতিমানস রূপান্তরের ফলে, প্রাকৃত দেহচেতনায় সঙ্কোচের যে-আড়াল রয়েছে তা ভেঙে যায়, এই শরীরের অনুভব রূপান্তরিত হয় 'আকাশশরীরং ব্রহ্মে'র অনুভবে। ব্রহ্মাণ্ড তখন গুটিয়ে আসে পিণ্ডে, পিণ্ড বিকীর্ণ হয় ব্রহ্মাণ্ডে। শক্তির কেন্দ্রাভিগ (centripetal) এবং কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) দুটি গতির দোলনে এই হৃদয়েরই ছন্দ স্পন্দিত হতে থাকে আদিত্যহৃদয়ের ছন্দে। আমার 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ' দৈহ্য আত্মা আলোকবর্তিকার মত কেন্দ্রে সংহত হয়ে যুগপৎ পরিধিতে পরিকীর্ণ। তার প্রভাস্বর পরিমণ্ডলের মধ্যেই বিশ্বের সমস্ত সত্ত্বের (beings) ও শক্তির অবাধ সঞ্চরণ। শুধু সঞ্চরণ নয়, অন্যোন্যসঙ্গমন—আলোকের যা স্বভাবধর্ম। এই ধর্মের অনুসরণেই প্রাকৃত চেতনার ভূমিতে দেখা দেয় সহবেদন (sympathy), অতিমানস চেতনায় যা অসীমগুণিত হয়ে রূপান্তরিত হয় সর্বাত্মভাবে। তখন এই রূপই বিশ্বরূপ, 'অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্র সর্বতোহনন্তরূপ' এই দেহেই 'দেবাঃ সর্বে তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘাঃ'। যেমন এই প্রাকৃত দেহের প্রত্যেকটি কোষের স্বাতন্ত্র্যকে তন্ত্রিত করে এক দেহীর পরম স্বাতন্ত্র্য, তেমনি এক বিরাট মহাভূতের স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত এই ভূতবিশেষসংঘের স্বাতন্ত্র্য। প্রতি জীব এক জীবঘনেরই কোষভূত, সব আমি এক পরম আমিরই স্ফুলিঙ্গ—আর এই প্রত্যয় এই আমিতে, যে-আমি যুগপৎ বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্বাত্মক এবং ব্যক্তি। সব হয়ে সবার মধ্যে আবিষ্ট হওয়ার আনন্দ তখন উল্লসিত হয় এই সত্ত্বতনুরই অণুতে-অণুতে—এমন-কি ব্যক্তির দুঃখের বিবাদী সুরও সঙ্গতি পায় বৃহৎ সামের সর্বসমঞ্জস নিটোল আভোগে। এই দেহের তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত ইন্দ্রিয়সংবিৎমাত্রেই হয় পরমানন্দের সংবিৎ।

*

দেহাশ্রিত প্রাকৃত মন ইন্দ্রিয় দিয়ে জানে বাইরের জগৎকে, আর সাক্ষাৎভাবে জানে তার অন্তর্জগৎকে। কিন্তু সাধারণত সে মনে করে তার এই আন্তর

অনুভবের উৎস রয়েছে বাইরে, বহির্জগৎই প্রতিনিয়ত তার অন্তর্জগতে তরঙ্গ তুলছে। উপনিষদে একেই বলা হয়েছে প্রাকৃত জীবের পরাক্ দৃষ্টি। কিন্তু এই বহির্মুখ দৃষ্টিতে বাইরেরও সব-কিছু জানা যায় না, দৃষ্টি প্রায়শ বস্তুর বাইরের রূপে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, তার অন্তরের তত্ত্বের সন্ধান পায় না।

কিন্তু এই পরাক্ দৃষ্টি ছাড়াও আছে 'আবৃত্তচক্ষু ধীরে'র প্রত্যক্‌দৃষ্টি, যোগীর অন্তর্দৃষ্টি৽ যা অন্তরাত্মাকে দেখে। এই আত্মবোধ একেবারেই বহির্জগতের বোধের নিরপেক্ষ, কেননা প্রথমটায় বাইরের জ্ঞান লুপ্ত হলে তবেই এই আন্তরজ্ঞান স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। অবশ্য তখনও আত্মবোধ দেহেরই আশ্রিত, কিন্তু তবুও দেহবোধ যে তখন এক চিদ্‌ঘন অথচ পরিব্যাপ্ত দেহ-বোধে রূপান্তরিত হতে থাকে, তার আভাস আগেই দিয়েছি।

এই আন্তর বোধের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এ যোগীর দৃষ্টির সামনে বহির্জগতেরও অন্তঃপুরের দুয়ার খুলে দেয়। এখন ইন্দ্রিয়ের কাছে দেহ শুধু প্রত্যক্ষ, প্রাণ মন ইত্যাদি একটা আবছা অনুমানের বিষয়। কিন্তু যোগীর অন্তর্দৃষ্টি তখন প্রাণ দিয়ে প্রাণকে মন দিয়ে মনকে চেতনা দিয়ে চেতনাকে অপরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে। এই দৃশ্য জগতের অন্তরালে তখন আপাত-অদৃশ্য আরেকটা জগতের পরম্পরা উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে।

জড়ের গভীরে রয়েছে প্রাণ, জড়জগতের অন্তরালে প্রাণের জগৎ। এখানে প্রাণকে মনে হয় একান্তই জড়াশ্রিত, যেন সে জড়েরই একটা প্রতিভাসমাত্র। কিন্তু বস্তুত এ তার সংবৃত্ত (involved) দশা, এছাড়াও তার একটা স্বাধীন স্ব-তন্ত্র ভূমি আছে, যেখানে থেকে এই অবরভূমিকে সে প্রভাবিত করছে। চেতনার অপ্রাকৃত অবস্থায় সে-প্রভাবের কিছু-কিছু আভাস আমরা পাইও। স্বধামে থেকে ক্রিয়াপর হবার জন্য প্রাণ যে-মাধ্যমকে আশ্রয় করে তা আর এই স্থূলভূত নয়—'ভূতসূক্ষ্ম' বা ভূতেরই ভাব বা শক্তিরূপ। প্রাণক্রিয়ার প্রত্যক্ষে যোগী এই ভূতসূক্ষ্মই প্রত্যক্ষ করেন এবং সে-প্রত্যক্ষ হয় তাঁর আত্মপ্রাণের প্রত্যক্ষের সমবেত (inherent)। এক্ষেত্রে প্রাকৃত মন অনুমান আর কল্পনার জোড়াতাড়া দিয়ে কোনরকমে কাজ চালিয়ে যায় মাত্র—যেমন ধরা যাক ভৈষজ্যের দ্বারা প্রাণকে নিরাময় করবার প্রচেষ্টায়। প্রাণের সঙ্গে সাক্ষাৎ কারবারে প্রথমটায় যোগীও খানিকটা মানস-সংস্কারের বশে হাতড়ে-হাতড়ে চলেন। কিন্তু পরিপূর্ণ আত্মপ্রবোধন এবং অতিমানস শক্তিপাতের ফলে মানস সংস্কার নির্মূল হয়ে

গেলে দিব্যপ্রাণের প্রজ্ঞান শক্তি ও প্রবর্তনা যোগীর মধ্যে স্বরূপেই আবির্ভূত হয়।

এই আবির্ভাব স্থূল অন্নময় কোশেই ঘটে এবং তার ফলে তার অন্তরে এবং তাকে ঘিরে রয়েছে যে প্রাণময় কোশ তার চেতনা যোগীর মধ্যে প্রজ্বল হয়ে ওঠে। যোগী তখন স্থূল অন্নময় শরীরেই বাস করেন না, বাস করেন সূক্ষ্ম প্রাণময় শরীরেও। এ যেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ে এক টুকরা কয়লার আগুন হয়ে ওঠার মত। কয়লার মধ্যকার তাপ তখন বাইরের তাপের সঙ্গে একাকার। জড়ের জগৎ বস্তুত বিশ্বপ্রাণের মধ্যে নিমজ্জিত এবং তার দ্বারা অনুবিদ্ধ। এই প্রাণ সম্পর্কে সচেতন হলে পর যোগী সাক্ষাৎভাবে তার শক্তিকে আহরণ নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চালন করতে পারেন। নিজের দেহের মত করে প্রাণকে পরের দেহেও প্রত্যক্ষ করা কিংবা তার ক্রিয়াকে পরিচালিত করা তখন অসম্ভব হয় না। প্রাণ সম্পর্কে এই অপরোক্ষ সচেতনতা এবং তার স্বচ্ছন্দ বশীকার অতিমানস শক্তিপাতের ফলেই অনায়াস হতে পারে।

তখন দেহকে আশ্রয় করে জীবে-জীবে যে ভেদের প্রাচীর তা ভেঙে পড়ে, এক বিশ্বব্যাপ্ত চিন্ময় প্রাণসমুদ্রের বিদ্যুৎপ্রবাহ যে সব-কিছুকে পরিপ্লুত করে রয়েছে এ-অনুভব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যোগীর দেহ তখন হয় প্রাণবিচ্ছুরণের একটা শক্তিকূট, দেহের বাধা দূর হয়ে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ হয় সাবলীল। জাগে এক অনির্বচনীয় প্রাণসংবিৎ (vital sense) যার তন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্ব-প্রাণের আনন্দমূর্ছনা বিচিত্র সুরলীলায় ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। অতিমানসের আবেশ এবং প্রশাসনে এই প্রবুদ্ধ প্রাণচেতনা তখন হয় জীবনের মর্মমূলে দিব্য-সংকল্পের অবন্ধ্য স্ফুরণের স্বচ্ছন্দ বাহন।

*

প্রাণচেতনা ও প্রাণসংবিতের উদ্‌বোধনে সাধকের মধ্যে যেসব অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্ফুরণ হয়, সাধারণত তাদের ফেলা হয় চৈত্য (psychical) বিভূতির এলাকায়। প্রাকৃত ভূমিতে চৈত্যসত্তা ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী বহির্মনের আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকে; চিত্তের অন্তরাবৃত্তিতে তার শক্তি ও প্রভাব স্ফুরিত হয়ে এইসব অতীন্দ্রিয় এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষের পথ খুলে যায়, একথা সত্য। কিন্তু এসব অনুভবেরও দুটি জাত আছে—একটি ব্যামিশ্র, আরেকটি শুদ্ধ। সাধকের

চিত্ত যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বাসনা এবং সংস্কারের আবিলতা হতে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ ফোটে সত্য-মিথ্যায় মেশানো ব্যামিশ্র বিভূতি। এগুলি কতকটা যেন প্রাকৃতভূমির স্বপ্নের মত। বিপদ হচ্ছে এই, এদের মধ্যে যেটুকু সত্যের প্রকাশ ঘটে, তা-ই নিয়ে সাধকের অহঙ্কার শক্তিমত্ততায় ফেঁপে উঠে তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। মহাজনেরা সিদ্ধাইএর পিছনে ছুটতে বারণ করেন এইজন্য। সমাধিতে বিভূতির স্ফুরণ হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সমাধি চিত্তের সব ভূমিতেই হতে পারে, অথচ সব ভূমিই কিছু বিদ্যার ভূমি নয়। তাই প্রথমটায় বিভূতির স্ফুরণকে উপেক্ষা করে সাধকের কর্তব্য চিত্তকে অবিদ্যার সংস্কার থেকে মুক্ত করা। সমাধি যখন প্রজ্ঞার ভূমিতে প্রবর্তিত হয়, তখন দেখা দেয় বিদ্যার শুদ্ধ বিভূতি। তার অনুভবে যেমন নির্ভেজাল সত্যের প্রকাশ, ব্যবহারেও তেমনি বিশ্বভাবন ঋতের লীলায়ন।

চৈত্যবিভূতির বস্তুত কোনও অন্ত নাই। এখানে তাদের রূপ আর রীতি নিয়ে একটা মোটামুটি আলোচনাই সম্ভব। স্থূল ইন্দ্রিয়সংবিতের অনুরূপ সূক্ষ্ম সংবিৎও আছে। যোগের ভাষায় তাদের বলা হয় 'প্রাতিভ-সংবিৎ'—যেমন দিব্য শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের সংবিৎ। এদের মধ্যে সাধারণত রূপসংবিৎ ফোটে সবার আগে। ভূতাকাশে যে ভৌতিক রূপ ফোটে তাকে গ্রহণ করে ভৌতিক চক্ষু; তেমনি চিত্তাকাশে চৈত্তরূপকে গ্রহণ করে দিব্য চক্ষু। এগুলি ভৌতিক জগতের ভূত বা ভব্য অর্থের ছবি হতে পারে। দৃষ্টি খুলে গেলে নানাভাবে এদের দেখা যায়—সমাধিতে বা ব্যুত্থানে, চোখ বুজে বা চোখ মেলে, বাইরে বা ভিতরে, দেশ বা কালের সমস্ত ব্যবধান ছাপিয়ে। কিন্তু সর্বত্রই বিষয়ী আর বিষয়ের সন্নিকর্ষ এত নিবিড় হয় যাতে অনুভব হয়, এ যেন বিষয়চৈতন্যেরই বিভূতি, গাছে ফুল ফোটার মত করে ফুটছে। অন্তরাবৃত্ত চেতনায় বোধের গতি তখন ভিতর থেকে বাইরের দিকে।

প্রাতিভসংবিতের মত চিত্তাকাশে ভাবের রূপকল্পও ফোটে। এগুলি কখনও জাগে সাধকেরই চেতনার গভীর হতে, কখনও-বা সংক্রামিত হয় পরচিৎ-এর পরিমণ্ডল হতে। প্রকৃতিতে এরা ব্যামিশ্র, সত্য-মিথ্যার ভেজালে তৈরী, বুদ্‌বুদের মত কিছুক্ষণ থেকে আবার মিলিয়ে যায়, সাধকের দেহ-প্রাণ-মনের উপর রেখে যায় ভাল-মন্দের ছাপ। কখনও তারা আসে পার্থিব স্তর থেকে, কখনও-বা অপার্থিব অন্য-কোনও স্তর থেকে।

চৈত্যবিভূতির আরেকটি প্রকার হচ্ছে প্রাতিভসংবিতের সহায়ে পার্থিব বা

অপার্থিব সত্ত্বের (beings) সঙ্গে সংযোগ ঘটানো। এমনি করে জড়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের চৈত্যসত্তাকে সক্রিয় করে তোলা যায়—জড়ভূত তখন হয় যোগীর অধ্যাত্মশক্তির বাহন। আবার জাগ্রৎ বা স্বপ্ন-সমাধিতে আত্মচৈতন্যের সংহনন (consolidation) ও পুরঃক্ষেপের (projection) সহায়ে লোক-লোকান্তরের সত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন—এও চৈত্যবিভূতির আরেকটি প্রকার।

অন্যত্র বলেছি, পৃথিবীর উপরে-নীচে প্রাণ ও চেতনার আরও লোক বা ভুবনের পরম্পরা রয়েছে : উপরের দিকে রয়েছে দেবলোক এবং সত্তার অন্যান্য মহাভূমি। এই ভুবনগুলি ওতপ্রোত, তাই অজানতে আমাদের পার্থিব জীবনকেও তারা প্রভাবিত করে চলেছে। চৈত্যসত্তার জাগরণে এইসমস্ত প্রভাব আমাদের সুস্পষ্ট অনুভবের এলাকায় আসে। প্রথমত তারা চেতনায় ভেসে ওঠে প্রতিচ্ছবি বা প্রতীকের আকারে। চিত্ত সংস্কারমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এদের অর্থ ঠিক-ঠিক বোঝা যায় না বা এদের ঠিকমত কাজে লাগানো যায় না। তাই প্রথমটায় তটস্থ থেকে এদের শুধু দেখে যেতে হয়—নিজের বাসনার অনুকূলে এদের ব্যাখ্যা বা ব্যবহার করবার চেষ্টা না করে। নিঃস্পৃহ দ্রষ্টৃত্বের ফলে ক্রমে এদের সঙ্গে পরিচয় যখন প্রগাঢ় হয়, তখন পার্থিব ভূত আর শক্তির মতই এদের বিবিক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়। জড় আর জড়োত্তরে তখন কোনও ভেদ থাকে না —জড়ের ভিতর হতে শক্তির মুক্তিতে এবং জড়োত্তর শক্তির সংহননে দুটিকে অনুভব হয় একই চিৎসত্ত্বের (Spiritual Existent) এপিঠ আর ওপিঠ।

গীতায় মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃত মনে বিষয়সম্পর্কে ইন্দ্রিয়সংবিতের তীক্ষ্ণতা নাই। একটা-কিছুকে আমরা দেখি খুবই স্পষ্ট করে, কিন্তু তার সম্পর্কে আমাদের ভাবনা প্রায় সবসময়েই আবছা। আবার আমাদের মন নিজের জগতের সম্পর্কে খানিকটা ওয়াকিবহাল হলেও অপরের মন সম্পর্কে একেবারে দিনকানা—সেখানে আবছা অনুমানের ওপর তার সব নির্ভর। অথচ সব মনই এক বিরাট মনঃসমুদ্রে ঢেউএর মত—একের দোলা অপরকে অহরহ দুলিয়ে দিচ্ছেই। প্রাকৃত ভূমিতে এই দোলনকে আমরা বশে আনতে পারি না। কিন্তু অন্তর্মুখীনতা এবং তটস্থতার ফলে চৈত্যসত্তা যখন আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, তখন গভীরসমুদ্রে শক্তির যে-আন্দোলন উপরের ঢেউকে দোলাচ্ছে তাকে আমার সত্তার অন্তস্তলে অনুভব করি। তখন এই মনই হয় একাধারে সকল মনের বিচিত্র আন্দোলনের ধারক এবং প্রেরক। এই মনে এবং এই মন থেকেই তখন সব মনের দোলন। মন দিয়ে মন জানা এবং মন পাওয়া

তখন ইন্দ্রিয়সংবিতের মতই একটা সুস্পষ্ট অনুভবের বলক্রিয়ার (dynamism) ব্যাপার। অপরের মনের সঙ্গে যোগ তখন শুধু অন্তঃ-সমুদ্রের গভীরেই নয়, সাযুজ্যবোধ পাকা হলে তার শক্তি উপরের ঢেউএর দোলা পর্যন্ত প্রসর্পিত হতে পারে। অধ্যাত্মজগতে শিষ্যের মধ্যে গুরুর ভাব ও শক্তি সংক্রামণের এই রহস্য।

চৈত্যবিভূতির স্ফুরণকে আমরা যদি প্রাকৃত মনের ক্ষুদ্র বাসনার চরিতার্থতায় লাগাই, তাহলে সে হবে তার হানিকর অপব্যবহার। শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে শিবের আরাধনায়, তবেই তার সার্থকতা। বিভূতির উন্মেষ জানিয়ে দেয়, চেতনার প্রাকৃতভূমি ছাড়া আরও-সব মহাভূমি আছে, অধ্যাত্মশক্তির একটা বিপুল উৎস আমাদের মধ্যে নিহিত আছে। এই জ্ঞান আর শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে অহন্তার পরিতর্পণে নয়, আত্মার উন্মীলনে, প্রকৃতির রূপান্তর-সাধনে। বিভূতিতে শক্তির খানিকটা বাইরে ছলকে পড়েই, কেননা এ হল শক্তির ঐশ্বর্যের প্রকাশ। কিন্তু এই ঐশ্বর্যকে বাঁধতে হবে বৈরাগ্যের প্রশাসনে, গোড়া হতেই সাধককে শক্তির রাস টানতে হবে, তাকে অন্তর্মুখ এবং একাগ্র করতে হবে। 'সিদ্ধাই চাই না, চাই আমাকে অথবা চাই শুধু তোমাকে'—এই হবে সাধকের একমাত্র অভীপ্সা। শক্তির উচ্ছলন নিরুদ্ধ হয়ে তার প্রবেগ তখন অন্তরের পথ ধরে উজান বইবে বিশুদ্ধ আনন্দলোকের দিকে।

উত্তরবাহিনী শক্তির তখন আলম্বন হতে পারে দিব্য নাম এবং দিব্য রূপ অথবা দুই-ই। নাম হল মন্ত্র কিনা মননের চিদ্‌ঘন বীর্য। অর্থভাবনা বা পরিশুদ্ধ স্মৃতির সঙ্গে জপের ফলে তার শক্তি জাগে, শব্দ সচেতন ইষ্টবিগ্রহে রূপান্তরিত হয়। এই বিগ্রহ চিন্ময়, অরূপকল্প, শক্তির একটা বিদ্যুৎকূট—যা প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে চিদাকাশকে উদ্‌ভাসিত করে তোলে। সে-উদ্ভাস জমাট বাঁধে অকল্পিতপূর্ব দিব্যরূপে, নাম হয় রূপের প্রবর্তক। রূপোল্লাসে চৈতন্যের সমৃদ্ধি, বিচিত্র চৈত্যবিভূতির উচ্ছলন এবং পরিণামে ইষ্টসম্প্রয়োগ-জনিত সাযুজ্য। তারপর চিৎকেন্দ্র হতে শক্তির বিচ্ছুরণ ও সর্বাত্মভাব। শিব-সঙ্গমে তখন শক্তির সার্থকতা, শান্তিসমৃদ্ধ আনন্দের হিল্লোল।

*

অতিমানসের আবেশে চৈত্যসত্ত্বের রূপান্তর হল সিদ্ধির চরম। চৈত্যপুরুষ তখন হন বিজ্ঞানঘনপুরুষ। এই পুরুষের বিশিষ্ট লক্ষণ হল সর্বাত্মভাব—

চেতনায় হৃদয়ে মনে প্রাণে এমন-কি দেহেও সবার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। শুধু বিশ্বভূতের হৃদয়-মনের সঙ্গে নয়, বিশ্বপ্রকৃতিরও হৃদয়-মনের সঙ্গে সাযুজ্যবোধে বিজ্ঞানঘনপুরুষ যুগপৎ স্বরাট্ বিরাট্ এবং সম্রাট্। আত্ম-স্থিতিতে তাঁর স্বারাজ্য, বিশ্ববিভাবনায় বৈরাজ্য, আর সব হয়ে সব ছাপিয়ে যাওয়াতে সাম্রাজ্য। যে-জ্যোতি এই হৃদয়ে, সেই জ্যোতিই আদিত্যে এবং লোকোত্তর শূন্যতার অনালোকে। বিজ্ঞানঘনপুরুষের আত্মবোধ বিশ্বের সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধের রসে উল্লসিত, পলতোলা হীরার মত যেদিক থেকে আলো আসে সেইদিকেই সে ঝিকিয়ে ওঠে। গীতার ভাষায়, 'যে যেভাবে তাঁতে প্রপন্ন হয়, তিনি সেইভাবেই তাকে ভজনা করেন'। তিনি সবার সব-কিছু—শুধু এই লোকেই নয়, লোকে-লোকান্তরে, চেতনার সকল ভূমিতে।

অতিমানসের আবেশে চৈত্যসত্ত্বের যে-রূপান্তর ঘটে, তাতে দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। প্রথমটি হল ঋতচ্ছন্দ। প্রাকৃতমনের মধ্যে বেসুর নিত্য লেগেই রয়েছে। সুর জাগে চৈত্যসত্তার জাগরণে; কিন্তু তারও প্রথমটায় অ-সুরের অত্যাচার একেবারে থামে না, বরং আগের তুলনায় সুরের অভাবটা যেন বেশী করে বাজে। কিন্তু চৈতন্যের গভীরতায় ব্যাপ্তিতে এবং তুঙ্গতায় চৈত্যসত্তা যখন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার ভিতর দিয়ে বিশ্বের হৃদয়-মনের মৌল ঋতচ্ছন্দই প্রকাশ পায়, অন্তর-বাইরের সমস্ত অনুভব ও প্রবর্তনার মধ্যে খেলে এক অপরূপ সুরসঙ্গতির সৌষম্য। রূপান্তরের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল অনুভবের সহজতা। অন্তরে আশ্চর্যের এবং বাইরে অঘটনের মেলা—কিন্তু কিছুকেই তখন খাপছাড়া অপ্রত্যাশিত বা লোভনীয় বলে মনে হয় না, আলোর ঐশ্বর্যের মতই অনুভবের ঐশ্বর্য বাইরে-ভিতরে ফুটে ওঠে সহজের ছন্দে এবং সুরে। অতিমানসের মধ্যে রয়েছে সবাইকে নিয়ে অদ্বৈতের যে-সৌষম্য, তা-ই তখন জীবনে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে।

রূপান্তর সম্পূর্ণ হয় যখন অতিমানসের বীর্য আধারের ধাতুতে (substance) নিবিষ্ট হয়। আমাদের প্রাকৃত সত্ত্ব (being) প্রধানত তিনটি ধাতুতে গড়া—জড় প্রাণ এবং মন। সাধনা আমরা শুরু করি মন দিয়ে। রূপান্তরের কাজ প্রথম শুরু হয় মনে, এবং মনোধাতুর রূপান্তরে মানসভূমিতে তা শেষ হয়। অনেক সাধক এতেই তুষ্ট থাকেন, প্রাণ আর দেহের রূপান্তর তাঁরা চান না। কিন্তু পূর্ণযোগের লক্ষ্য হল আধারের সমগ্র রূপান্তর। যে আলো আনন্দ আর শক্তি মনে পেয়েছি, তাকে নামিয়ে আনতে হবে প্রাণে

এবং দেহেও। কয়লায় উপরে-উপরে আগুন ধরলেই চলবে না, আগুনকে ঢুকতে হবে একেবারে তার মজ্জার ভিতরে। এই অনুবেধের জন্য তার শক্তির সংহনন চাই। শক্তি সংহত হয়ে আছে আমাদের চৈত্যসত্ত্বে। যেমন আমাদের আছে স্থূল মর্ত্যতনু, তেমনি আছে সূক্ষ্ম ভাবতনু—চৈত্যসত্ত্ব যার আশ্রয়। শুদ্ধসত্ত্ব তার ধাতু বা উপাদান। সে শুদ্ধ চিন্ময় নয়, চিদ্‌ঘন। এই চিদ্‌ঘন ধাতুর বীর্যকে অবতারিত করতে হবে প্রাণে এবং দেহেও। প্রাণ এবং দেহে অনুপ্রবিষ্ট যোগাগ্নি ধাতুর রূপান্তর ঘটিয়ে তাদেরও অগ্নিময় করে তুলবে। বিজ্ঞানঘন-পুরুষ তখন সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। তাঁর মর্ত্যতনু শুধু ভাবতনুই নয়, চিৎশক্তির চরম সান্দ্রতায় সত্ত্বতনুও। এই তনুর এক আশ্চর্য তেজস্ক্রিয়তা (radio-activity) আছে, যা মৃদ্‌ধর্মের সঙ্কোচকে অতিক্রম করে যায়। বুদ্ধের মতই বিজ্ঞানঘনপুরুষ বলতে পারেন, 'যো মাং পশ্যতি স ধর্মং পশ্যতি',—যে আমাকে দেখে সে ধর্মকেই দেখে। 'ঋতং বৃহৎ' আকাশের অতনু যোগমায়ায় গড়া হয় তাঁর নিত্যসিদ্ধ সত্ত্বতনু। রূপান্তরের এই হল নিরবধিক অবধি।

অতিমানস চেতনা যখন চৈত্যসত্তাকে অধিকার করে তাতে আবিষ্ট হয়, তখন সে তার ধর্মের বা ক্রিয়ার কোনও ব্যত্যয় ঘটায় না, বরং অপরা প্রকৃতির সংস্পর্শে তাদের মধ্যে সংক্রামিত হয় যে মালিন্য বিভ্রম বা ন্যূনতা তা দূর করে তাদের প্রতিষ্ঠিত করে স্বভাবের ঔজ্জ্বল্যে, তার নিজের বৃহৎ জ্যোতি আনন্দ ও শক্তির স্ফুরত্তাকে ঝলকে-ঝলকে তাদের মধ্যে ঢেলে দেয়। নাম এবং রূপকে আশ্রয় করে চিত্তাকাশে চৈত্যবিভূতির যত উল্লাস, প্রাতিভসংবিতের যত ঐশ্বর্য, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাদের তাৎপর্য অসঙ্কোচ নিঃসংশয়তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চেতনার সমস্ত ভূমির সমস্ত অনুভব অতিমানস জ্যোতির আবেশে এবং জারণায় উত্তীর্ণ হয় 'ঋতং সত্যং বৃহৎ'-এর অবিপ্লুত মহিমায়।

বিজ্ঞানঘনপুরুষের ব্যক্তিত্ব সমুদ্রে নুনের পুতুলের মত গলে যায় না, কিন্তু নুন জমে পাথর হয়ে যায়। আনন্ত্যের চিদ্‌ঘনতাই তাঁর ব্যক্তিত্ব। এক যখন বহুতে পরিকীর্ণ হয়, তখনই ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি। অজ্ঞানদশায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্য ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু স্বরূপের জ্ঞানে বিরোধ রূপান্তরিত হয় বৈচিত্র্যে। আর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় বৈচিত্র্য হয় সাযুজ্যের বিলাস। সব আমিই তখন এক পরম আমির উচ্চাবচ বিভূতি। বহু ছড়িয়ে আছে অসীম দেশে, অনন্ত কাল ধরে চলছে তাদের ধর্মের পরিণাম। বাইরে থেকে দেখলে তাদের মনে হবে খণ্ডিত। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে তারা এক

অখণ্ড শক্তি ও চৈতন্যের উল্লাস। সেই শক্তি ও চৈতন্যের অপরোক্ষ অনুভব হয় 'আমি'তেই। অনুভব শুদ্ধ হলে আর 'আমি' নয়—'আত্মা'। আত্মা সাযুজ্য-বোধে সবার সঙ্গে যুক্ত, সবার মধ্যে নিবিষ্ট। তখন 'ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বম্'। 'ইদং' দেহ, আত্মা 'দেহী'। বহু যেন গুণ ও ক্রিয়ার বৈচিত্র্যে একই দেহের কোষস্থানীয়। বহু কোষ, কিন্তু একই শক্তিতে সঞ্জীবিত, একই চৈতন্যে উদ্ভাসিত—সবার স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম এক পারার্থ্যে। এই অখণ্ড অনন্তের বোধ সংহত হয়েছে বিজ্ঞানঘনপুরুষের ব্যক্তিত্বে। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এ-ব্যক্তিত্ব বিবিক্ত, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে সর্বাত্মভূত। বিবিক্তদের মধ্যে কাজ করতে হলে বিবিক্তত্বকে অঙ্গীকার করে নিতে হয়। তাই বিজ্ঞানঘনপুরুষেরও দেহ প্রাণ মন সবই আছে। কিন্তু প্রাকৃত দেহ প্রাণ মনের মত তারা অভেদের বাধক নয়—সাধক। তাদের সংবিৎ এবং বৃত্তি অকুণ্ঠ, কেননা তারা অতিমানসের স্বরূপ-শক্তির দ্বারা আবিষ্ট জারিত এবং প্রচোদিত।

২৫

অতিমানস কালদৃষ্টি

অনন্তচেতনার দুটি বিভাব রয়েছে—একটি কালের অতীত, আরেকটি কালে প্রবহমান। যা কালে প্রবহমান, প্রাকৃতমন তারই খানিকটা দেখতে পায়; কাল যেখানে চলে না, সেখানে তার দৃষ্টিও চলে না। তাইতে কালবাহিত আর কালাতীত—এদুটি সংজ্ঞা তার কাছে পরস্পরের বিরোধী। এই বিরোধের সৃষ্টি হয় বহির্মুখ চেতনাতেই, নইলে দুয়ের মধ্যে বস্তুত কোনও বিরোধ নাই। বাইরে যা ঘটছে, তার মধ্যে একটা পরম্পরা আছে : বীজ হতে অঙ্কুর, তারপর ক্রমে পাতা ফুল ফল। এটা হল শক্তিপরিণামের একটা দিক—তার প্রবৃত্তির দিক। কিন্তু ফলের মধ্যে রয়েছে বীজ, গাছ তার মধ্যে গুটিয়ে আছে। এ হল শক্তিপরিণামের আরেক দিক—তার নিবৃত্তির দিক। কালের পর্বে-পর্বে ঘটনার বিন্যাস এবং বিস্তার। কিন্তু ঘটনার মূলে যে শক্তি আর ভাব, তার মধ্যে পর্বভেদ এত সংক্ষিপ্ত যে তা নাই বললেই চলে—আছে শুধু সম্ভূতির একটা প্রবেগ। কালপ্রবাহের সেই হল কালাতীত উৎস। উৎসে যা বিধৃত এবং সংহৃত, প্রবাহে তা-ই উৎসারিত। উৎস ছাড়া প্রবাহ হয় না। কালের ভিত্তি কালাতীত। ঘটনার ভিত্তি শক্তি এবং ভাব। শক্তি বা ভাবে অবগাহন করলে ঘটনার প্রবাহকে আগে থাকতেই ধরতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায়। অন্তর্জগতে এর প্রমাণ খুব দুর্লভ নয়।

প্রাকৃত মনের গতি বাইরের দিকে, কালের প্রবাহে সে ভেসে চলেছে। উৎসের সন্ধান সে বড় একটা করে না। করতে গেলে চেতনার ধারাকে উজান বওয়াতে হয়—যেমন যোগে। কালাতীত উৎসে গেলে মন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। নিরোধসমাধিতে কিছুরই বোধ থাকে না, অথবা থাকে এক অনন্ত ব্যাপ্তি-চৈতন্যের বোধ, আকাশানন্ত্যের বোধ—কিন্তু অনন্ত কালের বোধ নয়। ব্যুত্থানেও এই নিরোধের সংস্কার থাকে বলে মনোময় পুরুষের কাছে জীবনের কালিক প্রবাহকে মনে হয় যেন প্রারব্ধের অনিরুদ্ধ প্রবেগ, অর্থহীন একটা প্রবাহ, ছন্দোহীন একটা অনাসৃষ্টি। কালাতীত স্থিতি স্পষ্টত এখানে কালের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলে।

অতিমানস চেতনায় কিন্তু কাল এবং কালাতীতের আনন্ত্য একসঙ্গে বিধৃত থাকে। বিশুদ্ধ চৈতন্য কালাতীত শিব, আর শক্তি কালী। শিব আর শক্তি অবিনাভূত। কালাতীতে কালী সংহৃত, আবার কালে কালাতীতেরই হৃদয়ে নৃত্যপরা। বিজ্ঞানীর অনুভবে দুটি যেন তুলাধৃত। কালের ভূমিতে থাকলেও তিনি কালাতীতে প্রতিষ্ঠিত; আবার গুহাহিত কালাতীত স্বরূপে নিস্পন্দ থেকেই তিনি কালে স্পন্দিত বিচ্ছুরিত এবং কৃত্যকারী। আত্মসংহৃত তাদাত্ম্যের বোধে যেমন তিনি কালাতীত, তেমনি আত্মবিসৃষ্টির উল্লাসে কালময়। আবার গঙ্গোত্রী হতে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত কালের সমগ্র ধারাটি তাঁর চেতনায় বিধৃত বলে তিনি যুগপৎ ত্রিকালদর্শী।

*

এই ত্রিকালদর্শিতা বা কালানন্ত্যের চেতনার পূর্ণ স্ফুরণ কেবল অতিমানসের তুঙ্গতম ভূমিতেই সম্ভব। যোগের সহায়ে আত্মচৈতন্যের ক্রমবিকাশের ফলে আমরা তার দিকে এগিয়ে যেতে পারি। তার জন্য পর-পর চেতনার তিনটি ভূমি আমাদের পার হয়ে যেতে হবে।

প্রথম ভূমি হল অবিদ্যার। অচিতি (Inconscience)হতে অবিদ্যায় (Ignorance) উত্তরণ—চেতনার ক্রমবিকাশের এই হল শুরু। অচিতি—অবিদ্যা—বিজ্ঞান। অচিতি কিছুই জানে না—যেমন জড়প্রকৃতিতে; যদিও চোখ বুজে সে এক অন্তর্গূঢ় বিজ্ঞানের শাসনই মেনে চলে নিয়তিকৃত নিয়মের তাড়নায়। তার মধ্যে ক্রমে উন্মেষিত হয় অবিদ্যা : সেও পুরাপুরি জানে না, কিন্তু জানতে চায়, বুঝতে চায় তার মনের মুকুরে কোন্ অজানার আলোর ঝলকে কিসের ইশারা। জ্ঞান তার কাছে স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বহু আয়াসে বাইরে থেকে তাকে তার অর্জন করতে হয়। অন্তরের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে সে তাকিয়ে আছে শুধু বাইরের দিকে।

এই অবিদ্যা সর্বজীবসাধারণ। কিন্তু মানুষের মধ্যে এসে শুরু হয় তার রূপান্তর। বহিশ্চেতনতার সঙ্গে-সঙ্গে জাগে আত্মসচেতনতা, দৃষ্টির মোড় ক্রমে বাইর থেকে ফেরে ভিতরের দিকে। মানুষ দেখতে পায়, তার অনুভবের যে-অর্থ, বাইরের বস্তু তার আশ্রয় হলেও তার তাৎপর্য নিহিত অন্তরের ভাবে। বাইরের জগতের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে তার অন্তশ্চেতনা যে ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠছে,

এতেই তার জীবনের সত্যকার সার্থকতা। আত্মচৈতন্যের উদ্‌বোধনে বাইরের সঙ্গে ক্রমে সে অনুভব করে একটা অদ্ভুত নিবিড় আত্মীয়তা—যা তার প্রাকৃত প্রয়োজনের বাইরে। এর সাধারণ প্রকাশ দরদী চিত্তের সমবেদনায়। সমবেদনা মানুষের প্রতি, সর্বজীবের প্রতি—এমন-কি সর্ববস্তুর প্রতি। বাইরের জগৎ তখন আর শুধু বাইরে নয়, সে আমার অন্তরেও। তাকে জানা শুধু আর ইন্দ্রিয়-মন দিয়ে নয়, হৃদয় আর বোধি দিয়েও। এই বোধি প্রাকৃতমনের গভীরে আবিষ্কার করে বিশ্বমনের সেই মহাসমুদ্রকে, আর-সব মন যার একেকটা ঢেউ। অবিদ্যা তখন চলে বিদ্যায় রূপান্তরের পথে। তার লক্ষণ অন্তর্মুখীনতা, আত্মসচেতনতা, আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তি এবং সর্বাত্মভাব। তখন কোন-কিছুকে জানার অর্থ বিষয়ের স্পর্শটুকু নিয়ে নিজের গভীরে তলিয়ে গিয়ে যে মূলীভূত বিশ্বশক্তি হতে বিষয়টি উদ্‌গত হয়েছে, তার সঙ্গে একাত্মক হয়ে তাকে জানা।

এ-জানা শুধু প্রাক্তন সংস্কারবশে উপরভাসা জানা নয়, বস্তুর মূলে স্বভাবের প্রবর্তনাকে জানা। কারণকে জানি বলে কার্যে তার যে-বিক্ষেপ, তাকে তখন ঠিক-ঠিক ধরতে পারি। জানার এই ধরন কিছুটা প্রাকৃত ভূমিতেও দেখা দেয়, আমরা যখন একটা-কিছু 'তলিয়ে বোঝবার' চেষ্টা করি। কিন্তু সাধারণত সে-তলানো একেবারে বিশ্বমূল আত্মচৈতন্যে তলানো নয়, বহিশ্চেতনার খানিকটা গভীরে যাওয়া মাত্র। কিন্তু তাতেও বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান যে 'সংযম' বা সমাধিলভ্য একাত্মপ্রত্যয়ের উপরেই নির্ভর করে—যোগের এই সূত্রের সত্যতাই প্রমাণিত হয়। সর্বজ্ঞতার অভিমুখে চেতনার উত্তরায়ণের এই হল দ্বিতীয় ভূমি।

তৃতীয়ভূমি বিজ্ঞানের সহজভূমি। চেতনা তখন সম্যক্ সম্বুদ্ধ, নিয়ত আত্মনিরত। কিন্তু এই নিরতির অর্থ বাইরের জগৎকে ভুলে থাকা নয়। অবস্থাটা অত্যন্ত গভীর অথচ সহজস্থিতির একটা অবস্থা বলে সূর্যমণ্ডল হতে যেমন কিরণ বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি জ্ঞান এখানে অন্তর হতে অনায়াসে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এমনিতর একটা বিচ্ছুরণ প্রাকৃত মনেও আছে : স্মৃতি আর কল্পনা নিয়ে আমরা অনবরত একটা অন্তর্জগৎ গড়ছি আর ভাঙ্‌ছি যা বাইরের জগতের উপর নির্ভর করলেও তার সঙ্গে সর্বাংশে খাপ খায় না। কিন্তু প্রাকৃত-মনের এই ভাঙা-গড়া হল সত্য-মিথ্যার ভেজালে তৈরী অবিদ্যার খেলা। চিত্তের ভূমি সেখানে ক্ষিপ্ত অথবা মূঢ়, ক্বচিৎ 'বিক্ষিপ্ত'। কিন্তু ওই তৃতীয়ভূমি শুদ্ধসত্ত্ব একটি যোগভূমি। মূলের সঙ্গে যুক্ত আছে বলেই স্থূলে তার অভি-ব্যক্তিতে বিকার দেখা দেয় না। সে যা দেখে তা ঠিক দেখে, যা জানে তা ঠিক

জানে। দ্বিতীয় ভূমির সঙ্গে এই ভূমির তফাত এই যে, ওতে জ্ঞান আহরণের খানিকটা আয়াস আছে, কিন্তু এতে জানার ব্যাপারটা একেবারে অনায়াস। অন্ধকার অথচ চেনা ঘরে আলো জেবলে দিলে যেমন হয়, এও যেন তেমনি অন্তরের আলোতে চেনা জিনিসকেই আবার জানা। দ্বিতীয়ভূমিতে অনুভব হয়, যেন ভুলে-যাওয়া জিনিসকে আবার জানছি—জ্ঞান একটা প্রত্যভিজ্ঞা। কিন্তু তৃতীয়ভূমিতে জ্ঞান নিত্যজাগ্রত এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

বিজ্ঞানময় চিত্তের এটা হল স্বভাব এবং সম্ভাব্যতার দিক। কিন্তু মনের ভূমিতে কাজ করতে গিয়ে তাকে মনের শর্ত মেনে চলতে হয়, যেমন অতিমানস-কেও মানতে হয়। মন তখন বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত থেকেও তার সবটুকু কখনও ধারণা করতে পারে না। কিন্তু ইচ্ছা করলে বিজ্ঞান তার যে-কোনও বিভাব মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারে। মন তখন যন্ত্র, আর বিজ্ঞান যন্ত্রী। বিজ্ঞান সর্বজ্ঞ, কিন্তু তার জ্ঞান মনে স্ফুরিত হয় বিজ্ঞানের সঙ্কল্প এবং মনের ধারণসামর্থ্য অনুসারে। প্রাকৃতভূমিতে বিজ্ঞানীর সর্বজ্ঞতা সে-ভূমির আইন মেনে এইভাবেই কাজ করে।

*

অতিমানসের দিকে যেতে-যেতে মনকে এই স্তরগুলি পার হতে হয় এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে তার কালজ্ঞানেরও বিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতভূমিতে মানুষের কালজ্ঞান নিতান্তই সংকীর্ণ। তার কাছে বর্তমান ক্ষণই খুব স্পষ্ট, অতীত আর ভবিষ্যৎ আবছা। ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে সে ভেসে চলেছে—কোথায় তা নিশ্চিত করে বলতে পারে না। যে-কালকে সে অতিবাহন করে এল, তার প্রত্যয়ও তার কাছে একটা আবছা সংস্কারে পর্যবসিত; তা আর তার কাছে জীবন্ত নয়, একটা প্রেতচ্ছায়ার শামিল। কালিক অনুবৃত্তির (continuity) একটা সামান্যবোধ তার আছে, নইলে তার ব্যবহার চলে না : তার এক মেরুতে অতীতের স্মৃতি, আরেক মেরুতে ভবিষ্যতের কল্পনা—যার নির্ভর অতীত অনুভবের সজাতীয়তা (uniformity) এবং পৌনঃপুনিকতার উপর। বরাবর যখন এইরকমটা হয়ে এসেছে, তখন এবারও তা-ই হবে—এই একটা প্রত্যাশা তার ভবিষ্য কল্পনার উৎস। কিন্তু এরকমটা যে হবেই, তা সে জোর করে বলতে পারে না। তার চাইতে যা হয়েছে তা নিশ্চিত, কিন্তু তার অনুভব উজ্জ্বল নয়।

সুতরাং আগে-পিছনের একটা বিরাট অন্ধকারের মধ্যে তার অনুভবের ক্ষণিকা যেন জোনাকির আলোর মত টিপটিপ করে জ্বলে চলেছে—এই হল তার কাল-জ্ঞানের চেহারা।।

বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বর্তমান অনুভবের এই ক্ষণস্থায়িত্বকে ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন তাঁদের বিখ্যাত ক্ষণভঙ্গবাদ। এই মতে সব-কিছুই ক্ষণিক—যেমন অন্তরের অনুভব, তেমনি বাইরের বস্তুস্থিতি। অনুভব যদি ক্ষণিক হয়, আমার এই ক্ষণের অনুভব যদি পরক্ষণেই বিলীন হয়ে যায়, আর আমার অনুভবই যদি হয় আমার আত্মভাব, তাহলে শাশ্বত আত্মা বলে কিছুই নাই। আমার অতীত মৃত, ভবিষ্যৎ অজাত; আমি আছি শুধু বর্তমানের এই ক্ষণটিতে। তার পরক্ষণেই এই আমি ভেঙে গিয়ে দেখা দিল আরেক আমি আর একটি ক্ষণের জন্য। এমনি করে আমার আমি গুঁড়িয়ে গেল, যদি থাকবার কিছু থাকে তো রইল এক অপ্রমেয় শূন্যতা। এই শূন্যতাই আত্মভাব এবং জগতের তত্ত্ব। ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে চেতনা বা শক্তির অনুবৃত্তি একটা বিকল্প (mental construction) মাত্র।

একেবারে উপরভাসা আমাদের প্রাকৃতচেতনাকে অবলম্বন করে এমনিতর একটা দর্শন দাঁড় করানো যায় বটে; এবং তা যে সর্বনাশা অনুভবে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে, তার প্রামাণ্যও অনস্বীকার্য। কিন্তু এই সত্যই চেতনার সবখানি সত্য নয়। বৌদ্ধের এই বিশ্লেষণ প্রাকৃতবুদ্ধির বিশ্লেষণ, যে-বুদ্ধি এক্ষেত্রে একধরনের আণবিক বিভঙ্গবাদকে (atomic analysis) আশ্রয় করেছে। বিশ্লেষণে বস্তুকে অণু-পরমাণুতে ভাঙা যায় বটে, কিন্তু তাতেই তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। যা ভাঙ্‌লাম, তাকে আবার জুড়ে দেখাতে হবে। তখন বিশ্লিষ্ট অবয়ব অবয়বীতে (whole) সংশ্লিষ্ট হয় কি করে? 'অদৃষ্ট'বাদী নৈয়ায়িক বললেন, হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু কি করে হয় তা জানি না। সাংখ্যবাদী আরও গভীরে গিয়ে বললেন, হয় শক্তিতে; শক্তির স্বভাব হচ্ছে পরিণাম, অনুবৃত্তি তার ধর্ম। আমাদের বিশ্লিষ্ট অনুভবের একটি ক্ষণেরও গভীরে যদি তলিয়ে যাই, তাহলে দেখব ওই ক্ষণটি একেবারে পূর্বাপর ব্যবচ্ছিন্ন নয়। অতীত হতে শক্তির প্রবাহ তার মধ্যে সংহত হয়ে একটা ভবিষ্য সার্থকতার দিকে উদ্যত হয়ে রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে নিরর্থক ওই ক্ষণটিতে অর্থের বিধান করছে শক্তির পরিণাম। অনুভব যত গভীর হবে, পরিণামের অনাদ্যন্ত ধারাবাহিকতা চেতনায় ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তখন বুঝব,

ক্ষণভঙ্গে কালের বাইরের পরিচয় শুধু, তার সত্যকার পরিচয় অনুবৃত্তিতে। আত্মনিরতি যত গভীর হয়, কালিক সংহতির অনুভবও তত স্পষ্ট হতে থাকে। অবশেষে বীজের মধ্যে বনস্পতির মত একটি ক্ষণের মধ্যে শাশ্বত কালকে সমাহিত দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষণ তখন অনন্তের ভ্রূণ। ক্ষণের সংহতিকে আশ্রয় করে শাশ্বতের বিস্তার—এই হল কালিক আনন্ত্যবোধের সঙ্কেত।

প্রাকৃতভূমিতে বর্তমান ক্ষণের অনুভব সবচাইতে তীব্র হলেও মানুষ কিন্তু বস্তুত ক্ষণজীবী নয়। জীবনের পথে চলতে গিয়ে তাকে সামনে-পিছনে তাকাতেই হয়। অতীতকে জীর্ণ করে নিয়ে মন থেকে তাকে মুছে ফেলা যায়, কিন্তু জীবনের বেগে ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে সে পারে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ কি জানা যায়? সবটা না জানতে পারলেও কিছুটা যে জানা যায় না, তা নয়। এক্ষেত্রে কার্য-কারণের জ্ঞান আর প্রাকৃতিক ব্যাপারের সারূপ্য (uniformity) তার মস্ত বড় সহায়। প্রকৃতিতে একই কারণ থেকে একই কার্য একই ধরনে বারবার দেখা দেয়। এই সূত্রকে অবলম্বন করে জড়বিজ্ঞানী জড়ের ভবিষ্যৎ ব্যবহারের একটা নিখুঁত ছক এঁকে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর এই কৃতিত্ব জড়ের ক্ষেত্রে যতখানি সার্থক, প্রাণ আর মনের ক্ষেত্রে বস্তুত ততখানি সার্থক নয়।

তার কারণ, প্রাণ আর মনের চলন যেমন সূক্ষ্ম তেমনি জটিল। কার্য-কারণের সূত্র এখানে তৈরী হয়েছে বহু বিচিত্র তন্তুর পাক দিয়ে, যার সবখানি প্রাকৃতবুদ্ধির গোচর নয়। একটা কারণ-সামগ্রী (totality of causes) হতে একটা কার্য-সামগ্রীর মোটামুটি আন্দাজ সে করতে পারে; কিন্তু তা যে সর্বাংশে সত্য হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নাই। একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেছিলেন, রেলের উপর একটা এঞ্জিন ছুটে আসছে, আরেকটা পিঁপড়াও হাঁটছে; এঞ্জিনের গতিরেখা আমরা জানি, কিন্তু পিঁপড়াটা প্রাণ বাঁচাতে ডাইনে না বাঁয়ে যাবে তা বলতে পারি না। তাইতে প্রাণ আর মনের ক্ষেত্রে কি ঘটবে, মানুষ তার গড়পড়তা একটা আন্দাজ করতে পারে মাত্র, নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারে না। বস্তুত, একদিকে রয়েছে জড়ের নিয়ম, আরেকদিকে চৈতন্যের সর্বগ্রাহী তটস্থ স্বাতন্ত্র্য: শক্তিসমন্বিত হলেও আসলে দুইই স্থাণুধর্মী। দুয়ের মধ্যে প্রাণ আর মনকে আশ্রয় করে প্রকাশ পাচ্ছে শক্তির বিচ্ছুরণ। সে-বিচ্ছুরণে তার স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস, সে অঘটনঘটন-পটীয়সী। সে-উল্লাসের ক্ষেত্র জড়, আর অধিষ্ঠান চৈতন্য। জড় শব, আর চৈতন্য শিব; দুইই স্থাণুধর্মী। দুয়ের বুকে শক্তির নৃত্য অন্তহীন সম্ভাবনায় বুদ্ধির

অপ্রমেয়। আধুনিক জড়বিজ্ঞানীও স্বীকার করেন, জড়ের গভীরে শক্তির উল্লাসে রয়েছে এক অনিশ্চয়তা (indeterminacy)। জীবাত্মার (Soul) ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যে তারই আভাসন। পরমাত্মার (Spirit) ইচ্ছা অনন্ত্যাবগাহী, অতএব দুর্জ্ঞেয়। সে-ইচ্ছার প্রশাসন স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে অন্বিত, কেননা তার স্বরূপ হল তাঁর আত্মবিভাবনা (self-formation)। তিনি বহু হচ্ছেন : সে-হওয়ার নিয়ম আছে, একটা ছক আছে; কিন্তু বহুত্বের কোনও নিয়ম নাই। তিনি কখন কি যে হতে পারেন, কেউ তা বলতে পারে না। অতএব মূলে পাচ্ছি, এক বিশ্বতোমুখ ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য এবং তারই যে-কোনও একটি ধারায় নিয়মের নৈশ্চিত্য। এই নৈশ্চিত্যের জ্ঞান তখনই সম্ভব, যখন আমরা ওই মূল ইচ্ছায় অবগাহন করতে পারি। এ যেন বীজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বনস্পতির ভবিষ্য ইতিহাসের অবধারণ। ত্রিকালদর্শিতাও এই রীতিতেই সম্ভব।

*

ত্রিকালদর্শিতার কিছুটা আভাস প্রাকৃতমনেও যে না ফোটে, তা নয়। সাধারণত তা দেখা দেয় অস্পষ্ট প্রাতিভসংবিতের আকারে। যেমন কখনও-কখনও অনুমানের কোনও হেতু বা ইচ্ছার কোনও তাগিদ না থাকা সত্ত্বেও মন ডেকে বলে, আজ এই হবে; এবং ঠিক তা হয়ও। এইধরনের প্রাগনুভব (presentiment) কোনও-কোনও ব্যক্তিতে বা জাতিতে বেশ পরিস্ফুট। আসলে এগুলি প্রাণ ও মনের একধরনের সহজসংস্কার (instinct) যা ইতর-প্রাণীতে প্রকট, কিন্তু তর্কবুদ্ধির (logical reason) বিকাশ ঘটাতে গিয়ে মানুষের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে। অনুশীলনের ফলে এদের আবার ফুটিয়ে তোলা যায় বটে, কিন্তু তবুও ইতরপ্রাণীর মত অবিসংবাদী তারা কোনকালেই হয় না। কেননা, প্রকৃতি চায় না, মানুষ আবার পশুর স্তরে ফিরে যাক। তাই সহজসংস্কারের নৈশ্চিত্য অর্জন করবার জন্য মানুষকে উর্ধ্বতন বোধির শক্তিকে আবাহন করতে হয়। বোধিজাত যে-প্রাগনুভব, তার ধরন আলাদা। সহজাত প্রাগনুভবের উৎস চেতনার কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু বোধি হতে তার উৎসারণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িয়ে বেশ স্পষ্ট লক্ষ্যগোচর হয়। তবুও তার মধ্যে মানস-সংস্কারের ভেজাল থাকতে পারে। তাকে বিশুদ্ধ করতে হলে চেতনাকে আরও উর্ধ্বে তোলা দরকার হয়।

বুদ্ধি অনেকসময় বোধির সহজ স্ফুরণের বাধা, অথচ ভবিষ্যৎ জানবার আগ্রহ তার প্রবল। তাই দায়ে পড়ে সে নানা বিকল্পের আশ্রয় নেয়, যেমন শকুনবিদ্যা (cult of omens), করকোষ্ঠী, ফলিত জ্যোতিষ ইত্যাদি। অবশ্য 'সুবুদ্ধি' এদের 'ওড়ায় হাসে'। কিন্তু তবুও মাঝে-মাঝে এসব আবার ফলতেও দেখা যায়। বিশ্বের সবার সঙ্গে সবার ওতপ্রোত সম্পর্ক, সুতরাং এইসব অপজ্ঞানের মূলে খানিকটা বিজ্ঞান থাকা অসম্ভব নয়। তবে আসলে সে-বিজ্ঞানের ধারক এবং পোষক হচ্ছে বোধি, বুদ্ধির কোনও কসরত নয়। যারা এসব নিয়ে কারবার করে, তারাও শেষপর্যন্ত সার্থকতা অর্জন করে বস্তুত বোধির দৌলতে।

সত্যকার ত্রিকালদর্শিতার স্ফুরণ শুরু হয় চৈত্যসত্ত্ব ও চৈত্যবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে। চৈত্যসত্ত্ব অধিচেতন পুরুষের (subliminal Self) বিভূতি। উপনিষদে ইনি 'স্বপ্নস্থান' পুরুষ এবং যোগের 'স্বপ্নজ্ঞান' চৈত্যানুভবের সমার্থক। প্রাতিভসংবিৎ এর অন্তর্গত এবং তার পরিধি যে বলতে গেলে অনন্তবিস্তৃত, একথা আগেই বলেছি। চৈত্যসংবিতের (psychical sense) সহায়ে চিত্তাকাশে দেশ-কালের ব্যবধান ডিঙিয়ে বাইরের ছবি দেখা যেতে পারে, এও বলেছি। দূরদর্শন দূরশ্রবণ ইত্যাদি যোগের ক্ষুদ্রসিদ্ধি এইধরনের। এরা আধ্যাত্মিকতার সূচক মোটেই নয়। এগুলি কারও মধ্যে সহজাত, আবার কারও মধ্যে কোনও কারণে নেপথ্যের পরদা সরে গিয়ে হঠাৎ আবির্ভূত হয়। কি করে এগুলি হয়, তারা তা বলতে পারে না। কিন্তু অধ্যাত্মচেতার মধ্যে একটা বিশিষ্ট চিৎপরিণামের ফলে এরা দেখা দেয় বিশ্ব-মনের আত্মরূপায়ণের স্পন্দরূপে। চৈত্যসংবিৎ যদি অনাবিল ও সংস্কারমুক্ত হয়, তাহলে এদের ধারণা এবং বিবৃতিও হয় যথাযথ।

চৈত্যসত্ত্বের পুষ্টি এবং চৈত্যানুভবের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে ত্রিকালদর্শিতার নানা 'প্রকারে'র (modes) স্ফুরণ হয়। চৈত্য বা অধিচেতন পুরুষ তখন চেতনাকে পিছনে হটিয়ে নিয়ে সুপ্ত অতীতকে জাগিয়ে তুলতে পারেন কিংবা ভবিষ্যৎকে আভাসিত করতে পারেন। এর উপায় হচ্ছে, যে-তত্ত্বের মধ্যে ভাব বা বস্তুর বীজসত্তা নিত্যবিধৃত হচ্ছে, তাতে অবগাহন করে তার সঙ্গে একাত্মক হওয়া এবং সেই সংহত আত্মচৈতন্য হতে কালকলনাকে উৎসারিত করা। আগেই বলেছি, বনস্পতির ইতিহাস কালে বিস্তৃত কিন্তু বীজশক্তিতে সংহত। কালব্যাপ্তির যে-কোনও পর্ব হতে অন্তরাবৃত্ত চেতনাকে যদি বীজ-

শক্তির মধ্যে তলিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেখান থেকে বনস্পতির পূর্বাপর সমগ্র ইতিহাসকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এমনি করে চিদাকাশে অজানার আলেখ্যকে ফুটিয়ে তোলা, অবচেতন স্মৃতির গহন হতে অতীতকে এবং অব্যক্তের গর্ভাশয় হতে ভবিষ্যৎকে উদ্ধার করা এবং অনাকুল চৈত্যসংবিতের দ্যুতিতে তাদের উজ্জ্বল করে তোলা, প্রতীকের মাধ্যমে জড়োত্তর ভূমির সত্যকে চিত্তাকাশে প্রতিফলিত করা, আকাশলিপিতে ত্রিকালের ইতিহাস পাঠ করা—চেতনার অন্তরাবর্তনের ফলে এসবই সম্ভব। নেপথ্য হতে যে-সব অলৌকিক এবং দিব্য শক্তি আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে, এই উপায়ে তাদেরও সাক্ষাৎভাবে অনুভব করা যায়। এই বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধি হচ্ছে অতিচেতনার গহনে ডুবে ঈশ্বরসঙ্কল্পের সাক্ষাৎকার।

চৈত্যানুভবের উন্মেষের ফলে জাতিস্মরতা, ভুবনজ্ঞান ইত্যাদি নানারকমের বিভূতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু একটা বিষয়ে সাধককে গোড়াতেই সাবধান করে দেওয়া ভাল : চৈত্যসত্ত্বের জ্ঞান একেবারে প্রথম থেকেই প্রমাদশূন্য হয় না। মনের কাছাকাছি তার বাস বলে মানসসংস্কারের প্রভাব তার উপর পড়া কিছুই বিচিত্র নয়। তাই বোধি বা অতিমানসের আবেশ দিয়ে তার শক্তিকে পদে-পদে শোধন করে নিতে হয়। সাধকের তটস্থতাও শুদ্ধির সহায়ক। প্রথম যখন বিভূতি ফুটতে থাকে, তখন তার প্রতি কোনরকম আগ্রহ না রাখাই ভাল। বাইরের মত অন্তরেও এক বিরাট জগৎ রয়েছে। তার মধ্যে কত-কিছু ফুটছে ঝরছে—আপন খেয়ালে। সাধক যদি নিঃস্পৃহ থেকে কেবল তাদের দেখে যান, তাহলে অদৃশ্য এক ঋতায়িনী শক্তির প্রভাবে ক্রমে তারা গুছিয়ে আসে, অবিদ্যার আবিলতা দূর হয়ে শুদ্ধবিদ্যার আবেশে তারা সত্যবহ হয়। জানতে হবে, নিজেকে সবসময় বিবিক্ত এবং ঊর্ধ্বশক্তির প্রতি উন্মুখ রাখা যোগের একান্ত অনুকূল।

*

চেতনার অন্তরাবৃত্তি এবং আত্মস্থিতির ফলে চৈত্যানুভব যখন সক্রিয় হয় আর অধিচেতনার বার্তা প্রাকৃতচেতনায় বুদ্‌বুদের মত ভেসে উঠতে থাকে, তখন সাধকের মধ্যে বিজ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞার (recognition) আকার ধারণ করে। গভীর হতে যা ভাসে তাকে দেখে মনে হয়, এ যেন জানা জিনিসকেই দেখছি—

অজানাকে নয়। এ একধরনের স্মৃতি, কিন্তু প্রাকৃত স্মৃতির মত নয়। প্রাকৃত স্মৃতি অতীতের কোনও বিশিষ্ট ঘটনাকে জানে; আর এই ধ্রুবা স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞা আবিষ্কার করে বিশেষের মূলীভূত সামান্যভাবকে যার ব্যঞ্জনা তিন কালেই ব্যাপ্ত। আমি কাল বিকালে কোথায় গিয়েছিলাম, আজ সকালে তা মনে করতে পারি : এটা হল সাধারণ স্মৃতি। কিন্তু আমি যদি অন্তরাবৃত্ত হয়ে আত্মস্বরূপে অবগাহন করি, তাহলে সে-অনুভবের কালিক প্রকার (mode) হবে—আমি এই ছিলাম, এই আছি এবং এই থাকবও। আমি নিত্যকাল ধরে যা, এ-অনুভব তারই পুনরাবিষ্কার। তাই এ স্মৃতি বটে; কিন্তু ভবিষ্যৎকেও কুক্ষিগত করে বলে এ আবার স্মৃতিও নয়। এর দার্শনিক পরিভাষা হল 'প্রত্যভিজ্ঞা'। যেমন আত্মস্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞা হয়, অধিচেতন ভূমিতে তেমনি বস্তুস্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞাও সম্ভব। আত্মস্বরূপের প্রত্যয় একরস, সদৃশ-পরিণাম (homogeneity) তার বৈশিষ্ট্য; আর বস্তুস্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞা সেই ভূমিতেই বিসদৃশপরিণামের তরঙ্গভঙ্গ, ভাব হতে বস্তুর ভাবনা।

প্রথম অবস্থায় প্রত্যভিজ্ঞার রূপটি মানস-সংস্কারের মিশ্রণের দরুন হয় অবিশুদ্ধ। তার প্রতিকারের জন্য বোধির অনুশীলন প্রয়োজন। মন খণ্ডদর্শী, সীমিত অহংএর চাহিদা মেটাতে গিয়ে সহজ সত্যকে সে বাঁকা-চোরা করে দেখে। অথচ এই মনেরই পিছনে রয়েছে বোধি—অখণ্ডদর্শন যার স্বভাব। বস্তুর মূলে সে দেখে ভাবকে, আর সে-ভাব তার আত্মবোধেরই একটি প্রকার। আত্মবোধের বিচ্ছুরণে ভাবের যে-উল্লাস, বস্তুর ইতিহাসে তারই কালিক অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তিকে বোধি স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টিতে দেখে, সীমিত বাসনার রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে নয়। তাই তার দর্শন হয় অবিকল্প সত্যের দর্শন। শাশ্বতের প্রবাহ সংহত হয়ে আছে যে-পরমক্ষণে, তা-ই হতে উৎসারিত হয় তার কালের কলনা। তাই তিনটি কালকেই সে একসঙ্গে দেখতে পায় : অতীত তার কাছে বিস্মৃত নয়, কিংবা ভবিষ্যতও অজ্ঞাত নয়।

বোধিজাত এই ত্রিকালদৃষ্টির অভিব্যক্তি হয় ধীরে-ধীরে, কেননা বোধিকে প্রথমটায় মনের বাধা কাটিয়ে কাজ করতে হয়। মন হল অজ্ঞানের শক্তি, আর বোধি বিজ্ঞানের। অজ্ঞান আলো-আঁধারির মধ্যে হাতড়ে-হাতড়ে চলে, দেখার ন্যূনতাকে সে পূরণ করে বিকল্প (construction) দিয়ে। কিন্তু বোধির কাছে সবই দিবালোকের মত স্পষ্ট। প্রথমটায় অজ্ঞানে-বিজ্ঞানে মেশামিশি থাকে

বলে ত্রিকালদৃষ্টির শক্তি ব্যাহত বা বিকৃত হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে।

মনের বিকল্প দুরকমের হতে পারে। একরকম বিকল্পের সৃষ্টি হয় বাসনার প্ররোচনা থেকে। মন ঘটনার গতিকে তটস্থ হয়ে দেখতে অভ্যস্ত নয়। সে যেমন চায় ঘটনার পরিণাম তেমনই হ'ক, এমন-একটা ইচ্ছা সে সবসময় পোষণ করে। এ-ইচ্ছা হয়তো তার ব্যক্তিগত, ঋতচ্ছন্দা সত্যসঙ্কল্পের কোনও প্রকাশ নয়। দৃষ্টি তখন বাসনার রঙে রাঙিয়ে যায়, সত্যের নির্বিকল্প শুভ্র রূপটি দেখা আর সম্ভব হয় না। কখনও আবার এই অনুরঞ্জন আসে বাইরে থেকে : মনের অজানতে বিশ্বশক্তির কোনও অবাঞ্ছনীয় প্রভাব তাকে অধিকার করে তার দৃষ্টিকে বদলে দেয়। মনকে সম্পূর্ণ বাসনাশূন্য করতে পারলে এইসব বিকল্পের অনাসৃষ্টি হতে সে রক্ষা পায় বটে, কিন্তু তাতে যোগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না। আমরা বিশ্বব্যাপারের শুধু উদাসীন উপদ্রষ্টা হতে চাই না, চাই তার ভর্তা মহেশ্বরও হতে। দৃষ্টির বিশুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আমরা চাই সঙ্কল্পেরও সত্যসন্ধ অবন্ধ্যতা। পরম পুরুষে দৃষ্টি আর সৃষ্টি জ্ঞান আর সঙ্কল্প এক। আমরা সেই সমর্থ দৃষ্টির শরিক হতে চাই। তাই দৃষ্টির বিশুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্কল্পের বিশুদ্ধিও আমাদের তুল্যভাবে সাধ্য। তার জন্য উপদ্রষ্টৃত্ব বা তটস্থতারও গভীরে আমাদের ডুবতে হবে, যেতে হবে অতিমানসের সেই পরম ধামে যেখানে জ্ঞান আর সঙ্কল্প এক।

মনের আরেকরকমের বিকল্পের মূল রয়েছে তার স্বভাবে। ঘটনাকে মন তিনভাবে দেখে—বাস্তব সম্ভাবিত এবং অবশ্যম্ভাবী। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতএব বর্তমান, তা হল বাস্তব—তার আর নড়চড় নাই। অতীতও একরকম নিশ্চিত, যদিও তার অনেকখানি বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে আছে। কিন্তু গোল বাধে ভবিষ্যৎকে নিয়ে : তার কতটুকু সম্ভাবিত আর কতটুকু অবশ্যম্ভাবী, মন তা স্থির করতে পারে না। অথচ সত্যকে নিশ্চিতরূপে জানবার আগ্রহ তার দুর্বার। আগেই বলেছি, একমাত্র জড়ের রাজ্যেই নিশ্চিত ভবিষ্যৎকে খানিকটা সে জানতে পারে, কিন্তু প্রাণ আর মনের রাজ্যে তেমন পারে না। ভবিষ্যৎ মনের কাছে প্রত্যক্ষ নয়, অনুমেয়। কিন্তু অনুমানের হেতু এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বা সুনিশ্চিত নয়। একমাত্র অবরোহ-অনুমানেই (deductive reasoning) নৈশ্চিত্য সম্ভব, যদি তার ভিত্তি সুনিশ্চিত হয়। ভিত্তির নিশ্চয় করে আরোহ-অনুমান (inductive reasoning)। কিন্তু ব্যাপকভূয়োদর্শন বা কার্য-কারণসম্পর্কের অব্যভিচারী জ্ঞানের অভাবে আরোহ-অনুমানের প্রামাণ্যে ন্যূনতা

থেকেই যায়। কোনও অনুমানই নিশ্চায়ক নয় বলে মন ভবিষ্যৎকে ঠিক-ঠিক জানতে পারে না। জানার গরজকে সে তখন সার্থক করে বাসনা-প্ররোচিত নানা বিকল্পের দ্বারা। আশা কত স্বপ্নই দেখে। কিন্তু সব স্বপ্ন কি আর সার্থক হয়। অথচ কাজ করতে গেলে স্বপ্ন না দেখেও তো উপায় নাই।

*

বোধিরও কারবার বাস্তব সম্ভাবিত আর অবশ্যম্ভাবীকে নিয়ে। কিন্তু তার জ্ঞানের সাধন হল অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ। আর এ-প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়েরই নয়, প্রাতিভসংবিতেরও। সে শুধু বস্তুকে দেখে না, দেখে তার মূলে শক্তি ও ভাবের যে-প্রেরণা রয়েছে তাকেও। আত্মপ্রত্যক্ষের সঙ্গে না জড়িয়ে বস্তুতে শক্তি বা ভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং বোধির এই জ্ঞান তাদাত্ম্যজ্ঞানেরই একটা প্রকার। বিষয়কে আত্মসাৎ করে যখন জানি অথবা 'হয়ে জানি', তখন আর তার মধ্যে অনুমানের অবকাশ থাকে না।

এই বোধিজ জ্ঞান সক্রিয় হতে পারে তিনটি ভূমিতে। বাস্তবের ভূমিতে তার প্রথম ক্রিয়া। প্রাকৃতমনেরই মত বোধি সেখানে ঘটনার প্রবাহ দেখে চলে, কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার গভীরে শক্তি ও ভাবের যে-প্রবাহ তাকেও প্রত্যক্ষ করে। বলা বাহুল্য, এ-প্রত্যক্ষ কাল্পনিক নয়—এ একটা সংজ্ঞান বা সংবেদন অর্থাৎ নিস্তরঙ্গ আত্মানুভবের উপর বাইরের স্পন্দনকে অনুভব করে তার নিশ্চিত পরিণাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আত্মানুভবের সঙ্গে যোগ থাকাতে জ্ঞান তখন বাইর থেকে আহৃত না হয়ে ভিতর থেকে উৎসারিত হয় : যা ঘটেছে এবং তার ফলে যা ঘটছে এবং ঘটবে, তা আমি আমার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। প্রথমটায় হয়তো ত্রিকালের পূর্ণপ্রত্যক্ষ হয় না—বর্তমানকে আশ্রয় করে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত কারণের বা কার্যের প্রত্যক্ষই হয়।

এই বোধিজ প্রত্যক্ষ সুনিশ্চিত হলেও কতকটা উপরভাসা, কেননা ঘটনার উপরের প্রবাহ এখানে জ্ঞানের আশ্রয়। তার নীচে যে শক্তির প্রবাহ, তা অনন্ত সম্ভাব্যতার উৎস। এর মধ্যে আপাতত কিছুটা বাস্তবের আকারে নিশ্চিত হয়ে উপরে দেখা দিয়েছে। তার সুদূরসম্ভাবী পরিণাম কি, তা বাস্তবাশ্রয়ী বোধির কাছেও সবসময়ে ধরা পড়ে না। তাছাড়া নীচের থেকে অতর্কিতের

উদ্ভাস, এমন-একটা ব্যাপার, যা উপর থেকে লক্ষ্য হয় না। উপরের ঘটনার মোড় নীচের ঠেলায় হঠাৎ বদলে যেতে পারে এবং এই বদলে দেওয়াটা শক্তির স্বাতন্ত্র্যের লীলা। অবশ্য লীলারও একটা নিয়ম আছে, কিন্তু শক্তির অন্তস্তলে না ঢুকলে তাকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

বাস্তবাশ্রয়ী বোধির এই ন্যূনতা পূরণ করে জ্যোতির্ময় চিদাবেশ (inspiration)। বিশ্বশক্তির গর্ভাশয়ে নিহিত রয়েছে অনন্ত সম্ভাব্যের ভ্রূণ। তার কোন্‌টি বাস্তবে পরিণত হবে, তা জানা যায় একমাত্র সেই শক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে। অবশ্য শক্তি এখানে লীলোচ্ছলা। কিন্তু বলেছি লীলারও নিয়ম আছে। সে-নিয়ম বা 'যাথাতথ্যত অর্থের বিধান' তন্ত্রিত হয় আরও গভীরে নিগূঢ় বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশশক্তির (revelation) দ্বারা। এই চিৎপ্রকাশ সর্বতোভাস্বর শাশ্বতনিত্যতা—ত্রিকালের সমস্ত পর্বই তার কাছে স্বরূপে অনাবৃত। একে আশ্রয় করেই কুরুক্ষেত্রে ভগবান বলতে পারেন, 'ধার্তরাষ্ট্রেরা আমার দ্বারা নিহত হয়েই রয়েছে, হে সব্যসাচী, তুমি বধের নিমিত্ত মাত্র হও।' বধ এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী; যা অবশ্যম্ভাবী তা-ই প্রাকৃত-জগতে বাস্তব হচ্ছে। কিন্তু অবশ্যম্ভাবিতা আর বাস্তবতার মাঝখানে রয়েছে অনন্ত সম্ভাব্যতার আকারে শক্তির লীলায়ন। সে যেন টোপগেলা মাছকে খেলিয়ে ডাঙায় তুলছে। এই খেলিয়ে তোলাতেই বাস্তবের ভূমি থেকে তাকে মনে হয় অঘটনঘটনপটীয়সী। কিন্তু বস্তুত তার লীলাও ঋতচ্ছন্দা এবং সে ঋতসত্যে প্রতিষ্ঠিত।

বিচিত্র সম্ভাব্যতার ভিতর দিয়ে অবশ্যম্ভাবীর বাস্তবে রূপায়ণ—এই হল কাল-কলনার রহস্য। একে বোধে আনা খুব সহজ নয়, কেননা মানস সংস্কার পদে-পদে তার পথে বাধার সৃষ্টি করে। ত্রিকালদৃষ্টির সাধনা শুরু করতে হয় প্রাকৃত মনকে দিয়েই—যে-মন তিনটি কালের একটিকেই কেবল স্পষ্ট দেখতে পায়, আর-দুটি কাল যার কাছে আবছা। এই মনের অজ্ঞানকে প্রথম রূপান্তরিত করতে হয় প্রত্যভিজ্ঞায় এবং তার পরে বিজ্ঞানে। করতে গিয়ে মনকে নিথর করতে হয়, যাতে সে সংস্কারলেশশূন্য হয়। কিন্তু অমনীভাবে আবার কালজ্ঞান থাকে না, অথচ কালাতীতে না গেলেও কালজ্ঞান সম্যক্‌ হয় না।

এই সমস্যার সমাধান হতে পারে মনের রূপান্তরে—তাকে ক্রমে বোধিবাসিত, চিদাবিষ্ট এবং স্বপ্রকাশ করে তোলায়। বোধিই এ-সাধনার প্রধান সহায়। বোধি আছে মনের ওপারেই, তার ক্রিয়া নানাভাবে মনের মধ্যে হচ্ছেই।

সুতরাং তার নাগাল পাওয়া খুব কঠিন নয়। এই বোধি আবার অতিমানস জ্যোতির বাহন। বোধি যদি অনুশীলনের ফলে চেতনায় সহজ হয়—আর তার জন্য মন বা বুদ্ধির অনুমানবৃত্তিকে দাবিয়ে দিয়ে মনকে প্রাতিভদর্শনে অভ্যস্ত করতে হবে—তাহলে বোধি প্রতিক্ষেত্রে অতিমানসের জ্যোতিকে নিজের মধ্যে নামিয়ে এনে নিজের প্রবৃত্তিকে (function) বিশুদ্ধ এবং সমর্থ রাখতে পারে। বোধির সহায়ে তখন মনের অতিমানস রূপান্তর সম্ভব হতে পারে। তার পর্বভেদের কথা অন্যত্র বলেছি।

একথা মনে রাখতে হবে, পরম চেতনায় দৃষ্টিই সৃষ্টি বা আত্মরূপায়ণ। এ যেন নিজের ভিত্তিতেই আত্মগত বিশ্বের উন্মীলন। উন্মীলনের ধারাবাহিকতাই কাল। ধারার উৎস আত্মচৈতন্যে, ত্রিকাল সেখানে সংহত। সেই চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে সবটাকে দেখা আর করা অথবা হওয়া—একই কথা। ত্রিকালদৃষ্টির পরম তাৎপর্য এই সম্ভূতিতে। তা মাহেশ্বর্যের লক্ষণ এবং অপরা-প্রকৃতির রূপান্তরের প্রয়োজক। পূর্ণযোগের পরমা সিদ্ধি এইখানে।

॥ সমাপ্ত ॥